

www.e-ilm.weebly.com

اشراق الھدی

# আশরাফুল হিদায়া

বাংলা



লেখকবৃন্দ

মাওলানা মুঃ অছিউর রহমান  
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা আবু বকর  
মুহাদ্দিস, দারুল উলুম টঙ্গী, গাজীপুর

মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ  
মুহাদ্দিস, জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা

সম্পাদনায়

মাওলানা আহমদ মায়মুন  
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ বক্সক হল রোড, বালাবাজার, ঢাকা-১১০০

। মাওলানা মুঃ অহিউর রহমান

كتاب البيوع -এর শুরু থেকে باب خيار العيب -এর শেষ পর্যন্ত।

। মাওলানা আবু বকর

باب المراجعة والتولية থেকে باب البيع الفاسد -এর শেষ পর্যন্ত।

। মাওলানা মুফতি হাযীযুল্লাহ

كتاب الصرف থেকে باب الريوا -এর শেষ পর্যন্ত।

---

## আশরাফুল হিদায়া বাংলা

---

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মুন  
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা  
[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমুদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমুদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

---

হাদিয়া ❖ ৬৫০.০০ [ ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র ]

---



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين - اما بعد :

ফিকহে হানাফীতে হিদায়া গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের বিবেচনায়ই গ্রন্থখানি শত শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূত্রির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এবং সোয়া আটশ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি ফিকহশাফের অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সারা বিশ্বে পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। খোদ আরবি ভাষায় গ্রন্থখানির ভাষা শ্রুত হয়েছে সবচেয়ে বেশি; প্রায় অর্ধ শতকের মতো। বাংলাভাষায় ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এর আংশিক অনুবাদ এবং ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সুখের কথা যে, একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। অবশ্য শুধু অনুবাদের সাহায্যে হিদায়ার মতো গ্রন্থ ভালভাবে বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই এর একখানা নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে, যা এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি। উর্দু ভাষায়ও 'আইনুল হিদায়া' নামে এর একখানা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ এবং 'আশরাফুল হিদায়া' নামে একখানা সবিশদ অপূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব একজন বড় ও সাহসী হৃদয়ের মানুষ। তিনি বিশাল সাহস নিয়ে হিদায়া'র একখানা পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে উর্দু ভাষ্যগ্রন্থ আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন এবং মরহুম হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশের কাজে হাত দেন। ইতোমধ্যে তার দু' খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। হিদায়া আখেরাইনের ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে আমার তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে আমি তাঁকে আখেরাইনের জন্য উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ না করে হিদায়া'র প্রধান আরবি ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর' ও 'আল-বিনায়া' সামনে রেখে প্রয়োজনবোধে উর্দু আশরাফুল হিদায়া থেকে সাহায্য নিয়ে একখানা মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করানোর পরামর্শ দেই। সে মোতাবেক তিনি আমাকে ফাতহুল কাদীর, আল-বিনায়া ও উর্দু আশরাফুল হিদায়া- এ তিনটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সরবরাহ করেন। আমি গ্রন্থখানির একটি মৌলিক ভাষ্য প্রণয়নের কিছু মূলনীতি তৈরি করি এবং এ কাজের জন্য আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ও এক সময়কার তিনজন মেধাবী ছাত্র, যারা বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক ও মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন, তাঁদেরকে মনোনীত করে তাঁদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করি। তারা হলেন, মাওলানা মুঃ অহিউর রহমান, মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়াহ মালিবাগ, ঢাকা; মাওলানা আবু বকর, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম টঙ্গী, গাজীপুর এবং মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা।

তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে উপরিউক্ত তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে রেখে হিদায়া'র একখানা সহজবোধ্য, সাবলীল ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক বাংলা ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং আমি গ্রন্থখানি আদ্যোপাত্ত দেখে পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করে দিয়েছি। সুতরাং হিদায়া আউয়ালাইনের ভাষ্যগ্রন্থ 'আশরাফুল হিদায়া বাংলা সংস্করণ' উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ হলেও আখেরাইনের ভাষ্য অংশটি উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ নয়; বরং এটি হিদায়া আখেরাইনের একখানা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ।

এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একে ‘আশরাফুল হিদায়া’ নামকরণের ব্যাপারে আমার একটুখানি কৈফিয়ত আছে। একটি স্বতন্ত্র ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে এর আশরাফুল হিদায়া নামকরণে আমার জ্ঞোর আপত্তি ছিল, কিন্তু জনাব প্রকাশক মহোদয়ের আবদার ছিল ‘আশরাফুল হিদায়া’ নামটি ধরে রাখার। কারণ, তিনি ইতিপূর্বে ‘আশরাফুল হিদায়া’ নামক ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এ নামে আউয়ালহিনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু আশরাফুল হিদায়া’র দু’ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশও করে ফেলেছেন। তাই তাঁর আবদার রক্ষার্থে ‘আশরাফুল হিদায়া’ নামকরণে সন্মত হই। অবশ্য এর পক্ষে একটি যুক্তিও পেয়ে যাই যে, কখনো দেখা যায়, দুজন পৃথক পিতার দু’ সন্তানের নাম একই হয়ে থাকে, তাই বলে দু’ সন্তান তো আর এক হয়ে যায় না। পূর্ববর্তীদের রচনাবলিতেও আমরা এরূপ দেখতে পাই যে, একই নামে পৃথক দুই বা ততোধিক লেখক পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই ‘আশরাফুল হিদায়া’ নামকরণকে অনুচিত বলা যায় না। অন্যের রাখা কোনো একটি নাম কারও পছন্দ হলে সে নামটি তো অন্য কেউ ধার করেও নিতে পারে। সমাজের অনেকে এমন তো নেয়ও। এতে তেমন অসুবিধার তো কিছু নেই।

হিদায়া গ্রন্থখানি এমনিতেই একটি সমৃদ্ধ। তার একটি মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ তৈরি করা কত বড় কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য লেখকবৃন্দ, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই অটুট ধৈর্য, নিরলস শ্রম ও পর্যাণ্ড সময় এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা’আলার তৌফিকপ্রাপ্তির বড় প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা’আলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে সব কিছু সহজ করে দিয়েছেন। এজন্য সকল প্রশংসা তাঁরই।

হে মহান করুণাময় আল্লাহ! আমাদের সবাইকে এবং সকল মানুষকে সকল নেক কাজে ইখলাস দান করুন। বিশেষ করে এ বিশাল কাজটির রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রেফ সংশোধন, প্রকাশনা ইত্যাদির সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং আছেন, তাদের সবার শ্রমটুকু কেবল দুনিয়ার জন্য না বানিয়ে আপনার প্রিয় দীনের উপকারার্থে কাজে লাগিয়ে সকলের পরকালের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন এবং আমাদের সবাইকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন। হে আল্লাহ! পরকালের পুরস্কারপ্রাপ্তিই বড় প্রাপ্তি। আমাদের শ্রম-সুনায সবটুকু আপনার জন্য কবুল করে নিন। আপনি আমাদের কাউকে পরকালের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমরা সবাই আপনার অনুগ্রহের ভিখারি। আপনি একমাত্র দয়ালু দাতা।

আরজুওজার

*amr*

[ মাওলানা আহমদ মায়মুন ]

মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

# সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
كتاب البيوع অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়	৭
باب خيار الشرط পরিচ্ছেদ : শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার	৬৯
باب خيار الرؤية পরিচ্ছেদ : দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার	১১৩
باب خيار العيب পরিচ্ছেদ : দোষজনিত এখতিয়ার	১৩৯
باب البيع الفاسد পরিচ্ছেদ : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়	১৯৩
فصل فى احكامه অনুচ্ছেদ : ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম	২৭৯
فصل فيما يكره অনুচ্ছেদ : মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয়	৩০৩
باب الاقاله পরিচ্ছেদ : ইকালাহ	৩১৮
باب المراجعة والتولية পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিক্রয়	৩৩৩
باب الرىوا পরিচ্ছেদ : 'রিবা' বা সুদ	৩৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
باب الحقوق	
পরিচ্ছেদ : অধিকার	৪৪৯
باب الاستحقاق	
পরিচ্ছেদ : অধিকার দাবি করা	৪৫৫
فصل : فى بيع الفضولى	
অনুচ্ছেদ : নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়	৪৬৮
باب السلم	
পরিচ্ছেদ : বায় সলম	৪৮৯
مسائل منشورة	
বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা	৫৭১
كتاب الصرف	
অধ্যায় : 'বায় সরফ' বা মুদা বিনিময়	৫৯৫

## كِتَابُ الْبَيْعِ

### অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

প্রকাশ থাকে যে, শরিয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবিধান বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। কিছু বিধান খালেস ইবাদত। যেমন- নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ। কিছু বিধান নিরেট লেনদেন সংক্রান্ত, যা সর্বাংশে বান্দার সাথে জড়িত। আর কিছু বিধান ইবাদতও, আবার লেনদেনও। যেমন- বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আলফারগানী (র.) [মৃ. ৫৯৩ হি.] সর্বপ্রথম [হিদায়ার ১ম খণ্ডে] খালেস ইবাদতের বর্ণনা দেন। এরপর [২য় খণ্ডে] এমন বিষয়াদির বর্ণনা দেন যেগুলো ইবাদতও এবং লেনদেনও। এখানে অর্থাৎ ৩য় খণ্ডে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় থেকে তিনি নিরেট লেনদেন-বিষয়ক বিধানসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন।

গ্রন্থকার (র.) ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়কে ওয়াকফ অধ্যায়ের পরে স্থান দিয়েছেন। এ দু অধ্যায়ের মাঝে যোগসূত্র হলো, ক্রয়-বিক্রয় এবং ওয়াকফ দুটোই যদি শুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ও বিক্রীত পণ্য মালিকের মালিকানা থেকে খারিজ হয়ে যায়। তবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির নতুন করে কেউ মালিক হয় না। কিন্তু ক্রোতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হয়। সুতরাং মালিকানা খারিজ হওয়ার বিচারে উভয়টা এক, কিন্তু ওয়াকফকৃত সম্পত্তির নতুন করে যেহেতু কেউ মালিক হয় না তাই তা একক (مَسْبُوطٌ) -এর পর্যায়ে, আর ক্রয়-বিক্রয় যৌগিক (مُرَكَّبٌ) -এর পর্যায়ে। আর বাস্তবে এককের স্থান আগে বিধায় গ্রন্থকার প্রথমে ওয়াকফের এরপর ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

بيع শব্দটি بَيْع -এর বহুবচন। مَصْدَر শব্দটি ক্রিয়ামূল (مَصْدَر)। এর দ্বিচন বা বহুবচন হয় না। এতদসত্ত্বেও গ্রন্থকার এ শব্দটিকে বহুবচন রূপে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বিটি উত্তর হতে পারে।

এক. بيع শব্দটি ইসমে মাফউল তথা مَبِيع [বিক্রীত বা বিক্রয়যোগ্য পণ্য] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিক্রীত বা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের শ্রেণী ও প্রকার অনেক। তাই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. بيع শব্দটি অবশ্যই ক্রিয়ামূল। কিন্তু بَيْع [ক্রয়-বিক্রয়] এর প্রকার বিবিধ হওয়ার কারণে শব্দটিকে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

بيع শব্দটি দুই বিপরীতমুখী অর্থ প্রদান করে অর্থাৎ অভিধানে بَيْع শব্দটি إِخْرَاجُ الشَّيْءِ عَنِ الْمِلْكِ بِسَالٍ এবং إِدْخَالُ الشَّيْءِ إِلَى الْمِلْكِ بِسَالٍ তথা মালের বিনিময়ে কোনো জিনিসকে মালিকানা থেকে বের করা এবং মালের বিনিময়ে কোনো জিনিসকে 'মালিকানা আনয়ন করা' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এক কথায় শব্দটি বিক্রয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়, ক্রয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। - لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوْ بَيْعِ بَيْعٍ - إِذَا اخْتَلَفَ التَّوَعَّانِ فَيَبِيعُوا كَيْفَ وَنَتْنَمُ - এ হাদীসে শব্দটি বিক্রয় অর্থে এবং بَيْعُ بَيْعٍ [পণ্য ও বিনিময়] যদি ভিন্ন শ্রেণীর হয় তাহলে যেভাবেই ইচ্ছা [কমবেশি] করে তোমরা বিক্রয় কর। দ্বিতীয় হাদীসের অর্থ : তোমাদের কেউ যেন তার অপর ভাইয়ের ক্রয়-আলোচনার মুহূর্তে ক্রয়ের প্রস্তাব না করে।

শরিয়তের পরিভাষায় **الْمُبَادَلَةُ بِالتَّارِاضِ بِطَرِيقِ الْجَارَةِ** - পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায়িক উপায়ে মালের দ্বারা মালের বিনিময় করা কে **بَيْع** বলে। মালের দ্বারা মালের বিনিময় করা মানে ক্রেতাকে পণ্যের এবং বিক্রেতাকে পণ্যমূল্যের মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং ইজারা ও বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের (**بَيْع**) অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ ইজারা হলো **مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَنْفَعِ** আর বিবাহ হলো **مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالضَّعِ** ক্রয়-বিক্রয়ে পারস্পরিক সম্মতি জরুরি বিধায় জবরদস্তিমূলক বেচাকেনা ও ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞায় পড়ে না। বিনিময় প্রদানের শর্তে যে সব উপহার ও উপটৌকন প্রদান করা হয় তাও ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে বারোজ হয়ে যায়। কারণ তাতে **الْمَالِ بِالْمَالِ** পাওয়া গেলেও ব্যবসায়িক উপায় অনুপস্থিত। ইসলামি শরিয়তে ক্রয়-বিক্রয় লেনদেনের একটি বৈধ পদ্ধতি। এর বৈধতা শরিয়তের দলিল তথা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

“হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না ; তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ ” [সূরা নিসা : ২৯] এ আয়াত থেকে বুঝা যায় পারস্পরিক সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ্ ।

(۲) أَحَدَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“আল্লাহ তা’আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”- [সূরা বাকারা : ২৭৫] এ আয়াত থেকেও ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

হাদীসে বলা হয়েছে,

(۱) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَزَزَةَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُسَمِّي السَّيَّسَةَ فَمَرَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّائًا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَعْضُرُهُ الْغُفْرُ وَالْحَلْفُ فُشُورُهُ بِالْصَّدَقِ -

হযরত কায়স ইবনে আবী গযরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমাদের ব্যবসায়ী দলকে সামাসিরাহ বলা হতো। একদা রাসূল ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তদপেক্ষা সুন্দর একটি নামে আমাদেরকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, হে ব্যবসায়ীগণ! ক্রয়-বিক্রয়ে কসম ও অর্থহীন কথাবার্তা হয়ে থাকে, তাই তোমরা নিজেদের ক্রয়-বিক্রমকে সদকার সাথে মিলিয়ে নাও। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়কালে যে সব অপ্রয়োজনীয় কসম ও অর্থহীন কথা বা কাজ হয়ে যায় তার কাফফারা স্বরূপ তোমরা কিছু সদকা কর।—[আবু দাউদ, ১খও, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়] অন্য রিওয়াযাতে আছে—  
**بَا مَعْتَرِ التَّجَارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَمَنْ بَاعَ بِعَمَلٍ بِالصَّدَقَةِ**  
হে ব্যবসায়ীগণ! ক্রয়-বিক্রমকালে শয়তানের আগমন ঘটে এবং বিভিন্ন গুনাহ হয়ে যায়, তাই তোমরা তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সদকাকে মিলিয়ে নাও।—[তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২২৯]

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِ وَالشَّهِيدِ.

হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (-র হাশরা) নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে হবে। -[তিরমিযী, খ. ১. পৃ. ২২৯]

(৩) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُحَصِّلِيِّ فَرَأَى النَّاسَ يَنْتَابِعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النَّجَارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ النَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ -

হযরত রিফাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা হজুর ﷺ -এর সঙ্গে ঈদগাহে গমন করেন। হজুর ﷺ দেখলেন, লোকেরা বেচাকেনা করছে। তখন তিনি তাদের ডাকলেন- হে ব্যবসায়ীগণ! তাঁরা সকলে তাঁর ডাকে সাড়া দিল এবং তাঁদের ঘাড় উচিয়ে ও চোখ তুলে তার প্রতি তাকাল। তখন তিনি বললেন, ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন অপরাধী অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। অবশ্য তারা ব্যতিক্রম যারা আল্লাহকে ভয় করে, নেক কাজ করে এবং সত্য কথা বলে।

—[তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২৩০]

প্রথমোক্ত হাদীসে ব্যবসায়ীদেরকে সদকা করার উপদেশ দান করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসে সং ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনটি হাদীসই ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণ করে।

**ইজমা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন। প্রায় সকল সীরাতে লেখক লিখেছেন যে, নবুয়ত লাভের পনের বছর পূর্বে স্বয়ং নবী করীম ﷺ ব্যবসা করেছেন। বহু প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আব্বাস (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.) প্রমুখ সাহাবী ব্যবসা করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন শস্য ব্যবসায়ী। হযরত উসমান (রা.) কাপড় ও খেজুরের ব্যবসা করতেন। হযরত আব্বাস (রা.) আতর এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ঘি ও পনিরের ব্যবসা করতেন। মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, হানাফী উলামায়ে কেরামের মতে জিহাদের [গনিমতে মালের] পর সর্বোত্তম উপার্জন হলো ব্যবসা। এরপর কৃষি, এরপর শিল্প ও কারিগরী। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, আমার মতে সর্বোত্তম পেশা হলো কেতাবাত [হস্তলিপির কাজ]—[শরহে নুকায়া]

**ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার কারণ :** تَعَلَّقُ الْبَقَاءُ الْمَعْلُومُ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ جَبِيلٍ

অর্থাৎ সুন্দর উপায়ে মানুষের জীবন-যাপনের প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়কে শরিয়ত বৈধ করেছে। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন তা সব এক ব্যক্তির পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয় না। কেউ এক জিনিস তৈরি করে, কেউ অন্য জিনিস তৈরি করে। একজন কৃষক ধান উৎপাদন করে, অপরজন গম উৎপাদন করে। জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষী থাকে। তাই নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসটি আরেকজন থেকে বৈধ উপায়ে গ্রহণের উদ্দেশ্যে শরিয়ত আদান-প্রদান তথা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছে।

**ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম :** ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে আর বিক্রেতা বিনিময়ের মালিক হবে।

**ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত :**

১. ক্রেতা ও বিক্রেতা বোধ-বুদ্ধির অধিকারী (الْعَاقِلُ الْمُبِينُ) হওয়া।
২. পণ্য মূল্যমানসম্পন্ন (الْمَالُ الْمَقْرُومُ) হওয়া।
৩. পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতাকে সোপর্দ করা যায় (مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ) এরূপ হওয়া।
৪. ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ (الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ) অতীতকালীন (مَاضِي) শব্দযোগে হওয়া।
৫. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি (التَّرَاضِي) থাকা।

ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন : ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন ছয়টি।

১. ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব (الْإِجَابُ):

২. প্রস্তাব গ্রহণ (الْقَبُولُ):

৩. পণ্য (التَمَيُّعُ):

৪. বিনিময় (الْمَنْسَرُ):

৫. ক্রেতা (الْمُنْتَرِي):

৬. বিক্রেতা (الْبَائِعُ)।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকার : ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া ও না হওয়ার হিসেবে তা দু'প্রকার-

১. مُتَعَيِّن : যে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়।

২. غَيْرُ مُتَعَيِّن : যে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না। এ প্রকারের অপর নাম (الْبَيْعُ الْبَاطِلُ)

প্রথমে ক্রয়-বিক্রয়ের চার প্রকার- ১. সহীহ ২. ফাসেদ ৩. মাকরুহ ৪. মওকুফ।

সহীহ (الصَّحِيحُ) : (الْبَيْعُ الَّذِي يَصَحُّ أَصْلًا وَصَفًا) যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় বিচারে শুদ্ধ। মৌলিক বলতে বুঝায় ক্রয়-বিক্রয়ের উপরোক্ত রুকন সমূহের বিদ্যমানতা। আর আনুষঙ্গিক বলতে বুঝায় রোকনের পরিপূরক বিষয়সমূহ, যেমন ইজাব কবুলের সময় দ্রব্য বা বিনিময়ের পরিমাণ উহ্য না রাখা, বিনিময় পরিশোধের অনির্দিষ্ট মেয়াদ ধার্য না করা, পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতাকে সোপর্দ করা যায় এরূপ হওয়া, বিনিময়-চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীত কোনো শর্ত আরোপ না করা ইত্যাদি। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ইজাব কবুল হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতা পণ্যের, আর বিক্রেতা বিনিময়ের মালিক হয়ে যাবে।

ফাসেদ (الْفَاسِدُ) : (الْبَيْعُ الَّذِي يَصَحُّ أَصْلًا لَا وَصَفًا) - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিকত্বের বিচারে শুদ্ধ, কিন্তু আনুষঙ্গিক বিচারে অশুদ্ধ। যেমন, বিক্রীত পণ্য কিছুদিনের জন্য বিক্রেতার ভোগ-ব্যবহারে থাকবে, ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীত এ ধরনের কোনো শর্ত আরোপ করা, যেদিন তুফান আসবে সেদিন মূল্য পরিশোধ করবে, এরূপ অনির্দিষ্ট মেয়াদ বিনিময় পরিশোধের জন্য ধার্য করা ইত্যাদি। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ইজাব কবুলের পর ক্রেতা পণ্যদ্রব্য করায়ত্ত করে নিলে সে তার মালিক হবে। তবে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে ফেলাই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কর্তব্য। নতুবা তা সুদী কারবার বলে গণ্য হবে। -[ইমদাদুল ফাতওয়া]

মাকরুহ (الْمَكْرُوهُ) : (الْبَيْعُ الَّذِي يَصَحُّ أَصْلًا وَوَصَفًا وَقَدْ جَاوَرَهُ نَهْيٌ عَنْهُ) - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় বিচারে শুদ্ধ কিন্তু এ সম্পর্কে হাদীসে কোনো নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন, জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে, তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে গুনাহগার হবে।

বাতিল (الْبَاطِلُ) : (الْبَيْعُ الَّذِي لَا يَصَحُّ أَصْلًا وَلَا وَصَفًا) - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক বিবেচনাতেই অশুদ্ধ। যেমন, মাল নয় এমন জিনিস উদাহরণত: লাশ, স্বাধীন মানুষ ইত্যাদি বিক্রয় করা।

কার্যকর হওয়া না হওয়ার বিচারে আবার ক্রয়-বিক্রয় দু'প্রকার। ১. النَّافِذ [কার্যকরী] ২. غَيْرُ النَّافِذ [অকার্যকরী]।

এ প্রকার হলো (الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ) [মওকুফ ক্রয়-বিক্রয়]। প্রথমে ক্রয়-বিক্রয় আবার দু'প্রকার-

১. لَازِم [লাযেম]; ২. غَيْرُ لَازِم [গায়রে লাযেম]।

মওকুফ (الْمَوْقُوفُ) : (الْبَيْعُ الَّذِي يَصَحُّ أَصْلًا وَوَصَفًا وَيُعَيِّدُ الْبَيْعَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ) - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় বিচারে শুদ্ধ, কিন্তু পণ্যদ্রব্য অন্যের মালিকানাধীন। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, মালিক সম্মত হলে তা কার্যকর হবে। নচেৎ বাতিল হয়ে যাবে।



লাযেম (الْأَيْم) : هُوَ الْبَيْعُ التَّائِيْدُ الْعَارَى مِنَ الْخِيَارَاتِ : - যে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা কারো জন্যই ইজাব কবুলের পর অপরজনের সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার কোনোরূপ এখতিয়ার নেই।

পায়েরে লাযেম (عَبْرَ لَاَيْم) : هُوَ الْبَيْعُ التَّائِيْدُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارَاتُ : - যে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতা কিংবা উভয়ের জন্যই ইজাব কবুলের পর অপরজনের সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকে। আর এ ধরনের এখতিয়ার চার প্রকার- ১. خِيَارُ الشَّرْطِ ২. خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ৩. خِيَارُ الْعَيْبِ ৪. خِيَارُ لِسَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ - প্রতিটির সংজ্ঞা সামনে আসবে।

নিহায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, ক্রয়-বিক্রয় আট প্রকার। পণ্যদ্রব্যের বিচারে চার প্রকার। বিনিময় দ্রব্যের বিচারে চার প্রকার। পণ্যদ্রব্যের বিচারে চার প্রকার হলো-১. মুকায়াদাহ (الْمُقَايَاةُ) ২. সরফ (الصَّرْفُ) ৩. মুতলাক (الْمُتْلَقُ) (৪) সলম (السَّلَمُ) মুকায়াদাহ (الْمُقَايَاةُ) : بَيْعُ دَرَبٍ بِنِمْيَمٍ بِالْعَيْنِ : দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন, খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে কাপড় বিক্রি করা।

সরফ (الصَّرْفُ) : بَيْعُ الثَّمَنِ الْمَطْلُوقِ بِالْثَمَنِ الْمَطْلُوقِ : - মুদার বিনিময়ে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন, স্বর্ণমুদার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা। [বর্তমান যুগে যেমন- টাকার বিনিময়ে রিয়াল ক্রয়-বিক্রয় করা।]

মুতলাক (الْمُتْلَقُ) : بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْأَثْمَانِ الْمَطْلُوقَةِ : - নগদ হোক কিংবা বাকি হোক মুদার বিনিময়ে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় করা। যেমন, টাকার বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা।

সলম (السَّلَمُ) : بَيْعُ الذِّينِ بِالْعَيْنِ : - দ্রব্য বাকি রেখে মূল্য অগ্রিম প্রদান করা। যেমন, উৎপাদনের পর উৎপাদনকারী ক্রেতাকে এক মণ ধান প্রদান করবে, সে বাবদ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা।

বিনিময় দ্রব্যের বিচারে চার প্রকার হলো- ১. মুসাওয়ামা ২. মুরাবাহা ৩. তাওলিয়া ৪. ওয়াযীআ।

মুসাওয়ামা (الْمُسَاوَمَةُ) : الْبَيْعُ الَّذِي لَا تَنْسَبُ إِلَى الثَّمَنِ السَّابِقِ : - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে ক্রয়-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। বরং দর কষাকষির পর ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে যে মূল্য ধার্য হয় তাই বিনিময়মূল্য হয়ে থাকে।

মুরাবাহা (الْمُرَابَاةُ) : الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الْإِدْوَلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ : - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে পূর্বের ক্রয় মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং ক্রয়-মূল্যের চেয়ে কিছুটা লাভে বিক্রি করা হয়। যেমন, দশ টাকায় কোনো দ্রব্য ক্রয় করে বার টাকায় বিক্রি করা।

তাওলিয়া (التَّوَلِيَّةُ) : الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الْإِدْوَلِ : - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে পূর্বে ক্রয়-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং পূর্বের ক্রয়-মূল্যেই পণ্য বিক্রয় করা হয়। যেমন, দশ টাকায় কোনো দ্রব্য ক্রয় করে দশ টাকায় বিক্রি করা।

ওয়াযীআ (الْوَضِيعَةُ) : وَهُوَ بَيْعُ الْفَقْصَانِ عَنِ الثَّمَنِ الْإِدْوَلِ : - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে পূর্বের ক্রয়-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং পূর্বের ক্রয়-মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রি করা হয়। যেমন, দশ টাকায় কোনো দ্রব্য ক্রয় করে আট টাকায় বিক্রয় করা।

قَالَ : أَلْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ إِذَا كَانَا بِلَفْظِي الْمَاضِي مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا بَعْتُ وَالْآخَرُ اشْتَرَيْتُ لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنشَاءٌ تَصَرُّفٌ وَالْإِنشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَالْمَوْضُوعِ لِلْإِخْبَارِ قَدْ اسْتَعْمِلَ فِيهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ التَّكَاثُفِ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ وَقَوْلُهُ رَضِيتُ بِكَذَا أَوْ اعْطَيْتُكَ بِكَذَا أَوْ خَذَهُ بِكَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْتُ وَاشْتَرَيْتُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ وَالْمَعْنَى هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي فِي التَّوْفِيسِ وَالْخُسْنِيسِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَحَقُّقِ الْمَرَاضَاةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী বলেন, ক্রয়-বিক্রয় [চুক্তি] ইজাব ও কবুল [প্রস্তাবকরণ ও প্রস্তাব গ্রহণ] দ্বারা সম্পাদিত হয়, যখন উভয়টি অতীতকাল বাচক (مَاضِي) শব্দযোগে হয়। যেমন, ক্রেতা-বিক্রেতার একজন বলল, আমি বিক্রি করলাম, অপরজন বলল, আমি ক্রয় করলাম। কারণ ক্রয়-বিক্রয় হলো একটি নতুন লেনদেনের সৃষ্টি (إِنشَاءٌ تَصَرُّفٌ)। আর নতুন [লেনদেন] সৃষ্টি [র বিধান] শরিয়ত দ্বারা জানা যায়। খবর প্রদানের জন্য গঠিত ক্রিয়ারূপ কখনো কখনো [শরিয়ত কর্তৃক] নতুন [লেনদেন] সৃষ্টির জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং [অতীতকাল বাচক শব্দ যদিও খবর প্রদানের জন্য, কিন্তু] তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ক্রয়-বিক্রয় [চুক্তি] এমন দু’শব্দ দ্বারা সম্পাদিত হয় না, যার একটি ভবিষ্যৎকাল বাচক শব্দ। অবশ্য বিবাহের ব্যাপারটি ভিন্ন। এ দু’টোর পার্থক্যের বর্ণনা পিছনে গেছে। “আমি এত টাকায় সন্তুষ্ট” বা “আমি এত টাকার বিনিময়ে তোমাকে প্রদান করলাম” বা “তুমি এত টাকার বিনিময়ে এটা গ্রহণ কর” ক্রেতা-বিক্রেতার এ সব উক্তি- আমি বিক্রি করলাম এবং আমি ক্রয় করলাম উক্তির অর্থেই গণ্য হবে। কারণ, উক্ত উক্তিগুলো এ অর্থই ব্যক্ত করে। আর এ ধরনের চুক্তিতে মর্মার্থই ধর্তব্য। তাইতো বিতৃপ্ত মতানুযায়ী কম দামী ও বেশি দামী সব জিনিসই মৌখিক ইজাব ও কবুল ছাড়া পণ্য ও বিনিময় আদান-প্রদানেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। কারণ পারস্পরিক সম্মতি পাওয়া গেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِعْنَادٌ হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার একজনের কথা আরেকজনের কথার সাথে শরিয়ত নির্দেশিত উপায়ে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা, যাতে মহল তথা পণ্যের উপর তার ক্রিয়া প্রকাশ পায় অর্থাৎ পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে খারিজ হয়ে ক্রেতার মালিকানায় চলে আসে। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যিনি প্রথমে ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন তাকে مُرْجِب [প্রস্তাবক] আর তার প্রস্তাবকে إِيْجَاب বলে। প্রস্তাব গ্রহণ করাকে কবুল (قَبُولٌ) বলে।

ক্রয়-বিক্রয় ইজাব ও কবুল দ্বারা সম্পাদিত হয়। তবে শর্ত হলো ইজাব ও কবুল অতীতকাল বাচক (مَاضِي) শব্দযোগে হতে হবে। শব্দ গঠনকারীগণ অতীতকাল বাচক শব্দকে কোনো সংঘটিত বিষয় বা ঘটনার সংবাদ প্রদানের (إِخْبَارٌ) জন্য গঠন করেছে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি إِخْبَار-এর প্রকারভুক্ত নয়। বরং তা এক প্রকার ইনশা। ইনশা হলো إِنْبَاءٌ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ

سَمَّاءُ সম্পাদিত নয় এমন কোনো বিষয় সম্পাদন করা। আর ইজাব কবুলের মাধ্যমে নতুন করে একটি বিষয় সম্পাদিত হয় অর্থাৎ ক্রেতা পণের, আর বিক্রোতা বিনিময় দ্রব্য বা অর্থের মালিক হয়। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি: إِنشَاءً-এর প্রকারভুক্ত। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য إِبْخَار-এর শব্দ কেন ব্যবহার করা হবে? হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটাই যুক্তিযুক্ত ছিল যে, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি: إِنشَاءً-এর জন্য গঠন করা শব্দযোগে হবে। কিন্তু শব্দ গঠনকারীরা إِنشَاءً-এর জন্য কোনো শব্দ গঠন করেননি। আর শরিয়ত আভিধানিকভাবে إِبْخَار-এর জন্য গঠিত শব্দকে কখনো কখনো إِنشَاءً-এর জন্য ব্যবহার করেছে। তাই اَشْتَرَيْتُ وَعَبَيْتُ শব্দদ্বয় إِبْخَار-এর জন্য হলেও তা দ্বারা إِنشَاءً তথা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। কারণ: إِنشَاءً তথা নতুন লেনদেন চুক্তির বিধান শরিয়ত দ্বারা ইজাযা যায়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এমন দু'শব্দযোগে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না, যার একটি ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ (مُسْتَفِيلٌ) আর অপরটি অতীতকাল বাচক শব্দ। ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন, ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ মানে نَعْلَ مَضَارِعٍ যেমন, বিক্রোতা বলল, اَبَيْعُ আর ক্রেতা বলল اِشْتَرَيْتُ। হজুর ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অতীতকাল বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাই ক্রয়-বিক্রয় অতীতকালীন শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ হলে। দ্বিতীয় কারণ হলো, যদি ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ বিক্রোতার পক্ষ থেকে হয়, উদাহরণত: সে বলল, اَبَيْعُ [আমি বিক্রি করব] আর ক্রেতা বলল اِشْتَرَيْتُ তাহলে এটা বিক্রোতার পক্ষ থেকে বিক্রয়ের ওয়াদা হলো। বিক্রয়ের প্রস্তাব হয়নি। আর ওয়াদা দ্বারা বিক্রি সংঘটিত হয় না। আর যদি ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ ক্রেতার পক্ষ থেকে হয়, উদাহরণত বিক্রোতা বলল, আমি বিক্রি করলাম, আর ক্রেতা বলল, আমি ক্রয় করব, তাহলে এটা দরদাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হলো। বিক্রোতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

তবে مُسْتَفِيلٌ শব্দের উপরোক্ত উদ্দেশ্য গ্রহণ করলে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। مَضَارِعٍ যেমন ভবিষ্যত কালের অর্থ দেয় তেমনি বর্তমান কালেরও অর্থ দেয়। বরং বর্তমান কালই আসল। তাই তো ক্রেতা-বিক্রোতার কোনো একজন مَضَارِعٍ শব্দ ব্যবহার করলে এবং তা দ্বারা বর্তমান কাল উদ্দেশ্য নিলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। ইমাম তহাবী ও আল্লামা সায়ারাফী (র.) এ কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তখন ওয়াদাও হয় না, দরদামের ইচ্ছাও ব্যক্ত করা হয় না। তাই مُسْتَفِيلٌ শব্দ দ্বারা مَضَارِعٍ উদ্দেশ্য নেওয়া ঠিক নয়।

এ আপত্তির জবাবে ব্যাখ্যাকারদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, مَضَارِعٍ-এর ভুক্তিতে যদি سَوْفَ থাকে তাহলে তা ভবিষ্যত কালের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে مُسْتَفِيلٌ শব্দ দ্বারা এরূপ مَضَارِعٍ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রোতার কোনো একজন যদি سَوْفَ যুক্ত مَضَارِعٍ ব্যবহার করে তাহলে এরূপ ইজাব কবুল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না। কিন্তু سَوْفَ বা ব্যতিরেকে যদি مَضَارِعٍ ব্যবহার করে আর তা দ্বারা বর্তমান কাল উদ্দেশ্য করে তাহলে এরূপ ইজাব বা কবুল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, হিদায়ার ইবারতের مُسْتَفِيلٌ দ্বারা اَمْرٌ-এর ক্রিয়ারূপ উদ্দেশ্য। يَخْلُوكَ الْيَتَامَا-এর কথটি সেদিকেই ইঙ্গিত করে। কারণ [দ্বিতীয় খণ্ডে] বিবাহ অধ্যায়ের শুরুতে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, اَمْرٌ ক্রিয়ারূপ দ্বারা وَتَنْعِيْدٌ يَنْظُرِيْنَ يَغْبِرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاْنِيْ وَيَاْخِرُ عَنِ الْمُسْتَفِيْلِ-এর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-اَمْرٌ ক্রিয়ারূপই উদ্দেশ্য। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রোতার কোনো একজন যদি অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার করে আর অপরজন اَمْرٌ-এর সীগাহ ব্যবহার করে, যেমন একজন বলল, يَغْنِيْ هَذَا يَغْنِيْ تَاكِي-এ কাপড়টি একশ টাকার বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি কর। অপরজন বলল يَغْنِيْ আমি বিক্রি করলাম। এতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কোনো কোনো পুরুষকে বলে رُوْحَتِيْ তুমি আমাকে বিবাহ কর। আর পুরুষ বলে رُوْحَتِكَ আমি তোমাকে বিবাহ করলাম, তাহলে বিবাহ হয়ে যাবে। এ দু'টোর মাঝে পার্থক্যের কারণ

হলো, رَوَيْتُ [আমাকে বিবাহ কর] শব্দ বলে বিবাহের উকিল বানানো হয়। আর بِعْنِي [আমার কাছে বিক্রয় কর] বলে বিক্রয়ের উকিল বানানো হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে উকিল একাই ইজাব ও কবুল উভয়টা করতে পারে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ে তা পারে না। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে অধিকার বা লেনদেনের সম্পর্ক হয় তা উকিলের সাথে হয়। ক্রেতা উকিল থেকে তার পণ্য উদ্ভুল করে এবং মূল্য উকিলকেই পরিশোধ করে। কিন্তু বিবাহে এ সম্পর্ক হয় মুআত্তেলের (مُؤْتَلٍ) সাথে। স্বামী স্ত্রী থেকে তার অধিকার দাবি করে এবং মহরানা তাকেই পরিশোধ করে, উকিলকে নয়। সুতরাং বিবাহের উকিল যদি নিজেই ইজাব কবুল উভয়টা করে এতে জটিলতা সৃষ্টি হয় না। কারণ সে ক্ষেত্রে উকিল হবেন (مُطَابٍ) অধিকারের দাবিদার, আর অধিকার দাবি করবেন মুআত্তেলের কাছে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল যদি নিজেই ইজাব কবুল উভয়টা করেন তাহলে তিনি নিজেই ক্রেতা হলেন আবার নিজেই বিক্রেতা হলেন, তিনিই (مُطَابٍ) অধিকারের দাবিদার হচ্ছেন এবং তার কাছেই অধিকার দাবি করা হচ্ছে। তিনিই মালিক (مُتَمَلِّكٌ) হচ্ছেন এবং তিনিই মালিক বানিয়ে (مُكَلِّفٌ) দিচ্ছেন। আর এক ব্যক্তি উভয়টা হতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই ক্রয়-বিক্রয়ে একব্যক্তি ইজাব ও কবুল উভয়টা করতে পারে না। অতএব বিবাহের ইজাব কবুলের কোনো একটি যদি ভবিষ্যতকালীন তথা أَمْرٌ -এর শব্দ হয় তাহলে তা দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ইজাব কবুলের কোনো একটি শব্দ ভবিষ্যতকালীন তথা أَمْرٌ -এর শব্দ হলে তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে না।

بِعْتِ يَنْكَ هَذَا بِكَذَا وَاشْتَرَيْتَ শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অর্থ ও ভাব ব্যক্ত করে এমন যে কোনো শব্দ দ্বারাই তা সম্পাদিত হতে পারে। সুতরাং কেউ বলল بِعْتِ يَنْكَ هَذَا بِكَذَا وَاشْتَرَيْتَ আমি তোমার কাছে এ দ্রব্যটি এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম আর অপরজন বলল رَضِيتُ আমি সম্মত আছি। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে। এরূপভাবে কেউ বলল بِعْتِ يَنْكَ هَذَا بِكَذَا وَاعْطَيْتَكَ هَذَا بِكَذَا আমি তোমাকে এ দ্রব্যটি এত টাকার বিনিময়ে দিলাম, আর ক্রেতা বলল وَاشْتَرَيْتَ আমি ক্রয় করলাম বা قَبِلْتُ আমি গ্রহণ করলাম। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে। কেউ বলল بِعْتِ يَنْكَ هَذَا بِكَذَا وَاشْتَرَيْتَ আমি এত টাকার বিনিময়ে এ দ্রব্যটি ক্রয় করলাম আর বিক্রেতা বলল خُذْ ঠিক আছে, নাও। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে। মোটকথা, بِعْتِ وَاشْتَرَيْتَ -এর ভাব ব্যক্ত করে, ইজাব কবুল এমন যে কোনো শব্দ হলেই হবে। কারণ শরিয়ত অনুমোদিত এ সব চুক্তিতে অর্থ ও ভাবই আসল। আর এ জন্যই بِالْعَطَايِ জায়েজ। بِعْ بِالْعَطَايِ হলো, ক্রেতা দোকানে যেয়ে নির্দিষ্ট পণ্যটি তুলে নিল বা দোকানদারকে দিতে বলল। তার দাম জানা আছে, সে টাকা দিল, দোকানদার টাকা নিল। মৌখিকভাবে দু'জনের মাঝে কোনো কথাই হলো না। কার্যত আদান-প্রদান হলো। এ ক্রয়-বিক্রয় দামী, কমদামী সব পণ্যেই জায়েজ। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কারণ এখানে পারস্পরিক সম্মতি পাওয়া গেছে। অবশ্য ইমাম কারখী (রা.) কমদামী জিনিসে এ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলেন। কিন্তু বেশি দামী জিনিসে বৈধ বলেন না।

أَلْتَبِيسُ হলো দামী ও মূল্যবান দ্রব্য। আর أَلْخَبِيسُ হলো কম দামী ও তুচ্ছ পণ্য। কেউ কেউ বলেন, যে দ্রব্য চোর চুরি করলে শাস্তি স্বরূপ তার হাত কাটা যায় এ পরিমাণ মূল্যের হয় তা হলো أَلْخَبِيسُ ধরা হবে। আর এ পরিমাণের চেয়ে কম মূল্যের হলে তা أَلْخَبِيسُ বলে গণ্য হবে।

قَالَ : وَإِذَا أُوجِبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدِينَ الْبَيْعَ فَلَاخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قِيلَ فِي الْمَجْلِسِ  
وَإِنْ شَاءَ رَدُّهُ وَهَذَا خِيَارُ الْقَبُولِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْعَقْدِ مِنْ  
غَيْرِ رِضَاهُ وَإِذَا لَمْ يَفِدِ الْحُكْمَ بِذَوْنِ قَبُولِ الْآخِرِ فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ لِيُخْلِيَهُ عَنْ  
إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ  
فَاعْتَبِرَتْ سَاعَاتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً دَقْعًا لِلْعُسْرِ وَتَحْقِيقًا لِلْيُسْرِ وَالْكِتَابُ  
كَالْخِطَابِ وَكَذَا الْإِرْسَالُ حَتَّى أُعْتَبِرَ مَجْلِسٌ بُلُوغُ الْكِتَابِ وَأَدَاءُ الرِّسَالَةِ وَلَيْسَ لَهُ  
أَنْ يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَيْبَعِ وَلَا أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرَى بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِعَدَمِ رِضَاءِ الْآخِرِ  
يَتَفَرَّقُ الصَّفَقَةُ إِلَّا إِذَا بَيَّنَّ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ صَفَقَاتٌ مَعْنَى .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, “যখন চুক্তির দুই পক্ষের একজন [ক্রয় বা বিক্রয়ের] প্রস্তাব করে তখন  
অপরজনের জন্য মজলিসে থাকা পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে; সে ইচ্ছা করলে কবুল করতে পারে, ইচ্ছা করলে প্রস্তাব  
প্রত্যাখান করতে পারে।” আর এটাকেই খিয়ারে কবুল বলে। কারণ [প্রস্তাবের পর] যদি তার জন্য [প্রস্তাব  
প্রত্যাখানের] এখতিয়ার না থাকে তাহলে তার সম্মতি ব্যতিরেকে তার উপর ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান আরোপিত হবে।  
যখন অপরজনের কবুল ব্যতীত প্রস্তাব হুকুমের [মালিকানার] ফায়দা দিল না তখন প্রস্তাবকারীর জন্যও তার প্রস্তাব  
ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ প্রস্তাব ফেরত নেওয়াটা অপরজনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা থেকে মুক্ত। আর  
খেয়ারে কবুল মজলিসের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। কারণ মজলিস বিবিধ বিষয়কে একত্র করে। সুতরাং কঠোরতা দূর  
করা এবং সহজতা খুঁজে বের করার জন্য মজলিসের মুহূর্তগুলোকে একটি মুহূর্ত গণ্য করা হয়েছে। চিঠিপত্র বা  
দূতের মাধ্যমে পেশকৃত ইজাবের ব্যাপারটিও এরূপ। অতএব, পত্র পৌছার এবং দূতের সংবাদ ব্যক্ত করার মজলিস  
ধর্তব্য হবে। কবুলকারীর জন্য প্রস্তাবিত পণ্যের কিয়দাংশে প্রস্তাব কবুল করা বৈধ নয় এবং প্রস্তাবিত মূল্যের কিছু  
অংশের বিনিময়ে বিক্রয় পণ্য কবুল করা বৈধ নয়। কারণ, [পণ্যের কিয়দাংশ বিক্রিতে] চুক্তি বিভাগ হয়ে যায়, আর  
এতে অপরজনের [বিক্রেতার] সম্মতি নেই। অবশ্য [পণ্য আলাদা আলাদা হলে] প্রতিটির পৃথক পৃথক মূল্য [আগে  
থেকে] বলে দিলে [পণ্যের কিয়দাংশে প্রস্তাব কবুল করা] বৈধ হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে কার্যত প্রতিটি পৃথক  
পৃথক চুক্তি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। যথা—

১. খেয়ারে কবুল কাকে বলে এবং তার যৌক্তিকতা কি?
২. মজলিসের শেষ পর্যন্ত খেয়ারে কবুলের সুযোগ কেন?
৩. পত্র বা দূত মাধ্যমে অনুপস্থিত ব্যক্তির সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খেয়ারে কবুলের সময় কতটুকু?

৪. প্রস্তাবিত পণ্যের কিয়দংশে বা আংশিক মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় কিনা ?

এক. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়জনের কোনো একজন যদি ইজাব করে; উদাহরণত : বিক্রেতা বলল, **بَعْتُ مِنْكَ هَذَا يَانِبُ** আমি তোমার কাছে এ পণ্যটি এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম, তাহলে অপরজনের অর্থাৎ ক্রেতার মজলিসে থাকা পর্যন্ত তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের এখতিয়ার থাকে। সে ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত মূল্যে পণ্য গ্রহণ করবে, অথবা তা প্রত্যাখ্যান করবে। এ এখতিয়ারকে ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় খেয়ারে কবুল (**خِيَارُ الْقَبُولِ**) বলা হয়। এর যৌক্তিকতা হলো, যদি প্রস্তাবের পর অপর পক্ষের সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা, না করার এখতিয়ার না থাকে তাহলে তার সম্মতি ছাড়াই চুক্তির হুকুম তথা প্রস্তাবিত পণ্যের মালিকানা তার উপর আরোপিত হবে। বাধ্যতামূলকভাবে সে মালিক হবে। অথচ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময় করাকেই ক্রয়-বিক্রয় বলে। তাই ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজনের প্রস্তাবের পর অপর পক্ষ কবুল করা বা না করার এখতিয়ার লাভ করবে।

অপর পক্ষের কবুল করার আগ পর্যন্ত যেহেতু প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব হুকুমের ফায়দা দেয় না অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের এবং বিক্রেতা বিনিময়মূল্যের মালিক হয় না, তাই কবুলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রস্তাবকারীর জন্য, প্রস্তাবকারী ক্রেতা হোক বা বিক্রেতা হোক, তার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ প্রস্তাবের দ্বারা অপরজনের পণ্যে বা মূল্যে মালিকানা বা মালিকানার অধিকার সাব্যস্ত হয় না। তাই প্রস্তাব ফেরত নেওয়া হলে কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, বিক্রেতার প্রস্তাবের দ্বারা পণ্যে ক্রেতার মালিকানা বা মালিকানার অধিকার সাব্যস্ত না হলেও কবুলের মাধ্যমে পণ্যের মালিক হওয়ার অধিকার (**حَقُّ تَمْلُكٍ**) তো সাব্যস্ত হয়। তাই প্রস্তাব ফেরত নেওয়া হলে ক্রেতার এ অধিকার তো ক্ষুণ্ণ হবে ?

এর উত্তর হলো,

- যখন বিক্রেতার প্রস্তাবে পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না তখন পণ্যের প্রকৃত মালিকানা তথা **حَقِيقَتِ مِلْكٍ** বিক্রেতারই থাকে। ক্রেতার জন্য শুধু **حَقُّ تَمْلُكٍ** তথা কবুলের মাধ্যমে মালিক হওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর **حَقِيقَتِ مِلْكٍ** বেশি শক্তিশালী **حَقُّ تَمْلُكٍ**-এর চেয়ে। সুতরাং বিক্রেতাকে যদি তার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার দেওয়া না হয় তাহলে কম শক্তিশালী অর্থাৎ ক্রেতার **حَقُّ تَمْلُكٍ**-এর জন্য বেশি শক্তিশালী অর্থাৎ বিক্রেতার **حَقِيقَتِ مِلْكٍ** কে বাতিল করা হয়। আর এটা সঙ্গত নয় যে, অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালীর জন্য বেশি শক্তিশালী বিষয়কে বাতিল করা হবে। তাই বিক্রেতাকে তার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- তাছাড়া ক্রেতার জন্য **حَقُّ تَمْلُكٍ** সাব্যস্ত হয় বিক্রেতার পক্ষ থেকেই। সুতরাং তার **حَقُّ تَمْلُকٍ** সাব্যস্তের অধিকার যেক্রপ আছে তেমননি তা বাতিল করার অধিকারও থাকবে।

শেষোক্ত উত্তরের উপর প্রশ্ন হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যাকাত উসূলকারীর কাছে তার মালের যাকাত বাবদ মাল বা অর্থ জমা করে তবে সেই মাল বা অর্থে ফকিরদের **حَقُّ تَمْلُكٍ** সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তা ফেরত নেওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার **حَقُّ تَمْلُكٍ**-এর কারণে বিক্রেতার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার না থাকা উচিত।

এর উত্তর হলো,

- উপরিউক্ত যাকাতের মাসআলার সাথে আলোচ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলার পার্থক্য আছে। উপরোক্ত মাসআলায় **أَصْلٌ** অর্থাৎ সোদা বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ মালের বর্ধিষ্ণুতা প্রমাণিত। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলায় **أَصْلٌ** বিদ্যমান নেই, বরং **أَصْلٌ**-এর একাংশ অর্থাৎ ইজাব আছে।

২. তাছাড়া যাকাত আদায়কারী যখন যাকাত উসূলকারীর কাছে তার যাকাত অর্পণ করে তখন তার **حَبِطَتْ مِلْكُهُ** অর্থাৎ মালিকানা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলায় বিক্রেতার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তার মালিকানা শেষ হয় না।

**দুই. قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَسْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ النَّحْلِيسِ** : এ ইবারতে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, প্রস্তাবের পর প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের এখতিয়ারকে মজলিসের সাথে কেন সীমাবদ্ধ করা হয়েছে? আর এখতিয়ার মজলিসের শেষ পর্যন্ত কেন বলবৎ থাকবে?

প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে— ইজাবের পর কবুলের তিনটি সূরত হতে পারে।

১. ইজাবের সাথে সাথেই কবুল করা আবশ্যিক। তা না হলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে।

২. মজলিসের সাথে কবুল করার বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত হবে না। মজলিস শেষ হওয়ার আগে কবুল করুক বা পরে করুক উভয় অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হবে।

৩. প্রস্তাবের পর মজলিসের শেষ পর্যন্ত কবুল করার এখতিয়ার থাকবে।

ইজাব যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে হয় প্রথম সূরতে ক্রেতার সমস্যা হবে। কারণ তখন চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকবে না। চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে কবুল করতে হবে। দ্বিতীয় সূরতে বিক্রেতার সমস্যা হবে। কারণ তখন তাকে মজলিসের পরেও দীর্ঘ সময় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে। তৃতীয় সূরতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই সুবিধা। কারণ ক্রেতা মজলিসের ভিতরে থেকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবে আর বিক্রেতার মজলিসের পরে অপেক্ষা করতে হবে না। আর মজলিস একাধিক বিষয়কে সমন্বিত করে। তাই তো কোনো ব্যক্তি যদি এক মজলিসে তিলাওয়াতে সেজদাকে বারবার পড়ে তাহলে একটি সেজদাই ওয়াজিব হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সুবিধার জন্য এবং উভয় থেকে কষ্ট লাঘব করার জন্য মজলিসের মুহূর্তগুলোকে একটি মুহূর্ত গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং মজলিসের শেষ মুহূর্তে কবুল করা আর ইজাবের সাথে সাথে কবুল করা একই কথা। তাই খেয়ারে কবুল মজলিসের শেষ পর্যন্ত বাকি থাকবে।

তিন. হিদায়া গ্রন্থকার (রা.) বলেন, “অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পত্র মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করা বা দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করা উপস্থিত ব্যক্তিকে প্রস্তাব পেশ করার মতোই।” কারণ নবী করীম ﷺ সরাসরিও দীনের দাওয়াত দিয়েছেন, পত্র মাধ্যমেও দাওয়াত দিয়েছেন। যদি পত্র মারফত দাওয়াত সরাসরি দাওয়াতের মতো না হতো তাহলে তিনি পত্র মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন না। পত্র মারফত বা দূত মুখে ইজাবের খেয়ারে কবুলে পত্র পৌছা বা দূত মুখে সংবাদ শোনার মজলিস ধর্তব্য হবে। পত্র মাধ্যমে ইজাবের ধরন : **شَامِلٌ سِنَانِكُمْ لِيُخْلَلَ** ‘আমি আমার অমুক জমিটি তোমার কাছে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম।’ যখন পত্রটি সিনানের কাছে পৌছবে, সে তা পড়বে ও তার মমার্থ বুঝবে এবং মজলিসে থাকা অবস্থায় কবুল করবে, তখন চুক্তি সম্পন্ন হবে। দূত মুখে ইজাবের ধরন : **فَرِيدٌ بَلِيلِكُمْ** ‘হুমি ওয়াহীদের কাছে যাও এবং তাকে বল যে, ফরীদ তোমার কাছে তার অমুক জমিটি এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে।’ খলীল এসে যখন ওয়াহীদেরকে এ কথা জানাবে এবং ওয়াহীদ ঐ মজলিসে থাকা অবস্থায় বলবে, আমি ক্রয় করলাম বা আমি সম্মত আছি তখন এ চুক্তি সম্পন্ন হবে। মজলিস খতমের পর বললে চুক্তি সম্পাদিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে পত্র মাধ্যমে ইজাবের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে কিনা এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। বিদ্বৎ অভিমত অনুসারে যদি ইজাবের নিয়তে পত্র লিখে তাহলে বিক্রয় চুক্তি (**عَقْدٌ**) সম্পাদিত হবে। তা না হলে হবে না।

আর দূত মাধ্যমে ইজাবের দ্বারা বিক্রয়-চুক্তি (**عَقْدٌ**) সম্পাদিত হবে।

মাসআলা : দূত মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণের পর দূতের অজান্তে কবুলের পূর্বে প্রস্তাব ফেরত নেওয়া শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে পর মারফুত প্রস্তাব পাঠানোর পর কবুলের পূর্বে প্রস্তাব ফেরত নেওয়া শুদ্ধ হবে। —মুজতবা ও শরহুত তহাবী।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি লিখে পাঠায় যে, **بِعْنِي مَذَاكَ** “তুমি আমার কাছে অমুক পণ্য এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি কর।” উত্তরে যদি সে লিখে জানায় যে, আমি বিক্রি করলাম, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি জবাবে না বলে যে, আমি ক্রয় করলাম বা আমি সম্মত আছি। কারণ, তা না হলে উভয় দিক থেকে **مُضَيِّ** —এর শব্দ হয় না।

চায়, কবুলকারীর জন্য প্রস্তাবিত পণ্যের ক্রিয়াংশে প্রস্তাব গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই। উদাহরণত: বিক্রেতা বলল, “আমি তোমার কাছে এক হাজার টাকার বিনিময়ে এ দু’টি পণ্য বিক্রি করলাম।” তাহলে ক্রেতার জন্য এখতিয়ার নেই যে, সে বলবে, “আমি একটি পণ্য পাঁচশ’ টাকায় গ্রহণ করলাম।” এরূপভাবে ক্রেতা যদি বলে, “আমি এ দু’টি পণ্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম।” তাহলে বিক্রেতার জন্য এটা বলার এখতিয়ার নেই যে, “আমি একটি পণ্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম।” কারণ এখতিয়ার থাকলে চুক্তির (صَفَقَة) ধরন পাল্টে যাবে। প্রস্তাবকারী যদি বিক্রেতা হয় আর ক্রেতা পণ্যের কিছু অংশে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে অবশিষ্ট পণ্যের জন্য বিক্রেতাকে নতুন করে ক্রেতা খুঁজতে হবে। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা ভাল-খারাপ পণ্য মিলিয়ে বিক্রি করে। যাতে ভালগুলোর সাথে খারাপগুলোও চালিয়ে দেওয়া যায়। ক্রেতার জন্য কিছু অংশে প্রস্তাব বৈধ হলে ক্রেতা বেছে বেছে ভাল পণ্যগুলো নিবে। আর খারাপগুলো থেকে যাবে। এতে বিক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আর যদি প্রস্তাবকারী ক্রেতা হয় আর বিক্রেতা কিছু পণ্যে প্রস্তাব কবুল করে তাহলে ক্রেতার চাহিদার অবশিষ্ট পণ্যের জন্য তার আরেকজন বিক্রেতার সন্ধান করতে হবে। তাছাড়া এক সাথে বেশি পণ্য ক্রয়ে যে সুবিধা পাওয়া যায় তা ভিন্ন ভিন্ন ক্রয় করলে অনেক ক্ষেত্রে সে সুবিধা পাওয়া যায় না। এছাড়া ক্রেতা একটি পণ্যের বিনিময়ে এক হাজার টাকা দিতে সম্মত নয়। এরূপভাবে পণ্যকে প্রস্তাবিত মূল্যের কিছু অংশের বিনিময়ে কবুল করাও বৈধ নয়। উদাহরণত: বিক্রেতা বলল, “আমি তোমার কাছে এ জমিট এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম।” তাহলে ক্রেতার এটা বলার এখতিয়ার নেই যে, “আমি পাঁচশ’ টাকার বিনিময়ে কবুল করলাম।” কারণ মূল্য সংকোচনে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এতে সে সম্মত নয়।

মাসআলা : বিক্রেতা একটি জমি এক হাজার টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দিল। ক্রেতা তা পাঁচশ টাকার বিনিময়ে কবুল করল। বিক্রেতা ঐ মজলিসে থেকেই তাতে সম্মত হলো। তাহলে এ বিক্রয়-চুক্তি (عَقْد) শুদ্ধ হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার পাঁচশ’ টাকার বিনিময়ে জমিটি কবুল করাকে মূলত ইজাব আর বিক্রেতার তাতে সম্মত হওয়াকে কবুল গণ্য করা হবে। আর বিক্রেতার প্রথমোক্ত ইজাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, যদি একই ইজাবে একাধিক পণ্যের উল্লেখ করা হয় এবং প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন মূল্য বলে দেওয়া হয় তাহলে ক্রেতার কিছু পণ্য কবুল করা শুদ্ধ হবে। যেমন, বিক্রেতা বলল, “আমি আমার এ দু’টি জমি বিক্রি করলাম; এটা একশ’ টাকা আর ওটা দেড়শ’ টাকা।” ক্রেতা বলল, আমি এ [শেযোক্ত] জমিটি দেড়শ’ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম’ তাহলে তা শুদ্ধ হবে। কারণ এক্ষেত্রে একই ইজাবে একাধিক পণ্যের উল্লেখ করলেও পরোক্ষভাবে চুক্তি অনেকগুলো। সুতরাং পণ্যের কিছু অংশে কবুল করলেও চুক্তির (صَفَقَة) ধরন পাল্টে যাচ্ছে না। আর যেহেতু চুক্তির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে না তাই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে।



وَأَيْهَمًا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطْلَ الْإِنْجَابِ ، لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ  
وَالرُّجُوعِ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

**অনুবাদ :** তাদের কোনো একজন কবুলের পূর্বে মজলিস থেকে উঠে গেলে ইজাব বাতিল [অকার্যকর] হয়ে যাবে। কারণ [মজলিস থেকে] উঠে যাওয়া [কবুলকে] উপেক্ষা করা এবং [ইজাব থেকে] ফিরে আসার প্রমাণ। আর এ অধিকার তার আছে। এটা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে কখন ইজাব বাতিল হবে তা আলোচিত হয়েছে। ক্রোতা ও বিক্রোতা উভয়ের মধ্যে একজনের ইজাবের পর অপরজনের কবুল করার এখতিয়ার থাকে। যদি কবুল করার আগে কোনো একজন মজলিস থেকে উঠে বা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। কারণ আলোচনার মাঝ থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়া অসম্মতি ও অনগ্রহের প্রমাণ বহন করে। যদি ইজাবকারী দাঁড়িয়ে যায়, তা তার ইজাব প্রত্যাহারের প্রমাণ বহন করে। আর কবুলের পূর্বে ইজাব প্রত্যাহারের তার এখতিয়ার আছে। আর যদি অপর পক্ষ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তা কবুলের প্রতি তার অনগ্রহ ও অসম্মতির (اعراض) প্রমাণ বহন করে। আর কবুল না করার অর্থাৎ ইজাব প্রত্যাখান করার তার এখতিয়ার আছে।

আল্লামা আইনী (র.) তাঁর বিনায়া গ্রন্থে وُضِل শব্দে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, ইজাবের স্থান ছেড়ে চলে যাওয়া। অবশ্য সাধারণভাবে সকল কিতাবে শুধু দাঁড়িয়ে যাওয়াকেই অসম্মতি ও অনগ্রহের প্রমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শায়খুল ইসলাম খাহার যাদাহ (র.) শরহুল জামেইস সাগীরে উল্লেখ করেছেন, শুধু দাঁড়ানোটা অনগ্রহ ও অসম্মতির দলিল নয়। বরং স্থান ছেড়ে চলে যাওয়াটা অনগ্রহ ও অসম্মতির দলিল। তাই বিক্রোতা যদি ইজাবের স্থান থেকে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু এখানে ঐ স্থান ছেড়ে যায়নি, এমতাবস্থায় যদি ক্রোতা কবুল করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। শুধু দাঁড়ানোতে ইজাব বাতিল হবে না। তাছাড়া ইমাম কুদুরী (র.) -এর ইবারত **قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ** -এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইজাবের স্থান ছেড়ে যাওয়া শর্ত। কারণ স্থান ছেড়ে গেলেই **قِيَامٌ عَنْهُ** হয়। যদি স্থান ছেড়ে যাওয়া শর্ত না হতো তাহলে **قَامَ عَنْهُ** না বলে **قَامَ فِيهِ** বলা হতো।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইজাব প্রত্যাখান বা প্রত্যাহার যেমন মৌখিক বলার দ্বারা ঘটে, তেমনি কাজ বা আচরণের মাধ্যমেও তা ঘটে থাকে।

**মাসআলা :** শরহত তহাবী গ্রন্থে আছে, দু'ব্যক্তি এক সঙ্গে হাঁটছে কিংবা একই বাহনে অথবা একাধিক বাহনে চলছে, এমতাবস্থায় যদি একজন ইজাব করে, তাহলে অপরজন যদি ইজাবকারীর ইজাবের সাথে সাথে কবুল করে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর যদি সামান্যতম বিলম্ব হয়, একই বিষয়ে ও একই বাহনে থাকা সত্ত্বেও চুক্তি শুদ্ধ হবে না। কারণ দুই বক্তব্য অর্থাৎ ইজাব ও কবুলের মাঝে যখন পথ চলা কিংবা একসাথে বা আগে পরে হাঁটা পাওয়া গেল, তা সামান্য হলেও, এতে মজলিস পরিবর্তন হয়ে গেল এবং চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগেই অনগ্রহ ও অসম্মতি (اعراض) পাওয়া গেল। তাই ইজাব বাতিল হয়ে গেছে।

**মাসআলা :** যদি বাহ্যিকভাবে মজলিস পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ স্থান ছেড়ে কেউ যায়নি; কিন্তু আলোচনা বা কাজ পাল্টে যায়, এটাকে মজলিস পরিবর্তন ধরা হবে। এর দ্বারা ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। মোটকথা, প্রস্তাবের প্রতি অনগ্রহ ও অসম্মতি (اعراض) বোঝা গেলেই মজলিস বাতিল হয়ে যাবে।

وَإِذَا حَصَلَ الْإِنْبِجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إِبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى خِيَارِ الْقَبُولِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا مُتَبَايَعَانِ فِي حَالَةِ الْمُبَاشَرَةِ لَا بَعْدَهَا أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَالتَّفَرُّقُ فِيهِ تَفَرُّقُ الْأَقْوَالِ .

অনুবাদ : যখন ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হবে তখন বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এরপর ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্যই [তা অমান্য] করার এখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য পণ্যের কোনো দোষ-ত্রুটি [প্রকাশ পেলে] কিংবা না দেখে কেনার কারণে [দেখার পর তা রাখা বা না রাখার এখতিয়ার থাকবে]। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [ইজাব ও কবুলের পর] ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে। কারণ, হজুর ﷺ বলেন, ক্রেতা -বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ে এখতিয়ার পাবে। আমাদের দলিল হলো, [ইজাব কবুলের পর] বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করলে তাতে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়। সুতরাং তা জায়েজ নেই। উপরোক্ত হাদীসটি খেয়ারে কবুলের জন্য প্রযোজ্য। আর হাদীসে এর প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। কারণ, তাদের দু'জনকে ক্রেত-বিক্রেতা তখনই বলা হয়, যখন তারা ইজাব ও কবুল করছে। ইজাব কবুলের পর নয়। [ইজাব কবুলের পর তারা অপরিচিত ব্যক্তির মতো।] অথবা হাদীসটি থেকে [অন্য অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকলেও] খেয়ার কবুলের অর্থ গ্রহণের অবকাশও আছে [অন্য অর্থ গ্রহণ করার চেয়ে খেয়ারে কবুলের অর্থ গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত শ্রেয় বিধায়] এ অর্থেই হাদীসটিকে প্রয়োগ করা হবে। আর বিচ্ছিন্নতা মানে মৌখিক কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে খেয়ারে মজলিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরতে মাসআলা : ইজাব কবুল সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে যে বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার শারীরিক পৃথক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের তা ভঙ্গ করার এখতিয়ারকে খেয়ারে মজলিস বলা হয়। আমাদের মতে যখন ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হবে তখন বিক্রয়-চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের আর বিক্রেতা বিনিময় মূল্যের মালিক হবে এবং কারো জন্যই এ চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকবে না। তবে পণ্য হস্তগত করার পর যদি ক্রেতা পণ্যে এমন কোনো দোষ খুঁজে পায় যা হস্তগত করার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল কিংবা ক্রেতা যদি পণ্য না দেখে ক্রয় করে, তবে প্রথমেই সূরতে ক্রেতা খেয়ারে আইব (خِيَارُ عَيْبٍ) লাভ করবে অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ত্রুটিযুক্ত সেই পণ্য রেখে দেবে, অথবা ইচ্ছা করলে বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে মূল্য বাবদ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ তুলে নিবে। আর শেষোক্ত সূরতে দেখার পর খেয়ারে রুম্যত (خِيَارُ رُؤْيَةٍ) অর্থাৎ তা রাখা বা না রাখার এখতিয়ার লাভ করবে। এক কথায় আমাদের মতে ক্রেতা বিক্রেতা কারো জন্যই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও এটি।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ মতই পোষণ করেন। তাঁদের দলিল নিম্নোক্ত হাদীস। হাদীসটি শব্দের কিছুটা পার্থক্যসহ আইখ্যায়ে সিত্তাহ হযরত নাফে' (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার যে শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা নাসায়ী শরীফে সংকলিত হয়েছে। হাদীসটি এই—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَّاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

“ক্রেতা-বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়।” এ হাদীসের দুটি শব্দ الْمَتَّاعَانِ ও الْخِيَارِ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। الْمَتَّاعَانِ মানে ক্রেতা ও বিক্রেতা। ইজাব ও কবুলের পর এ শব্দের প্রয়োগ হয়। আর تَفَرَّقَا মানে পৃথক হওয়া। এর দ্বারা শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ দাঁড়ায়, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে ইজাব কবুলের পর শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এখতিয়ার পাবে। শারীরিকভাবে হওয়ার পর এখতিয়ার পাবে না। আর ইজাব কবুলের পর শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে এখতিয়ার থাকে তাই তো খেয়ারে মজলিস। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে বিক্রয়-চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পর খেয়ারে মজলিস পাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার আমাদের মাযহাবের পক্ষে আকলী দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ইজাব কবুলের দ্বারা বিক্রয়-চুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের। আর বিক্রেতা বিনিময় মূল্যের মালিক হয়ে গেছে। এখন ক্রেতা-বিক্রেতা কাউকে এ চুক্তি ভঙ্গের এখতিয়ার দেওয়া হলে এবং তার ভিত্তিতে সে চুক্তি ভঙ্গ করলে অপরজনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে। আর এতে অপরজনের সম্মতি নেই। সুতরাং তা বৈধ নয়।

আল্লাহ আইনী (র.) বিষয় প্রকাশ করে বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মাযহাবের পক্ষে পেশ করা হলো সহীহ হাদীস আর গ্রন্থকার স্বীয় মাযহাবের পক্ষে পেশ করেছেন আকলী দলিল প্রতিপক্ষের দলিলের পাশ্চাত্য দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের দলিল উপস্থাপন করাই সঙ্গত ছিল। অন্যান্য ফুকাহায়ে কেলাম তাই করেছেন।

আমাদের দলিল : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।'—[মায়েদা : ১] ইজাব কবুল নিষ্পন্ন ক্রয়-বিক্রয়ও একটি চুক্তি। তাই আয়াতের নির্দেশ মতে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। যদি খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত করা হয় তাহলে চুক্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আয়াতের নির্দেশ অমান্য করা হয়। অতএব, খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না।

দ্বিতীয় দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ 'তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষ্য রেখ।'—[বাকারা : ২৬৮] এ আয়াতে সাক্ষ্য দ্বারা বিক্রয়-চুক্তিকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ বিক্রয়কে অস্বীকার করতে না পারে। খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত করা হলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সুদৃঢ় করার বিষয়টি ব্যাহত হয়। এতে কুরআনের নির্দেশকে অকার্যকর করা হয়। তাই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না।

তৃতীয় দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী—اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ "মুসলমানগণ তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।" ইজাব ও কবুলের দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পণ্য ও বিনিময় মূল্য তাদের মালিকানা থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তা নিজের উপর আবশ্যক করেছে। যদি খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত করা হয় তাহলে হাদীসের নির্দেশ পালন হয় না। তাই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না।

চতুর্থ দলিল : হুজুর ﷺ হযরত হি'রান ইবনে মুনকিয় ইবনে আমর আল আনসারী (রা.)-কে বলেছিলেন, اِذَا اشْتَرَيْتَ، فَقُلْ لَا خِلَافَ لِّىَ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ "যখন তুমি ক্রয় কর তখন তুমি বলে নাও যে, কোনো প্রত্যারণা নেই, আমার

তিনদিনের খেয়ার (خِيَارٌ شَرْطٌ) থাকবে।” এ থেকে বুঝা যায় যে, ইজাব কবুলের সাথে সাথে বিক্রয়-চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

تَوَلَّاهُ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى خِيَارِ الْفَيْوَلِ الْخ : হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদীসটির উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসে মূলত: খেয়ারে কবুলের কথা বলা হয়েছে; খেয়ারে মজলিসের কথা নয়। হাদীসের পূর্বাপর অবস্থা তাই প্রমাণ করে। কারণ مُتَبَايَعَانِ শব্দটি ইসমে ফায়েল (اسْمٌ فَاعِلٌ) দ্বিভাচন। অর্থ ক্রেতা-বিক্রেতা। একবচন مُتَبَايِعٍ কারবারী দু'জনকে তিন অবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায়—

১. কারবারী দু'জনের মাঝে কেনাবেচার কোনো কথা হয়নি, তারা কেনাবেচার কেবল ইচ্ছা করেছে। একটু পরে ক্রেতা-বিক্রেতা হবে (مَا يُولُ الْإِنْبِ) -এ হিসেবে রূপক অর্থে তাদেরকে (مُتَبَايَعَانِ) ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায়।
২. ইজাব কবুল সম্পন্ন হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় একটু আগে ক্রেতা-বিক্রেতা ছিল (مَا كَانَ عَلَيْهِ) এ হিসেবে রূপক অর্থে তাদেরকে (مُتَبَايَعَانِ) ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায়।
৩. কারবারীদ্বয় বোচাকেনার আলোচনায় লিপ্ত অর্থাৎ একজন বলেছে يُعْنِي তুমি আমার কাছে বিক্রি কর। আর অপরজন বলেছে يَغْتُ আমি বিক্রি করলাম। এরপর দু'জনই মজলিসে থাকা পর্যন্ত এখতিয়ার লাভ করবে। বিক্রোতা এখতিয়ার পাবে সে যা বলেছে তা স্থির রাখার কিংবা তা প্রত্যাহার করার, আর ক্রেতা এখতিয়ার পাবে বিক্রোতার প্রস্তাব কবুল করার বা প্রত্যাহান করার।

এ তৃতীয় অবস্থায় কারবারীদ্বয় প্রকৃত ক্রেতা-বিক্রেতা। কারণ ইসমে ফায়েল মূলত বর্তমানের (حَالٌ)-এর অর্থ প্রদান করে। রূপক অর্থে অতীত ও ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। আর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। তাই হাদীসে مُتَبَايَعَانِ -এর তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ একজনের ইজাবের পর অপরজনের কবুলের পূর্ব পর্যন্ত কারবারীদ্বয় ক্রেতা-বিক্রেতা। তাদের উভয়ের বিচ্ছিন্নতার পূর্ব পর্যন্ত এখতিয়ার থাকবে। ইজাবকারী তার ইজাব স্থির রাখা কিংবা প্রত্যাহার করার এখতিয়ার পাবে, আর অপরজন কবুল করা বা প্রত্যাহান করার এখতিয়ার পাবে। আর এটাই খেয়ারে কবুল। অতএব প্রমাণিত হলো যে, হাদীসে খেয়ারে কবুলের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে দলিল হতে পারে না।

أَوْ يَغْتِيلُهُ الْخ বলে হিদায়া গ্রন্থকার হাদীসটির দ্বিতীয় আরেকটি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো, হাদীসের خِيَار শব্দ দ্বারা নিশ্চিতভাবে যদি খেয়ারে কবুল উদ্দেশ্য নাও হয় তবু খেয়ারে কবুলের অর্থ গ্রহণের অবকাশ তো আছে। আবার খেয়ারে মজলিসের অর্থ গ্রহণের অবকাশও আছে। কিন্তু খেয়ারে মজলিস উদ্দেশ্য নিলে যেহেতু অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় তাই খেয়ারে কবুল উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। আর হাদীসের تَفَرَّقَ بِأَقْوَالٍ শব্দ দ্বারা কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কারবারীদ্বয় ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়ারে কবুল বাকি থাকবে।

তাছাড়া ইজাব কবুল সম্পন্ন হওয়ার পরের মুহূর্ত হলো ইকাল (الْإِلَاقَةُ) -এর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইজাব কবুল সম্পন্ন হওয়ার পর যদি ইকালার সুযোগ দিতে না চাইতেন তাহলে হেঁটে স্বস্থান থেকে সরে যেতেন। [মুসলিম] এ থেকে বুঝা যায় যে, ইজাব কবুলের পর ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ খেয়ার পাবে না।

قَالَ : وَالْأَعْوَاضُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةٍ بِمَقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ لِأَنَّ  
 بِالْإِشَارَةِ كِفَايَةً فِي التَّعْرِيفِ وَجَهَالَةِ الْوُصْفِ فِيهِ لَا تُفْضَى إِلَى التَّجَارَعَةِ ،  
 وَالْإِثْمَانُ الْمَطْلَقَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَالتَّسْلَمَ  
 وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلَمُ وَكُلُّ  
 جَهَالَةٍ هَذِهِ صَفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ قَالَ : وَجُزُورُ الْبَيْعِ بِثَمَنِ حَالٍ  
 وَمَوْجَلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ : أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ ذِرْعَةً وَلَابدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ  
 مَعْلُومًا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ عَنِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ فَهَذَا يُطَالِبُهُ بِهِ فِي  
 قَرْنِ الْمُدَّةِ وَهَذَا يَسْلَمُ فِي بَعِيدِهَا .

**অনুবাদ :** ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে সব পণ্যের দিকে ইশারা করা হয়, বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য তার পরিমাণ জানা জরুরি নয়। কারণ নির্দিষ্টতার জন্য ইশারা ই যথেষ্ট। [তবে পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু তার পরিমাণ গুণের অজ্ঞতা ঋণাড়ার দিকে ধাবিত করে না। ইশারাকৃত নয় এমন বিনিময়মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়, যদি না পরিমাণ ও গুণগত মান জানা থাকে। কারণ বিক্রয়-চুক্তির বিধানানুসারে [বিনিময় মূল্য] হস্তান্তর করা এবং হস্তগত করা ওয়াজিব। আর এ ধরনের অজ্ঞতা যেহেতু ঋণাড়ার কারণ হয় তাই হস্তান্তর করা এবং হস্তগত করা বাধাগ্রস্ত হয়। আর এ ধরনের প্রতিটি অজ্ঞতাই [ক্রয়-বিক্রয়ের] বৈধতাকে রহিত করে। এটা মৌলনীতি। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, নগদমূল্যে এবং যদি মেয়াদ ধার্য হয় তাহলে বাকিমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কারণ “আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।” আল্লাহ তা’আলার এ বাণী [নগদ বা বাকির] শর্তমুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি এক ইহুদি থেকে মেয়াদ ধার্য করে বাকিতে খাবার ক্রয় করেছিলেন এবং তার কাছে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। [ক্রয়-বিক্রয় বাকিমূল্যে হলে মূল্য পরিশোধের] মেয়াদ অবশ্যই ধার্য হতে হবে। কারণ, মেয়াদের অজ্ঞতা হস্তান্তরকে বাধাগ্রস্ত করে, যা বিক্রয়-চুক্তির বিধানানুসারে আবশ্যিক। [মেয়াদ সুনির্দিষ্ট না হলে] এ ব্যক্তি [বিক্রেতা] ক্রেতার কাছে মূল্য চাইবে স্বল্প সময়ের মধ্যে, আর এ ব্যক্তি [ক্রেতা] দিবে বিলম্ব করে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য পণ্য (مَبِيع) ও বিনিময়মূল্য (ثَمَن) নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। কারণ অনির্দিষ্টতা ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে ঋণাড়ার সৃষ্টি করে। অবশ্য ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে পরিমাণ অজানা থেকে যায়। কিন্তু পরিমাণের অজ্ঞতা ঋণাড়ার কারণ (مُنْفِضٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয় না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ে কেউ যদি পণ্য বা তার

বিনিময়ের পরিমাণ ও গুণাগুণ মৌখিকভাবে উল্লেখ না করে ইশারায় দেখিয়ে দেয়; উদাহরণত: একটি গমের স্তুপ দেখিয়ে এক ব্যক্তি বিক্রেতাকে বলল, আমি গমের এ স্তুপ আমার হাতের এ টাকাতুলার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। অথচ ক্রেতার গমের পরিমাণ জানা নেই এবং বিক্রেতার টাকার পরিমাণ জানা নেই, তা সত্ত্বেও উভয়পক্ষ এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে সম্মত হয় তাহলে এ বেচাকেনা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো, পণ্য ও বিনিময়মূল্য যে সব মালে সুদ হয় এমন মাল (أَمْوَالٌ رِبَوِيَّةٌ) হলে উভয়টা এক জাতীয় না হতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে পরিমাণে কমবেশি হওয়ার কারণে সুদের আশঙ্কা থাকে। আর সুদ যেমন হারাম তেমনি যে বিষয়ে সুদের আশঙ্কা থাকে তাও হারাম।

২. قَوْلُهُ وَالْأَنْتَانِ الْمَطْنَتَيْنِ لَا تَبْعُ إِلَّا أَنْ الْخ: যদি বিনিময়মূল্য (تَمَنُّ) নির্দিষ্ট করা না হয়, ইশারার মাধ্যমেও নির্দিষ্ট করা হয়নি, পরিমাণ ও গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমেও নির্দিষ্ট করা হয়নি, উদাহরণত: কেউ বলল, আমি স্বর্ণের বা টাকার বিনিময়ে এ দ্রব্যটি ক্রয় করলাম। কিন্তু সে স্বর্ণ বা টাকার পরিমাণ ও গুণাগুণ উল্লেখ করল না, তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়। পরিমাণ মানে হলো, টাকার নির্দিষ্ট অংক বা দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ। আর গুণাগুণ মানে হলো, দিনার কি ইরাকী বা ইয়ামেনী, ভাল বা খারাপ ইত্যাদি। মোটকথা, ইশারাকৃত নয় এমন বিনিময়মূল্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা না থাকলে বিক্রয় শুদ্ধ নয়। কারণ বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বিক্রেতার জন্য পণ্য (مَبْعُوعٌ) হস্তান্তর এবং বিনিময়মূল্য (تَمَنُّ) হস্তগত করা, আর ক্রেতার জন্য পণ্য হস্তগত করা এবং বিনিময়মূল্য হস্তান্তর করা ওয়াজিব। যদি বিনিময়মূল্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা না থাকে এবং ইশারাকৃতও না হয় তাহলে তা ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। পরিমাণ অজানা থাকার ক্ষেত্রে বিক্রেতা বেশি পরিমাণ মূল্য দাবি করবে আর ক্রেতা কম দিতে চাইবে। গুণাগুণ অজানা থাকলে বিক্রেতা ধাক্কা দিয়ে বিনিময়মূল্য দাবি করবে, আর ক্রেতা তখন খুঁত আছে এমন বিনিময়মূল্য দিতে চাইবে। এতে করে হস্তান্তর ও হস্তগত করা বাধাগ্রস্ত হবে। তাই বিনিময়মূল্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা না থাকলে এবং ইশারার মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট করা না হলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَكُلَّ جِهَانَةٍ هَذَا الْخ: হিদায়া গ্রন্থকার এ ইবারতে একটি মূলনীতি বলেছেন। মূলনীতিটি হলো, ক্রয়-বিক্রয়ে যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُنْفَضِي إِلَى التَّنَازَعِ) হয় তা সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতাকে রহিত করে। কিন্তু যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না তা ক্রয়-বিক্রয়ের শুদ্ধতাকে রহিত করে না। যেমন, কেউ দুটি ঘোড়ার একটি বিক্রি করল এবং ক্রেতাকে নির্দিষ্ট করার এখতিয়ার দিল। এ ক্ষেত্রে কোন ঘোড়াটি বিক্রয় পণ্য তা অজ্ঞাত। কিন্তু এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُنْفَضِي إِلَى التَّنَازَعِ) নয় বিধায় এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। সামনে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের বহু উদাহরণ আসবে যা পণ্যের অনির্দিষ্টতা কিংবা বিনিময়মূল্যের অনির্দিষ্টতা বা বিনিময়মূল্য পরিশোধের সময়কালের অনির্দিষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে শুদ্ধ নয়।

তিন. قَوْلُهُ قَالَ وَبِجُزِّ الْبَيْعِ يَتَسَوَّى حَالُ الْخ: ক্রয়-বিক্রয় নগদমূল্যে জায়েজ, বাকিমূল্যেও জায়েজ। এটা ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য করা আবশ্যিক। কারণ সময় নির্দিষ্ট না হলে মূল্য পরিশোধ নিয়ে ঝামেলা হবে। বিক্রেতা স্বল্প সময়ের মধ্যেই মূল্য পরিশোধ করার দাবি করবে। আর ক্রেতা বিলম্ব করে পরিশোধ করতে চাইবে। এতে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে।

নগদ ও বাকি উভয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ, এ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার দু'টি দলিল পেশ করেছেন—

১. আল্লাহর বাণী— اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ “আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন।”—[বাকারা : ২৭৫] এ আয়াতে নগদ ও বাকি বিক্রয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং উভয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ।

২. রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম: রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ইহুদি থেকে বাকিতে খাবার ক্রয় করেছেন এবং তার কাছে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছেন। সুতরাং বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আসওয়াদ (র.)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। বিক্রেতা ইহুদি বনী যফর গোত্রের লোক ছিল। তার নাম ছিল আবুশ শাহাম।—[বায়হাকী]

قَالَ : وَمَنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِي النَّبِيعِ كَانَ عَلَى غَالِبٍ نَقْدَ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ الْمُعَارَفُ وَفِيهِ  
التَّحَرُّى لِلْجَوَازِ فَيُصَرَّفُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَتِ الثَّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ  
أَحَدُهَا وَهَذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرِّوَاجِ سَوَاءً لِأَنَّ الْجَهَالََةَ مُقْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ إِلَّا أَنْ  
تَرْتَفِعَ الْجَهَالََةُ بِالْبَيَانِ أَوْ يَكُونُ أَحَدُهَا أَغْلَبَ وَارْوَاجَ فَحِينَئِذٍ يُصَرَّفُ إِلَيْهِ تَحَرُّيًا  
لِلْجَوَازِ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ سَوَاءً فِيهَا كَالثَّنَائِي  
وَالثَّلَاثِي وَالنُّصْرَتِي الْيَوْمَ بِسَمَرْقَنْدَ ، وَالْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَدَالِي يَفْرَغَانَهُ جَارَ الْبَيْعِ  
إِذَا أُطْلِقَ اسْمُ الدِّرْهِمِ كَذَا قَالُوا وَيَنْصَرَّفُ إِلَى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَى نَوْعٍ كَانَ لِأَنَّهُ لَا  
مُنَازَعَةَ وَلَا اِخْتِلَافَ فِي الْمَالِيَّةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, “ক্রয়-বিক্রয়ে কেউ মুদ্রাকে মুতলাক রাখলে [অর্থাৎ পরিমাণ উল্লেখ করেছে, কিন্তু গুণাগুণ উল্লেখ করেনি] শহরের সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয় হবে। কারণ, লোক সমাজে এটিই পরিচিত। আর এভাবেই এ ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার একটি পথ খোঁজা যায়। অতএব, ঐ মুদ্রার সাথেই বিক্রয়কে সম্পৃক্ত করা হবে। কিন্তু মুদ্রার মান যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ; যদি না তার কোনো একটার কথা ক্রেতা বলে দেয়। আর এটা তখন হবে, যখন এক পরিমাণের সবগুলো মুদ্রাই প্রচলনে সমান। [এ সূরতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ।] কারণ, [এ ক্ষেত্রে] অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হবে। [বিক্রেতা বেশি মানের মুদ্রাটি দাবি করবে, আর ক্রেতা দিতে চাইবে কম মানের মুদ্রা।] তবে কোনটা তা নির্দিষ্ট করে বলে দিলে অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। অথবা [মুদ্রার মান ভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে] কোনোটা বেশি প্রচলিত [আর কোনোটা কম।] বৈধতার পথ খোঁজা হিসেবে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে [অর্থাৎ সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রাটি দিলে ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।] আর এটা তখন হবে, যখন একই পরিমাণ মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর যদি মান সমান হয় [এবং প্রচলনও সমান] যেমন সমরকন্দের বর্তমান সুনাসি, সুলাসী ও নুসরাতী মুদ্রা ফারগানার আদুলী অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে শুধু দিরহামের পরিমাণ উল্লেখ করে থাকলেই ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। মাশায়েখে কেলাম একরুপই বলেছেন। এবং যে প্রকারের দিকে ইচ্ছা ঐ পরিমাণকে ফিরানো যাবে [অর্থাৎ সুনাসি, সুলাসী ও নুসরাতীর যে কোনো একটা দিয়ে ঐ পরিমাণ পরিশোধ করলেই হবে।] কারণ [এগুলোর] প্রচলনে ভিন্নতা এবং মানে কোনো পার্থক্য নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য ইবারতে যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কোনো ক্রেতা বিনিময়মূল্য হিসেবে মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ করল, কিন্তু মুদ্রার শ্রেণী ও মান উল্লেখ করল না, উদাহরণত ক্রেতা বলল, “আমি এ দ্রব্যটি দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলাম” কিন্তু দিরহামগুলো কি বুখারী, না সমরকন্দী তা উল্লেখ করল না, এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে কি না? উল্লেখ্য যে, পূর্বযুগে কোনো কোনো অঞ্চলে একাধিক রকমের ইস. আশরাফুল হেদায়া (৫ম) ৩ (ক)

মুদ্রার প্রচলন ছিল। এক দেশের মুদ্রা পার্শ্ববর্তী দেশে প্রচলিত ছিল। দেশের অন্তর্গত প্রতিটি প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশের বাজারজাতকৃত মুদ্রা এক একটা ভিন্ন রকমের মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত হতো। আর মুদ্রাগুলোর মৌল উপাদান ও নাম ভিন্ন হতো বিধায় বাহ্যিক পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলোকে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের/দেশের দিকে সম্পর্কিত করা হতো। যেমন বলা হতো, বুখারী দিরহাম, সমরকন্দী দিরহাম। আজকালও পৃথিবীতে এমন বহু অঞ্চল আছে, যেখানে সাধারণ বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার প্রচলন আছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে, আমি এ কিতাবটি এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলাম, কিন্তু দিরহামের প্রকার উল্লেখ করল না, তাহলে এ দিরহাম কোন রকমের দিরহাম বলে বিবেচিত হবে?

এ মাসআলায় চারটি সূরত হতে পারে—

১. প্রচলিত সকল প্রকার দিরহামের মান সমান এবং সবগুলো ঐ অঞ্চলে সমভাবে প্রচলিত।
  ২. প্রচলিত সকল প্রকার দিরহামের মান ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রচলনও ভিন্ন ভিন্ন; কোনোটা বেশি প্রচলিত, কোনোটা অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত। এটা কিতাবে বর্ণিত তৃতীয় সূরত।
  ৩. সকল প্রকার দিরহামের মান সমান, কিন্তু প্রচলন ভিন্ন ভিন্ন; কোনোটা বেশি প্রচলিত, কোনোটা কম প্রচলিত। এটা কিতাবে বর্ণিত প্রথম সূরত।
  ৪. সকল প্রকার দিরহামের মান ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু প্রচলন সবগুলোর সমান। এটা কিতাবে বর্ণিত দ্বিতীয় সূরত।
- প্রথম সূরতে বিক্রয় শুদ্ধ। যে কোনো প্রকারের এক দিরহাম দিলেই চলবে। কারণ সকল প্রকার দিরহামের মান ও প্রচলন সমান। ফলে ঝগড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূরতে শহরের সর্বাধিক প্রচলিত দিরহাম অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হবে। দ্বিতীয় সূরতে দিরহামের মান ভিন্ন ভিন্ন হলেও সর্বাধিক প্রচলিত দিরহামের উপর ক্রয়-বিক্রয় হবে দু'কারণে।
১. সমাজের মানুষের লেনদেন যে দিরহামে সবচেয়ে বেশি, সাধারণভাবে দিরহাম বলতে তাই বুঝানো হয়ে থাকে। কায়দা আছে **الْمَرْبُوبُ كَالْمَرْبُوتِ** “প্রচলিত ও পরিচিত বিষয় শর্তকৃত বিষয়ের পর্যায়ে।” তাই শর্ত করে দেওয়ার কারণে ক্রেতার উপর যেমন শর্তকৃত মুদ্রা আবশ্যক হতো, তেমনি শর্তমুক্ত অবস্থায় পরিচিত ও প্রচলিত মুদ্রা আবশ্যক হবে।
  ২. এ প্রক্রিয়া আলাচ্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েজের একটি পথ বের করার চেষ্টা। তাই সর্বাধিক প্রচলিত দিরহামই ক্রেতার উদ্দেশ্য বলে ধরা হবে।
- তৃতীয় সূরতে যেহেতু সব দিরহামের মান সমান তাই সর্বাধিক প্রচলিত দিরহাম দিলেই ঝগড়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। আর এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয়ের বৈধতা খোঁজা হয়। আকেল ও বালেগ মুসলমানের কথা ও কর্মকে যথাসম্ভব বৈধতার উপর প্রয়োগ করা উচিত।
- চতুর্থ সূরতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসদ হবে। কারণ, সব দিরহামের প্রচলন সমান, কিন্তু মান ভিন্ন ভিন্ন; এটা ঝগড়ার কারণ **(مُنْفِي إِلَى الْمَنَازِعَةِ)** হবে। বিক্রেতা বেশি মানেরটা দাবি করবে, আর ক্রেতা কম মানেরটা দিতে চাইবে। অবশ্য এ সূরতে মজলিস শেষ হওয়ার আগেই যদি ক্রেতা কোন দিরহামের কথা সে বলেছে তা নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কারণ বলে দেওয়ার দ্বারা অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়।

**قَوْلُهُ فَإِنَّ كَانَتْ سَرَاةً فِيهَا كَأَنَّ سَرَاةً**: কয়েক প্রকার মুদ্রার মান সমান হওয়ার উদাহরণ হলো, আজকাল [হিদায়া গ্রন্থাকারের সময়কাল] যেমন সমরকন্দে নুসরতী, সুনাসী ও সুলাসী তিন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত এবং তিনটির মান সমান। পুরা এক দিরহামকে নুসরতী বলা হয়। সমরকন্দের শাসক নুসরত উদ্দীনের দিকে সন্মত করে এ মুদ্রার নাম রাখা হয়েছে নুসরতী। আর সুনাসী হলো ঐ মুদ্রা যা দুটি মিলে এক দিরহাম হয়। আর সুলাসী হলো যা তিনটি মিলে এক দিরহাম হয়। অতএব কেউ যদি সমরকন্দে দশ দিরহামের বিনিময়ে কোনো জিনিস ক্রয় করে তাহলে ক্রেতা ইচ্ছে করলে নুসরতী দশটি দিবে, কিংবা সুনাসী বিশটি দিবে বা সুলাসী ত্রিশটি দিবে। আজকাল বাংলাদেশে যেকোন দশ টাকায় কোনো জিনিস ক্রয় করলে ক্রেতা দশ টাকাও দিতে পারে, বিশটি আধুনিও দিতে পারে, চল্লিশটি সিকিও দিতে পারে; যে কোনো ভাবে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। তবে শর্ত হলো, খুচরা পয়সার কারণে মানের দিক থেকে কোনোরূপ সমস্যা না হতে হবে। এ ধরনের ভিন্নতা ফারশানার আধালী [দিরহাম] মুদ্রায় আছে। ট্রান্স অস্ট্রিয়ানার **(مَازَرَاتُ الْكُفَرِ)** ফুকাহায়ে কেরামগণ দিরহামকে আধালী বলতেন।—[বেনায়া]

**ফায়দা** : শহরের সর্বাধিক প্রচলিত বলতে ঐ শহর বুঝাবে যেখানে বিক্রয় চুক্তি হবে। ক্রেতা বা বিক্রেতার শহর নয়।



قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحَبُوبِ مَكَايِلَةً وَمَجَازَفَةً وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ  
 جَنْسِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا اخْتَلَفَ التَّوَعَانَ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونُ  
 يَدًا يَبِيدُ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ بِجَنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْتِمَالِ الرِّبَا وَلِأَنَّ  
 الْجِهَالَةَ غَيْرُ مَا نِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسْلِيمُ فَشَابَهُ جِهَالَةُ الْقِيَمَةِ قَالَ : وَيَجُوزُ  
 بِنَاءً بِعَيْنِهِ لَا يُعْرِفُ مِقْدَارَهُ ، وَيُوزَنُ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرِفُ مِقْدَارَهُ ، لِأَنَّ الْجِهَالَةَ لَا  
 تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا أَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فِيهِ التَّسْلِيمُ فَيَنْدُرُ هَلَاكُهُ قَبْلَهُ بِخِلَافِ  
 السَّلَامِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِيهِ مَتَاجِرٌ وَالْهَلَاكُ لَيْسَ يَنَادِرُ قَبْلَهُ ، فَيَتَحَقَّقُ الْمُنَازَعَةُ ، وَعَنْ  
 أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا ، وَ الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, “গম ও অন্যান্য শস্য পাত্র মাপে এবং অনুমান করে বিক্রয় জায়েজ আছে।”  
 অবশ্য অনুমান করে বিক্রয় তখন জায়েজ, যখন তাকে বিক্রিতে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে। কারণ,  
 রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন পণ্য ও বিনিময়মূল্য ভিন্ন জাতীয় হবে তখন হাতে হাতে লেনদেন করে তোমরা  
 যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি] করে বিক্রি কর। পক্ষান্তরে যখন পণ্যকে সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি  
 করবে [তখন তা শুদ্ধ হবে না] কারণ তাতে সুদের আশঙ্কা আছে। [পণ্য ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অনুমান করে  
 বিক্রয় জায়েজ হওয়ার] আরেকটি কারণ হচ্ছে [পণ্য বা বিনিময়মূল্যের পরিমাণের] অজ্ঞতা হস্তান্তর ও হস্তগত করার  
 প্রতিবন্ধক নয়। তাই এটা পণ্যের বাজার দর না জানার মতোই হলো। [পণ্যের বাজার দর জানা না থাকলেও বিক্রয়  
 জায়েজ]। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, “নির্দিষ্ট পাত্রের [পরিমাপে] যার পরিমাণ জানা নেই এবং নির্দিষ্ট পাথরের ওজনে  
 যার পরিমাণ জানা নেই ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ আছে। যেহেতু এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য হস্তান্তর নগদ হয় আর  
 হস্তান্তরের পূর্বে নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথর ধ্বংস হওয়ার ঘটনা সাধারণত ঘটে না, তাই পরিমাণের এ অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে  
 পৌছায় না। পক্ষান্তরে বাইয়ে সালাম [নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথরের পরিমাপে জায়েজ নেই] কারণ তাতে হস্তান্তর বিলম্ব  
 হয়। আর হস্তান্তরের আগে ঐ পাত্র বা পাথরের ধ্বংস হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। ইমাম আবু  
 হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়াত আছে যে, সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়েও এটা [নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথরের পরিমাপে বিক্রয়]  
 জায়েজ নেই। তবে প্রথমোক্ত মত বিতর্ক ও সুস্পষ্ট।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْبَيْعُ بِطَعَامٍ : قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحَبُوبِ مَكَايِلَةً الْح  
 হলো অন্যান্য শস্য-ফসল। ব্যাকরণবিদ খলীল (র.) বলেন, আরবদের ভাষায় طَعَامٌ বলতে গমকেই বুঝায়। [বিনায়া] হাদীসে

এসেছে۔ **ইমাম কুদুরী (র.) বলেন,** গম, আটা ও অন্যান্য শস্য-কমল পাত্র মেপেও বিক্রয় জায়েজ, অনুমান করেও বিক্রয় করা জায়েজ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তবে অনুমান করে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, পণ্য (مَيْسِر) ও বিনিময়মূল্য (ثَمَن) এক জাতীয় না হতে হবে। যদি এক জাতীয় হয় তাহলে অনুমান করে বিক্রি করা জায়েজ নেই। কারণ, অনুমান করে বিক্রি করা হলে কমবেশি হতে পারে। আর এক জাতীয় দ্রব্য কমবেশি হলে তা সুদ হয়। সুদ যেকোন হারাম, তেমনি যে সব ক্ষেত্রে সুদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাও হারাম। তাই অনুমান করে বিক্রয় জায়েজ নেই।

ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় জায়েজ— এ সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার দু'টি দলিল পেশ করেছেন। একটি নকলী দলিল, অপরটি আকলী দলিল।

**নকলী দলিল :** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস— **إِذَا اخْتَلَفَ الثَّرْعَانِ فَيَبْعُومَا كَيْفَ شِئْنُمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بَدَأُ يَدٍ** অর্থাৎ "যখন পণ্য ও বিনিময়মূল্য ভিন্ন জাতীয় হবে তখন হাতে হাতে লেনদেন করে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি] করে বিক্রয় কর।"

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকলানী (র.) বলেন, আমি বর্ণিত শব্দে হাদীসটি কোথাও পাইনি। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত শব্দে হাদীসটি গরীব (غَرِيب)। মুসলিম শরীফে হাদীসটি নিম্নবর্ণিত শব্দে হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সূত্রে সংকলিত হয়েছে

**إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلِذْمُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالْثَعْبِيرُ بِالْثَعْبِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ يَسَوَاءُ بَدَأُ يَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَصْنَافُ هَذِهِ فَيَبْعُومَا كَيْفَ شِئْنُمَا إِذَا كَانَ بَدَأُ يَدٍ.**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান করে এবং হাতে হাতে বিক্রয় জায়েজ। এসব দ্রব্যের বিক্রয় যদি [সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে না হয়ে] ভিন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে হয় তাহলে হাতে হাতে করে হলে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা, কমবেশি করে, পরিমাপ করে বা অনুমান করে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তবে আদান-প্রদান হবে নগদ, বিক্রয়-মজলিসে পণ্য (مَيْسِر) ও পণ্যের বিনিময় (ثَمَن) হস্তগত করতে হবে। বাকিতে আদান-প্রদান নিষেধ করা হয়েছে।

**আকলী দলিল :** হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, অনুমান করে বিক্রয়ের সুরতে পণ্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণের অজ্ঞতা হস্তান্তর করা ও হস্তগত করার প্রতিবন্ধক নয়। আর ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ সাব্যস্ত করে ঐ অজ্ঞতা, যা হস্তান্তর ও হস্তগত করার প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং এ অজ্ঞতা পণ্যের বাজার দর (فَيْسَةٌ) না জানার মতোই হলো। উদাহরণত কেউ দশ টাকার বিনিময়ে একটি কলম কিনল। কিন্তু তার জানা নেই এর বাজার দর (فَيْسَةٌ) কত, দশ টাকার চেয়ে বেশি, না কম। পণ্যের বাজার দর (فَيْسَةٌ) সম্পর্কে অজ্ঞতা (مُتَعَمِّدٌ إِلَى السَّأَلَةِ) ঋণাড়ার কারণ না হওয়ার কারণে যেমনিভাবে সকলের মতেই তা বৈধতার প্রতিবন্ধক নয়, তেমনিভাবে এখানেও পণ্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা ঋণাড়ার কারণ না হওয়ার কারণে তা বৈধতার প্রতিবন্ধক হবে না।

ফায়দা : দ্রব্যের বাজার দরকে কীমত (قِيَمَةُ) আর ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে দ্রব্যের যে মূল্য নির্ধারণ হয় তাকে সমন (ثَمَنٌ) বলে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجْزُوْ بِأَنَاءٍ يَعْنِيهِ لَا يُعْرَفُ بِمِقْدَارِهِ الْخ : সুরতে মাসআলা হলো, নির্দিষ্ট পাত্র, তাতে কি পরিমাণ চাউল বা আটা ইত্যাদি ধরে, তার ধারণক্ষমতা কতটুকু তা জানা নেই অথবা নির্দিষ্ট পাথর যার ওজন জানা নেই, এমন পাত্র ও পাথরের পরিমাপে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। উদাহরণত এক ব্যক্তি একটি গামলা দেখিয়ে বলল, আমি দশ টাকায় এ গামলা ভর্তি গম দিব অথবা কোনো একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, আমি দশ টাকায় এ পাথরের ওজন পরিমাণ চাল দিব তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। অথচ গামলায় কি পরিমাণ গম ধরবে এবং পাথরের ওজন কতটুকু তা ক্রেতা-বিক্রেতা কারোই জানা নেই।

এর দলিল হলো, যদিও এ ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের (مَبْعُوعٍ) পরিমাণ অজ্ঞাত, কিন্তু এ অজ্ঞাত (مُنْطَوًى إِلَى الْمَنَازَعَةِ) ঝগড়ার কারণ হয় না। কারণ, বেচাকেনায় পণ্যকে উপস্থিত হস্তান্তর করা হয়। আর হস্তান্তরের আগে ঐ পাত্র বা পাথর ধ্বংস হওয়াটা বিরল। তাই সহজেই বিক্রেতা ঐ পাত্র বা পাথর দ্বারা মেপে ক্রেতাকে পণ্য সোপর্দ করে দিবে। ফলে কোনোরূপ ঝগড়া সৃষ্টি হবে না। আর ঝগড়া সৃষ্টির যখন কোনো আশঙ্কা নেই তখন বেচাকেনাও শুদ্ধ হবে। কিন্তু বাইয়ে সালাম [যে ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময়মূল্য আগে দেওয়া হয়, আর উৎপাদনের পর বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তর করে] এ ধরনের পাত্র বা পাথরের পরিমাপে জায়েজ নেই। কারণ বাইয়ে সালামে পণ্য হস্তান্তর বিলম্বিত হয়। আর ততদিনে নির্দিষ্ট করা পাত্র বা পাথর ধ্বংস হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর তাই যদি ঘটে তাহলে বিক্রেতার পণ্য হস্তান্তর বাধ্যহস্ত হবে। ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। ক্রেতা (مُسْلِمٌ لِّنَفْسِهِ) বলবে, নির্দিষ্ট করা পাত্রটি বড় ছিল, আর বিক্রেতা (رَبُّ السَّلَمِ) বলবে, ঐ পাত্রটি আরো ছোট ছিল। আর যে অজ্ঞাত ঝগড়ার কারণ হয় তা বেচাকেনাকে ফাসেদ করে। তাই নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথরের পরিমাপে বাইয়ে সালাম শুদ্ধ নয়।

ফায়দা : যে সব পাত্র কঠিন পদার্থ দ্বারা তৈরি, যা সাধারণত চাপ দিলে বা ব্যবহারে প্রশস্ত হয় না, যেমন, এলুমিনিয়াম, কাঠ, বাঁশ, সিলভার, লোহা প্রভৃতি উপাদানে তৈরি পাত্র, এমন সুনির্দিষ্ট পাত্রের পরিমাপে বিক্রয় জায়েজ আছে। কিন্তু যে সব পাত্র ব্যবহারে বা চাপ দিলে প্রশস্ত হয়, যেমন পাট, তুলা, রাবার, পলিথিনজাত পাত্রাদি দ্বারা বিক্রয় দুরন্ত নয়।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجْزُو الْخ : ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়াত আছে যে, নির্দিষ্ট পাত্র বা নির্দিষ্ট পাথর যার পরিমাণ জানা নেই তার পরিমাপে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমত অর্থাৎ জায়েজ হওয়ার মতামতই অধিক শুদ্ধ ও অধিক শক্তিশালী।



قَالَ : وَمَنْ بَاعَ صَبْرَةَ طَعَامٍ كُلِّ قَفِيزٍ يَذَرُهُمْ جَارَ الْبَيْعِ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يُسَمَّى جُمْلَةً قَفْرَانِهَا، وَقَالَ يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ إِلَى الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالْثَمَنِ فَيُصْرَفُ إِلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ تَزُولَ الْجَهَالَةُ بِتَسْمِيَةِ جَمِيعِ الْقَفْرَانِ أَوْ بِالْكَيْلِ فِي الْمَجْلِسِ، وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ وَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَى كُلِّ ذَرْمٍ فَعَلَيْهِ ذَرْمٌ وَاحِدٌ بِأَلْجَمَاعِ، وَلَهُمَا أَنْ الْجَهَالَةَ يَبِيدُ هُمَا إِزَالَتَهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَا نَجِ كَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا مِنْ عِبْدَيْنِ عَلَى أَنْ الْمُشْتَرَى بِالْخِيَارِ ثُمَّ إِذَا جَارَ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِلْمُشْتَرَى الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا كَيْلَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ سَمِيَ جُمْلَةً قَفْرَانِهَا لِأَنَّهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ أَلَا، فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا إِذَا رَأَاهُ، وَلَمْ يَكُنْ رَأَاهُ وَقَتَ الْبَيْعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্যের স্তুপ প্রতি নির্দিষ্ট পাত্র এক দিরহাম দরে বিক্রি করল, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার এ বিক্রয় শুধুমাত্র এক কফিয়ার মাঝে দূরন্ত হবে। তবে স্তুপের নির্দিষ্ট পাত্রের মোট সংখ্যা উল্লেখ করলে [স্তুপের সব খাদ্য শস্যই বিক্রয় জায়েজ হবে]। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয় সুরতেই [সকল কফিয়ার] বিক্রয় জায়েজ। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ক্রয়-বিক্রয়কে সম্পূর্ণ স্তুপের ক্ষেত্রে কার্যকর করা অসম্ভব। কারণ পণ্য (مَبِيع) ও বিনিময়মূল্য (ثَمَن) উভয়টা অজ্ঞাত (مَجْهُول)। সুতরাং সর্বনিম্ন পরিমাণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে। আর সর্বনিম্ন পরিমাণটা জানাও আছে। তবে মোট কয় পাত্র তার সংখ্যা বলে দেওয়ার দ্বারা বা উপস্থিত মেপে নেওয়ার দ্বারা এ অজ্ঞতা (جَهَالَةٌ) দূর হয়ে যায়। এ মাসআলাটি হয়ে গেল যেমন কেউ স্বীকারোক্তি করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে সব দিরহাম পাবে। তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার উপর এক দিরহাম আবশ্যক হবে। সাহেবাসীন (র.)-এর দলিল হলো, অজ্ঞতা দূর করার বিষয়টি তাদের এখতিয়ারভূক্ত। আর এ ধরনের অজ্ঞতা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন কেউ দুটি গোলামের একটি বিক্রি করল এ শর্তে যে, ক্রেতা [যে কোন একটি নির্দিষ্ট করার] এখতিয়ার পাবে। পর কথা হলো, ইমাম আবু হানীফা (রা.) -এর মতে যখন এক পাত্রে বিক্রয় জায়েজ, তখন ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ তার উপর বিক্রয়-চুক্তি বিভক্ত হয়ে গেছে। এক্রপভাবে [এখতিয়ার পাবে] যখন মজলিসে পরিমাপ করা হবে অথবা মোট কয় পাত্র সে সংখ্যা উল্লেখ করা হবে। কারণ সে এখনি [পণ্য ও বিনিময়মূল্য সম্পর্কে] অবগত হলো। সুতরাং তার এখতিয়ার থাকবে। যেরূপ [এখতিয়ার থাকে] ক্রেতার পণ্য দেখার পর, অথচ সে ক্রয়কালে পণ্য দেখেনি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি খাদ্যশস্যের স্তুপ প্রতি কফিয় [একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ] এক দিরহাম দরে বিক্রয় করে, কিন্তু স্তুপে মোট কত কফিয় আছে তা উল্লেখ না করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এক কফিযে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর অবশিষ্ট শস্যো বিক্রয় বাতিল হবে। যদি মোট কফিয় সংখ্যা উল্লেখ করে অথবা প্রতি কফিয় এক দিরহাম দরে বিক্রয়ের প্রত্যাবের পর উপস্থিত মেপে নেয় তাহলে সকল কফিযেই বিক্রয় জায়েজ হবে। সাহেবাসীন [ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)] বলেন, উভয় সুরতেই সমুদয় শস্য বিক্রয় জায়েজ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাযল (র.)-এর অতিমতই এটিই।

قَوْلُهُ لَهٗ أَنَّهُ تَعَدَّرَ الصَّرْفَ إِلَى الْكُلِّ لِحَالَةِ الْخ :

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষে দলিল : সর্বমোট কত কফিয় তা ইজাবের সময় উল্লেখ করা না হলে পণ্যের পরিমাণ অজ্ঞাত (مَجْهُول) থেকে যায়। আর যেহেতু পণ্যের পরিমাপের উপর ভিত্তি করেই মূল্যের অংক নির্ধারিত হবে তাই বিনিময়মূল্যের পরিমাণও অজ্ঞাত থেকে যায়। পণ্য (مَبِيع) ও বিনিময়মূল্য (نَمْر) উভয়টা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট (مَجْهُول) থাকার কারণে পুরা শস্যান্ত্রপের বিক্রয় সম্ভব নয়। কিন্তু স্ত্রপের মধ্যে ন্যূনতম এক কফিয় পরিমাণ শস্য থাকাটা যেহেতু নিশ্চিত তাই এক কফিয়ার মাঝে বিক্রয় শুদ্ধ সাব্যস্ত হবে। কারণ كُل শব্দকে যখন এমন কিছু দিকে সম্বন্ধ (اصَافَتْ) করা হয় যার শেষ (اِنْتِهَاء) জানা নেই তখন তা সর্বনিম্ন পরিমাণের উপর প্রয়োগ হয়। আলোচ্য মাসআলায় كُل কে فَتْرٍ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মোট কফিয় জানা নেই। তাই এক কফিয়ার বিক্রয় দূরস্ত হবে। তবে ইজাবের পর যদি স্ত্রপে সর্বমোট কত কফিয় আছে বিক্রোতা তা জানিয়ে দেয় কিংবা উপস্থিত মেপে নির্ধারণ করে নেয় তাহলে পণ্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণ জ্ঞাত হওয়ার কারণে পুরা খাদ্যস্ত্রপই বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ وَسَارَ هَذَا كَمَا لَوْ أَقْرَأَ الْخ : كُل শব্দকে শেষ (اِنْتِهَاء) জানা নেই এমন কিছু দিকে সম্বন্ধ (اصَافَتْ) করা হলে তা যে সর্বনিম্ন পরিমাণের উপর প্রয়োগ হয় এর পক্ষে হিদায়া গ্রন্থকার উদাহরণ পেশ করেছেন। কেউ যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে كُل دُرْهَم [সব দিরহাম] পাবে তাহলে সর্বসম্মতভাবে এর দ্বারা তার উপর এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও এক কফিয়ে বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَهٗمَا أَنَّ الْجِهَانَةَ بِيَدَيْهِمَا إِذَا لَحَّتْ الْخ :

সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে দলিল : সাহেবাইন (র.)-এর মতে শস্যের মোট পরিমাণ উল্লেখ করা হোক বা না হোক উভয় সূরতে সমুদয় শস্যের বিক্রয় শুদ্ধ হবে। কারণ এখানে দ্রব্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণে যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা (جَهْلًا) রয়েছে তা দূর করার ব্যবস্থা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ন্তের ভিতরে। ক্রেতা-বিক্রেতার যে কেউ উপস্থিত মেপে তা দূর করতে পারে। আর যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা দূর করা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ন্তের ভিতরে তা বিক্রয় জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তি তার দুটি গোলাম দেখিয়ে বলল, আমি এ দু'গোলামের একটিকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম, তবে দুটির যে কোনো একটি পছন্দ করার এখতিয়ার ক্রেতার থাকবে। এ ক্ষেত্রে পণ্য অজ্ঞাত (مَجْهُول) কিন্তু এ অজ্ঞতা দূর করা যেহেতু ক্রেতার আয়ন্তের ভিতরে এবং তা ঝগড়ার কারণ নয় (مُفَضِّلِي إِلَى الْمَسَارَعَةِ) তাই এ বিক্রয় শুদ্ধ হবে। ক্রেতা যে কোনো একটিকে পছন্দ করে নিবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও যেহেতু অজ্ঞতা (جَهْلًا) দূর করা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ন্তের ভিতরে এবং এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ নয় তাই সমুদয় শস্য বিক্রয় শুদ্ধ হবে! উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের উপর ফাতওয়া।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا جَارَ فِي قَيْصِرٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ الْخ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যেহেতু সমুদয় শস্যের স্থলে এক কফিয় শস্য বিক্রয় শুদ্ধ হবে তাই ক্রেতার তা গ্রহণ করার বা না করার এখতিয়ার থাকবে। কারণ তার চুক্তির (صَفَقَةٍ) ধরন পাল্টে গেছে। তাই সে তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিক্রেতার চুক্তির ধরনও তো পাল্টে গেছে। তাহলে সে কেন এখতিয়ার পাবে না? এর উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, বিক্রেতার চুক্তির ধরন পাল্টে গেছে। কিন্তু এ পরিবর্তন তো তার পক্ষ থেকেই হয়েছে। সে মোট কফিয়ার পরিমাণ উল্লেখ করেনি, কিংবা উপস্থিত মেপে তা নির্ধারণ করেনি, তাই এ পরিবর্তনে সে অবশ্যই সম্মত আছে। আর যখন চুক্তির ধরন পরিবর্তনে সে সম্মত আছে তখন তাকে পুনরায় এখতিয়ার দেওয়ার কি অর্থ?

একপক্ষে যখন বিক্রোতা মোট কফিয়ার সংখ্যা উল্লেখ করবে কিংবা উপস্থিত মেপে কফিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে তখনও ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ সে এখন পণ্যের পরিমাণ ও বিনিময়মূল্যের অংক সম্পর্কে অবগত হলো। তার এ পরিমাণ পণ্যের প্রয়োজন নাও হতে পারে কিংবা এ পরিমাণ অর্থ সে ব্যয় করতে রাজি নয় কিংবা পরিমাণ তার ধারণার চেয়ে কম। ফলে প্রয়োজন পূরণের জন্য তার অন্যত্র থেকে অবশিষ্ট শস্য ক্রয় করতে হবে। খুচরা ক্রয়ে তার খরচ বেশি পড়তে পারে, ইত্যাদি সমস্যার কারণে সে তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। যেমন কোনো ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করল, কিন্তু ক্রয়কালে সে তা দেখেনি। দেখার পর তার ধারণার চেয়ে পণ্যের মান খারাপ হতে পারে। আর এতে সে সম্মত নয়। তাই সে সর্বসম্মতভাবে তা রাখা বা না রাখার এখতিয়ার পাবে। তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা এখতিয়ার পাবে।



وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَسَدَ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا).  
وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُذَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يَسِمِ جُمْلَةَ الدَّرْعَانِ، وَكَذَا كُلُّ  
مَعْدُودٍ مُتَّفَاوِتٍ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا، وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ  
لِمَا بَيَّنَّا، غَيْرَ أَنْ بَيْعَ شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاوُتِ، وَيَبْعُ  
قَفِيزٍ مِنْ صَبْرَةٍ يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ، فَلَا تَفْضِي الْجَهَالَةَ إِلَى الْمَنَازَعَةِ فِيهِ،  
وَتَفْضِي إِلَيْهَا فِي الْأَوَّلِ فَوْضَحَ الْفَرْقُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কেউ যদি একপাল ছাগল প্রতিটি এক দিরহাম দরে বিক্রি করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সমস্ত ছাগলের বিক্রয় অশুদ্ধ হবে। এরূপভাবে কেউ যদি গজ হিসেবে [এক থান] কাপড় বিক্রয় করে, প্রতি গজ এক দিরহাম দরে কিন্তু [কাপড়] মোট কত গজ আছে তা উল্লেখ করেনি [তাহলে এক গজ কাপড়েও বিক্রি শুদ্ধ হবে না।] গণনা করে বিক্রয় হয় এমন যে সব দ্রব্যের এককের মাঝে [দামে] পার্থক্য হয় সেগুলোর বিধানও এরূপই। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সবগুলোতে বিক্রয় জায়েজ। কারণ আমরা পিছনে বলেছি। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পূর্বোক্ত দলিল অনুসারে একটিতে বিক্রয় কার্যকর হবে। কিন্তু পালের একটি ছাগল এবং থানের এক গজ বিক্রয় [পালের একক ও থানের গজের পরস্পরে দামের] পার্থক্যের কারণে জায়েজ নেই। তবে স্তূপের এক কফিয় বিক্রয় জায়েজ। কারণ স্তূপীকৃত পণ্যের পরস্পরে পার্থক্য নেই। তাই তাতে অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে ধাবিত করবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলায় [ছাগলের পাল ও থানের কাপড় বিক্রয়ে] অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে পৌঁছাবে। অতএব [উভয় মাসআলার] পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি একপাল ছাগল প্রতিটি এক দিরহাম দরে বিক্রয় করে, উদাহরণত সে বলল, আমি ছাগলের এ পালটি বিক্রি করলাম, প্রতিটির মূল্য এক দিরহাম, কিন্তু সে পালে মোট কতগুলো ছাগল আছে তা উল্লেখ করেনি। এরূপভাবে কেউ যদি থান কাপড় গজ হিসেবে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে বিক্রি করে উদাহরণত সে বলল, আমি এ কাপড়টি বিক্রি করলাম, প্রতি গজ এক দিরহাম, কিন্তু থানে মোট কত গজ কাপড় আছে তা উল্লেখ করল না, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সমস্ত ছাগলে এবং সমস্ত কাপড়ে বিক্রয় অশুদ্ধ হবে। একটি ছাগলেও এবং এক গজেও বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। এরূপভাবে যে সব দ্রব্য গণনা করে বিক্রি করা হয় কিন্তু দ্রব্যের এককের মাঝে দামে পার্থক্য হয়, যেমন লাউ, তরমুজ, আনারস ইত্যাদি, এগুলোর স্তূপও প্রতিটি এক দিরহাম দরে বিক্রি করলে, যদি মোট সংখ্যা না বলে, একটিতেও বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, এ মাসআলায় তিনটি সুরত রয়েছে—

১. মোট কত গজ বা কতটি ছাগল উল্লেখ করেছে। এরপর বলেছে, প্রতিটি ছাগল বা প্রতি গজ কাপড় এক দিরহাম করে, কিন্তু মোট মূল্য কত আসে তা উল্লেখ করেনি। এ সুরতে সমস্ত পালে এবং সমস্ত থানে বিক্রয় জায়েজ। কারণ পণ্যদ্রব্যও নির্দিষ্ট এবং বিনিময়মূল্যও নির্দিষ্ট।
২. মোট কত টাকা মূল্য আসে তা উল্লেখ করেছে, কিন্তু থানে মোট কত গজ কাপড় বা পালে মোট কতটি ছাগল তা উল্লেখ করেনি। এরপর বলেছে, প্রতিটি ছাগল বা প্রতি গজ কাপড় এক দিরহাম। এ সুরতেও সমস্ত পালে এবং সমস্ত থানে বিক্রয় জায়েজ। কারণ যখন মোট মূল্য উল্লেখ করার পর প্রতিটি ছাগলের বা প্রতি গজ কাপড়ের মূল্য বলে দিল এতে পালে মোট কতটি ছাগল আছে এবং থানে কত গজ কাপড় আছে তা বুঝা যায়।
৩. পালে মোট কতটি ছাগল আছে এবং থানে মোট কত গজ কাপড় আছে এবং মোট মূল্য কত আসে কোনোটিই বলেনি। শুধু প্রতিটি ছাগলের বা প্রতি গজ কাপড়ের মূল্য বলেছে। এটাই কিতাবের মাসআলা। এ সুরতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একটি ছাগলেও এবং এক গজ কাপড়েও বিক্রয় শুদ্ধ নয়। খাদ্যস্তু প্রতি কফিয় এক দিরহাম দরে বিক্রয়ের যে মাসআলা পূর্বে গেছে সে অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একটি ছাগল এবং এক গজ কাপড়ে বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু দু'টি মাসআলায় স্পষ্টত পার্থক্য আছে। খাদ্যশস্য স্তুপের সমস্ত শস্য এক রকম। কিন্তু পালের সমস্ত ছাগল এবং থানের সমস্ত গজ এক সমান নয়। ছাগলের মধ্যে পরস্পরে পার্থক্য স্বীকৃত। আর পূর্বযুগের থান কাপড়ের সব গজ এক রকম হতো না। কোনো গজ ভাল, কোনো গজ খারাপ হতো। এমতাবস্থায় পালের একটি ছাগলের মধ্যে কিংবা থানের এক গজ কাপড়ে যদি বিক্রয় সহীহ ধরা হয় তাহলে সেই একটি ও এক গজ নির্বাচন নিয়ে ঝগড়া বাধবে: ক্রেতা চাইবে দেখে শুনে বড় সাইজের একটা নিতে, কাপড়ের যে গজ সবচেয়ে ভাল তা নিতে আর বিক্রেতা চাইবে ছোটখাটো বা মাঝারি একটি দিতে। আর যা ক্রেতা-বিক্রেতাকে ঝগড়ার দিকে পৌছায় (مُنْفِئِي إِلَى الْمَنَازَعَةِ) তা জায়েজ নেই। তাই পালের একটি ছাগলেও এবং কাপড়ের এক গজেও বিক্রয় জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে খাদ্যশস্যের স্তুপ পুরাটা দামের হিসেবে এক রকম। সেখানে এক কফিয় জায়েজ হলে ঝগড়ার আশঙ্কা নেই, বিধায় এক কফিযে বিক্রয় শুদ্ধ।
- সাহেবাইন (র.)-এর মতে ছাগলের পুরা পালে এবং কাপড়ের পুরা থানে বিক্রয় জায়েজ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ মতই পোষণ করেন। তাদের দলিল হলো, পালে মোট কতটি ছাগল আছে এবং থানে মোট কত গজ আছে এর অজ্ঞতা (جَهْلًا) দূর করা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে। উপস্থিত গুণে নিলেই এ অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। আর যে অজ্ঞতা দূর করা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে তা ঝগড়ার কারণ হয় না। তাই তা বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

قَالَ : وَمِنْ ابْتِاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَى أَثَرِهَا مِائَةٌ فَمِنْ بَيِّنَاتِهِ دَرَاهِمُ فَوْجَدَهَا أَقْلَ كَانَ الْمُشْتَرَى بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحَصِّصِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَّ الْبَيْعَ لَتَفَرُّقِ الصَّفَقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّمَامِ ، فَلَمْ يَتِمَّ رِضَاؤُهُ بِالْمَوْجُودِ وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مُقْدَارٍ مُعَيَّنٍ وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো শস্যস্তুপ একশ' কফিয় আছে এ শর্তে একশ' দিরহামে ক্রয় করল, অতঃপর শস্য [-র পরিমাণ তার চেয়ে] কম পেল তাহলে ক্রেতার অর্থতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে যা উপস্থিত আছে তাই তদনুপাতে দাম দিয়ে গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে বিক্রয়-চুক্তি ভেঙ্গে দিবে। কারণ [বিক্রয়-চুক্তি] পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই তার চুক্তির ধরন পাল্টে গেছে। ফলে বর্তমান পরিমাণ দ্বারা তার সম্ভূষ্ট পূরণ হয়নি। আর যদি শস্য [একশ' কফিয়ার চেয়ে] বেশি পায় তাহলে অতিরিক্ত শস্য বিক্রোতার। কারণ বিক্রয় নির্দিষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে। আর বস্তুর পরিমাণ এখানে তার সীফাত বলে বিবেচিত নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি খাদ্যশস্যের স্তুপ একশ' কফিয় আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে কিন্তু হস্তগত করার সময় তার চেয়ে পরিমাণে কম পায়, উদাহরণত নব্বই কফিয় পায়, তাহলে ক্রেতা তা গ্রহণ করা বা না করার অর্থতিয়ার পাবে। যদি সে গ্রহণ করতে চায় তাহলে মওজুদ নব্বই কফিয় শস্যকে নব্বই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। আর যদি বিক্রয়-চুক্তি (فُتِدَ) ভঙ্গ করতে চায় তা তার জন্য জায়েজ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও (র.) এ অভিমতই পোষণ করেন। শর্তকৃত পরিমাণের চেয়ে শস্য কম হলে ক্রেতা কেন অর্থতিয়ার পাবে এ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার (র.) যে আকলী দলিল পেশ করেছেন, তার সারমর্ম হলো- ক্রেতা চুক্তি করেছে একশ' কফিয়ার, কিন্তু এখন পাচ্ছে নব্বই কফিয়। সে এখনো পণ্য (مَيْع) হস্তগত করেনি বিধায় বিক্রয়-চুক্তি এখনো পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি, অথচ তার চুক্তিকৃত পরিমাণে ঘাটতি এসেছে। আর মওজুদ পরিমাণে তথা নব্বই কফিয়ে সে সম্ভূষ্ট নয়। কারণ সে হয়তো একাধিক দোকান থেকে পৃথক পৃথক চুক্তিতে অল্প অল্প না কিনে একই দোকান থেকে এক সাথে একশ' কফিয় কেনার ইচ্ছা করে থাকবে। অথচ এ স্থলে পণ্য-ঘাটতি তার সে ইচ্ছা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সঙ্গত কারণেই তাকে উক্ত পণ্য গ্রহণ করা/ না করার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য গ্রহণ করতে সম্মত হলে তাকে আনুপাতিক দাম দিলেও চলবে। কারণ খাদ্যশস্য সমমান সম্পূর্ণ সামগ্রীর (مُتَمَّال) অন্তর্ভুক্ত বিধায় এর এক কফিয়ার সাথে অন্য কফিয়ার মূল্যে তারতম্য হয় না। সুতরাং যে পরিমাণ শস্য মওজুদ আছে অর্থাৎ নব্বই কফিয় তা নব্বই দিরহামে গ্রহণ করা হলে কোনোরূপ বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আর যদি শস্যের পরিমাণ একশ' কফিয়ার চেয়ে বেশি হয় তাহলে অতিরিক্তটুকু বিক্রোতার; তা ক্রেতা নিতে পারবে না। কারণ, বিক্রয় নির্দিষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে। আর যেখানে বিক্রয় নির্দিষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয় সেখানে অতিরিক্তটুকু তাতে शामिल হয় না। হ্যাঁ, যদি অতিরিক্তটুকু وَصْفٌ হতো তাহলে পণ্যের نَائِغ হিসেবে शामिल হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর যা অতিরিক্ত হয়েছে তা وَصْفٌ নয়। সুতরাং বিক্রয় চুক্তি তাকে शामिल করবে না।



قَوْلُهُ وَالْقَدَرُ لِنَسَبِ بَوْصِفٍ : মাশায়েখ কেরাম قَدَرُ ও وَصَفُ -এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। টুকরা বা ভাগ করার দ্বারা যে সব দ্রব্য দোষযুক্ত হয়ে পড়ে, উদাহরণত: পিস কাপড়, শাড়ি, জুকা প্রভৃতি তৈরি পোশাক, এগুলো টুকরা করলে বা এগুলো থেকে এক গজ, আধা গজ কাপড় কেটে নিলে সম্পূর্ণ কাপড়টিই বাতিল হয়ে যায় কিংবা তার মূল্যে ঘাটতি আসে, এধরনের পণ্যে কমবেশি এবং পরিমাপ হলো وَصَفُ তথা বস্তুর গুণ বা অবস্থা। আর وَصَفُ -এর বিনিময়ে মূল্য আসে না। وَصَفُ টা পণ্যের تَابِعُ হয়ে থাকে। সুতরাং কেউ যদি পিস কাপড় এ শর্তে ক্রয় করে যে, তাতে দশ গজ আছে, কিন্তু মেপে দেখা গেল তাতে এক গজ বেশি আছে তাহলে এ অতিরিক্ত এক গজ ক্রেতা পাবে এবং এর জন্য তাকে অতিরিক্ত কোনো পয়সা দিতে হবে না। কারণ অতিরিক্ত গজটি পণ্যের تَابِعُ হিসেবে পণ্যের সাথে ক্রেতার মালিকানায় এসে যাবে, আর وَصَفُ -এর বিপরীতে যেহেতু কোনো মূল্য আসে না তাই বিক্রেতা অতিরিক্ত পয়সা পাবে না।

আর যে সব দ্রব্য টুকরো বা ভাগ করার দ্বারা ক্রটিযুক্ত হয় না, উদাহরণত একশ' কফিয় শস্য আছে, তা থেকে পাঁচ/ দশ কফিয় শস্য আলাদা করলে অবশিষ্ট শস্যগুলো বাতিলও হয় না এবং তার দরও পড়ে যায় না। এমন সব পণ্যে পরিমাপ তথা কমবেশি হওয়ার বিষয়টি মূল্যমান পাওয়ার উপযোগী। অতএব আলোচ্য মাসআলায় যদি কেউ একশ' কফিয় শস্য ক্রয় করার পরে দেখে পাঁচ কফিয় বেশি আছে। তাহলে অতিরিক্ত পাঁচ কফিয়ার মালিকানা বিক্রেতার থাকবে। একশ' কফিয় পণ্যের تَابِعُ হিসেবে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হবে না।

অবশ্য ক্রয়-বিক্রয়ে وَصَفُ টা যদি মুখ্য হয়, উদাহরণত তৈরি পোশাক, জায়গা-জমি, বাড়ি প্রভৃতি যদি হাত বা ফিট হিসেবে বিক্রয় হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতি হাত/গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যেমন বলা হলো, এ কাপড়টিতে দশ গজ আছে, দাম একশ' টাকা, প্রতি গজ দশ টাকা, তাহলে وَصَفُ টা মূল্যমান বা পাওয়ার উপযোগী হয় এবং সে কারণে পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে দামেও তারতম্য ঘটে।

وَمِنْ إِبْتِرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ بِعَشْرَةٍ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةٍ  
فَوَجَدَهَا أَقْلَ فَاَلْمُشْتَرَى بِالْخِبَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِأَنَّ  
الذِّرَاعَ وَصَفٌ فِي الثَّوْبِ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ وَالْوَصْفُ لَا يُقَابِلُهُ  
شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ كَأَطْرَافِ الْحَيَوَانِ فَلِهَذَا يَأْخُذُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْفَضْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ  
الْمِقْدَارَ يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ فَلِهَذَا يَأْخُذُهُ بِحَصَّتِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ  
الْمَذْكُورِ لِتَغْيِيرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَخْتَلُ الرِّضَا وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِي  
سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرَى وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ صَفَةٌ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا بَاعَهُ  
مَعِيبًا فَإِذَا هُوَ سَلِيمٌ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোনো কাপড় দশ গজ আছে এ শর্তে দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে কিংবা কোনো জমি একশ' গজ আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে, অতঃপর সে তা তার চেয়ে কম পায় তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, যদি চায় পুরো দাম দিয়ে মওজুদ কাপড় বা জমিটি নিবে, আর যদি চায় [তা] পরিত্যাগ করবে। কারণ কাপড়ে গজ একটি গুণ (وَصْفٌ)। তুমি কি দেখ না যে, গজ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি রূপ। আর গুণের (وَصْفٌ) বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ হয় না। যেমন প্রাণীর হাত, পা ইত্যাদি। তাই কাপড় বা জমিটি ক্রেতা পুরো দাম দিয়ে নিবে। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলা ভিন্ন। কারণ পরিমাপের বিপরীতে মূল্য হয়। তাই [সে ক্ষেত্রে] মওজুদ শস্যকে গ্রহণ করবে তদনুপাত দাম দিয়ে। তবে [আলোচ্য মাসআলায়] উল্লিখিত গুণের অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ, [উল্লিখিত গুণের অনুপস্থিতির কারণে] চুক্তিকৃত পণ্য পাল্টে গেছে। ফলে ক্রেতার সম্মতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আর যদি কাপড় বা জমিটিকে ধার্যকৃত গজের চেয়ে বেশি পায় তাহলে অতিরিক্তটুকু ক্রেতার। এতে বিক্রেতার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। কারণ গজ হলো গুণ (وَصْفٌ)। সুতরাং এটা ঐ বেচাকেনার মতো হলো যে, বিক্রেতা একটি ক্রটিযুক্ত পণ্য বিক্রয় করেছে, কিন্তু পরে দেখা গেল তা ক্রটিমুক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি কাপড় দশ গজ আছে এ শর্তে দশ দিরহামের বিনিময়ে অথবা একটি জমি একশ' গজ আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল, কিন্তু ক্রয়ের পর দেখা গেল তাতে কাপড় বা জমি যথাক্রমে দশ গজ ও একশ' গজের চেয়ে কম আছে, তাহলে ক্রেতা তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। তবে গ্রহণ করলে পুরো দামে গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে কাপড় বলতে খান কাপড় বা এমন কাপড় বুঝানো হয়নি, যা থেকে আধা বা এক গজ কাপড় কেটে নিলে তার ক্ষতি সাধিত হয় না এবং দাম কমে যায় না। বরং পিস হিসেবে বিক্রয় হয়, গজ বা হাত হিসেবে নয় এমন কাপড় উল্লেখ্য। যেমন, জুকা, শাড়ি, লুঙ্গি, খ্রীপিস ইত্যাদি। এ শ্রেণীর বিভিন্ন মাপের কাপড় সাধারণতঃ একই দামে বেচাকেনা হয় : ১০/ ১১/ ১২ হাতের শাড়ি সমান দরেই বিক্রয় হয়। তাই ইজাবের সময় এ ধরনের কোনো কাপড়ের গজ, ফুট, ইঞ্চি উল্লেখপূর্বক দাম নির্ধারণ করে থাকলেও মোট দাম বিভাজ্য হয়ে প্রতি গজ/ফুট/ইঞ্চির বিপরীতে আরোপিত হয় না। অর্থাৎ ১০ হাত মাপের শাড়ির দাম একশ' টাকা হওয়ার মানে এ নয় যে, এর প্রতি হাতের দাম দশ টাকা। তাই ১০ হাতের জায়গায় ১১ হাত হলে বা ৯ হাত হলে দামে তারতম্য ঘটে না। জমির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। প্রতি শতাংশ/ কাঠা/ গজের বিপরীতে যদি দাম ধার্য না করে মোট জমির দাম ধার্য করা হয় তাহলে পুরো দামটা বিভাজ্য হয়ে প্রতি শতাংশ/ কাঠা/ গজের বিপরীতে আরোপিত হয় না। এ ধরনের কোনো কাপড়, যেমন শাড়ি এগার হাত বলে বিক্রি করার পর যদি দেখা যায় তা দশ হাত কিংবা জমি একশ' হাত বলে বিক্রি করার পর যদি দেখা যায় তা পঁচানব্বই হাত তবে ক্রেতার নেওয়া বা না নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে, কিন্তু নিলে পুরো দামেই নিতে হবে।

পুরো দামে কেন নিতে হবে? কারণ জমি ও কাপড়ে গজ হলো وَصْف, আমরা দেখি, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকেই গজ বলে। আর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বস্তুর [গুণ] وَصْف হয়ে থাকে। আর [গুণ] وَصْف -এর বিপরীতে মূল্যের অংশ হয় না অর্থাৎ وَصْف -এর কমবেশিতে দাম কমবেশি হয় না। কারণ এ ধরনের কাপড় ও জমি সাধারণত (وَصْف) গজ/ফিট হিসেবে বিক্রয় হয় না; বরং গোটা বস্তু ধরে বিক্রয় হয়। অতএব যদি ক্রেতা কাপড় বা জমি নিতে চায় তাহলে দাম কম দিতে পারবে না। বরং পুরো দামেই নিতে হবে। যেমন কেউ একটি বান্দি ক্রয় করল। বান্দিটি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় তার একটি চোখ কানা হয়ে গেল কিংবা তার কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। চোখ সুস্থ থাকা বা কানা হওয়া এটা وَصْف, এ জন্য ক্রেতা ঐ বান্দির দাম কম দিতে পারবে না। পুরো দাম দিতে হবে। তবে পূর্বোক্ত মাসআলা এ থেকে ভিন্ন অর্থাৎ একশ' কফিয় আছে শর্তে শস্যভূগু কেনার পর নব্বই কফিয় পেলে সে ক্ষেত্রে পুরো দাম দিতে হয় না। কারণ খাদ্যশস্য পরিমাপ তথা কমবেশি হওয়ার বিষয়টি মূল্যমান পাওয়ার উপযোগী।

তবে আলোচ্য মাসআলায় কাপড় বা জমি শর্তকৃত গজের চেয়ে কম পেলে ক্রেতার না নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, ক্রেতা মূলত পণ্যের এ গুণের প্রতি খেয়াল করেই তা খরিদ করতে সম্মত হয়েছিল, অথচ সেটা এখন অবর্তমান। সুতরাং তার সম্মতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তাই সে এখতিয়ার পাবে।

আর যদি কাপড় দশ গজের চেয়ে বেশি বা জমি একশ গজের চেয়ে বেশি পায় তাহলে অতিরিক্তটুকু ক্রেতার হবে। বিক্রেতার দাম নিয়ে আপত্তি ভোলার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। কারণ وَصْف-এর কমবেশিতে দামে কমবেশি হয় না। আর وَصْف হয় اَمْل-এর نَائِع। তাই পণ্যের نَائِع হিসেবে অতিরিক্তটুকু ক্রেতার হয়ে যাবে। এর উদাহরণ হলো, বিক্রেতা একটি দ্রব্যকে ক্রটিযুক্ত হিসেবে বিক্রি করল, কিন্তু পরে দেখা গেল তা ক্রটিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অতিরিক্ত দাম দাবি করতে পারে না। কারণ ক্রটিযুক্ত বা ক্রটিযুক্ত হওয়া وَصْف, আর وَصْف এর বিপরীতে কোনো মূল্য (ثَمَن) হয় না।

وَلَوْ قَالَ بَعْتُكُمَهَا عَلَىٰ أَنَّهُ مِائَةٌ ذِرَاعٌ بِمِائَةِ ذِرْهِمٍ كُلِّ ذِرَاعٍ بِذِرْهِمٍ قَوَّجَهَا نَاقِصَةً  
فَالْمُسْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحَصْنَتِهَا مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، لِأَنَّ الْوَصْفَ  
وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِكَيْفَ صَارَ أَصْلًا بِإِفْرَادِهِ بِذِكْرِ الثَّمَنِ ، فَنَزَلَ كُلُّ ذِرَاعٍ بِمَنْزِلَةِ ثَوْبٍ ،  
وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ أَخِذًا لِكُلِّ ذِرَاعٍ بِذِرْهِمٍ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَهُوَ  
بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيعَ كُلِّ ذِرَاعٍ بِذِرْهِمٍ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَّ النَّبِيعَ ، لِأَنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ  
الرِّبَادَةُ فِي الدَّرَجِ تَلَزَمَتْ زِيَادَةُ الثَّمَنِ ، فَكَانَ نَفْعًا بِشُرُوبِهِ ضَرَرٌ قُبَيْتَحَيْرٌ ، وَإِنَّمَا  
يَلْزَمُهُ الرِّبَادَةُ ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ صَارَ أَصْلًا ، وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْأَقْلَى لَمْ يَكُنْ أَخِذًا  
بِالْمَشْرُوطِ .

অনুবাদ : যদি বিক্রেতা বলে, আমি কাপড়টি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে, একশ' গজ আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম, অতঃপর ক্রেতা কাপড়টি তার চেয়ে কম পেল তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে মওজুদ কাপড়টি তদানুপাতিক দাম দিয়ে গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগ করবে। কারণ, গুণ (وَصْف) যদিও বস্তুর অনুগামী, কিন্তু তার বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণের কারণে তা এখানে মূল বস্তুর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং প্রতি গজ কাপড়কে স্বতন্ত্র একটি কাপড়ের পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে। আর মওজুদ কাপড়কে তদানুপাতিক দাম দিয়ে গ্রহণ করা হবে। কারণ যদি ক্রেতা কাপড়টিকে পুরো দামে গ্রহণ করে তাহলে সে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে গ্রহণকারী হবে না। আর যদি ক্রেতা কাপড়টি [একশ' গজের চেয়ে] বেশি পায় তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। ইচ্ছা করলে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে পুরো কাপড়টি নিবে, ইচ্ছা করলে বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করবে। কারণ, অতিরিক্ত গজগুলো যদি তার নিতে হয় তাহলে অতিরিক্ত মূল্য তার উপর আবশ্যক হবে। আর এটা এমন লাভ, যাতে ক্ষতি মিশ্রিত আছে। সুতরাং সে এখতিয়ার পাবে। আর তার উপর অতিরিক্ত মূল্য আবশ্যক হওয়ার কারণ পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি যে, গুণ এখানে মূল বস্তুর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আর যদি ক্রেতা তা কম দামে গ্রহণ করে তাহলে সে শর্তানুযায়ী গ্রহণকারী হলে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি কাপড় বা জমি গজ/ফিট/হাত হিসেবে বিক্রি করে এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতি হাত/গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করে, যেমন বলল, এ কাপড়টিতে একশ' গজ আছে, দাম একশ' দিরহাম, প্রতি গজ এক দিরহাম, অতঃপর ক্রেতা তা কম পেল, ধরুন নব্বই গজ পেল, তাহলে ক্রেতার তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকবে। যদি গ্রহণ করে তবে মওজুদ কাপড়ের আনুপাতিক মূল্য দিয়ে অর্থাৎ নব্বই গজ নব্বই দিরহাম দিয়ে গ্রহণ করবে।

পূর্বেক্ত মাসআলার সঙ্গে আলোচ্য মাসআলার পার্থক্য হলো, পূর্বেক্ত মাসআলায় স্বতন্ত্রভাবে কাপড়ের প্রতি হাত বা গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি; বরং গোটা কাপড় ধরে বিক্রি করা হয়েছে, আর আলোচ্য মাসআলায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতি গজের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে প্রতি গজের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হলে গজ, যা মূল বস্তুর অনুবর্তী ণ তা মূল বস্তুর মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং সে কারণে পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে দামেও তারতম্য ঘটে। তখন প্রতি গজকে একটি পৃথক কাপড় গণ্য করা হয়। অতএব একশ' গজ একশ' দিরহাম, প্রতি গজ এক দিরহাম -এর অর্থ দাঁড়ায় একশ'টি কাপড় একশ' দিরহাম, প্রতিটি কাপড় এক দিরহাম। এ সূরতে কাপড়ের পরিমাণ কম পাওয়া গেলে, উদাহরণত নকই গজ পাওয়া গেলে নকই দিরহামের বিনিময়ে নিবে। কারণ, তা না হলে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে পড়বে না। অথচ প্রতি গজ এক দিরহাম দরেই বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

আর যদি কাপড়ের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়, উদাহরণত একশ' দশ গজ পাওয়া গেল তাহলে ক্রেতার তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকবে। কিন্তু গ্রহণ করলে পুরো কাপড়টি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকার কারণ এই যে, ক্রেতা যদি অতিরিক্ত দশ গজ নিতে বাধ্য হয় তাহলে অতিরিক্ত তার আরো দশ দিরহাম দিতে হবে। আর অতিরিক্ত দশ দিরহাম প্রদানে সে সম্মত নয়। অতিরিক্ত দশ গজ পেলে তার লাভ হতো, কিন্তু এটা এমন লাভ যার সঙ্গে ক্রেতাকে দশ দিরহামের ক্ষতিও বহন করতে হবে। অতএব ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। আর ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করলে অতিরিক্ত দশ গজের বিনিময়ে দশ দিরহাম দিতে হবে। কারণ, উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রতি গজের বিনিময়ে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে গজ أَصْل -এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। আর أَصْل এর বিপরীতে মূল্য مَنْع আসে। তাই অতিরিক্ত এ দশ গজের বিপরীতে মূল্য আসবে। আর যদি পুরো একশ' দশ গজ কাপড় একশ' দিরহামে ক্রেতা গ্রহণ করে তাহলে তো প্রতি গজ এক দিরহাম দরে পড়ে না। অথচ প্রতি গজ এক দিরহাম দরে বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, শস্যস্তুপ বিক্রয়ের পূর্বেক্ত মাসআলায় গেছে, যদি একশ' কফিয় একশ' দিরহাম দরে বিক্রয় হয় আর পরে ক্রেতা একশ' কফিয়ার চেয়ে বেশি পায় তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে না অর্থাৎ তাকে একশ' কফিয় একশ' দিরহাম দিয়ে নিতে হবে এবং অতিরিক্ত কফিয় শস্য বিক্রোতার হবে। আর আলোচ্য মাসআলায় দেখা গেল যে, যদি একশ' গজ কাপড় প্রতি গজ এক দিরহাম দরে একশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করার পর ক্রেতা একশ' গজের চেয়ে কাপড় বেশি পায় তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে। যদি গ্রহণ করে তাহলে অতিরিক্তটুকুও গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্তটুকু বিক্রোতার হবে না। প্রশ্ন হলো, এ দু'মাসআলায় পার্থক্য কেন? অথচ শস্যস্তুপের মাসআলায় কফিয় যেমন قَنْز আলোচ্য মাসআলায় প্রতি গজের বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে গজও তেমনি 'পরিমাণ' তাহলে পার্থক্য কেন? আল্লামা আইনী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, এ দু'মাসআলার মাঝে পার্থক্য আছে। কাপড়ে অতিরিক্ত গজ যদি বিক্রয়-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে বিক্রয়-চুক্তি عَقْد ফাসদ হয় যে বাবে। কারণ এক/দু'গজ কাপড় কেটে নিলে মূল কাপড়টি নষ্ট হয়ে যাবে, আর কেটে নেওয়া কাপড় তেমন কোনো কাজেও লাগবে না। পক্ষান্তরে শস্যস্তুপে অতিরিক্ত কফিয় যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে বিক্রয়-চুক্তি ফাসদ হয় না। কারণ, শস্যস্তুপ থেকে অতিরিক্ত কফিয় শস্য আলাদা করে নিলে শস্যস্তুপের তাতে ক্ষতি হয় না।

وَمِنْ اشْتَرَى عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمِيمٍ فَابْتِيعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) ، وَقَالَ هُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ اشْتَرَى عَشْرَةَ أَنْسِهِمْ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ جَازَ فَوْى قَوْلِهِمْ جَيِّعًا ، لَهُمَا أَنَّ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عَشْرُ الدَّارِ فَاشْبَهَ عَشْرَةَ أَنْسِهِمْ وَلَهُ أَنَّ الدِّرَاعَ اسْمٌ لِمَا يُذْرَعُ بِهِ ، وَاسْتَعْبِرَ لِمَا يَحْلُهُ الدِّرَاعُ ، وَهُوَ الْمُعَيَّنُ دُونَ الْمَشَاعِ ، وَذَلِكَ غَيْرَ مَعْلُومٍ بِخِلَافِ السَّهْمِ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ جُمْلَةَ الذَّرْعَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الْخَصَائُ لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ .

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি একশ' গজের বাড়ি বা গোসলখানা থেকে দশ গজ ক্রয় করলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসদ। সাহেবাইন (র.) বলেন, এটা জায়েজ। আর যদি একশ' অংশের দশ অংশ ক্রয় করে তবে সকলের ঐকমত্যে তা জায়েজ। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে- একশ' গজ বাড়ির দশ গজ হলো বাড়ির এক দশমাংশ। সুতরাং তা [একশ' অংশের] দশ অংশের মতো। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- গজ হলো ঐ জিনিসের নাম, যা দ্বারা মাপা হয়। যে লাঠি বা ফিতায় গজ ধারণ করে তাকে রূপক অর্থে গজ বলা হয়। আর তা নির্দিষ্ট, অনির্ধারিত নয়। কিন্তু এ নির্দিষ্ট পরিমাণটা [বাড়ির ঠিক কোন স্থানটি তা এ বিক্রয়ে] অজানা। কিন্তু [একশ' অংশের দশ] অংশ [তা থেকে ভিন্ন]। স্থানটি সর্বমোট কত গজের তা ক্রেতা জ্ঞাত থাকুক, আর না থাকুক ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তাতে কোনো পার্থক্য নেই। এটাই বিতর্ক অভিমত। কারণ, [সর্বমোট গজ জানা থাকলেও] অজ্ঞতা থেকে যায়। ইমাম খাসুসাফ (র.) যা বলেছেন, তা এর বিপরীত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একশ' গজের বাড়ি বা গোসলখানা থেকে দশ গজ ক্রয় করলে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এ কেনাবেচা জায়েজ নেই। সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। কিন্তু যদি একশ' অংশের বাড়ি বা গোসলখানার দশ অংশ ক্রয় করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে জায়েজ আছে। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.) একশ গজ থেকে দশ গজ ক্রয় করা আর একশ' অংশের দশ অংশ ক্রয় করার মাঝে পার্থক্য করেছেন। কিন্তু সাহেবাইন (র.) পার্থক্য করেননি। এ মতবিরোধের ভিত্তি মূলত এ কথাটির উপর যে, একশ' গজের দশ গজ কি একটি নির্ধারিত পরিমাণ (مُعَيَّن) , না অনির্ধারিত পরিমাণ (مُشَاع) ? সাহেবাইন (র.)-এর মতে অনির্ধারিত পরিমাণ। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নির্ধারিত পরিমাণ। একশ' অংশের দশ অংশ যে একটি অনির্ধারিত পরিমাণ এ বিষয়ে সকলে একমত। অনির্ধারিত পরিমাণ মানে দশ অংশ বাড়ির নির্দিষ্ট কোনো দিক বা স্থান জুড়ে নয়; বরং একশ' অংশের বাড়ির পুরো জমিতে তা ছড়িয়ে আছে। উদাহরণত

দু'ব্যক্তি মিলে একশ' টাকার বিনিময়ে একটি বাড়ি ক্রয় করল। একজন দিল নব্বই টাকা, অপরজন দিল দশ টাকা। এখন পুরো বাড়ির প্রতি ইঞ্চি জমিতে দু'জন অংশীদার। তবে একজনের অংশ নব্বই, অপরজনের অংশ দশ। সাহেবাইন (র.)-এর মতে একশ' অংশের দশ অংশ যেমন অনির্ধারিত পরিমাণ, তেমনি একশ' গজের দশ গজও অনির্ধারিত পরিমাণ। একশ' অংশের দশ অংশ বলতে যেমন বাড়ির এক দশমাংশ বুঝায় তেমনি একশ গজের দশ গজ বলতেও বাড়ির এক দশমাংশ বুঝায়। সুতরাং উভয়টার হুকুম এক হবে। একশ' অংশের দশ অংশ বিক্রয় সকলের ঐকমত্যে জায়েজ, সুতরাং একশ' গজের দশ গজও বিক্রয় জায়েজ হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একশ' অংশের দশ অংশ আর একশ' গজের দশ গজ এক নয়। একশ' অংশের দশ অংশ অনির্ধারিত (مُسَاعٍ) আর একশ' গজের দশ গজ নির্ধারিত (مُعَيَّن)। কারণ গজ (ذِرَاع) একটি নির্ধারিত পরিমাণ। নির্ধারিত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে গজ বলে। লাঠি বা ফিতা যা দ্বারা গজের পরিমাপ করা হয় তাকে রূপক অর্থে গজ বলে। গজ যেহেতু নির্ধারিত, তাই বিক্রয়ে একশ' গজের দশ গজ বাড়ির ঠিক কোন দিক দিয়ে, তা অজ্ঞাত (مَجْهُول)। আর এ অজ্ঞাত ঝগড়ার কারণ (مُنْطَى إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয়। বিক্রেতা চাইবে বাড়ির যে অংশ পেছনে বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সেদিক থেকে দিতে, আর ক্রেতা চাইবে বাড়ির সামনের অংশে বা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে দিক সেদিক দিয়ে নিতে। আর যে অজ্ঞাতা ঝগড়ার কারণ হয় তা বিক্রয়-চুক্তিকে (عَقْد) ফাসেদ করে দেয়। পক্ষান্তরে একশ' অংশের দশ অংশ বলতে জমির নির্ধারিত কোনো স্থান বুঝায় না। তা সম্পূর্ণ একশ' অংশে ছড়িয়ে থাকে। আর এ ধরনের অজ্ঞাতা ঝগড়ার কারণ হয় না। কারণ বন্টনের সময় মীমাংসা করে নিবে।

الخ : قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَ بَيْنَ مَا إِذَا الْخ : হেদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বাড়ি বা গোসলখানায় মোট কত গজ জমি আছে তা বিক্রয়কালে উল্লেখ করুক বা না করুক উভয় সুরতে ইমাম আজম (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসেদ। উল্লেখ করার সুরত হলো, বিক্রেতা বলল, আমি এই একশ' গজ বাড়ির দশ গজ বিক্রি করলাম। উল্লেখ না করার সুরত হলো, বিক্রেতা বলল, আমি এ বাড়ির দশ গজ বিক্রি করলাম এবং বাড়িটি সর্বমোট কত গজের উপর আছে তা বলল না। উভয় সুরতে বিক্রয় ফাসিদ এটাই বিশুদ্ধমত। তবে খাস্সাফ (র.) বলেন, যদি বাড়িটি ঠিক কত গজের উপর তা যদি জানা না থাকে তখন ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি মোট জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয় তবে বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

وَلَوْ اشْتَرَىٰ عَدْلًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَثْوَابٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ أَوْ أَحَدُ عَشْرَةٍ فَسَدَ الْبَيْعُ لِبَهَالَةِ الْمَيْبُوعِ أَوْ الثَّمَنِ ، وَلَوْ بَيَّنَّ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا جَازًا فِي فَصْلِ التَّقْصَانِ بِقِيَمِهِ ، وَلَهُ الْخِيَارُ ، وَلَمْ يَجْزُ فِي الرَّبَادَةِ لِبَهَالَةِ الْعَشْرَةِ الْمَيْبُوعَةِ ، وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) لَا يَجُوزُ فِي فَصْلِ التَّقْصَانِ آيَضًا ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، يَخْلَافُ مَا إِذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا هَرَوْبَانِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرُوءٌ حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا ، وَإِنْ بَيَّنَّ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لَأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ فِي الْمَرُوءِ شَرْطًا لِلْعَقْدِ فِي الْهَرُوءِ ، وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَلَا قَبُولٌ يَشْتَرِطُ فِي الْمَعْدُومِ ، فَافْتَرَقَا .

অনুবাদ : যদি কেউ কাপড়ের একটি গাঁইট এ শর্তে ক্রয় করে যে, তাতে দশটি কাপড় আছে, কিন্তু পরে দেখা গেল তাতে নয়টি বা এগারটি কাপড় রয়েছে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ। কারণ [এ ক্ষেত্রে] বিক্রয় পণ্য অথবা বিনিময়মূল্য অজ্ঞাত থাকে। যদি প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য বলে দেয় তাহলে [উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে] কমের সুরতে তদানুপাতিক দামের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ক্রেতার [নেওয়া বা না নেওয়ার] অখতিয়ার থাকবে। কিন্তু বেশির সুরতে বিক্রয় জায়েজ নেই। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিক্রয়পণ্য কোন দশটি তা অজ্ঞাত থাকে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, কমের সুরতেও বিক্রয় জায়েজ নেই। কিন্তু তা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি এ শর্তে দু'টি কাপড় ক্রয় করে যে, কাপড় দু'টি হিরাতী, কিন্তু পরে দেখা যায় তার একটি মারবী, তাহলে এ ক্ষেত্রে দু'টির কোনোটিকেই বিক্রয় জায়েজ নেই; যদিও প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন দাম উল্লেখ করা হয়। কারণ, বিক্রেতা হিরাতী কাপড়ের বিক্রয়ে মারবী কাপড়ের কবুলকে শর্ত করেছে। আর এটা ফাসিদ শর্ত। পক্ষান্তরে অবিদ্যমান জিনিসে কবুলের শর্ত হয় না। সুতরাং দু' মাসআলায় পার্থক্য রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَدْلٌ অর্থ গাঁইট। উটের পিঠে মালামাল বহনের সুবিধার্থে আরবরা রশির দু'মাথায় দু'টি গাঁইট বেঁধে উটের পিঠের দু'দিকে ঝুলিয়ে নিত। এ দু' গাঁইটকে বলা হতো عَدْلَانِ এর একবচন হলো عَدْلٌ, সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি গাঁইট এ শর্তে ক্রয় করল যে, তাতে দশটি কাপড় আছে, মূল্য দশ দিরহাম। কিন্তু প্রতিটি কাপড়ের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করল না। ক্রয়ের পর দেখা গেল তাতে কাপড় বেশি বা কম, উদাহরণত এগারটি বা নয়টি আছে। এমতাবস্থায় বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ, বেশির সুরতে অর্থাৎ দশটির স্থলে কাপড় এগারটি হলে একটি কাপড় অতিরিক্ত হয়। কিন্তু অতিরিক্ত কাপড় কোনটি, আর কোন দশটি বিক্রয়পণ্য তা অজ্ঞাত। আর এ অজ্ঞাত ঋণাড়ার কারণ (مُنْضًى إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয়। কারণ বিক্রেতা চাইবে ভাল কাপড়টি রেখে দিতে, আর ক্রেতা চাইবে খারাপটি দিতে। আর কমের সুরতে অর্থাৎ দশটির স্থলে কাপড় নয়টি হলে যে কাপড়টি নেই সেটার মান কিরূপ এবং তার মূল্য কত, আর অবশিষ্ট নয়টির মূল্য কত, তা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। আর এ অজ্ঞাত ঋণাড়ার কারণ হয়। বিক্রেতা যেহেতু মোটমূল্য উল্লেখ করেছে, প্রতিটির বিপরীতে মূল্য উল্লেখ করেনি, তাই হতে পারে যে কাপড়টি নেই সেটা খুবই উন্নত মানের। তারই মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম আর অবশিষ্ট নয়টির মূল্য পাঁচ দিরহাম। আর যে অজ্ঞাত ঋণাড়ার কারণ (مُنْضًى إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয় তা ক্রয়-বিক্রয়কে ফাসিদ করে দেয়।



হ্যাঁ, বিক্রেতা যদি প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করে থাকে তাহলে ক্রমের সুরতে তদানুপাতিক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে এ সুরতে ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার অর্থত্ব্যার পাবে। কারণ, ক্রেতার দশটি কাপড় প্রয়োজন এবং বিক্রেতার সঙ্গে তার দশটি কাপড় ক্রয়ের চুক্তি হয়েছিল। এখন চুক্তির মধ্যে বিভক্তি দেখা যাচ্ছে। আরেকটি কাপড়ের জন্য তাকে আরেকজন বিক্রেতার শরণাপন্ন হতে হবে। খুচরা কাপড় ক্রয়ে মূল্যও বেশি দিতে হবে। তাই ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার অর্থত্ব্যার পাবে। আর বিক্রয় জায়েজ হওয়ার সুরতে প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য উল্লেখ করার কারণে বিদ্যমান নয়টি কাপড়ের মূল্য জানা আছে। তাই ঝগড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু বেশির সুরতে প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও কোন দশটি বিক্রয়পণ্য তা যেহেতু অজ্ঞাতই থেকে যায় তাই বিক্রয় জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ نِي فَصْلُ الْخ مতে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিলেও ক্রমের সুরতে অর্থাৎ দশটির স্থলে নয়টি কাপড় পাওয়া গেলে বিক্রয় জায়েজ নেই। কারণ নয়টি কাপড় مَوْجُود [বিদ্যমান] আর একটি কাপড় مَعْدُوم [অবিদ্যমান]। আর বিক্রেতা একই চুক্তিতে مَعْدُوم ও مَوْجُود -কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং বিক্রেতা যেন শর্ত দিচ্ছে যে, যদি মওজুদ নয়টি কাপড় ক্রয় করতে হয় তাহলে مَعْدُوم কাপড়টিও ক্রয় করতে হবে। আর এ ধরনের শর্ত ক্রয়-বিক্রয়কে ফাসিদ করে দেয়। যেমন- কোনো লোক যদি গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তির আওতায় বিক্রি করে এবং প্রতিটির পৃথক মূল্যও উল্লেখ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে গোলামও বিক্রয় জায়েজ নেই। অবশ্য সাহেবাব্দীন এর বিপরীত মত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর যুক্তি হলে, এভাবে গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তিতে উল্লেখ করার দ্বারা বিক্রেতা যেন শর্ত দিচ্ছে যে, গোলাম ক্রয় করতে হলে স্বাধীন ব্যক্তিকেও ক্রয় করতে হবে। অথচ স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এ ধরনের শর্ত ক্রয়-বিক্রয়কে ফাসিদ করে দেয়। [আইনী খ. ৭, পৃ. ৫০]

উক্ত মাশায়েখ কেলাম নয়টি কাপড়ের মাসআলাকে জামে সগীরের নিম্নোক্ত মাসআলার উপর কিয়াস করেছেন। জামে সগীরে আছে, যদি কোনো ব্যক্তি দু'টি কাপড় এ শর্তে ক্রয় করে যে, উভয়টি হিরাতী কাপড় এবং প্রতিটির পৃথক মূল্যও উল্লেখ করে কিন্তু পরে দেখা যায় একটি হিরাতী অপরটি মারবী তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে কোনটিতেই বিক্রয় জায়েজ নেই। মাশায়েখে কেলাম বলেন, হিরাতী শর্তে দু'টি কাপড় ক্রয় করার পর যখন দেখা গেল একটি মারবী এ সুরতে কাপড় দু'টিই আছে, শুধু একটিতে হিরাতী হওয়ার وَصْف [বিশিষ্টা] অনুপস্থিত। আর দশটি কাপড়ের স্থলে যখন নয়টি পাওয়া গেল এ ক্ষেত্রে দশম কাপড়টিই অনুপস্থিত। অতএব শুধু وَصْف অনুপস্থিত থাকাটা যদি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসিদ হওয়ার কারণ হয় তাহলে দশম কাপড়ের অনুপস্থিতি তো যৌক্তিক কারণেই বিক্রয় ফাসিদ হওয়ার কারণ হবে।

قَوْلُهُ وَلَسَّ بِصَحِيحٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ الْخ হাফেযে হিদায়া বলেন, নয়টি কাপড়ের সুরতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েয নেই বলে মাশায়েখে কেলাম যে উক্তি করেছেন তা শুদ্ধ নয়। কারণ পৃথকভাবে প্রতিটি কাপড়ের মূল্য উল্লেখ করার কারণে নয়টি কাপড়ের বিনিময়মূল্য (ثَمَنٌ) নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে। আর পণ্য (مَجْنِع) এবং বিনিময়মূল্য (ثَمَنٌ) যখন নিশ্চিতভাবে জানা থাকে তখন ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয় না। আর মাশায়েখে কেলামের কেউ কেউ যে জামে সগীরের মাসআলার উপর আলোচ্য মাসআলার কিয়াস করেছেন তাও শুদ্ধ নয়। কারণ দু'মাসআলায় পার্থক্য আছে। হিরাতী শর্তে দু'টি কাপড় ক্রয়ের পর দেখা গেল একটি মারবী। তাহলে যেন বিক্রেতা হিরাতী কাপড়ের বিক্রয়ে মারবী কাপড়ের কবুলকে শর্ত করেছে যে, হিরাতীটা নিতে হলে মারবীটাও নিতে হবে। আর এ শর্ত বিক্রয়-চুক্তির খেলাফ বিধায় তা ফাসিদ। আর কায়দা আছে, ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। তাই এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে এবং হিরাতী ও মারবী কোনোটিতেই বিক্রয় জায়েয হবে না।

পক্ষান্তরে দশটি কাপড়ের স্থলে নয়টি পাওয়া যাওয়ার সুরতে নয়টি কাপড় নিতে হলে অবিদ্যমান (مَعْدُوم) দশম কাপড়টি নিতে হবে, বিক্রেতা এ শর্ত দিয়েছে তা বলা যায় না। কারণ যেটা নেই (مَعْدُوم) সেটা নেওয়া (قَبُول) -এর শর্ত করবে কিভাবে? বরং যেগুলো আছে সেগুলোই বিক্রীতে বিক্রি করেছে; কোনো শর্তারোপ করেনি। তবে সংখ্যা উল্লেখের তার ভুল হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হলে, জামে সগীরের মাসআলার আর আলোচ্য মাসআলায় পার্থক্য আছে। আলোচ্য মাসআলাকে জামে সগীরের মাসআলার উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ كُلِّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، فَإِذَا هُوَ عَشْرَةٌ وَنِصْفٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَنِصْفٌ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (رح) فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ : يَأْخُذُهُ بِعَشْرَةٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِتِسْعَةٍ إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، يَأْخُذُهُ بِأَحَدٍ عَشَرَ إِنْ شَاءَ ، وَفِي الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِعَشْرَةٍ إِنْ شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَوَّلِ : يَأْخُذُهُ بِعَشْرَةٍ وَنِصْفٍ إِنْ شَاءَ ، وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ ، وَيَخِيرُ ، لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةٍ مُقَابَلَةِ الذِّرَاعِ بِالذِّرْهَمِ مُقَابَلَةً نِصْفِهِ يَنْصِفُهُ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهَا ، وَلِإِبْنِ يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ لَمَّا أَفْرَدَ بِكُلِّ ذِرَاعٍ بِبَدَلِ نَزَلِ كُلِّ ذِرَاعٍ مَنْزِلَةً ثَوْبٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَقَدْ انْتَقَصَ ، وَلِإِبْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ الذِّرَاعَ وَصَفَ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَ حُكْمَ الْمُقَدَّارِ بِالشَّرْطِ ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذِّرَاعِ ، فَعِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ ، وَقِيلَ فِي الْكِرْبَاسِ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ جَوَانِبُهُ لَا يَطِيبُ لِلْمُشْتَرِي مَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْزُونِ حَيْثُ لَا يَضُرُّهُ الْفَضْلُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا : يَجُوزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ .

অনুবাদ : কেউ যদি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে একটি কাপড় দশ গজ আছে এ শর্তে ক্রয় করে, পরে দেখা গেল যে, তা সাড়ে দশ গজ বা সাড়ে নয় গজ হয়েছে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, প্রথম সূরতে [অর্থাৎ সাড়ে দশ গজ পেলে] ক্রেতা কাপড়টিকে বিনা ইচ্ছাধিকারে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। আর দ্বিতীয় সূরতে [অর্থাৎ সাড়ে নয় গজ পেলে] নয় দিরহামের বিনিময়ে ইচ্ছা হলে গ্রহণ করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, প্রথম সূরতে ক্রেতা [গ্রহণের] ইচ্ছা করলে এগার দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, আর দ্বিতীয় সূরতে [গ্রহণের] ইচ্ছা করলে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রথম সূরতে ক্রেতা ইচ্ছা করলে সাড়ে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, আর দ্বিতীয় সূরতে সাড়ে নয় দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে এবং সে এখতিয়ার পাবে। কারণ এক গজের বিপরীতে এক দিরহাম হওয়ার জন্য জরুরি হলো আধা গজের বিপরীতে আধা দিরহাম। তাই আধা গজের উপরও তার হুকুম জারি হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হচ্ছে— যখন বিক্রেতা প্রতি গজের বিপরীতে বিনিময়মূল্য ধার্য করেছে তখন প্রতি গজ স্বতন্ত্র একটি কাপড়ের মর্যাদা লাভ করেছে। তবে [একটি কাপড়] একটু কম হয়েছে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে— গজ মূলত সিফাত (وَصْف)। তা

পরিমাণের হুকুম ধারণ করেছে শর্তের কারণে। আর শর্তটি গজের সাথে যুক্ত। সুতরাং যখন শর্ত পাওয়া গেল না তখন হুকুম মুল্লের দিকে ফিরে আসল। কারো কারো মতে, যে সব কাপড়ের বিভিন্ন প্রাপ্ত মানগতভাবে তারতম্যপূর্ণ নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য শর্তকৃত পরিমাণের অতিরিক্ত [গজ] হালাল নয়। কারণ, বিচ্ছিন্নকরণ ক্ষতিকর না হওয়ার কারণে তা ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত। আর এ কারণেই মাশায়েখ কেলাম বলেন, তা থেকে এক গজ বিক্রয় জায়েজ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে সব কাপড় কর্তন করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন, জামা, পায়জামা, পাগড়ি, জুন্সা ইত্যাদি এ ধরনের কোনো কাপড় যদি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে দশ গজ আছে এ শর্তে কোনো ব্যক্তি ক্রয় করে, কিন্তু ক্রয়ের পর দেখে তাতে সাড়ে দশ গজ বা সাড়ে নয় গজ আছে তাহলে মাসআলা কি হবে?

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, সাড়ে দশ গজের সুরতে ক্রেতা দশ দিরহামের বিনিময়ে কাপড়টি বাধ্যতামূলক গ্রহণ করবে এবং সে কোনোরূপ এখতিয়ার পাবে না। আর সাড়ে নয় গজের সুরতে সে গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কিন্তু গ্রহণ করলে নয় দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, দশ গজের স্থলে সাড়ে দশ গজ পাক, আর সাড়ে নয় গজ পাক উভয় সুরতে ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। যদি গ্রহণ করে তাহলে সাড়ে দশ গজ হলে এগার দিরহামের বিনিময়ে, আর সাড়ে নয় গজ হলে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ক্রেতা সাড়ে দশ গজের সুরতে সাড়ে দশ দিরহাম এবং সাড়ে নয় গজের সুরতে সাড়ে নয় দিরহামের বিনিময়ে কাপড়টি গ্রহণ করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : যখন প্রতি গজের বিপরীতে বিনিময়মূল্য এক দিরহাম ধার্য হলো, তখন গজের প্রতিটি অংশের বিনিময়মূল্য দিরহামের তদানুপাতিক অংশ হবে। আধা গজের বিনিময়ে আধা দিরহাম হবে। এক-চতুর্থাংশ গজের বিনিময়ে এক-চতুর্থাংশ দিরহাম হবে। অতএব বেশির সুরতে অর্থাৎ কাপড়টি সাড়ে দশ গজ হলে সাড়ে দশ দিরহাম মূল্য হবে। কমেব সুরতে অর্থাৎ সাড়ে নয় গজ হলে সাড়ে নয় দিরহাম মূল্য হবে। তবে উভয় সুরতেই ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ, প্রথম সুরতে তাকে আধা দিরহাম বেশি নিতে হচ্ছে, আর দ্বিতীয় সুরতে তার প্রয়োজনের চেয়ে আধা গজ কাপড় কম হচ্ছে, আর এতে সে সন্তুষ্ট নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল : এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কাপড়, তৈরি পোশাক, জায়গা-জমি, বাড়ি প্রভৃতিতে গজ/ফিট/হাত মূলত **وَسْفٌ**। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ে **وَسْفٌ** টা যদি মুখ্য হয়, উদাহরণত তৈরি পোশাক, জায়গা-জমি, বাড়ি প্রভৃতি যদি হাত বা ফিট হিসেবে বিক্রি হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতি হাত/গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যেমন বলা হলো, এ কাপড়টিতে দশ গজ আছে, দাম একশ' টাকা, প্রতি গজ দশ টাকা, তাহলে **وَسْفٌ** টা **كَذَرٌ** তথা **أَصْلٌ** -এর মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং সে কারণে পরিমাণ-হ্রাস-বৃদ্ধি হলে দামেও তারতম্য ঘটে। আলোচ্য মাসআলায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতি গজের বিনিময়ে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে গজ **أَصْلٌ** -এর মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং দশ গজ কাপড় যেন দশটি স্বতন্ত্র কাপড়। সাড়ে দশ গজের সুরতে ক্রেতা যেন এগারটি কাপড় ক্রয় করল। তবে এগারতম কাপড়টি একটু ছোট। আর সাড়ে নয় গজের সুরতে ক্রেতা যেন দশটি কাপড় ক্রয় করল, তবে দশম কাপড়টি একটু ছোট। অতএব এগারটি কাপড়ের জন্য ক্রেতাকে এগার দিরহাম আর দশটি কাপড়ের জন্য দশ দিরহাম দিতে হবে।

তবে ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ সাড়ে দশ গজের সূরতে এগার দিরহামের বিনিময়ে সে কাপড়টি গ্রহণে বাধ্য হলে যদিও সে আধা গজ কাপড় বেশি পাচ্ছে কিন্তু তাকে অতিরিক্ত এক দিরহামের ক্ষতিও বহন করতে হবে। আর অতিরিক্ত এক দিরহামের ক্ষতি বহনে সে সম্মত নয়। আর সাড়ে নয় গজের সূরতে এখতিয়ার পাওয়ার কারণ হলো, তার কাপড় দরকার দশ গজ। সাড়ে নয় গজে তার প্রয়োজন মিটবে না। তা ছাড়া আধা গজের জন্য সে এক দিরহাম দিতে সম্মত নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : কাপড়ে গজ মূলত وَصَفَ। কিন্তু كُلُّ ذِرَاعٍ بِدَرَمٍ-এর শর্তের কারণে তা أَصْل-এর মর্যাদা লাভ করেছিল। আর শর্তটি গজের সাথে সংযুক্ত। আধা গজ যেহেতু গজ নয় তাই আধা গজের মধ্যে শর্ত অনুপস্থিত। আর যেহেতু শর্ত অনুপস্থিত তাই হুকুম أَصْل-এর দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ আধা গজকে وَصَفَ বলা হবে। আর وَصَفَ-এর বিপরীতে বিনিময়মূল (ثَمَنٌ) হয় না। তাই দশ গজ ও নয় গজের উপর অতিরিক্ত যে আধা গজ তার বিপরীতে কোনো মূল্য আসবে না। বরং ক্রেতা সাড়ে দশ গজের সূরতে কাপড়টিকে দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং সাড়ে নয় গজের সূরতে নয় দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। এর উপমা হলো, কোনো ব্যক্তি ক্রটিযুক্ত এ শর্তে কোনো দ্রব্য ক্রয় করার পর দেখল তা দোষমুক্ত। দোষমুক্ত ও ভাল হওয়া একটি وَصَفَ। এর বিনিময়ে কোনো মূল্য হবে না; বরং এ وَصَفَ টি ক্রেতা বিনিময়হীনভাবে লাভ করবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর মতে ক্রেতা সাড়ে দশ গজের সূরতে কোনোরূপ এখতিয়ার পাবে না। কারণ অতিরিক্ত আধা গজ গ্রহণে তার কোনো ক্ষতি নেই। বরং আধা গজ উপরি লাভ। আর সাড়ে নয় গজের সূরতে সে গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ নয় গজে তার প্রয়োজন নাও মিটেতে পারে; তার দরকার দশ গজ। যদি নয় গজ নিতে সে বাধ্য থাকে তাহলে তা বিক্রয়-চুক্তি মুতাবেক হলো না। আর এতে সে সন্তুষ্ট নয়।

قَوْلُهُ وَفِيهِ الْكَرْبَاسُ الَّذِي لَا يَتَفَارَقُ جَوَانِبَهُ لَا يَطْبُقُ الْخ-আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, এ ইবারত দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার এই দিকে ইশারা করেছেন যে, পূর্বাঙ্ক অভিমত তিনটি ঐ সব কাপড়ের ব্যাপারে, যেগুলোর বিভিন্ন প্রান্ত মানগতভাবে তারতম্যপূর্ণ হয়। যেমন, জামা, পাঞ্জাবী, সেলোয়ার, পাগড়ি, জুকা প্রভৃতি। এ ধরনের পোশাক থেকে আধা গজ কাপড় কেটে নিলে পুরা কাপড়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যে সব কাপড়ের একাংশের সাথে অপরাংশের ভিন্নতা থাকে না সে সব কাপড়ে শর্তের অতিরিক্ত গজ ক্রেতার জন্য হালাল নয়। কারণ, অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে রেখে দিলে অবশিষ্ট কাপড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাই এ ধরনের কাপড়ে গজ, কফিয়/কেজি/টন-এর মতো أَصْل। আর কাপড়টি ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মতো। তাই মাশায়েখে কেরাম বলেছেন যে, শস্যস্তুপ থেকে পৃথকভাবে এক কেজি/কফিয় শস্য যেমন বিক্রয় জায়েজ, তেমনি এ ধরনের কাপড়েও পৃথকভাবে এক গজ বিক্রয় জায়েজ, যদিও কাপড়ের ঠিক কোন স্থান থেকে কেটে এক গজ দিবে তা নির্ধারিত না হয় وَاللَّهُ أَعْلَمُ

فَصْلٌ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِسَائِهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَسْمِهِ ، لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ تَسْنَاوُلُ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ فِي الْعُرْفِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ إِتِّصَالَ قَرَارٍ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمِهِ ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْقَرَارِ ، فَاشْتَبَهَ الْبِنَاءَ ، وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْفَصْلِ ، فَاشْتَبَهَ الْمَتَاعَ الَّذِي فِيهِ .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : যদি কোনো ব্যক্তি বাড়ি বিক্রি করে তাহলে বাড়ির ঘরসমূহ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও তা উল্লেখ না করে। কারণ, 'বাড়ি' শব্দটি লোক প্রচলনে আগিনা ও ঘর-দালানকে শামিল করে। তাছাড়া ঘর-দালান বাড়ির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত, তাই তা বাড়ির অনুবর্তী হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি বিক্রি করে তাহলে তাতে বিদ্যমান খেজুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছপালা [বিক্রয় চুক্তিতে] অন্তর্ভুক্ত হবে; যদিও তার উল্লেখ না করে। কেননা, গাছপালা ও খেজুর বৃক্ষ ভূমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। সুতরাং তা ঘর-দালানের মতো। তবে ভূমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা ছাড়া ফসল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, ফসল ভূমির সাথে সংযুক্ত পৃথক হওয়ার জন্যই। সুতরাং তা ভূমিতে বিদ্যমান দ্রব্যের মতো।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

دار : আমাদের সমাজে বাড়ি বলতে যা বুঝায়, আরবি ভাষা ও আরবদের পরিভাষায় دَار বলতে তাই বুঝায়। অর্থাৎ কয়েকটি ছোট ছোট ঘর, চাতাল, রান্নাঘর, গোয়ালঘর ও বাথরুমের সমন্বিত বসবাসস্থলকে دَار বলে। আর مَنْزِل অর্থ ঘর বা শহরঞ্চলের বাসা/ফ্লাট; যাতে কয়েকটি কক্ষ, বাথরুম, রান্নাঘর ও বারান্দা থাকে, আগিনা থাকে না। আর بَيْت হলো এক কক্ষবিশিষ্ট ঘর, যাতে একটি দরজা থাকে। -[সিকায়, হাশিয়ায়ে হিদায়া থেকে গৃহীত]

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মাসআলাসমূহ দুটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—

১. লোকসমাজে যে সব বিষয়কে উল্লেখ করা ছাড়াই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় সেগুলো স্পষ্ট উল্লেখ না করলেও বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যে সব জিনিস উল্লেখ করা ছাড়া লোকসমাজে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না সেগুলো মূল পণ্যের অধীন হয়ে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
২. যে সব জিনিস বিক্রয় পণ্যের সাথে অবিশ্লেষ্য বা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। যেমন, দরজার সাথে সংযুক্ত তালা, কড়া এবং বাড়ির ঘর-দুয়ার অথবা বিক্রয় পণ্যের পরিপূরক যেমন— তালার চাবি, বোতলের ছিপি ইত্যাদি এগুলো বিক্রয়কালে উল্লেখিত না হলেও মূল পণ্যের অধীন হয়ে আপনা-আপনি বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে পরিপূরক বা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত নয়। যেমন, গৃহস্থিত খাট-পালং, ফার্নিচার এবং ক্ষেতের ফসলাদি এগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া মূল পণ্যের অধীন হয়ে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। -[ফাতহুল কাদীর : খ. ৬, পৃ. ২৫৯]

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِسَائِهَا فِي الْبَيْعِ : যদি কোনো ব্যক্তি বাড়ি বিক্রি করে তাহলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও বিক্রয়ে বাড়ির সব ঘর-দুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, লোকসমাজে 'বাড়ি' শব্দটি বাড়ির ভূমি, ঘর-দালান, ভিটে, আগিনা,

গাছপালা সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া ঘর-দালানগুলো বাড়ির ভূমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। তাই উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলেও তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও তাই বলেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ : যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি ক্রয় করে, আর ঐ ভূমিতে খেজুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছপালা আছে, তাহলে গাছপালা ছোট হোক বা বড় হোক, ফলবান হোক বা ফলহীন হোক, গাছের কথা উল্লেখ করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, গাছপালা ভূমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। সুতরাং তা ঘর-দালানের মতো। ঘর-দালান যেরূপ বাড়ির বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় তেমনি গাছপালাও ভূমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالنَّسْبَةِ : যদি কোনো ব্যক্তি জমি ক্রয় করে আর ঐ জমিতে ফসল আছে তাহলে ফসল জমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি ফসলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যেমন বলল, আমি ফসলসহ জমিটি ক্রয় করলাম, তাহলেই শুধু অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, ফসল জমির সাথে কেটে পৃথক করার উদ্দেশ্যেই সংযুক্ত হয়ে আছে। তাই এটা বাড়িতে রাখা দ্রব্যের মতো। বাড়ির মালিক তার কাজের জন্য এক হাজার ইট এনে বাড়িতে স্থাপন করেছে। এখন বাড়িটি বিক্রি করে দিলে ইটগুলো যেমন বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না, তেমনিভাবে ফসলও জমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, দাসীর গর্ভস্থিত সন্তান, পশু/পাখির গর্ভস্থিত বাছুর/ছানা প্রসবের পর পৃথক হওয়ার জন্যই মায়ের সাথে সংযুক্ত। এতদসত্ত্বেও তা মায়ের বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ উল্লিখিত মূলনীতি অনুযায়ী তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়া উচিত। এর উত্তরে আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, গর্ভস্থিত বাছুর/ ছানাকে বাড়িতে রাখা মালামাল বা ফসলের উপর কিয়াস করা যাবে না। কারণ বাড়ি বিক্রয়ের পর তা থেকে মালামাল সরানো এবং জমি বিক্রয়ের পর তা থেকে ফসলকে পৃথক করা মানুষের সাধ্যের ভিতরে। কিন্তু মাকে বিক্রয়ের পর তার গর্ভস্থিত বাছুর/ ছানা/ সন্তানকে পৃথক করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই সঙ্গত কারণেই গর্ভস্থিত সন্তান/ বাছুর/ ছানা মায়ের বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।—[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৫৫]

وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَلِأَنَّ الْإِتِّصَالَ وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً فَهُوَ لِلْقَطْعِ لَا لِلْبَقَاءِ ، فَصَارَ كَالزَّرْعِ ، وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ إِقْطَعْنَهَا ، وَسَلِّمْ الْمَيْعَ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ ، لِأَنَّ سِلْكَ الْمُشْتَرِي مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِغُهُ وَتَسْلِيمُهُ ، كَمَا إِذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح)، يُتْرَكَ حَتَّى يَظْهَرَ صَلَاحُ الثَّمَرِ وَيَسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا هُوَ التَّسْلِيمُ الْمُعْتَادُ ، وَفِي الْعَادَةِ أَنْ لَا يَقْطَعَ كَذَلِكَ ، وَصَارَ كَمَا إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ ، قُلْنَا هُنَاكَ التَّسْلِيمُ وَاجِبٌ أَيْضًا ، حَتَّى يُتْرَكَ بِأَجَرٍ ، وَتَسْلِيمُ الْعَوِضِ كَتَسْلِيمِ الْمُعَوِضِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ بِحَالٍ لَهُ قِيَمَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحِيحِ ، وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ ، لِأَنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى مَا نُسِنَ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ .

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ বা অন্য কোনো গাছ, তাতে ফল থাকা অবস্থায় বিক্রি করে তাহলে ফলগুলো বিক্রেতার থাকবে। হ্যাঁ, ক্রেতা যদি [ক্রয়কালে ফলগুলোর] শর্ত করে [তাহলে সে পাবে।] কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি খেজুর গাছ আছে এমন জমি ক্রয় করে তাহলে খেজুর-ফলগুলো বিক্রেতার থাকবে। হ্যাঁ, যদি ক্রেতা [ক্রয়কালে] শর্ত করে [তাহলে ক্রেতা পাবে।] তাছাড়া [গাছের সাথে ফলের] সংযুক্তি যদিও জন্মগত, কিন্তু তা কর্তনের জন্য, স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নয়। সুতরাং তা ফসলের মতো হয়ে গেল। অতঃপর বিক্রেতাকে বলা হবে, তুমি ফলগুলো কেটে নাও এবং বিক্রয়পণ্যকে [অর্থাৎ গাছকে ক্রেতার কাছে] অর্পণ কর। এরূপ হুকুম হবে যদি জমিতে ফসল থাকে। কারণ, ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [গাছ/জমি] বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [ফসল/ফল] দ্বারা আবদ্ধ আছে। আর তাকে মুক্ত করা এবং [ক্রেতার কাছে] তা অর্পণ করা বিক্রেতারই কর্তব্য। যেদ্রুপ কর্তব্য বিক্রিত বাড়িতে বিক্রেতার মালামাল থাকলে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফল ও ফসল গাছে রেখে দেওয়া হবে যে পর্যন্ত ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পায় এবং ফসল কাটার সময় হয়। কারণ ওয়াজিব হলো এভাবে অর্পণ করা, যা লোক সমাজে প্রচলিত। আর সামাজিক প্রচলনে এ ধরনের ফল কাটা হয় না। আর এটা জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার সদৃশ হলো। [সে ক্ষেত্রে কাটা পর্যন্ত ফসল জমিতে থাকে।] আমরা বলি, সে ক্ষেত্রেও অর্পণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ভাড়ার বিনিময়ে [জমিতে] ফসল রাখা হয়। আর বিনিময় [ভাড়া] অর্পণ করা বিনিময়দ্রব্য [জমি] অর্পণ করার নামান্তর। বিদ্বদ্ধ অভিমত অনুসারে ফল যে পর্যায়েরই হোক না কেন,

মূল্যউপযুক্ততা আছে বা নেই তাতে [হুকুমের] কোনো পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থাতেই তা বিক্রেতার, কারণ, দুটি বর্ণনার বিস্তৃততম বর্ণনা অনুযায়ী যা সামনে আমরা বর্ণনা করব- তা বিক্রয় করা জায়েজ। সুতরাং গাছ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হাড়া ফলসমূহ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি ফল আছে এমন গাছ বিক্রি করে তাহলে ফল বিক্রেতার থাকবে। তবে ক্রেতা গাছ ক্রয়কালে যদি ফলের কথা বলে নেয়, যেমন বলল, আমি ফলসহ গাছটি ক্রয় করলাম, তাহলে ফল ক্রেতা পাবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ কথাই পক্ষে আকলী ও নকলী দলিল পেশ করেছেন।

**নকলী দলিল :** রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- **مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَالْخَمْرَةُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ** - 'কোনো ব্যক্তি ফলবান খেজুর বৃক্ষ আছে এমন জমি ক্রয় করলে ফলগুলো হবে বিক্রেতার। হ্যাঁ, যদি ক্রেতা [ফলের] শর্ত করে [তাহলে সে পাবে।]' এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, ফলবান গাছ আছে এমন জমি বিক্রি করলে গাছ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও ফলগুলো বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং তা বিক্রেতার থাকবে।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এবং আল্লামা আইনী (র.) বলেছেন, বর্ণিত শব্দে হাদীসটি গরিব। তবে প্রায় এ ধরনের একটি হাদীস আইখায়ে সিন্তাহ তাদের কিতাবে হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বশত দিয়ে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

**مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَلَهُ لِبَّائِعٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤْتَرًا فَالْخَمْرَةُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ**

"যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো গোলাম বিক্রি করে যার মাল আছে তবে তার মাল বিক্রেতার থাকবে। অবশ্য ক্রেতা [ক্রয়কালে মালের] শর্ত করলে [তার হবে]। আর কোনো ব্যক্তি যদি পরাগায়নকৃত খেজুর গাছ বিক্রি করে তাহলে ফল বিক্রেতার থাকবে। তবে ক্রেতা শর্ত করে নিলে সে পাবে।" -[দিরায়া, বিনায়া]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, ফলবান গাছ বিক্রি করলে ফলগুলো বিক্রেতার হবে।

**আকলী দলিল :** সাহেবে হিদায়া বলেন, গাছের সাথে ফলগুলোর সংযুক্তি (إِتِّصَالٌ) যদিও জন্মগত, কিন্তু তা কর্তনের জন্যই; স্থায়ীভাবে গাছে থাকার জন্য (إِتِّصَالٌ قَرَارٌ) নয়, তাই তা ফসলের মতো। সুতরাং জমির ফসল যেসকল জমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না, সেসকল গাছের ফলও গাছ বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং তা বিক্রেতার থেকে যাবে।

**فَرَأَى نَخْلًا لِلْبَّائِعِ إِنْطَعَمًا رَزَقَهُ** : উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, ফল বিক্রেতা পাবে, আর গাছ ক্রেতা পাবে, তখন বিক্রেতাকে বলা হবে, তুমি তোমার ফল কেটে নিয়ে গাছ ক্রেতাকে বুঝিয়ে দাও। একপভাবে যে জমিতে ফসল আছে তা বিক্রয়ের পর বিক্রেতাকে বলা হবে, তোমার ফসল কেটে রেখে জমি ক্রেতাকে অর্পণ কর। গাছ/জমি বিক্রয়ের পর তার ফল/ফসল তৎক্ষণাৎ কেটে নিতে হবে। এর দলিল হিসাবে সাহেবে হিদায়া বলেন, ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ গাছ/ জমি বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ ফল/ফসল দ্বারা আটক আছে। আর বিক্রয়ের পর বিক্রয়পাণীনে বস্তু সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত করে ক্রেতার কাছে অর্পণ করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। যেমন কোনো ব্যক্তি জমি বা বাড়ি বিক্রি করল আর জমি বা বাড়িতে তার মালামাল আছে। এ ক্ষেত্রে যেমন মালামাল সরিয়ে জমি বা বাড়ি খালি করে ক্রেতার কাছে অর্পণ করা ওয়াজিব তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ফল/ ফসল কেটে নিয়ে তৎক্ষণাৎ গাছ বা জমি ক্রেতার কাছে অর্পণ করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হয় তাহলে ফল/ফসল তৎক্ষণাৎ কেটে নেওয়া জরুরি নয়। বরং ফল/ফসল গাছেই থাকবে। যখন ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাবে এবং ফসল কাটার



উপযুক্ত হবে তখন কাটবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও এটি। তাদের দলিল এই যে, বিক্রতার উপর অবশ্যই গাছ/জমি অর্পণ করা ওয়াজিব; কিন্তু যে অর্পণ লোকসমাজে প্রচলিত সে মতে ওয়াজিব। তাই কেউ যদি রাতে বাড়ি বিক্রি করে আর বাড়িতে মালামাল থাকে তাহলে রাতেই বাড়ি অর্পণ করা ওয়াজিব নয়। বরং মজদুরের উপস্থিতি ও সকাল হওয়ার অপেক্ষা করা হয়। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক প্রচলনে লোকেরা যে ফল এখনও খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি এবং যে ফসল এখনও কাটার উপযুক্ত হয়নি তা কাটে না। তাই আলোচ্য মাসআলায়ও ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত ফল/ফসল কাটবে না, ক্রেতা সম্মত থাকুক বা না থাকুক। [ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬২]

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا انْقَضَتْ مَدَّةُ الْإِحَارَةِ: আইয়্যে সালাসার পক্ষ থেকে তাদের অভিমতের সমর্থনে একটি উদাহরণ পেশ করা হয় যে, এক ব্যক্তি ফসল করার জন্য জমি ইজারা নিল এবং তাতে ফসল করল। ফসল এখনও কাটার উপযুক্ত হয়নি, কিন্তু ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যেরূপ ফসল কেটে নিয়ে জমি অর্পণ করা তার জন্য ওয়াজিব নয়, বরং কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত সে ফসল জমিতে রাখতে পারে, তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়া এবং ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত ফল গাছে এবং ফসল জমিতে রাখতে পারবে।

قَوْلُهُ قُلْنَا هُنَاكَ التَّسْلِيمُ وَاجِبٌ أَيْضًا الخ: আইয়্যে সালাসার অভিমতের পক্ষে যে উদাহরণ পেশ করা হয় সে সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ফসল না পাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও জমি ইজারাদাতার কাছে অর্পণ করা ওয়াজিব। আর সে কারণেই ইজারাগ্রহীতা ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত যদি জমিতে রাখতে চায় তবে তাকে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে। বিনিময় অর্থাৎ ভাড়া অর্পণ করা আর বিনিময় দ্রব্য অর্থাৎ জমি অর্পণ করা একই কথা। অতএব ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, অথচ ফসল কাটার উপযুক্ত হয়নি সে ক্ষেত্রেও প্রকারণের জমিই অর্পণ করা হলো।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, কাটার উপযুক্ত না হলে ইজারার ক্ষেত্রে ভাড়ার বিনিময়ে যেরূপ ফসল জমিতে রাখা জায়েজ তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়া এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা থেকে ভাড়ার বিনিময়ে বিক্রতার জন্য ফল/ফসল গাছে/জমিতে রাখা জায়েজ হওয়া উচিত। তা যদি হয় তাহলে প্রকারণের গাছ/জমি অর্পণ করা হলো, আবার বিক্রতারও ক্ষতি হলো না। আলামা ইবনে হুমাম ও আলামা আইনী (র.)-এর উত্তরে বলেন, ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও যখন বিক্রতা গাছ/জমি বিক্রি করছে, এতে তৎক্ষণাৎ ফল/ফসল কেটে নেওয়ার ব্যাপারে তার সম্মতি বুঝা যায়। কারণ, সে জানে বিক্রয়ের পর ক্রেতা তার কাছে স্বীয় মালিকানাধীন গাছ/জমি ঝামেলামুক্ত অবস্থায় হস্তান্তরের দাবি জানাবে। যেহেতু তার পক্ষ থেকে সম্মতি পাওয়া যায় তাই তাকে ক্রেতা থেকে গাছ/জমি ইজারা নেওয়ার সুযোগ দান করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে জমিতে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইজারাগ্রহীতার পক্ষ থেকে এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি, যা থেকে বুঝা যায় যে, ফসল কাটার উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও সে ফসল কেটে নিয়ে যেতে সম্মত। সুতরাং তাকে ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দান করা ওয়াজিব। আর সামাজিক প্রচলনে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ না পেলে এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হলে ফল/ফসল কাটা হয় না এ কথা ঠিক নয়। কারণ সামাজিক প্রচলনে বিক্রয়ের পর যেরূপ ফল/ফসল গাছে রেখে দেওয়া হয় তেমনি তৎক্ষণাৎ কেটে নেওয়ার শর্তও করা হয়।

[ফাতহুল কাদীর, বিনায়া]

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ التَّمَرُ بِحَالِ الخ: হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, “ফল মূল্য মান সম্পন্ন হোক বা না হোক তাতে হুকুমের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং বিতুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী উভয় সূরতে তা বিক্রতা পারে।” এ কথার দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার আলামা মাশআরী প্রমুখ ফুকাহায়ে কেরামের অভিমতকে নাকচ করেছেন। তাঁরা বলেন, “ফল যদি এত ছোট ছোট হয় যে, তা এখনও মূল্য মান সম্পন্ন হয়নি তাহলে তা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।” বিতুদ্ধ অভিমতের যৌক্তিকতা হলো, ফল মূল্য মান সম্পন্ন হোক বা না হোক উভয় সূরতে তা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ। আর যা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ তা যদি স্থায়ীভাবে যুক্ত না হয় তাহলে অনুবর্তী হয়ে অন্য কোনো বস্তুর বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, যদি উল্লেখ করা না হয় তাহলে ফল ও ফসল গাছ ও জমির বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وَأَمَّا إِذَا يَبِيعَتِ الْأَرْضُ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ مُؤَدَّعٌ فِيهَا كَالْمَتَاعِ ، وَلَوْ نَبَتْ وَلَمْ تَصِرْ لَهُ قِسْمَةً فَقَدْ قَبِلَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَقَدْ قَبِلَ يَدْخُلُ فِيهِ ، وَكَأَنَّ هَذَا سِنَاءٌ عَلَى الْإِخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْبُلَهُ الْمَشَايِرُ وَالْمَنَاجِلُ ، وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ يَكُلُّ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ ، لِمَا قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ ، أَمَّا الثَّمَرُ الْمَجْدُودُ وَالزَّرْعُ الْمَحْصُودُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِالتَّصْرِيحِ بِهِ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ .

অনুবাদ : আর যদি জমি বিক্রি করা হয়, অথচ জমির মালিক জমিতে বীজ বপন করেছে, কিন্তু এখনও বীজ অঙ্কুরিত হয়নি, তাহলে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ বীজ মালামালের মতো রক্ষিত আছে। আর যদি বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু এখনও তার কোনো মূল্য হয়নি তাহলে কারো মতে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর কারো মতে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্ভবত এ মতভিন্নতার ভিত্তি হচ্ছে কাস্তো ও [পশুর] ঠোঁটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ফসল বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কিত মতপার্থক্যের উপর। “অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা”র উল্লেখের দ্বারা ফল ও ফসল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ফল ও ফসল “অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা”র অংশ নয়। ক্রেতা যদি বলে, বিক্রেতার ভূমিতে এবং গাছে অল্প-বিস্তর যত অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা আছে সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসহ [ক্রয় করলাম] তাহলে ফল ও ফসল পূর্বোক্ত কারণে বিক্রয়-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে যদি ক্রেতা “অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা”র কথা উল্লেখ না করে [গাছে ও ভূমিতে বিক্রেতার যা কিছু আছে শুধু এটুকু বলে] তাহলে ফল ও ফসল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর পাড়া ফল এবং কাটা ফসল প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া [বিক্রয় চুক্তির] অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তা [জমিতে রাখা] মালামালের মতো।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, এক লোক জমি বিক্রি করেছে, কিন্তু এর পূর্বেই সে জমিতে ফসলের বীজ বপন করেছে, তবে বীজ এখনও অঙ্কুরিত হয়নি এবং বিক্রয়কালে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখিত হয়নি তাহলে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে বীজ জমিতে রক্ষিত মালামাল ও আসবাবপত্রের মতো। জমিতে মালামাল বা আসবাবপত্র থাকাবস্থায় জমি বিক্রি করা হলে মালামাল ও আসবাবপত্র যেরূপ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না তেমনি বীজও বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর যদি এমন হয় যে, বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, কিন্তু এখনও মূল্যসম্পন্ন হয়নি, সে ক্ষেত্রে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। ফকীহ আবুল কাসিম আসসাফহার প্রমুখের মতে, বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর ফকীহ আবু বকর আল ইসকাফের মতে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।—[বিনায়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯]

গ্রন্থকার (য. ব) বলেন, সম্ভবত এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে কাস্তে ও পত্তর চৌটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ ফসল বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কিত মতপার্থক্যের উপর। যে সকল ফকীহ কাস্তে ও পত্তর চৌটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ ফসল বিক্রয়কে বৈধ বলেন, মূল্যসম্পন্ন হয়নি এমন অঙ্কুরিত চারাগাছ/ ফসল প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না এটা তাদের অভিমত। কারণ পৃথকভাবে যে বস্তুর বিক্রয় বৈধ তা প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর অনুবত্তী (نَابِعٌ) হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না। আর যে সকল ফকীহ কাস্তে ও পত্তর চৌটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ফসল বিক্রয়কে বৈধ বলেন না, তাদের মতামত হলো অঙ্কুরিত চারাগাছ/ফসল যা এখনও মূল্যসম্পন্ন হয়নি তা প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াই বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ পৃথকভাবে যে বস্তুর বিক্রয় বৈধ নয় তা প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াই মূল বস্তুর অনুবত্তী (نَابِعٌ) হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالشَّرْءُ يَذْكُرُ الْحَقُوقَ وَالْمَرَافِقَ الْخ : কেউ যদি জমি বা গাছ ক্রয়কালে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ করে, উদাহরণত ক্রেতা বলল, আমি সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসহ এ জমিটি বা এ গাছটি ক্রয় করলাম, তাহলে ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ফসল ও ফল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নয়।

ফসলওয়ালা জমি ও ফলবান বৃক্ষ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত শব্দাবলি চার রকম। যথা—

১. বিক্রেতা বলল, আমি জমি বা গাছ বিক্রি করেছি। অতিরিক্ত কিছু বলল না। এ সূরতে ফসল/ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর দলিল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।
২. বিক্রেতা বলল, আমি জমি/গাছ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসহ বিক্রি করলাম। এ সূরতেও ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।
৩. বিক্রেতা বলল, জমি/গাছে আমার অল্প বিস্তার যত অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা আছে সব সহ আমি জমি/গাছ বিক্রি করলাম। এ সূরতে ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ফসল ও ফল অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা নয়।
৪. বিক্রেতা বলল, জমি বা গাছে আমার অল্প বিস্তার যা কিছু আছে সব সহ আমি জমি/ গাছ বিক্রি করলাম। অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলেনি। এ সূরতে ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ এ সূরতে ক্রেতা জমি/গাছ ও সংশ্লিষ্ট সবকিছু ক্রয় করেছে। আর ফসল/ফল জমি ও গাছের সংশ্লিষ্ট বস্তু।

উল্লেখ্য যে, حَقٌّ শব্দটি حَقٌّ-এর বহুবচন। حَقٌّ হলো, বিক্রয়পণ্যের এমন অনুবত্তী জিনিসসমূহ যা অত্যাवশ্যকীয়। যেমন, জমিতে আসার রাস্তা, সেচ দেওয়ার পানি ইত্যাদি। আর مَرَافِقٌ বলতে বুঝায় বিক্রয়পণ্যের এমন অনুবত্তী জিনিসসমূহ যা বিক্রয়পণ্য দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য জরুরি। যেমন পয়ঃ নিকাশনের জন্য ড্রেন, বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি।

يَكُلُّ قَلِيلٌ الْخ : গাছ থেকে পাড়া ফল এবং কর্তিত ফসল প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া بِكُلِّ قَلِيلٍ الْخ বলায় দ্বারা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, তা জমিতে রাখা মালামালের মতো। জমিতে রাখা মালামাল জমি বিক্রয়ে যেসব قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ مَوْلَهُ فِيهَا وَمِنْهَا বলায় দ্বারা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না তেমনি কাটা ফল ও কর্তিত ফসলও بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٌ مَوْلَهُ فِيهَا وَمِنْهَا বলায় দ্বারা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَأَ جَارَ الْبَيْعِ ، لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ ، إِمَّا يَكُونُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الثَّانِي ، وَقَدْ قِيلَ : لَا يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِطْعُهَا فِي الْحَالِ تَفْرِغًا لِمِلْكِ الْبَائِعِ ، وَهَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقِطْعِ ، وَإِنْ شَرَطَ تَرْكُهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ ، لِأَنَّهُ شَرَطَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ، وَهُوَ شُغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ ، أَوْ هُوَ صَفَقَةٌ فِي صَفَقَةٍ ، وَهُوَ إِعَارَةٌ أَوْ إِجَارَةٌ فِي بَيْعٍ ، وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرْكِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا إِذَا تَنَاهَى عَظَمُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رَحَا) لِمَا قُلْنَا ، وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ (رَحَا) لِلْعَادَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কদুরী (র.) বলেন, “কেউ যদি এমন ফল বিক্রি করে যার উপযোগিতা প্রকাশ পায়নি বা প্রকাশ পেয়েছে তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে।” কারণ বর্তমানে বা পরবর্তীতে উপকার লাভের যোগ্য হওয়ার কারণে তা মূল্যসম্পন্ন পণ্য। কারো কারো মতে, ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে বিক্রয় বৈধ নয়। তবে প্রথমোক্ত অভিমতই বিশুদ্ধতম। সে মতে বিক্রেতার মালিকানাধীন [গাছ] কে [বিক্রয়পণ্য থেকে] মুক্তকরণের জন্য ক্রেতার উপর তৎক্ষণাৎ ফল পেড়ে নেওয়া ওয়াজিব। আর বিক্রয়ের বৈধতা হবে তখন, যখন ফল শর্তহীনভাবে বা পেড়ে নেওয়ার শর্তে ক্রেতা ক্রয় করে। যদি ক্রেতা ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত করে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ, তা এমন শর্ত, যা বিক্রয় চুক্তি দাবি করে না। তা হলো অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে আবদ্ধ রাখা কিংবা এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি। আর তা হলো বিক্রয় চুক্তির মাঝে ধার দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া। [জমিতে] রেখে দেওয়ার শর্তে ফসল বিক্রি করাটাও পূর্বোক্ত কারণে একই রকম। যখন ফলের বর্ধন পূর্ণ হয় [এবং ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় করা হয়] তখনও পূর্বোক্ত কারণে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসিদ। তবে লোক প্রচলনের কারণে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) তা অনুমোদনযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার (র.) উপরোক্ত ইবারতে গাছে থাকাবস্থায় ফল বিক্রির বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

صَلَّاحٌ জিয়াতি বঁড় থেকে নির্গত। অর্থ প্রকাশ পাওয়া, ফুটে উঠা। আর صَلَّاحٌ  
 ثَمَرٌ ʾএমন ফল, যার উপযোগিতা এখনও প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ যা এখনও মানুষ বা  
 পশুর খাওয়ার উপযোগী হয়নি।

ফলে কখন উপযোগিতা আসে তা নিয়ে আইনশাস্ত্রে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী ফিকহবিদদের মতে ফল প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হওয়া (أَمَّنَ النِّسَاءَ) অর্থাৎ যে সময়টা অতিক্রম করলে

সাধারণত পোকুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় তাই হলো ফলের উপযোগিতা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যখন ফলে রং ধরে এবং মিষ্টতা আসে তখন তা উপযোগী হয়। -[ফাতুহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬৪]

উল্লেখ্য যে, ফল বিক্রির কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

১. ফল শর্তহীনভাবে বিক্রি করা। বিক্রয়ের পর গাছে রাখা/না রাখা কোনোটির শর্ত করা হয় না।

২. ফল কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রি করা।

৩. বিক্রয়ের পর ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা।

ফলে কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যথা-

১. ফল এখনো প্রকাশ পায়নি, কলি বা ফুল আকারে আছে। এ ধরনের ফল সর্বসম্মতভাবে বিক্রয় জায়েজ নেই। কারণ বিক্রয়পণ্য (مَبِيع) অজ্ঞাত। আর এ ধরনের অজ্ঞাতা ঝগড়ার কারণ (مُنْفِئِي إِلَى الْمَسَازِعَةِ) হয়।

২. ফল প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু উপকার লাভের যোগ্য হয়নি। এত ছোট যে, মানুষ বা পশুর খাদ্যের উপযুক্ত হয়নি। শায়খুল ইসলাম খাহার জাদাহ (র.)-এর মতে এ ধরনের ফল বিক্রি জায়েজ নেই। কারণ, তা মূল্যাসম্পন্ন পণ্য (مَالٌ مُتَقَرَّمٌ) নয়। আর যে পণ্য মূল্যাসম্পন্ন নয় তার বিক্রি জায়েজ নেই। ইমাম কুদুরী প্রমুখের মতে জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীরের যাকাত অধ্যায়ে "উশর ও খারাজ পরিচ্ছেদে" এদিকেই ইশারা করেছেন। -[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৬২]

৩. উপকার লাভের যোগ্য হয়েছে, কিন্তু এখনও তাতে উপযোগিতা প্রকাশ (يُذَرُّ الصَّلَاحُ) পায়নি। এ ধরনের ফল তৎক্ষণাৎ পেড়ে নেওয়ার শর্তে সর্বসম্মতভাবে বিক্রি জায়েজ। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে সর্বসম্মতভাবে বিক্রি না জায়েজ। আর শর্তহীনভাবে বিক্রয়ের বৈধতা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। আর হানাফীদিগের মতে জায়েজ আছে। তবে ফল তৎক্ষণাৎ পেড়ে নিতে হবে। [ফাতুহুল কাদীর, প্রাগুক্ত]

৪. ফলের উপযোগিতা (صَلَاحٌ) প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু বর্ধন এখনও পূর্ণ হয়নি (لَمْ يَنْتَهَ عَظْمُهَا) আরো পুরু ও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ধরনের ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা হলে সর্বসম্মতভাবে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ। তৎক্ষণাৎ পেড়ে নেওয়ার শর্তে কিংবা শর্তহীনভাবে বিক্রি করা হলে সর্বসম্মতভাবে জায়েজ। তবে শর্তহীনভাবে ক্রয় করার সূরতে তৎক্ষণাৎ কেটে নিতে হবে।

৫. ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে এবং বর্ধন পূর্ণ হয়েছে (تَنَاهَى عَظْمُهَا)। এ ধরনের ফল তৎক্ষণাৎ পেড়ে নেওয়ার শর্তে এবং শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) বিক্রয় জায়েজ। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় জায়েজ কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) লোক প্রচলনের কারণে ইসতিহসান হিসেবে জায়েজ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতামতও এটি। -[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৬২]

قَوْلُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُتَقَرَّمًا فِي الْحَالِ أَوْ فِي النَّاسِ الْخ: সাহেবে হিদায়া বলেন, উপযোগিতা প্রকাশ পায়নি অথবা উপযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে উভয় ধরনের ফল তৎক্ষণাৎ কেটে নেওয়ার শর্তে (بِشَرْطِ الْقَطْعِ) বা শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) কেউ বিক্রি করলে তা জায়েজ। কারণ তা মূল্যাসম্পন্ন পণ্য (مَالٌ مُتَقَرَّمٌ)। যে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে তা এখন উপকার দানের যোগ্য। আর যে ফলের উপযোগিতা এখনও প্রকাশ পায়নি তা পরবর্তীকালে উপকার দানের যোগ্য। আর যা উপকার দানের যোগ্য তাই মূল্যাসম্পন্ন মাল। তবে ক্রেতার উপর তৎক্ষণাত ফল পেড়ে নেওয়া ওয়াজিব। কারণ, তা না হলে বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ গাছ ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ ফল দ্বারা আটক থাকে।

অবশ্য শায়খুল আইম্মা আস-সারাহসী ও শায়খুল ইসলাম খাহার জাদাহ (র.)-এর মতে, ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে [অর্থাৎ মানুষ বা পশুর খাবারের উপযুক্ত না হলে] বিক্রি বৈধ নয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমত বিতর্কিত।

আর যদি ক্রেতা গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত করে, যেমন ক্রেতা বলল, **إِنَّمَنْتُ الشَّرَّ عَلَى أَنِّي أَتْرَكُهُ عَلَى التَّخْلِيلِ**, তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। কারণ, গাছে রেখে দেওয়ার শর্তটি বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী। বিক্রয় চুক্তি বিক্রয়পণ্য হস্তান্তরিত হওয়াকে তাগাদা করে। অথচ এ সূরতে বিক্রয়পণ্য হস্তান্তরিত না হয়ে অন্যের (বিক্রেতার) মালিকানাধীন গাছকে আবদ্ধ রাখে। কিংবা বলা যায়, গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয়টা মূলত এক চুক্তির ভিতরে নতুন আরেকটি চুক্তি। কেননা, ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত এ শর্তের দুটি অর্থ হতে পারে—

১. ভাড়ার ভিত্তিতে ফলগুলো গাছে থাকবে। ক্রেতা মালিককে ফলগুলো পাকা পর্যন্ত গাছের ভাড়া দিতে থাকবে। বস্তুত এটা হলো ইজারা চুক্তি।

২. ধারের ভিত্তিতে ফলগুলো গাছে থাকতে দিবে। অর্থাৎ গাছগুলো কিছুদিনের জন্য ধারস্বরূপ ক্রেতার অধিকারে থাকবে। ফল পাড়া হয়ে গেলে মালিককে গাছ ফেরত দিবে। এ ধরনের চুক্তিকে ই‘আরা (إِعَارَة) বলা হয়। ইজারা ও ই‘আরা (إِعَارَة وَإِعَارَة) উভয়টি স্বতন্ত্র চুক্তি। আর নিয়ম হলো, কোনো চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগে অন্য কোনো চুক্তি তাতে প্রবিষ্ট হলে প্রথম চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যায়। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয়টা যেহেতু এরকম তাই বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। এরূপভাবে জমিতে রেখে দেওয়ার শর্তে ফসল বিক্রয়ও একই কারণে ফাসিদ হবে। কারণ, সে ক্ষেত্রেও ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [অর্থাৎ ফসল] বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [অর্থাৎ জমিকে] আবদ্ধ রাখে এবং বিক্রয় চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই অন্য আরেকটি চুক্তি তাতে প্রবিষ্ট হয়।

গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে ফল বিক্রয় করা হলে বিক্রয় চুক্তির মাঝে ইজারা বা ই‘আরা চুক্তিকে প্রবিষ্ট করানো হয়- সাহেবে হিদায়ার এ কথা সঠিক নয়। কারণ, প্রয়োজন ও প্রচলন না থাকায় গাছকে ইজারা তথা ভাড়ায় দেওয়াও জায়েজ নেই, ই‘আরা তথা ধারে দেওয়াও জায়েজ নেই। যখন গাছে ইজারা বা ই‘আরা নেই তখন এটাকে চুক্তি বলা যায় না। আর চুক্তি বলা না গেলে চুক্তির মাঝে চুক্তি- এ কথা আসে না। তবে ফসলের ক্ষেত্রে চুক্তির ভিতরে চুক্তি হয়। কারণ জমির ইজারা ও ই‘আরা উভয়টি জায়েজ। মোটকথা, গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে ফল বিক্রয় ফাসিদ এজন্য যে, তা বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী।

—[আইনী, প্রান্তক]

**قَوْلُهُ رَكَدًا إِذَا تَنَاهَى عَظْمُهَا عِنْدَ أَسَى حَبِيفَةِ الْخ** : ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়ে গেলেও ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় ফাসিদ। কারণ, এ শর্ত বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী। আর বিক্রয় চুক্তির বিরোধী শর্ত আরোপ করার কারণে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। অতএব এ সূরতেও বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) লোক সমাজে প্রচলনের কারণে ইসতিহসান হিসেবে (إِسْتِحْسَانًا) এ সূরতে বিক্রয়কে জায়েজ বলেছেন। এর উপরই ফতোয়া।

পক্ষান্তরে যে ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়নি, আরো পুরু ও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ফল যদি গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা হয় তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা ফাসিদ। কারণ, বিক্রেতার গাছ ও জমি থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে ফলের যে অংশের প্রবৃদ্ধি ঘটবে তা বিক্রয়কালে অবিদ্যমান (مُنْذُوم)। বিক্রয় চুক্তিতে এ অবিদ্যমান অংশের শর্ত করা হচ্ছে। আর নিয়ম হলো, বিক্রয় চুক্তিতে অবিদ্যমান অংশের শর্ত করা হলে তা ফাসিদ হয়ে যায়। তাই এ সূরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

يَخْلَافَ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهَ عَظْمُهَا ، لِأَنَّهُ شُرْطُ فِيهِ الْجُزْءُ الْمَعْدُومُ ، وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ بِمَعْنَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجَهَةِ مَحْظُورَةٍ ، وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَى عَظْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ هَذَا تَغْيِيرُ حَالَةٍ لَا تَحَقُّقُ زِيَادَةٍ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ ، وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِذْرَاكِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ التَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ ، فَبَقِيَ الْإِذْنُ مُعْتَبَرًا ، يَخْلَافُ مَا إِذَا اشْتَرَى الزَّرْعَ وَاسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ إِلَى أَنْ يُذْرِكَ وَتَرَكَهُ حَيْثُ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ لِلْجَهَالَةِ فَأَوْرَثَتْ حُبْنًا .

অনুবাদ : পক্ষান্তরে যখন ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়নি তখন বিষয়টি ভিন্ন। [সকলের ঐকমত্যে তা গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় না জায়েজ]। কারণ, তাতে অবিদ্যমান অংশের শর্ত করা হয়। অবিদ্যমান অংশ হলো [বিক্রয়ের পর] যা ভূমি গাছের উপাদান দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ক্রেতা তা শর্তহীনভাবে ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে [গাছে] রেখে দেয় তাহলে বর্ধিত অংশটুকু তার জন্য হালাল হবে। কিন্তু বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া যদি তা [গাছে] রেখে দেয় তাহলে মুলের উপর যা বর্ধিত হয়েছে তা সদকা করে দিবে। কারণ, তা নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে। আর ফলের বর্ধন পূর্ণ হওয়ার পর যদি তা [গাছে] রেখে দেয় তাহলে কিছুই সদকা করবে না। কারণ, এটা ফলের অবস্থার পরিবর্তন, বর্ধন সম্পন্ন হওয়া নয়। যদি ক্রেতা ফল [বর্ধন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে] শর্তহীনভাবে ক্রয় করে এবং [ক্রয়ের পর] গাছে রেখে দেয়, আর ফল পাকার সময় পর্যন্ত গাছ ভাড়া নেয় তাহলে তার জন্য বর্ধিতাংশটুকু হালাল হবে। কারণ প্রচলন ও প্রয়োজন না থাকার দরুন ভাড়া গ্রহণ চুক্তি বাতিল হবে, কিন্তু বিক্রেতার অনুমতি বিবেচ্য থাকবে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি ফসল ক্রয় করে আর ফসল পাকার সময় পর্যন্ত জমি ভাড়া নেয় এবং [সে মতে] ফসল [জমিতে] রেখে দেয় তাহলে তার জন্য বর্ধিতাংশটুকু হালাল হবে না। কেননা, [ফসল পাকার সময়কাল] অজ্ঞাত থাকার কারণে ভাড়ার চুক্তি ফাসিদ। সুতরাং তাতে অবৈধতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ الخ : ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়নি, আরো পুরু ও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ফল যদি শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) কেউ ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতি সাপেক্ষে গাছে রেখে দেয় তাহলে বিক্রেতার গাছ ও জমি থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে ফলে যে অংশের প্রবৃদ্ধি ঘটবে তা তার জন্য হালাল হবে। আর যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া মাঝে তাহলে ফলের যে অংশটুকু বর্ধিত হয়েছে তা সদকা করে দিবে। অর্থাৎ ক্রয়কালে ফলের দায় কত ছিল আর এখন বেড়ে কত হয়েছে তা হিসাব করে যে পরিমাণ অর্থ বের হয় তা সদকা করে দিবে।—[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৬৩]

ফল (مُطْلَقًا) : যদি ফলের বর্ধন পূর্ণ ও পুষ্ট হওয়ার পর কেউ শতহীনভাবে (مُتْلَقًا) ফল  
 ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া গাছে রেখে দেয় তাহলে তাকে কিছুই সদকা করতে হবে না। কারণ, এ সুরতে  
 বিক্রেতার গাছ ও জমি থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে ফলে কোনো অংশের প্রবৃদ্ধি ঘটেনি। বরং ফলের অবস্থায় পরিবর্তন  
 এসেছে। আগে কাঁচা ছিল, এখন সূর্যের আলো তাকে পাকিয়েছে, চাঁদের আলো তাতে রং ধরিয়েছে, আর নক্ষত্রমণ্ডলী তাতে  
 স্বাদ এনেছে।—‘আইনী, প্রাপ্তক।’ অতএব অন্যের মালিকানাধীন বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়নি। তাই তাকে কিছু সদকা  
 করতে হবে না।

**একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :**

এর উত্তর হলো, এখানে দু'টি বিষয়; বাতিল ও ফাসিদ। বাতিল হলো (مَا لَا يَبُحُّ أَصْلًا وَلَا وَضْعًا وَلَا شَرْعًا) যা মৌলিক, আনুসঙ্গিক ও শরয়ী কোনো বিচারেই শুদ্ধ নয়। বরং তা অস্তিত্বহীন (مَعْدُوم) একটি ব্যাপার। গাছ ইজারার নেওয়ার সূরতে ইজারার বাতিল হওয়ার অর্থ হলো, যেন ইজারার প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়নি। বরং বিক্রেতার অনুমতিটা এখানে মুখ্যভাবে উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং অনুমতি যখন পাওয়া গেল তখন বর্ধিত অংশটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে।—[নিবান্য : খ. ৭. পৃ. ৬৩।

قَوْلُهُ وَيُخْلَقُ مَا إِذَا اشْتَرَى الزَّرْعَ وَاسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ الخ কেউ যদি ফসল ক্রয় করে ফসল জমিতে রেখে দেয় এবং ফসল পাকার সময় পর্যন্ত বিক্রেতা থেকে জমি ইজারা নেয় তাহলে তার জন্য ফসলের বর্ধিত অংশটুকু হালাল হবে না। কারণ ফসল পাকতে কতদিন লাগবে তা অজানা থাকার দরুন ইজারার মেয়াদ অজ্ঞাত। আর মেয়াদ অজ্ঞাত হলে ইজরা ফাসিদ হয়। ফাসিদ হলো (مَا يَبُوعُ أَثْلًا وَصَفًا) যা মৌলিক বিচারে শুদ্ধ, কিন্তু আনুসঙ্গিক বিচারে শুদ্ধ নয়। তা অতিবৃশীল (مَوْزُون) ব্যাপার জমি ইজারা দেওয়ার সূত্রে ইজারা ফাসিদ হওয়ার অর্থ হলো, ইজারার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রক্রিয়াটি অশুদ্ধ হয়েছে। তাই তা বাস্তবায়িত হবে না। যেহেতু জমিতে ফসল রাখার অনুমতি ইজারার প্রেক্ষিতে ছিল, তা যখন বাস্তবায়িত হবে না তখন অনুমতিও কার্যকর হবে না। আর অনুমতি কার্যকর না হওয়ার কারণে বর্ধিত অংশের মাঝে অবৈধতা সৃষ্টি হবে। তাই বর্ধিত অংশটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে না।



وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا فَاتَّمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُ تَسْلِيمُ الْمَيْعِ لِتَعَدُّرِ التَّمْيِيزِ، وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِإِخْتِلَاطِ وَالْقَوْلِ قَوْلُ الْمُشْتَرَى فِي مَقْدَارِهِ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَكَذَا فِي الْبَاذِنَجَانِ وَالْبِطِّيخِ، وَالْمَخْلُصُ أَنْ يَشْتَرَى الْأَصُولَ لِيَخْصُلَ الزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِ.

অনুবাদ : কেউ যদি শর্তহীনভাবে ফল ক্রয় করে, কিন্তু দখল বুঝে নেওয়ার পূর্বে আরো কিছু নতুন ফল ধরে সে ক্ষেত্রে [বিক্রীত ফল ও নতুন ফলের মাঝে] পার্থক্য করা অসম্ভব বিধায় বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি দখল বুঝে নেওয়ার পর নতুন আরো কিছু ফল ধরে তাহলে [বিক্রয় ফাসিদ হবে না, কিন্তু বিক্রীত ফল ও নতুন ফলের] সংমিশ্রণের কারণে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে সমগ্র ফলে অংশীদার হবে। আর বর্ধিত ফলের পরিমাণের ব্যাপারে ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। কারণ ফল তার দখলে আছে। বেগুন ও খরবুযাতেও একই হুকুম। [বিক্রয় ফাসিদ হওয়া থেকে] বাঁচার উপায় হলো গাছ কিনে নেওয়া। যাতে ক্রেতার মালিকানাতে বর্ধন অর্জিত হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি গাছে বিদ্যমান ফলসমূহ, গাছে রেখে দিবে বা তৎক্ষণাৎ পেড়ে নিবে এ ধরনের কোনো শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে ক্রয় করল। ক্রয়ের পর বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলো, কিন্তু সে এখনও ক্রয়কৃত ফল দখল বুঝে নেয়নি। ইতোমধ্যে গাছে আরো কিছু নতুন ফল ধরেছে এবং তা বেড়ে উঠেছে। এখন কোন ফলগুলো বিক্রিত আর কোন ফলগুলো নতুন তা কোনোক্রমে পার্থক্য করা যাচ্ছে না। তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ পার্থক্য করা অসম্ভব হওয়ার কারণে বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ফলগুলো বুঝিয়ে দিতে পারছে না। আর যে সূরতে বিক্রীত পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া যায় না সেই সূরতে বিক্রয় ফাসিদ হয়। তাই এ সূরতেও বিক্রয় ফাসিদ হবে।

ক্রেতা বিক্রীত ফলে দখল বুঝে নিয়েছে, কিন্তু এখনও ফল পেড়ে নেয়নি। ইতোমধ্যে গাছে আরো কিছু নতুন ফল ধরেছে এবং বেড়ে উঠেছে। এখন কোন ফলগুলো ক্রেতার, আর কোন ফলগুলো নতুন তা পার্থক্য করা যাচ্ছে না। এ সূরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। কারণ বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রয়পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ায় বিক্রয় চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। তবে যেহেতু ক্রেতার মালিকানাধীন বিক্রীত ফলগুলো এবং বিক্রেতার মালিকানাধীন নতুন ফলগুলো এমনভাবে মিশে আছে যে, সেগুলোর মাঝে পার্থক্য করা যাচ্ছে না তাই ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে গাছের সমগ্র ফলে অংশীদার হবে। তবে ফলগুলো ক্রেতার দখলে থাকার কারণে কি পরিমাণ ফল নতুন ধরেছে এ বিষয়ে ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। কারণ নিয়ম হচ্ছে, দখলকৃত জিনিসের ব্যাপারে দখলকারীর কথা ধর্তব্য হয়। অতএব এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে।

বেগুন, খরবুযা ও অন্যান্য ফলেও একই হুকুম। অর্থাৎ, কেউ যদি গাছে বিদ্যমান বেগুন/খরবুযা বা অন্য কোনো ফল ক্রয় করে এবং দখল বুঝে নেওয়ার পূর্বে গাছে নতুন আরো কিছু বেগুন/খরবুযা ধরে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি দখল বুঝে নেওয়ার পর নতুন বেগুন/খরবুযা ধরে তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা গাছের সমগ্র ফলে অংশীদার হবে।

قَوْلُهُ وَالْمَخْلُصُ أَنْ يَشْتَرَى الْأَصُولَ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, দখল বুঝে নেওয়ার পূর্বে গাছে নতুন ফল ধরার সূরতে বিক্রয় ফাসিদ হওয়া থেকে বাঁচার উপায় হলো, কিছু টাকা বাড়িয়ে ফলের গাছও কিনে নেওয়া। ফল গাছে নতুন যত ফল ধরবে তা ক্রেতার মালিকানায় ধরবে। ক্রেতাই সেগুলোর মালিক হবে। এতে বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। আর ফল পেড়ে নেওয়ার পর ক্রেতা পূর্ব মূল্যে বিক্রেতার কাছে গাছটি বিক্রি করে দিবে। তবে এটা তখনই সম্ভব, যখন ক্রেতা পূর্ব মূল্যে বিক্রেতার কাছে গাছ বিক্রি করবে বলে বিক্রেতা নিশ্চিত থাকবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنَعَ ثَمَرُهُ ، وَاسْتَشْنَى مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً ، خِلَافًا لِمَالِكٍ (رح) ، لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ وَاسْتَشْنَى تَخْلًا مَعِينًا لِأَنَّ الْبَاقِيَ مَعْلُومٌ بِالسَّاهِدَةِ قَالَ : (رض) قَالُوا : هَذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ ، أَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا يَجُوزُ إِبْرَاقُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِإِنْفِرَادِهِ يَجُوزُ إِسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْعَقْدِ ، وَيَبْنَعُ قَفِيزٌ مِنْ صُبْرَةٍ جَائِزٌ ، فَكَذَا إِسْتِثْنَاءُهُ ، بِخِلَافِ إِسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ وَأَطْرَافِ الْحَيَوَانِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَكَذَا إِسْتِثْنَاؤُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, “নির্দিষ্ট কয়েক রিতল বাদ দিয়ে [গাছের] ফল বিক্রি করা জায়েজ নেই।” তবে ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। [জায়েজ না হওয়ার] কারণ, বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ফলের পরিমাণ অজ্ঞাত। তবে নির্দিষ্ট গাছ বাদ দিয়ে ফল বিক্রি করলে তার ব্যাপার ভিন্ন। কারণ, [সে ক্ষেত্রে] অবশিষ্ট ফলগুলোর পরিমাণ প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা জ্ঞাত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ফিকহবিদগণ বলেছেন, এটা [ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে] হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা। ইমাম তহাবী (র.)-এর অভিমতও এটি। পক্ষান্তরে জাহেবী বর্ণনা অনুসারে এটা জায়েজ হওয়া উচিত। কেননা, কায়দা হলো, যার উপর স্বতন্ত্রভাবে চুক্তি করা জায়েজ তাকে চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও জায়েজ। খাদ্যশস্যের স্তুপ থেকে এক কফিয় বিক্রয় জায়েজ, তা থেকে এক কফিয়কে বাদ দেওয়াও জায়েজ। পশুর গর্ত ভ্রণ ও অঙ্গ বিশেষকে [বিক্রয় চুক্তি থেকে] বাদ দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা আলাদা বিক্রি করা যেমন জায়েজ নেই, তেমনি [বিক্রয় থেকে] তা বাদ দেওয়াও জায়েজ নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল বাদ দিয়ে গাছের অবশিষ্ট ফল বিক্রি করে, যেমন কেউ বলল, এই গাছে যতগুলো আম আছে তা থেকে দশ কেজি বা একশ’টি আম বাদে অবশিষ্ট আমগুলো আমি একশ’ টাকায় বিক্রি করলাম, তাহলে এ বিক্রয় বৈধ হবে না। দলিল হলো, মোট পরিমাণ থেকে দশ কেজি বাদ দিলে গাছে কি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তা অজ্ঞাত (مَجْهُول)। আর এ ধরনের অজ্ঞাতা ঋণাড়ার কারণ (مُنْفَضٍ إِلَى الْمَنَازَعَةِ) হয় বিধায় তা বিক্রয় বৈধ হওয়ার প্রতিবন্ধক। তাছাড়া এও তো হতে পারে যে, ফল পাড়ার পর ফলের সর্বসাকুল্য পরিমাণই দাঁড়াবে দশ কেজি। তখন মূল্যের বিপরীতে পণ্য অবিদ্যমান (مُعْدُوم) হবে। আর বিক্রয়পণ্য অবিদ্যমান হলে বিক্রয় জায়েজ হয় না।

তবে কেউ যদি বাগানের নির্দিষ্ট গাছকে বাদ রেখে অবশিষ্ট গাছের ফলসমূহ বিক্রি করে তাহলে তা বৈধ হবে। কারণ, অবশিষ্ট গাছের সংখ্যা কত এবং তাতে কি পরিমাণ ফল আছে তা প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা জানা যাবে। তাই এ সুরতে বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত নয়।

ইমাম মালিক (র.) প্রথমোক্ত মাসাআলায় ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে বাগানের নির্দিষ্ট গাছকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট গাছের ফল বিক্রয় যেরূপ বৈধ, তেমনি গাছের নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ ফল বিক্রয়ও বৈধ।

—[ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৬৯]

عَنْهُ قَالَ : قَالُوا : هَذَا رَوَاةُ الْحَنَافِ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, “নির্দিষ্ট কয়েক রিতিল বাদ দিয়ে [গাছের] ফল বিক্রি করা জায়েজ নেই” ইমাম কুদূরীর এ উক্তি মূলত ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর বর্ণনা। ইমাম তহাবী (র.)-এর অভিমতও এটি। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.) ও এ মতামত পোষণ করেন।

তবে জাহেরী রিওয়ায়াত অনুসারে এ সূরতে বিক্রয় বৈধ হওয়া উচিত। কারণ, জাহেরী রিওয়ায়াতে এই মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসকে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ তাকে বিক্রয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও জায়েজ। উদাহরণত শস্যস্তুপ থেকে এক কফিয় শস্য স্বতন্ত্রভাবে যেরূপ বিক্রি করা জায়েজ তেমনি শস্যস্তুপ থেকে এক কফিয়কে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শস্য বিক্রি করাও জায়েজ। পশুর ভ্রূণ গর্ভ ও অঙ্গবিশেষ (الْحَمْلُ وَالْأَطْرَانُ) যেরূপ আলাদাভাবে বিক্রি করা জায়েজ নেই, তেমনি তাকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পশু বিক্রয়ও জায়েজ নেই। পশুর গর্ভ ভ্রূণ বাদ দেওয়ার সূরত হলো, কেউ বলল, আমি এ গরুটি তার গর্ভস্থিত বাছুর ছাড়া পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। অঙ্গ বিশেষ বাদ দেওয়ার সূরত হলো, কেউ বলল, আমি একটি রান বাদে এই পুরা গরুটি তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম।

গাছের নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল যেরূপ স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ, উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে তেমনি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফল বিক্রয় করাও জায়েজ হবে।

তবে নির্দিষ্ট কয়েক কেজি বাদ দিলে অবশিষ্ট ফলের পরিমাণ সম্পর্কে যে অজ্ঞতা (جَهْلٌ) থাকে এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, অবশিষ্ট ফলের ওজন অজানা থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের হিসেবে পরিমাণ অজানা থাকে না। তাছাড়া এ সূরতে ফলের বিক্রয় হচ্ছে অনুমান হিসেবে, ওজন হিসেবে নয়। আর অনুমান হিসাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ওজন জানা থাকা জরুরি নয়। বরং ইশারা এবং প্রত্যক্ষ দর্শনই বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আর বাদ দেওয়ার পরিমাণটি যদি ফলের সর্বসাকুল্য পরিমাণ হয়, তবে এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, সে ক্ষেত্রে إِنْسِفْنَا، الْكُلِّي مِنَ الْكُلِّي তথা পণ্যের পুরোটাকেই বাদ দেওয়া হলো। আর কায়দা আছে, যদি الْكُلِّي مِنَ الْكُلِّي হয় তাহলে إِنْسِفْنَا، তথা বাদ দেওয়ার উক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। যখন বাদ দেওয়ার উক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে তখন বিক্রয় গাছের সমগ্র ফলে হবে। আর বাদ দেওয়া ছাড়া গাছের সমগ্র ফল বিক্রি করা জায়েজ আছে। তাই এ সূরতেও বিক্রয় জায়েজ হবে।

—[ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০]



وَيَجُوزُ بَيْعُ الْجَنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا، وَالْبَاقِلَى فِي قَشْرِهِ، وَكَذَا الْأَرَزُّ وَالسَّنْسِمُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح): لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَى الْأَخْضَرِ، وَكَذَا الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْفُسْتُقُ فِي قَشْرِهِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُ، وَلَهُ فِي بَيْعِ السَّنْبُلَةِ قَوْلَانِ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ، لَهُ أَنْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ بِمَا لَا مَنَفْعَةَ لَهُ فِيهِ، فَاشْبَهَ تُرَابَ الصَّاعَةِ إِذَا بَيْعَ بِجِنْسِهِ، وَلَنَا مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزُيَّ، وَعَنْ بَيْعِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ، وَيَأْمَنَ الْعَامَةُ، وَلَأنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنْبُلِهِ كَالشَّعِيرِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ مَا لَا مَتَقَرُّوْماً، بِخِلَافِ تُرَابِ الصَّاعَةِ، لِأنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا، حَتَّى لَوْ بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ جَازَ وَفِي مَسْئَلَتِنَا لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِشَبْهَةِ الرِّبَا لِأنَّهُ، لَا يُدْرَى قَدْرُ مَا فِي السَّنَابِلِ.

অনুবাদ : শীষে থাকা গম এবং খোসায় আবৃত সবজি বিক্রি করা জায়েজ আছে। চাউল ও তিলের হুকুমও এরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সবুজ খোসা বিশিষ্ট সবজি বিক্রি করা জায়েজ নেই। উপরের খোসা আবৃত অবস্থায় আখরোট, বাদাম ও পেস্তা বিক্রয়ের হুকুমও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এরূপ। শীষে থাকা গম বিক্রয় সম্পর্কে তার দু'টি অভিমত রয়েছে। আমাদের মতে এর সবই জায়েজ। তাঁর দলিল হলো, চুক্তিকৃত পণ্য এমন জিনিস দ্বারা আবৃত যাতে ক্রেতার কোনো উপকার নেই। সুতরাং তা স্বর্ণকারের ছাই সদৃশ হলো যখন তা সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। আমাদের দলিল হচ্ছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রং ধরার আগে গাছে থাকা খেজুর বিক্রি করতে এবং শুভ্রতা আসার ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মুক্ত হওয়ার আগে শীষে থাকা গম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া গম একটি উপকার লাভযোগ্য শস্য। সুতরাং যবের মতো তা শীষে থাকা অবস্থায় বিক্রি জায়েজ হবে; উভয়ের যোগসূত্র হলো, উভয়টি মূল্যসম্পন্ন মাল। স্বর্ণকারের ছাই তা থেকে ভিন্ন। কারণ সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করা সুদের সম্ভাবনার কারণে জায়েজ নেই। অবশ্য যদি তাকে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে জায়েজ আছে। আর আমাদের এ মাসআলায়ও যদি শীষসহ গমকে সমজাতীয় শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে সুদের সম্ভাবনার কারণে তা জায়েজ নেই। কেননা শীষের মাঝে কি পরিমাণ গম আছে তা জানা যায় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فُسْتُقٌ : বাদাম : لَوْزٌ : আখরোট : جَوْزٌ : খোসা : قَشْرٌ : সজি : بَاقِلَى : শীষ, যাতে শস্যদানা জন্ম নেয় : سُنْبُلٌ : গম : الْجَنْطَةُ : পেস্তা : بَادَامٌ : চাউল : سِنْبِلٌ : তিল।

শীষসহ গম এবং খোসাসহ সবজি বিক্রি করা জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বলেন, সবুজ খোসা বিশিষ্ট সবজি বিক্রি করা জায়েজ নেই। এমনভাবে উপরের শক্ত খোসাসহ আখরোট, বাদাম ও পেস্তা বিক্রি করা তাঁর মতে জায়েজ নেই। আর শীষসহ গম বিক্রয় সম্পর্কে তাঁর দু'টি অভিমত আছে। আগের অভিমত হলো জায়েজ আছে। আর পরের অভিমত হলো জায়েজ নেই। তাঁর দলিল হলো কিয়াস। তিনি বলেন, চুক্তিপণ্য (مَعْقُودٌ عَلَيْهِ) অর্থাৎ, গম, সজি এবং আখরোট, বাদাম ও পেস্তার শাখ খোসা দ্বারা আবৃত, আর খোসায় ফ্রেতার কোনো উপকার নেই। খোসার ভিতরে বিক্রয় পণ্য আছে কিনা বা কতটুকু আছে তা অজ্ঞাত। সুতরাং এটা স্বর্ণকারের ছাইকে সমজাতীয় ছাইয়ের বিনিময়ে বিক্রি করার মতো। স্বর্ণকারের ছাইয়ের মাঝে স্বর্ণ বা রূপার কণা থাকে। কিন্তু তা লুকায়িত থাকে। আর এমন জিনিসে লুকায়িত থাকে যাতে ফ্রেতার কোনো উপকার নেই অর্থাৎ ছাই। স্বর্ণকণা মিশ্রিত এ ছাইকে স্বর্ণের বিনিময়ে কিংবা রূপার কণা মিশ্রিত ছাইকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ নেই। কারণ ছাইয়ের আড়াল্লে স্বর্ণ বা রূপার কণা আছে কিনা তা অজ্ঞাত। এমনভাবে শীষসহ গম বিক্রি করার সুরতেও শীষের মাঝে গম আছে কি নেই তা অজ্ঞাত থাকে এবং গম এমন জিনিস দ্বারা আবৃত, যাতে ফ্রেতার কোনো উপকার নেই। অতএব শীষসহ গমের বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে।

আমাদের দলিল : হাদীস-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُزْمَى وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَرَأْسُ الْعَامَةِ -

রাসুলুল্লাহ ﷺ [ফলে] রং না ধরা পর্যন্ত গাছে থাকা খেজুর বিক্রি করতে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে নিরাপদ ও সাদা না হওয়া পর্যন্ত শীষসহ গম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) বাতীত আইন্বায়ে সিতার সকলে তাদের কিতাবে সংকলন করেছেন। [বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৬৭] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শীষসহ গম বিক্রি করা জায়েজ আছে। তবে বিক্রয়টা অবশ্যই প্রাকৃতিক বিপদ থেকে নিরাপদ ও পাকার পর হতে হবে। যখন শীষসহ গম বিক্রি করার বৈধতা প্রমাণিত হলো তখন খোসাসহ অন্যান্য ফল ও শস্য বিক্রি করাও জায়েজ হবে।

আকলী দলিল : শীষে থাকা গম উপকার লাভযোগ্য শস্য। তাই তা যবের মতো। শীষে থাকা যবের সাথে শীষে থাকা গমের সাদৃশ্যের যোগসূত্র হলো উভয়টা মূল্যসম্পন্ন (مَالٌ مَّقْشُورٌ) ও উপকার লাভযোগ্য মাল। অতএব শীষসহ যব বিক্রি করা জায়েজ হলে শীষসহ গম বিক্রি করাও জায়েজ হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে খোসা ও শীষে উপকার নেই বলে যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ এ খোসা ও শীষের মধ্যেই গম ইত্যাদি জমা করে আট্কাই তা 'আলা সেতুলোকে নিরাপদ রাখেন। আর এটা নিঃসন্দেহে একটি উপকার। সুতরাং শীষসহ গম বিক্রি করা জায়েজ হবে।

تَوَلَّى يَخْلُفُ تَرَابِ السَّاعَةِ الْخ: স্বর্ণকণা মিশ্রিত ছাইকে সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী নাজায়েজের কারণ হলো স্বর্ণকণাগুলো উপকার লাভযোগ্য নয় এমন জিনিস তথা ছাইয়ের মাঝে লুকায়িত থাকা। কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং ছাইয়ের মাঝে কি পরিমাণ স্বর্ণকণা আছে তা জানা না থাকায় সুদের সম্ভাবনার কারণে সমজাতীয় স্বর্ণকণা মিশ্রিত ছাইয়ের বিনিময়ে তার বিক্রয় জায়েজ নেই। তাই সুদের সম্ভাবনা যেখানে নেই অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে উদাহরণত স্বর্ণকণা মিশ্রিত ছাইকে রূপার কণা মিশ্রিত ছাইয়ের বিনিময়ে বিক্রি করা হলে তা জায়েজ। যদি চুক্তিকৃত পণ্য (مَعْقُودٌ عَلَيْهِ) লুকায়িত থাকা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হতো তাহলে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয়ও না জায়েজ হতো। কিন্তু তা হচ্ছে না।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, চুক্তিকৃত পণ্য লুকায়িত থাকা বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ নয়। এ বিষয়টিই যদি আলোচ্য মাসআলায় পাওয়া যায় অর্থাৎ শীষে থাকা গমকে সমজাতীয় গমের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে তাও সুদের সম্ভাবনার

কারণে না জায়েজ হবে। কারণ, শীষের মাঝে কি পরিমাণ গম আছে তা জানা নেই। সে ক্ষেত্রে সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হলে কমবেশি হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, শাফেয়ী ফিকহবিদদের কেউ কেউ আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি পেশ করেন-

۱. إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। শীষের মাঝে আদৌ গম আছে কিনা, থাকলে কি পরিমাণ আছে তা অজ্ঞাত থাকায় এ ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাই তা না জায়েজ হবে।

۲. إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّعَبِ حَتَّى يُفْرَكَ . (رَوَاهُ ابْنُ جِبَّانَ)

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ শীষ থেকে না ছাড়ানো পর্যন্ত শস্যাদানা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। অতএব শীষে থাকা অবস্থায় গম বিক্রি করা জায়েজ নেই।

হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম প্রথম হাদীসের উত্তরে বলেন, উক্ত হাদীসটি মূলত উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা, শিকার করার পূর্বে নদী বা ডোবার মাছ বিক্রি করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, বিক্রীতপণ্য নির্ধারিত এবং অর্পণযোগ্য না হলে তা ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু শীষে থাকা গম অর্পণযোগ্য এবং ইশারার মাধ্যমে নির্ধারিত। আর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইশারাকৃত বস্তুর পরিমাণ জানা বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি নয়। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭১]

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো, حَتَّى يُفْرَكَ শব্দে হাদীসটি গরীব (غَرِيب)। হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) ব্যতীত অন্য কোনো রাবীর রিওয়ায়াতে এ শব্দ নেই। এটাকে সঠিক মেনে নিলেও এর ব্যাখ্যা হলো, حَتَّى يُبَيِّنَ بِحَالٍ يَتَأَنَّى نَبُو الْفَرْكَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ শীষ থেকে ছাড়ানোর উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শস্যাদানা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

মাসআলা : সুপারি, নারিকেল, বেল, আম, কাঠাল, কলা প্রভৃতি খোসা জাতীয় ফল খোসায় আবৃত থাকা অবস্থায় বিক্রি করা জায়েজ। একরূপভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারজাতকৃত টিনজাত খাবার, বিভিন্ন দ্রব্যের প্যাকেট, বোতলে ভরা পানীয়, ঔষধ ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েজ।

وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَغْلَاقُ ، لِأَنَّهُ  
مُرْكَبَةٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ ، وَالْمِفْتَاحُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْغَلَقِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ  
بَعْضٍ مِنْهُ ، إِذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِدُونِهِ .

অনুবাদ : কেউ যদি বাড়ি বিক্রি করে তাহলে তার তালার চাবিগুলো বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, তালার বাড়ির সাথে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সংযুক্ত বিধায় তালার বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তালার বিক্রয় চুক্তিতে উল্লেখ ছাড়াই চাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, চাবি তালার অংশ বিশেষ। কেননা, চাবি ছাড়া তালার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَغْلَاقٌ শব্দটি বহুবচন। অর্থ তালার। একবচন غَلَقٌ। মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করেছে। বাড়ির দরজার সাথে ফিটিং করা তালার আছে। তাহলে বিক্রয় চুক্তিতে তালার ও তার চাবি অন্তর্ভুক্ত হবে। তালার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ, তালার বাড়ির দরজার সাথে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সংযুক্ত। আর যা কোনো জিনিসের সাথে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য যুক্ত হয় তা ঐ জিনিসের অনুবর্তী হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই তালার বাড়ি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর চাবি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ, চাবি ছাড়া তালার কোনো কাজে আসে না। চাবি তালারই একটি অংশের মতো। তাই শুধু তালার বিক্রি করার ক্ষেত্রে যেমন চাবির উল্লেখ ছাড়াই চাবি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি এ সুরতেও তালার অংশ হিসেবে চাবি বাড়ি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

মাসআলা : উপরোক্ত মাসআলা হলো দরজার কাঠ/ পাল্লার সাথে ফিটিং করা তালার ক্ষেত্রে। কিন্তু যে তালার দরজার কাঠ/ পাল্লার সাথে ফিটিং করা নয় তা এবং তার চাবি বাড়ি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। -[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৬৯]

قَالَ : وَأَجْرَةُ الْكَيَالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا الْكَيَلُ فَلَابَدٌ مِنْهُ لِلتَّسْلِيمِ ، وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ ، وَمَعْنَى هَذَا إِذَا بَيْعَ مِكَايَلَةً ، وَكَذَا أَجْرَةُ الْوَزَانِ وَالذَّرَاعِ وَالْعِدَادِ ، وَأَمَّا النِّقْدُ فَالْمَذْكُورُ رَوَايَةُ ابْنِ رُسْتَمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) ، لِأَنَّ النِّقْدَ يَكُونُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْوَزَنِ ، وَالْبَائِعُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِيَمِيزَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِيَعْرِفَ الْمَعِينَبَ لِيَرُدَّهُ ، وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمِ الْجَيِّدِ الْمُقَدَّرِ ، وَالْجَوْدَةُ تُعْرَفُ بِالنِّقْدِ كَمَا يُعْرَفُ الْقَدْرُ بِالْوَزَنِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قَالٌ : وَأَجْرَةُ وَزَانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ، وَيَالْوَزَنِ يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ .

অনুবাদ : পাত্র দ্বারা পণ্য পরিমাপকারী ও মূল্য মুদ্রা পরখকারীর মঞ্জুরি বিক্রেতার দায়িত্বে। পরিমাপকারীর বিষয়টি এ জন্য যে, [ক্রেতার কাছে] সোপর্দ করার জন্য পরিমাপ করা জরুরি। আর সোপর্দ করার দায়িত্ব বিক্রেতার। এর অর্থ হলো, বিক্রীত দ্রব্য যদি পাত্রের পরিমাপে বিক্রি করা হয়। পণ্য দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপকারী, গজে পরিমাপকারী এবং গণনাকারীর মঞ্জুরিও তদ্রূপ হকুম। মূল্য মুদ্রা পরখকারীর মঞ্জুরি বিষয়ে উপরোক্ত বক্তব্যটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে ইবনে রুস্তমের বর্ণনা। কারণ, পরখ করার বিষয়টি হয় অর্পণের পর। তুমি কি দেখ না যে, ওজন করার পর মুদ্রা পরখ করা হয়। আর বিক্রেতাই এর প্রতি মুখাপেক্ষী, যাতে সে যে মুদ্রার সাথে তার হক জড়িত তাকে অন্য মুদ্রা থেকে পৃথক করতে পারে কিংবা ক্রটিযুক্ত মুদ্রাগুলোকে ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করতে পারে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে ইবনে সিমআর বর্ণনা অনুসারে [মুদ্রা পরখকারীর মঞ্জুরি] ক্রেতার জিম্মায়। কারণ, ক্রেতা নির্ধারিত উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলো অর্পণ করার মুখাপেক্ষী। আর উৎকৃষ্টতা বুঝা যায় পরখ করার দ্বারা যেমন পরিমাণ জানা যায় দাঁড়িপাল্লায় ওজন করার দ্বারা। অতএব মুদ্রা পরখ করার মঞ্জুরি ক্রেতার জিম্মায় হবে। ইমাম (র.) কুদূরী বলেন, মূল্যমুদ্রা ওজনকারীর মঞ্জুরি ক্রেতার জিম্মায়। কারণ, আমরা বলেছি যে, ক্রেতাই মূল্য মুদ্রা অর্পণ করার মুখাপেক্ষী। আর অর্পণ হয় ওজনের মাধ্যমে। [সুতরাং ওজনের মঞ্জুরি তার উপর বর্তাবে।]

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, পণ্য বিক্রয়ে বিভিন্ন পরিমাপ আছে— ১. (كَيَل) পাত্রের পরিমাপ। ২. (وَزَن) দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ। ৩. (ذَرَاع) গজের পরিমাপ। ৪. (عَدَد) গণনার পরিমাপ।

সূরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি পণ্য বিক্রি করে তাহলে ক্রেতাকে মেপে দেওয়ার খরচ বিক্রেতার জিম্মায়। কায়ল পরিমাপে বিক্রি করলে কয়ালের মঞ্জুরি বিক্রেতা বহন করবে। তদ্রূপ দাঁড়িপাল্লায় মেপে বিক্রি করলে দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপকারীর



মজুরি, এমনভাবে গড়ে মাশে বিক্রি করলে গড়ে পরিমাপকারীর মজুরি এবং গণনা করে বিক্রি করলে গণনাকারীর মজুরি বিক্রোতা বহন করবে। দলিল হলো, ক্রেতার নিকট বিক্রীত পণ্য সোপর্দ করতে গেলে তার পরিমাপ করা জরুরি। আর বিক্রীত পণ্য সোপর্দ করা বিক্রোতার উপর আবশ্যিক। তাই তার ব্যয়ভারও তার উপর আবশ্যিক হবে।

قَوْلُهُ نَقْدٌ مানে পরখ করা। পূর্ব যুগে বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। এ সব মুদ্রার মাঝে ডাল (الْحَبْدُ), খারাপ (الرَّوِي), মধ্যম (الْأَوْسَطُ) বিভিন্ন রকমের ছিল। মূল্য মুদ্রার পরিমাণ বেশি হলে সাধারণত ওজন করে মুদ্রা অর্পণ (تَسْلِيمٌ) করা হতো। এ সব মুদ্রা বিক্রেতার কাছে আসলে তার প্রকার পরখ করে নিতে হতো। অনেক ক্ষেত্রে পরখ করার জন্য আলাদা লোক রাখা হতো। বর্তমান যুগে কাগজি নোটের পরিমাণ বেশি হলেও তা যাচাই করার জন্য আলাদা লোকের প্রয়োজন হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এ মুদ্রা পরখকারী মজুরি কার জিমায়? ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে রুস্তম (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মূল্য মুদ্রা (تَكْنٌ) পরখকারীর মজুরি বিক্রেতার জিমায়। আর ইবনে সিমাতা (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ক্রেতার জিমায়।

ইবনে রুস্তম (র.)-এর বর্ণনার যৌক্তিকতা হলো, মূল্য মুদ্রা (نَمَن) ক্রেতার পক্ষ থেকে ওজন করে বিক্রেতার কাছে অর্পণের (تَلِيم) পর তা পরখ করা হয়। আর তা হয় বিক্রেতার প্রয়োজনেই। কারণ, তার প্রাপ্য মুদ্রার চেয়ে বেশি এসে গেলে তার প্রাপ্যকে আলাদা করা এবং অতিরিক্ত মুদ্রাগুলো ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া তার কর্তব্য। তাছাড়া তার প্রাপ্য উৎকৃষ্ট (الْحَبْدُ) মুদ্রার স্থলে নিম্নমানের (الرَدِي) মুদ্রা এসে গেলে তা ফেরত দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা কিংবা প্রাপ্য মুদ্রার চেয়ে কম হলে ক্রেতার কাছে অবশিষ্টগুলো দাবি করার জন্য মুদ্রাগুলো পরখ করা তার প্রয়োজন। অতএব এর ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে।

ইবনে সামাআ (র.)-এর বর্ণনায় যৌক্তিকতা হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার চুক্তিতে নির্ধারিত উৎকৃষ্ট মুদ্রা বিক্রেতাকে অর্পণ করতে ক্রেতা মুখাপেক্ষী। আর উৎকৃষ্টতা বুঝা যায় পরখ করার দ্বারা। সুতরাং পরখ করার ব্যয়ভার তার উপরই বর্তাবে। যেমন ওজন করার ব্যয়ভার তার উপর বর্তায়। ওজন দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ জানা যায়। আর পরখ দ্বারা মুদ্রার প্রকার জানা যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা ক্রেতা বিক্রেতাকে অর্পণ করতে বাধ্য বিধায় ওজনের মঞ্জুরি যেক্রপ ক্রেতার জিম্মায়, তেমনি উৎকৃষ্ট মুদ্রা অর্পণ করতে বাধ্য বিধায় পরখের মঞ্জুরিও ক্রেতার জিম্মায় হবে।

পূর্বযুগে মূল্য মূদ্রার পরিমাণ বেশি হলে সাধারণত মেপে তা পরিশোধ করা হতো। যেহেতু বিক্রেতাকে মূদ্রা পরিশোধ করতে হতো মুখাপেক্ষী, আর নির্দিষ্ট পরিমাণ মূদ্রা পরিশোধ হলো কিনা তা জানা যায় ওজন দ্বারা তাই ওজনের মঞ্জুরি ক্রেতার উপর বর্তাবে। এরূপভাবে মূল্য মূদ্রা না হয়ে যদি দ্রব্য হয়, আর তা মেপে পরিশোধ করার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রেও পরিমাপকারীর মঞ্জুরি ক্রেতার উপর বর্তাবে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قَبْلَ لِلْمُسْتَوْرَى إِذْفَعَ الثَّمَنَ أَوْلاً ، لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَوْرَى تَعَيَّنَ فِي الْمَبِيعِ ، فَيُقَدَّمُ دَفْعُ الثَّمَنِ لِيَتَّعِينَ حَقَّ الْبَائِعِ بِالْقَبْضِ ، لِمَا أَنَّهُ لَا يَتَّعِينَ بِالْتَّعْيِينِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ ، قَالَ : وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ قَبْلَ لَهُمَا سَلَمًا مَعًا ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا فِي الدَّفْعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, “কেউ যদি মুদার বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি করে তাহলে ক্রেতাকে বলা হবে, তুমি প্রথমে মূল্যমুদা অর্পণ কর।” কেননা, [বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হতেই] বিক্রীত পণ্যে ক্রেতার হক নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তাই সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে [মুদা] হস্তগত করার মাধ্যমে বিক্রেতার হক নির্দিষ্ট করার জন্য প্রথমে মূল্যমুদা অর্পণ করা হবে। কারণ, মুদা [হস্তগত করা ছাড়া] নির্দিষ্ট করা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। ইমাম কুদরী (র.) বলেন, আর কেউ যদি দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি করে কিংবা মুদার বিনিময়ে মুদা বিক্রি করে তাহলে উভয়কে বলা হবে, তোমরা দু’জন এক সাথে [বিক্রিত মুদা ও মূল্য] অর্পণ কর। কারণ, নির্দিষ্ট হওয়া/না হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টি সমান। সুতরাং দু’টোর কোনো একটিকে আগে অর্পণ করার প্রয়োজন নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে একটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো **اَلْثَّمَنُ لَا يَتَّعِيَنَّ بِالتَّعْيِينِ** অর্থৎ ইশারায় বা মৌখিক উল্লেখের দ্বারা কিংবা মেপে আলাদা করার মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী নির্দিষ্ট করা হলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুদা নির্দিষ্ট করা হলে হাতে না আসা পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট হয় না। যেমন কেউ গমের স্থূপ দেখিয়ে বলল, আমি এ স্থূপ থেকে এক মণ গম দু’শ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। বিক্রেতা সম্মত হলো। বিক্রেতা ঐ স্থূপ থেকে এক মণ গম মেপে ক্রেতার জন্য আলাদা করল। এতে ঐ গমে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু কেউ যদি হাতের একশ’ টাকার নোট দেখিয়ে বিক্রেতাকে বলল, আমি এই একশ’ টাকার বিনিময়ে তোমার থেকে এক মণ আলু ক্রয় করলাম, আর বিক্রেতা তাতে সম্মত হয় তাহলে ঐ একশ’ টাকাতে বিক্রেতার মালিকানা স্বীকৃত বা নিশ্চিত হয়নি এবং ক্রেতার উপর বিনিময়মূল্য হিসেবে একশ’ টাকার ঐ নোটটি বিক্রেতাকে দেওয়া আবশ্যক নয়। একশ’ টাকা দেওয়া আবশ্যক, তবে তা ক্ষুদ্র বিভিন্ন নোটের সমন্বয়ে হলেও চলবে।

উপরোক্ত ইবারতের মাসআলা হলো, মুদার বিনিময়ে কোনো দ্রব্য বিক্রি করা হলে, যেমন এক ব্যক্তি পাঁচশ’ টাকার বিনিময়ে এক মণ চাউল বিক্রি করল, তাহলে বিক্রীত পণ্য ও বিনিময় মুদার কোনটা প্রথমে অর্পণ (تَسْلِيم) করা হবে? ইমাম কুদরীর ভাষ্য মতে প্রথমে বিনিময় মুদা অর্পণ করতে হবে। যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে এ বিষয়ে তর্ক বাঁধে তাহলে ফয়সালা যাবে বিক্রেতার পক্ষে, আর ক্রেতাকে বলা হবে, তুমি প্রথমে বিনিময় মুদা অর্পণ কর।

দলিল হলো, যেহেতু দ্রব্যসামগ্রী নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় তাই বিক্রেতা যখন বিক্রীত দ্রব্য মেপে আলাদা করেছে কিংবা ইশারায় দেখিয়েছে তখন বিক্রীত দ্রব্যে ক্রেতার হক নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বিক্রেতার হক তখনও স্বীকৃত বা নির্দিষ্ট হয়নি। বিক্রেতার হক নির্দিষ্ট করার জন্য বিনিময় মুদা তার হস্তগত হওয়া জরুরি। তাই সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্রেতা প্রথমে বিনিময় মুদা অর্পণ করবে।

ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত এটি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিক্রেতাকে প্রথমে বিক্রীত পণ্য অর্পণে বাধ্য করা হবে।

এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত।

**وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ** : বিক্রীত পণ্য ও বিক্রয়মূল্য (مَبِيعٌ وَثَمَنٌ) উভয়টিই যদি দ্রব্য হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে অর্পণের আগেই ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের হক নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর উভয়টি যদি মুদা হয় তাহলে অর্পণের আগে কারো হক নির্দিষ্ট হয় না। হক নির্দিষ্ট হওয়া/না হওয়ার হিসেবে যখন উভয়ে সমান তখন কোনো একজনকে আগে অর্পণে বাধ্য করা যাবে না। বরং সমতা রক্ষার জন্য উভয়কে বলা হবে, তোমরা বিক্রীত পণ্য ও বিক্রয় মূল্য এক সাথে অর্পণ কর।

## بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

পরিচ্ছেদ : শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার

إِصَافَةُ) অর্থ এখতিয়ার, ইচ্ছাধিকার, স্বাধীনতা। شَرْطٌ অর্থ শর্ত, দফা। خِيَارٌ শব্দটি شَرْطٌ-এর দিকে ইয়াফত (إِصَافَةُ) হয়েছে। মূলত: এ ইয়াফত خِيَارٌ يَنْبَغُ بِالشَّرْطِ অর্থ হচ্ছে خِيَارٌ شَرْطٌ। إِصَافَةُ الْعَكْمِ إِلَى سَبَبِهِ ইচ্ছাধিকার।

মানুষের প্রয়োজনে মানুষ লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় ক্রয়-বিক্রয়ে মানুষ প্রতারিত হয়, ধোঁকা খায়, চিন্তার অবকাশ না থাকায় ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্তে ভুল হয়, ফলে তাকে অনুতপ্ত ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হয়, অনেক সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের এ সব সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে শরিয়ত খেয়ারে শর্তের বিধান দিয়েছে। মানুষের সমস্যা লাঘবই এ বিধান দানের উদ্দেশ্য। ক্রয়-বিক্রয়ে এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়কালে ইজাব বা কবুলের মাঝে বলে নিবে, “আমি তিনদিনের খেয়ারে শর্তে এ দ্রব্যটি ক্রয় বা বিক্রয় করলাম।” এভাবে বলে নিলে সে তিনদিন পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাবে। এ তিনদিনে সে ধীরস্থিরভাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, কৃত বিক্রয় চুক্তি স্থির রাখবে, না তা ভেঙ্গে দিবে। যদি কৃত চুক্তি স্থির রাখার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এ সিদ্ধান্তের কথা অপরপক্ষকে তিনদিনের ভিতরে জানানো জরুরি নয়। তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তিন দিনের ভিতরে অপর পক্ষকে তা জানাতে হবে এবং আনুসঙ্গিক হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ সে যদি বিক্রেতা হয়ে থাকে আর বিক্রয় দ্রব্য বাবদ ক্রেতা থেকে বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করে থাকে তাহলে তা ফেরত দিবে। আর যদি ক্রেতা হয়ে থাকে তাহলে বিক্রেতাকে বিক্রয় মূল্য দিয়ে থাকলে তা তুলে নিবে এবং বিক্রয় পণ্য হস্তগত করে থাকলে তা ফেরত দিবে।

ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার সাত প্রকার। যথা—

১. خِيَارُ الشَّرْطِ শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার।
২. خِيَارُ الرُّؤْيَةِ দর্শনভিত্তিক ইখতিয়ার।
৩. خِيَارُ النَّعْبِ দোষের কারণে প্রাপ্ত ইখতিয়ার।
৪. خِيَارُ التَّغْيِينِ নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার।
৫. خِيَارُ نَفْدٍ নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করার ইখতিয়ার।
৬. خِيَارُ قَبُولٍ গ্রহণ করার ইখতিয়ার।
৭. خِيَارُ الْمَعْلِيَسِ দরাদরির মজলিস চলাকালীন ইখতিয়ার। আল্লামা আইনী (র.) প্রথমোক্ত চার প্রকারের উল্লেখ করেছেন।  
—[বিনায়া, প্রাক্তক্ত পৃ. ৭৪]

হানাফীদেবর কাছে খেয়ারে মজলিস স্বীকৃত নয়, তবে খেয়ারে নকদ স্বীকৃত। আইশ্মায়ে ছালাছার মাযহাবে খেয়ারে মজলিস স্বীকৃত, কিন্তু খেয়ারে নকদ স্বীকৃত নয়।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) লিখেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ে পাঁচ প্রকার প্রতিবন্ধকতা (أَلْوَانُ) আছে। যথা—

১. **مَنْعَ بَيْعِ إِنْغَادِ الْعِلَّةِ** যে প্রতিবন্ধকতা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়াকে বাধা দেয়। যেমন বিক্রয় পণ্য স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করা। বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিক্রীত বস্তু পণ্য হওয়া জরুরি। আর স্বাধীন মানুষ পণ্য নয়। তাই এ ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তিই শুদ্ধ বা সম্পন্ন হয় না।
২. **مَنْعَ بَيْعِ نَسَامِ الْعِلَّةِ** যে প্রতিবন্ধকতা বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়াকে বাধা দেয় না, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়াকে বাধা দেয়। যেমন, অন্যের মাল অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা। এ ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু মালিকের অনুমতির উপর তার পরিপূর্ণতা স্থগিত থাকে।
৩. **مَنْعَ بَيْعِ إِبْتِدَاءِ الْعُكْمِ بَعْدَ إِنْغَادِ الْعِلَّةِ** প্রতিবন্ধকতা বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রাথমিক হুকুম সাব্যস্ত হতে বাধা দেয়। যেমন খেয়ারে শর্ত। খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোনো জিনিস বিক্রি করলে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিক্রীত পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রথম ধাপ হলো বিক্রীত পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। আর খেয়ারে শর্ত তা নিষেধ করে।
৪. **مَنْعَ بَيْعِ نَسَامِ الْعُكْمِ بَعْدَ نُزُولِهِ** যে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় চুক্তির হুকুম সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তার পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন খেয়ারে রুয়ত (خِبَارُ الرُّوْيَةِ)। ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত থাকলে বিক্রীত পণ্যে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ হয় না।
৫. **مَنْعَ بَيْعِ لُزْمِ الْعُكْمِ** যে প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও বিক্রয় চুক্তির হুকুম পূর্ণাঙ্গভাবে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক হয় না। যেমন খেয়ারে আইব (خِبَارُ عَيْبٍ)। ক্রেতার খেয়ারে আইব থাকলে বিক্রীত পণ্যে তার মালিকানা বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত হয় না। সে ইচ্ছা করলে তা বিক্রয়তাকে ফেরত দিতে পারে।

—[ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭৬]

খেয়ারে শর্ত যেহেতু প্রাথমিক হুকুম সাব্যস্ত হওয়াকেই বাধা দেয় তাই গ্রন্থকার (র.) প্রথমে এর আলোচনা করেছেন। কারণ, যা প্রাথমিক হুকুমের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট তার ধারাবাহিকতা প্রথমে। আর খেয়ারে শর্তকে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এনেছেন। কারণ, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হুকুমের হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় প্রথমত দুপ্রকার। এক. লায়েম (لَا يَمُ) দুই. গায়রে লায়েম (غَيْرُ لَا يَمُ)। যে ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার নেই তা লায়েম। আর যে ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার আছে তা গায়রে লায়েম। লায়েম যেহেতু গায়রে লায়েম অপেক্ষা শক্তিশালী, তাই প্রথমে লায়েমের আলোচনা করেছেন। এরপর আলোচ্য পরিচ্ছেদ থেকে গায়রে লায়েমের আলোচনা শুরু করেছেন।

خِبَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ فِي النَّبَيْعِ لِلْبَّائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَلَهُمَا الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَا دُونَهَا، وَالْأَصْلُ فِيهِمَا رَوَى أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِي (رض) كَانَ يَغْنُنُ فِي النَّبَاعَاتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ وَلِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ وَالشَّافِعِيِّ رَح، وَقَالَ: يَجُوزُ إِذَا سُمِّيَ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ أَجَازَ الْخِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ، وَلَئِنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّرْوِي لِيَنْدَفَعَ الْغَبْنُ، وَقَدْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ إِلَى الْأَكْثَرِ، فَصَارَ كَالْتَّاجِيلِ فِي الثَّمَنِ.

অনুবাদ : ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে খেয়ারে শর্ত [শর্তারোপ করে ইচ্ছাধিকার রাখা] ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েজ। তাদের খেয়ার [এর মেয়াদ] থাকবে তিন দিন বা তার চেয়ে কম। এ বিষয়ের দলিল হলো এই মর্মে বর্ণিত হাদীস যে, হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিয় ইবনে আমর আল আনসারী (রা.) বেচাকেনায় ঠকে যেতেন। তাই নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, 'যখন তুমি বেচাকেনা কর তখন তুমি বলে নিও যে, কোনো ঠকবাজি নয়; আমার তিনদিনের খেয়ার [ইচ্ছাধিকার] থাকবে।' ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে তিনদিনের অধিক [মেয়াদে] খেয়ারে শর্ত [ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ করা] জায়েজ নেই। এটাই ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, [তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য] খেয়ারে শর্ত জায়েজ; যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ ধার্য করে। দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। তিনি দু'মাসের মেয়াদে খেয়ারে শর্তের অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া খেয়ারে শর্ত শরিয়ত বৈধ করেছে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনে, যাতে প্রতারণা রোধ হয়। আর [এর জন্য] কখনও কখনও [তিন দিনের] অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এটা বিক্রয় মূল্য পরিশোধের মেয়াদ ধার্যের মতো হয়ে গেল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ خِبَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ فِي النَّبَيْعِ لِلْبَّائِعِ وَالْمُشْتَرِي : ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে ইসলামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ক্রমে খিয়ারে শর্ত জায়েজ। [বিনায়া, প্রাণ্ডুত, পৃ. ৭৪] তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েয কিনা এ ব্যাপারে তাবেয়ীদের কারো কারো ভিন্নমত পাওয়া যায়। হযরত সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শুবরুমা (র.) বলেন, খেয়ারে শর্ত শুধু ক্রেতার জন্য জায়েয। বিক্রেতার জন্য জায়েজ নেই। [প্রাণ্ডুত] জমহুরের মতে খিয়ারে শর্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েজ। দু'জনের একসাথেও জায়েজ, পৃথকভাবেও জায়েজ। ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের ভিন্ন অন্য কারো জন্য খিয়ারের শর্তারোপ করলে পারবে কিনা এ বিষয়ে অবশ্য জমহুরের মাঝে মতবিরোধ আছে। এ সম্পর্কিত আলোচনা পরে আসছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শুবরুমা (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারের শর্তারোপ করা কিয়াস বিরোধী। হাদীসের কারণে তা জায়েজ রাখা হয়েছে। তাই তা হাদীসে উল্লিখিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর হাদীসে শুধু ক্রেতার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের দলিল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন—

إِنْ حَبَانَ بْنِ مُنْفِذٍ بِنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُغْبَى نِسِي الْبَيْعَاتِ فَقَالَ لَدَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ، وَلَيْسَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -

হযরত হাক্বান ইবনে মুনকিয ইবনে আমর আল আনসারী (রা.) বেচাকেনায় ঠেকে যেতেন। তাই নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, যখন তুমি কেনাবেচা কর তখন বলে নিও যে, কোনো প্রতারণা নেই, আমার তিন দিনের খেয়ার থাকবে।

এ হাদীসটিই খেয়ারে শর্ত জায়েজ হওয়ার মূল দলিল। আহ্মাদী আইনী (র.) বলেন, হাদীসের শব্দ থেকেই বুঝা যায় খেয়ারে শর্ত ক্রোতা-বিক্রোতা উভয়ের জন্য জায়েজ। হাদীসের শব্দ হলো: إِذَا بَايَعْتَ الْخ

উল্লেখ্য যে, مُفَاعَلَةٌ বাবে ক্রিয়াক্রপ। বাবে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: مُتَارَكَةٌ। সেই হিসেবে শব্দটি ক্রোতা-বিক্রোতা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ঠেকে যাওয়া থেকে বাঁচার উপায় বের করার সুবিধার্থে খেয়ারে শর্ত বৈধ করা হয়। আর এ বিষয়ে ক্রোতা-বিক্রোতা উভয়ে সমান। তাই উভয়ের জন্য খেয়ারে শর্ত জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাটি সাহাবী হাক্বানের, না তাঁর পিতা হযরত মুনকিয এ সম্পর্কে রিওয়াযাত দু'ধরনের হলেও দীর্ঘ আলোচনার পর হাফেজ আইনী প্রমাণ করেছেন যে, ঘটনাটি হযরত হাক্বানের। -[প্রাণ্ড, পৃ. ৭৬]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (র.) লিখেছেন, শব্দের কিছুটা পরিবর্তনসহ বর্ণিত হাদীসটি আইনাম্মায়ে আরবাব'আ তাদের সুনানে সংকলন করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) তাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। মুসতাদরাকে হাকিমে এ হাদীসটিই আরেকটু বিস্তারিত আছে,

كَانَ حَبَانَ بْنُ مُنْفِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا وَكَانَ قَدْ سَفِعَ فِي رَأْسِهِ مَازُومَةً فَتَعَمَّلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَيْنَمَا اشْتَرَاهُ وَكَانَ قَدْ تَقَلَّى لِسَانَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ وَقُلْ لَا خِلَافَةَ نَكُنْتَ أَسْمَعُ يَقُولُ لَا خِلَافَةَ لَا خِلَافَةَ وَكَانَ يَشْتَرِي وَيَبْعِي بِهِ إِلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ إِنَّ هَذَا غَالٍ، فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَبَّرَنِي فِي بَيْعِي -

এ রিওয়াযাতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত হাক্বান (রা.)-কে ক্রয়কালেও খেয়ারের শর্তারোপ করার কথা বলেছেন এবং বিক্রয়কালেও। সুতরাং খেয়ারে শর্ত ক্রোতা-বিক্রোতা উভয়ের জন্য জায়েজ।

-[আদ-দিরায়া ফী তাখরীজিল হিদায়া]

قَوْلُهُ وَلَا يَحُزُّ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْخ: হযরত ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতানুসারে খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিনদিন। তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্ত করা জায়েজ নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খেয়ারের শর্তারোপকারী যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে তবে তা যত দিনই হোক না কেন জায়েজ আছে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও মতামত। তবে কেউ যদি সর্বদার জন্য খেয়ারের শর্ত করে তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা জায়েজ নেই।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, খেয়ারে শর্তের সময়সীমা প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। আর দ্রবোর বিভিন্নতার কারণে প্রয়োজনও বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যদি কাঁচা দ্রব্য যা সাধারণতঃ এক দিনের বেশি ভাল থাকে না, যেমন ফলমূল, সে ক্ষেত্রে এক দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্তারোপ করা জায়েজ হবে না। আর যদি দ্রব্য একরূপ হয় যে, তিন দিনের ভিতর তার সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্তারোপ করা জায়েজ হবে।

সাছেবাইন (র.)-এর দলিল :

নকলী দালিল : হযরত আব্দুত্তাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে- أَجَازَ الْخِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ

অর্থাৎ তিনি দু'মাস পর্যন্ত খেয়ারে শর্তকে জায়েজ রেখেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্তারোপ করা জায়েজ আছে।

**আকলী দলিল :** শরিয়ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনে খেয়ারে শর্ত বৈধ করেছে, যাতে মানুষ ঠকা থেকে বাঁচতে পারে। আর এর জন্য কখনও কখনও তিন দিনের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই তিন দিনের অধিক সময়ের সুযোগ থাকবে। এটা বাকি মূল্য পরিশোধের মেয়াদ ধার্যের মতো। বাকি মূল্য পরিশোধের জন্য তিন দিন বা তার অধিক যতদিন প্রয়োজন হয়, ততদিন সময় ধার্য করা জায়েজ। তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা-বিক্রেতার চিন্তা-ভাবনার জন্য যতদিন প্রয়োজন হয় পারস্পরিক সম্মতিতে ততদিন সময়সীমা ধার্য করা জায়েজ হবে।

**ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল [নকলী দলিল] :**

১. পূর্বোক্ত হাদীসে হযরত হাক্বান ইবনে মুনকিয় (রা.)-কে হজুর ﷺ তিন দিনের খেয়ারে শর্তের কথা বলেছেন। খেয়ারের শর্তারোপ করা বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক দাবির পরিপন্থি। বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক দাবি হলো, বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের, আর বিক্রেতা বিনিময় মূল্যের মালিক বনে যাবে। বিক্রেতাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রীত পণ্যের দখল ছেড়ে দিতে, আর ক্রেতাকে অবশ্যই বিক্রীত দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে এবং বিক্রেতাকে বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে হবে। বিক্রয় চুক্তিতে খিয়ারের শর্ত করা হলে ক্রেতা যেহেতু বিক্রীত পণ্যের মালিক হয় না এবং তার উপর বিক্রয় মূল্য প্রদানও আবশ্যিক হয় না তাই তা বিক্রয় চুক্তির পরিপন্থি। এতদসত্ত্বেও কিয়াস বহির্ভূতভাবে আমরা উক্ত হাদীসের কারণে খেয়ারে শর্ত জায়েজ রেখেছি। আর কায়দা আছে, কোনো নস [কুরআনের আয়াত, হাদীস] কিয়াস বহির্ভূত হলে তার হুকুম নসের প্রসঙ্গ ও ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। আলোচ্য হাদীসে তিন দিনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিতে খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিন হবে। এর বেশি জায়েজ হবে না।

২. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত,

إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْخَبِيرَ أَرْبَعَةً فَأَبْطَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْخَبِيرُ ثَلَاثَةٌ أَبْطُلُ -

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি থেকে একটি উট ক্রয় করে এবং চার দিনের খেয়ারের শর্তারোপ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বাতিল করে দেন এবং বলেন, খেয়ারের সময়সীমা তিন দিন।—[দিরায়া : ইবনে হাজর আসকলানী]

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিন।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদীসটিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে হাদীসটির সম্বন্ধ সঠিক নয়। সাহেবে হিদায়ার মতেও হাদীসটি মারফু' (مَرْفُوعٌ) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম বা বাণী নয়। বরং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর নিজস্ব আমল। ইমাম আতাবী (র.) বলেন, সঠিক উত্তর হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) একবার এক মাসের খেয়ারে শর্তে একটি বাদী বিক্রি করেন। আর যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সে বিষয়ে সাহাবীর কর্ম অগ্রগণ্য হতে পারে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে হাদীসটির সম্বন্ধ সঠিক মেনে নেওয়া হলেও হযরত হাক্বানের হাদীসটি মাহসুর। আর আলোচ্য হাদীসটি গরীব। গরীব হাদীসের তুলনায় মাহসুর হাদীস অগ্রগণ্য। এছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে খেয়ারে শর্তের কথা উল্লেখ নেই। খেয়ারে কয়তও (خَبِيرٌ أَوْ زَيْنٌ) হতে পারে। বরং তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, অন্যত্র খেয়ারে কয়তের সময়সীমা দু'মাস পর্যন্ত থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে।—[কেফায়া, হেদায়ার টীকা]

আত্লামা কাকী (র.) বলেন, সাহেবাইনের মতের পক্ষে মূল দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ "মুসলমানগণ তাদের পারস্পরিক শর্ত রক্ষা করবে।"—[তিরমিযী] আর খেয়ারে শর্তও একটি শর্ত। অতএব পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যতদিন ইচ্ছা খেয়ারে শর্তের সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

وَلَا يَبْنِي حَنِيفَةً (رح) أَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ بِخَالِفٍ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ الزُّوْمُ وَإِنَّمَا جَوَزَنَاهُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِمَا رَوَيْنَا مِنَ النَّصِّ، فَيَقْتَضِرُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَانْتَفَتِ الزِّيَادَةُ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) خِلَافًا لَزْفَرٍ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّهُ إِنْ عَقِدَ فَايِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا، وَلَهُ أَنَّهُ أَقْطَعَ الْمُنْفِذَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَيَعُودُ جَائِزًا، كَمَا إِذَا بَاعَ بِالرَّقْمِ وَأَعْلَمَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَلِأَنَّ الْفَسَادَ بِإِعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَإِذَا أَجَازَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّصِلِ الْمُنْفِذُ بِالْعَقْدِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِمَضْيِ جُزْءٍ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَقِيلَ يَنْعَقِدُ فَايِدًا ثُمَّ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ بِحَذْفِ الشَّرْطِ، وَهَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ .

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, খেয়ারে শর্ত [শর্তারোপ করে ইচ্ছাধিকার রাখা] বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী। বিক্রয় চুক্তির চাহিদা হলো, [বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার আর বিনিময় মূল্যে বিক্রেতার মালিকানা] আবশ্যক হওয়া। আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীসের কারণে আমরা কiyাসের বিপরীত তা জায়েজ রেখেছি। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত সময়সীমাতো তা সীমাবদ্ধ থাকবে এবং [তাতে] বর্ধিতকরণ নিষিদ্ধ হবে। তবে অধিক মেয়াদে খেয়ারের শর্তারোপকারী যদি তৃতীয় দিনের ভিতরেই অনুমোদন দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ আছে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ রূপে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং তা জায়েজরূপে প্রত্যাবর্তিত হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অধিক মেয়াদে খেয়ারের শর্তারোপকারী ফাসিদকারী বিষয়টিকে স্থির হওয়ার পূর্বেই রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি জায়েজ হয়ে যাবে। যেমন কেউ মূল্যের সংকেত দেখিয়ে কোনো দ্রব্য বিক্রি করল, এরপর মজলিসে থাকা অবস্থাতেই সংকেতের পরিমাণ তাকে জানিয়ে দিল। তাছাড়া ফাসাদ সাব্যস্ত হয় চতুর্থ দিনের হিসাবে। যখন এর আগেই খেয়ারের শর্তারোপকারী অনুমোদন দিয়ে দিল তখন ফাসিদকারী বিষয়টি বিক্রয় চুক্তির সাথে যুক্ত হলো না। এ কারণেই বলা হয় যে, [অধিক মেয়াদে খেয়ারের শর্তারোপ করার ক্ষেত্রে] বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয় চতুর্থ দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে। কারো মতে চুক্তিটি ফাসিদরূপেই সংঘটিত হয়, এরপর [অধিক মেয়াদের] শর্ত রহিত করার দ্বারা ফাসাদ দূর হয়ে যায়। এই শেবোক্ত মতটি প্রথোক্ত দলিলের উপর নির্ভরশীল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الخ : যদি কেউ বিক্রয়চুক্তিতে খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করে, কিন্তু পরে তিন দিনের ভিতরেই অনুমোদন দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে সেই বিক্রয় চুক্তি জায়েজ হবে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, তিন দিনের অধিক



সময়সীমা নির্ধারণ করার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়েছে। আর যে চুক্তি ফাসিদরূপে সংঘটিত হয় তা পুনরায় জায়েজ হবে না। শরিয়তে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন,

১. এক ব্যক্তি দু'দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করল। সুদ হওয়ায় এ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ। এরপর অতিরিক্ত দিরহামটি রহিত করে দিলেও এ বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হয় না।

২. এক ব্যক্তির চারজন স্ত্রী আছে। এমতাবস্থায় সে আরেকজন মহিলাকে বিবাহ করল। এক সাথে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা যায় না, বিধায় এ বিবাহচুক্তি ফাসিদ। এখন চতুর্থ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেও তার উক্ত বিবাহ জায়েজ হবে না।

৩. এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম ও এক সের মদের বিনিময়ে একটি গাড়ি ক্রয় করল। মুসলমানের জন্য মদের লেনদেন হারাম বিধায় এ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ। এখন যদি বিক্রয়মূল্য থেকে মদকে বাদ দিয়ে দেয় তাহলেও উক্ত বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে না। অতএব তিনদিনের অধিক সময়সীমা ধার্য করার কারণে যে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়েছে, অতিরিক্ত সময় বাদ দিয়ে দিলেও তা পুনরায় জায়েজ হবে না।

**ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর দলিল :**

আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, কেউ যদি খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করে তাহলে এ বিক্রয়চুক্তির হুকুম সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) যে উক্তি করেছেন তার ব্যাখ্যা নিয়ে মাশায়েখে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। ইরাকের হানাফী মাশায়েখের মতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ রূপে সংঘটিত হবে। কিন্তু তিন দিনের ভিতরে অনুমোদন দিয়ে দিলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর খোরাসানের হানাফী মাশায়েখের মতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, বিক্রয় চুক্তিটি মওকুফ থাকবে। যখন চতুর্থ দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তা ফাসিদ হবে। শামসুল আইম্বা সারাখসী (র.)-এর সমর্থন এদিকে।

প্রথমোক্ত বক্তব্য হিসেবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যে বিষয়টি আলোচ্য বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করেছে তা হলো চতুর্থ দিনের শর্তারোপ করা। খেয়ারের শর্তারোপকারী যখন তা সুদূর হওয়ার আগেই অর্থাৎ চতুর্থ দিন আসার আগেই তা রহিত করে দিল তখন ফাসাদ উঠে গেল। তাই বিক্রয় চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে। এর উপমা হলো : এক ব্যক্তি দ্রব্যের গায়ে লেখা দামের বিনিময়ে একটি দ্রব্য বিক্রি করল। গায়ে লেখাটি একটি বিশেষ সংকেত। এ সংকেত দেখে বিক্রেতা দামের অংক বুঝতে পারে। কিন্তু এ সংকেতের অর্থ ক্রেতা বুঝে না। ব্যবসায়ীদের এ ধরনের সংকেত দেওয়ার প্রচলন আছে। যেহেতু ক্রেতা এ সংকেতের অর্থ জানে না তাই বিক্রয় মূল্য তার কাছে অজ্ঞাত। আর বিক্রয় মূল্য অজ্ঞাত থাকলে এ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। কিন্তু মজলিসে থাকা অবস্থাতেই যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে সংকেতের অর্থ জানিয়ে দেয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি জায়েজ হয়ে যায়।

আর শেষোক্ত বক্তব্য হিসেবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, খেয়ারের শর্তারোপ করা বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করে না। ফাসিদকারী হলো তিন দিনের সাথে চতুর্থ দিনকে যুক্ত করা। যখন চতুর্থ দিন আসার আগেই অনুমোদন দিয়ে দিল তখন ফাসাদকারী বিষয়টি বিক্রয় চুক্তির সাথে যুক্ত হলো না। অতএব বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হলো না।

عَنْ قَوْلِهِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ بَعْضُهُ جَزْءٌ مِنَ التَّوْبِخِ : এ বাক্যে সাহেবে হিদায়া খোরাসানের মাশায়েখের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করলে বিক্রয় চুক্তি মওকুফ থাকবে। চতুর্থ দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে বিক্রয় চুক্তিটি ফাসিদ হবে।

عَنْ قَوْلِهِ وَقِيلَ بِنَعْيِهِ نَائِلًا ثُمَّ الْخ : এ বাক্যে সাহেবে হিদায়া ইরাকের মাশায়েখের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। তবে চতুর্থ দিনের আগে অনুমোদন দিয়ে দিলে তা জায়েজ হয়ে যাবে। এ বক্তব্যটি প্রথমোক্ত দলিলের উপর নির্ভরশীল। وَهَذَا عَلَى التَّوَجُّهِ الْأَوَّلِ : এর এটা ই অর্থ।

وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْقُدِ الثَّمَنَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَازَ، وَإِلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رح)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يَجُوزُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ حَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ، إِذَا الْحَاجَةُ مَسَّتْ إِلَى الْإِنْفِسَاحِ عِنْدَ عَدَمِ النِّقْدِ تَحَرُّزًا عَنِ الْمُطَاطَلَةِ فِي الْفَسْخِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ وَقَدْ مَرَّ أَبُو حَنِيفَةَ (رح) عَلَى أَصْلِهِ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ وَنَفَى الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَكَذَا مُحَمَّدٌ (رح) فِي تَجْوِيزِ الزِّيَادَةِ وَأَبُو يُوسُفَ (رح) أَخَذَ فِي الْأَصْلِ بِالْأَثَرِ، وَفِي هَذَا بِالْقِيَّاسِ، وَفِي هَذَا الْمَسْئَلَةِ قِيَاسٌ آخَرُ، وَإِلَيْهِ مَالَ زُفَرٍ، وَهُوَ أَنَّهُ بَيْعٌ شُرْطُ فِيهِ إِقَالَةُ قَاسِدَةٍ لَتَعْلُقَهَا بِالشَّرْطِ، وَاشْتِرَاطُ الصَّحِيحِ مِنْهَا فِيهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فِاشْتِرَاطِ الْفَاسِدِ أَوْلَى، وَجَهٌ الْإِسْتِحْسَانِ مَا بَيَّنَّا.

অনুবাদ : কেউ যদি [কোনো দ্রব্য] এই শর্তে ক্রয় করে যে, যদি তিন দিনের ভিতরে সে মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে উভয়ের মাঝে কোনো বেচাকেনা নেই তাহলে তা জায়েজ হবে। আর যদি চার দিন বা তদুর্ধ্ব দিন পর্যন্ত বলে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, চার দিন বা তদুর্ধ্ব দিন পর্যন্ত জায়েজ হবে। অতঃপর যদি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে সকলের একমতে জায়েজ হবে। এ বিষয়ে মূলনীতি হলো, এটা খেয়ারে শর্তের সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ, ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করলে বিক্রয়চুক্তি [নিজ থেকে] রহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে চুক্তি রহিত করার ব্যাপারে অপর পক্ষের গড়িমসি থেকে বাঁচা যায়। সুতরাং এটা [অর্থাৎ, মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত ইচ্ছাধিকার] খেয়ারে শর্তের সাথে যুক্ত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) খেয়ারে শর্তের ব্যাপারে [গৃহীত] স্বীয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন এবং [আলোচ্য] মাসআলায় খেয়ারের সময়সীমা তিন দিনের অধিক [ধার্য করার বিষয়টি] বাতিল করেছেন। এক্রপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) তিন দিনের অধিক সময়ের খেয়ারকে জায়েজ রাখার ক্ষেত্রে [স্বীয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন।] পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) মূল মাসআলায় [অর্থাৎ খেয়ারে শর্তে] সাহাবীর কর্মকে গ্রহণ করেছেন, আর আলোচ্য মাসআলায় কিয়াসকে গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য মাসআলায় অপর আরেকটি কিয়াস রয়েছে, ইমাম যুফার (র.) সেদিকেই সমর্থন দিয়েছেন। তা হলো, এটা এমন একটি বিক্রয়চুক্তি, যাতে ফাসিদ ইকালার শর্তারোপ করা হয়েছে। [ইকালার ফাসিদ] এ জন্য যে, ইকালাকে শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অথচ বিক্রয়চুক্তিতে শুদ্ধ ইকালার শর্তারোপ করাও বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং ফাসিদ ইকালার শর্তারোপ তো স্বাভাবিকভাবেই [বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করবে।] আর ইসতিহসানের সূরত আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**খোয়ারে নকদ :** মানুষের প্রয়োজনে মানুষ লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় মানুষের একটি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু কেনার মতো টাকা থাকে না। কখনো কখনো প্রয়োজন এত বেশি থাকে যে, টাকা না থাকলেও কিনতে হয়। কিন্তু কেনার পর মূল্য পরিশোধ করতে পারে না কিংবা সামর্থ্য আছে কিন্তু ইচ্ছাকৃত পরিশোধ করে না। এদিকে মূল্য না পাওয়াতে বিক্রেতা বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করতে চায়। কিন্তু ক্রেতার উপস্থিতি ছাড়া বিক্রয় চুক্তি ভাঙতেও পারছে না। এ ধরনের সমস্যা থেকে বাচার উপায় হিসাবে শরিয়ত "খোয়ারে নকদ" (خيار نكدة) -এর বিধান দিয়েছে। খোয়ারে নকদ -এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা ক্রয়কালে বিক্রেতাকে বলবে, "আমি এ দ্রব্যটি একশ" টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। যদি আমি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বেচাকেনার চুক্তি বহাল থাকবে না।" এরপর ক্রেতা তিন দিন সময় পাবে। এ তিন দিনের ভিতরে ক্রেতা টাকা পরিশোধ না করলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে খোয়ারে নকদ স্বীকৃত। কিন্তু ইমাম যুফার, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (র.) এটাকে জায়েজ বলেন না। তাদের দলিল হলো কিয়াস। আর ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো ইসতিহসান।

**ইমাম যুফার ও আইশ্মায়ে ছালাছার দলিল :**

ইমাম যুফার ও আইশ্মায়ে ছালাছার দলিল উপস্থাপন করার আগে ইকালার ও তার প্রকার সম্পর্কে জানতে হবে। ক্রেতা বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে বিক্রয়মূল্যে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করাকে ইকালার (الإقالة) বলা হয়। যেমন, এক ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে একটি পেন্সিল ক্রয় করল। কিন্তু কোনো কারণে তার এখন পেন্সিলের প্রয়োজন নেই। সে পেন্সিল দোকানে ফেরত দিয়ে দশ টাকা ফিরে পেতে চায়। তাই সে দোকানে গিয়ে বিক্রেতাকে বলল, ভাই! আমার পেন্সিলের প্রয়োজন নেই। আপনি পেন্সিলটি রেখে আমাকে দশ টাকা ফেরত দিন। বিক্রেতা পেন্সিল রেখে দশ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু সে সম্মত হয়ে ফেরত দিল। এটাকেই শরিয়তের পরিভাষায় ইকালার বলে।

ইকালার দু'প্রকার- ১. সহীহ ইকালার (الإقالة الصحيحة) ২. ফাসিদ ইকালার (الإقالة الفاسدة)। সহীহ ইকালার হলো, যে ইকালারকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা হয় না। যেমন কেউ বলল, "আমি তোমার কাছে এ দ্রব্যটি বিক্রয় করলাম এ শর্তে যে, তুমি ইকালার করবে।" এ উক্তিই ইকালারকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়নি, তাই এটা সহীহ। অবশ্য বিক্রয়চুক্তিতে ইকালার শর্ত করা হয়েছে। ফাসিদ ইকালার হলো, যে ইকালারকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন কেউ বলল, "আমি তোমার কাছে এ দ্রব্যটি বিক্রয় করলাম এ শর্তে যে, যদি তুমি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না কর তাহলে তোমার আমার মাঝে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না।" এ উক্তিই "বিক্রয় হবে না" বলে ইকালার শর্ত করা হয়েছে। আর ইকালারকে মূল্য পরিশোধ না করার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। তাই এটা ফাসিদ ইকালার।

ইমাম যুফার ও আইশ্মায়ে ছালাছা (র.) বলেন, যে বিক্রয়চুক্তিতে খোয়ারে নকদ রাখা হয় তা মূলত এমন একটি বিক্রয়চুক্তি যাতে ফাসিদ ইকালার শর্ত করা হয়। আর বিক্রয়চুক্তিতে সহীহ ইকালার শর্ত করাটাই বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। সেখানে ফাসিদ ইকালার তো স্বাভাবিকভাবেই বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দিবে। তাই খোয়ারে নকদের শর্ত করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। অতএব খোয়ারে নকদ জায়েজ নেই।

**ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর দলিল :**

ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.) খোয়ারে নকদকে খোয়ারে শর্তের উপর কিয়াস করেন। এ কিয়াসকেই সাহেবে হিদায়া ইসতিহসান বলেছেন। **مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ** হলো খোয়ারে শর্ত। আর **مُبَيَّنٌ** হলো খোয়ারে নকদ। উভয়ের মাঝে যোগসূত্র (الترابط) হলো প্রয়োজন ও জরুরত (الضرورة)। ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকে যাওয়া থেকে বাচার জন্য চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনে যেকোনো খোয়ারে শর্তকে শরিয়ত জায়েজ করেছে তেমনি খোয়ারে নকদেরও প্রয়োজন হয়। কারণ, অনেক সময় ক্রেতা দ্রব্য কিনে নিয়ে যায়, কিন্তু মূল্য পরিশোধ করে না বা করতে পারে না। এদিকে বিক্রেতা মূল্য না পাওয়াতে বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করতে চায়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্রেতার উপস্থিতি জরুরি, অথচ ক্রেতাকেও সে পাচ্ছে না। মূল্যও পাচ্ছে না, দ্রব্যও ফিরে পাচ্ছে না- এ উভয় সংকট থেকে বাচার উপায় হিসেবে খোয়ারে নকদের প্রয়োজন। তাই তা খোয়ারে শর্তের মতো জায়েজ হবে।

إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ..... جَاءَ وَإِلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ الْغَنَاءُ : ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারে নকদের শর্তারোপ করার কয়েকটি সূরত হতে পারে।

১. কেউ খেয়ারে নকদের শর্তারোপ করেছে, কিন্তু সময়সীমা উল্লেখ করেনি। যেমন বলল, আমি এ দ্রব্যটি এই শর্তে ক্রয় করলাম যে, যদি আমি এর মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে না। এ সূরতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ।

২. সময়সীমা উল্লেখ করেছে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট করেনি। যেমন বলল, তুফান আসার আগে যদি আমি মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে না। এ বিক্রয় চুক্তিও ফাসিদ। কারণ, সময়সীমা অজ্ঞাত। আর এ ধরনের অজ্ঞতা ঋগড়ার কারণ হয়।

৩. তিন দিন বা তার কম সময় উল্লেখ করেছে। যেমন বলল, আমি যদি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয় বহাল থাকবে না। এ সূরতে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাব্দীন (র.)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি জায়েজ। ইমাম যুফার ও আইমায়ে ছালাছার মতে জায়েজ নেই। উভয়পক্ষের দলিল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৪. খেয়ারে নকদের সময়সীমা চারদিন বা তদুর্ধ্ব দিন নির্ধারণ করা। যেমন, যদি চার দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয় চুক্তিসম্পন্ন হবে না। এ সূরতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি জায়েজ নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) **مَبْنِي عَلَيْهِ** ও **مَنْعُ بِهِ** তথা খেয়ারে শর্তে যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ খেয়ারের তিন দিনের অধিক সময়সীমাকে জায়েজ বলেননি, **مَنْعُ وَ مَبْنِي** তথা খেয়ারে নকদে তারই অনুসরণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদও খেয়ারে শর্তে যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তিন দিনের অধিক সময়সীমাকে জায়েজ বলেছেন, খেয়ারে নকদেও তার অনুসরণ করেছেন।

সাহেবে হিদায়া বলেন, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.) **أَصْل** অর্থাৎ খেয়ারে শর্তের বেলায় হাদীসের উপর আমল করেছেন, আর আলোচ্য মাসআলা অর্থাৎ খেয়ারে নকদের বেলায় কিয়াসের উপর আমল করেছেন।

সাহেবে হিদায়ার এক কথার দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়। এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী **أَصْل** মানে খেয়ারে শর্ত, **وَفِي هَذَا** মানে খেয়ারে নকদ, **إِنَّهُ أَجَازَ الْخِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ** অর্থাৎ এ হাদীসের কারণে খেয়ারে শর্তকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়। আর **وَفِي هَذَا** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খেয়ার বিক্রয়চুক্তির চাহিদা পরিপন্থি। তাই তা নাজায়েজ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হাকান ইবনে মুনকিয় (র.)-এর ঘটনার কারণে খেলাফে কিয়াস তিন দিনের জন্য জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিন দিনের অধিক সময়ের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর আমল করে খেয়ারে নকদকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী **أَصْل** মানে তিন দিন। অর্থাৎ খেয়ারে নকদ তিন দিনের জন্য জায়েজ। এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হলো, ইবনুল বারসার আজাদকৃত দাস হযরত সুলায়মান তাঁর কাছে এই শর্তে একটি বাদী বিক্রি করেছিল যে, যদি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ করা না হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে না। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ বিক্রয়চুক্তিকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। আর **وَفِي هَذَا** মানে তিন দিনের অধিক সময়। অর্থাৎ সাধারণভাবে কিয়াস বিক্রয় চুক্তিতে খেয়ারে নকদ নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে। হাদীসের কারণে তিন দিনকে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিন দিনের অধিক সময়ের ক্ষেত্রে হাদীস না থাকায় কিয়াসের উপর আমল করে নাজায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।-বিবায়ী, প্রাগুক্ত পৃ. ৮১; ফাতহুল কাদীর প্রাগুক্ত পৃ. ২৮২।

ফায়দা : হযরত হাসান ইবনে মালিকের বর্ণনা মতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উপরোক্ত মত প্রত্যাহার করে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের অনুরূপ মত গ্রহণ করেছেন। তবে শরহুল জামেউস সাগীরে আছে- **أَصْلُ الْأَصَحِّ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ** অর্থাৎ, বিতর্কিতম বর্ণনা মতে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে একমত।

-ফাতহুল কাদীর : প্রাগুক্ত।

পাঁচ. খেয়ারে নকদের সময়সীমা চারদিন বা তদুর্ধ্ব দিন নির্ধারণ করেছে, কিন্তু তিন দিনের ভিতরেই মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাব্দীন (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে।

قَالَ : وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ، لِأَنَّ تَمَامَ هَذَا السَّبَبِ بِالْمَرَاةِ، وَلَا تَتِمُّ مَعَ الْخِيَارِ، وَلِهَذَا يَنْفَعُ عِتْقَهُ، وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، فَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيَمَةِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِالْهَلَاكِ، لِأَنَّهُ كَانَ مَوْكُوفًا، وَلَا نِفَادَ بِذَوْنِ الْمَحَلِّ، فَبَقِيَ مَقْبُوضًا فِي يَدِهِ عَلَى سَوَمِ الشَّرَاءِ، وَفِيهِ الْقِيَمَةُ، وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِغْتِبَارًا بِالصَّحِيحِ الْمَطْلَقِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, বিক্রেতার খেয়ার বিক্রীত-পণ্যকে তার মালিকানা থেকে বের হতে বাধা দেয় : কেননা, এই কার্যকারণের [অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তির] পূর্ণাঙ্গতা উভয়ের সম্মতির উপর নির্ভরশীল। আর খেয়ারের বর্তমানে সম্মতি পূর্ণাঙ্গ হয় না। এ কারণেই [বিক্রেতার খেয়ারে শর্তে বিক্রীত ক্রীতদাসের বেলায়] বিক্রেতার মুক্তিদান কার্যকর হয়। আর ক্রেতা [বিক্রেতার খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে] বিক্রীত-পণ্যে হস্তক্ষেপের অধিকার পায় না; যদিও সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে তা হস্তগত করে। যদি ক্রেতা তা হস্তগত করে এবং তার অধিকারে থাকা অবস্থায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতা বাজার-মূল্য দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করবে। কেননা, [পণ্য] বিনষ্ট হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কারণ, তা [বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত] মওকুফ ছিল, [কার্যকর হয়নি]। আর [বিনষ্ট হওয়ার পর কার্যকর হওয়ার প্রশ্ন আসে না।] কারণ, পাত্র [অর্থাৎ বিক্রয়-পণ্য] ছাড়া বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয় না। [যেহেতু বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয়নি] তাই ক্রেতার দখলে বিক্রয়পণ্যটি ছিল দরাদরির পর্যায়ে : আর দরাদরি করা অবস্থায় ক্রেতার কজায় বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে জরিমানা হিসেবে ঐ পণ্যের বাজারমূল্য আবশ্যক হয়। আর যদি বিক্রেতার কজায় বিনষ্ট হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং নিঃশর্ত ও বিদগ্ধ বিক্রয়চুক্তির উপর ক্রিয়াসের ভিত্তিতে ক্রেতার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিসৃত ইবারতে খেয়ারে শর্তের লুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। খেয়ারে শর্ত ক্রেতার জন্যও হয়, বিক্রেতার জন্যও হয় : যদি খেয়ারে শর্ত বিক্রেতার হয়, যেমন- বিক্রেতা বলল, আমি এই গাভীটি পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে তিন দিনের খেয়ারে শর্তে বিক্রি করলাম, তাহলে বিক্রীত-পণ্যের মালিক সেই থাকবে। তিন দিনের ভিতরে বিক্রির অনুমোদন দিলে কিংবা হ্যাঁ/ না বল ছাড়াই তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তখন বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে এবং পণ্য তার মালিকানা থেকে বের হবে। আর সে কারণেই কেউ যদি খেয়ারে শর্তে বিক্রি করা তার দাসকে তিন দিনের ভিতর মুক্ত করে দেয়, তাহলে মুক্তকরণ কার্যকর হয় : কারণ, মুক্তকরণ কার্যকর হওয়ার জন্য দাসের মালিকানা থাকা শর্ত। আর বিক্রেতার তা আছে : একই কারণে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রীত-পণ্য হস্তগত করা সত্ত্বেও ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পায় না : কারণ, হস্তক্ষেপ করার জন্য বিক্রীত-পণ্যে মালিকানা শর্ত : আর ক্রেতার তা নেই। খেয়ারে শর্ত বিক্রেতার বিধায় পণ্যের মালিকানা এখনও তার।

খেয়ারে শর্তে বিক্রী করা পণ্য থেকে বিক্রেতার মালিকানা কেন উঠে যায় না? বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হলে পণ্যের উপর থেকে বিক্রেতার মালিকানা উঠে যায় এবং ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকলে; পণ্যের উপর থেকে বিক্রেতার মালিকানা ছাড়ার সম্মতি এবং বিনিময়মূল্যের উপর থেকে ক্রেতার মালিকানা ছাড়ার সম্মতি। কিন্তু খেয়ারে শর্ত থাকা অবস্থায় এ সম্মতি পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কারণ, পণ্যের উপর থেকে মালিকানা ছাড়তে সে সম্মত কিনা এ চিন্তাভাবনার জন্যই তো তার খেয়ারে শর্ত নেওয়া। তাই খেয়ারে শর্ত থাকা অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না। বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কারণেই বিক্রয়পণ্য (مَيْع) থেকে বিক্রেতার মালিকানা যায় না।

قَوْلُهُ فَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَيَسِي مَدَّةَ الْخَبَارِ الْخ: ক্রেতা যদি বিক্রয়পণ্য হস্তগত করে এবং তার দখলে থাকা অবস্থায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে জরিমানা হিসেবে তাকে ঐ পণ্যের বাজারমূল্য (فَيْسَةً) দিতে হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এটাই অভিমত। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জরিমানা হিসেবে ধার্যকৃত মূল্য (ثَمَن) দেবে। ইমাম ইবনে আবী লায়লা (র.) বলেন, ক্রেতাকে জরিমানা দিতে হবে না। কারণ, সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হস্তগত করেছে। সুতরাং তা তার হাতে আমানত। আর আমানতের মাল ধ্বংস হলে জরিমানা আবশ্যক হয় না। আমাদের দলিল হলো, বিক্রেতার খেয়ারে শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি মওকুফ তথা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। পণ্য ধ্বংস হওয়ার কারণে এ বিক্রয়চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করার কোনো উপায় থাকল না। কারণ, পণ্য ছাড়া বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না, তাই বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে গেছে। আর নিয়ম আছে- مَبْرُورٌ بِجَهَةِ الْعَقْدِ مَضْرُورٌ بِاتِّبَاعِهِ অর্থাৎ 'ক্রয় করার ইচ্ছায় কোনো জিনিস হস্তগত করার পর তা ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা হিসেবে বাজার মূল্য প্রদান আবশ্যক হয়।' যেমন- এক ব্যক্তি ক্রয়ের ইচ্ছায় একটি কাঁচের পাত্র হাতে নিয়ে দরদাম করছে, হঠাৎ তার হাত থেকে তা পড়ে ভেঙ্গে গেল। তাহলে তাকে জরিমানা হিসেবে ঐ পাত্রের বাজারমূল্য দিতে হবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার উপর পণ্যের জরিমানা হিসেবে বাজারমূল্য (فَيْسَةً) প্রদান আবশ্যক হবে।

কিন্তু খেয়ারের সময়সীমার পরে যদি ধ্বংস হয়, তাহলে ধার্যকৃত (ثَمَن) প্রদান আবশ্যক হবে। কারণ, খেয়ারের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর বিক্রীত-পণ্য ধ্বংস হলে ক্রেতার মালিকানাধীন অবস্থায় তা ধ্বংস হয়েছে। তাই তার উপর কোনো জরিমানা আসবে না। তবে বিক্রেতাকে পণ্যের ধার্যকৃত মূল্য (ثَمَن) দিয়ে দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ انْفُسَخَ الْبَيْعُ الْخ: যদি বিক্রেতার খেয়ারে শর্ত এবং তার দখলে থাকা অবস্থায় বিক্রয়পণ্য ধ্বংস হয়, তাহলে বিক্রেতার মাল ধ্বংস হলো। এর জন্য ক্রেতার উপর কোনো জরিমানা আবশ্যক হবে না; যেমনিভাবে কোনো শর্তহীন বিতুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় বিক্রীত-পণ্য ধ্বংস হলে ক্রেতার উপর কিছু আবশ্যক হয় না।

قَالَ : وَخِيَارَ الْمُشْتَرَى لَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي جَانِبِ  
الْآخِرِ لِأَرْزَمٍ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْبَدَلِ عَنْ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، لِأَنَّهُ  
شُرِعَ نَظَرًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ ، قَالَ : إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرَى لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَيِّ حَنِيفَةٍ (رحا)  
وَقَالَ : يَمْلِكُهُ ، لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرَى  
يَكُونُ زَائِلًا لَا إِلَى مَالِكٍ ، وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ ، وَلِأَيِّ حَنِيفَةٍ (رحا) أَنَّهُ لَمَّا  
لَمْ يَخْرُجِ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ لَاجْتِمَاعِ الْبَدَلَانِ  
فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ ، لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ  
يَقْتَضِي الْمَسَاوَاةَ ، وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى لِيَتَرَوَى ، فَيَقِفُ عَلَى الْمَضْلَحَةِ ،  
وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ رَمًا يَغْتَقَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، بِأَن كَانَ قَرِيبَهُ فَيَقُوتُ النَّظَرُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ক্রেতার খেয়ার বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রীত-পণ্যকে বের হতে বাধা দেয় না। কারণ, বিক্রয় তো অন্য পক্ষে সাব্যস্ত হয়ে আছে। বাধা না দেওয়াটা এজন্য যে, খেয়ারে শর্ত ঐ ব্যক্তির মালিকানা থেকে বিনিময়বস্তু বের হতে বাধা দেয়, যার অনুকূলে খেয়ারের শর্ত আরোপ করা হয়। কারণ, অপরাধনের নয়, বরং তার সুবিধার্থেই খেয়ারে শর্ত বৈধ হয়েছে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে। কারণ, যখন পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়, তখন তা যদি ক্রেতার মালিকানায় প্রবেশ না করে, তাহলে পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হলো কোনো মালিকের মালিকানায় আসা ছাড়াই। আর শরিয়তে এ ধরনের কোনো নজির আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যখন ক্রেতার মালিকানা থেকে বিনিময়মূল্য বের হচ্ছে না, তখন আমরা যদি বলি যে, বিক্রীত-পণ্য তার মালিকানায় প্রবেশ করবে, তাহলে বিনিময়চুক্তির হুকুম হিসেবে এক ব্যক্তির মালিকানায় উভয় বিনিময়বস্তু [পণ্য ও বিনিময়মূল্য] একত্র হয়ে যাবে। আর শরিয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই। কেননা, বিনিময়চুক্তি সমতাকে দাবি করে। তাছাড়া ক্রেতার সুবিধার্থে খেয়ারকে বৈধ করা হয়েছে, যাতে সে চিন্তাভাবনা করে নিজের মঙ্গল [কিসে তা] বুঝতে পারে। যদি [বিক্রীত-পণ্য তার] মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তাহলে হতে পারে তার ইচ্ছা ছাড়াই ক্রয়কৃত দাস আজাদ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, সে তার নিকটাত্মীয়। এতে তার সুবিধার দিক রক্ষা হয় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লেখ্য যে, যার অনুকূলে খেয়ারের শর্ত আরোপ করা হয়, তাকে مَنْ لَهُ الْخِيَارُ বলা হয়। উপরিস্থিত ইবারতে মাসআলা হলো, যদি مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ক্রেতা হয় অর্থাৎ খেয়ার ক্রেতার হয়, তাহলে বিক্রীত-পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। এ বিষয়ে আইনগোয়ে আরবাবু'আ ও সাহেবাইন (র.) একমত। তবে তা ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয় কিনা এ বিষয়ে

মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয় না। সাহেবাইন, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক মতানুসারে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয়।

বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্য বের হয়ে যায় এ বিষয়ের দলিল হলো, খেয়ারে শর্ত যেহেতু শরিয়ত বৈধ করেছে যার খেয়ার তার সুবিধার্থে, তাই খেয়ার তার মালিকানা থেকে বিনিময় বস্তু বের হওয়াকে বাধা দেয়। বিক্রেতার খেয়ার হলে তার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্যকে (مَبِيع) বের হতে বাধা দেবে, আর ক্রেতার খেয়ার হলে ক্রেতার মালিকানা থেকে বিনিময়মূল্য (ثَمَن) বের হতে বাধা দেবে। যেহেতু আলোচ্য মাসআলায় খেয়ার ক্রেতার, তাই বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্য বের হতে কোনো বাধা নেই। বিক্রেতার দিক থেকে বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। বিক্রয়চুক্তি থেকে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। তাই তার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্য বের হয়ে যাবে।

বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হওয়ার দলিল : সাহেবাইন (র.) বলেন, যখন এটা সাব্যস্ত হলো যে, বিক্রয়পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে তখন তা যদি ক্রেতার মালিকানাভুক্ত না হয়, তাহলে তা মালিকানাবিহীন হবে। অথচ শরিয়তে এ ধরনের কোনো নজির নেই যে, কারো মালিকানাধীন পণ্য তার মালিকানা থেকে বের হয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় থাকে। তাই এ পণ্যের ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হওয়া জরুরি।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : যেহেতু খেয়ার ক্রেতার তাই তার মালিকানা থেকে বিনিময়মূল্য (ثَمَن) বের হবে না। এখন যদি বিক্রয়পণ্য তার মালিকানাভুক্ত হয়, তাহলে বিনিময়চুক্তিতে একই ব্যক্তির মালিকানায় বিক্রয়পণ্য ও বিনিময়মূল্য একত্র হয়ে যায়। অথচ শরিয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই। কারণ, বিনিময়চুক্তির দাবি হলো সমতা। একজনের মালিকানায় বিক্রয়পণ্য আসলে তার বিনিময়টা যাবে অপরজনের মালিকানায়। অথচ এখানে উভয়টা ক্রেতার মালিকানায় এসে যায়। সেক্ষেত্রে এটা বিনিময়চুক্তি হয় কি করে?

এ দলিলের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এক ডাকাত ডাকাতি করে এক ব্যক্তির একটি মুদাক্কার দাসকে [যে দাসের মুক্তি মনিবের মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত] নিয়ে গেল। কিন্তু দাসটি তার হাত থেকে পলায়ন করল। এ সুরতে ডাকাতের উপর জরিমানা আদায় করা আবশ্যক হয়। কিন্তু তখনও মুদাক্কার মনিবের মালিকানা থেকে বের হয় না। কারণ, মুদাক্কার যেহেতু এক রকম স্বাধীন, তাই তা নতুন করে কারো মালিকানাভুক্ত হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে মনিবের মালিকানায় জরিমানার অর্থ ও দাস উভয়টি একত্র হচ্ছে। অতএব, এক ব্যক্তির মালিকানায় উভয় বিনিময়বস্তু (مَبِيع وَثَمَن) একত্র হওয়ার প্রমাণ শরিয়তে নেই একথা শুদ্ধ নয়।

আদ্বামা আইনী (র.) বলেন, উপরিউক্ত উদাহরণ ضَمَانَ حَيَاةٍ -এর, আর আমাদের আলোচনা ضَمَانَ مَعَاوَضَةٍ -এর। সুতরাং প্রশ্নটি সঠিক নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ক্রেতার জন্য শরিয়ত খেয়ারে শর্ত বৈধ করেছে তার সুবিধার্থে। সে চিন্তাভাবনা করে ধীরে-সুস্থে সিদ্ধান্ত নেবে, তার জন্য কোনটা মঙ্গলজনক হবে। ক্রয় করা মঙ্গলজনক হবে, না বিপরীতটা মঙ্গলজনক হবে? যদি খেয়ার সত্ত্বেও বিক্রয়পণ্য তার মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে খেয়ারের কোনো অর্থ থাকে না। কারণ, তখন তার চিন্তাভাবনার সুযোগ থাকে না। যেমন- ক্রেতা তার নিকটাত্মীয়কে খেয়ারে শর্তে ক্রয় করল। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন رَمِيَ مَكَدًا رَمِيَ مَعْرَمٍ مِنْهُ عَيْتَى عَلَيْهِ অর্থৎ 'কেউ যদি তার কোনো নিকটাত্মীয় মালিক হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা ক্রেতার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে।' তাই কেনার সঙ্গে সঙ্গে সে আজাদ হয়ে গেছে। এ সুরতে ক্রেতা চিন্তাভাবনার কোনো সুযোগ পেল না। খেয়ার যে উদ্দেশ্যে বৈধ করা হয়েছে তা এখানে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা বলি, খেয়ার ক্রেতার হলে ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হবে না। -[বিনায়া, প্রাচীণ, পৃ. ৮৫]



قَالَ : فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَالْهَلَاكُ لَا يَغْنِي عَنْ مُقَدِّمَةِ عَيْبٍ فِيهِلِكَ، وَالْعَقْدُ قَدْ إِنْبَرَمَ، فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّ يَدْخُولَ الْعَيْبِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ حُكْمًا لِخِيَارِ الْبَائِعِ فِيهِلِكَ، وَالْعَقْدُ مَوْثُوقٌ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রেতার কজায় বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হয়, তাহলে বিক্রয়মূল্যের বিপরীতে বিনষ্ট হলো। তদ্রূপ হুকুম হবে যদি [ক্রেতার কজায়] বিক্রয়পণ্য দোষগ্ৰস্ত হয়। কিন্তু খেয়ার যখন বিক্রেতার হয়, তখন ব্যাপার ভিন্ন। পার্থক্যের কারণ এই যে, যখন বিক্রয়পণ্য [ক্রেতার কজায়] দোষগ্ৰস্ত হয় [এবং খেয়ার তার হয়] তখন তা [বিক্রেতাকে] ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। আর বিনষ্ট হওয়াটাও কোনো পূর্বদোষ থেকে মুক্ত হয় না [অর্থাৎ দোষে দুষ্ট হয়েই বিনষ্ট হয়]। সুতরাং পণ্য বিনষ্ট হলো এমতাবস্থায় যে, বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। তাই ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। কিন্তু পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। কারণ, বিক্রেতার খেয়ারের কারণে [পণ্য] দোষগ্ৰস্ত হওয়াতে ফেরত দেওয়াটা নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং পণ্য বিনষ্ট হলো এমতাবস্থায় যে, বিক্রয়চুক্তি মওকুফ রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, খেয়ার যদি ক্রেতার হয় এবং তার কজায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হয় কিংবা এমন কোনো দোষে দুষ্ট হয়, যা কখনো দূর হওয়ার নয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে এবং ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য (ثَمَنٌ) ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে খেয়ার যদি বিক্রেতার হয় এবং ক্রেতার কজায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে পণ্য বিনষ্ট হয়, তাহলে ক্রেতার উপর পণ্যের বাজারমূল্য (فَيْئَةٌ) ওয়াজিব হবে। এ দু-মাসআলায় পার্থক্যের কারণ এই যে, ক্রেতার খেয়ারের সূরতে বিক্রয়পণ্য যখন তার কজায় দোষগ্ৰস্ত হলো, তখন খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে বিক্রেতার কাছে পণ্যটি ফেরত দেওয়ার যে সুযোগ ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। কারণ, বিক্রেতার মালিকানা থেকে পণ্যটি দোষমুক্ত অবস্থায় বের হয়েছে। এখন ফেরত গেলে দোষগ্ৰস্ত অবস্থায় বিক্রেতার মালিকানায় দাখিল হবে। যখন ফেরত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে গেল এবং বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হলে ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য (ثَمَنٌ) ওয়াজিব হয়। তাই এ সূরতে ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য ওয়াজিব হবে।

ক্রেতার খেয়ারের সূরতে তার কজায় থাকা অবস্থায় পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও একই হুকুম। কারণ, যে কোনো জিনিস ধ্বংস বা বিনষ্ট হওয়ার আগে দোষযুক্ত হয়। মানুষও মৃত্যুবরণ করার আগে অসুস্থ হয়; যদিও অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থতা অনুভব হয় না। যখন পণ্য দোষযুক্ত হলো তখন তা বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। ফলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে গেল এবং বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হলে ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য (ثَمَنٌ) ওয়াজিব হয়, তাই এ সূরতেও ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে বিক্রেতার খেয়ারের সূরতে ক্রেতার কজায় যখন পণ্য দোষগ্ৰস্ত হলো, তখন তা ফেরত দেওয়াটা অসম্ভব নয়। কারণ, বিক্রেতার মালিকানা থেকে পণ্য বের হয়নি, তাই তা তার মালিকানাতেই দোষযুক্ত হয়েছে। এরপর যখন পণ্য ধ্বংস হলো, আর তা ধ্বংস হলো এমন এক অবস্থায় যখন সুযোগ মওকুফ। পণ্য ছাড়া বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না, তাই বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে গেল। আর কায়দা আছে, مَقْبُوضٌ بِحَقِّهِ الْعَقْدُ مَقْنُونٌ بِالْفَيْئَةِ অর্থাৎ 'ক্রয় করার ইচ্ছায় কোনো জিনিস হস্তগত করার পর তা ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা হিসেবে বাজার মূল্য (فَيْئَةٌ) প্রদান করা আবশ্যিক হয়।' যেমন— এক ব্যক্তি ক্রয়ের ইচ্ছায় একটি কাচের পাত্র হাতে নিয়ে দরদাম করছে, হঠাৎ তার হাত থেকে তা পড়ে গেল, তাহলে তাকে জরিমানা হিসাবে এ পাত্রের বাজারমূল্য দিতে হবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায় জরিমানা হিসাবে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য (فَيْئَةٌ) প্রদান করা আবশ্যিক হবে।



قَالَ : وَمَنْ اشْتَرَىٰ امْرَأَتَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَّمْ يَفْسِدِ النِّكَاحُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا لِمَالِهِ مِنَ الْخِيَارِ ، وَإِنْ وَطَّيَهَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، لِأَنَّ الْوَطْءَ يُعْكِمُ النِّكَاحَ ، إِذَا كَانَتْ بِكْرًا ، لِأَنَّ الْوَطْءَ يُنْقِصُهَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) ، وَقَالَ : يَفْسِدُ النِّكَاحُ ، لِأَنَّهُ مَلَكَهَا ، وَإِنْ وَطَّيَهَا لَمْ يَرُدَّهَا ، لِأَنَّ وَطْئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا .

**অনুবাদ :** ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীকে এই শর্তে ক্রয় করে যে, তার তিন দিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে [তাদের] বিবাহ ফাসিদ হবে না। কেননা, তার খেয়ার থাকার কারণে এখনও সে স্ত্রীর মালিক হয়নি। [মালিক হলে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যায়।] এ অবস্থায় যদি সে তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এরপরেও সে তাকে বিক্রোতার কাছে ফেরত দিতে পারবে। কারণ, এ সহবাস বিবাহ সূত্রে হয়েছে। ইয়া, স্ত্রী যদি কুমারী হয় [তাহলে ফেরত দিতে পারবে না।] কেননা, সহবাস [কুমারিত্ব নষ্ট করার মাধ্যমে] তাকে দোষযুক্ত করে দেয়। এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, সে স্ত্রীর মালিক হয়েছে। এরপর যদি সে তার সাথে সহবাস করে, তাহলে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, তার সাথে সহবাস করেছে দাসত্বের মালিকানার ভিত্তিতে। সুতরাং [তাকে] ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হবে; যদিও সে অকুমারী হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে যে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাটি উল্লিখিত হয়েছে তা মূলত পূর্বোক্ত একটি উসূলগত মতপার্থক্যের উপর ভিত্তিশীল। উসূলটি হলো, খেয়ারে শর্ত ক্রোতার হলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রোতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হয় না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রোতা মালিক হয়। এ মূলনীতিগত মতপার্থক্যের কারণে বহু মাসআলায় মতপার্থক্য হয়েছে। সাহেবে হিদায়া এ স্থলে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের বেশ কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করেছে।

এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে তার দাসী স্ত্রীকে ক্রয় করল। মূলনীতি হলো, কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীর মালিক হয়, তাহলে বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, এ সূরতে বিবাহ ভাঙবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যেহেতু খেয়ার ক্রোতার হলে ক্রোতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হয় না, তাই এ সূরতে স্বামী এখনও স্ত্রীর মালিক হয়নি। সুতরাং তাদের বিবাহ ভাঙেনি। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে যেহেতু ক্রোতা মালিক হয়, তাই এ সূরতে স্বামী তার স্ত্রীর মালিক হয়ে গেছে। ফলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে গেছে।

এরপর ক্রোতা তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল। পিছনে মূলনীতি গেছে যে, যদি খেয়ার ক্রোতার হয়, আর তার কজায় থাকাকালে বিক্রয়পণ্য দোষযুক্ত হয়, তাহলে ক্রোতা বা বিক্রোতাকে ফেরত দিতে পারে না এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, এ সূরতে চিন্তাভাবনার পর ক্রোতা যদি স্ত্রীকে ক্রয় করার ইচ্ছে না করে, তাহলে বিক্রোতার কাছে তাকে ফেরত দিতে পারবে কিনা এবং সহবাস করা সত্ত্বেও তার খেয়ার বাকি থাকবে কিনা?

স্ত্রীর দু' অবস্থা হতে পারে। কুমারী কিংবা অকুমারী (ثَيِّبَةً)। স্ত্রী যদি অকুমারী হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ফেরত দিতে পারবে এবং তার খেয়ার বাতিল হবে না। তিনি বলেন, স্বামী বিবাহের সূত্রে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে; ক্রোতা হিসেবে বিক্রয়পণ্যে হস্তক্ষেপ করেনি এবং তার সহবাসের কারণে বিক্রয়পণ্যে নতুন কোনো দোষও যুক্ত হয়নি। তাই তার খেয়ার বাতিল হবে না।

আর যদি স্ত্রী কুমারী হয়, তাহলে স্বামী বিবাহের সূত্রে সহবাস করেছে— এ কথা যদিও বলা যায়, কিন্তু তার সহবাসের কারণে যেহেতু বিক্রয়পণ্যে নতুন দোষ যুক্ত হয়েছে তাই তা ফেরত দেওয়া যাবে না এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, স্ত্রী কুমারী হোক বা অকুমারী হোক সহবাস করার কারণে তা দোষযুক্ত হয়ে পড়েছে, তাই তা ফেরত দেওয়া যাবে না এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। তাঁরা বলেন, স্বামী যেহেতু তার মালিক হয়ে গেছে এবং তাদের বিবাহ ভেঙ্গে গেছে, তাই দাসত্বের মালিকানার ভিত্তিতেই স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে। আর এ সহবাস তাকে দোষযুক্ত করেছে। কারণ, একজনের ব্যবহৃত দাসী অন্যজন ব্যবহার করতে অগ্রহী হয় না। সুতরাং এ কারণে তাকে বিক্রোতার কাছে ফেরত দেওয়া যাবে না। ফলে ক্রোতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

وَلِهَذِهِ الْمَسْئَلَةِ أَخَوَاتٌ، كُلُّهَا تَبْتَنِي عَلَى وَكُوعِ الْمَلِكِ لِلْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخَبَارِ وَعَدَمِهِ، مِنْهَا : عِتَقُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُشْتَرَى إِذَا كَانَ قَرِيبًا لَهُ فِي مَدَّةِ الْخَبَارِ (وَمِنْهَا عِتْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرَى حَلَفَ : إِنْ مَلَكَتْ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : إِنْ اشْتَرَيْتُ ، لِأَنَّهُ بَصِيرٌ كَالْمُنْشِي لِلْعِتْقِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَسْقُطُ الْخَبَارُ .

অনুবাদ : উল্লিখিত মাসআলাটির সমশ্রেণীর আরো কিছু মাসায়েল আছে। সবগুলোই খেয়ারে শর্ত দিয়ে ক্রয়কৃত জিনিসের উপর। ক্রেতার মালিকানা সাবাস্ত হওয়া, না হওয়ার উপর ভিত্তিশীল। তন্মধ্যে একটি হলো, খেয়ারের সময়সীমার মাঝে ক্রয়কৃত দাসের ক্রেতার পক্ষ থেকে আজাদ হওয়া, যখন ক্রয়কৃত দাস তার নিকটাত্মীয় হয়। তন্মধ্যে আরেকটি হলো, খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত দাসের আজাদ হওয়া, যখন ক্রেতা শর্তবাচক বাক্য বলে যে, যদি আমি কোনো ক্রীতদাসের মালিক হই তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ সুরতে বিধান ভিন্ন হবে, যখন ক্রেতা বলে যে, যদি আমি কোনো গোলাম ক্রয় করি তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। কারণ, এ উক্তিটি ক্রয়ের পর আজাদ হওয়ার কারণ হবে। সুতরাং তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাহেবে হিদায়া (র.) উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বোক্ত মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন। মূলনীতিটি হলো, খেয়ারে শর্ত ক্রেতার হলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হয় না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতা মালিক হয়। এ মূলনীতিগত মতপার্থক্যের কারণে যে সব মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে সেগুলোর একটি পূর্বোক্ত ইবারতে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ইবারতে সাহেবে হিদায়া (র.) আরেকটি মাসআলা আলোচনা করেছেন।

এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে তার এক নিকটাত্মীয় দাসকে ক্রয় করল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন، مَن مَلَكَ ذَا رَجُلٍ مِّنْ مَّالِكَ عَلَيْهِ رَجْمٌ بَعَثَ مِنْهُ عِتَقَ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'কেউ যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়ের মালিক হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা ক্রেতার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যায়।'-[মিশকাত শরীফ]

সাহেবাইন (র.) বলেন, এ হাদীস অনুসারে ক্রেতা তিন দিনের খেয়ারে শর্তে তার নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে সে আজাদ হয়ে যাবে। কারণ, ক্রেতা তার মালিক হয়ে যায়, আর মালিক হওয়াতে নিকটাত্মীয় আজাদ হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আজাদ হবে না। কারণ, তাঁর মতে ক্রেতা মালিক হয়নি। আর হাদীসে মালিক হলে তবেই আজাদ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا عِتْقُهُ : আরেকটি মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি দাস ক্রয় করল : ক্রয়ের আগে সে এভাবে শর্তবাচক বাক্য বলে ব্যক্ত করেছিল যে, যদি আমি কোনো ক্রীতদাসের মালিক হই, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, এ সুরতে ক্রীতদাসটি আজাদ হবে কিনা? সাহেবাইন (র.) বলেন, যেহেতু ক্রেতা খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত জিনিসের মালিক হয়, তাই কেনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসটি মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর তার উপর ক্রীতদাসের মূল্য (ثَمَنٌ) ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, যেহেতু ক্রেতা খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত জিনিসের মালিক হয় না, তাই ক্রীতদাসটি মুক্ত হবে না। তার খেয়ার বাতিল থাকবে।

পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এভাবে শর্তযুক্ত বাক্য ব্যক্ত করে যে, যদি আমি কোনো গোলাম ক্রয় করি, তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর সে তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি গোলাম ক্রয় করল। এ সুরতে সর্বসম্মতভাবে গোলামটি মুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে আর তার উপর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কারণ, ক্রেতা মুক্ত হওয়াতে ক্রয়ের সাথে শর্তযুক্ত করেছিল। আর ক্রয় পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং ক্রীত গোলামটি মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, নিয়ম আছে-الْمُتَّقِ بِالشَّرْطِ كَالْمُتَّقِ অর্থাৎ 'কেউ যদি কোনো জিনিসকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করে এবং পরে সেই শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে যেন সে শর্ত ছাড়াই ঐ জিনিসটি সংঘটিত করল।' তাই শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে কোনো গোলামকে মুক্ত করলে সে যেমন মুক্ত হয়ে যায় তেমনি এ সুরতেও মুক্ত হয়ে যাবে।

وَمِنْهَا : إِنْ حَبِضَ الْمُشْتَرَاءُ فِي الْمُدَّةِ لَا يُجْتَزَى بِهِ فِي الْإِسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا  
يُجْتَزَى، وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِبَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ،  
وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ .

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, [খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে] ক্রয়কৃত বাদির খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে ঋতুস্রাব হলে তা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে গর্ভমুক্ততা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতে যথেষ্ট হবে। আর যদি খেয়ারের বিধানসারে বাদিটি বিক্রেতার কাছে ফেরত আসে, তাহলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব নয়। সাহেবাইন (র.)-এর মতে [ক্রেতার] কজা করার পর যদি ফিরে আসে, তাহলে গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি বাদি ক্রয় করল এবং তাকে কজা করল। তার কজায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে দাসীটির ঋতুস্রাব হলো। এরপর সে দাসীটির ব্যাপারে খেয়ারে শর্ত পরিত্যাগ করে তাকে রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। নিয়ম হলো, কোনো দাসী যদি একজনের মালিকানা থেকে আরেকজনের মালিকানায় আসে, তাহলে নতুন মালিকের উপর ঐ দাসীর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় করা (إِسْتِبْرَاءٌ) ওয়াজিব। গর্ভমুক্ততা নির্ণয়ের জন্য কমপক্ষে একটি মাসিক রজঃস্রাব অভিবাহিত হওয়া জরুরি। একটি মাসিক রজঃস্রাব অভিবাহিত হলে এটা নির্ণীত হবে যে, এ দাসীর গর্ভে আগের মালিকের পক্ষ থেকে কোনো সন্তান নেই। এটা প্রমাণ হওয়ার পর নতুন মালিকের জন্য তার সঙ্গে সহবাস বৈধ হবে। এখন প্রশ্ন হলো, খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে দাসীর যে ঋতুস্রাব হয়েছে তা গর্ভমুক্ততা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা?

সাহেবাইন (র.) বলেন, যথেষ্ট হবে। কারণ, ক্রেতা খেয়ারে শর্তে পণ্য ক্রয়ের পর পণ্যের মালিক হয়ে যায়, তাই দাসীর ঋতুস্রাব তার মালিকানায় হয়েছে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, যথেষ্ট হবে না। কারণ, খেয়ারে শর্তে পণ্য ক্রয়ের পর কজা করলেও অনুমোদন দেওয়ার আগে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না, তাই ঋতুস্রাব ক্রেতার মালিকানায় হয়নি। নিয়ম হলো, মালিকানায় আসার পর ঋতুস্রাব হলে তা দ্বারা গর্ভমুক্ততা নির্ণয় (إِسْتِبْرَاءٌ رَحْم) হবে।

আর যদি ক্রেতা তার খেয়ার বলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেয় এবং দাসী বিক্রেতার কাছে ফেরত আসে, তাহলে ক্রেতা দাসী কজা করে থাকুক বা না থাকুক ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় (إِسْتِبْرَاءٌ) ওয়াজিব নয়। কারণ, বিক্রেতার পর এ দাসীর অন্য কেউ মালিক হয়নি। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতার কজা করার পর যদি দাসী বিক্রেতার কাছে ফেরত আসে, তাহলে বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব। কেননা, ক্রেতা খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে ক্রয় করার কারণে তার মালিক হয়েছিল। এখন নতুন করে বিক্রেতার মালিকানায় আসছে। অতএব বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব।

কজা করার আগে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার সুরতেও সাহেবাইন (র.)-এর উসূল মোতাবেক বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব হওয়া উচিত। কারণ, খেয়ারে শর্তে ক্রয় করার কারণে ক্রেতা তার মালিক হয়েছিল। এখন নতুন করে বিক্রেতার মালিকানায় আসছে। কিন্তু ইসতিহসান হিসেবে ওয়াজিব নয়। কারণ, মালিকানা সাব্যস্ত হলেও কজা না করায় তা স্থির হয়নি। তাই বিক্রেতার পর যেন কেউ মালিক হয়নি।

وَمِنْهَا : إِذَا وَلَدَتِ الْمُشْتَرَاةُ فِي الْمُدَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا .

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, [খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে ক্রয়কৃত] দাসী যদি বিবাহ সূত্রে [ক্রেতার ঔরসে] খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে সন্তান প্রসব করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট সে উম্মে ওয়ালাদ হবে না; কিন্তু সাহেবাইন (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লেখ্য যে, মালিকের ঔরসে যে দাসী সন্তান প্রসব করে তাকে ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিভাষায় উম্মে ওয়ালাদ বলে। উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা জায়েজ নয়। মনিবের মৃত্যুর পর সে দাসত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়।

উপরিউক্ত ইবারতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি খেয়ারে শর্তে নিজ দাসী স্ত্রীকে তার মনিবের কাছ থেকে ক্রয় করল, কিন্তু সে এখনও দাসীটি কজা করেনি। [৩৬. বেনায়া : প্রাগুক্ত পৃ. ৯১] বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে স্ত্রী সন্তান প্রসব করল। এখন এ দাসীটি ক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ হবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে হবে না। কারণ, তাঁর মতে ক্রেতা দাসীর সন্তান প্রসবকালে তার মালিক হয়নি। মালিকের ঔরসে দাসী সন্তান প্রসব করলে তবেই সে উম্মে ওয়ালাদ হয়। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদ হবে। কারণ, তাঁদের মতে খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। তাই দাসীটি ক্রেতার মালিকানায় সন্তান প্রসব করেছে।

ফায়দা : ক্রেতার কজায় আসার পর দাসী সন্তান প্রসব করল, না কজায় আসার আগে প্রসব করল তা সাহেবে হিদায়ার উপরিউক্ত ইবারতে স্পষ্ট নয়। আল্লামা আইনী (র.) দীর্ঘ আলোচনার পর মন্তব্য করেছেন যে, যদি সাহেবে হিদায়ার ইবারতে وَلَدَتْ قَبْلَ الْفَيْضِ শব্দাবলি থাকত, তাহলে এত আলোচনার প্রয়োজন পড়ত না। কারণ, بَعْدَ الْفَيْضِ অর্থাৎ কজা করার পর যদি দাসী সন্তান প্রসব করে, তাহলে সকলের মতেই দাসী ক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ হবে। কারণ, সন্তান প্রসব করা দাসীর জন্য মানস্কপ্ণকারক, আর ক্রেতার কজায় সন্তান প্রসব হলে দাসী বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া যায় না। ফলে বিক্রয়চুক্তি অপরিহার্য হয়ে যায় এবং ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যায়।

وَمِنْهَا : إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي الْمُدَّةِ، هَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، لِإِرْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِالرَّدِّ، لِعَدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، لِصَحَّةِ الْإِيْدَاعِ بِإِعْتِبَارِ قِيَامِ الْمِلْكِ .

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, ক্রেতা যদি [খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে] ক্রয় করা পণ্য বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কজা করে, তারপর তা বিক্রেতার কাছে গচ্ছিত রাখে, এরপর বিক্রেতার দখলে থাকাবস্থায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট বিক্রেতার সম্পদ বিনষ্ট হলো। কারণ, ক্রেতার মালিকানা না থাকায় বিক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে [ক্রেতার] কজা রহিত হয়ে গেছে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে, ক্রেতার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। কারণ, [পণ্যে ক্রেতার] মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ায় [বিক্রেতার কাছে] গচ্ছিত রাখা শুদ্ধ হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করল এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে পণ্যটি কজা করল। এরপর সে পণ্যটি বিক্রেতার কাছে আমানত রাখল। কিন্তু খেয়ারের সময়সীমার মাঝেই পণ্য বিক্রেতার দখলে থাকাবস্থায় বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হলো, পণ্যটি কার সম্পদ থেকে গেল? ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতার সম্পদ থেকে গেল। কারণ, ক্রেতা পণ্যটির মালিক হয়নি। তাই যখন সে আমানত রাখার কথা বলে বিক্রেতার হাতে পণ্যটি তুলে দিল- এতে বিক্রেতার পণ্য বিক্রেতার হাতে চলে আসল, আর ক্রেতার কজা রহিত হয়ে গেল। কারণ, মালিকানা না থাকায় আমানত রাখা শুদ্ধ হয়নি। যখন ক্রেতার কজা রহিত হয়ে গেল, তখন তা বিক্রেতার কজা থেকে বিনষ্ট হলো। আর বিক্রেতার কজা থেকে এবং বিক্রেতার মালিকানা থেকে কোনো পণ্য বিনষ্ট হলে বিক্রেতার সম্পদ থেকে যায়, ক্রেতার উপর কোনো জরিমানা আসে না।

সাহেবাইন (র.) বলেন, এটা ক্রেতার সম্পদ থেকে গেল। তাই বিক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য (ثَمَنٌ) প্রদান করা তার উপর আবশ্যিক হবে। কারণ, তাঁদের মতে ক্রেতার খেয়ারের সূরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়। তাই বিক্রেতার কাছে আমানত রাখা শুদ্ধ হয়েছে। আর আমানতের মাল আমানতদারের কাছ থেকে ধ্বংস হওয়া আর মালিকের কাছ থেকে ধ্বংস হওয়া একই কথা। উভয় অবস্থায় মালিকের সম্পদ থেকে যায়। তাই ক্রেতার সম্পদ থেকে যাবে এবং তার উপর বিক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হবে।

وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَبْدًا مَّاذُونًا لَهُ فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ بَقِيَ  
خِبَارَهُ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الرَّدَّ امْتِنَاعٌ عَنِ التَّمَلُّكِ ، وَالْمَازُونُ لَهُ يَلِيهِ ، وَعِنْدَهُمَا يَظَلُّ  
خِبَارَهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَه كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ تَمْلِيكًَا بِغَيْرِ عَوْضٍ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .

**অনুবাদ :** আরেকটি মাসআলা হলো, ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত দাস হয়, আর বিক্রেতা তাকে খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে মূল্য থেকে অব্যাহতি দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট তার খেয়ার অবশিষ্ট থাকবে। কারণ, [খেয়ারের ভিত্তিতে] পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো মালিকানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। আর অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের এর অধিকার রয়েছে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, যখন সে পণ্যের মালিক হয়ে গেছে তখন পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো কাউকে বিনিময় ছাড়া মালিক বানানো। আর এর অধিকার তার নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে দাস মালিকের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, তাকে **عَبْدٌ مَّازُونٌ** বলে। মানুষের সাথে তার সকল লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় মালিকের পক্ষ থেকে গণ্য হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যেসব অর্থ বা সম্পদ তার হাতে আসে সেগুলোর মালিকানাও মালিকের। মালিকের অনুমতি ছাড়া কাউকে কোনো হাদিয়া দেওয়া বা দান করার এখতিয়ার তার নেই। সুরতে মাসআলা এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত একটি দাস দশ দিরহামের বিনিময়ে তিন দিনের খেয়ারে একজন স্বাধীন ব্যক্তি থেকে একটি দ্রব্য ক্রয় করল। এরপর খেয়ারের সময়সীমার ভিতরেই বিক্রেতা তাকে পণ্যের মূল্য থেকে অব্যাহতি দিল। কিয়াস তথা যুক্তি অনুযায়ী বিক্রেতার এ অব্যাহতি দান শুদ্ধ নয়। কারণ, ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রেতা এখনো বিক্রয়মূল্যের মালিক হয়নি। আর বিক্রয়মূল্যের মালিক না হয়ে বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দেয় কিভাবে? কিন্তু ইসতিহসান তথা উত্তম বিচিনা হিসেবে অব্যাহতি দান শুদ্ধ। কারণ, মালিকানার সূত্র অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তি সংগঠিত হওয়ার কারণে বিক্রয়মূল্যে তার এক জাতীয় মালিকানা অর্জিত হয়েছে। তাই বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দান শুদ্ধ হবে। যখন বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দান শুদ্ধ হয় তখন ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতার খেয়ার স্বস্থানে ঠিক থাকবে; ইচ্ছা করলে বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করবে, তখন পণ্য বিনামূল্যে তার হবে। আর ইচ্ছা করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দেবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) দলিল হলো, ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না। তাই খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো, সে পণ্যের মালিক হতে চায় না। আর গোলামের মালিকের পক্ষ থেকে তাকে এতটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, সে ইচ্ছা করলে কোনো জিনিস ক্রয় করতে পারে, আবার ক্ষেরতও দিতে পারে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দানের কারণে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, তাঁদের মতে ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে গেছে। এখন খেয়ারের ভিত্তিতে পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো, তার পক্ষ থেকে সে একজনকে বিনামূল্যে পণ্যের মালিক বানাচ্ছে। আর পণ্যের মালিকানা যেহেতু তার মনিবের, তাই এর অধিকার তার নেই। কারণ, পণ্য বিনামূল্যে দেওয়া মানে হাদিয়া দেওয়া। আর কাউকে পণ্য হাদিয়া দেওয়ার অধিকার মনিব তাকে দেয়নি।

وَمِنْهَا : إِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخَبَارِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَطَلَ الْخَبَارُ عِنْدَهُمَا ، لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَعِنْدَهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا ، فَلَا يَتَمَلَّكُهَا بِإِسْقَاطِ الْخَبَارِ وَهُوَ مُسْلِمٌ .

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, জিম্মি যদি অপর কোনো জিম্মি থেকে খেয়ারের শর্তের মাধ্যমে মদ ক্রয় করে, এরপর সে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, সে মদের মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মুসলমান অবস্থায় সে তা ফেরত দেওয়ার অধিকারী হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, জিম্মি মদের মালিক হয়নি। তাই এখন মুসলমান অবস্থায় খেয়ার রহিতকরণের মাধ্যমে সে মদে মালিকানা গ্রহণ করতে পারবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذِمِّي (জিম্মি) হলো ইসলামি রাষ্ট্রের ঐ সকল অমুসলিম বাসিন্দা, যারা নিরাপত্তা-কর দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—مَنْ نَزَى ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ অর্থাৎ 'তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জিম্মায়।' এ থেকেই ইসলামের পরিভাষায় তাদেরকে জিম্মি বলা হয়।

—[মুফতী সায়ীদ আহমদ পালনপুরী : তাকরীরে তিরমিযী]

মুসলমানদের জন্য মদ ও শূকরের লেনদেন করা হারাম। মালিক হওয়া ও মালিক বানানো উভয়টা নিষিদ্ধ। কিন্তু জিম্মিদের পরস্পরে এ দুটোর লেনদেন করা বৈধ।

সূরতে মাসআলা হলো, এক জিম্মি অপর জিম্মি থেকে তিন দিনের খেয়ারের শর্তের মাধ্যমে মদ ক্রয় করল। এরপর জিম্মি ক্রেতা মুসলমান হয়ে গেল। তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, তাদের মতে ক্রেতার খেয়ারের সূরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। তাই ক্রেতা জিম্মি থাকাবস্থায় মদের মালিক হয়ে গেছে। এখন যেহেতু মুসলমান হয়ে গেছে— আর মুসলমান কাউকে মদের মালিক বানাতে পারে না, তাই খেয়ারের ভিত্তিতে এখন বিক্রয়চুক্তি মদ ফেরত দিতে পারবে না। অতএব তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে এ সূরতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল। কারণ, তাঁর মতে ক্রেতার খেয়ারের সূরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না। তাই ক্রেতা জিম্মি থাকাবস্থায় মদের মালিক হয়নি। এখন যদি খেয়ার রহিতকরণের মাধ্যমে মদের মালিকানা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তা পারবে না। কারণ, মুসলমান মদের মালিক হতে পারে না। তাই বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।



قَالَ : وَمَنْ شَرِطَ لَهُ الْخِيَارَ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مَدَّةِ الْخِيَارِ ، وَلَهُ أَنْ يُجِيرَ فَإِنْ أَجَارَ  
يُغَيِّرُ حَضْرَةَ صَاحِبِهِ جَارًا ، وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجْزِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخِرُ حَاضِرًا عِنْدَ أَبِي  
حَنِيفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) : يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ  
(رح) : وَالشَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ ، وَإِنَّمَا كُنِيَ بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ ، لَهُ أَنَّهُ مُسَلِّطٌ عَلَى الْفَسْخِ  
مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَلَيْهِ كَالْأَجَازَةِ ، وَلِهَذَا لَا يَشْتَرِطُ رِضَاهُ ،  
وَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ - وَهُوَ الْعَقْدُ - بِالرَّفْعِ ،  
وَلَا يَغَرُّ عَنِ الْمَضَرَّةِ ، لِأَنَّهُ عَسَاهُ يَغْتَمِدُ تَمَامَ الْبَيْعِ السَّابِقِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তির জন্য খেয়ারে শর্ত আরোপ করা হয়, খেয়ারের সময়সীমার মাঝে তার বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং বহাল রাখাও অধিকার রয়েছে। যদি সে অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে বহাল রাখে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কিন্তু যদি ভেঙ্গে দেয়, তাহলে অপর পক্ষের উপস্থিতি ছাড়া ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, জায়েজ হবে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। মূলত শর্ত হলো অবগতি। ইমাম কুদরী উপস্থিতির কথা বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, যার জন্য খেয়ারে শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে তো অপর পক্ষের কাছ থেকে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাই বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়াটা অপর পক্ষের অবগতির উপর মওকুফ হবে না। যেমন- অনুমোদন বিষয়টি। আর সে কারণেই [ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য] তার সত্ত্বা শর্ত নয়। আর [যার খেয়ারে শর্তের অধিকার রয়েছে] সে হলো বিক্রয়ের উকিলের মতো। তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়াটা অর্থাৎ চুক্তি রহিতকরণ মূলত অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ। আর তা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। কেননা, হতে পারে যে, বিক্রেতার খেয়ারের সুরতে অপর পক্ষ বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হওয়ার আশায় বিক্রয়পণ্যে হস্তক্ষেপ করবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লেখ্য যে, যার অনুকূলে খেয়ারের শর্ত আরোপ করা হয় তাকে **لَهُ الْخِيَارُ** বলা হয়। **لَهُ الْخِيَارُ** ক্রেতাও হতে পারে, বিক্রেতাও হতে পারে বা অন্য কেউও হতে পারে। যার অনুকূলে খেয়ার থাকে না তাকে **لَهُ الْخِيَارُ** বলে। **لَهُ الْخِيَارُ** ক্রেতা হোক বা বিক্রেতা হোক, সে খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে চিন্তাভাবনার পর বিক্রয়চুক্তিকে বহাল রাখতে পারে, বিক্রয়চুক্তিকে বাতিলও করতে পারে। যদি বিক্রয়চুক্তিকে বহাল রাখে, তাহলে এ অনুমোদনের কথা অপর পক্ষকে জানানো জরুরি নয়। জানানো ছাড়াই তার অনুমোদন কার্যকর হবে। কিন্তু ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে ইমাম আবু

হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে তিন দিনের ভিতরে অপর পক্ষকে তা জানানো হবে। জানানো ছাড়া তার ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না; বরং অপর পক্ষের অবগতি ছাড়া যদি খেয়ারের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তির অনুমোদনের তথা বহাল রাখার কথা অপর পক্ষকে যেক্ষণ জানানো জরুরি নয়, তেমনি ভেঙ্গে দেওয়ার কথাও জানানো জরুরি নয়। অপর পক্ষের অবগতি ছাড়াই ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম যুফার (র.) এবং এক রেওয়াজে অনুসারে ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও এটাই।

قَوْلُهُ لَكَ أَنَّهُ مَسْكُطٌ عَلَى النَّسْخِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْخ:

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল : অপর পক্ষ (مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ) যখন খেয়ারের শর্ত মেনে নিয়েছে, এর মাধ্যমে সে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল : অপর পক্ষ (مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ) কে এই অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করেছে যে, সে ইচ্ছা করলে বিক্রয়চুক্তিকে বহাল রাখবে, ইচ্ছা করলে বাতিল করবে। অপর পক্ষের ঐ ক্ষমতা বলে সে যখন বিক্রয়চুক্তিকে অনুমোদন দেয়, তখন সর্বসম্মতভাবে তা কার্যকর হওয়া অপর পক্ষের (مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ) অবগতির উপর নির্ভর করে না। তাছাড়া অপর পক্ষের ক্ষমতা বলেই যেহেতু الْخِيَارُ বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে, তাই বিক্রয়চুক্তি বাতিলেও তার সম্মতি শর্ত নয়। অতএব একই ক্ষমতা বলে তার বাতিলকৃত চুক্তিটির কার্যকর হওয়াটাও অপরপক্ষের অবগতির উপর নির্ভর করবে না।

قَوْلُهُ وَسَارَ كَالرَّكِبِ بِالنَّبْعِ : ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তার পক্ষে একটি নজিরও পেশ করেন। তিনি বলেন, مَنْ لَهُ الْخِيَارُ বিক্রয়ের উকিলের মতো। বিক্রয়ের উকিল-মুআক্কিল তথা মালিকের পক্ষ থেকে অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তার অনবগতিতেও বিক্রয়পণ্য হস্তক্ষেপ করতে পারে। অতএব যার খেয়ারের অধিকার রয়েছে, সেও অপর পক্ষের অনবগতিতে তারই প্রদত্ত অধিকার বলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَهَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ بِاتْرَافِ الْخ :

তরফাইন (র.)-এর দলিল : তরফাইন (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা মূলত অপরজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। কারণ, যার খেয়ার নেই (مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ) তার পক্ষ থেকে বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হয়ে গেছে। এখন বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা মানে তার এ অধিকারকে বাতিল করা। আর এটা ক্ষতি থেকে খালি নয়। কারণ, বিক্রোতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হবে এ আশায় বিক্রয়পণ্য কজা করে তাতে হস্তক্ষেপ করে। ফলে তা বিনষ্ট/ ধ্বংস/ শেষ হয়ে যায়। এরপর যদি বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়, তখন দণ্ড হিসেবে তার উপর ঐ পণ্যের বাজারমূল্য (ثِمْنًا) আরোপিত হয়। আর বাজারমূল্য অনেক সময় ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হয়। আর ক্রেতার উপর ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি আরোপ করা তার জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি।

আর ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রোতা মনে করে যে, পণ্য তো বিক্রি হচ্ছেই, তাই পণ্যের জন্য অন্য কোনো ক্রেতা তালাশ করে না। অথচ ততদিনে সে সহজই তা অন্যত্র বিক্রি করে ফেলত। তাছাড়া বিক্রয়মূল্য কজা করে থাকলে বিক্রয়মূল্য কাজে লাগিয়ে ফেলে। বিক্রয়চুক্তি বাতিল হলে তাকে বিক্রয়মূল্য যোগাড় করতে হবে, পণ্যের জন্য আবার ক্রেতা তালাশ করতে হবে- এগুলো নিঃসন্দেহে ক্ষতি। যেহেতু বিক্রয়চুক্তি বাতিল-করাটা অপরজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ ও তার ক্ষতির কারণ, আর যে কাজে অন্য কারো ক্ষতি ও লোকসান হয় তা তার অবগতি ছাড়া করা জায়েজ নেই। তাই বিক্রয়চুক্তির রহিতকরণ কার্যকর হওয়া অপর পক্ষের অবগতির উপর মওকুফ থাকবে অর্থাৎ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ যদি খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে চায়, তাহলে অপর পক্ষকে জানিয়ে বাতিল করবে, যাতে সে ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

فَيَلْزَمُهُ غَرَامَةُ الْفَيْئَةِ بِالْهَلَاكِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَا يَطْلُبُ لِمَنْعَتِهِ  
مُشْتَرِيًا فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، وَهَذَا نَوْعٌ ضَرَرٍ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ،  
وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، لِأَنَّهُ لَا إِزَامَ فِيهِ، وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ مُسَلِّطٌ،  
وَكَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ؟ وَصَاحِبُهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ، وَلَا تَسْلِيْطُ فَنِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ  
الْمُسَلِّطُ، وَلَوْ كَانَ فَسَخَ فِي حَالِ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ، وَيَلْغَهُ فِي الْمُدَّةِ تَمَّ الْفَسْخُ لِحْصُولِ  
الْعِلْمِ بِهِ، وَلَوْ بَلَغَهُ بَعْدَ مَضَى الْمُدَّةِ تَمَّ الْعَقْدُ يَمْضِي الْمُدَّةُ قَبْلَ الْفَسْخِ.

অনুবাদ : ফলে তা বিনষ্ট হওয়ার কারণে তার উপর ঐ পণ্যের বাজারমূল্যের দণ্ড আরোপিত হবে। আর ক্রেতার  
খেয়ারের সুরতে অপর পক্ষ পণ্যের অন্য কোনো ক্রেতা তালাশ করবে না। আর এটাও এক ধরনের ক্ষতি। তাই  
বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ করাটা অপর পক্ষের অবগতির উপর মওকুফ থাকবে। আর তাই এটা [ক্রয়-বিক্রয়ের] উকিলকে  
বরখাস্ত করার মতো হলো। কিন্তু অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তাতে অপর পক্ষের প্রতি কোনো দায়  
আরোপিত হয় না। আর আমরা এ কথা বলি না যে, যার খেয়ারের শর্তের অধিকার রয়েছে, সে [অপর পক্ষের নিকট  
থেকে বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গের বিষয়ে] ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কিভাবেই বা এটা বলা যায়, অথচ অপর পক্ষ নিজেই চুক্তি ভঙ্গ করার  
ক্ষমতা রাখে না। আর ক্ষমতা দানকারী যে বিষয়ে ক্ষমতা রাখে না সে বিষয়ে ক্ষমতা দান গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অপর  
পক্ষের অনুপস্থিতিতে চুক্তি বাতিল করে, কিন্তু খেয়ারের সময়সীমার মাঝে তার কাছে সংবাদ পৌছে যায়, তাহলে  
তার অবগতি অর্জিত হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিলকরণ কার্যকর হবে। আর যদি সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর  
সংবাদ পৌছে, তাহলে চুক্তি বাতিল হওয়ার পূর্বে সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার কারণে চুক্তি সম্পন্ন হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ : তরফাইন (র.)-এর পক্ষে সাহেবে হিদায়া একটি নজির পেশ করেছেন। তিনি বলেন, খেয়ারের  
ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিলকরণের উপমা হলো উকিল বরখাস্তকরণ। কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের  
উকিল বানায় এবং পরে কোনো কারণে তাকে বরখাস্ত করতে চায়, তাহলে উকিলকে জানিয়ে বরখাস্ত করা আবশ্যিক। কারণ,  
উকিলকে না জানিয়ে বরখাস্ত করা হলে অনেক সময় উকিলের ক্ষতি হতে পারে। না জানার কারণে সে হয়তো বিক্রেতার জন্য  
কোনো দ্রব্য ক্রয় করবে, আর এর পয়সা তাকে দিতে হবে। অতএব উকিলকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে যেরূপ তাকে জানিয়ে  
বরখাস্ত করতে হয় তেমনি খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে চাইলে তা অপর পক্ষকে জানিয়ে করতে হবে। তা না  
হলে বাতিলকরণ কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ إِزَامٌ فِيهِ : ইমাম আবু ইউসুফ (র.) খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করাকে বহাল রাখার  
উপর কিয়াস করেছেন অর্থাৎ বহাল রাখার জন্য যেরূপ অপর পক্ষের অবগতি লাগে না, তেমনি বাতিলকরণ কার্যকর হওয়ার  
জন্যও অপর পক্ষের অবগতি লাগবে না। এর জ্বাবে তরফাইন (র.)-এর পক্ষে সাহেবে হিদায়া বলেন, বিক্রয়চুক্তি বহাল  
রাখার উপর বিক্রয়চুক্তি বাতিল করাকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ, বহাল রাখার মধ্যে অপর পক্ষের কোনো ক্ষতি নেই।

কারণ, তার দিক থেকে তো বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হয়েছিল। **مَنْ لَّهُ الْخِيَارُ** -এর বহাল রাখার মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। যেহেতু বহাল রাখার ক্ষেত্রে অপর পক্ষের কোনো ক্ষতি নেই, তাই এটা তার অবগতির উপর মওকুফ নয়।

**قَوْلُهُ وَلَا تَقُولُ إِنَّهُ مَسْلُوطٌ وَكَيْفَ يَقَالُ الْخِيَارُ** : সাহেবে হিদায়া ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেন, **مَنْ لَّهُ الْخِيَارُ** অপর পক্ষ থেকে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় একথা আমরা মানি না। কারণ, অপর পক্ষের নিজেরই তো বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা নেই। আর যার যে বিষয়ের ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে তার ক্ষমতা দান গ্রহণযোগ্য নয়। তাই **مَنْ لَّهُ الْخِيَارُ** অপর পক্ষের নিকট থেকে বিক্রয়চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা পেয়েছে এ কথা শুদ্ধ নয়।

**قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَكَيْفَ نَزَلَ حَالَ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ الْخِيَارُ** : সাহেবে হিদায়া বলেন, যদি খেয়ারের ভিত্তিতে **مَنْ لَّهُ الْخِيَارُ** অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে, আর খেয়ারের সময়সীমার মাঝে এ সংবাদ অপর পক্ষের কাছে পৌঁছে, তাহলে যথেষ্ট হবে; বিক্রয়চুক্তি বাতিলকরণ সম্পন্ন হবে। কারণ, খেয়ারের সময়সীমার মাঝে অপর পক্ষের জানা জরুরি। চুক্তি বাতিলের স্থানে উপস্থিত থাকা জরুরি নয়। কুদূরীর ইবারতে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও **(إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَخْرَجَ حَاضِرًا)** তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অবগতি। সাহেবে হিদায়া **وَأَسْمَا كُنِيَ بِالْحَضَرَةِ عَنْهُ** বলে এ কথাই বুঝিয়েছেন।

কিন্তু অপর পক্ষের কাছে যদি এ সংবাদ খেয়ারের সময়সীমার পরে পৌঁছে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে- বাতিলকরণ কার্যকর হবে না। কারণ, বাতিলকরণ কার্যকর হওয়ার জন্য অপর পক্ষের জানা জরুরি। জানার আগেই সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। আর খেয়ারের ভিত্তিতে হ্যাঁ/না কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যদি সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়।

ফায়দা : খেয়ারে শর্ত যদি বিক্রেতার হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন ও কার্যকর হওয়ার তিনটি সূরত।

১. খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে বিক্রেতা বলল- **أَجَزْتُ الْبَيْعَ** [আমি বিক্রয়চুক্তি বহাল রাখলাম]। এ সূরতে অপর পক্ষের উপস্থিতি বা অবগতি শর্ত নয়।
২. খেয়ারের সময়সীমার মাঝে বিক্রেতার মৃত্যুবরণ করা। এ সূরতে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে। কারণ, আমাদের মতে খেয়ারে উত্তরাধিকার নেই।
৩. বিক্রয়চুক্তি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাতিল করা ছাড়া সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যাওয়া।

আর বিক্রয়চুক্তি বাতিলের দু সূরত। যথা-

১. স্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা। যেমন, বিক্রেতা বলল- **فَسَخَّطُ الْبَيْعَ** [আমি বিক্রয়চুক্তি বাতিল করলাম]। এ উক্তির মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায়। ক্রেতার সম্মতি ও বিচারকের ফয়সালার প্রয়োজন হয় না। তবে তরফাইন (র.)-এর মতে ক্রেতার অবগতি শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে অবগতি শর্ত নয়।

২. কার্যকলাপের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা। যেমন- খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে বিক্রেতার বিক্রয়পণ্য এমন কোনো হস্তক্ষেপ করা, যা অন্যকে বিক্রয়পণ্যের মালিক বানিয়ে দেয়। উদাহরণত- বিক্রি করে দেওয়া, বিক্রয়পণ্য দাস হলে মুক্ত করে দেওয়া, খাদদ্রব্য হলে খেয়ে ফেলা ইত্যাদি। এ সূরতে বিক্রয়চুক্তি বাতিলের জন্য ক্রেতার অবগতি জরুরি নয়।

আর যদি খেয়ার ক্রেতার হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন ও কার্যকর হওয়ার উপরিউক্ত তিনটি সূরত ছাড়া আরো একটি সূরত আছে। তা হলো, ক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় বিক্রয়পণ্য এমন কোনো দোষে দুষ্ট হওয়া, যার কারণে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যায় না। ক্রেতার কার্যকলাপে দোষযুক্ত হোক বা অন্য কারো কার্যকলাপে হোক কিংবা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ের কারণে হোক কিংবা স্বয়ং বিক্রয়পণ্যের কার্যকলাপে হোক- সমান কথা। -[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮]

মাসআলা : কেউ যদি মদ খেয়ে মাতাল হয়, তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয় না। অনুরূপভাবে কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলেও তার খেয়ার বাতিল হয় না। -[প্রাগুক্ত]

قَالَ : وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحم)، بُورِثَ عَنْهُ، لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ، فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ، كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ، وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيئَةً وَإِرَادَةً، وَلَا يَتَصَوَّرُ انْتِقَالُهُ، وَالْإِرْثُ فِيمَا يَقْبَلُ الْإِنْتِقَالَ، يَخْلَافُ خِيَارَ الْعَيْبِ، لِأَنَّ الْمَوْرَثَ اسْتَحَقَّ الْمَيْعَ سَلِيمًا، فَكَذَا الْوَارِثُ، فَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ لَا بُورِثَ، وَخِيَارُ التَّعْيِينِ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ إِنْ تَدَاءَ لَاخْتِلَافُ مِلْكِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ، لَا أَنَّ بُورِثَ الْخِيَارُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তির খেয়ার রয়েছে সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি তা প্রত্যাবর্তিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, খেয়ার তার পক্ষ থেকে ওয়ারিসদের প্রতি উত্তরাধিকার সূত্রে আবর্তিত হবে। কারণ, খেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত একটি অধিকার। সুতরাং তাতে উত্তরাধিকার জারি হবে, যেমন [জারি হয়] দোষজনিত খেয়ার ও নির্দিষ্টকরণের খেয়ারের ক্ষেত্রে। আমাদের [অর্থাৎ হানাফী ফিকহবিদদের] দলিল হলো, খেয়ার একটি ইচ্ছা ও ইরাদা মাত্র। এর স্থানান্তরিত হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর উত্তরাধিকার হয় ঐ সকল জিনিসে, যেগুলো স্থানান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু দোষজনিত খেয়ারটি ভিন্ন। কারণ, মৃতব্যক্তি দোষমুক্ত পণ্যের অধিকারী হয়েছিল। অতএব উত্তরাধিকারীরাও এরূপ হবে। শুধু খেয়ারের [এক্ষেত্রেও] উত্তরাধিকার হয় না। আর নির্দিষ্টকরণের খেয়ার [উত্তরাধিকারীদের] সাব্যস্ত হয় নতুনভাবে ও পৃথকভাবে, তাদের মালিকানা অন্যের মালিকানার সাথে মিশে যাওয়ার কারণে; খেয়ারের উত্তরাধিকার হিসেবে নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খেয়ারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে, সে ক্রেতা হোক বা বিক্রেতা অথবা অন্য কেউ হোক, তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। তার উত্তরাধিকারীগণ তার খেয়ারের উত্তরাধিকার লাভ করবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উত্তরাধিকারীগণ তার খেয়ারের উত্তরাধিকার লাভ করবে। এটা ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ فَجَرِي فِيهِ الْبَيْعُ

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার শরিয়তের পক্ষ থেকে অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত একটি অধিকার। অপর পক্ষ অর্থাৎ যার খেয়ার নেই সে চাইলেও এ অধিকার বাতিল করতে পারে না। মানুষ যদি বলে, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারে শর্ত চলবে না তাহলেও খেয়ারপ্রাপ্ত ব্যক্তির এ অধিকার বহাল থাকবে। আর যে অধিকার অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত হয় তাতে উত্তরাধিকার জারি হয়। অতএব খেয়ারে শর্তের মাঝেও উত্তরাধিকার জারি হবে। যেমন- দোষজনিত খেয়ারে (خِيَارُ الْعَيْبِ) ও নির্দিষ্টকরণের খেয়ারে (خِيَارُ التَّعْيِينِ) উত্তরাধিকার জারি হয়। খেয়ারে আইব অর্থাৎ

দোষজনিত খেয়ারের স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি দোকান থেকে একটি পণ্য ক্রয় করে বাড়ি আনার পর সে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিগণ দেখল পণ্যটি দোষযুক্ত। বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই পণ্যে এ দোষ ছিল। তাহলে তারা খেয়ার পায়, ইচ্ছা করলে পণ্যটি রেখেও দিতে পারে, ইচ্ছা করলে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে।

আর খেয়ারে তা'য়ীনে অর্থাৎ নির্দিষ্টকরণের খেয়ারের স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি দুটি গরুর একটি ক্রয় করল। ক্রেতা তাকে যে কোনো একটি পছন্দ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করার আগেই সে মৃত্যুবরণ করল। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারিগণ যে কোনো একটি গরু নির্দিষ্ট করতে পারে। মোটকথা, **مَنْ لَهُ الْخَبَارُ** -এর মৃত্যুবরণের পর খেয়ারে আইব ও খেয়ারে তা'য়ীনে উত্তরাধিকারিগণ যেকোনো খেয়ার পায় তেমনি খেয়ারে শর্তের বেলায়ও উত্তরাধিকারিগণ খেয়ার পাবে।

**: قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْخَبَارَ لِبَسٍّ إِلَّا مَثَبَةً وَإِرَادَةُ الْخ**

হানাফীদের দলিল : তাঁরা বলেন, খেয়ার একটি ইচ্ছা মাত্র। ইচ্ছা অবস্থুগত জিনিস। অবস্থুগত জিনিস স্থানান্তর হয় না। আর উত্তরাধিকার জারি হয় ঐ সকল জিনিসে, যেগুলো স্থানান্তরযোগ্য। যেমন- দ্রব্যসামগ্রী ও মালামাল। অতএব দ্রব্যসামগ্রী ও মালামালের মতো মৃতব্যক্তির ইচ্ছায় উত্তরাধিকার জারি হবে না।

আর খেয়ারে আইব ও খেয়ারে তা'য়ীনে উত্তরাধিকার জারি হয় বলে যে কথা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, মূলত সেক্ষেত্রে খেয়ার বা ইচ্ছায় উত্তরাধিকার জারি হয় না; বরং সেখানে বিষয়টি ভিন্ন। খেয়ারে আইবের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রয়চুক্তির কারণে দোষযুক্ত পণ্যের মালিক হয়। সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারীরাও দোষযুক্ত পণ্যের মালিক হবে। তাই পণ্য দোষযুক্ত হলে তারা তা ফেরত দেওয়ার অধিকার পায়। আর খেয়ারে তা'য়ীনের ক্ষেত্রে ক্রেতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা পণ্যের মালিক হয়। ক্রেতা যেকোনো দুটি গরুর একটির মালিক হয়, তেমনি উত্তরাধিকারীরাও একটি গরুর মালিক হয়। কিন্তু তাদের মালিকানা বিক্রেতার মালিকানার সাথে মিশে আছে। তাই তারা চিহ্নিত করার এখতিয়ার নতুনভাবে লাভ করে। মৃত্যুবরণকারী ক্রেতার পরিত্যক্ত দ্রব্য ও সম্পদের মতো ইচ্ছা ও এখতিয়ার মিরাস হিসেবে তাদের কাছে পৌঁছে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِعَٰلِيهِ فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازٌ ، وَأَيُّهُمَا نَقَضَ  
 انْتَقَضَ ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ لِعَٰلِيهِ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا  
 يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ (رحا) ، لِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ مَوَاجِبِ الْعَقْدِ وَأَحْكَامِهِ ، فَلَا يَجُوزُ  
 اشْتِرَاؤُهُ لِعَٰلِيهِ ، كَاشْتِرَاطِ الثَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي ، وَلَنَّا أَنَّ الْخِيَارَ لِعَٰلِيهِ الْعَاقِدِ  
 لَا يَنْتَبِئُ إِلَّا بِطَرِيقِ النَّيَابَةِ عَنِ الْعَاقِدِ ، فَيَقْدَرُ الْخِيَارُ لَهُ إِقْتِضَاءٌ ، ثُمَّ يُجْعَلُ هُوَ  
 نَائِبًا عَنْهُ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ ،  
 فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازٌ ، وَأَيُّهُمَا نَقَضَ انْتَقَضَ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো জিনিস ক্রয় করে এবং অন্যের জন্য খেয়ারের শর্ত করে, তাহলে তাদের দুজনের যে কেউ অনুমোদন দিলে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হবে এবং যে কেউ রহিত করলে রহিত হয়ে যাবে। এর মূলনীতি হলো, অন্যের জন্য খেয়ারের শর্ত করা ইসতিহসান তথা উত্তম বিবেচনা হিসেবে বৈধ। কিন্তু কিয়াস [যুক্তি] হিসেবে বৈধ নয়। এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত। কারণ, খেয়ার বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি ও তার বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চুক্তিকারী ছাড়া অন্যের জন্য তার শর্ত করা বৈধ হবে না। যেমন বৈধ নয় ক্রেতা ভিন্ন অন্য কারো উপর বিক্রয়মূল্য শর্ত করা। আমাদের দলিল হলো, চুক্তিকারীর স্থলাভিষিক্ততার ভিত্তিতেই শুধু অন্যের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত হচ্ছে। তাই চুক্তিকারীর জন্যও অনিবার্যভাবে খেয়ার সাব্যস্ত হবে। [সুতরাং যেন সে নিজের জন্য শর্ত করেছে], এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত বানাচ্ছে, তার পদক্ষেপকে শুদ্ধরূপ দেওয়ার জন্য। আর তখন উভয়ের প্রত্যেকের জন্য খেয়ার হবে। তাই তাদের যে কেউ অনুমোদন করলে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হবে। আর যে কেউ রহিত করলে রহিত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় মানুষ একটি জিনিস ক্রয় করার ইচ্ছা করে, কিন্তু ঐ জিনিস সম্পর্কে কিংবা ঐ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাকে অভিজ্ঞ ও ক্রয়-বিক্রয়ে পারদর্শী কোনো ব্যক্তির পরামর্শ ও পছন্দ অনুসারে ক্রয় করতে হয়। অনেক সময় ক্রেতা নিজের জন্য ক্রয় করে না, অন্যের জন্য ক্রয় করে। যার জন্য ক্রয় করে তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে। এসব প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত আরোপ বৈধ করা হয়েছে। এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা কোনো জিনিস ক্রয় করল এবং অন্যের জন্য তিন দিনের খেয়ারের শর্ত করল। এ সুরতে তাদের দুজনই খেয়ার-প্রাপ্ত হবে। দুজনের যে কেউ অনুমোদন দিলে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হবে এবং যে কেউ বাতিল করলে বাতিল হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ বিষয়ে মূলনীতি হলো, অন্যের জন্য খেয়ারের শর্ত করা ইসতিহসান [উত্তম বিবেচনা] হিসেবে বৈধ। কিয়াস [যুক্তি] হিসেবে বৈধ হয় না। ইমাম যুফার (র.) -এর মতেও তৃতীয় কারো জন্য খেয়ারের শর্ত করা বৈধ নয়। কিয়াস হলো, খেয়ারে শর্ত বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি এবং হকুমসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য পরিশোধ করা, পণ্য অর্পণ করা ইত্যাদি যেমন অবশ্য পালনীয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো এক পক্ষের জন্য খেয়ারের শর্ত করা হলে তাও অবশ্যপালনীয়। যেহেতু খেয়ার বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি এবং হকুমসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, তাই তা শুধু দুই চুক্তিকারী অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য বৈধ হবে। তৃতীয় কারো জন্য বৈধ হবে না। যেমন বৈধ হয় না মূল্য পরিশোধের শর্ত ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো জন্য করা। অথচ মূল্য পরিশোধ করাও খেয়ারের মতোই বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি এবং হকুমসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই খেয়ারের শর্তও তৃতীয় কারো জন্য করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لِيُغَيِّرَ الْعَاقِدَ لَا يَنْبَغُ الْخ:

আমাদের দলিল : প্রয়োজনের কারণে শরিয়ত খেয়ারের শর্ত আরোপ বৈধ করেছে; কিয়াস হিসেবে খেয়ারের শর্ত আরোপ বৈধ হয় না। এরূপ প্রয়োজন চুক্তিকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য খেয়ারের শর্ত করার বেলায়ও বিদ্যমান। তাই ইসতিহসান [উত্তম বিবেচনা] হিসেবে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত করাও বৈধ হবে। তবে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত করার দু-সুরত হতে পারে—

১. মূলগতভাবে (أَصْلًا);

২. স্থলাভিষিক্ত রূপে (نِسَابَةً)।

যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি চুক্তিকারী নয়, তাই তার জন্য মূলগতভাবে খেয়ারের শর্ত করা যায় না। তবে চুক্তিকারীর স্থলাভিষিক্ত রূপে তার জন্য খেয়ারের শর্ত করা যায়। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত করার অর্থ হবে— চুক্তিকারী প্রথমে নিজের জন্য খেয়ারের শর্ত করেছে, এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয়চুক্তিতে হস্তক্ষেপে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এরূপ সুরত করে তৃতীয় ব্যক্তির খেয়ারের শর্তকে বৈধ করা এজন্য যে, যাতে একজন বালগ মুসলমান ব্যক্তির চুক্তি দরুস্ত হয়ে যায়।

এ প্রক্রিয়ায় যখন দুজনের জন্যই খেয়ার সাব্যস্ত হবে, তখন দুজনের যে কেউ বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করলে তা বৈধ হবে। অনুরূপভাবে যে কেউ বাতিল করলে বাতিল হবে। কিন্তু যদি দুজনের কথায় পার্থক্য হয় অর্থাৎ একজন বিক্রয়চুক্তিকে অনুমোদন করে আর অপরজন বাতিল করে, তাহলে প্রথমে যে সিদ্ধান্ত দেবে তার হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, প্রথমজন যখন অনুমোদন বা বাতিল করে তখন তার বিপরীতে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ফলে তার কথাই কার্যকর হয়ে যায়।



وَلَوْ أَجَاَزَ أَحَدُهُمَا وَقَسَخَ الْآخَرُ يُعْتَبَرُ السَّابِقُ لَوُجُودُهُ فِي زَمَانٍ لَا يُزَاجِمُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَلَوْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُ الْعَاقِدِ فِي رَوَايَةٍ، وَتَصَرُّفُ الْفَاسِيخِ فِي أُخْرَى، وَجَهَ الْأَوَّلُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِدِ أَقْوَى، لِأَنَّ النَّائِبَ يَسْتَفِيدُ الْوَلَايَةَ مِنْهُ، وَجَهَ الثَّانِي أَنَّ الْفَسَخَ أَقْوَى لِأَنَّ الْمَجَازَ يَلْحَقُهُ الْفَسَخُ، وَالْمَفْسُوحُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، وَلَمَّا مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ رَجَحْنَا بِحَالِ التَّصَرُّفِ، وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رح)، وَالثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (رح)، وَاسْتُخْرِجَ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْ رَجُلٍ وَالْمَوْكِلُ مِنْ غَيْرِهِ مَعًا فَمُحَمَّدٌ (رح) يَعْتَبَرُ فِيهِ تَصَرُّفُ الْمَوْكِلِ، وَأَبُو يُوسُفَ (رح) يَعْتَبَرُهُمَا .

অনুবাদ : যদি দুজনের একজন অনুমোদন দেয় আর অপরজন বাতিল করে, তাহলে অগ্রবর্তীজনের পদক্ষেপ বিবেচিত হবে। কারণ, তার হস্তক্ষেপ এমন সময়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে যখন অন্য কিছু তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। যদি দুজনের কথা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাহলে এক বর্ণনা অনুসারে চুক্তিকারীর হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। অপর বর্ণনা অনুসারে রহিতকারীর হস্তক্ষেপ (تَصَرُّفٌ) গ্রহণযোগ্য হবে। প্রথম বর্ণনার দলিল হলো, চুক্তিকারীর হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। কারণ, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি তো তারই নিকট থেকে ক্ষমতা পেয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হলো, চুক্তি বাতিল করার হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। কারণ, অনুমোদনকৃত বিষয়ের সঙ্গে রহিতকরণ যুক্ত হয়, কিন্তু বাতিলকৃত বিষয়ের সঙ্গে অনুমোদন যুক্ত হয় না। যখন উভয়ের প্রত্যেকেই হস্তক্ষেপের অধিকারী, তখন হস্তক্ষেপের গুণগত মানের বিচারে আমরা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করব। কারো কারো মতে প্রথম বর্ণনাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত, আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। এটা বের করা হয়েছে ঐ মাসআলা থেকে যে, যখন একসঙ্গে [একই পণ্যকে] উকিল বিক্রি করে এক ব্যক্তির কাছে আর মুআকিল বিক্রি করে আরেক ব্যক্তির কাছে, তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুআকিলের কর্মকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেন, আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উভয়ের কর্মকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : আর যদি দুজনের কথা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাহলে এক বর্ণনা অনুসারে চুক্তিকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী বাতিলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যে বর্ণনা অনুযায়ী চুক্তিকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে তার দলিল হলো, খেয়ারের বেলায় চুক্তিকারী যেহেতু মূল ব্যক্তি তাই তার কথা বেশি শক্তিশালী। কারণ, অপরজন তো তার কাছ থেকেই খেয়ারের ক্ষমতা পেয়েছে। সুতরাং বেশি শক্তিশালীটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যে বর্ণনা অনুযায়ী বাতিলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে তার দলিল হলো, দুজনের প্রত্যেকেই বিক্রয়চুক্তিতে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে। তাই দেখা উচিত কার হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। আমরা দেখি বাতিলকারীর হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। কারণ, বাতিলকরণ অনুমোদন দানের তুলনায় বেশি শক্তিশালী। কোনো জিনিস অনুমোদন করার পর তা বাতিল করা যায়, কিন্তু বাতিল করার পর অনুমোদন করা যায় না। তাই বাতিলকরণ গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ফিক্‌হবিদদের কারো কারো মতে প্রথমোক্ত বর্ণনা অর্থাৎ চুক্তিকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে— এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ বাতিলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে— এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। সরাসরি ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মাঝে যে মতপার্থক্য হয়েছে সম্ভবত ফিক্‌হবিদগণ তা থেকেই এ মত গ্রহণ করেছেন। মাসআলা হলো, যখন একসঙ্গে একই পণ্যকে উকিল বিক্রি করে এক ব্যক্তির কাছে, আর মুআক্কিল বিক্রি করে আরেক ব্যক্তির কাছে, তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুআক্কিলের কর্মকে (تَصَرُّفٌ) গ্রহণ বলে বিবেচনা করেন।

এ মাসআলায় মুআক্কিল মূল ব্যক্তি, আর উকিল তার স্থলাভিষিক্ত। উকিল মুআক্কিল থেকেই বিক্রয়ের ক্ষমতা পেয়েছে। পূর্বেক্ত মাসআলায় চুক্তিকারী মূল। চুক্তিকারীর পক্ষ থেকেই তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রয়চুক্তিতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা পেয়েছে। এ মাসআলায় যেহেতু ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুআক্কিলের কর্মকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন তাই পূর্বেক্ত মাসআলায় চুক্তিকারীর পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে— এ অভিমত তাঁরই হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উভয়ের কর্মকে (تَصَرُّفٌ) গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন এবং তিনি বলেন, উভয় ক্রেতা অর্ধেক করে পণ্যটির মালিক হবে এবং উভয়ের উপর অর্ধেক মূল্য আবশ্যিক হবে। তবে সম্মতি অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি না হওয়াতে উভয়ে তা গ্রহণ করা/না করার এক্টিয়ার পাবে। এ মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উকিল ও মুআক্কিলের বিবেচনা করেননি; তাদের পদক্ষেপের বিবেচনা করেছেন এবং উভয়ের পদক্ষেপকে ঠিক রেখেছেন। এ থেকে বুঝা যায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হস্তক্ষেপকারীর বিবেচনা করেন না, হস্তক্ষেপের বিবেচনা করেন। অতএব পূর্বেক্ত মাসআলায় হস্তক্ষেপের বিবেচনা করার অভিমত ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর।

মোটকথা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে আসল মতবিরোধ হলো ওকালতের মাসআলায়। আলোচ্য মাসআলার দুই বর্ণনাকে ফিক্‌হবিদগণ কিয়াস করে দুই বর্ণনা দুজনের বলে সাব্যস্ত করেছেন।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلْيَبِيعْ فَايَسِدْ، وَإِنْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا يَبِيعُهُ جَارَ النَّبِيعِ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، أَحَدُهَا أَنْ لَا يُفْصَلَ الثَّمَنُ، وَلَا يُعَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ، وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ وَالْمِيبِيعِ، لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا الْعَقْدُ مَعَ الْخِيَارِ لَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ، فَبَقِيَ الدَّخْلُ فِيهِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُفْصَلَ الثَّمَنُ وَيُعَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ ثَانِيًا فِي الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا جَارَ، لِأَنَّ الْمِيبِيعَ مَعْلُومٌ، وَالثَّمَنَ مَعْلُومٌ، وَقَبُولُ الْعَقْدِ فِي الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لِإِنْعِقَادِهِ فِي الْآخِرِ وَلَكِنْ هَذَا غَيْرُ مَفْسِدٍ لِلْعَقْدِ، لِكُونِهِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ، كَمَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ قَيْنِ وَمُدَبَّرٍ، وَالثَّلَاثُ أَنْ يُفْصَلَ، وَلَا يُعَيَّنَ الرَّابِعُ أَنْ يُعَيَّنَ، وَلَا يُفْصَلَ، وَالْعَقْدُ فَايَسِدْ فِي الْوَجْهَيْنِ إِنَّمَا لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে দুটি দাস এই শর্তে বিক্রি করে যে, দুটোর একটিতে ক্রেতার তিন দিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি দুটোর প্রতিটিকে পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় করে যে, নির্দিষ্ট একটিতে তিন দিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ মাসআলার সূরত চারটি। প্রথম সূরত: বিক্রোতা [প্রতিটি দাসের বিপরীতে পৃথকভাবে] মূল্য ধার্য করেনি এবং কোনটিতে খেয়ার হবে তা নির্দিষ্ট করেনি। কিতাবে [জামে সগীরে] উল্লিখিত দু-সূরতের এটি প্রথমটি। এর ফাসিদ হওয়াটা বিক্রয়মূল্য ও বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত থাকার কারণে। কারণ, যে গোলামে খেয়ার তা চুক্তি বহির্ভূত ক্রীতদাসের মতো। কারণ, খেয়ারের বর্তমানে হুকুম [অর্থাৎ মালিকানা] সাব্যস্ত হওয়ার হিসেবে চুক্তি সংগঠিত হয় না। অতএব চুক্তিভুক্ত রইল দুটোর একটি। আর তা অনির্দিষ্ট। দ্বিতীয় সূরত : [প্রতিটির বিপরীতে পৃথকভাবে] মূল্য ধার্য করা এবং কোনটিতে খেয়ার তা নির্দিষ্ট করা। কিতাবে উল্লিখিত দ্বিতীয় সূরত হলো এটি। [এ সূরতে] বিক্রয় জায়েজ। কারণ, বিক্রয়পণ্যও নির্দিষ্ট এবং বিক্রয়মূল্যও নির্দিষ্ট। অবশ্য যেটায় খেয়ার রয়েছে, তাতে চুক্তি কবুল করাটা যদিও অপরাধীতে বিক্রয় সংগঠিত হওয়ার জন্য শর্ত, কিন্তু এটি চুক্তিকে ফাসিদকারী নয়। কারণ, তা বিক্রয়ের ক্ষেত্র। যেমন কেউ দাস ও মুদাব্বারকে [একই বিক্রয়চুক্তিতে] একত্র করলে [তা ফাসিদ নয়]। তৃতীয় সূরত : [প্রতিটি দাসের বিপরীতে] মূল্য ধার্য করা, তবে [খেয়ার কোনটিতে তা] নির্দিষ্ট না করা। চতুর্থ সূরত : [কোনটিতে খেয়ার তা] নির্দিষ্ট করা, কিন্তু [প্রতিটির বিপরীতে] মূল্য ধার্য না করা। বিক্রয়পণ্য বা মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এ দু-সূরতে চুক্তি ফাসিদ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারত ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামে সগীরে। আলোচিত মাসআলার সুরত চারটি। ইবারতে দু-সুরত উল্লিখিত হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বিশ্লেষণসহ উক্ত চার সুরতই উল্লেখ করেছেন।

**প্রথম সুরত:** **الْخ: قَوْلُهُ أَحْمَأْ لَا يَنْفِصِلُ الشَّنَّ وَلَا يَغِيَنُ الْخ:** এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে দুটি গোলাম বিক্রি করল, এই শর্তে যে, একটি গোলামে ক্রেতার তিন দিনের খেয়ার থাকবে। কিন্তু দুটির কোনটির মূল্য কত তা ধার্য করেনি এবং দুটির কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার থাকবে তাও নির্দিষ্ট করেনি। ইবারতে উল্লিখিত দু-সুরতের এটি প্রথমটি। এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ, এ সুরতে বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত এবং মূল্যও অজ্ঞাত। তা এভাবে যে, যে গোলামে ক্রেতার খেয়ার রয়েছে তাতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি, তাই তা যেন চুক্তি-বহির্ভূত। সুতরাং চুক্তিভুক্ত রইল একটি। একটিতে বিক্রয় সংগঠিত হয়েছে এবং তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সেটা কোনটি এবং তার মূল্য কত তা নির্দিষ্ট না হওয়ায় বিক্রয়পণ্যও অজ্ঞাত এবং মূল্যও অজ্ঞাত। আর বিক্রয়পণ্য ও মূল্যের উভয়টি কিংবা কোনো একটি অজ্ঞাত হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। অতএব এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

**দ্বিতীয় সুরত:** **قَوْلُهُ وَالْوَجْهَ الشَّائِنَ أَنْ يَنْفِصِلُ الشَّنَّ وَيَغِيَنُ الْخ:** বিক্রোতা প্রতিটি গোলামের বিপরীতে মূল্য ধার্য করেছে এবং কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার তাও নির্দিষ্ট করেছে। এটা ইবারতে উল্লিখিত দ্বিতীয় সুরত। এ সুরতে বিক্রয় জায়েজ। কারণ, যে গোলামে খেয়ার নেই তাতে বিক্রয়চুক্তি সংগঠিত হয়েছে এবং তার মূল্যও ধার্য করা আছে। তাই বিক্রয়পণ্যও জানা এবং মূল্যও জানা। অতএব বিক্রয় জায়েজ হওয়াতে কোনো বাধা নেই।

তবে এ সুরতে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যেন বিক্রোতা বিক্রয়চুক্তিতে এ ধরনের একটি শর্ত করল যে, যদি খেয়ারবিহীন গোলামটি ক্রয় করতে হয়, তাহলে খেয়ারাধীন গোলামে বিক্রয়চুক্তি কবুল করতে হবে। যে গোলামে খেয়ার আছে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি বিধায় তা যেন বিক্রয়চুক্তি বহির্ভূত। আর বিক্রয়চুক্তিতে চুক্তি-বহির্ভূত কোনো বিষয়ের শর্ত করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন, কেউ যদি নিজের মালিকানাধীন গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তিতে বিক্রি করে, তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হয়। গোলামেও বিক্রয় দুরস্ত হয় না। কারণ, এ সুরতে বিক্রোতা যেন এই শর্ত করেছে যে, যদি গোলাম ক্রয় করতে হয় তাহলে স্বাধীন ব্যক্তির বেলায় বিক্রয়চুক্তি কবুল করতে হবে। আর স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্য নয়। তাই তা বিক্রয়পণ্য নয়। অতএব, বিক্রয় চুক্তিতে চুক্তি বহির্ভূত বিষয়ের শর্ত করা হলো। আর বিক্রয়চুক্তিতে চুক্তি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের শর্ত করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। তাই তা ফাসিদ হবে। আলোচ্য মাসআলায় যেন ঠিক একই শর্ত করা হয়েছে। অতএব এ চুক্তিও ফাসিদ হওয়া উচিত।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর জবাবে বলেন, যে গোলামে ক্রেতার খেয়ার রয়েছে তা বিক্রয়যোগ্য পণ্য। আর তাই তা বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে: যদিও মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে অন্তর্ভুক্ত নয়। যখন খেয়ারাধীন গোলাম বিক্রয়যোগ্য পণ্য হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত, তখন বিক্রয়চুক্তিতে চুক্তিবহির্ভূত কোনো বিষয় কবুল করার শর্ত করা হয়নি। অতএব বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। এর উদাহরণ হলো, কেউ যদি গোলাম ও মুদাঝারকে একই বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে আমাদের মতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ নয়: গোলামে বিক্রয় কাকর হয়। কারণ, মালিকানাধীন হেতু মুদাঝার বিক্রয়ের স্থল। তাই তা বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে বিক্রয়চুক্তিতে বহির্ভূত কোনো জিনিসের শর্ত করা হয় না।

**তৃতীয় সুরত:** **وَالثَّالِثُ أَنْ يَنْفِصِلُ وَلَا يَغِيَنُ:** বিক্রোতা প্রতিটি গোলামের বিপরীতে মূল্য ধার্য করেছে, কিন্তু কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার তা নির্দিষ্ট করেনি। এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ। কারণ, এ সুরতে কোন গোলামটিতে এখন বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে এবং ক্রেতা তার মালিক হয়েছে তা নির্দিষ্ট নয় বিধায় বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত। আর বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত হলে বিক্রয় ফাসিদ হয়। সুতরাং এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

**চতুর্থ সুরত:** **الرَّابِعُ أَنْ يَغِيَنَ وَلَا يَنْفِصِلُ:** বিক্রোতা প্রতিটি গোলামের বিপরীতে মূল্য ধার্য করেনি, কিন্তু কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার তা নির্দিষ্ট করেছে। এ সুরতেও বিক্রয় ফাসিদ। কারণ, এ সুরতে যে গোলামটিতে এখন বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে এবং ক্রেতা তার মালিক হয়েছে তা নির্দিষ্ট, কিন্তু তার মূল্য ধার্য নয় বিধায় বিক্রয়মূল্য অজ্ঞাত। আর বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত হলে যেকোন বিক্রয় ফাসিদ হয় তেমনি বিক্রয়মূল্য অজ্ঞাত হলেও বিক্রয় ফাসিদ হয়। সুতরাং এ সুরতেও বিক্রয় ফাসিদ হবে।

قَالَ : وَمِنْ أَشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيُّهُمَا شَاءَ بِعَشْرَةٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً أَثَرًا فَلِیَبِيعَ فَاِسِدَّ، وَالْقِیَاسُ أَنْ یَفْسُدَ النِّبَعُ فِی الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ وَالشَّافِعِيِّ (رح)، وَجَهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنْ شَرَعَ الْخِيَارَ لِلْحَاجَةِ إِلَى دَفْعِ الْغَبْنِ لِيَخْتَارَ مَا هُوَ الْأَرْزَقُ وَالْأَوْفَى، وَالْحَاجَةُ إِلَى هَذَا التَّنَوُّعِ مِنَ الْبِیْعِ مُتَحَقِّقَةٌ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِخْتِيَارٍ مَنْ يَتَّقُ بِهِ أَوْ إِخْتِيَارٍ مَنْ يَشْتَرِيهِ لِأَجْلِهِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْبَایْعُ مِنَ الْحَمْلِ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْبِیْعِ، فَكَانَ فِی مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি দু'টি কাপড় [এর একটি] এই শর্তে ক্রয় করে যে, দু'টির যেটা ইচ্ছা সে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে এবং তার তিন দিনের খেয়ার থাকবে তাহলে তা জায়েজ আছে। এরপভাবে তিনটি কাপড় [এর একটি হলেও জায়েজ]। কিন্তু কাপড় যদি চারটি হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ। আর ক্রয়সের দাবি হলো বিক্রয় পণ্য অজ্ঞাত হওয়ায় সকল সূরতে বিক্রয় ফাসিদ হওয়া। এটাই ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইসতিহসানের দলিল হলো, শরিয়ত কর্তৃক খেয়ারকে বৈধ করা হয়েছে ঠকা রোধ করার প্রয়োজনে; যাতে খেয়ারের শর্তারোপকারী অধিকতর লাভজনক ও সুবিধাজনক বস্তুটি নির্বাচন করতে পারে। আর এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনও সুসাব্যস্ত। কারণ, খেয়ারের শর্তারোপকারী [অনেক সময়] নির্ভরযোগ্য কারো পছন্দের প্রতি কিংবা যার জন্য সে ক্রয় করছে তার পছন্দের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর বিক্রেতা তাকে বিক্রয় চুক্তি ছাড়া তার কাছ থেকে তা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিবে না। সুতরাং শরিয়ত তিনদিন মেয়াদী যে শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার বৈধ করেছে এটা তারই সমপর্যায়ের।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খেয়ারে তা'ঈন : মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় মানুষ একটি জিনিস ক্রয় করায় ইচ্ছা করে। কিন্তু ঐ জিনিসের ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাকে অভিজ্ঞ এবং ঐ জিনিসের ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো ব্যক্তির পরামর্শ ও পছন্দ অনুসারে ক্রয় করতে হয়। অনেক সময় একই জিনিস বিভিন্ন মানের হয়, আবার একই মানের জিনিস বিভিন্ন ডিজাইনের ও বিভিন্ন কালারের হয়। অনেক সময় ক্রেতা নিজের জন্য ক্রয় করে না, অন্যের জন্য ক্রয় করে। যার জন্য ক্রয় করে তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে। ক্রয়-বিক্রয়ে শরিয়ত কর্তৃক প্রদত্ত শর্তভিত্তিক খেয়ারের উপর ক্রয় করে এসব প্রয়োজনে ফুকাহায়ে কেরাম খেয়ারে তা'ঈন বা নির্দিষ্টকরণের খেয়ারকে বৈধ করেছেন।

এর উদাহরণ হলো, ক্রেতা একটি কাপড় কেনার জন্য দোকানে গেল। বিক্রেতা একই মানের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন ও ভিন্ন ভিন্ন কালারের দু'টি/ তিনটি কাপড় দেখিয়ে ক্রেতাকে বলল, তিনটি কাপড়ের যেটা ইচ্ছা আপনি নিতে পারেন, সবগুলোর দাম সমান, যেটা নেন একশ টাকা। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মানের দু'টি/ তিনটি কাপড় দেখিয়ে বলল, এর দাম একশ টাকা, এর দাম

দেড়শ' টাকা, আর এর দাম দু'শ টাকা, আপনার ইচ্ছা যেটা নেন। এ সব সূরতে ক্রেতাকে তার উদ্দিষ্ট একটি পণ্য নির্দিষ্ট করার অর্থতন্ত্র দেওয়া হয়। এটাকেই খেয়ারে তা'ঈন বলে।

তবে নির্দিষ্ট করার জন্য ক্রেতা কতটুকু সময় পাবে কিংবা বলা যায়, খেয়ারে তা'ঈনের সময়সীমা কতটুকু হবে- এ নিয়ে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। শর্তভিত্তিক খেয়ারের সময়সীমার ব্যাপারে যে মতপার্থক্য, ঠিক একই মতপার্থক্য খেয়ারে তা'ঈনের বেলায়ও। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে যতদিন ধার্য হয়। এর কারণ হলো, খেয়ারে তা'ঈনকে তো খেয়ারে শর্তের উপর কিয়াস করেই বৈধ করা হয়েছে। অতএব, শর্তভিত্তিক খেয়ারের সময়সীমা যা হবে, খেয়ারে তা'ঈনেও তাই হবে।

খেয়ারে তা'ঈনের ভিত্তিতে নেওয়া দু'টি/ তিনটি কাপড়ের যে কোনো একটি বিক্রয় পণ্য হবে। অবশিষ্ট একটি বা দু'টি ক্রেতার হাতে আমানত থাকবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ إِلَيْهِمَا الْح: উপরোক্ত মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রণীত জামে সগীরের। সাহিবে হিদায়া তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সূরতে মাসআলা এই যে, এক ব্যক্তি একটি কাপড় ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দোকানে গেল। বিক্রেতা তাকে দু'টি কাপড় দেখাল। ক্রেতা বলল, আমি দশ টাকার বিনিময়ে দু'টির একটি এ শর্তে ক্রয় করলাম যে, যেটা পছন্দ হয় সেটা নিব এবং আমার তিনদিনের খেয়ার থাকবে। বিক্রেতা সম্মত হলো। এ সূরতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

এরূপ চুক্তি যদি তিনটি কাপড়ের মাঝে হয় অর্থাৎ বিক্রেতা তিনটি কাপড় দেখাল আর ক্রেতা বলল, আমি এ তিনটি কাপড়ের একটি একশ টাকার বিনিময়ে এই শর্তে ক্রয় করলাম যে, যেটা পছন্দ হয় সেটা নিব এবং আমার তিনদিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে তাও জায়েজ হবে। কিন্তু চার কাপড়ের মাঝে এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

قَوْلُهُ وَالْفَيْسَ أَنْ يَنْفَسَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ الْح: সাহিবে হিদায়া বলেন, কিয়াস অনুযায়ী তিনো সূরতেই বিক্রয় ফাসিদ হয় এবং ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও তাই। কারণ, দুই/ তিন/ চার কাপড়ের মধ্যে কোনটি বিক্রয়পণ্য (مُبِيع) তা বিক্রয়চুক্তির সময় অজ্ঞাত থাকে। আর ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য ও বিক্রয় মূল্যের কোন একটি অজ্ঞাত হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। তাই এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

قَوْلُهُ وَجَهَ الْإِسْتِعْصَانُ أَنْ تُرْعَى الْخِيَارُ لِلْعَايَةِ الْح: সাহিবে হিদায়া বলেন, কিন্তু ইসতিহসান হিসেবে এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি বৈধ। ইসতিহসানের দলিল হলো, শরিয়ত শর্তভিত্তিক খেয়ারকে বৈধ করেছে ঠক রোধ করার প্রয়োজনে; যাতে খেয়ারের শর্তারোপকারী চিন্তাভাবনা করে তার জন্য যেটাকে অধিকতর লাভজনক ও সুবিধাজনক মনে করে তা নির্বাচন করতে পারে। আর এ ধরনের প্রয়োজন খেয়ারে তা'ঈনেও পাওয়া যায়। কারণ, অনেক সময় মানুষ একটি জিনিস ক্রয় করার ইচ্ছা করে। কিন্তু ঐ জিনিসের ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তার ধারণা তাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাকে অভিজ্ঞ এবং ঐ জিনিসের ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো ব্যক্তির পরামর্শ ও পছন্দ অনুসারে ক্রয় করতে হয়। অনেক সময় ক্রেতা নিজের জন্য ক্রয় করে না, অন্যের জন্য ক্রয় করে। যার জন্য ক্রয় করে তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে। তার পছন্দের জন্য বেছে বেছে কয়েকটি কাপড় তার কাছে নিয়ে আসতে হয়। আর বিক্রেতা তাকে বিক্রয়চুক্তি ছাড়া তার কাছ থেকে তা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় না। এসব কারণে অর্থাৎ প্রয়োজনের বিবেচনায় খেয়ারে তা'ঈন তিনদিন মেয়াদি শর্তভিত্তিক খেয়ারের সমপর্যায়ভুক্ত। অতএব প্রয়োজনের কারণে যেমন শরিয়ত শর্তভিত্তিক খেয়ার বৈধ করেছে তেমনি খেয়ারে তা'ঈনও বৈধ হবে।

আর খেয়ারে তা'ঈনের বেলায় বিক্রয়কালে বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত থাকলেও তা বিক্রয়চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য বাধা নয়। কেননা, এ অজ্ঞাত ঝগড়ার কারণ (مُنْجَرٍّ إِلَى السَّاعَةِ) হয় না। তা এ জন্য যে, বিক্রেতার পক্ষ থেকে তো ক্রেতাকে পণ্য নির্দিষ্ট করার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। তাই ক্রেতার পছন্দের উপর বিক্রেতার কিছু বলার অবকাশ থাকে না। আর যে অজ্ঞাত ঝগড়ার কারণ হয় না তা বিক্রয়চুক্তি বৈধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالثَّلَاثِ لَوْجُودِ الْجَبِدِ وَالْوَسْطِ وَالتَّوَدُّعِ فِيهَا،  
وَالْجَهَالَةُ لَا تَفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي الثَّلَاثِ لِتَعْيِينِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، وَكَذَا فِي  
الْأَرْجِ، إِلَّا أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ، وَالرُّخْصَةُ ثُبُوتُهَا بِالْحَاجَةِ وَكَوْنِ  
الْجَهَالَةِ غَيْرِ مُفْضِيَةٍ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، فَلَا تَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قِيلَ يَشْتَرِطُ أَنْ  
يَكُونَ فِي هَذَا الْعَقْدِ خِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ التَّعْيِينِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ  
الصَّغِيرِ، وَقِيلَ : لَا يَشْتَرِطُ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى  
هَذَا الْإِعْتِبَارِ وَفَاقًا لَا شَرْطًا، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لِأَبَدٍ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ  
التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ، وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أُيْتُهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا، ثُمَّ ذُكِرَ فِي بَعْضِ  
النُّسخِ اشْتَرَاؤُ تَوْيْنَيْنِ، وَفِي بَعْضِهَا اشْتَرَاؤُ أَحَدِ التَّوَيْنَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ  
الْمَبِيعَ فِي الْحَقِيقَةِ أَحَدُهُمَا، وَالْآخَرُ أَمَانَةٌ، وَالْأَوَّلُ تَجَوُّزٌ وَاسْتِعَارَةٌ.

অনুবাদ : তবে তাতে উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন তিন মানের কাপড় থাকতে প্রয়োজন তিনটি কাপড়ের দ্বারা ই মিতে যায়। আর খেয়ারগ্রাণ্ড ব্যক্তির নির্দিষ্টকরণের কারণে তিনটি কাপড়ে [-র মাঝে বিক্রয় পণ্য কোনটি এ] অজ্ঞতা ঋগড়ার দিকে ধাবিত করে না। একপূর্ণভাবে চার কাপড়েও [ঋগড়ার দিকে ধাবিত করে না।] তবে চার কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান নেই। অথচ প্রয়োজনের কারণে এবং অজ্ঞতা ঋগড়ার দিকে ধাবিত না করার কারণেই [এ ধরনের বিক্রয়ের] অনুমতি সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দু'টির একটি দ্বারা অনুমতি সাব্যস্ত হবে না। [দু'টোই বিদ্যমান থাকতে হবে।] কারো কারো মতে এ চুক্তিতে নির্দিষ্টকরণের খেয়ারের সাথে সাথে শর্তভিত্তিক খেয়ারের [-এর উল্লেখ] থাকাও শর্ত। জামে সগীরে এটাই উল্লিখিত হয়েছে। আর কারো কারো মতে শর্ত নয়। এটা জামে কাবীরে উল্লিখিত হয়েছে। এ হিসেবে [অর্থাৎ জামে কাবীরের উল্লেখ অনুযায়ী] শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ শর্তরূপে নয়, বরং ঘটনাক্রমে। যখন শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ থাকবে না তখন ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে নির্দিষ্টকরণের খেয়ার তিনদিন ধার্য করা জরুরি। সাহেবাইন (র.)-এর মতে নির্দিষ্ট মেয়াদ ধার্য করা জরুরি; তা যাই হোক না কেন। [জামে সগীরের] কোনো কোনো নুসখায় “দু’টি কাপড় ক্রয় করল” এর উল্লেখ আছে। আর কোনো কোনো নুসখায় “দু’টির একটি ক্রয় করল” এর উল্লেখ আছে। আর এটাই বিসদ্ব। কারণ, বিক্রয়পণ্য মূলত দু’টির একটি, অপরটি [ক্রেতার হাতে] আমানত। প্রথমোক্ত নুসখার ইবারত রূপক ও ইঙ্গিতার্থক হবে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْحَاجَّةَ تَنْدُبِعُ بِالثَّلَاثِ الْخ: স্বেযাৰে তাঈন তিন কাপড়ে বৈধ, কিন্তু চাৰ কাপড়ে বৈধ নয়। বরং সে ক্ষেত্রে বিক্ৰয় ফাসিদ। তিন কাপড়ে বৈধ হওয়ার কারণ দুটি। এক, প্রয়োজন। দুই, বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও ঋণাড়ার কারণ না হওয়া। কিন্তু চাৰ কাপড়ে এ উভয় কারণ পাওয়া যায় না। শুধু দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়। প্রথমটি পাওয়া যায় না। কারণ, বিক্রয়পণ্য সাধারণত তিন ধরনের হয়। উন্নত মানের, মধ্যম মানের ও নিম্ন মানের। তিন মানের তিনটি কাপড় হলেই ক্রেতা কান্টিফত পণ্যটি পছন্দ করতে পারেন। কাপড় চাৰটি হলে একই মানের দু'টো হয়ে যাবে। তাই তিনটি কাপড়ে যে প্রয়োজন আছে তা চাৰটিতে নেই। মোটকথা, বৈধতার জন্য যে দুটি কারণ থাকা দরকার তার একটি না থাকায় চাৰ কাপড়ের মাঝে স্বেযাৰে তাঈনের ভিত্তিতে বিক্ৰয় ফাসিদ।

বিক্রয়চুক্তিতে খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ করা শর্ত কিনা? জামে সগীরের যে ইবারত সাহিবে হিদায়া উদ্ধৃত করেছেন তাতে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ আছে। কিন্তু জামে কাবীরের ইবারতে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দু' কিতাবে দু' ধরনের বর্ণনা থাকায় মশায়ের মাঝে এ বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এক জামাতের মতে খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ শর্ত। ইমাম কারখী (র.)-এর সমর্থন এদিকে। ইমাম শামসুল আইহা সারাখসী (র.) এ মতকে বিতর্ক বলেছেন। আরেক জামাতের মতে শর্ত নয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুখী ও মুহাম্মদ ইবনে শুজা বলখী (র.)-এর মতে এ মত বিতর্ক। যারা বলেন, শর্ত নয় তাদের মতে জামে সগীরের ইবারতে ঘটনাক্রমে শর্তভিত্তিক খেয়ারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। চুক্তিতে উল্লেখ করা শর্ত এ হিসেবে উল্লিখিত হয়নি। [বিনায়া, প্রাক্তক, পৃ. ১০৯]

قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خَيْرَ الشَّرْطِ لَبَّدَ الْخَ : সাহিবে হিদায়া বলেন, যদি বিক্রম চুক্তিতে খেয়ারে তাঈনের সঙ্গে খেয়ারে শর্তের উল্লেখ করা না হয় তাহলে খেয়ারে তাঈনের মেয়াদ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে খেয়ারে শর্তের মতো সর্বোচ্চ তিনদিন, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে চুক্তিকারী দু'জনের সম্মতিতে যতদিন ধার্য হয় ততদিন।

اِشْتَرَى سَاهِبِهِ هِدَايَا بَلَعَنَ، جَامِعَ سَهْلِيَّةٍ كَوْنَهُ كَوْنَهُ نُسْخَايَ اِشْتَرَى تَوْبِيْنَ الْخِ  
اِشْتَرَى اَحَدَ التَّوْبِيْنَ وَهِيَ اَعْلَى اَحَدَ التَّوْبِيْنَ اِشْتَرَى اَحَدَ التَّوْبِيْنَ اِشْتَرَى اَحَدَ التَّوْبِيْنَ  
এটিই বিতণ্ড। কারণ اِشْتَرَى تَوْبِيْنَ -এর অর্থ হলো, ক্রেতা দু'টি কাপড় ক্রয় করেছে। আর اِشْتَرَى اَحَدَ التَّوْبِيْنَ -এর  
অর্থ হলো, ক্রেতা দু'টি কাপড়ের একটি ক্রয় করেছে। আর উপরোক্ত মাসআলা এটিই যে, ক্রেতা যদি দুই কাপড়ের একটি  
ক্রয় করে...। একটি কাপড় বিক্রয়পণ্য, অন্যটি তার হাতে আমনত। অতএব বলা যায় اِشْتَرَى تَوْبِيْنَ রূপক (مَجَاز) অর্থে  
এবং ইস্তিআরা (اِشْتِعَارًا) হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ 'সম্পূর্ণতা' বলে "অংশ বিশেষ" বুঝানো হয়েছে।



وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّبَ لَرِمَ الْبَيْعُ فِيهِ بِمَنْبِهِ، وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ لِإِمْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالتَّعْيِيبِ، وَلَوْ هَلَكَ جَمِيعًا مَعَ يَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشُرْطِ الْبَيْعِ وَالْأَمَانَةِ فِيهِمَا، وَلَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا، وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا، لِأَنَّ الْبَاقِيَ خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْإِخْتِلَافِ، وَلِهَذَا لَا يَتَوَثَّقُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ، فَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُوَرِّثُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

অনুবাদ : যদি দুই কাপড়ের একটি বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা দোষযুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাতে তার মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ, দোষযুক্ত হওয়াতে তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব। আর অপরটি আমানত হিসাবে নির্ধারিত হবে। আর যদি দু'টোই এক সাথে বিনষ্ট হয় তাহলে প্রতিটির অর্ধেক মূল্য তার উপর আবশ্যক হবে। কেননা, বিক্রয়চুক্তি ও আমানত দু'টোতেই ব্যাপ্ত রয়েছে। যদি বিক্রয়চুক্তিতে খেয়ারে শর্তও থাকে তাহলে তার জন্য উভয়টি ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে। যদি খেয়ারের শর্তারোপকারী মৃত্যুবরণ করে তাহলে উত্তরাধিকারীদের একটি ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ, মালিকানা সংমিশ্রণের কারণে শুধু খেয়ারে তা'ঈন অবশিষ্ট আছে। এ কারণেই উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে কোনো সময় নির্ধারণ নেই। আর খেয়ারে শর্তের ব্যাপার হলো, তাতে মিরাস জারি হয় না; আমরা পূর্বে তা উল্লেখ করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খেয়ারে তা'ঈনের ভিত্তিতে নেওয়া দু'টি/ তিনটি কাপড়ের যে কোনো একটি বিক্রয় পণ্য হয়। অবশিষ্ট একটি বা দুটি ক্রেতার হাতে আমানত থাকে। কেউ যদি দু'টি কাপড় নেয় এবং ক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় একটি বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা এমন দোষগ্রস্ত হয় যে, তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যায় না তাহলে বিনষ্ট বা দোষগ্রস্ত কাপড়টিতে তার মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে যাবে এবং অপরটি আমানতের বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ, দোষগ্রস্ত হওয়ার কারণে যখন ফেরত দেওয়া যায় না তখন খেয়ার বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আর যদি উভয়টি একসাথে বিনষ্ট বা দোষগ্রস্ত হয় তাহলে ক্রেতার উপর উভয়টির অর্ধেক মূল্য আবশ্যক হবে। কারণ, কোনটা আমানতের আর কোনটা বিক্রয়পণ্য তা নির্ধারিত না থাকায় প্রতিটির অর্ধেককে বিক্রয়পণ্য এবং অবশিষ্ট অর্ধেককে আমানতের পণ্য ধরা হবে। যেহেতু অর্ধেক বিক্রয়পণ্য তাই অর্ধেক মূল্য আবশ্যক হবে। আর অর্ধেক আমানতের পণ্য বিধায় তার জন্য জরিমানা আসবে না। কারণ, আমানতের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো لَا تَضْمَنُ الْأَمَانَاتُ আমানতের মাল বিনষ্ট হলে জরিমানা আরোপিত হয় না।

যদি দু'টি কাপড় একসাথে বিনষ্ট না হয়ে আগে পরে হয়, তাহলে যেটা প্রথমে বিনষ্ট হবে তা বিক্রয় পণ্য সাব্যস্ত হবে এবং তার মূল্য ক্রেতার উপর আবশ্যক হবে আর যেটা পরে বিনষ্ট হবে তা আমানতের বলে সাব্যস্ত হবে এবং তার জন্য ক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُ أَنْ يَرُدَّ: যদি চুক্তিতে খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে খেয়ারে শর্ত থাকে তাহলে ক্রেতার জন্য উভয় কাপড়টি ফেরত দেওয়া হবে। কারণ, একটি কাপড় তার কাছে আমানত। তা বিক্রেতাকে আমানতের মাল হিসেবে ফেরত দিবে। আর অপরটি খেয়ারের ভিত্তিতে পণ্য। খেয়ারের ভিত্তিতে তা ফেরত দিবে।

قَوْلُهُ وَكَوْنُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِلْوَارِثِهِ: যদি খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে খেয়ারে শর্তের উল্লেখ করা হয় আর ক্রেতা তিন দিনের ভিতরে মৃত্যুবরণ করে তাহলে খেয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং একটিতে বিক্রয় অনিবার্য হয়ে যাবে। উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির খেয়ারের ভিত্তিতে ঐ বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। কারণ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, খেয়ারে শর্তের মাঝে উত্তরাধিকার জারি হয় না। একপভাবে মৃত ব্যক্তির খেয়ার তা'ঈন বা নির্দিষ্টকরণের ইচ্ছায়ও উত্তরাধিকার জারি হয় না। আর এ জন্যই উত্তরাধিকারীদের জন্য খেয়ারে তা'ঈনের কোনো সময়সীমা নেই। অথচ মৃত ব্যক্তির জন্য খেয়ারে তা'ঈনের সময়সীমা আছে। তবে উত্তরাধিকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে খেয়ারে তা'ঈন পাবে। কারণ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হিসেবে তারা একটি পণ্যের মালিক হয়েছে। কিন্তু তাদের মালিকানাধীন পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানাধীন পণ্যের সাথে মিশে আছে। তাই তারা দু'টি/ তিনটির একটিকে নির্দিষ্ট করবে। আর অপরটি আমানতের মাল হিসেবে বিক্রেতাকে ফেরত দিবে।

وَمِنْ أَشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، فَبِعَتْ دَارَ أُخْرَى إِلَى جَنْبِهَا، فَأَخَذَهَا  
بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ رِضًا، لِأَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِهِ الْمِلْكَ فِيهَا، لِأَنَّهُ مَا تَمَثَّلَتْ  
إِلَّا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجَوَارِ وَذَلِكَ بِالِاسْتِدَامَةِ فَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطَ الْخِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ،  
فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجَوَارَ كَانَ نَائِبًا، وَهَذَا التَّفْرِيرُ  
يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) خَاصَّةً.

অনুবাদ : কেউ যদি তার খেয়ারের শর্তে কোনো বাড়ি ক্রয় করে, এরপর তার পার্শ্ববর্তী আরেকটি বাড়ি বিক্রি হয় আর সে শোফা-এর অধিকার বলে তা গ্রহণ করে তাহলে এটা [বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে তার] সম্মতি [বলে গণ্য হবে]। কারণ, শুফ'আ দাবি করাটা প্রমাণ করে যে, খেয়ারের শর্তে ক্রয়কৃত বাড়িতে সে মালিকানা অনুমোদন করেছে। কেননা, প্রতিবেশীর ক্ষতি রোধ করার জন্যই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর ক্ষতি রোধ হয় স্থায়ীভাবে মালিকানা গ্রহণ করার দ্বারা। সুতরাং শুফ'আ দাবি করা দাবির পূর্বেই খেয়ার রহিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তাই ক্রয়ের সময় থেকে [খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত বাড়িতে] মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর এতেই প্রমাণিত হবে যে, প্রতিবেশী পূর্ব থেকে ছিল। এ ব্যাখ্যা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাবানুসারে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে একটি বাড়ি ক্রয় করার পর দেখল, পার্শ্ববর্তী বাড়িটি বিক্রি হয়েছে। সে তাতে শোফা দাবি করল এবং সে অনুযায়ী ঐ বাড়িটি কিনে নিল। শুফ'আর ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী বাড়ি ক্রয় করায় খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত বাড়িটির বিক্রয়চুক্তিতে সে সম্মত আছে বলে গণ্য হবে। তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়বে।

উল্লেখ্য যে, শুফ'আ প্রতিবেশীর জমিতে প্রতিবেশীর একটি স্বীকৃত অধিকার। এর স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তির এক খণ্ড জমি/একটি বাড়ি আছে। তার জমি/বাড়ির চারপাশে যে সকল জমি/বাড়ি আছে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে তার কোনোটি দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী জমি/বাড়িটি একই মূল্যে সে ক্রয় করতে পারে এবং এ বিষয়ে বিক্রিত জমি/বাড়ির মালিকের বা তৃতীয় ব্যক্তির কিছু বলার থাকবে না। শরিয়ত কর্তৃক প্রদত্ত এ অধিকারকে শুফ'আ বলে। এ অধিকার লাভের জন্য বিক্রিত জমি/বাড়ির পার্শ্ববর্তী জমি/বাড়ির মালিক হওয়া শর্ত। পার্শ্ববর্তী জমির মালিক অন্য কেউ হলে তার পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষতি রোধ করার জন্যই শরিয়ত শুফ'আর বিধান দিয়েছে।

যেহেতু শুফ'আ দাবির জন্য বাড়ি/জমির মালিক হওয়া শর্ত আর খেয়ারে শর্তের বর্তমানে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না, তাই আলেচা মাসআলায় ক্রেতা পার্শ্ববর্তী বাড়িটি বিক্রি হয়েছে দেখে যখন তাতে শুফ'আ দাবি করল, তখন তার এ দাবি এটা প্রমাণ করে, প্রথমে খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত জমিটিতে সে তার খেয়ার বাতিল করেছে, এরপর শোফা দাবি করেছে। যেন খেয়ার ছাড়াই সে বাড়িটি কিনেছিল এবং সেই সূত্রে শুফ'আ দাবি করার আগে থেকেই সে ক্রয়সূত্রে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর গৃহীত মূলনীতির কারণে উপরোক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কারণ, তার মতে ক্রেতার খেয়ারের সূরতে বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করার আগে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না। আর শুফ'আ দাবির জন্য পার্শ্ববর্তী জমি/বাড়ির মালিক হওয়া শর্ত। তাই খেয়ার বাকি থাকা অপছন্দ্য শুফ'আ দাবি করা যায় না। কিন্তু সাহেবাবীন (র.)-এর মতে যেহেতু ক্রেতার খেয়ারের সূরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় তাই তাদের মতে খেয়ার বাকি থাকা সত্ত্বেও শুফ'আ দাবি করা এবং সেই দাবির প্রেক্ষিতে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক হওয়া যায়।

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ غُلَامًا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَرُدَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، وَقَالَ : أَنْ يَرُدَّهُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ، لَهُمَا أَنْ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا إِثْبَاتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ، وَلَهُ أَنْ الْمَبِيعَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعْيِبٍ بِعَيْبِ الشَّرَكَةِ، فَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمَا رَدَّهُ مَعْيِبًا بِهِ وَفِيهِ الزَّامُ ضَرَرٌ زَائِدٌ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا الرِّضَا بِرَدِّ أَحَدِهِمَا، لِتَصَوُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرَّدِّ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি দুই ব্যক্তি এ শর্তে একটি গোলাম ক্রয় করে যে, তাদের উভয়ের খেয়ার থাকবে, অতঃপর একজন [বিক্রয় চুক্তিতে] সম্মত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে অপরজনের তা ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই। সাহেবাইন (র.) বলেন, অপরজনের তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। একই ধরনের মতপার্থক্য দোষজনিত খেয়ার ও দর্শন ভিত্তিক খেয়ারের ক্ষেত্রেও। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, দু'জনের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করার অর্থ দু'জনের প্রত্যেকের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করা। সুতরাং তার সঙ্গী খেয়ার রহিত করার কারণে তার খেয়ার রহিত হবে না। কারণ, তাতে অন্যের অধিকার বাতিল করা হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয় পণ্য অংশীদারিত্বের দোষমুক্ত অবস্থায় বের হয়েছে। যদি দু'জনের একজন [খেয়ারের অধিকার বলে] বিক্রয় পণ্য ফেরত দেয় তাহলে তা অংশীদারিত্বের দোষে দোষগ্রস্ত করে ফেরত দিবে। আর এতে "অতিরিক্ত ক্ষতি" আরোপ করা হয়। দু'জনের জন্য খেয়ার সাব্যস্তকরণ এটা আবশ্যক করে না যে, [বিক্রেতা] তাদের একজনের ফেরত দানে সম্মত। কারণ, ফেরত দানে দু'জনের একমত হওয়া সম্ভব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রণীত জামে সগীরে আছে, যদি দুই ব্যক্তি মিলে একটি গোলাম এ শর্তে ক্রয় করে যে, উভয়ের খেয়ার থাকবে, এরপর দু'জনের একজন গোলামটি ক্রয়ে সম্মত হয় এবং খেয়ার রহিত করে উদাহরণত সে বলল, আমি খেয়ার ছাড়াই ক্রয় করলাম, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে অপরজন খেয়ার বলে গোলামটিকে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, অপরজন ফেরত দিতে পারবে।

সাহিবে হিদায়া বলেন, এ ধরনের মতপার্থক্য খেয়ারে আইব (خِيَارُ الْعَيْبِ) ও খেয়ারে রুমতের (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ দু'ব্যক্তি মিলে যদি একটি দ্রব্য ক্রয় করে এবং দ্রব্যটি কজা করার পর তাতে দোষ পায় তাহলে পণ্যটি রাখা/না রাখার ব্যাপারে তারা দু'জন খেয়ার পায়। দু'জনের একজন যদি দোষসহ পণ্যটি রাখতে সম্মত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা

(র.)-এর মতে অপরজন খেয়ারের বলে পণ্যটি দিতে পারবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতে অপরজন ফেরত দিতে পারবে। একপাশে দু'জন মিলে একটি পণ্য ক্রয় করল। কিন্তু কেনার সময় বা কজা করার সময় তারা পণ্যটি দেখল না। তাহলে দেখার পর দু'জন পণ্যটি রাখা/না রাখার খেয়ার পায়। এরপর যদি একজন পণ্যটি রাখতে সম্মত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে অপরজন তা ফেরত দিতে পারবে না।

قَوْلُهُ لَهَا إِنِّي أَتَيْتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا الْغ

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রয় চুক্তিতে দু'জনের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করার অর্থ হলো দু'জনের প্রত্যেকের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করা। আর যে খেয়ার দু'জনের প্রত্যেকের জন্য সাব্যস্ত হয় তাকে যদি একজন রহিত করে দেয় তাহলে অপরজনের খেয়ার রহিত হয় না। কারণ, এতে অপরজনের অধিকার বাতিল করা আবশ্যিক হয়। আর অপরের অধিকার বাতিল করা জায়েজ নেই। তাই একজনের খেয়ার রহিত করার দ্বারা অপরজনের খেয়ার রহিত হবে না। সে খেয়ার বলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : সাহিবে হিদায়া বলেন, ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয় পণ্য অংশীদারিত্বের দোষমুক্ত অবস্থায় বের হয়। খেয়ার রহিত করে একজন বিক্রয়ে সম্মত হওয়ার পর যদি খেয়ার বলে অপরজন বিক্রয় পণ্য বিক্রেতাকে ফেরত দেয় তাহলে পণ্যটিতে বিক্রেতা ও খেয়ার রহিতকারী ক্রেতা সমানভাবে অংশীদার হবে। আর দ্ব্যে অংশীদারিত্ব একটি দোষ। তাই বিক্রেতার এতে অতিরিক্ত ক্ষতি হবে। আর কারো ক্ষতি করা জায়েজ নেই। তাই দু'জনের একজন বিক্রয়ে সম্মত হলে অপরজন খেয়ার বলে তা ফেরত দিতে পারবে না।

সাহিবে হিদায়া বিক্রেতার বেশি ক্ষতি হবে বলেছেন। কারণ যে বিক্রয়ে সম্মত নয় তার যদি বিক্রয় পণ্য ফেরত দেওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে তারও ক্ষতি হবে। বাধ্য হয়ে তাকে নিতে হচ্ছে। এর জন্য তাকে কতগুলো পয়সা গুণতে হবে। কিন্তু তার ক্ষতিটা বিক্রেতার ক্ষতির তুলনায় কম। কারণ, বিক্রেতার ক্ষতি তার কারণে। আর তার ক্ষতি হচ্ছে নিজের কারণে। অন্যের কারণে ক্ষতি হলে মানুষের দুঃখ বেশি হয়। পক্ষান্তরে নিজের কারণে ক্ষতি হলে দুঃখ তুলনামূলক কম হয়।

—[বেনায়া, প্রাক্ত, পৃ. ১১২]

قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ إِنْشَاءِ الْخِيَارِ الْغ : সাহিবে হিদায়া সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেন, দু'জনকে খেয়ার দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, একজন ক্রয়ে সম্মত হলে এবং অপরজন ফেরত দিলে বিক্রেতা তাতে সন্তুষ্ট হবে। বরং ক্রেতা এই ভেবে দু'জনকে খেয়ার দিয়েছে যে, নিলে দু'জন একমত হয়ে নিবে, না নিলে দু'জন একমত হয়ে নিবে না। কারণ, নেওয়া/না নেওয়া দু'জনের একমত হওয়া সম্ভব। অতএব, একজন ক্রয়ে সম্মত হবে আর অপরজন ফেরত দিবে, এতে বিক্রেতা সন্তুষ্ট নয়। তাই একজন ক্রয়ে সম্মত হলে অপরজন ফেরত দিতে পারবে না।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ حَبَّارٌ أَوْ كَاتِبٌ، وَكَانَ يَخْلَافُهُ، فَلَمْ يَشْرِهِ بِالْخَبَارِ،  
إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، لِأَنَّ هَذَا وَصَفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيَسْتَحِقُّ  
فِي الْعَقْدِ بِالشَّرْطِ، ثُمَّ فَوَاتُهُ يُوْجِبُ التَّخْيِيرَ، لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِهِ دُونَهُ وَهَذَا يَرْجِعُ  
إِلَى اخْتِلَافِ التَّوَعُّلِ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِي الْأَغْرَاضِ، فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِعَدَمِهِ بِمَنْزِلَةِ  
وَصْفِ الذُّكُورَةِ وَالْإُنُوثَةِ فِي الْحَيَوَانَاتِ، وَصَارَ كَفَوَاتٍ وَصْفِ السَّلَامَةِ، وَإِذَا أَخَذَهُ  
أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ لِكُونِهَا تَابِعَةً فِي  
الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِفَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো দাস বিক্রি করে এ শর্তে যে, সে রুটি তৈরি করতে জানে কিংবা সে লিখতে জানে, অথচ দেখা গেল তার ব্যতিক্রম তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে সে দাসটিকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে ত্যাগ করবে। কারণ, এটি একটি আগ্রহজনক গুণ, তাই চুক্তিতে শর্ত করার দ্বারা ক্রেতা [তার] অধিকারী হবে। এরপর তার অবদ্যমানতা এখতিয়ার প্রদানকে আবশ্যক করবে। কারণ, ক্রেতা এটা ছাড়া ক্রয়ে সন্মত হয়নি। আর এ ভিন্নতা [গুণ ভিন্নতা] উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য স্বল্পতার কারণে শ্রেণীগত ভিন্নতার সমপর্যায়ভুক্ত, যেমন প্রাণীর ক্ষেত্রে নর ও মাদী হওয়ার গুণ। তাই তার অনুপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। আর এটা দোষমুক্ততা গুণের অনুপস্থিতির মতো হলো। তাই যখন ক্রেতা তা গ্রহণ করবে, পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে। কারণ, পূর্ব বর্ণিত নীতি অনুযায়ী যেহেতু গুণ চুক্তিতে অনুবর্তী বিষয় তাই গুণের বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ আসে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কোনো গোলাম এই শর্তে ক্রয় করে যে, গোলামটি রুটি তৈরি করতে জানে কিংবা লেখতে জানে কিন্তু ক্রয়ের পর দেখা গেল সে রুটিও তৈরি করতে জানে না, লিখতেও জানে না তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না, তবে ক্রেতা গোলামটি গ্রহণ করা/না করার ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যদি গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ না হওয়ার কারণ এই যে, যে গোলাম রুটি তৈরি করতে জানে আর যে জানে না এবং যে গোলাম লিখতে জানে, আর যে লিখতে জানে না- এ দু'জনের মাঝের ভিন্নতা হলো শ্রেণীগত ভিন্নতা (اِخْتِلَافُ التَّوَعُّلِ)। আর পণ্যের শ্রেণীগত ভিন্নতার কারণে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয় না। উদাহরণত এক ব্যক্তি কুরবানি করার উদ্দেশ্যে বাজার থেকে গাভী ক্রয় করল। কিন্তু বাড়িতে আনার পর দেখল তা ষাড়। এতে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয় না। যদি জাতিগত ভিন্নতা (اِخْتِلَافُ الْجِنْسِ) হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়। যেমন এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল কিন্তু পরে দেখল তা দাস। এতে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়।

ফিকহের পরিভাষায় জাতিগত ও শ্রেণীগত ভিন্নতা নির্বিত্ত হয় উদ্দেশ্য (أَغْرَاضُ)-এর বিচারে। দু'টি জিনিসের উদ্দেশ্যের মাঝে ভিন্নতা কম হলে ঐ দু'টি জিনিসকে একই শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। আর উদ্দেশ্যের ভিন্নতা বেশি হলে দুই জিনিসকে দুই জাতি গণ্য করা হয়। যেমন, মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারী দু'টি ভিন্ন জাতি। কারণ দু'টির উদ্দেশ্যের মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন আয়-উর্পাজন, নেতৃত্ব দান ও বাড়ির বাইরের কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যে, আর নারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন সন্তান প্রজনন ও পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পতন মধ্যে নর ও মাদী একজাতি, কিন্তু ভিন্ন শ্রেণী। কারণ গরু আর গাভীর উদ্দেশ্যের মাঝে ভিন্নতা সামান্যই। এগুলো সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের গোশতের চাহিদা পূরণ করা। অন্যান্য উদ্দেশ্যও থাকে। অন্যান্য উদ্দেশ্যের বিচারে এগুলোকে দুই শ্রেণী গণ্য করা হয়।

আলোচ্য মাসআলায় যে গোলাম রুটি তৈরি করতে জানে আর যে জানে না উভয়ের মাঝে ভিন্নতা হলো শ্রেণীগত ভিন্নতা। কারণ, গোলামের মাঝে সাধারণভাবে উদ্দেশ্য একটিই। তা হলো, খেদমত নেওয়া। আর এ উদ্দেশ্যে সব গোলামেই সমান। তবে কাজের যোগ্যতার ভিন্নতার কারণে দুই যোগ্যতার অধিকারীকে দুই শ্রেণী গণ্য করা হয়। আর শ্রেণীগত ভিন্নতার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয় না। তাই আলোচ্য বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না।

তবে ক্রেতা বিদ্যমান গোলামটি গ্রহণ করা/না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ, রুটি তৈরি করতে জানা এবং লিখতে পারা একটি আকর্ষণীয় গুণ (الْوَصْفُ الْمُرْغُوبُ فِيهِ)। ক্রেতা এ গুণের কারণেই গোলামটি ক্রয় করেছে এবং বিক্রয়চুক্তিতে এর শর্ত করেছে। আর বিক্রয় চুক্তিতে বস্তুর কোনো গুণের উল্লেখ শর্ত আকারে হলে ক্রেতা ঐ গুণসম্পন্ন বস্তুর অধিকারী হয়। ঐ গুণের অবিদ্যমানতায় ক্রেতা বিদ্যমান বস্তুটি গ্রহণ করা/না করার এখতিয়ার পায়। কারণ, ঐ গুণ ছাড়া বস্তু ক্রয়ে ক্রেতা সন্মত নয়।

রুটি তৈরি করতে জানা এবং লিখতে পারাটা বস্তুর দোষমুক্ত হওয়ার গুণের মতো। অর্থাৎ কেউ যদি দোষমুক্ত হওয়ার শর্তে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে, আর পরে দোষগ্রস্ত পায় তাহলে সে তা গ্রহণ করা/না করার এখতিয়ার পায়। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও রুটি তৈরি করতে না জানায় কিংবা লিখতে না পারায় ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। ইচ্ছা করলে সে গোলামটি গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে বাদ দিবে। তবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্যে দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, গুণ (وَصْفُ)-এর বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ হয় না। কারণ, গুণ পণ্যের অনুবর্তী (تَابِعُ) হওয়ায় উল্লেখ ছাড়াই তা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যা উল্লেখ ছাড়াই পণ্যের অনুবর্তী হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় তার বিপরীতে পৃথকভাবে মূল্য আসে না।

ফায়দা : যখীরা গ্রহণে আছে, যদি ক্রেতা তার এখতিয়ারের ভিত্তিতে গোলামটি ফেরত দিতে চায় কিন্তু কোনো কারণে ফেরত দিতে পারছে না তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। অর্থাৎ যে গোলাম রুটি তৈরি করতে জানে আর যে জানে না-এ দুয়ের মাঝে দামের যে ব্যবধান হয় ঐ পরিমাণ অর্থ ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ফেরত নিবে।

-বিনায়া, প্রাক্তন, পৃ. ১১৪।

ফায়দা : ক্রেতা রুটি তৈরি করতে জানে কিংবা লিখতে জানে-এ শর্তে গোলাম ক্রয় করার পর কজা করল। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমি তো গোলামটিকে রুটি বানাতে জানে কিংবা লিখতে পারে এরূপ পাইনি। বিক্রেতা বলল, আমি ঠিক মতোই তোমার কাছে অর্পণ করেছি; তোমার কাছে যেয়ে ভুলে গেছে ক্রেতা-বিক্রেতার কথায় যদি এ ধরনের একতেলাফ হয় তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মানুষের আসল হলো লেখতে না পারা এবং রুটি তৈরি করতে না জানা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, **وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْنِ أُمِّيَاتِكُمْ لَا** 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না।' **فَعَلِمُوا شَيْئًا**

-সূরা নাহল : ৭৮।

## بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِعَيْنِهِ  
الْثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح): لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَصْلًا، لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ  
مَجْهُوْلٌ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ، وَلَا يَنْبَغُ  
الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ لَا تَفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ يَرُدُّهُ، فَصَارَ  
كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمَعَانِي الْمَشَارِإِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيتُ ثُمَّ رَأَاهُ، لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ،  
لِأَنَّ الْخِيَارَ مُعْلَقٌ بِالرُّؤْيَةِ لِمَا رَوَيْنَا، فَلَا يَثْبُتُ قَبْلَهَا، وَحَقُّ الْفَسْخِ بِحُكْمِ أَنَّهُ  
عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، لَا يُمْفَقُ الْحَدِيثُ، وَلَئِنَّ الرِّضَاءَ بِالشَّيْءِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَوْصَافِهِ لَا  
يَتَحَقَّقُ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ رَضِيتُ، قَبْلَ الرُّؤْيَةِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: رَدَدْتُ.

### পরিচ্ছেদ : দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার

অনুবাদ : কেউ যদি না দেখে কোনো জিনিস ক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে, আর যখন সে ঐ জিনিস দেখবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে। যদি চায়, জিনিসটিকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, যদি চায় জিনিসটিকে ফেরত দিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোভাবেই বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না। কারণ, বিক্রয় পণ্য অজ্ঞাত। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী “কেউ যদি না দেখে কোনো জিনিস ক্রয় করে তাহলে যখন তা দেখবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে।” তাছাড়া না দেখার কারণে [সৃষ্ট] অজ্ঞাত ঝগড়ার দিকে ধাবিত করে না। কারণ, তার মনঃপূত না হলে ফেরত দিয়ে দিবে। সুতরাং এটা চোখে দেখা ও ইশারাকৃত পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত থাকার মতো হলো। এরপভাবে ক্রেতা যদি বলে, আমি সম্মত আছি, এরপর সে পণ্যটি দেখল, তাহলেও তার তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ, আমাদের বর্ণিত হাদীস অনুসারে এখতিয়ার দেখার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তা দেখার পূর্বে সাব্যস্ত হবে না। আর [দেখার পূর্বে] বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার এই হাদীসের প্রেক্ষিতে হিসেবে নয়, বরং এই হিসেবে যে, তা অবশ্য সাব্যস্ত চুক্তি নয়। তাছাড়া কোনো জিনিসের গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে ঐ জিনিসের প্রতি সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং দেখার পূর্বে ‘আমি সম্মত আছি’ ক্রেতার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ‘আমি [বিক্রয়চুক্তি] প্রত্যাখ্যান করলাম’ ক্রেতার এ উক্তি [এর ব্যাপার] ভিন্ন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خِيَارٌ অর্থ- এখতিয়ার, ইচ্ছাধিকার, স্বাধীনতা। الرُّؤْيَةُ অর্থ- দেখা, দর্শন। خِيَارٌ শব্দটি الرُّؤْيَةُ-এর দিকে ইয়াফত خِيَارٌ يَنْبَغُ بِالرُّؤْيَةِ-এর দিকে ইয়াফত خِيَارٌ يَنْبَغُ إِلَى سَبَبٍ বলা হয়। وَاصْفَاءُ الْعُكْمِ إِلَى سَبَبٍ হয়েচ্ছে। এরূপ ইয়াফত خِيَارٌ অর্থ হচ্ছে- দর্শনভিত্তিক ইচ্ছাধিকার।

মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয় করে। সাধারণভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের এটাই নিয়ম যে, মানুষ প্রথমে পণ্য দেখে, দরদাম করে, এরপর ক্রয় করে। কিন্তু অনেক সময় এর উল্টাও হয়। পরিস্থিতির কারণে এবং সময়ের অভাবে না দেখেই মানুষকে ক্রয় করতে হয়। আর আজকাল টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সব ক্রয়-বিক্রয় হয় তা শ্রায় সবই এ ধরনের। পণ্য

এক স্থানে, বিক্রতা আরেক স্থানে, আর ক্রেতা আরেক দেশে-প্রয়োজনের কারণেই মানুষকে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে হয়। মানুষের এ সব প্রয়োজনের কারণেই শরিয়ত দর্শনভিত্তিক ইখতিয়ারের বিধান দিয়েছেন। এর স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করল, কিন্তু পণ্যটি সে দেখেনি। পণ্যটি দূরে কোথাও আছে কিংবা নিকটেই আছে, কিন্তু দেখার মতো সমর্থ-সুযোগ নেই। এ সুরতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে ক্রেতা যখন পণ্যটি দেখবে তখন সে এখতিয়ার লাভ করবে। পছন্দ হলে পণ্যটি রাখবে, পছন্দ না হলে ফেরত দিবে। যদি রাখতে চায় তাহলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে রাখবে।

খেয়ারে রুম্যতের হুকুম হলো, **خَيْرُ الرُّزْقِ بَيْعُ تَمَّ الْحَكْمُ بَعْدَ تَرْكِهِ** ক্রেতার খেয়ারে রুম্যত থাকলে বিক্রয়চুক্তি সম্বন্ধিত হয়, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, কিন্তু পণ্য দেখার আগে তার পূর্ণ সম্মতি পাওয়া যায় না বিধায় তা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন ফারগানী (র.) খেয়ারে রুম্যত-এর আলোচনাকে খেয়ারে আইবের পূর্বে এনেছেন। কারণ, খেয়ারে রুম্যত খেয়ারে আইবের তুলনায় বেশি শক্তিশালী (**أَقْوَى**)। খেয়ারে রুম্যতের সুরতে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু খেয়ারে আইবের সুরতে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়; অবশ্য বিক্রয় চুক্তির হুকুম তথা বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতার মালিকানা অনিবার্য হয় না। আর যা বিক্রয় চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ হতে দেয় না, তা নিশ্চয়ই যা পূর্ণাঙ্গ হতে দেয় তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। বেশি শক্তিশালী বিধায় খেয়ারে আইবের আগে রুম্যত-এর আলোচনা করেছেন। [ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত, প. ৩০৯]

কেউ যদি না দেখে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে আমাদের মাযহাবানুসারে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে, আর যখন সে ঐ জিনিস দেখবে তখন সে রাখা বা না রাখার এখতিয়ার লাভ করবে। যদি চায়, জিনিসটিকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, অথবা জিনিসটিকে ফেরত দিবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) থেকেও এরূপ মতামত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী বহু ফুকাহায়ে কেরাম ও এ মত গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত] এটাই হযরত উসমান ও তালহা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোভাবেই বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল :

নকলী দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতামতের পক্ষে দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত দু'টি হাদীস পেশ করা হয়।

১. **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفَرَرِ** (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। না দেখে পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, তাই এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞা অনুসারে তা নিষিদ্ধ হবে। [মুসলিম শরীফ, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়]

২. **قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ** (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন- যে দ্রব্য তোমার কাছে নেই তা বিক্রি কর না। এ

হাদীসে পক্ষান্তরে অনুপস্থিত দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। না দেখে পণ্য ক্রয় করার সুরতে পণ্য অনুপস্থিত থাকে। তাই তার বিক্রয় নাজায়েজ হবে। [সুনানে আরবা'আ, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়]

আকলী দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, না দেখে ক্রয়ের সুরতে পণ্য ক্রেতার কাছে অজ্ঞাত থাকে। আর ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য ও বিক্রয় মূল্যের কোনো একটি অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। অতএব না দেখে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- **إِذَا رَأَاهُ** “কেউ যদি না দেখে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে তা দেখার পর সে রাখা বা না রাখার এখতিয়ার পাবে।” এ হাদীসটি দারাকুতনীতে মুত্তাসিল সনদে এবং বাযহাকী ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতের মুরসাল সনদে একাধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, না দেখে পণ্য ক্রয় করা হলে তা জায়েজ হবে এবং ক্রেতা দেখার পর পণ্যটি রাখা/না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার লাভ করবে।

নাওয়াদিকুল ফুকাহা গ্রন্থে আছে, যে অনুপস্থিত দ্রব্য অর্পণযোগ্য, তা না দেখে বিক্রি করা জায়েজ এবং দেখার পর ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করবে এ বিষয়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমত। একবার হযরত তালহা (রা.) হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বসরার একটি জমি মদীনায় বসে ক্রয় করেন। হযরত ভূবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে হযরত তালহার পক্ষে খেয়ারে রুম্যতের সিদ্ধান্ত দেন। [তহাবী ও বাযহাকী শরীফ]



হানাহী ফুকাহায়ে কেরাম ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাবে বলেন, প্রথম হাদীসটি মূলত যে সব পণদ্রব্য অর্পণযোগ্য নয়, যেমন উভতপাখি, নদী বা ডোবার যে মাছ শিকার করা হয়নি ইত্যাদি বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। কারণ, বিক্রীতপণ্য নির্ধারিত এবং অর্পণযোগ্য না হলে তবেই তা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু আমরা যে পণ্য না দেখে ক্রয় করা জায়েজ বলাছি তা অবশ্যই নির্ধারিত ও অর্পণযোগ্য। কারণ, নির্ধারিত বা অর্পণযোগ্য না হলে আমরাও এরূপ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ বলি না।

আর দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসে অনুপস্থিত দ্রব্য বলে মূলত মালিকানাভুক্ত নয় এমন পণ্যের কথা বলা হয়েছে। মূল হাদীসটি অনেক দীর্ঘ। নাসায়ী শরীফে হাদীসটি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرْلَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مَنِ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عَنْهُ أَيْبَعُهُ مِنْهُ ثُمَّ ابْتِاعَ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে যে পণ্য আমার কাছে নেই তা বিক্রি করার আবেদন জানায়। আমি কি তার কাছে সেই পণ্য বিক্রি করব এবং এরপর বাজার থেকে সেই পণ্য ক্রয় [করে তার কাছে অর্পণ] করব? তিনি বললেন, যে পণ্য তোমার কাছে নেই তা বিক্রি কর না। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হজুর ﷺ মালিকানাভুক্ত নয় এমন দ্রব্যকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর মালিকানাভুক্ত নয় এমন পণ্য বিক্রি করা নাজায়েজ এ ব্যাপারে আমরাও একমত।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ الْجِهَالَةَ يَعْنِي الرُّؤْيَا لَا تَفْضِي الْخ: ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর আকলী দলিলের জবাবে সাহিবে হিদায়া বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় দুরন্ত নয় - এটা ঐ অজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, যা ঝগড়ার কারণ হয়। কিন্তু যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না তা বিক্রয় বৈধ হওয়ার পথে বাধা নয়। না দেখে ক্রয়ের সুরতে বিক্রয়পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সৃষ্ট অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না। কারণ, ক্রেতার মনঃপূত না হলে পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার তো সে পাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিক্রেতার উচ্চবাচ্চ্য করার অবকাশ নেই। সুতরাং ঝগড়ারও কিছু নেই।

قَوْلُهُ كَيْهَالَةَ الْوَضْبِ نَبِي الْمُعَايِنِ الْخ: সাহিবে হিদায়া বলেন, না দেখে কেনার সুরতে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সৃষ্ট অজ্ঞতা চোখে দেখা ও ইশারাকৃত পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত থাকার মতো। বিক্রেতা ক্রেতাকে হাত ইশারায় একটি খাদ্যশস্যের স্তুপ দেখিয়ে বলল, আমি এ স্তুপটি তোমার কাছে একশ' টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এ সুরতে স্তুপে কি পরিমাণ শস্য আছে এবং সেগুলো কোন মানের তা জানা না থাকলেও বিক্রয় জায়েজ হয়। কারণ পরিমাণ ও গুণাগুণের এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না। না দেখে ক্রয় করার সুরতে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অজ্ঞতাও যেহেতু ঝগড়ার কারণ নয় তাই তাও জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ رَيْبُ الْخ: হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কেউ যদি না দেখে পণ্য ক্রয় করার পর বলে, পণ্য যেরূপ হোক আমি সম্মত আছি, এতে তার খেয়ার রুয়ত বাতিল হবে না। এরপর যখন সে পণ্য দেখবে তখন সে এখতিয়ার পাবে। কারণ, উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী খেয়ার দেখার সাথে সম্পৃক্ত। যখন দেখবে তখন খেয়ার সাব্যস্ত হবে। দেখার পূর্বে যেহেতু খেয়ার সাব্যস্ত হয় না তাই যা সাব্যস্ত হয়নি তা বাতিল হবে কিরূপে? তাই দেখার আগে খেয়ার বাতিল করলেও বাতিল হবে না।

তাহাড়া কোনো জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার আগে ঐ জিনিসের প্রতি সে পুরোপুরি সম্মত আছে এটা বুঝা যায় না। সুতরাং দেখার মাধ্যমে পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার আগে আমি সম্মত আছি - এ কথা বলা গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ وَيُخْلَبُ قَوْلُهُ رَدَّدْتُ الْخ: কিন্তু দেখার আগে যদি ক্রেতা বলে যে, আমি বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলাম, তাহলে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, না দেখে পণ্য ক্রয় করার সুরতে দেখার আগে যদি ক্রেতার এখতিয়ার সাব্যস্ত না হয় তাহলে দেখার আগে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার এখতিয়ার পাচ্ছে কোথেকে? সাহিবে হিদায়া এর জবাবে বলেন, দেখার আগে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার এখতিয়ার আর দেখার পর বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেয়ার এখতিয়ার দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। দেখার পর ক্রেতা বিক্রয়চুক্তি স্থির রাখার কিংবা বাতিল করার যে খেয়ার পায়, তা পায় اِنْ شَرَيْتُ مِنْهُ لَمْ يَرْهُ هাদীসের প্রেক্ষিতে। আর দেখার আগে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার এখতিয়ার পায় বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য না হওয়ার কারণে। কারণ, খেয়ারে রুয়তের সুরতে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয় না। আর যে চুক্তি অনিবার্য হয় না তা যখন তখন ভাঙ্গা যায়।



قَالَ : وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ (رح) يَقُولُ أَوَّلًا : لِمَا الْخِيَارُ  
إِعْتِبَارًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَهَذَا لِأَنَّ لَزُومَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَاءِ زَوَالًا  
وُثُوبًا، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمُسْتَعِ، وَذَلِكَ بِالرُّؤْيَةِ، فَلَمْ يَكُنِ  
الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ، وَوَجَّهَ الْقَوْلُ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّرَاءِ لِمَا رَوَيْنَا، فَلَا  
يَنْبُتُ دُونَهُ، وَرَوَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَ أَرْضًا بِالْبَصْرَةِ مِنْ طَلْحَةَ  
بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقِيلَ لَطَلْحَةَ : إِنَّكَ قَدْ غَشِيتَ، فَقَالَ : لِي الْخِيَارُ،  
لَأَتَى اشْتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ، وَقِيلَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّكَ قَدْ غَشِيتَ، فَقَالَ : لِي  
الْخِيَارُ، لَأَتَى بَعْتُ مَا لَمْ أَرَهُ، فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،  
فَقَضَى بِالْخِيَارِ لَطَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো দ্রব্য বিক্রি করে যা সে দেখেনি তাহলে [দেখার পর] তার কোনো খেয়ার নেই। ইমাম আবু হানীফা (র.) দোষজনিত খেয়ার ও শর্তভিত্তিক খেয়ারের সাথে তুলনা করে প্রথম দিকে বলতেন যে, তার [বিক্রেতার] খেয়ার রয়েছে। আর এটা এ জন্য যে, চুক্তির অনিবার্যতা [বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রীত-পণ্যের] স্বত্ব ত্যাগ ও [ক্রেতার] স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কিত পূর্ণ সম্মতির উপর নির্ভরশীল। আর পূর্ণ সম্মতি পণ্যের সম্পর্কে অবগতি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর অবগতি হয় দেখার দ্বারা। সুতরাং [না দেখে বিক্রি করার সুরতে] বিক্রোতা পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে পূর্ণ সম্মত নয়। [তাই দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে।] আর প্রত্যাবর্তিত মতের দলিল হলো, আমাদের বর্ণিত রিওয়াযাত অনুসারে দর্শনভিত্তিক খেয়ার ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ক্রয় ছাড়া অন্য সুরতে তা সাব্যস্ত হবে না। তা ছাড়া বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (র.) বসরার একটি জমি [মদীনায় থেকে] হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (র.)-এর কাছে বিক্রি করেছিলেন। পরে হযরত তালহাকে বলা হলো, আপনি ঠকে গেছেন। তিনি বললেন, আমার [জমিটি রাখা/ না রাখার] এখতিয়ার আছে। কারণ, আমি না দেখা জিনিস ক্রয় করেছি। হযরত উসমান (রা.)-কেও বলা হলো যে, আপনি ঠকে গেছেন। তিনি বললেন, আমার [জমিটি ফেরত নেওয়ার] এখতিয়ার আছে। কারণ, আমি না দেখা জিনিস বিক্রি করেছি। অতঃপর দু'জন তাদের মাঝে [ফয়সালার জন্য] হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-কে বিচারক বানালেন। তখন তিনি হযরত তালহা (রা.)-এর এখতিয়ারের রায় দিলেন। আর এটা ছিল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপস্থিতিতে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ক্রেতার খেয়ারে রুম্যত [দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার] রয়েছে অর্থাৎ কেউ যদি না দেখা কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে দেখার পর সে ঐ দ্রব্য রাখা/ না রাখার এখতিয়ার পাবে। আলোচ্য ইবারতের মাসআলা হলো, বিক্রেতার খেয়ারে রুম্যত (جِيارُ الرُّمَى) আছে কিনা? অর্থাৎ কেউ যদি না দেখা কোনো দ্রব্য বিক্রি করে, যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিক হলো এবং তা না দেখেই কারো কাছে বিক্রি করে দিল, তাহলে দেখার পর বিক্রয় চুক্তিকে বহাল রাখা কিংবা ঐ জমিটি ফেরত নিয়ে চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার তার এখতিয়ার রয়েছে কিনা? ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, বিক্রেতার খেয়ারে রুম্যত নেই। না দেখা দ্রব্যটিতে বিক্রেতার দিক থেকে বিক্রয় অনিবার্য হয়ে যায়। ইমাম চতুঠয়ের এটাই অভিমত। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) প্রথম দিকে বলতেন যে, বিক্রেতার খেয়ারে রুম্যত আছে। তবে পরবর্তীতে তিনি তার এ মত পরিবর্তন করেন।

قَوْلُهُ لَهُ الْخِيَارُ اِعْتِبَارًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الْحِجَابِ :

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রথম মতের দলিল : হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) প্রথম দিকে খেয়ারে রুম্যতকে খেয়ারে শর্ত [শর্তভিত্তিক এখতিয়ার] ও খেয়ারে আইব [দোষজনিত এখতিয়ার]-এর উপর কিয়াস করেছিলেন। বিক্রয়চুক্তিতে তিন দিনের খেয়ারের শর্ত ক্রেতাও করতে পারেন, বিক্রেতাও করতে পারেন। এক্রপভাবে পণ্যে দোষ পাওয়া গেলে তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার যেক্রপ ক্রেতার আছে তেমনি মূল্যমুদ্রায় বা মূল্যদ্রব্যে দোষ পাওয়া গেলে বিক্রেতারও তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার আছে। তবে পার্থক্য এটুকু যে, ক্রেতা দোষের কারণে পণ্য (مَيْسِع) ফেরত দিলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বিক্রেতা মূল্যমুদ্রা বা মূল্যদ্রব্য (مَنْ) ফেরত দিলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায় না। কারণ, চুক্তিতে পণ্য হলো মূল; মূল্য মূল জিনিস নয়। তাই দোষের ভিত্তিতে মূল্য ফেরত দেওয়া হলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায় না; বরং দোষমুক্ত মূল্য প্রদান আবশ্যিক হয়। মোটকথা, খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে আইবের সুরতে যেমন ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য খেয়ার রয়েছে, তেমনি খেয়ারে রুম্যতের সুরতেও ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য খেয়ার থাকবে।

قَوْلُهُ وَمَذَا لَأَنَّ لِرُومِ الْعَقْدِ بِنَاءَ الرِّضَاءِ الْخ : ইমাম আবু হানীফা (র.) খেয়ারে রুম্যতকে খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে আইবের উপর কোনো যোগসূত্রের (اَوَّلُ الْجَمِيعَةِ) ভিত্তিতে কিয়াস করেছিলেন, হিদায়া গ্রন্থকার তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ সম্মতি পাওয়া গেলে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়; বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্যের স্বত্ব তাগের উপর পূর্ণ সম্মতি, আর ক্রেতার ঐ পণ্যে তার স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি। আর পূর্ণ সম্মতি পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অবগতি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর অবগতি হয় দেখার দ্বারা। কারণ, দেখার দ্বারা পণ্যের ভাল খারাপ দিক সম্পর্কে যেক্রপ স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তা শোনার দ্বারা পাওয়া যায় না। সুতরাং না দেখে বিক্রি করার সুরতে বিক্রেতা পণ্যের স্বত্ব তাগে পূর্ণ সম্মত নয়। অতএব দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে। যেমন খেয়ারে শর্তের সুরতে বিক্রেতা পণ্যের স্বত্ব তাগে সম্মত নয় বিধায় সে এখতিয়ার পায়। এক্রপভাবে খেয়ারে আইবের সুরতে বিক্রেতা দোষগ্রস্ত মূল্য গ্রহণে সম্মত নয় বিধায় সে তা রাখা/ না রাখার এখতিয়ার পায়। অতএব খেয়ারে রুম্যতের সুরতেও বিক্রেতা এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ أَنَّهُ مُعْلَقٌ بِالْبَيِّنَةِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَنْبَغُ الْحِجَابِ :

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রত্যাবর্তিত মতের দলিল : গ্রন্থকার (র.) দুটি দলিল উল্লেখ করেছেন।

১. পূর্বেউল্লিখিত যে হাদীস দ্বারা আমরা খেয়ারে রুম্যতকে বৈধ সাব্যস্ত করেছি তাতে খেয়ারে রুম্যতকে ক্রয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে আছে, مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَ، فَكَالْخِيَارِ الْحِجَابِ "না দেখা কোনো দ্রব্য কেউ ক্রয় করলে দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে।" অতএব ক্রয় ছাড়া অন্য সুরতে খেয়ারে রুম্যত সাব্যস্ত হবে না।

২. হযরত উসমান ও হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর ঘটনা। একবার হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর কাছে তার বসরার একটি জমি বিক্রি করেন।

তারা দু'জনের কেউ জমিটি দেখেননি। উভয়ে মদীনায থেকেই এ ক্রয়-বিক্রয় করেন। কিছুদিন পর হযরত তালহা (রা.) -কে কেউ বললেন, আপনি ঠকে গেছেন, জমিটির দাম আরো কম ছিল। উত্তরে তিনি বললেন, আমি না দেখা জিনিস ক্রয় করেছি। সুতরাং দেখার পর পছন্দ না হলে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাব। অপরদিকে হযরত উসমান (রা.) -কে কেউ বলল, আপনি ঠকে গেছেন, জমিটির দাম আরো বেশি ছিল। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি না দেখা জিনিস বিক্রি করেছি। তাই আমি জমিটি দেখার পর ফেরত নেওয়ার এখতিয়ার পাব।

দু'জনের একই উক্তিতে বিষয়টি একটু ঘোলাটে হয়ে যায়। কারণ, দু'জনই যদি এখতিয়ার পায় আর এখতিয়ার বলে একজন জমিটি রাখতে চায় আরেকজন ফেরত নিতে চায় তাহলে দু'জনের এখতিয়ার রক্ষা হয় না। তাই মূলত কে এখতিয়ার পাবেন তা নির্ধারণের জন্য তারা বিখ্যাত সাহাবী হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর কাছে বিষয়টি পেশ করেন এবং তার উপর বিষয়টি মীমাংসা করার ভার দেন। হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শুধু হযরত তালহা (রা.) এখতিয়ার পাবেন বলে রায় প্রদান করেন। উপস্থিত সাহাবীদের কেউ এ রায়ের বিরোধিতা করেননি। সুতরাং এটা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা যে, না দেখা কোনো দ্রব্য বিক্রি করলে বিক্রেতা দেখার পর এখতিয়ার পাবেন না। এ ইজমার কারণে ইমাম আবু হানীফা (র.) তার প্রথম মত থেকে ফিরে আসেন এবং এই মত গ্রহণ করেন যে, বিক্রেতা খেয়ারে ক্রয়ত তথা দেখার এখতিয়ার লাভ করবে না। -[তাহাবী ও বায়হাকী]

ثُمَّ خِيَارُ الرَّؤْيَةِ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، بَلْ يَبْقَى إِلَى أَنْ يَوْجَدَ مَا يُبْطِلُهُ، وَمَا يُبْطِلُ خِيَارَ الشَّرْطِ مِنْ تَعَيُّبٍ أَوْ تَصَرُّفٍ يُبْطِلُ خِيَارَ الرَّؤْيَةِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُمَكِّنُ رَفْعَهُ، كَالِإِعْتَاقِ وَالتَّذْيِيرِ، أَوْ تَصَرُّفًا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةَ يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرَّؤْيَةِ وَبَعْدَهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَ تَعَذُّرُ الْفَسْخِ فَبَطَلَ الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَالْمَسَاوِمَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لَا يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرَّؤْيَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَرْتَوِ عَلَى صَرِيحِ الرِّضَاءِ وَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرَّؤْيَةِ، لَوْجُودِ دَلَالَةِ الرِّضَاءِ .

অনুবাদ : দেখার ইচ্ছাধিকার সময়ের সাথে নির্ধারিত নয়। বরং বাতিলকারী কোনো জিনিসের উপস্থিতি পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকবে। আর [পণ্য] দোষগ্রস্ত হওয়া কিংবা [পণ্যে] কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি যে সব বিষয় খেয়ারে শর্তকে বাতিল করে তা দেখার ইচ্ছাধিকারকেও বাতিল করে। তবে কথা হলো, হস্তক্ষেপ যদি এরূপ হয় যা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, যেমন [ক্রয়কৃত দাসকে] মুক্ত করে দেওয়া বা মুদাব্বার বানানো কিংবা এমন হস্তক্ষেপ, যা [পণ্যের মাঝে] অপরের অধিকারকে অবশ্য সাব্যস্ত করে, যেমন [ক্রয়কৃত পণ্যকে] নিঃশর্ত বিক্রি করা, বন্ধক রাখা বা ইজারা দেওয়া, তাহলে তা দেখার আগে হোক বা পরে হোক তা দেখার ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে দেয়। কারণ, হস্তক্ষেপটি প্রত্যাহার করা সম্ভব না হওয়াতে কিংবা পণ্যে অপরের অধিকার অবশ্য সাব্যস্ত হওয়াতে বিক্রয়চুক্তি রহিত করা অসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি হস্তক্ষেপ এরূপ হয় যা [পণ্যের মাঝে] অপরের অধিকারকে অবশ্য সাব্যস্ত করে না, যেমন খেয়ারের শর্তে বিক্রয় করা বা দরদাম করা কিংবা অর্পণ না করে কাউকে পণ্য উপহার দেওয়া, তাহলে তা দেখার পূর্বে দেখার ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে না। কারণ, এ হস্তক্ষেপ স্পষ্ট সম্মতির চেয়ে বেশি [শক্তিশালী] নয়। আর দেখার পরে হলে দেখার ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে দিবে। কারণ, সম্মতির ইস্তিত পাওয়া গেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে দু'টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক, খেয়ারে ক্রয়তের কোনো সময়সীমা আছে কি না? দুই, খেয়ারে ক্রয়ত বাতিলকারী জিনিস কি কি?

হানাফী ফিকহবিদগণের মধ্যে কারো কারো মতে খেয়ারে ক্রয়তের নির্ধারিত সময়সীমা আছে। তারা বলেন, দেখার পর ক্রেতার পছন্দ না হলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দিতে যেটুকু সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়ার থাকবে। এটুকু সময়ে যদি সে বিক্রয়চুক্তি বাতিল না করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, চুক্তিতে সে সম্মত আছে। তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

—[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২]

কিন্তু বিদ্বত্তম অভিমত হলো, খেয়ারে শর্তের যেরূপ নির্ধারিত সময়সীমা আছে এবং হা/না কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান ছাড়া ঐ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে যেরূপ খেয়ার বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে, খেয়ারে ক্রয়তের এ

ধরনের কোনো সময়সীমা নেই। দেখার আগে বা পরে খেয়ার বাতিলকারী কোনো কারণ না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত খেয়ার থাকবে। খেয়ার বাতিলকারী কোনো কারণ পাওয়া গেলে তবেই খেয়ার বাতিল হবে।

খেয়ার বাতিলকারী কারণসমূহ কি কি? ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খেয়ারে শর্ত যে সব কারণে বাতিল হয়, সে সব কারণে খেয়ারে রুম্মতও বাতিল হবে। যেমন— ক্রেতার খেয়ারে শর্তের সুরতে বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় দোষগ্রস্ত হলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরূপভাবে ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রীত-পণ্যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হলে ধরে নেওয়া হয় ক্রেতা চুক্তিতে সম্মত আছে। তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যায়। তদ্রূপ খেয়ারে রুম্মতের সুরতেও যদি ক্রেতার কজায় থাকাকালে বিক্রীত-পণ্য দোষগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা ক্রেতা পণ্যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ إِن كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُسْكِنُ رُغْمًا كَالْإِعْصَانِ الْخ: হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা ফারাগানী (র.) বলেন, হস্তক্ষেপের বিভিন্ন সুরত আছে। সব ধরনের হস্তক্ষেপে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হবে না। দুই ধরনের হস্তক্ষেপের কারণে খেয়ার বাতিল হবে।

১. যে হস্তক্ষেপ (تَصَرُّفٌ) প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, এ ধরনের হস্তক্ষেপ দেখার আগে হোক বা পরে হোক, এর কারণে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, ক্রেতা গোলাম ক্রয়ের পর না দেখেই আজাদ করে দিল। এ সুরতে এখতিয়ার বাতিল হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু গোলামটি আজাদ হয়ে গেছে তাই তা এখন তার মালিকানাভুক্ত নয়। অতএব এখতিয়ার বলে গোলামটি সে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে চাইলে তা সম্ভব নয়। তাই তার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

এরূপভাবে গোলাম ক্রয়ের পর না দেখে তাকে মুদাব্বার (مُدَبَّرٌ) বানালে সে ক্ষেত্রেও ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, দেখার পর এখতিয়ার বলে ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো ক্রেতা বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে যে গোলামের মালিক হয়েছিল এখন বিক্রেতাকে সে তার মালিক বানাচ্ছে। আর মুদাব্বার গোলামে মালিকানা পরিবর্তন বৈধ নয়। অতএব এখতিয়ার বলে বিক্রেতাকে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

২. যে হস্তক্ষেপ বিক্রীত-পণ্যে অন্যের মালিকানা আবশ্যকরূপে সাব্যস্ত করে, এ ধরনের হস্তক্ষেপ দেখার আগে হোক বা পরে হোক, এর কারণে ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, ক্রেতা না দেখা পণ্যটি নিঃশর্তভাবে কারো কাছে বিক্রি করে ফেলল কিংবা কারো কাছে বন্ধক রাখল কিংবা কাউকে ইজারা দিল। এ সব সুরতে পণ্যে অপরের অধিকার অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ায় ক্রেতা এখতিয়ার বলে পণ্যটি যেহেতু বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারছে না তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقَّ الْخ: আর যে হস্তক্ষেপ বিক্রীত-পণ্যে অপরের অধিকার অবশ্য সাব্যস্ত করে না, তা দেখার পূর্বে হলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হবে না। যেমন, ক্রেতা না দেখা পণ্যটি খেয়ারের শর্তে কারো কাছে বিক্রি করল অথবা এখনও বিক্রি করেনি, কেবল দরদাম হচ্ছে কিংবা পণ্যটি কাউকে উপহার দিল, কিন্তু এখনও তা তাকে অর্পণ করেনি। এ সকল সুরতে পণ্যে অপরের অধিকার আবশ্যকরূপে সাব্যস্ত না হওয়ায় এখতিয়ার বলে বিক্রেতাকে পণ্যটি ফেরত দেওয়া সম্ভব। তাই ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হবে না। অবশ্য এ সব হস্তক্ষেপ এদিকে ইঙ্গিত করে যে, না দেখা পণ্যটি গ্রহণে ক্রেতার সম্মতি আছে। কিন্তু তা খেয়ার বাতিলের কারণ হতে পারে না। কারণ, দেখার আগে কেউ যদি স্পষ্টভাবে তার সম্মতি প্রকাশ করে তাহলেও তার খেয়ার বাতিল হয় না। স্পষ্ট সম্মতির তুলনায় সম্মতির ইঙ্গিত অনেক দুর্বল ব্যাপার। তাই যৌক্তিকভাবেই তার কারণে ক্রেতার খেয়ার এখতিয়ার বাতিল হবে না।

তবে এ সব হস্তক্ষেপ দেখার পর হলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, দেখার পর পণ্যটি গ্রহণে ক্রেতা সম্মত রয়েছে, এ ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেই এখতিয়ার বাতিল হয়ে যায়। তাই দেখার পর এ ধরনের হস্তক্ষেপ খেয়ার বাতিলের কারণ হবে।

قَالَ : وَمَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ أَوْ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوًى أَوْ إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ أَوْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَّلَهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رُؤْيَا جَمِيعِ الْمَبْنُوعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ لِعَتَادِهِ، فَيَكْتَفِي بِرُؤْيَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ، وَلَوْ دَخَلَ فِي الْمَبْنُوعِ أَشْيَاءٌ، فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتْ أَحَادُهَا كَالْمَكِيلِ وَالْمُوزُونِ، وَعَلَامَتُهُ أَنْ يُعْرَضَ بِالنَّمُودَجِ يَكْتَفِي بِرُؤْيَا وَاحِدٍ مِنْهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَرْدَأَ مِمَّا رَأَى، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتْ أَحَادُهَا كَالثِّيَابِ وَالذُّوَابِ لِأَبَدٍ مِنْ رُؤْيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَالْجَوْزُ وَالْبَيْضُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ (رح)، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْحَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لِكُونِهَا مُتَقَارِبَةً، إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ : النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ كَافٍ، لِأَنَّهُ يُعْرِفُ وَصْفَ الْبَقِيَّةِ، لِأَنَّهُ مَكِينٌ يُعْرَضُ بِالنَّمُودَجِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কেউ যদি শস্যভূপের বাইরের দিক অথবা ভাঁজ করা কাপড়ের বাইরের দিক কিংবা দাসীর মুখমণ্ডল কিংবা পশুর মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ দেখে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, বিক্রীত-পণ্যের সর্বাংশ দেখা শর্ত নয়। কারণ, তা অসাধ্য। সূত্রাং এটুকু দেখাই যথেষ্ট হবে, যা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। যদি বিক্রয়চুক্তিতে [এক জাতীয়] অনেকগুলো জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়, আর তার এককগুলোর মাঝে তারতম্য না হয়; যেমন, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা বস্তু, যার আলামত হলো, [সবগুলোর স্বরূপ বুঝতে অল্প কিছুকে] নমুনা হিসেবে পেশ করা, এ ধরনের বস্তুর একটি দেখাই [সবগুলো দেখার পক্ষে] যথেষ্ট হবে। অবশ্য অবশিষ্টগুলো যদি দেখা জিনিসের চেয়ে নিম্নমানের হয় তখন ক্রেতার অথতিয়ার থাকবে। আর যদি তার এককগুলোর মাঝে তারতম্য হয়; যেমন, কাপড় বা পশু, তাহলে তার প্রতিটিকে দেখা অপরিহার্য। আখরোট ও ডিম ইমাম কারখী (র.)-এর মতানুযায়ী এ পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এগুলো গম ও যবের পর্যায়ভুক্ত হওয়া সমুচিত ছিল। কারণ, এগুলো [-র প্রতিটি] পরস্পর কাছাকাছি। যখন এ মূলনীতি সাব্যস্ত হলো, তখন আমরা বলব, শস্যভূপের বাইরের দিক দেখাই যথেষ্ট। কারণ, তা অবশিষ্টগুলোর গুণাগুণ জানিয়ে দেয়। কেননা, স্থপিকৃত শস্য পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু, [সবগুলোর মান বুঝতে অল্প কিছুকে] নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলাটির বিবরণ হলো—

১. ক্রেতা একটি শস্যত্বপ ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে শস্যত্বপের বাইরের অংশ দেখেছে, ভিতরের শস্য বের করে দেখেনি।
  ২. ক্রেতা একটি ভাজ করা ধান কাপড় ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে বাইরের দিক দেখেছে, ভিতরে খুলে দেখেনি।
  ৩. ক্রেতা দাস/ দাসী ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে দাস/দাসীর চেহারা দেখেছে, অন্যান্য অঙ্গ দেখেনি।
  ৪. ক্রেতা পত্ব ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ দেখেছে, দেহের অন্যান্য অংশ দেখেনি- এ সব সুরতে ক্রেতার উক্ত অংশ বিশেষ দেখাই সমগ্র পণ্য দেখেছে বলে গণ্য হবে। তাই তার জন্য খেয়ারে রুযত সাব্যস্ত হবে না।
- الْخ : قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رُؤْيَا جَمِيعِ النَّسِيجِ : গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন ফারগানী (র.) ক্রয়কালে পণ্যের কতটুকু অংশ দেখে থাকলে ক্রেতার খেয়ারে রুযত [দেখার এখতিয়ার] বাকি থাকবে না এ বিষয়ে একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন : তিনি বলেন, ক্রয়কালে বিক্রয় পণ্যের সব অংশ দেখা শর্ত নয়; বরং যেটুকু দেখলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়, পণ্যের মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, তা দেখলেই যথেষ্ট হবে এবং উক্ত পরিমাণ দেখার পর তার দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার বাকি থাকবে না।

পণ্যের সংখ্যা ও ধরন তিন রকম হতে পারে—

১. পণ্যের সংখ্যা একটি।
২.  $\text{الْأَنْبِيَاءُ}$  পণ্যের সংখ্যা একাধিক, সবই এক জাতীয় এবং একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয় না। এর আলামত হলো, ব্যাগে বা পাত্রে রাখা সমগ্র পণ্যের মান ও স্বরূপ বোঝার জন্য অল্প কিছুকিছু নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়। যেমন কায়ল বা ওজন পরিমাপে বিক্রি করা পণ্য; ধান, চাউল, গম, যব। এক্রপভাবে গণনা করে বিক্রি করা পণ্য; যেমন, ডিম, লেবু, পেয়ারা।
৩.  $\text{الْأَنْبِيَاءُ}$  পণ্যের সংখ্যা একাধিক; সবগুলো এক জাতীয়, তবে একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয়। যেমন, গরু, ছাগল, কাপড় ইত্যাদি।

যদি পণ্যের সংখ্যা একটি হয় তাহলে তার সব অংশ দেখা শর্ত নয়। কেননা, তা বাস্তবিক পক্ষেও এবং শরিয়তের বিধানগত কারণেও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়। যদি খেয়ার রহিত হওয়ার জন্য পণ্যের সব অংশ দেখা শর্ত হয় তাহলে দাস/ দাসীর গুণগুহান ও সতর খুলে দেখতে হবে। অথচ তা জায়েজ নেই। তাই মুখ্য ও প্রধান অংশটুকু দেখাই যথেষ্ট হবে। যখন মুখ্য ও প্রধান অংশটি দেখবে তখন না দেখা অপ্রধান অংশগুলো তার অনুবর্তী (تَابِعٌ) হয়ে যাবে। প্রধান অংশটুকু দেখার কারণে যখন তাতে খেয়ার রহিত হয়ে যাবে তখন অনুবর্তী অংশগুলোতেও খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

অতএব কেউ যদি দাস/ দাসী ক্রয় করে আর ক্রয়কালে দাস/দাসীর মুখমণ্ডল দেখে থাকে তাহলে অবশিষ্ট অংশগুলো দেখার পর তার খেয়ারে রুযত বাকি থাকবে না। কারণ মুখমণ্ডলেই মানুষের প্রধান ও মুখ্য অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গগুলো মুখমণ্ডলের অনুবর্তী। এ কারণেই অন্যান্য অঙ্গসমূহ এক রকম হওয়া সত্ত্বেও মুখমণ্ডলের তারতম্যের কারণে দাস/দাসীর দামেও তারতম্য ঘটে। হ্যাঁ, যদি ক্রয়কালে ক্রেতা দাস/দাসীর পেট, পিঠ ও অন্য সব অঙ্গ দেখে, কিন্তু মুখমণ্ডল দেখেনি তাহলে মুখমণ্ডল দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে এবং এখতিয়ার বলে উক্ত দাস/দাসী বিক্রয়তাকে ক্ষেতত দিতে পারবে।

الْخ : قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَأْذِنُ الْخَادِمَ كَأَنَّ كَيْفَ الْخ : যদি পণ্য একাধিক হয়, সবগুলো এক জাতীয় এবং একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয় না তাহলে ক্রয়কালে কোনো একটি দেখাই ক্রেতার দেখার এখতিয়ার রহিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। অতএব কেউ যদি স্তূপকৃত শস্য ক্রয় করে আর ক্রয়কালে স্তূপের বাইরের অংশ দেখে তাহলে স্তূপের অবশিষ্ট শস্য দেখার পর তার খেয়ারে রুযত বাকি থাকবে না। কারণ স্তূপের সব শস্য এক জাতীয়, পরস্পর কোনো তারতম্য নেই।



সবগুলোর মান বোঝার জন্য কিছুকে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়। অল্প কিছু দেখলেই অবশিষ্টগুলোর মান কেমন তা বোঝা যায়। অতএব ক্রয়কালে কিছু দেখার অর্থ হলো ক্রেতা সব পণ্যের মান ও অবস্থা জেনে শুনেই ক্রয় করেছে। তাই দেখার পর তার এখতিয়ার বাকি থাকবে না।

এরূপভাবে একই সুতা, একই কালার, একই ডিজাইন এবং একই বুননের কয়েকটি থান কাপড় যদি ক্রেতা একই বিক্রয়যুক্তিতে ক্রয় করে এবং ক্রয়কালে কেবল একটি থান দেখে তাহলে অবশিষ্ট থানগুলো দেখার পর ক্রেতা দেখার এখতিয়ার পাবে না।

قَوْلُهُ إِذَا كَانَ الْبَائِسُ أَرَادَ مَسَّ الْخ: তবে ক্রয়ের পর ক্রেতা যদি দেখে যে, সে যা দেখেছিল অবশিষ্টগুলো তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের, তাহলে তখন সে এখতিয়ার পাবে। তবে কোন এখতিয়ার পাবে গ্রহকার (র.) তা স্পষ্ট উল্লেখ করেননি। যানবী' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খেয়ারে আইব পাবে।—[প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৫]

কাফী গ্রন্থে আছে, যদি অবশিষ্টগুলো দেখা জিনিসের চেয়ে নিম্নমানের হয় তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ, ক্রেতা যে মানের পণ্য দেখেছে তা ক্রয়েই সে সম্মত হয়েছে, তারচেয়ে নিম্নমানের পণ্য ক্রয়ে সে সম্মত হয়নি। আত্মা ইবনে হুয়াম (র.) বলেন, কাফী গ্রন্থের এ দলিল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, খেয়ারে রুম্মত পাবে। গ্রহকার (র.)—এর পূর্বাপর বক্তব্যের দাবিও এটাই। তবে সঠিক কথা হলো, কিছু সুরতে খেয়ারে আইব পাবে, আর কিছু সুরতে খেয়ারে রুম্মত পাবে। যদি পণ্য দেখা জিনিসের চেয়ে এতটা নিম্নমানের হয় যে, তা দোষের সংজ্ঞায় পড়ে তাহলে খেয়ারে আইব, আর যদি দোষের সংজ্ঞায় না পড়ে তাহলে খেয়ারে রুম্মত পাবে। কখনো উভয়টা এক সাথেও হতে পারে। যেমন, ক্রেতা না দেখা পণ্য ক্রয় করার পর এখনও তা কজা করেনি। ইতোমধ্যে বিক্রোতা তাকে পণ্যে দোষ আছে বলে জানাল এবং তৎক্ষণাৎ তাকে পণ্য দেখাল। এ সুরতে ক্রেতা খেয়ারে আইব ও খেয়ারে রুম্মত উভয়টা পাবে।—[ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩১৫]

যখীরা গ্রন্থে আছে, কায়ল পরিমাপে বিক্রি করা পণ্য বা ওজন করে বিক্রি করা পণ্য যদি এক পাত্রে থাকে তাহলে তার কিছু দেখাই যথেষ্ট হবে। যদি পণ্য দুই পাত্রে থাকে আর ক্রেতা একটি পাত্রের পণ্য দেখে তাহলে এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। ইরাকের মাশায়েখ বলেন, যদি অপর পাত্রের পণ্যের মান ক্রেতার দেখা পাত্রের পণ্যের মতো বা তারচেয়ে ভাল হয় তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হবে। আর যদি নিম্নমানের হয় তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। তবে ফেরত দিতে চাইলে সবটাই ফেরত দিতে হবে। ফাতাওয়া কাজীখান গ্রন্থে আছে, বলখের মাশায়েখ বলেন, দুই পাত্রের একটি দেখার দ্বারা ক্রেতার খেয়ার বাতিল হবে না।—[বিনায়া, প্রাণ্ডক্ত]

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَتَخَارُفُ أَحَادِمًا كَالْبَيَابِ وَالذَّوَابِ الْخ: যদি পণ্যের সংখ্যা একাধিক হয়; সবগুলো এক জাতীয়, তবে একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয় যেমন, একই বিক্রয়যুক্তিতে ক্রেতা কয়েকটি গরু কিংবা কয়েক প্রকারের ধান কাপড় ক্রয় করে, তাহলে বিক্রীত-পণ্যের প্রতিটিকে দেখা আবশ্যিক। যদি কোনো একটি না দেখে তাহলে তা দেখার পর ক্রেতা দেখার এখতিয়ার লাভ করবে। কেননা, একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্যের কারণে একটি দেখার দ্বারা অবশিষ্টগুলোর মান ও স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। তাই প্রতিটিকে দেখা আবশ্যিক।

قَوْلُهُ وَالنَّجَرُ وَالنَّبْضُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نَيْبًا ذَكَرَهُ الْكُتُبُ الْخ: ইমাম কারখী (র.)—এর উল্লেখ অনুসারে ডিম ও আখরোট এক জাতীয় যে সব দ্রব্যের এককের মাঝে দামে তারতম্য হয় সেই পর্যায়ভুক্ত। কারণ, এগুলো ছোট বড় হয়। কাজী খান (র.)—এর মতও এটি। অতএব ক্রয়কালে ডিম ও আখরোটের প্রতিটিকে দেখা শর্ত। কিন্তু গ্রহকার (র.)—এর মতে, এগুলোর যে কোনো একটি দেখাই যথেষ্ট। তাই তিনি বলেন, ডিম ও আখরোট, গম ও যবের পর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ, এগুলোর একটি অপরটির কাছাকাছি। তাই কিছু দেখাই সবগুলো দেখার পক্ষে যথেষ্ট হবে। মুজাররদ গ্রন্থে আছে, এটাই বিতর্ক অভিমত। ইমাম শাফেরী (র.)—এর অনুসারী কতিপয় ফিকহবিদের অভিমতও এরূপ।—[প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৬]

وَكَذَٰلِكَ النَّظَرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّرِبِ مِمَّا يُعْلِمُ الْبَقِيَّةَ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي طَبَعِهِ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا كَمَوْضِعِ الْعَلَمِ، وَالْوَجْهَ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الْأَدَمِيِّ، وَهُوَ وَالْكَفْلُ فِي الدَّوَابِّ، فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَا الْمَقْصُودِ، وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَا غَيْرِهِ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَا الْقَرَائِمِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُونُسَ رَجَمَهُ اللَّهُ، وَفِي شَاةِ اللَّحْمِ لَا بُدَّ مِنَ الْجَسَنِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ اللَّحْمُ يُعْرِفُ بِهِ، وَفِي شَاةِ الْقُنْيَةِ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَا الضَّرْعِ، وَفِيمَا يُطْعَمُ لَا بُدَّ مِنَ الذَّوْقِ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْرِفُ لِلْمَقْصُودِ.

অনুবাদ : তদ্রূপ কাপড়ের উপরিভাগ দেখা অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে অবগতি দান করে। অবশ্য ভাঁজের ভিতরে যদি এ অংশ থাকে যা সাধারণত মুখ্য হয়, যেমন কারুকাজের স্থান তাহলে বাইরের দিক দেখা যথেষ্ট হবে না। মানুষের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল মুখ্য। আর পশুর ক্ষেত্রে মুখ্য হলো মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ। সূতরাং উদ্দেশ্য অংশটি দেখাই বিবেচ্য হবে। অন্যান্য অংশ দেখা বিবেচ্য হবে না। ফিকহবিদগণের কেউ কেউ পশুর পা দেখারও শর্ত করেছেন। প্রথমোক্ত অভিমত ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। গোশতের বকরির ক্ষেত্রে ধরে অনুমান করা জরুরি। কারণ, উদ্দেশ্য হলো গোশত, আর তা এভাবে বুঝা যায়। পালার বকরির ক্ষেত্রে ওলান দেখা এবং স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে চেখে নেওয়া আবশ্যিক। কারণ, এটাই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি দান করে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْحَرْبُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّرِبِ مِمَّا يُعْلِمُ الْبَقِيَّةَ، قَوْلُهُ وَكَذَٰلِكَ النَّظَرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّرِبِ الْحَرْبُ: এরূপভাবে কেউ যদি খান কাপড় ক্রয় করে আর ক্রয়কালে কাপড়ের বাইরের দিক দেখে, ভিতরে খুলে দেখেনি, তাহলে অবশিষ্ট কাপড় দেখার পর তার খেয়ারে রুমত বাকি থাকবে না। কারণ উপরের দিক দেখেই অবশিষ্ট কাপড়ের মান ও স্বরূপ ক্রেতা বুঝতে পেরেছে এবং তাতে সম্মত হয়েই সে কাপড় ক্রয় করেছে। হ্যাঁ, নকশা ও কারুকাজের স্থান, যা সাধারণত কাপড়ের প্রধান ও মুখ্য অংশ হয়, তা যদি ভাঁজের ভিতরে থাকে এবং ক্রয়কালে ক্রেতা না দেখে তাহলে দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ وَالْكَفْلُ فِي الدَّوَابِّ فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَا الْمَقْصُودِ: পশুর ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ দেখা বিবেচ্য হবে। কারণ, পততে এ দু'টোই প্রধান ও মুখ্য। অতএব, ক্রয়কালে এ দু'অংশ দেখে থাকলে তার দেখার এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এ দু'অংশ দেখেনি, অবশিষ্ট সব অংশ দেখেছে, তাহলে এ দু'অংশ দেখার পর সে দেখার এখতিয়ার পাবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত।

فِيكَهْرِ الْبِدَاوِيِّ: ফিকহবিদগণের কারো কারো মতে ক্রয়কালে পশুর পা দেখাও শর্ত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, দাস/দাসীর মতো পশুর মুখমণ্ডল দেখাই যথেষ্ট হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে আল মুহাল্লার বর্ণনা অনুসারে পশুর ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের রীতি বিবেচ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে পশুর মুখমণ্ডল, পশ্চাদভাগ ও পা দেখা জরুরি এবং বসার গদি, পাদানি এবং গলার রশি খুলে নেওয়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَفِي شَاةِ اللَّحْمِ لَا بُدَّ مِنَ الْجَسَنِ: যদি গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বকরি ক্রয় করা হয় তবে সেক্ষেত্রে ধরে দেখা বিবেচ্য হবে। কারণ বকরিতে কি পরিমাণ গোশত আছে, বকরি মোটা-তাজা, না কুশকায় তা ধরে দেখার দ্বারা বুঝা যায়। যদি পাল্য ও প্রজনন উদ্দেশ্য হয় তাহলে বকরির ওলান দেখা শর্ত। যখীরা গ্রন্থে আছে, ওলান এবং পুরা শরীর দেখা জরুরি। আর যদি স্বাদবিশিষ্ট জিনিস হয় তাহলে চেখে দেখা জরুরি। কারণ, স্বাদটাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য। আর তার স্বরূপ চেখে দেখার দ্বারা বুঝা যায়। অতএব ক্রয়কালে চেখে না দেখলে ক্রেতার খেয়ারে রুমত থাকবে।

قَالَ : وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشَاهِدْ بُيُوتَهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ أَوْ رَأَى أَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ، وَعِنْدَ زُفَرٍ (رح) لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُيُوتِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلَى وَفَائِ عَادَتِهِمْ فِي الْأَنْبِيَةِ، فَإِنَّ دَوْرَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً يَوْمِيذٍ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ لِتَتَفَاوَتِ، وَالنَّظَرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِالدَّخِيلِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, [বাড়ি ক্রয়কালে] যদি ক্রেতা বাড়ির প্রাঙ্গণ দেখে থাকে, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে না; যদিও সে বাড়ির ঘরগুলো [এবং কক্ষগুলো] না দেখে। তদ্রূপই বিধান; যদি বাড়ির বহিরাঙ্গণ দেখে থাকে কিংবা বাইরের দিক থেকে বাগানের গাছগুলো দেখে থাকে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা জরুরি। বিশুদ্ধতম মত হলো, ইমাম কুদুরী (র.)-এর বক্তব্যটি ঘর-বাড়ি [নির্মাণের] ক্ষেত্রে তাঁদের [তৎকালীন] প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। কারণ, তৎকালে তাদের ঘর-বাড়িগুলো সাধারণত [ভিতর ও বাইরের দিক থেকে] পার্থক্যপূর্ণ হতো না। কিন্তু বর্তমানে পার্থক্যের কারণে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যিক। বাইরের দিক দেখা ভিতর সম্পর্কে অবগতি দান করে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করেছে। ক্রয়কালে শুধু বাড়ির প্রাঙ্গণ দেখেছে, ঘর ও কক্ষগুলোতে ঢুকে দেখেনি, কিংবা বাড়ির বাইরের অংশ দেখেছে, বাড়ির ভিতরে ঢুকেনি, তাহলে ঘর ও কক্ষগুলো দেখার পর তার দেখার এখতিয়ার অর্জিত হবে না। তদ্রূপ এক ব্যক্তি একটি বাগান ক্রয় করেছে। ক্রয়কালে বাগানের বাইরে থেকে দেখেছে, বাগানের ভিতরে প্রবেশ করেনি, তাহলে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করার পর এবং গাছগুলো দেখার পর তার এখতিয়ার অর্জিত হবে না।

এর দলিল হলো, পূর্বে গেছে যে, বিক্রীত-পণ্যের সব অংশ দেখা শর্ত নয়। কারণ, সব অংশ দেখা অসাধ্য। বাড়ির প্রতি ইঞ্চি ভূমি দেখা এবং বাগানের প্রতিটি গাছ, গাছের শাখা ও কাণ্ড দেখা সহজসাধ্য নয়। তাই মুখ্য ও প্রধান অংশ দেখাই যথেষ্ট হবে। না দেখা অংশগুলো দেখা অংশের অনুবর্তী (تَابِعٌ) হবে। দেখা অংশে খেয়ার রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে অনুবর্তী অংশগুলোতেও খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) -এর মতে ঘর ও কক্ষগুলোর ভিতরে ঢুকে দেখা শর্ত। ইমাম ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর মত এটাই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে ঘরের ছাদ, রান্নাঘর, টয়লেট, গোসলখানা, গোয়ালঘর এবং ভিতর ও বাইরের দেয়াল দেখাও শর্ত। এটা ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এরও অভিমত। -[বিনায়া, পৃ. ১২৮]

قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلَى وَفَائِ عَادَتِهِمْ (র.)-এর মতে, ইমাম কুদুরী (র.)-এর বক্তব্যটি মূলত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর যুগে বাগদাদ ও কূফাবাসীদের ঘর-বাড়ি নির্মাণের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। তৎকালে তাদের নির্মিত বাড়ির বহিরাঙ্গণ ও অভ্যন্তরভাগ সাধারণত এক ও অভিন্ন হতো। তাই বাইরের অংশ দেখেই ভিতরের অংশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া

যেত । কিন্তু বর্তমানে নির্মিত বাড়ি ও ঘরগুলোর ভিতরভাগে ও অভ্যন্তরভাগে যথেষ্ট পার্থক্য হয় । তাই এখন খেয়ার বিলুপ্ত হওয়ার জন্য ইমাম যুফার (র.)-এর মতানুযায়ী ঘর ও কক্ষগুলোতে ঢুকে দেখা, রান্নাঘর, টয়লেট, গোসলখানা, গোয়ালঘর ইত্যাদি দেখা শর্ত । উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ইমাম যুফার (র.)-এর মতের উপর ফাতওয়া । —[প্রাপ্তক]

জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী বাগান ক্রয়কালে বাইরের দিক থেকে দেখে থাকলে কিংবা গাছের মাথাগুলো দেখে থাকলে খেয়ার রহিত হয়ে যাবে । কিন্তু কোনো কোনো ফিক্‌হবিদ এ রেওয়ায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, বাগানের ভিতরের অংশই মুখ্য ও প্রধান । সুতরাং বাইরের দিক দেখায় খেয়ার রহিত হবে না । ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে বাগান ক্রয়কালে প্রতিটি গাছ, বাগানের দেয়াল এবং পানির সুবিধাদি দেখা শর্ত । —[বিনায়া, প্রাপ্তক, পৃ. ১২৯]

ফায়দা : কেউ যদি কাচের পাত্রে রাখা তৈল ক্রয় করে আর পাত্রের বাইরের দিক থেকে দেখে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে হাতে ঢেলে দেখে না নিলে তার খেয়ার রহিত হবে না । কারণ, আড়াল থাকায় সে তেলকে ভালোভাবে দেখেনি । ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যথেষ্ট হবে । কারণ, কাচ তেলের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করেনি ।

তুহফা গ্রন্থে আছে, কেউ যদি আয়নার দিকে তাকায় এবং পণ্যকে দেখে, মাশায়েখ বলেন, এতে তার খেয়ার রহিত হবে না । কারণ, ক্রেতা মূল পণ্যকে দেখেনি, পণ্যের ছবি দেখেছে ।

যদি কেউ পানিতে থাকা মাছ ক্রয় করে, যা শিকার ছাড়াই ধরা সম্ভব এবং পানিতে দেখে থাকে, তাহলে কারো কারো মতে ক্রেতার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে । কারণ, সে পণ্যটি হুবহু দেখেছে । আর কারো কারো মতে খেয়ার রহিত হবে না । আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এটাই বিগততম অভিমত । কারণ, পানিতে থাকা অবস্থায় মাছের প্রকৃত আকার বুঝা যায় না; বরং কিছুটা বড় দেখা যায় । তাই এ দেখা পণ্য সম্পর্কে অবগতি দান করে না । —[ফাতহুল কাদীর, পৃ. ৩১৮]

قَالَ : وَنَظَرُ الْوَكِيلِ كَنَظَرِ الْمُشْتَرِي حَتَّى لَا يَرُدَّهُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ، وَلَا يَكُونُ نَظَرُ  
الرَّسُولِ كَنَظَرِ الْمُشْتَرِي، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحم) وَقَالَا : هُمَا سَوَاءٌ، وَلَهُ أَنَّ  
يَرُدُّهُ قَالَ (رض) : مَعْنَاهُ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ ، فَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ فَرُؤُوسُهُ تُسْقِطُ  
الْخِيَارَ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّهُ تَوَكَّلَ بِالْقَبْضِ دُونَ إِسْقَاطِ الْخِيَارِ، فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ  
يَتَوَكَّلْ بِهِ، وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَالْإِسْقَاطِ قَضَاءً : وَلَهُ أَنَّ الْقَبْضَ نَوْعَانِ،  
تَامٌ وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَهُوَ يَرَاهُ، وَنَاقِصٌ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ مَسْتُورًا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উকিলের দেখা ক্রেতার দেখার মতো; তাই [উকিল দেখে থাকলে] ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। তবে দোষগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা। বার্তাবাহকের দেখা ক্রেতার দেখার মতো নয়। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, উভয়ে সমান। [তাই উকিল বা বার্তাবাহকের দেখার পরও] ক্রেতার পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, উকিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কজা করার উকিল। যদি ক্রয়ের উকিল হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার দেখা খেয়ারকে রহিত করে দেবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, ক্রেতা [উকিলকে] কজা করার উকিল নিযুক্ত করেছে, খেয়ার রহিত করার উকিল নিযুক্ত করেনি। আর যে বিষয়ে সে উকিল নিযুক্ত হয়নি সে বিষয় সে ক্ষমতা রাখে না এবং এটা দোষজনিত খেয়ার, শর্তভিত্তিক খেয়ার এবং ইচ্ছাকৃত খেয়ার রহিত করার মতো হয়ে গেল। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— কজা দু প্রকার—১. পূর্ণ কজা। আর তা হলো, পণ্য দেখে কজা করা। ২. অপূর্ণ কজা। আর তা হলো, পণ্য শুণ্ড অবস্থায় কজা করা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামে সগীর থেকে গৃহীত হয়েছে। মাসআলাটির তিনটি অংশ। দ্বিটি অংশ ইমাম চতুর্থ একমত, একটি অংশ নিয়ে তাঁদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।

মাসআলাটির বিবরণ হলো, এক ব্যক্তি না দেখে একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে পণ্যটি তার পক্ষ কজা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল; যেমন বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে পণ্যটি কজা করার উকিল হও, কিংবা বলল, আমি তোমাকে পণ্যটি কজা করার উকিল নিযুক্ত করলাম। এখন এ উকিল যদি পণ্যটি দেখে, তাহলে তা মুআকিল তথা ক্রেতার দেখার মতো হবে। অর্থাৎ ক্রেতার দেখার কারণে যেকোন খেয়ারে রূয়ত রহিত হয়ে যায়, তেমনি উকিলের দেখার কারণেও ক্রেতার খেয়ারে রূয়ত রহিত (ساقط) হয়ে যাবে। যখন খেয়ারে রূয়ত রহিত হয়ে যাবে, তখন ক্রেতা পণ্যটি খেয়ারে রূয়তের ভিত্তিতে বিক্রয়তাকে ফেরত দিতে পারবে না। অবশ্য পণ্যে যদি কোনো দোষ প্রকাশ পায়, তাহলে দোষজনিত খেয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে।

দ্বিত্ব ক্রেতা যদি কাউকে পণ্য কজার দূত (رَسُول) নিযুক্ত করে; যেমন বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে পণ্যটি কজার দূত হও; কিংবা বলল, আমি তোমাকে পণ্যটি কজার দূত নিযুক্ত করলাম; কিংবা বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যেয়ে বল যে, সে যখন

তোমার কাছে পণ্যটি অর্পণ করে, তাহলে দূতের দেখাটা ক্রেতার দেখার মতো হবে না। অর্থাৎ ক্রেতার দেখার দ্বারা যেরূপ তার খেয়ারে রুমত রহিত হয়ে যায়, দূতের দেখার দ্বারা তার খেয়ার রহিত হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। তিনি উকিল ও দূতের দেখার মাঝে পার্থক্য করেন। সাহেবাইন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উকিল ও দূত একই রকম। তাঁরা উকিল ও দূতের দেখায় পার্থক্য করেন না। তাঁদের মতে দূতের দেখায় যেরূপ ক্রেতার খেয়ার রহিত হয় না, তেমনি উকিলের দেখায়ও ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না। দূতের দেখায় ক্রেতার খেয়ার বিলুপ্ত হবে না- এ বিষয়ে সকলে একমত। মতপার্থক্য হলো উকিলের দেখায় ক্রেতার খেয়ারে রুমত রহিত হবে কিনা। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, হবে না।

الْغَنَاءُ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ فَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالْخِيَارِ: এছকার (র.) বলেন, উকিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কজার জন্য নিযুক্ত উকিল। কারণ, পণ্য ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের দেখায় ক্রেতার খেয়ারে রুমত রহিত হবে- এ বিষয়ে সকলেই একমত।

قَوْلُهُ لَهَا أَنَّهُ تَوَكَّلَ بِالْقَبْضِ دُونَ اسْتِطَاعِ الْغَنَاءِ:

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতা উকিলকে কজা করার উকিল নিযুক্ত করেছে, তার খেয়ার বিলোপ করার উকিল নিযুক্ত করেনি। আর যে বিষয়ে সে উকিল নিযুক্ত হয়নি সে বিষয়ে সে ক্ষমতা রাখে না। অতএব কজার উকিল ক্রেতার খেয়ার বিলোপ করতে পারবে না। তাই তার দেখায় ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَالْإِسْقَاطِ الْغَنَاءِ: সাহেবাইন (র.)-এর মতের পক্ষে এছকার (র.) তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যথা-

১. এক ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে তা কজা করার উকিল নিযুক্ত করল। উকিল দেখেওনেই দোষগ্রস্ত অবস্থায় পণ্যটি কজা করল। এতে ক্রেতার খেয়ারে আইব [দোষজনিত অখতিয়ার] বিলুপ্ত হয় না।
২. এক ব্যক্তি খেয়ারের শর্তে একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে তা কজা করার উকিল নিযুক্ত করল। এ সুরতেও উকিলের পণ্যটি কজা করায় ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না।
৩. এক ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে তা কজা করার উকিল নিযুক্ত করল। কজার উকিল পণ্যটি গুণ্ড অবস্থায় কজা করল। এরপর পণ্যটি দেখল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ারকে রহিত করে দিল। এতেও ক্রেতার খেয়ার রহিত হয় না।

এ তিন সুরতে কজার উকিলের কারণে ক্রেতার খেয়ার রহিত হয় না। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও কজার উকিল দেখে কজা করলেও ক্রেতার খেয়ারে রুমত রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ الْقَبْضَ تَوَعَّانَ. تَامَ وَهُوَ الْغَنَاءُ:

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : এছকার (র.) বলেন, কজা দু প্রকার : পূর্ণ কজা ও অপূর্ণ কজা। পণ্য দেখে কজা করা হলে তাকে পূর্ণ কজা, আর না দেখে কজা করা হলে তাকে অপূর্ণ কজা বলে। মুআক্কিল অর্থাৎ ক্রেতা এ উভয় প্রকার কজার অধিকারী। উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে যেহেতু কোনোরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি, তাই কজার উকিলও উভয় প্রকার কজার অধিকারী হবে। মুআক্কিল যদি দেখে কজা করে, তাহলে যেরূপ তার খেয়ার রহিত হয়ে যায় তেমনি উকিল দেখে কজা করলেও তার খেয়ার রহিত হবে। মুআক্কিল না দেখে কজা করলে যেরূপ তার খেয়ার রহিত হয় না, তেমনি উকিল না দেখে কজা করলেও তার খেয়ার রহিত হবে না।

وَهَذَا لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفَقَةِ، وَلَا تَتِمُّ مَعَ بَقَاءِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ، وَالْمَوْكِيلُ مَلَكُهُ  
 يَنْوَعِيهِ، فَكَذَا الْوَكِيلُ، وَمَتَى قَبِضُ الْمَوْكِيلِ وَهُوَ بَرَاهُ سَقَطَ الْخِيَارُ، فَكَذَا الْوَكِيلُ  
 لِإِطْلَاقِ التَّوَكُّيلِ، وَإِذَا قَبِضَهُ مَسْتَوْرًا انْتَهَى التَّوَكُّيلُ بِالنَّاقِصِ مِنْهُ، فَلَا يَمْلِكُ  
 إِسْقَاطَهُ قَضًا بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفَقَةِ، فَيَجُزُّ  
 الْقَبْضُ مَعَ بَقَائِهِ، وَخِيَارُ الشَّرْطِ عَلَى الْخِلَافِ، وَلَوْ سَلِمَ فَالْمَوْكِيلُ لَا يَمْلِكُ التَّامُّ  
 مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِقَبْضِهِ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْخِيَارِ يَكُونُ بَعْدَهُ،  
 فَكَذَا لَا يَمْلِكُهُ وَكِيلُهُ، وَبِخِلَافِ الرَّسُولِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا إِلَيْهِ تَبْلِغُ  
 الرِّسَالَةِ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضُ وَالتَّسْلِيمَ، إِذَا كَانَ رَسُولًا فِي الْبَيْعِ.

অনুবাদ : দু প্রকার এজন্য যে, কজা পূর্ণ হয় বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা দ্বারা। আর দেখার এখতিয়ার থাকা অবস্থায় চুক্তি পূর্ণ হয় না। মুআক্কিল উভয় প্রকার কজার অধিকারী, তদ্রূপ উকিলও [উভয় কজার অধিকারী হবে]। মুআক্কিল যখন দেখে কজা করে, তখন তার এখতিয়ার রহিত হয়ে যায়। সুতরাং উকিল নিয়োগ দান শর্তহীন হওয়ার কারণে উকিলের ক্ষেত্রেও তাই হবে। যখন উকিল পণ্যকে গুপ্ত অবস্থায় কজা করে, তখন ওকালতি অপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়। তাই এরপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ার রহিত করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু দোষজনিত খেয়ারের ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ, দোষজনিত খেয়ার বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হতে বাধা দেয় না। তাই খেয়ার থাকা সত্ত্বেও কজা পূর্ণ হয়ে যায়। আর শর্তভিত্তিক খেয়ারের বিষয়টিতে মতবিরোধ রয়েছে। যদি [ক্রেতার শর্তভিত্তিক খেয়ারের সুরতে উকিল কজা করার পর ক্রেতার খেয়ার অবশিষ্ট থাকে, প্রতিপক্ষের এ কথা] মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে বক্তব্য হলো, সে ক্ষেত্রে মুআক্কিল নিজেই তো পূর্ণ কজার অধিকার রাখে না। কারণ, পণ্য কজা করার দ্বারা তার খেয়ার রহিত হয় না। কারণ, খেয়ারের উদ্দেশ্যেই হলো [পণ্যকে] যাচাই করা, আর তা কজার পরেই হয়। অতএব তার উকিলও পূর্ণ কজার ক্ষমতা রাখে না। বার্তাবাহকের বিষয়টিও ভিন্ন। কারণ, সে কোনো কজারই অধিকার রাখে না। তার কাজ হলো শুধু সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। এ কারণেই সে যখন বিক্রয়চুক্তিতে বার্তাবাহক হয়, তখন সে কজা ও অর্পণ কোনোটারই অধিকার রাখে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفَقَةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) কজা দু প্রকার কেন তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, কজা পূর্ণ হওয়া বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয়, তাহলে কজাও পূর্ণ হবে। যদি চুক্তি অপূর্ণ হয়, তাহলে কজাও অপূর্ণ হবে। কারণ, এটা স্বীকৃত যে, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারে রূপান্তর থাকলে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয় না। অতএব, ক্রেতা যখন পণ্য দেখে কজা করল তখন পণ্য দেখার কারণে তার খেয়ারে রূপান্তর রহিত হয়ে গেল। যখন খেয়ারে রূপান্তর রহিত হয়ে গেল, তখন চুক্তিও পূর্ণ হয়ে গেল। আর যখন চুক্তি পূর্ণ হলো, তখন ক্রেতার কজাও পূর্ণ হলো।

আর যখন ক্রেতা না দেখে পণ্য কজা করল, তখন যেহেতু খেয়ারে রুমত রহিত হয়নি তাই চুক্তিও পূর্ণ হয়নি। আর চুক্তি পূর্ণ না হলে ক্রেতার কজাও পূর্ণ হয় না।

الْمُزَكَّلِ : সাহেবাইন (র.)-এর মতের পক্ষ যে তিনটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, গ্রহকার (র.) ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে তার উত্তর দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কজার উকিল যেহেতু উভয় প্রকার কজার মালিক, তাই যখন সে শুণ্ড অবস্থায় (مُزَكَّلٍ) পণ্যটি কজা করল তখন অপূর্ণ কজার মাধ্যমে তার ওকালতি শেষ হয়ে গেল। যখন ওকালতি শেষ হয়ে গেল, তখন ক্রেতার বিষয়াদিতে সে অপরিচিত ব্যক্তির মতো। আর অপরিচিত কোনো ব্যক্তি ক্রেতার খেয়ারে রুমত রহিত করার অধিকার রাখে না। তাই পণ্য না দেখে কজা করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে উকিল খেয়ার রহিত করলেও ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না।

الْمُزَكَّلِ : গ্রহকার (র.) প্রথম উদাহরণ সম্পর্কে বলেন, খেয়ারে রুমতকে খেয়ারে আইবের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ, খেয়ারে আইব বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হওয়াতে বাধ্য দেয় না। অর্থাৎ খেয়ারে আইব থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায়। আর চুক্তি যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন খেয়ারে আইব থাকা সত্ত্বেও কজা পূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ খেয়ারে রুমত থাকা অবস্থায় কজা পূর্ণ হয় না। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে খেয়ারে রুমতকে খেয়ারে আইবের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

الْمُزَكَّلِ : গ্রহকার (র.) দ্বিতীয় উদাহরণ সম্পর্কে বলেন, খেয়ারে শর্তের উপর খেয়ারে রুমতকে কিয়াস করাও শুদ্ধ নয়। কারণ, যার উপর কিয়াস করা হবে (مُزَكَّلٍ) তা সর্বসম্মত বিষয় হতে হবে। কিন্তু ক্রেতার খেয়ারে শর্তের সুরতে কজার উকিল যদি পণ্য দেখে কজা করে, তাহলে ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে কিনা তাই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার খেয়ারে শর্ত রহিত হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে রহিত হবে না। যখন খেয়ারে শর্তের বিষয়টিই মতবিরোধপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হলো, তখন এর দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর মতের পক্ষে সমর্থন কিভাবে হয়?

আর যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয় যে, কজার উকিলের দেখে কজা করার দ্বারা সর্বসম্মতভাবে ক্রেতার খেয়ারে শর্ত রহিত হয় না, তাহলে আমাদের বক্তব্য হলো, উকিল সর্বদা মুআক্কিলের স্থলাভিষিক্ত হয়। আর খেয়ারে শর্তের সুরতে স্বয়ং ক্রেতা তথা মুআক্কিল পূর্ণ কজার অধিকারী নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ উকিল- সেও পূর্ণ কজার মালিক হবে না। অতএব মুআক্কিল (مُزَكَّلٍ) পণ্য দেখে কজা করলে যেকোন খেয়ারে শর্ত রহিত হয় না, তেমনি উকিল পণ্য দেখে কজা করলেও ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না। পক্ষান্তরে খেয়ারে রুমতের সুরতে মুআক্কিল উভয় কজার অধিকারী হয়। আর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উকিলও উভয় কজার অধিকারী হয়। তাই খেয়ারে রুমতকে খেয়ারে শর্তের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, ক্রেতার পণ্য কজা করার দ্বারা তার খেয়ারে শর্ত কেন রহিত হবে না? এর উত্তর হলো, খেয়ারে শর্তের বৈধতার উদ্দেশ্যই হলো ক্রেতাকে পণ্যের ভালোমন্দ যাচাই করার সুযোগ দেওয়া। আর ভালোমন্দ যাচাই হয় কজা করার পরেই। সুতরাং কজা করার দ্বারা যদি খেয়ার রহিত হয়ে যায়, তাহলে পণ্যের ভালোমন্দ তো যাচাই হলো না, বরং পণ্য ভালো হোক বা মন্দ হোক ক্রেতা নিতে বাধ্য থাকবে। আর এতে খেয়ারে শর্তের বৈধতার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তাই কজা করার দ্বারা ক্রেতার খেয়ারে শর্ত রহিত হয় না।

الْمُزَكَّلِ : সাহেবাইন (র.) উকিলকে দূতের উপর কিয়াস করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) উকিল ও দূতের মাঝে পার্থক্য করেছেন। এ পার্থক্যের কারণ হলো, উকিল মুআক্কিলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উভয় প্রকার কজার অধিকারী, কিন্তু দূত (رَسُولٍ) কোনো প্রকার কজার অধিকারী নয়। তার কাজ হলো শুধু সংবাদ পৌঁছানো। এ কারণেই কোনো ব্যক্তি যদি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে দূত হয়, তাহলে সে পণ্য কজারও অধিকার রাখে না এবং মূল্য অর্পণেরও অধিকার রাখে না। উকিল ও দূত তথা রাসুলের এ পার্থক্যের কারণেই কুরআনুল কারীমে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানকে এভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে, قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِرَسُولٍ ! আমি তোমাদের উপর উকিল নই।" অথচ তিনি রাসুল ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হলো, উকিল ও রাসুলের অর্থ এক নয়। তাই উকিলকে রাসুলের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না।



قَالَ : وَيَبْعُ الْأَعْمَى وَبِئْرًا هُ جَانِزٌ، وَلَهُ الْخَبَارُ إِذَا اشْتَرَى، لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ يَسْقُطُ خِبَارُهُ بِجَسَدِ الْمَيْبَعِ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالْحَسَنِ وَبِشَيْءٍ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالسَّيِّئِ، وَيَذُوقُهُ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالدُّوقِ، كَمَا فِي النَّبْصِ وَلَا يَسْقُطُ خِبَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ، لِأَنَّ الْوَصْفَ يُقَامُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ كَمَا فِي السَّلَمِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانٍ لَوْ كَانَ بِصِيرًا لَرَأَاهُ، وَقَالَ : قَدْ رَضِيتُ ، سَقَطَ خِبَارُهُ، لِأَنَّ التَّشْبِيهَ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ، كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ يُقَامُ مَقَامَ الْفِرَاءِ وَفِي حَقِّ الْأَخْرِسِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِجْرَاءِ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلْقِي فِي حَقِّ مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ فِي الْحَجِّ، وَقَالَ الْحَسَنُ (رح) : يُوكَّلُ وَكَيْلًا يَقْبِضُهُ، وَهُوَ يَرَاهُ، وَهَذَا أَشْبَهَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، لِأَنَّ رُؤْيَا الْوَكِيلِ رُؤْيَا الْمُوَكَّلِ عَلَى مَا مَرَّ أَنْفًا .

অনুবাদ : অন্ধ ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ। যখন সে ক্রয় করবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, সে না-দেখা জিনিস ক্রয় করেছে। আর এ বিষয়টি আমরা পূর্বে স্থির করেছি। অতঃপর তার এখতিয়ার রহিত হবে স্পর্শ করার দ্বারা, যদি স্পর্শ করার দ্বারা পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারা, যদি ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারা পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, আর চোখে দেখার দ্বারা; যদি চোখে দেখার দ্বারা পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন- চক্ষুমানের ক্ষেত্রে। আর ভূমির ক্ষেত্রে ভূমির গুণাগুণ ও [পূর্ণ] বিবরণ তার সম্মুখে তুলে না ধরা পর্যন্ত তার এখতিয়ার রহিত হবে না। কারণ, গুণ বর্ণনা দেখার স্থলবর্তী হয়; যেমন- 'বাইয়ে সালামের' ক্ষেত্রে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন স্থানে দাঁড়ায়- চক্ষুমান হলে সে যেখানে থেকে দেখতে পেত এবং বলে যে, 'আমি সম্মত হলাম,' তাহলে তার এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কারণ, অপারগতার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যটাই মূলের স্থলবর্তী। যেমন- বোবা ব্যক্তির ব্যাপারে নামাজের ক্ষেত্রে ঠোট নাড়ানো কেরাতের স্থলবর্তী ধরা হয় এবং চুলবিহীন ব্যক্তির ব্যাপারে হজের ক্ষেত্রে মাথা ক্ষুর টেনে নেওয়াকে মাথা মুণানোর স্থলবর্তী ধরা হয়। ইমাম হাসান (র.) বলেন, অন্ধ ব্যক্তি এমন একজন উকিল নিযুক্ত করবে যে দেখে তা কজা করবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, একটু আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, [তার মতে] উকিলের দেখাই মুআকিলের দেখা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَبْعُ الْأَعْمَى وَبِئْرًا هُ جَانِزٌ : অন্ধ ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম শাফেরী (র.)ও এ মত পোষণ করেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত হলো, জন্মান্ন ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ নেই। যদি বিক্রয়দাতার সময় অন্ধ হয়, কিন্তু পূর্বে চক্ষুমান ছিল তাহলে তাঁর মতে এরূপ অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। -বিনায়া, শাওক, পৃ. ১৩২।

জন্মাক্ষ ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ নেই— এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, জন্মাক্ষ ব্যক্তির রং ও গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাই তার সামনে পণ্যের গুণ বর্ণনা করা অর্থহীন। অতএব পণ্য তার কাছে অজ্ঞাত (مجهول)। আর অজ্ঞাত পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয় যেহেতু নাজায়েজ তাই অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো—

১. জন্মাক্ষ ও জন্ম পরবর্তী সময়ের অন্ধ উভয় প্রকার অন্ধের সাথেই লোকদের ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রচলন আছে এবং এ বিষয়ে কেউ কোনো আপত্তি উত্থাপন করে না। আর কোনো বিষয়ে মুসলমানদের সর্বসম্মত রায় [ইজমা] যেমন শরিয়তের দলিল, তেমনি আপত্তিহীন লোক-প্রচলনও শরিয়তের দলিল। অতএব জন্মাক্ষ ও জন্ম পরবর্তী সময়ের অন্ধ উভয়ের ক্রয় ও বিক্রয় বৈধ হবে।
২. তাছাড়া জন্মাক্ষ ব্যক্তি যদি নিজে ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার না রাখে, তাহলে সে অন্য কাউকে তার পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করারও অধিকার রাখবে না। কারণ, এটা স্বীকৃত নিয়ম যে, কেউ যদি নিজে কোনো বিষয়ের অধিকার ও ক্ষমতা না রাখে, তাহলে সে ঐ বিষয়ে অপর কাউকে অধিকার ও ক্ষমতা দান করতে পারে না। এ অবস্থায় জন্মাক্ষ ব্যক্তির যদি খাবারের প্রয়োজন হয় এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে তার নিজেরও কোনো জিনিস ক্রয় করার অনুমতি নেই এবং সে কাউকে উকিলও নিযুক্ত করতে না পারে, তাহলে সে তো না খেয়েই মারা যাবে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই জন্মাক্ষ ব্যক্তি ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى، لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ الْغ: অন্ধ ব্যক্তি কোনো জিনিস ক্রয় করলে সে খেয়ারে রুয়ত লাভ করবে। কারণ, পূর্বেক্ত হাদীসে আছে, কেউ যদি না দেখা পণ্য ক্রয় করে, তাহলে সে দেখার পর এখতিয়ার পাবে। অন্ধ ঐ চক্ষুমান ব্যক্তির মতো যে না দেখা পণ্য ক্রয় করে। সুতরাং চক্ষুমান ব্যক্তি না দেখে পণ্য ক্রয় করলে যেক্রপ খেয়ারে রুয়ত পায় তেমনি অন্ধ ব্যক্তিও খেয়ারে রুয়ত পাবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجِسْمِهِ النَّبِيْعِ إِذَا كَانِ الْغ:

অন্ধ ব্যক্তির খেয়ারে রুয়ত কখন রহিত হবে? এ প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ্য যে, চোখের দেখা ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও বহু পণ্যের ভালোমন্দ ও গুণাগুণ নির্ণয় করা যায়। এটা চক্ষুমান ব্যক্তি যেক্রপ নির্ণয় করতে পারে তদ্রূপ অন্ধ ব্যক্তিও নির্ণয় করতে পারে। চক্ষুমান ব্যক্তি ক্রয়কালে চোখে দেখা ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পণ্যের ভালোমন্দ ও গুণাগুণ যাচাই করে থাকলে যেক্রপ তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যায়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তিও ক্রয়কালে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এ ধরনের পণ্যের ভালোমন্দ যাচাই করে থাকলে তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যাবে। অতএব যদি পণ্য এমন হয় যে, স্পর্শ করা দ্বারা তার মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, যেমন— মুরগি, ছাগল ইত্যাদি, তাহলে ক্রয়কালে অন্ধ ব্যক্তি তা স্পর্শ করে থাকলে তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যাবে। যদি দ্রাণ নেওয়ার দ্বারা পণ্যের মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, যেমন— সুগন্ধি ও আতর, তাহলে দ্রাণ নিয়ে থাকলে তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যাবে। যদি চোখে দেখার দ্বারা পণ্যের মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, যেমন— মধু, দুধ, ঘি ইত্যাদি, তাহলে ক্রয়কালে তা চোখে দেখে থাকলে তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যাবে। যদি দেখা ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পণ্যের ভালোমন্দ ও স্বরূপ বুঝা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে পণ্যের গুণ (وَصْف) বর্ণনাকে দেখার স্থলবর্তী ধরা হবে এবং ক্রয়কালে অন্ধ ব্যক্তির কাছে পণ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরে থাকলে তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যাবে।

আবুল লাইস (র.) রচিত শরহে জামেউস সগীর গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পণ্যের ভালোমন্দ ও স্বরূপ স্পর্শ করা, দ্রাণ নেওয়া কিংবা চোখে দেখার দ্বারা বুঝা সম্ভব হলেও অন্ধ ব্যক্তির খেয়ারে রুয়ত হওয়ার জন্য গুণ বর্ণনা বিবেচ্য হবে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে স্পর্শ করা বা দ্রাণ নেওয়া কিংবা চোখে দেখার দ্বারা পণ্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। যেমন— গাছের ফল।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَفُتُ خِيَارَهُ فِي الْعَفَاةِ عَلَى يَوْمِكَ لَمْ يَنْجُ : যদি অন্ধ ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, যেমন- ভূমি, গাছ, বাড়ি, তাহলে তার পূর্ণ বিবরণ তার সম্মুখে তুলে না ধরা পর্যন্ত তার এখতিয়ার রহিত হবে না। যদি ক্রয়কালে পূর্ণ বিবরণ তার সম্মুখে তুলে ধরা হয় এবং তাতে সম্মত হয়ে সে তা ক্রয় করে, তাহলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। কারণ, শরিয়তে গুণ বর্ণনাকে দেখার স্থলবত্তী ধরা হয়। যেমন- بَيْعَ كَلَمٍ -এর ক্ষেত্রে চুক্তিকালে দাদন-দ্রব্যের স্থলে অপারগতা হেতু তার গুণ বর্ণনা করা হয়। কারণ, দাদন-দ্রব্য চুক্তিকালে অস্তিত্বহীন হয়। আর এ অপারগতা অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরো বেশি। কারণ, দাদন-দ্রব্যকে দেখা সম্ভব, কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে আরো বেশি যৌক্তিকতাবেই গুণ বর্ণনা দেখার স্থলবত্তী হবে।

وَعَنْ أَبِي يُونُسَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) إِذَا وَقَعَ فِي مَكَانٍ الْخَبْرُ : ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যদি অন্ধ ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, যেমন- জমি, বাড়ি এবং ক্রয়কালে এমন স্থানে দাঁড়ায় যেখান থেকে সে চক্ষুস্থান হলে ঐ জমি ও বাড়ি দেখতে পেত এবং বলে যে, আমি ক্রয়ে সম্মত হলাম, তাহলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। কারণ, অপারগতার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে মূলের স্থলবত্তী ধরা হয়। অন্ধ ব্যক্তি দেখতে অপারগ, তাই দেখার সাদৃশ্যকে দেখার স্থলবত্তী ধরা হবে। যেমন- বোবা ব্যক্তি নামাজে কেরাত পড়তে অপারগ, তাই কেরাত পড়ার সাদৃশ্য তথা মুখ নাড়ানোকে কেরাতের স্থলবত্তী ধরা হয়েছে। চুলবিহীন ব্যক্তি চুল মুগুণতে অপারগ, তাই চুল মুগুনোর সাদৃশ্য তথা মাথায় ক্ষুর টেনে নেওয়াকে হজের ক্ষেত্রে মুগুনোর স্থলবত্তী ধরা হয়েছে।

أَلْتَمَأَ إِبْنُ عِصْمٍ (ر.) بَلَنَ، أَوْ بَرْنَانًا يَهْ دُورْلَ تَا سُمْسُطُ : কারণ, অপারগতা তখন সাব্যস্ত হয়, যখন মূলের বিকল্প কিছু থাকে না। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখার বিকল্প আছে। তা হলো, পণ্যের গুণ বর্ণনা। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া ও চেখে দেখার পরিবর্তে গুণ বর্ণনাকে দেখার স্থলবত্তী বিবেচনা করার বর্ণনাও আছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) وَكَيْلًا بِفَيْضِهِ وَهُوَ بَرُّ الْخَبْرُ : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, অন্ধ ব্যক্তি তার পক্ষে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কজা করার জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করবে। এ উকিল দেখে কজা করলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

عَبْدُكَار (ر.) বলেন, এ মতটি ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, পূর্বোক্ত মাসআলায় গেছে যে, তিনি মুআক্কিলের দেখা ও উকিলের দেখাকে এক মনে করেন। মুআক্কিল দেখে কজা করলে যেক্ষণ তার খেয়ার রহিত হয়ে যায় তেমন উকিল দেখে কজা করলেও তার খেয়ার রহিত হয়ে যায়। তাই চক্ষুস্থান ব্যক্তির মতো অন্ধ ব্যক্তির উকিল দেখে কজা করলে অন্ধ ব্যক্তির খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

ফায়দা : অন্ধ ব্যক্তির সম্মুখে বিক্রয়কালে পণ্যের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং তাতে সম্মত হয়ে সে পণ্য ক্রয় করেছে, এরপর যদি সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তাহলে তার খেয়ার অর্জিত হবে না। কারণ, তার খেয়ার রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা প্রত্যাবর্তিত হবে না।

যদি চক্ষুস্থান ব্যক্তি না দেখা পণ্য ক্রয় করে, এরপর অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার এখতিয়ার গুণ বর্ণনায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ، ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ جَارَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا ، لِأَنَّ رُؤْيَهُ أَحَدَهُمَا لَا تَكُونُ رُؤْيَا الْآخَرِ لِلتَّفَاوُتِ فِي السَّيَابِ ، فَبَقِيَ الْخَبَارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ ، ثُمَّ لَا يَرُدُّهُ وَخَذَهُ بَلْ يَرُدُّهُمَا كَيْلًا يَكُونُ تَفْرِيقًا لِلصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الصَّفَقَةَ لَا تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ দুটি কাপড়ের একটি দেখে অতঃপর দুটিই ক্রয় করে, এরপর অপরটি দেখে, তাহলে তার জন্য উভয়টি ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে। কেননা, কাপড়ের তারতম্যের কারণে দুটির একটি দেখায় অপরটির দেখা হয় না। সুতরাং যেটা দেখিনি তাতে এখতিয়ার থাকবে। অতঃপর তা এককভাবে ফেরত দিতে পারবে না; বরং উভয়টাকে ফেরত দেবে, যাতে ফেরত দেওয়াটা বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তির জন্য বিভক্তকারী না হয়। আর তা এজন্য যে, কজা করা হোক বা না হোক দেখার এখতিয়ার থাকা অবস্থায় চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না। এ কারণেই বিচারকের রায় ও বিক্রেতার সম্মতি ছাড়াই [না দেখা পণ্য দেখার পর] ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকে; সুতরাং বিক্রয়চুক্তি মূল হতে রহিত বলে গণ্য হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলাটির বিবরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি ভিন্ন মানের দুটি থান কাপড়ের একটি দেখে কিংবা দুটি রেডিমেট জামার একটি দেখে অতঃপর দুটিই ক্রয় করে, এরপর অপরটি দেখে, তাহলে যে থানটি/ জামাটি ক্রয়কালে দেখিনি তাতে সে খেয়ারে রুমত লাভ করবে। তবে খেয়ারের ভিত্তিতে যদি ক্রয়কালে কেবল না দেখা কাপড়টি ফেরত দিতে চায়, তাহলে তা তার জন্য জায়েজ হবে না; বরং ফেরত দিতে চাইলে উভয়টি ফেরত দিতে হবে।

ক্রয়কালে না দেখা কাপড়টি দেখার পর ক্রেতা যে এখতিয়ার লাভ করবে তার দলিল হলো, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যদি পণ্যের সংখ্যা একাধিক হয় এবং সবগুলো এক জাতীয়, তবে একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয়, তাহলে বিক্রীত-পণ্যের একটিকে দেখা অবশিষ্টগুলোর জন্য দেখা হবে না; বরং প্রতিটিকে দেখা আবশ্যক। যদি কোনো একটি না দেখে, তাহলে তা দেখার পর ক্রেতা খেয়ারে রুমত লাভ করবে। এ মূলনীতি অনুযায়ী আলাচ্য মাসআলায় কাপড়ের একটি থান বা একটি জামা দেখায় অপর থান/ জামাটি দেখেছে বলে গণ্য হবে না। কেননা, মূল্যের দিক থেকে একটি থান/জামার সাথে অপরটির অনেক তারতম্য হয়। তাই ক্রেতা যে থান/জামাটি ক্রয়কালে দেখিনি তা দেখার পর খেয়ারে রুমত লাভ করবে।

খেয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দিতে চাইলে উভয়টি ফেরত দিতে হবে— এর দলিল হলো, আমরা পূর্বে জেনেছি যে, পণ্য কজা করা হোক বা না হোক খেয়ারে রুমত থাকা অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি (صَفَقَةٌ) পূর্ণ হয় না। যদি খেয়ারের ভিত্তিতে একটি থান/জামা ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা লাভের আগেই চুক্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। আর পূর্ণতা লাভের আগে বিক্রয়চুক্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করা (تَفْرِيقُ الصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ) জায়েজ নেই। অতএব দুটি থান/জামার একটিকে ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না!

وَلِهَذَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرَّذِّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، وَلَا رِضَاءٍ، وَيَكُونُ فَسْحًا مِنَ الْأَصْلِ وَمِنْ مَاتَ، وَلَهُ خِبَارُ الرُّؤْيَةِ بَطْلَ خِبَارِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الْإِثْرُ عِنْدَنَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي خِبَارِ الشَّرْطِ وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَأَاهُ فَلَا خِبَارَ لَهُ، لِأَنَّ الْعِلْمَ بِأَوْصَافِهِ حَاصِلٌ لَهُ بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ، وَفِرَاتِهِ يَثْبُتُ الْخِبَارُ، إِلَّا إِذَا كَبَانَ لَا يَعْلَمُهُ مَرْئِيَّةٌ لِعَدَمِ الرِّضَاءِ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِبَارُ، لِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةَ لَمْ تَقَعْ مُعْلِمَةً بِأَوْصَافِهِ، فَكَانَتْ لَمْ يَرَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغْيِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، لِأَنَّ التَّغْيِيرَ حَادِثٌ، وَسَبَبُ الْلُزُومِ ظَاهِرٌ، إِلَّا إِذَا بَعُدَتِ الْمُدَّةُ عَلَى مَا قَالُوا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمُشْتَرِي، بِخِلَافِ مَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرُّؤْيَةِ، لِأَنَّهَا أَمْرٌ حَادِثٌ، وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهُ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ.

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে অথচ তার দেখার এখতিয়ার ছিল, তাহলে তার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, আমাদের মতে দেখার এখতিয়ারে উত্তরাধিকার জারি হয় না। এ বিষয়টি আমরা খেয়ারে শর্তের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। যদি কেউ কোনো জিনিস দেখে অতঃপর কিছুকাল পরে তা ক্রয় করে— যদি জিনিসটি যে রকম দেখেছিল সে রকমই থাকে, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে না। কারণ, পূর্বের দেখার দ্বারা পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে তার অবগতি অর্জিত হয়েছে। অবগতি না থাকার ক্ষেত্রেই এখতিয়ার সাব্যস্ত হয়। তবে পণ্যাটিকে পূর্বের দেখা জিনিস বলে যদি চিনতে না পারে, [তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে]। কারণ, এর প্রতি সম্মতি নেই। যদি সে পণ্যাটিকে পরিবর্তিত পায়, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, পূর্বের দেখাটা পণ্যের বর্তমান গুণাগুণ সম্পর্কে অবগতি দান করেনি। সুতরাং সে যেন তা [পূর্বে] দেখেনি। যদি পরিবর্তন সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হয়, তাহলে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, পরিবর্তন হলো নতুন বিষয়। আর বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ স্পষ্ট। [আর যে স্পষ্ট বিষয়কে ব্যক্ত করে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।] তবে ফিক্‌হবিদগণের বক্তব্য অনুযায়ী সময়ের ব্যবধান বেশি হলে [ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে]। কারণ, বাহ্যিক অবস্থা ক্রেতার পক্ষে সাক্ষী। [আর বাহ্যিক অবস্থা যার পক্ষে সাক্ষী হয় তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।] অবশ্য দেখার বিষয়ে মতবিরোধ হলে ভিন্ন কথা। কারণ, দেখা একটি নতুন বিষয়। ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। [আর যে অস্বীকার করে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।] সুতরাং ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرَّذِّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ الخ : যেহেতু খেয়ারে ক্রয়ত থাকা অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয় না, তাই খেয়ারের ভিত্তিতে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে চাইলে বিচারকের রায় কিংবা বিক্রেতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। ক্রেতার পণ্য ফেরত দেওয়াটা মূল থেকে ফসখ হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ যেন বিক্রয়চুক্তিই হয়নি। কারণ, পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত

হওয়ার কারণে ক্রেতার সম্মতি পাওয়া যায়নি। আর ক্রেতার সম্মতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় সংগঠিত হয় না। তাই এ সূরতে যেন বিক্রয়চুক্তিই হয়নি।

আহনাফের মতে খেয়ারে রুম্যতের মাঝে উত্তরাধিকার জারি হয় না। কারণ, তা একটি ইচ্ছা মাত্র। আর এক ব্যক্তির ইচ্ছা অপূরণ ব্যক্তির মাঝে স্থানান্তরিত হয় না। তাই যার খেয়ারে রুম্যত ছিল এমন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে খেয়ারে রুম্যতের মাঝে উত্তরাধিকার জারি হয়। এ বিষয়টি খেয়ারে শর্ত পরিলক্ষ্যেই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مَدَّةٍ فَإِنْ كَانَ الْخ: যদি কেউ কোনো দ্রব্য দেখে এবং বেশ কিছুদিন পর তা ক্রয় করে- ক্রয়ের পর দ্রব্যটিকে পূর্বে যেমন দেখেছিল তেমনই পায়, তাহলে তার খেয়ারে রুম্যত থাকবে না। কারণ, ক্রয়কালে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার অবগতি না থাকলে খেয়ারে রুম্যত সাব্যস্ত হয়। আর আলোচ্য মাসআলায় পূর্বের দেখা দ্বারা ই পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার অবগতি অর্জিত হয়েছে, তাই সে এখতিয়ার পাবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ مَرْبِيَّتُهُ لِعَدَمِ الرِّضَا بِهِ: তবে ক্রয়কালে পণ্যটিকে পূর্বের দেখা জিনিস বলে যদি ক্রেতা চিনতে না পারে, উদাহরণত ক্রেতা অনেক দিন আগে একটি কাপড় দেখেছে, কিন্তু তখন কাপড়টি সে ক্রয় করেনি। এখন যখন ক্রয় করেছে তখন কাপড়টি ভাঁজ করা ছিল, তাই সে তা দেখতে পায়নি, এ সূরতে ক্রেতা কাপড়টি দেখার পর খেয়ারে রুম্যত লাভ করবে। কারণ, পূর্বের দেখা বলে চেনার পর যদি ক্রেতা পণ্যটি ক্রয় করত, তাহলে সে সম্মত হয়ে ক্রয় করছে বলে প্রমাণিত হতো। কিন্তু সে যেহেতু চিনেনি তাই পণ্যটির প্রতি তার সম্মতি পাওয়া যায়নি। অতএব তার খেয়ারে রুম্যত থাকবে।

-বিনায়া, শ্রাওক্ত, পৃ. ১৩৫।

قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ الْخ: যদি পূর্বের দেখা পণ্যটিকে ক্রয়ের পর ক্রেতা পরিবর্তিত পায়, তাহলে তার খেয়ার থাকবে। কারণ, পূর্বের দেখাটা পণ্যের বর্তমান গুণাগুণ সম্পর্কে তাকে অবগতি দান করেনি। সুতরাং সে যেন দেখেনি। আর না-দেখা পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতা দেখার পর খেয়ারে রুম্যত লাভ করে। তাই এ সূরতে ক্রেতা খেয়ার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي التَّغْيِيرِ فَالْفَرْقُ قَوْلُ الْبَانِعِ الْخ: পণ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হয়, যেমন- ক্রেতা বলল, আমি পণ্যটি পূর্বে যে রকম দেখেছি এখন সে রকম নেই; পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর বিক্রেতা বলল, পরিবর্তিত হয়নি; পূর্বে যে রকম ছিল এখনও সে রকমই আছে, তাহলে বিক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, পণ্যের আসল হলো পরিবর্তিত না হওয়া। পরিবর্তন হওয়াটা নতুন সৃষ্ট বিষয়। আর ক্রেতা এর দাবি করছে। তাছাড়া বাস্তবতা (طَافِرٌ) হলো, পূর্ববর্তী দেখার কারণে বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরপর ক্রেতা পণ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে প্রকাশ্যেই বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হয়নি বলে বাস্তবতার বিপরীত দাবি করছে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা বাদী (مُدْعَى) আর বিক্রেতা বিবাদী (مُدْعَى عَلَيْهِ) ও ক্রেতার দাবি অস্বীকারকারী (مُنْكَرٌ) শরিয়তের স্বীকৃত নিয়ম হলো, যদি বাদী তার দাবির পক্ষে দলিল পেশ করতে না পারে, তাহলে বিবাদীর কথা কসমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয় (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) তাই আলোচ্য মাসআলায় বিক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হবে।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا بَعْدَتْ الْمُدَّةُ عَلَى مَا قَالُوا الْخ: তবে দেখার সময়ের ব্যবধান যদি বেশি হয়; উদাহরণত ক্রেতা বিশ বছর আগে একটি বাদিকে দেখেছিল, এখন বিশ বছর পর এসে তাকে ক্রয় করল। বিক্রেতা ধারণা করল যে, এ বিশ বছরে রূপ-লাবণ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি, কিন্তু ক্রেতার ধারণায় পরিবর্তন এসেছে, তাহলে মুতাআখিখরীন ফিক্‌হবিদগণের মতে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পণ্য পরিবর্তন হতে পারে। তাই বাস্তবতা (طَافِرٌ) ক্রেতার কথার পক্ষে সাক্ষী। আর বাস্তবতা যার পক্ষে সাক্ষী হয় তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়। তাই ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। শামসুল আইয়া আস-সারাহসী (র.)-এর সমর্থন এ অভিমতের দিকেই। সদরুশ শহীদ এবং জহীরুদ্দীন মারগিনানী (র.) এ অভিমতের উপর ফাতওয়া দান করেছেন। -প্রাওক্ত, পৃ. ১৩৬।

قَوْلُهُ بِغِلَابٍ مَا إِذَا اخْتَلَفَ فِي الرُّبُيَّةِ لِبُتْنِ الْخ: যদি ক্রেতা পূর্বে দেখেছে কিনা এ বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হয়; ক্রেতা বলল, আমি পণ্যটি দেখিনি, বিক্রেতা বলল, তুমি দেখেছ, তাহলে ক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হবে। কারণ, পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অবগতি না থাকটা আসল ও বাস্তব (طَافِرٌ)। বিক্রেতা দেখার মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার অবগত হওয়ার দাবি করছে। আর এটা নতুন ও বাস্তবতার বিপরীত বিষয়। ক্রেতা এ দাবিকে অস্বীকার করছে। আর যে অস্বীকার করে তার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হয়। তাই ক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَدْلَ زُطِّي وَلَمْ يَرَهُ ، فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَاسْلَمَهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا مِنْ عَيْنٍ ، وَكَذَلِكَ خِيَارُ الشَّرْطِ ، لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ الرَّدُّ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ، وَفِي رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيقُ الصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ، لِأَنَّ خِيَارَ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْنِ ، لِأَنَّ الصَّفَقَةَ تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الْعَيْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ ، وَفِيهِ وَضْعُ الْمَسْئَلَةِ ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسَنَحْ ، فَهُوَ عَلَى خِيَارِ الرُّوْيَةِ ، كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ السَّرْحَسِيُّ (رح)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُّ .

অনুবাদ : কেউ যদি না দেখে 'যুত্বী' কাপড়ের একটি গাঁইট ক্রয় করে, তারপর তা থেকে একটি কাপড় বিক্রি করে অথবা তা [কাউকে] হেবা করে এবং অর্পণ করে, তাহলে দোষের কারণ ছাড়া কোনো কাপড় ফেরত দিতে পারবে না। তদ্রূপ খেয়ারে শর্তের বেলায়ও। কারণ, যে কাপড়টি ক্রেতার মালিকানা থেকে বেরিয়ে গেছে তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব। আর অবশিষ্টগুলো ফেরত দেওয়ায় পূর্ণতা লাভের আগেই বিক্রয়চুক্তি বিভক্ত হয়ে যায়। কারণ, খেয়ারে রুমত [দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার] ও খেয়ারে শর্ত [শর্তভিত্তিক এখতিয়ার] বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা লাভে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু খেয়ারে আইব [দোষজনিত খেয়ার]-এর বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, খেয়ারে আইব থাকা সত্ত্বেও কজার পরে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে; যদিও কজার আগে পূর্ণতা লাভ করে না। আর কজাকৃত পণ্যের ব্যাপারেই উপরিউক্ত মাসআলা। তারপর ক্রেতার কাছে যদি ঐ কাপড়টি ফিরে আসে এমন কোনো কারণে যা চুক্তি বিলোপ বলে মনে হয়, তাহলে তার খেয়ারে রুমত বহাল থাকবে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, খেয়ারে শর্তের মতো খেয়ারে রুমত একবার রহিত হওয়ার পর প্রত্যাবর্তিত হয় না। ইমাম কুদরী (র.) এর উপরই নির্ভর করেছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'যুত্ব' (زُطٌّ) ইরাকের বা মতান্তরে হিন্দুস্তানের একটি সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের প্রস্তুতকৃত কাপড়কে 'যুত্বী' বলা হতো। মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি 'যুত্বী' কাপড়ের একটি গাঁইট ক্রয় করল, ক্রয়কালে বা ক্রয়ের আগে কাপড়গুলো সে দেখেনি, কাপড়গুলো কজা করার পর একটি কাপড় কারো কাছে বিক্রি করল বা কাউকে হাদিয়া দিল এবং তা তাকে অর্পণও করল, এরপর সে কাপড়গুলো দেখল, তাহলে খেয়ারে রুমতের ভিত্তিতে সে অবশিষ্ট কাপড়গুলো ফেরত দিতে পারবে না। তবে অবশিষ্ট কাপড়গুলো দোষগ্রস্ত হলে 'খেয়ারে আইব' [দোষজনিত এখতিয়ার]-এর ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে।

তদ্রূপ কেউ যদি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি কাপড়ের গাঁইট ক্রয় করে এবং কজা করার পর তা থেকে একটি কাপড় কারো কাছে বিক্রি করে কিংবা কাউকে হাদিয়া দেয় এবং তা তাকে অর্পণও করে, তাহলে খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে অবশিষ্ট কাপড়গুলো সে ফেরত দিতে পারবে না।

এর দলিল হলো, যে কাপড়টি ক্রেতা বিক্রি করেছে বা কাউকে হাদিয়া দিয়েছে তা তার মালিকানা থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই খেয়ারে রুমত বা শর্তভিত্তিক একতিয়ারে এ কাপড়টি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, অবশিষ্টগুলো ফেরত দিতে পারে, কিন্তু খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুমত থাকা অবস্থায় পণ্য কজা করলেও যেহেতু চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না, তাই অবশিষ্টগুলো— উদাহরণত দশটি কাপড়ের নয়টি ফেরত দিতে গেলে পূর্ণতার আগে বিক্রয়চুক্তিতে বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়। আর মূলনীতি হলো, পূর্ণতা লাভের পূর্বে বিক্রয়চুক্তিতে বিভক্তি সৃষ্টি করা (تَفْرِيقُ الصَّنْفَةِ قَبْلَ التَّكْمِلِ) জায়েজ নেই। তাই অবশিষ্ট কাপড়গুলোও ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই।

তবে খেয়ারে আইবের সুরতে খেয়ারে আইব থাকা অবস্থায় যদিও কজা করার আগে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না কিন্তু কজা করার পর যেহেতু চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে, আর পূর্ণতা লাভের পর চুক্তিতে বিভক্তি সৃষ্টি করা জায়েজ আছে, তাই খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে অবশিষ্ট কাপড়গুলো ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ فَلَزَّ عَادَ إِلَيَّ بِسَبِّ هُوَ نَسَخَ فَهُوَ عَلَى الْخِ: যদি বিক্রি করা বা হাদিয়া দেওয়া কাপড়টি ক্রেতার কাছে চুক্তি বিলোপ (نَسَخَ) বলে সাব্যস্ত এমন কোনো কারণে ফেরত আসে; উদাহরণত দোষের কারণে দ্বিতীয় ক্রেতা বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম ক্রেতার কাছে ফেরত দেয় কিংবা ক্রেতা হাদিয়া ফেরত নিয়ে নেয়, তাহলে সে খেয়ারে রুমত ফিরে পাবে। কারণ, বিক্রি করা বা হাদিয়া দেওয়া কাপড়টিতে এখন তার মালিকানা ফিরে এসেছে। তাই খেয়ারে রুমতের ভিত্তিতে সবগুলো কাপড় ফেরত দেওয়া সম্ভব। ফলে পূর্ণতার আগে বিক্রয়চুক্তিতে বিভক্তি হচ্ছে না। শামসুল আইখা সারাখসী (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُونُسَ (رَحَا) أَنَّهُ لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ الْخِ: ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে আলী ইবনুল জাদ বর্ণনা করেন যে, খেয়ারে শর্তের সুরতে পণ্য বিক্রি করা বা হাদিয়া দেওয়ার পর তিন দিনের ভিতরে চুক্তি বিলোপ (نَسَخَ) বলে সাব্যস্ত এমন কোনো কারণে ক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত আসলে যেসকল ক্রেতা খেয়ারে শর্ত ফিরে পায় না, তেমনই আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা খেয়ারে রুমত ফিরে পাবে না। কারণ, যা একবার রহিত হয়ে যায় তা ফিরে আসে না। কাযীখান এ মতকে বিপ্লব বলেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) এ মতের উপরই নির্ভর করেছেন।



## بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

وَإِذَا أَطْلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَفْتَضِلُ وَضْفَ السَّلَامَةِ، فَعِنْدَ قَوَائِمِ بَتَّخِيرٍ، كَيْلًا يَتَضَرَّرَ بِلُزُومِ مَا لَا يَرْضَى، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ التُّفْصَانَ، لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقْلٍ مِنَ الْمُسْمَى، فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَدَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي مُمَكِّنٌ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَضَرُّرِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَيْعِ، وَلَا عِنْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ ذَلِكَ رِضًا بِهِ.

### পরিচ্ছেদ : দোষজনিত এখতিয়ার

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন] যদি ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে- চাইলে সে তা পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, চাইলে তা ফেরত দেবে। কারণ, শর্তহীন চুক্তি [পণ্য] দোষমুক্ত হওয়ার দাবি করে। সুতরাং তার অবিদ্যমানতায় ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করবে। যাতে যে বিষয়ে ক্রেতা সন্মত নয় তা গ্রহণে বাধ্য হওয়ার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর ক্রেতার এ অধিকার নেই যে, সে দোষগ্রস্ত পণ্যটি [তার কাছে] রেখে দেবে এবং [বিক্রেতার কাছ থেকে] ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। কারণ, সাধারণ চুক্তিতে গুণাবলির বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া বিক্রেতা বিক্রীত-পণ্যকে নির্ধারিত মূল্যের কমে তার মালিকানা থেকে ত্যাগ করতে সন্মত হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর বিক্রেতার ক্ষতি করা ছাড়াই বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিয়ে ক্রেতার ক্ষতি দূর করা সম্ভব। ইমাম কুদূরী (র.)-এর উল্লেখকৃত 'দোষ' দ্বারা এ দোষ উদ্দেশ্য যা [পণ্যটি] বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল, কিন্তু ক্রেতা ক্রয়কালেও তা দেখেনি এবং কজা করার সময়ও দেখেনি। কারণ, ক্রয়কালে বা ঝজার সময় দেখাটা তার প্রতি সন্মতির প্রমাণ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خِيَارٌ অর্থ- এখতিয়ার, ইচ্ছাধিকার, স্বাধীনতা। اَلْعَيْبُ অর্থ- দোষ, ত্রুটি। اَلْعَيْبُ শব্দের দিকে خِيَارٌ শব্দটির ইয়াফত (إِصَانَةٌ) হয়েছে। একদম ইয়াফতকে اِلِى سَبَبِ اِلِى اِلِى اِلِى اِلِى اِلِى বলা হয়। خِيَارُ الْعَيْبِ অর্থ হচ্ছে- 'خِيَارٌ يَنْبُتُ' 'দোষের কারণে সাব্যস্ত ইচ্ছাধিকার'। শরিয়তের পরিভাষায় পণ্যের দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর ক্রেতার এ পণ্যটি রাখা/ না রাখার শরিয়ত প্রদত্ত এখতিয়ারকে 'খেয়ারে আইব' বলে।

মানুষ নিজের প্রয়োজনে দেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণত সকল ক্রেতার প্রত্যাশা থাকে তার ক্রয়কৃত পণ্যটি নির্দোষ হবে, নিষ্পত্ত ও ক্রটিমুক্ত হবে। তাছাড়া নির্দোষ পণ্য বলেই ক্রেতা ক্রয়ে সম্মত হয়। কিন্তু অনেক সময় বিক্রেতার প্রতারণার শিকার হয়ে কিংবা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অজান্তে দোষগ্রস্ত পণ্য ক্রেতার কাছে এসে পড়ে। অথচ দোষগ্রস্ত পণ্যে ক্রেতার সম্মতি নেই। আর ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যিক। তাছাড়া দোষগ্রস্ত পণ্যটি ফেরত দিয়ে দোষমুক্ত পণ্য পাওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার অধিকারকে যদি নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্রেতার দোষমুক্ত পণ্য পাওয়ার অধিকার রক্ষা ও তাকে ক্ষতির হাত থেকে বাচানোর উপায় হিসেবে শরিয়ত খেয়ারে আইবের বিধান দিয়েছে। এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা একটি পণ্য ক্রয় করেছে এবং ক্রয়কালে বিক্রেতা সর্বপ্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দেয়নি। পণ্যটি কজা করার পর ক্রেতা তাতে দোষ পেল, এ দোষটি কজার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়নি, তাহলে ক্রেতা এ পণ্যটি রাখা/না রাখার এখতিয়ার লাভ করবে। যদি রাখে তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে রাখবে, আর যদি ফেরত দেয়, তাও তার জন্য জায়েজ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন ফারগানী (র.) খেয়ারে আইবের আলোচনাকে খেয়ারসমূহের আলোচনার সবশেষে কেন এনেছেন তা খেয়ারে ক্রয়তের আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

খেয়ারে আইবের বিধান হলো, خَبَارُ الْمَيْبِ مَانِعٌ يَنْتَعِ لَزُومِ الْحُكْمِ بَعْدَ نُبُوءِهِ বিক্রয়চুক্তির হুকুম পূর্ণাঙ্গভাবে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তা অনিবার্য হয় না। অর্থাৎ খেয়ারে আইব থাকা অবস্থায় ক্রেতা পণ্য কজা করলে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু বিক্রীত-পণ্যে তার মালিকানা বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত হয় না। সে ইচ্ছা করলে তা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে।

كَرْتُهُ وَإِذَا أَطْلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبِ الْخَبَرِ : ক্রেতা একটি পণ্য ক্রয় করল। পণ্যটি কজা করার পর ক্রেতা তাতে কোনো দোষ দেখতে পেল; এ দোষটি পণ্য কজা করার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়নি এবং কজা করার সময় ক্রেতা এ দোষ সম্পর্কে অবগতও ছিল না, আর ক্রয়কালে বিক্রেতা সর্বপ্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তির ঘোষণাও দেয়নি, তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করবে, সে পণ্যটি রাখতেও পারে, ফেরতও দিতে পারে। যদি রাখে তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে রাখবে, আর যদি ফেরত দেয়- তাও তার জন্য জায়েজ হবে। অবশ্য এ এখতিয়ার তখন লাভ করবে যদি দোষটি এমন হয় যে, তা কষ্ট ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয়, তাহলে এখতিয়ার পাবে না। যেমন- এক ব্যক্তি একটি কাপড় ক্রয় করল কিন্তু কজা করার পর দেখল কাপড়টি নাপাক; ব্যবহারের আগে ধুয়ে নিতে হবে। দৌত করার ঘরা যদি কাপড়টি নষ্ট না হয় কিংবা তার কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে এ দোষের কারণে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে না। -[ফাতহুল কাদীর, প্রান্তক, পৃ. ৩২৭]

كَرْتُهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَنْتَعِي وَصْفَ السَّلَامَةِ الْخَبَرِ : পণ্যে দোষ পেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করার দলিল হলো, পণ্যে দোষ আছে মর্মে কোনো শর্ত করা হয়নি, এমন যে কোনো চুক্তির স্বাভাবিক দাবি হলো, পণ্য দোষমুক্ত ও নিষ্পত্ত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস থেকেই এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। মু'জামে ইবনে শাহীন গ্রন্থে সাহাবী ইয়রাত আদা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়াহ (রা.) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ وَقِبٍ أَبُو وَقِبٍ قَالَ : قَالَ لِي الْعَمَاءُ بَنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ : أَلَا أَفْرَنْكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : قُلْتُ بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا هَذَا مَا اشْتَرَيْتُ الْعَمَاءُ بَنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا أَرَامَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِبَةَ وَلَا خُفَّةَ بَنَعَ السَّلِيمِ الْمُسْلِمِ .

হাদীসে উল্লিখিত خُفَّةٌ غَائِبَةٌ, لَا دَاءَ, لَا غَائِبَةَ, لَا خُفَّةَ হলো অভাবজনক রোগ, যেমন- পাকস্থলী, হাট ও কিডনির রোগ। غَائِبَةٌ হলো স্বাভাবিক দোষ, যেমন- চুরি করা, পলায়ন করা ইত্যাদি। আর خُفَّةٌ হলো, অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। -[বিনায়া, প্রান্তক, পৃ. ১৪০]

সূতরাং হাদীসটির অর্থ এই যে, হযরত আব্দুল হামীদ ইবনে ওয়াহাব (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আদা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়াহ (রা.) আমাকে বললেন, আমার জন্য লেখা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি চুক্তিপত্র কি তোমাকে পড়ে উনাব? আমি বললাম, অবশ্যই। এরপর তিনি একটি চুক্তিপত্র বের করলেন। তাতে লেখা ছিল- 'এটি একটি বিক্রয়চুক্তিপত্র; আদা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়াহ মুহাম্মদ ﷺ থেকে একটি দাস/ দাসী ক্রয় করেছে, যাতে দৈহিক রোগ ও নেই, স্বভাবগত দোষও নেই, আর অন্য কেউ এর মালিকও নয়। এটা মুসলমানের কাছে মুসলমানের বিক্রয়।'।

এ বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন বিক্রেতা, আর হযরত আদা ইবনে খালিদ (রা.) ছিলেন ক্রেতা। এ হাদীসটি বুখারী শরীফে তালীক হিসেবে (تَمْلِيْكًا) বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ক্রেতা। আত্মা ইবনে হুমাম ও আত্মা আইনী (র.) দীর্ঘ আলোচনার পর মু'জামে ইবনে শাহীনের বর্ণনাকে বিতর্ক সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, বুখারীর বর্ণনাটি যেহেতু তালীক তাই তার বিতর্কতা প্রশ্নাজীত নয়। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক, পৃ. ৩২৭]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিক্রয়চুক্তির দাবি হলো, বিক্রয়পণ্য নিখুঁত ও দোষমুক্ত হওয়া। এ বিষয়টি আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি রায় থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَاعَ غُلَامًا فَكَانَ عَنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করল। কিছু দিন যাওয়ার পর লোকটি গোলামে দোষ পেল। বিষয়টি সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিখুঁত ও দোষমুক্ত পণ্যই সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের দাবি। তাছাড়া যুক্তিও এটাই বলে। কারণ, সকল প্রকার সৃষ্টিজীবের মৌল প্রকৃতি হলো নিখুঁত ও দোষমুক্ত হওয়া। সুতরাং সাধারণ চুক্তিতে নিখুঁত পণ্যই উদ্দেশ্য হবে।

অতএব ক্রেতা যখন পণ্যকে নিখুঁত ও দোষমুক্ত পাবে না তখন সে এখতিয়ার লাভ করবে। কারণ, যদি এখতিয়ার না পায়; বরং দোষগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পণ্যটি গ্রহণে বাধ্য হয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ ক্ষতি বহনে সে সম্মত নয়। তাই সে এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَيِّكُهُ وَيَأْخُذَ النَّصَانَ : তবে ক্রেতার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে দোষগ্রস্ত পণ্যটি নিজের কাছে রেখে দেবে, আর বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ কথা বলেন। তবে ইমাম আহমদ (র.) ভিন্নমতে পোষণ করেন। তিনি বলেন, ক্রেতার জন্য পণ্য ফেরত দেওয়া কিংবা পণ্য রেখে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা উভয়টাই বৈধ।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوْصَانَ لَا يُقَابِلُهَا شَرْعًا : আমাদের প্রথম দলিল হলো, দোষ পণ্যের একটি গুণ (وَصْف)। আর যে বিক্রয়চুক্তিতে গুণটি মুখ্য হয় না এবং গুণের বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয় না তাতে গুণের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ ধার্য হয় না; বরং গুণটি দ্রব্যের অনুবর্তী হয়। পিছনে এর উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে। অতএব দোষের বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হবে না। তাই ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَئِنَّ لَمْ يَرْضَ يَرْأِهِ عَنْ مَلِكِهِ الْخ : দ্বিতীয় দলিল হলো, বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করেছে সে তার চেয়ে কমে পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে সম্মত নয়। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে হলে নির্ধারিত মূল্যের কমে তাকে স্বত্ব ত্যাগ করতে হয়। এতে বিক্রেতার ক্ষতি হবে। আর ক্ষতির হাত থেকে দুই কারবারির একজনকে বাঁচানোর জন্য শরিয়ত চেয়ারে আইবকে বৈধ করেছে। সুতরাং এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন বৈধ হবে না যাতে অপর কারবারির ক্ষতি হয়। তবে পণ্য দোষগ্রস্ত হওয়ার ক্রেতার যে ক্ষতি হচ্ছে, পণ্য বিক্রেতাকে কেন্দ্র দিয়ে তার ক্ষতি করা ছাড়াই তা দূর করা সম্ভব। সুতরাং পণ্য দোষগ্রস্ত হলে ক্রেতা তা কেন্দ্র দেওয়ার এখতিয়ার পাবে, কিন্তু তা রেখে দিয়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে না।

এস্থকার (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। তা হলো, বিক্রেতা তার পণ্যকে দোষযুক্ত মনে করে নির্ধারিত মূল্যে পণ্যের স্বত্ব ভাগে সম্মত হয়েছে। যখন দোষ প্রমাণিত হবে তখন সে মূল্যসংকোচন করতে সম্মত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। অতএব এ কথা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করেছে সে তার চেয়ে কমে পণ্যের স্বত্ব ভাগে সম্মত নয়।

আল্লামা আইনী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বিক্রীত-পণ্য দীর্ঘ সময় ধরে বিক্রেতার দখলে ছিল, সে তা নাড়াচড়া করেছে, তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। সুতরাং সে পণ্যের দোষ-গুণ সম্পর্কে অবগত ছিল বলে গণ্য হবে। যেন সে জেনেতেনই মূল্য নির্ধারণ করেছে: এর চেয়ে কমে সে সম্মত নয়। অতএব বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করেছে সে তার চেয়ে কমে পণ্যের স্বত্বভাগে সম্মত নয়- এ কথা যৌক্তিক। -[বিনায়া, প্রাপ্তজ, পৃ. ১৩৮]

এখানে আরকটি প্রশ্ন হয় যে, ক্রেতা কজা করার পর পণ্যে দোষ পেলে যেক্ষণ এখতিয়ার পায় তেমনি বিক্রেতা তার পণ্যকে দোষগ্রস্ত মনে করে হ্রাসকৃত মূল্যের বিনিময়ে কোনো দ্রব্য বিক্রি করার পর দ্রব্যটি দোষমুক্ত প্রমাণিত হলে তারও এখতিয়ার পাওয়া উচিত। কারণ, দোষগ্রস্ত মনে করে সে মূল্য কম নির্ধারণ করেছে। অথচ পণ্যটি দোষমুক্ত। যদি পণ্যটি ফেরত নেওয়ার কিংবা মূল্য বৃদ্ধির এখতিয়ার বিক্রেতাকে দেওয়া না হয়, তাহলে তার ক্ষতি হবে; ন্যায্য মূল্যের কমে পণ্যটি তার হাতছাড়া হবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এর উত্তরে বলেন, বিক্রেতার কাছে পণ্যটি দীর্ঘ সময় থাকায় সে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত বলে গণ্য হবে। সুতরাং যেন সে দোষমুক্ত মনে করেই পণ্যটি কম মূল্যে বিক্রি করেছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা পূর্বে বিক্রীত-পণ্য দেখেনি। সে পণ্যের দোষগুণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। এমতাবস্থায় যদি দোষগ্রস্ত পণ্যটি গ্রহণে সে বাধ্য হয়, তাহলে তার পূর্ব অবগতি ছাড়াই তার উপর একটি ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর কারো পূর্ব অবগতি ছাড়া তার উপর ক্ষতি আরোপ করা বৈধ নয়। তাই পণ্য দোষগ্রস্ত হলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কিন্তু দোষগ্রস্ত মনে করে পণ্য বিক্রি করার পর দোষমুক্ত প্রমাণিত হলে বিক্রেতা এখতিয়ার পাবে না। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাপ্তজ, পৃ. ৩৩০]

ফায়দা : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, পণ্যে দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর পণ্য ফেরত দেওয়ার যে অধিকার ক্রেতা লাভ করে, অর্থ বা মালের বিনিময়ে যদি ক্রেতা এ অধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার শর্তে সন্ধি করে, তাহলে তা জায়েজ আছে। এক রেওয়াজে অনুসারে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও এটাই। তবে খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুম্যতের বেলায় তা নাজায়েজ। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাপ্তজ, পৃ. ৩২৯]

الْخِ قَالَهُ وَالْمَرْءُ بِمِ عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرَ الْخِ : এস্থকার (র.) বলেন, মূল পাঠে [মতনে] বলা হয়েছে যে, পণ্যে কোনো 'দোষ' পাওয়া গেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে। উক্ত বক্তব্যে 'দোষ' বলে ঐ দোষ উদ্দেশ্য, যা পণ্য কজা করার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়নি; বরং পণ্যটি বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই তাতে দোষটি বিদ্যমান ছিল এবং ক্রেতা ক্রয়কালে ও কজা করার সময় এ দোষ সম্পর্কে অবগত ছিল না। কারণ, যদি অবগত থাকে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়- ক্রেতা জেনেতেনই দোষগ্রস্ত পণ্য ক্রয় করেছে। সুতরাং দোষযুক্ত পণ্য কেনার প্রতি তার সম্মতি আছে। আর একবার এক্ষণ সম্মতি সাব্যস্ত হলে পরবর্তিতে ক্রেতা খেয়ারে আইব পায় না।

قَالَ : وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانُ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التَّجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ ، لِأَنَّ النُّقْصَرَ  
يُنْقُصَانِ الْمَالِيَّةَ ، وَذَلِكَ بِإِنْتِقَاصِ الْقِيَمَةِ ، وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَتِهِ عَرَبٌ أَهْلُهُ  
وَالْإِبَاقُ وَالْبَوْلُ فِي الْفَرَاشِ وَالسَّرَقَةُ فِي الصَّغِيرِ عَيْبٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ  
ذَلِكَ بِعَيْبٍ حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَمَعْنَاهُ إِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ  
حَدَّثَتْ ، عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِي صِغَرِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ، لِأَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ ، وَإِنْ حَدَّثَتْ بَعْدَ  
بُلُوغِهِ لَمْ يَرُدَّهُ ، لِأَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَخْتَلِفُ بِالصَّغَرِ وَالْكِبَرِ ،  
فَالْبَوْلُ فِي الْفَرَاشِ فِي الصَّغَرِ لِضَعْفِ الْمَثَانَةِ ، وَبَعْدَ الْكِبَرِ لِدَاءٍ فِي الْبَاطِنِ ،  
وَالْإِبَاقُ فِي الصَّغَرِ لِحُبِّ اللَّغَبِ ، وَالسَّرَقَةُ لِقِلَّةِ الْمَبَالَاتِ ، وَهُمَا بَعْدَ الْكِبَرِ لِحُبْنِ  
فِي الْبَاطِنِ ، وَالْمُرَادُ مِنَ الصَّغِيرِ مَنْ يَعْقِلُ ، فَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَهُوَ ضَالٌّ لَا أُبَيُّ ،  
فَلَا يَتَحَقَّقُ عَيْبًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, যে সকল খুঁত ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন অনুসারে দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটায় তা-ই পণ্যের দোষ বলে বিবেচিত। কেননা, মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার কারণেই ক্ষতি সাধিত হয়। আর মূল্যমান হ্রাস পায় মূল্য কমে যাওয়ার কারণে। আর মূল্য জানার মানদণ্ড হলো ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পলায়ন করা, বিছানায় পেশাব করা এবং চুরি করা ছোটদের বেলায় দোষ। যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তা দোষ নয়; যদি বিক্রেতার কাছে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পুনরায় তা দেখা না দেয়। অর্থাৎ যদি বিক্রেতার কাছে শৈশবেই এসব দোষ দেখা দেয়, এরপর শৈশবেই ক্রেতার কাছে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে ক্রেতার তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ, তা হুবহু পূর্বেরটাই। আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এসবের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, এগুলো পূর্বেরগুলো থেকে ভিন্ন। এটা এজন্য যে, শৈশব ও বয়ঃপ্রাপ্তির কারণে এসব দোষের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শৈশবে বিছানায় পেশাব করার কারণ মূত্রথলির দুর্বলতা আর বয়ঃপ্রাপ্তির পর তা হয় অভ্যস্তরীণ কোনো রোগের কারণে। শৈশবে পলায়ন করার কারণ খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ আর চুরি করার কারণ দায়িত্ববোধে স্বল্পতা, আর এ দুটো বয়ঃপ্রাপ্তির পর হয় মন্দ স্বভাবের কারণে। [আলোচ্য মাসআলায়] ছোট ঘরা এমন বালক উদ্দেশ্য, যার বোধশক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে যার বোধশক্তি নেই সে তো হারিয়ে যাওয়া শিশু, পলাতক নয়। সুতরাং তা দোষ বলে গণ্য হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত মাসআলায় বলা হয়েছে যে, পণ্য কজা করার পর তাতে দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আলোচ্য ইবারতে পণ্যের কোন ধরনের খুঁতকে 'দোষ' বলে অভিহিত করা যাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম কুদরী (র.) একটি মূলনীতি বলেছেন। তিনি বলেন, দ্রব্যস্থিত যে সকল খুঁত ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন অনুসারে

দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটায়, তাই 'দোষ'। কেননা, মূল্যহ্রাসের কারণেই দ্রব্যের মানে ঘাটতি আসে। আর মানে ঘাটতি আসাতেই ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর মূল্যঘাটতি হলো কিনা তা বিচারের ভার এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর বর্তাবে। আর ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের বাজারদর সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়, তাই তাদের প্রচলনে যা দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটাবে তাই 'দোষ' বলে সাব্যস্ত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্বযুগে দাস/দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো; বরং বিক্রয়পণ্যের মাঝে দাস/দাসী একটি উল্লেখযোগ্য পণ্যরূপে বিবেচিত হতো। গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ইবারত থেকে দাস/দাসীর কোন কোন জিনিসগুলো দোষ এবং ক্রয়কৃত দাস/দাসীতে সেগুলো কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশ পেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার অর্থতিরার লাভ করবে এ বিষয় আলোচনা করেছেন। আলোচ্য ইবারতের মাঝে তিনটি দোষের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যথা—

১. পলায়ন করা (الفرار)

২. বিছানায় পেশাব করা

৩. চুরি করা

দাস/দাসীর দু শ্রেণী। যথা— ১. নাবালগ

২. বালগ

নাবালগ দাস/দাসী আবার দু প্রকার। যথা— ১. বোধশক্তি নেই

২. বোধশক্তি আছে

বোধশক্তি নেই— এ শ্রেণীর দাস/দাসীর বয়সের সময়সীমা নির্ধারণে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। ঈযাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বান্ধা একাকী খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়নি সে এ শ্রেণীভুক্ত। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে এ ধরনের একটি রেওয়াজেও আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় একাকী শৌচকার্য করতে সক্ষম নয় এমন বান্ধাদের এ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে সাত বছরের কম বয়সের বান্ধারা এ শ্রেণীভুক্ত।— [বেনায়া : খ. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৩] আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ও এ মত পোষণ করেন।

— [ফাতহুল কাদীর : খ. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৩০]

কেফায়া গ্রন্থকার পাঁচ বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ শ্রেণীর দাস/দাসীর বিছানায় পেশাব করা, পলায়ন করা এবং চুরি করা দোষ নয়। গ্রন্থকার (র.) বলেন, বোধশক্তি নেই এ শ্রেণীর দাস/দাসী পলাতক হয় না; বরং হারিয়ে যায়।

বোধশক্তি আছে এমন নাবালগ দাস/দাসীর বিছানায় পেশাব করা, চুরি করা ও পলায়ন করা দোষ। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, পলায়ন সফরের পরিমাণ দূরত্বে [৪৮ মাইল] হোক বা কম হোক, শহর থেকে গ্রামে হোক বা গ্রাম থেকে শহরে হোক তা দোষ বলে গণ্য হবে। [বিনায়া, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪১] কেননা, পলায়ন করার কারণে মনিব তা ঘারা উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। যদি দাস/দাসী ডাকাতে নিকট থেকে পালিয়ে স্বীয় মনিবের কাছে চলে আসে, তাহলে এটাকে পলায়ন বলা হবে না। যদি ডাকাতে নিকট থেকে পলায়ন করে, কিন্তু মনিবের কাছেও ফিরে আসে না এবং ডাকাতে কাছের ফিরে না যায়, তাহলে এর দু সূরত—

১. সে মনিবের ঠিকানা জানে এবং সেখানে পৌছতে সক্ষম।

২. সে ঠিকানা জানে না, কিংবা জানে কিন্তু পৌছতে সক্ষম নয়।

প্রথম সূরতে পলায়ন বলে গণ্য হবে— আর দ্বিতীয় সূরতে পলায়ন বলে গণ্য হবে না।—[ফাতহুল কাদীর]

চুরি করা তা দশ দিরহাম পরিমাণ হোক বা তার চেয়ে কম হোক, স্বীয় মনিবের মাল চুরি করুক বা অন্য কারো মাল চুরি করুক

সবই দোষ বলে গণ্য হবে। যদি মনিবের সম্পদ থেকে খাওয়ার জন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য নেয়, তাহলে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। তবে অন্যের সম্পদ থেকে নিলে চুরি বলে গণ্য হবে। যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মনিবের সম্পদ থেকে কোনো খাদ্য দ্রব্য নেয়, তবে তাও দোষ বলে গণ্য হবে। কারণ, এতে মনিব তার সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্ভিগ্ন থাকবে এবং তা সংরক্ষণের জন্য তাকে সর্বদা কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

বিছানায় পেশাব করা, পলায়ন করা ও চুরি করা বালেগ দাস/দাসীর ক্ষেত্রেও দোষ। তবে নাবালেগ অবস্থার দোষ আর বালেগ হওয়ার পরের দোষ হুবহু এক নয়। কারণ শৈশবকালে ও বয়ঃপ্রাপ্তির পর এসব দোষের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْإِبَانُ وَالْوَلُ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرَقَةُ فِي الصَّغِيرِ الْخ: কুদূরীর উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলাটি বোধশক্তি আছে এমন নাবালেগ দাস/দাসী সম্পর্কে। গ্রন্থকার (র.) এর ব্যাখ্যা তিনটি সূরত উল্লেখ করেছেন—

১. বিক্রতার কাছে থাকা অবস্থায় নাবালেগ দাস/দাসী বিছানায় পেশাব করত কিংবা পলায়ন করত কিংবা চুরি করত। ক্রৈতার কাছে আসার পর নাবালেগ অবস্থাতেই এসব দোষ প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে এ দোষগুলো হুবহু ঐ দোষ বলে গণ্য হবে, যা বিক্রতার কাছে ছিল এবং এর কারণে ক্রৈতা খেয়ারে আইব লাভ করবে।

২. বিক্রতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় এসব দোষ ছিল। বালেগ হওয়ার পর এসব দোষ দেখা যায়নি। পরবর্তীতে ক্রৈতার কাছে আসার পর এ দোষগুলো নতুন করে দেখা দিয়েছে। এ সূরতে ক্রৈতা খেয়ারে আইব পাবে না। কারণ, ক্রৈতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষগুলো বিক্রতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া ঐ একই দোষ বলে গণ্য হবে না। আর বিক্রতার কাছে ছিল এমন দোষের কারণেই শুধু ক্রৈতা খেয়ারে আইব লাভ করে।

ক্রৈতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষগুলো কেন বিক্রতার কাছে প্রকাশ পাওয়া ঐ একই দোষ বলে গণ্য হবে না— এর কারণ সম্পর্কে গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিক্রতার কাছে দোষগুলো প্রকাশ পেয়েছিল নাবালেগ অবস্থায়, আর ক্রৈতার কাছে প্রকাশ পেয়েছে বালেগ অবস্থায়। নাবালেগ অবস্থার দোষের কারণ ভিন্ন, আর বালেগ অবস্থার দোষের কারণ ভিন্ন। নাবালেগ অবস্থায় বিছানায় পেশাব করে মূত্রখলি দুর্বল হওয়ার কারণে, আর বালেগ অবস্থায় করে অভ্যন্তরীণ কোনো রোগের কারণে। নাবালেগ অবস্থায় চুরি করে পরিণতি সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে এবং পলায়ন করে খেলাধুলার আকর্ষণে, আর বালেগ হওয়ার পর চুরি ও পলায়ন করে মন্দ স্বভাবের কারণে। আর কারণ ভিন্ন হলে তার বিধানও ভিন্ন হয়। সুতরাং বিক্রতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া দোষ আর বালেগ অবস্থায় ক্রৈতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষ হুবহু এক নয়।

৩. হ্যাঁ, যদি বিক্রতার কাছে বালেগ হওয়ার পর এসব দোষ দেখা যায়, এরপর ক্রৈতার কাছে আসার পর এ দোষগুলো পুনরায় দেখা দেয়, তাহলে এ দোষগুলো হুবহু বিক্রতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষ বলে গণ্য হবে। কারণ, এ সূরতে ক্রৈতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষের কারণ এবং বিক্রতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষের কারণ এক ও অভিন্ন। তাই এ সূরতে ক্রৈতা খেয়ারে আইব পাবে।

قَالَ : وَالْجُنُونُ فِي الصَّغَرِ عَيْنٌ أَبَدًا ، وَمَعْنَاهُ إِذَا جُنَّ فِي الصَّغَرِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ أَوْ فِي الْكَبَرِ يَرُدُّهُ ، لِأَنَّهُ عَيْنُ الْأَوَّلِ ، إِذَا السَّبَبُ فِي الْحَالَيْنِ مُتَّحِدٌ ، وَهُوَ فَسَادُ الْعَقْلِ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْعَاوَدَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ قَلَّ مَا يَزُولُ ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَاوَدَةِ لِلرَّدِّ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শৈশবে পাগল হওয়া একটি স্থায়ী দোষ। অর্থাৎ যদি বিক্রেতার কাছে ছোটবেলায় পাগল হয় তারপর ক্রেতার হাতে ছোটবেলায় কিংবা বালেগ হওয়ার পর তার পুনরাবৃত্তি হয়, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে। কারণ, তা হুবহু পূর্বের মস্তিষ্ক-বিকৃতি। কেননা, উভয় অবস্থায় [মস্তিষ্ক-বিকৃতির] কারণ এক ও অভিন্ন। আর তা হলো, বোধশক্তি নষ্ট হওয়া। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, ক্রেতার হাতে পাগলামির পুনঃপ্রকাশ ঘটা শর্ত নয়। কারণ, মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগ দূর হওয়া বিরল হলেও আল্লাহ তা'আলা তো তা দূর করতে সক্ষম। সুতরাং ফেরত দেওয়ার জন্য পাগলামি পুনঃপ্রকাশ পাওয়া আবশ্যিক।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জামেউস সগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নাবালেগ ছেলের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা একটি স্থায়ী দোষ। গ্রন্থকার (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্থায়ী দোষের অর্থ হলো, যদি বিক্রেতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে যায় এরপর ক্রেতার কাছে তা পুনঃপ্রকাশ পায়, তাহলে ক্রেতার হাতে নাবালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাক বা বালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাক উভয় সূরতে তা হুবহু পূর্বের দোষ বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে। কেননা, নাবালেগ ও বালেগ উভয় অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ এক ও অভিন্ন। আর তা হলো বোধশক্তি নষ্ট হওয়া। আর একবার বোধশক্তি নষ্ট হলে সাধারণত তা ভালো হয় না। কিছুদিন সুস্থ থেকে তা আবার প্রকাশ পায়।

তবে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন যেহেতু ভালো করে দিতে পারেন, তাই ক্রেতার খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার কাছে এ দোষটি প্রকাশ পাওয়া শর্ত। বিক্রেতার কাছে এ দোষটি দেখা দিয়েছিল শুধু এটুকুতে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। প্রকাশ পেলে তবেই এটা সাব্যস্ত হবে যে, পূর্বের দোষটি এখনও আছে। আর বিক্রেতার কাছে ছিল এমন দোষ প্রমাণিত হলে তবেই ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করে।

ফায়দা : আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, মস্তিষ্ক বিকৃতি কত সময় স্থায়ী হলে তা দোষ বলে গণ্য হবে এ বিষয়ে ফিকহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে এক মূহূরের জন্য হলেও তা দোষ বলে গণ্য হবে। কারো কারো মতে কমপক্ষে একদিন একরাত হতে হবে। কেউ কেউ বলেন, একদিন একরাতের চেয়ে বেশি সময় ধরে হতে হবে। কেউ কেউ বলেন, ক্রমাগত চলতে থাকলে তা দোষ বলে গণ্য হবে। যদি ক্রমাগত না চলে, তাহলে তা দোষ নয়।



قَالَ : وَالْبَخْرُ وَالذَّفَرُ عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ يَكُونُ الْإِسْتِفْرَاشُ، وَهَمَّا يُخْلَلَانِ بِهِ، وَلَيْسَ يَعْيبُ فِي الْغُلَامِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْإِسْتِخْدَامُ، وَلَا يُخْلَلَانِ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ دَاءٍ، لِأَنَّ الدَّاءَ عَيْبٌ وَالزِّنَاءُ وَلَدُ الزِّنَاءِ عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الْغُلَامِ، لِأَنَّهُ يُخْلَلُ بِالْمَقْصُودِ فِي الْجَارِيَةِ، وَهُوَ الْإِسْتِفْرَاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَلَا يُخْلَلُ بِالْمَقْصُودِ فِي الْغُلَامِ، وَهُوَ الْإِسْتِخْدَامُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزِّنَاءُ عَادَةً لَهُ عَلَى مَا قَالُوا لِأَنَّ إِيَّاهُمُ يُخْلَلُ بِالْخِدْمَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, দাসীর ক্ষেত্রে মুখের দুর্গন্ধ ও বগলের দুর্গন্ধ দোষ। কারণ, কখনো [দাসী ক্রয়ের] উদ্দেশ্য হয় [তাকে] শয্যাসঙ্গিনী করা, আর এ দুটো দোষ উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কিন্তু [এ দুটো] দাসের ক্ষেত্রে দোষ নয়। কারণ, [দাস ক্রয়ের] উদ্দেশ্য হলো সেবা গ্রহণ করা, আর এ দুটো দোষ তাতে বাধা সৃষ্টি করে না। হ্যাঁ, যদি দুর্গন্ধ কোনো রোগের কারণ হয় [তাহলে তা দোষ বলে গণ্য হবে]। কারণ, রোগ একটি দোষ। ব্যতিচার ও ব্যতিচারজাত সন্তান হওয়া দাসীর ক্ষেত্রে দোষ, দাসের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, তা দাসীর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। আর উদ্দেশ্য হলো শয্যাসঙ্গিনী বানানো এবং সন্তান লাভ করা। কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে [তা] উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে না। উদ্দেশ্য হলো সেবা গ্রহণ করা। তবে ফিকহবিদগণের উক্তি মতে, যদি জেনা তার স্বভাবে পরিণত হয় [তাহলে তা দোষ]। কেননা, মেয়েদের পিছু নেওয়ার বিষয়টি সেবার কাজকে ব্যাহত করবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْبَخْرُ وَالذَّفَرُ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুখের দুর্গন্ধ এবং বগলের দুর্গন্ধ দাসীর ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য: কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য নয়। কারণ, দাসী ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাকে শয্যাসঙ্গিনী বানানো। আর এ দুটো দোষ উদ্দেশ্য পূরণে বাধার সৃষ্টি করে, তাই দাসীর এ দুটোকে দোষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে গোলাম ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় তাকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা, তার থেকে সেবা গ্রহণ করা। আর এ দুটো বিষয় উদ্দেশ্য পূরণে বাধা সৃষ্টি করে না, তাই গোলামের ক্ষেত্রে এ দুটোকে দোষ সাব্যস্ত করা হয়নি। অবশ্য রোগের কারণে যদি গোলামের মুখে ও বগলে এ দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, তাহলে এটাকেও দোষ গণ্য করা হবে। কারণ, রোগ নিঃসন্দেহে একটি দোষ।

ফায়দা : ফাতওয়ায়ে কাজীখান গ্রন্থে আছে, যদিও বগলের বা মুখের দুর্গন্ধ গোলামের ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য নয়, কিন্তু তা যদি স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে তা দোষ বলে গণ্য হবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, যদি দাঁত পরিষ্কার না করার কারণে মুখে গন্ধ হয়, তবে তা দোষ বলে গণ্য হবে না। কারণ, তা দাঁত পরিষ্কার করার দ্বারা দূর করা সম্ভব। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৩২]

قَوْلُهُ وَالزِّنَاءُ : ব্যতিচার এবং ব্যতিচারজাত সন্তান হওয়া— এ দুটো বিষয় দাসীর ক্ষেত্রে দোষ, কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে তা দোষ নয়। কারণ, এ দুটো বিষয় দাসী ক্রয়ের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, গোলাম ক্রয়ের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে না। দাসী ক্রয়ের সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে— মনিব তাকে শয্যাসঙ্গিনী বানাবে এবং তার গর্ভে সন্তান লাভ করবে। কিন্তু চরিত্রবান লোক ব্যতিচারিণী দাসীকে শয্যাসঙ্গিনী বানাতে ঘৃণাবোধ করে, আর তার গর্ভে সন্তান লাভ করতে চায় না। কারণ, সন্তানকে লোকেরা “জারজ মায়ের সন্তান বলে গালি দেবে”।

পক্ষান্তরে গোলাম ক্রয়ের সাধারণত উদ্দেশ্য হয় তার থেকে সেবা গ্রহণ করা। আর সেবা গ্রহণে এ দুটো বিষয় বাধা সৃষ্টি করে না। তবে ব্যতিচার যদি গোলামের স্বভাবে পরিণত হয়, তাহলে ফুকাহায়ে কেরাম তা দোষ বলে গণ্য করেন। কারণ, স্বভাবগত কারণে যখন সে মেয়েদের ষোজে থাকবে এবং তাদেরকে পটানোর ফিকিরে থাকবে, তখন মনিবের সেবা-কাজে ক্ষতি হবে। তাই ব্যতিচারের ন্যায় ঘৃণা আচরণে অভ্যস্ত হওয়া গোলামের ক্ষেত্রে দোষ।

قَالَ : وَالْكَفَرُ عَنِيبٌ فِيهِمَا ، لِأَنَّهُ طَبَعَ الْمُسْلِمُ يَتَنَفَّرُ عَنْ صُغْبَتِهِ ، وَلَئِنَّهُ يَتَنَفَّرُ صَرْفُهُ فِي بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ ، فَتَخْتَلُ الرُّغْبَةُ ، فَلَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لَا يَرُدُّهُ ، لِأَنَّهُ زَوَّلَ الْعَنِيبَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحا) : يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ الْكَافِرُ يَسْتَعْمِلُ فِيهِمَا لَا يَسْتَعْمِلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ ، وَقَوَاتُ الشَّرْطِ يَنْزِلَةُ الْعَنِيبِ قَالَ : فَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بِالْغَةِ لَا تَحِيضُ أَوْ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَهُوَ عَنِيبٌ ، لِأَنَّهُ إِرْتِفَاعُ الدِّمِّ وَإِسْتِمْرَارُهُ عِلَامَةُ الدَّاءِ ، وَيُغْتَبَرُ فِي الْإِرْتِفَاعِ أَقْصَى غَايَةِ الْبُلُوغِ ، وَهُوَ سَنَعُ عَشْرَةِ سَنَةٍ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) ، وَيُغْتَرَفُ ذَلِكَ يَقُولُ الْأَمَةُ قَتَرْتُ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ نَكْرُؤُ الْبَانِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَعْدَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কাকির হওয়া গোলাম ও বান্দি উভয়ের ক্ষেত্রে দোষ। কারণ, মুসলমানের স্বভাব তার সঙ্গকে ঘৃণা করে। তাছাড়া কোনো কোনো কাকফারায় তাকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুতরাং তার প্রতি আগ্রহ ব্যাহত হবে। তবে যদি কেউ কাকির হওয়ার শর্তে গোলাম ক্রয় করে তারপর তাকে দেখে যে, সে মুসলিম, তাহলে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, এটা তো দোষমুক্ত হওয়া। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা, কাকিরকে এমন কিছু ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়, যে ক্ষেত্রে মুসলমানকে কাজে লাগানো যায় না। আর শর্তের অনুপস্থিতি দোষের পর্যায়ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি দাসী প্রাপ্তবয়স্কা হয়, কিন্তু তার হয়েয আসে না কিংবা সে ইত্তিহাযাগ্রস্ত হয়, তাহলে তা দোষ। কেননা, রক্তস্রাব বন্ধ থাকা এবং রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা দুটোই রোগের লক্ষণ। রক্তস্রাব বন্ধ থাকার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা বিবেচ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নারীর ক্ষেত্রে তা হলো সতের বছর। আর রক্তস্রাব বন্ধ থাকার বিষয়টি জানা যাবে দাসীর কথা ঘারা। সুতরাং দাসীর কথার সাথে যখন বিক্রেতার পক্ষ থেকে কসমের অস্বীকৃতি মিলিত হবে, তখন দাসী ফেরত দেওয়া যাবে: কজার আগে হোক কিংবা পরে হোক। এটাই বিতর্কিতম অভিমত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْكَفَرُ عَنِيبٌ فِيهِمَا : একজন মুসলমান ক্রেতা এ শর্তে একটি গোলাম/বান্দি ক্রয় করল যে, সে মুসলমান। কজা করার পর ক্রেতা দেখল গোলাম/ বান্দিটি কাকির। তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে এবং ক্রয়কৃত গোলাম/বান্দিকে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা, “কুফর” গোলাম ও বান্দি উভয়ের ক্ষেত্রে দোষ। এর দলিল হলো—

১. কাকির সে ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান বা আগ্ন-উপাসক বা হিন্দু, যাই হোক—মুসলমানের স্বভাব তার সঙ্গকে ঘৃণা করে। তাই কাকির গোলামের প্রতি মুসলমান ক্রেতার আগ্রহ কম থাকে। আর বিক্রীত-পণ্যের প্রতি আগ্রহ কম থাকা মূলত্বসের কারণ হয়। আর যা বাবসারীদের রীতি ও প্রচলন অনুসারে দ্রব্যের মূলত্বাস ঘটায় তাই আইব বা দোষ। অতএব মুসলমান ক্রেতার জন্য ক্রয়কৃত গোলাম/বান্দির কাকির হওয়া দোষ বলে গণ্য হবে।

২. কাফির গোলামকে কোনো কোনো কাফফারায় মুক্ত করা নিষিদ্ধ। ভুলক্রমে হত্যার (قَتَلَ خَفَاءً) কাফফারা হিসেবে সর্বসম্মতভাবেই কাফির গোলাম মুক্ত করা নিষিদ্ধ। আর কসম ও যিহারের (ظَهَارًا) কাফফারা হিসেবে অনেকের মতে নিষিদ্ধ। তাছাড়া দীনি বিষয়ে তার সেবায় মুসলমান মনিব আশ্বস্ত নয়। যেমন- অজুর পানির ব্যবস্থা করা, কুরআন মাজীদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা ইত্যাদি। তাই স্বাভাবিকভাবেই কাফির গোলামের প্রতি মুসলমান ক্রোতার আগ্রহ কম থাকে। আর আগ্রহ কম থাকা মূলহাসের কারণ। আর যা মূলহাসের কারণ হয় তা দোষ। সুতরাং কাফির হওয়া গোলাম/বান্দি ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি নিঃশর্ত চুক্তি হয় অর্থাৎ গোলামটি মুসলমান বা কাফির এ ধরনের কোনো শর্ত যদি বিক্রয়চুক্তিতে করা না হয় এবং কজা করার পর দেখা যায় গোলামটি কাফির, তাহলে ক্রোতার এখতিয়ার থাকবে না। কারণ, ক্রোতা নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করেছে, আর ক্রয়ের আগে বাহ্যিক অবস্থা থেকে গোলামটি মুসলমান বলে কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তাই ক্রোতা সম্মত হয়েই কাফির গোলাম ক্রয় করেছে বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ فَلَرَأَيْتَهُ عَلَى أَنَّهُ كَافِرٌ تَوَجَّدَ مُسْلِمًا الْخ: যদি কোনো ব্যক্তি কাফির হওয়ার শর্তে গোলাম/বান্দি ক্রয় করে এবং কজা করার পর দেখে সে মুসলমান, তাহলে আমাদের মতে ক্রোতা খেয়ারে আইব পাবে না এবং উক্ত গোলাম/বান্দিটি বিক্রোতাকে ফেরত দিতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রোতা খেয়ারে আইব পাবে এবং খেয়ার বলে উক্ত গোলাম/বান্দিটি বিক্রোতাকে ফেরত দিতে পারবে। ইমাম আহমদও এ মত পোষণ করেন।

আমাদের দলিল হলো, যেহেতু “কুফর” গোলাম ও বান্দির ক্ষেত্রে দোষ, তাই এ সুরতে তো বিক্রীত-পণ্য দোষমুক্ত প্রমাণিত হলো। আর বিক্রীত-পণ্য দোষমুক্ত হলে ক্রোতা খেয়ারে আইব পায় না। অতএব এ সুরতে ক্রোতা এখতিয়ার পাবে না। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি একটি দোষগ্রস্ত পণ্য ক্রয় করল, কিন্তু কজা করার পর দেখল তা দোষমুক্ত। এ সুরতে যেরূপ ক্রোতা পণ্যটি ফেরত দিতে পারে না, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রোতা গোলাম/বান্দিটি ফেরত দিতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, لَاَنَّ الْكَافِرَ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا يَسْتَعْمَلُ الْخ: কাফির গোলাম/বান্দিকে যে সব কাজে ব্যবহার করা যায় মুসলমান গোলাম/বান্দিকে সে সব কাজে ব্যবহার করা যায় না। যেমন- নামাজের জামাতের সময় কাফির গোলাম/বান্দিকে দোকান/প্রতিষ্ঠান দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত করা যায়, কিন্তু মুসলমান মনিব তার মুসলমান গোলামকে এ কাজে ব্যবহার করা পছন্দ করবে না। তাছাড়া তুচ্ছ এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো মনিবের নিজে করা যেরূপ পছন্দ নয়, তেমনি তার মুসলমান গোলামের দ্বারা করানোও তার পছন্দ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কাফির গোলামকে ব্যবহার করা যায়। তাই কখনো কখনো কাফির গোলাম/বান্দি ও অগ্রহের কারণ হয়। আর অগ্রহ সৃষ্টিকারী গুণের (وَصَفَتْ مُرْغُوبٌ فِيهِ) অনুপস্থিতি দোষের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কাফির হওয়ার শর্তে ক্রয় করার সুরতে যদি গোলাম কাফির না হয়, তাহলে তা দোষ বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে ক্রোতা খেয়ার লাভ করবে। আর খেয়ার বলে সে মুসলমান গোলামকে ফেরত দিতে পারবে।

قَوْلُهُ فَلَرَأَيْتَهُ عَلَى أَنَّهُ كَافِرٌ تَوَجَّدَ مُسْلِمًا الْخ: হায়েয (حَيْضٌ) না আসা কিংবা ইস্তিহাযগ্রস্ত (مُسْتَحَاضَةٌ) হওয়া উভয়টা প্রাপ্তবয়স্ক (بَالِغَةٌ) মহিলার ক্ষেত্রে দোষ। অপ্রাপ্তবয়স্ক (الْأَغْفِيْرَةُ) মেয়ের ক্ষেত্রে হায়েয না আসাটা সর্বসম্মতভাবে দোষ নয়। তদ্রূপ যে মহিলা সন্তান জন্মদানের বয়সের সময়সীমা অতিক্রম করেছে (اِبْسَنَتْ) তার ক্ষেত্রেও হায়েয না আসাটা সকল ফুকাহায়ে কেন্নাদের মতে দোষ নয়। -[বিনায়া, প্রাপ্ত, পৃ. ১৪৮]

হায়েয না আসা কিংবা ইস্তিহাযগ্রস্ত হওয়াটা বালগা মহিলার ক্ষেত্রে দোষ কেন? এছকার (র.) বলেন, বালগা মহিলার রক্তপ্রাব বন্ধ থাকা (اِنْطِقَاعُ الدَّمِ) কিংবা রক্তপ্রাব অব্যাহত থাকা (اِسْتِمْرَارُ الدَّمِ) উভয়টা রোগের লক্ষণ। শায়খুল ইসলাম বাযদবী (র.) বলেন, “হায়েয নারীর সৃষ্টিগত বিষয়। যদি সময়মতো অর্থাৎ বালগা হওয়ার পর হায়েয না আসে,

তাহলে এটাই বাস্তব যে, কোনো রোগের কারণে হয়েছে আসছে না। আর রোগ একটি দোষ। [প্রাণ্ডক্ত] তবে রক্তদ্রাব বন্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হবে বলেগা হওয়ার সর্বোচ্চ সময়সীমা অতিবাহিত হলে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নারীর বলেগা হওয়ার সর্বোচ্চ সময়সীমা সতের বছর, আর সাহেবাইন [ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)]-এর মতে পনের বছর। অতএব পনের/সতের বছর অতিক্রম করার পরও যদি হয়েছে না আসে, তবে তা দোষ বলে নির্ণীত হবে।

অতএব কোনো ব্যক্তি যদি সতের বছরোপেক্ষ বলেগা বান্দি ক্রয়ের পর দেখে তার হয়েছে আসে না কিংবা সে ইস্তিহাযগ্রস্ত, তাহলে সে খেয়ারে আইব তথা দোষজনিত এখতিয়ার লাভ করবে। তবে তার আগে এ দোষটি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল তা প্রমাণ করতে হবে। আর হয়েছে বন্ধ থাকার বিষয়টি এমন যে, তা একমাত্র বান্দিই বলতে পারে- অন্যের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এ বিষয়টি তার কাছ থেকেই জানা যাবে। সে যদি বলে যে, বিক্রেতার কাছে থাকাকালীন সময় থেকেই তার হয়েছে আসে না, তাহলে নারীর সাক্ষী দুর্বল হেতু তার কথা দ্বারা আদালতে দোষ সাব্যস্ত হবে না, তবে তা আদালতে বিক্রেতার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ক্রেতার পক্ষে দলিল হবে। এরপর বিচারক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কাছে থাকাকালে এ দোষটি ছিল? সে যদি হ্যাঁ বলে, তাহলে ক্রেতার খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হবে এবং সে বান্দিটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি বিক্রেতা বলে, আমার কাছে থাকাকালে এ দোষ ছিল না; বরং ক্রেতার কাছে এসে এর সূচনা হয়েছে, তাহলে এ সুরতে বিক্রেতার কাছে থাকাকালে বান্দির হয়েছে আসেনি- ক্রেতা এ মর্মে বান্দি (مُدْعِي) হলো, বিক্রেতা তার অস্বীকারকারী (مُنْكِر) হলো। আর বিষয়টি অন্যের পক্ষে যেহেতু জানা সম্ভব নয়, তাই এ বিষয়ে কারো সাক্ষী ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, সাক্ষী এমন সব বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হয় যা সাক্ষ্যাদাতাদের জন্য জানা সম্ভব। আর হয়েছে না আসা সম্পর্কে সাক্ষীদাতাদের জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। মোটকথা, যখন ক্রেতা [বান্দি]-এর দলিল (بَيِّنَةٌ) পেশ করা অর্থাৎ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব হয়, তখন ক্রেতা যদি বিক্রেতা [বিবাদী ও অস্বীকারকারী] থেকে কসমের দাবি করে, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দেবেন। যদি বিক্রেতা এই মর্মে কসম করে যে, তার কাছে থাকাকালে এ দোষ ছিল না, ক্রেতার কাছে আসার পর এর সূচনা হয়েছে, তাহলে মোকদ্দমা খারিজ হয়ে যাবে এবং ক্রেতা বান্দি ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না। আর যদি বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে বিচারকের রায় ক্রেতার পক্ষে যাবে এবং ক্রেতা খেয়ারে আইবের অধীনে বান্দিটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

যদি ক্রেতা এই দাবি করে যে, বান্দির ইস্তিহাযার দোষ আছে এবং এ দোষটি বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই ছিল- আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে দলিল তথা সাক্ষী পেশ করার নির্দেশ দেবেন। কারণ, ইস্তিহাযা এমন একটি বিষয়, যা ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা ছাড়া অন্যের পক্ষেও জানা সম্ভব। অবশ্য পুরুষদের জানা সম্ভব নয়, কিন্তু মহিলাদের জানা সম্ভব। আর যে সব বিষয়ে পুরুষদের জানা সম্ভব নয় সে সব বিষয়ে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। অতএব ক্রেতা যদি ইস্তিহাযা থাকা এবং তা বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ করে, তাহলে বিচারক ক্রেতার পক্ষে রায় দেবেন এবং ক্রেতা খেয়ারে আইবের অধীনে বান্দিটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করতে অপারগ হয়, তাহলে বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি বিক্রেতা কসম করে, তাহলে রায় তার পক্ষে যাবে এবং ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে না। আর যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে এবং বান্দিটি ফেরত দিতে পারবে। -[বিনায়া, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০] গ্রন্থকার (র.) এ দীর্ঘ আলোচনাকেই তাঁর সংক্ষিপ্ত ইবারত **الْبَيْتُ إِذَا نَسَّمَ** দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

قَالَ : وَإِذَا حَدَّثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ وَأُطْلِعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالتَّقْصَانِ ، وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ ، لِأَنَّ فِي الرَّدِّ إِضْرَارًا بِالْبَائِعِ ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا وَيَعُودُ مَعِيبًا فَا مَتَّعَ ، وَلَا بَدَّ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ ، فَتَعَيَّنَ الرَّجُوعُ بِالتَّقْصَانِ ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالضَّرَرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যদি [কজার পর পণ্য] ক্রেতার কাছে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হয়, অতঃপর বিক্রেতার কাছে ছিল এমন আরেকটি দোষ সম্পর্কে ক্রেতা অবগত হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে; কিন্তু বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। কেননা, ফেরত দেওয়াতে বিক্রেতার ক্ষতি হবে। কারণ, পণ্য তার মালিকানা থেকে নতুন সৃষ্ট দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় বের হয়েছে, অথচ ফিরে আসবে দোষগ্রস্ত অবস্থায়। তাই ফেরত দেওয়া নিষেধ। আবার ক্রেতার ক্ষতি দূর করাও আবশ্যিক। তাই ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়াটা নির্ধারিত হয়ে গেল। তবে বিক্রেতা যদি [ক্রেতার কাছে সৃষ্ট দোষসহ] পণ্যটি গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ, সে ক্ষতি মেনে নিতে সম্মত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا حَدَّثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ : সূরতে মাসআলা হলো, ক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় পণ্য নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলো। এরপর বিক্রেতার কাছে ছিল এমন আরেকটি দোষ সম্পর্কে ক্রেতা অবগত হলো, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে আসা পুরাতন দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে, কিন্তু পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। এর দলিল হলো, পণ্যটি ফেরত দেওয়াতে বিক্রেতার ক্ষতি হয়, আর এদিকে পুরাতন দোষসহ পণ্যটি গ্রহণে ক্রেতার ক্ষতি হয়। বিক্রেতার ক্ষতি এজন্য হয় যে, পণ্যটি যখন তার মালিকানা থেকে বের হয় তখন তাতে ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্ট দোষটি ছিল না। এখন যদি পণ্যটি ফেরত আসে নতুন তাহলে ঐ সৃষ্ট দোষসহ ফেরত আসবে। তাই ফেরত দেওয়া নিষেধ। আর ক্রেতার ক্ষতি এজন্য হয় যে, দোষের কারণে পণ্যের মূল্যহ্রাস ঘটে। আর পণ্যের মূল্যহ্রাস ঘটা ক্রেতার জন্য ক্ষতি। তাই এমন পণ্য অবলম্বন করতে হবে যাতে বিক্রেতারও ক্ষতি না হয়, আবার ক্রেতাও ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায়। আর তা হলো ক্ষতিপূরণ নেওয়া। ক্রেতা পুরাতন দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিলেই উভয়দিক রক্ষা পায়। তাই ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়াই নির্ধারিত হবে। ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পদ্ধতি হলো, পুরাতন দোষসহ পণ্যটির বাজারমূল্য কত, আর দোষমুক্ত হলে কত দাম হতো এ দুটো বিষয় যাচাই করবে। এরপর দুটোর মূল্যে যে ব্যবধান হয় ঐ পরিমাণ মূল্য ক্রেতা ফেরত নেবে। উদাহরণত দোষমুক্ত অবস্থায় পণ্যটির বাজারদর একশ টাকা আর দোষসহ পণ্যটির দাম আশি টাকা, তাহলে দোষের ক্ষতিপূরণ বিশ টাকা। ক্রেতা বিক্রেতা থেকে এ বিশ টাকা ফেরত পাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, দোষ পণ্যের একটি গুণ (وَصِف)। দোষের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার অর্থ গুণের বিনিময়ে মূল্যের অংশ স্থির করা। আর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, গুণের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ হয় না। অতএব ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা বৈধ হয় না। এর উত্তরে আদ্যামা আইনী (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তিতে গুণ যদি মুখ্য না হয় তাহলে গুণের বিনিময়ে মূল্যের অংশ হয় না, কিন্তু যদি মুখ্য হয় তাহলে গুণের বিনিময়ে মূল্যের অংশ হয়। আর আলোচ্য মাসআলা হলো ঐ ক্ষেত্রেই যেখানে গুণ মুখ্য হয়।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ : অবশ্য বিক্রেতা যদি নতুন সৃষ্ট দোষসহ পণ্যটি গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দেবে এবং পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে। কারণ, বিক্রেতার ক্ষতি রোধের জন্যই ক্রেতার ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া নির্ধারিত হয়েছিল। বিক্রেতা যদি নিজের ক্ষতি মেনে নেয়, তাহলে এটা তার ব্যাপার। এটা সে করতে পারে। তাই ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দিতে পারবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَجَعَ بِالْعَيْبِ، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ الرَّدَّ بِالْقَطْعِ، فَإِنَّ عَيْبَ حَدَثَ، فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ، أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ كَانَ لَكَ ذَلِكَ، لَأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِ، وَقَدْ رَضِيَ بِهِ، فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ يَشْنِ، لَأَنَّ الرَّدَّ غَيْرُ مُتَمَتِّعٍ بِرِضَاءِ الْبَائِعِ، فَيَصِيرُ هُوَ بِالْبَيْعِ حَاسِبًا لِلْمَيْبِعِ، فَلَا يَرْجِعُ بِالنَّقْصَانِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো কাপড় ক্রয় করে এবং তা কর্তন করে তারপর তাতে দোষ পায়, তাহলে সে দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে। কেননা, কেটে ফেলার কারণে কাপড়টি ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হবে। কারণ, কেটে ফেলা একটি নতুন দোষ। তবে বিক্রেতা যদি বলে, আমি সেটা কাটা অবস্থাতেই [ফেরত] গ্রহণ করব, তাহলে এ অধিকার তার রয়েছে। কারণ, [ফেরত দানের] নিষিদ্ধতা তার হক রক্ষার জন্য, অথচ সে কাটা কাপড় ফেরত গ্রহণে সম্মত আছে। যদি ক্রেতা কাটা কাপড়টি বিক্রি করে দেয়, তাহলে সে কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কারণ, বিক্রেতা [নতুন দোষসহ] ফেরত গ্রহণে সম্মত হলে কাপড়টি [এ সুরতে] ফেরত দেওয়া অসম্ভব ছিল না। সুতরাং ক্রেতাই বিক্রি করার মাধ্যমে বিক্রীত-পণ্য আবদ্ধকারী হলো। সুতরাং সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ : আলোচ্য মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামে সগীরের। তিনি বলেন, কেউ যদি কোনো কাপড় ক্রয় করে এবং তা কর্তন করে তারপর তাতে দোষ পায়, তাহলে সে দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে: কিন্তু কাপড়টি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, কেটে ফেলা একটি নতুন দোষ। আর বিক্রেতার মালিকানা থেকে কাপড়টি বের হওয়ার সময় এ দোষ ছিল না। এখন ফেরত দেওয়া বৈধ হলে বিক্রেতার মালিকানায় কাপড়টি দোষসহ ফেরত যাবে। এতে তার ক্ষতি হবে। তাই তা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ : أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ : তবে বিক্রেতা যদি কেটে ফেলা কাপড়টি ফেরত নিতে সম্মত হয়, তাহলে এ অধিকার তার রয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে কাপড়টি ফেরত দেবে এবং মূল্য পরিশোধ করে থাকলে তা ফেরত নেবে। কারণ, তার থেকে ক্ষতি রোধ করার এবং তার অধিকার রক্ষার জন্যই ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন সে যেহেতু ফেরত নিতে সম্মত হয়েছে, এর অর্থ হলো, সে স্বেচ্ছায় ক্ষতি বহনে এবং নিজ অধিকার ত্যাগে সম্মত। আর স্বেচ্ছায় নিজ অধিকার ত্যাগ করা বৈধ। অতএব এ সুরতে কাপড়টি ফেরত নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ يَشْنِ : যদি কাপড়টি কাটার পর ক্রেতা কারো কাছে তা বিক্রি করে দেয়—দোষের কথা জেনে বিক্রি করুক বা না জেনে বিক্রি করুক, তাহলে সে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না। কারণ, নিয়ম হলো, দোষ প্রমাণিত হলে ক্রেতা খেয়ারে আইব পাবে এবং খেয়ার বলে সে বিক্রেতাকে কাপড়টি ফেরত দেবে। কিন্তু এখন কাপড়টি কেটে ফেলায় ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে কাপড়টি ফেরত দেওয়া যেত; কিন্তু বিক্রি করে দেওয়ায় কাপড়টিতে আরেকজনের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এখন বিক্রেতা কাটা কাপড়টি ফেরত নিতে সম্মত হলেও ক্রেতার পক্ষে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্রেতা বিক্রেতার কাছে কাপড়টি ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করল। আর নিয়ম হলো, ক্রেতা স্বীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দোষগ্রস্ত পণ্য বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না। অতএব আলোচ্য সুরতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না।

فَإِنْ قَطَعَ الثَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ لَتَ السَّوْتِ قَسَمَنٍ ثُمَّ أَطْلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ لِإِمْتِنَاعِ الرَّدِّ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ، لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى الْفَسْخِ فِي الْأَصْلِ بِدُونِهَا، لِأَنَّهُ لَا تَنْفَكُ عَنْهُ، وَلَا وَجْهَ إِلَيْهِ مَعَهَا، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِمَبْعُوعَةٍ، فَاُمْتِنَاعُ أَصْلًا وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ، لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّ الشَّرْعِ لَا لِحَقِّهِ، فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا رَأَى الْعَيْبَ رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ، لِأَنَّ الرَّدَّ مُمْتَنِعٌ أَصْلًا قَبْلَهُ، فَلَا يَكُونُ بِالْبَيْعِ حَاسِبًا لِلْمَبِيعِ، وَعَنْ هَذَا قُلْنَا : إِنْ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ لِبَاسًا لَوْلِيهِ الصَّغِيرُ وَخَاطَهُ ثُمَّ أَطْلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا يَرْجِعُ، لِأَنَّ التَّمْلِيكَ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ قَبْلَ الْخِيَاطَةِ، وَفِي الثَّانِي بَعْدَهُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ.

অনুবাদ : যদি ক্রেতা [ক্রয়ের পর] কাপড়টি কাটে এবং তা সেলাই করে কিংবা তাকে লাল রং দ্বারা রঞ্জিত করে অথবা ছাতুকে ঘি দ্বারা মেখে ফেলে, এরপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, [এ সূরতে] অতিরিক্ত জিনিস যোগ করার কারণে কাপড়টি ফেরত দেওয়া বাধ্যগত হয়েছে। কারণ, যুক্ত জিনিসটি যেহেতু পৃথক করা সম্ভব নয়, তাই সেটাকে বাদ দিয়ে মূল কাপড় ও ছাতুতে বিক্রয়চুক্তি রহিতকরণ সম্ভব নয়। আবার যুক্ত জিনিসটি যেহেতু বিক্রীত-পণ্য নয়, তাই তা সহ [কাপড় ও ছাতু ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে] বিক্রয়চুক্তি রহিতকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বতই [তা ফেরত দেওয়া] নিষিদ্ধ। আর বিক্রেতার জন্য [যুক্ত জিনিসসহ] বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, এ নিষিদ্ধতা শরিয়তের অধিকারের প্রেক্ষিতে; বিক্রেতার অধিকারের প্রেক্ষিতে নয়। যদি দোষ দেখার পরও [যুক্ত জিনিসসহ] ছাতু বা কাপড়টি ক্রেতা বিক্রি করে দেয়, তাহলেও সে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। কারণ, বিক্রি করার আগে থেকেই সর্বোতই তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং বিক্রি করার দ্বারা সে পণ্য আবদ্ধকারী বিবেচিত হবে না। এ কারণেই আমরা বলি যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে অতঃপর তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পোশাক তৈরির উদ্দেশ্যে তা কাটে এবং সেলাই করে, এরপর কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু যদি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে ফেরত নিতে পারবে। কারণ, প্রথম সূরতে কাপড়ে [অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের] মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে সেলাই করার আগে, আর দ্বিতীয় সূরতে সাব্যস্ত হয়েছে সেলাই করার পর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কাছে তা অর্পণ করার দ্বারা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قَطَعَ الْكَوْبَ الْخ: মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে, এরপর জামা তৈরির উদ্দেশ্যে কাপড়টি কাটে এবং তা সেলাই করে কিংবা তাকে লাল রং দ্বারা রঞ্জিত করে অথবা ছাত্তু ক্রয় করে এবং তাকে ঘি দ্বারা মেখে ফেলে, এরপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, যদিও নিয়ম হচ্ছে, দোষ প্রমাণিত হলে ষ্ঠয়ারে আইবের অধীনে বিক্রীত-পণ্য ফেরত দেওয়া, কিন্তু এ সূরতে অতিরিক্ত জিনিস যোগ করার কারণে কাপড়টি ফেরত দেওয়া বাধ্যপ্রাণ্ড হয়েছে। তবে এ বাধ্যপ্রাণ্ডতার জন্য ক্রেতার হস্তক্ষেপকে দায়ী করা যায় না। কারণ, পণ্যে অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ায় তার পক্ষে ফেরত দেওয়া সম্ভব, কিন্তু বাধ্যপ্রাণ্ড হচ্ছে অন্য কারণে। আর তা হলো, যুক্ত জিনিসটিকে বাদ দিয়ে মূল কাপড় ও ছাত্তু ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যুক্ত জিনিসটি কাপড় ও ছাত্তু থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। আবার যুক্ত জিনিসটি সহ কাপড় ও ছাত্তু ফেরত দেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, যুক্ত জিনিসটি বিক্রীত-পণ্য নয়। যখন কোনোভাবেই ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, তখন দোষের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর বিকল্প উপায় হিসেবে ক্রেতার জন্য ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْبَّائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّ الْأَمْتِنَاءَ الْخ: পূর্বোক্ত মাসআলায় গেছে যে, যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত কাপড় কেটে ফেলার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হয় এবং বিক্রেতা ঐ কাটা কাপড় ফেরত নিতে সম্মত হয়, তাহলে সে তা ফেরত নিতে পারবে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলা হলো, বিক্রেতা যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাত্তু ফেরত নিতে সম্মত হলেও সে তা ফেরত নিতে পারবে না। কারণ, দু'মাসআলায় স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্বোক্ত মাসআলায় কাটা কাপড় ফেরত দেওয়া নিষেধ বিক্রেতা থেকে ক্ষতি রোধ করা এবং তার অধিকার রক্ষার জন্য। আর সে যেহেতু স্বেচ্ছায় ক্ষতি বহনে এবং নিজ অধিকার ত্যাগে সম্মত, তাই সে কাটা কাপড় নিতে পারবে। আর আলোচ্য মাসআলায় যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাত্তু ফেরত নিলে যেহেতু তা সুদ হবে, তাই কাপড় বা ছাত্তু ফেরত নেওয়া শরিয়তের অধিকারের প্রেক্ষিতে নিষেধ। অতএব পূর্বোক্ত মাসআলায় ক্রেতার জন্য কাটা কাপড় ফেরত নেওয়া বৈধ হলেও আলোচ্য মাসআলায় যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাত্তু ফেরত নেওয়া বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرَى بَعْدَ مَا رَأَى الْعَيْبَ الْخ: যদি দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ক্রেতা যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাত্তু বিক্রি করে, তাহলেও সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, বিক্রির পূর্বেই কাপড় বা ছাত্তু ফেরত দেওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং বিক্রি করার মাধ্যমে ক্রেতা ফেরত দেওয়ার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। তাই বিক্রি করা সত্ত্বেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে।

قَوْلُهُ وَعَنْ هَذَا قُلْنَا: إِنْ سَرَّ الْمُشْتَرَى تَرْكُ قَطْعِهِ الْخ: গ্রন্থকার (র.) বলেন, ক্রেতা নিজ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দোষগ্রস্ত পণ্য বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে যেহেতু সে ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তাই আমরা বলি যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে তারপর তার অপ্রাণ্ডবয়স্ক সন্তানের পোশাক তৈরির উদ্দেশ্যে তা কাটে এবং সেলাই করে, এরপর কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু সন্তান যদি প্রাণ্ডবয়স্ক হয়, তাহলে ফেরত নিতে পারবে। কারণ, অপ্রাণ্ডবয়স্ক সন্তানের পোশাক তৈরির নিয়তে যখন ক্রেতা কাপড়টি কাটে, তখন তাতে সন্তানের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা কাটা কাপড় ফেরত নিতে সম্মত হতো, তাহলে ক্রেতার জন্য তা ফেরত দেওয়া সম্ভব হতো না। অতএব ক্রেতা সেলাই করার আগেই কাপড়টি ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করল। আর ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে যেহেতু ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তাই ক্রেতা সেলাই করার পরও ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না।

পক্ষান্তরে প্রাণ্ডবয়স্ক সন্তানের কাছে কোনো জিনিস অর্পণ করার পর সে তার মালিক হয়, তাই সেলাই করার আগে কাপড়ে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। বরং ক্রেতা নিজের মালিকানাধীন কাপড় সেলাই করেছে। আর সেলাই যুক্ত হওয়ার কারণে শরিয়তের অধিকারের প্রেক্ষিতে কাপড়টি ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এ সূরতে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। অতএব সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।



قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَطْلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنَفْسَانِهِ، أَمَّا الْمَوْتُ فَلِأَنَّ الْمَلِكَ يَنْتَهِي بِهِ، وَالْإِمْتِنَاعُ حُكْمِي لَا بِفِعْلِهِ، وَأَمَّا الْإِعْتِقَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ لَا يَرْجِعُ، لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ بِفِعْلِهِ، فَصَارَ كَالْقَتْلِ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ يَرْجِعُ، لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنِّهَاءُ الْمَلِكِ، لِأَنَّ الْأُدْمَى مَا خُلِقَ فِي الْأَصْلِ مَحَلًّا لِلْمَلِكِ، وَإِنَّمَا يَتَّبَتُ الْمَلِكُ فِيهِ مُوقِفًا إِلَى الْإِعْتِقَاقِ، فَكَانَ إِنِّهَاءً، فَصَارَ كَالْمَوْتِ، وَهَذَا لِأَنَّ الشَّيْءَ يَتَقَرَّرُ بِإِنْتِهَائِهِ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمَلِكَ بَاقٍ، وَالرَّدُّ مُتَعَدِّرٌ، وَالسَّيْئِرُ وَالْإِسْتِثْلَاقُ بِمَنْزِلَتِهِ، لِأَنَّ تَعَدُّرَ النُّقْلِ مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِّ بِالْأَمْرِ الْحُكْمِي، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَرْجِعْ شَيْئًا، لِأَنَّهُ حَبَسَ بَذَلِكَ، وَحَبَسُ الْبَدْلِ كَحَبْسِ الْمُبْدَلِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ يَرْجِعُ، لِأَنَّهُ إِنِّهَاءٌ لِلْمَلِكِ، وَإِنْ كَانَ يَعْوِضُ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করে এবং তাকে আজাদ করে দেয় অথবা সে তার কাছে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এরপর ক্রেতা কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারণ এই যে, মৃত্যুর দ্বারা মালিকানার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর [ফেরত দেওয়ার পথে] বাধা এসেছে শরিয়তের বিধানগত কারণে, ক্রেতার নিজস্ব কর্মের কারণে নয়। আর আজাদ করার ক্ষেত্রে কিয়াস [এর দাবি] হলো ক্রেতার ক্ষতিপূরণ ফেরত না পাওয়া। কেননা, এখানে বাধা সৃষ্টি হয়েছে তার নিজস্ব কর্মের কারণে। সুতরাং এটা [গোলামকে] হত্যা করার মতো হয়ে গেল। তবে ইসতিহসান বা সুস্থ কিয়াস মতে ক্রেতা [ক্ষতিপূরণ] ফেরত পাবে। কেননা, আজাদ করা মানে মালিকানার পরিসমাপ্তি ঘটা। কারণ, মানুষকে মূলত মালিকানাধীন বস্তুরূপে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তাতে আজাদ করার সময়কাল পর্যন্ত মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আজাদ করার অর্থ হলো, মালিকানার পরিসমাপ্তি। কাজেই তা মৃত্যুর মতো হলো। আর এটা এজন্য যে, একটি জিনিস পরিসমাপ্তির মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং ধরে নেওয়া হবে যে, মালিকানা বাকি আছে, কিন্তু ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়ে পড়েছে। আর মুদাকবার ও উম্মে ওয়ালাদ বানানো আজাদ করার পর্যায়ভুক্ত। কারণ, মালিকানা আরোপের পাত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মালিকানা হস্তান্তর অসাধ্য হওয়াটা শরিয়তের বিধানগত কারণে। [তার নিজস্ব কর্মের কারণে নয়।] যদি ক্রেতা গোলামকে মাল প্রদানের শর্তে আজাদ করে, তাহলে সে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, সে গোলামের বিনিময় আবদ্ধ করেছে। আর বিনিময় আবদ্ধ করা মূল বস্তু আবদ্ধ করার মতো। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। কেননা, বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে আজাদ করা হলেও তা মালিকানাকে সমাপ্ত করে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُتِبَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَقُولَ قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْخ  
কিংবা গোলাম ক্রেতার কজায় আশার পর মৃত্যুবরণ করে, এরপর ক্রেতা গোলামের এমন কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয় যা বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল, তাহলে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এজন্য নিতে পারবে যে, মৃত্যুর মাধ্যমে মালিকানার সমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমেই জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও যেন গোলামের মধ্যে ক্রেতার মালিকানা থাকা আছে, কিন্তু তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। আর এ অসাধ্যতা ক্রেতার নিজস্ব কর্মের কারণে নয়; বরং মৃত্যু তথা অনিচ্ছাকৃত বিষয়ের কারণে। আর নিয়ম হলো, ফেরত দিতে না পারার ক্ষেত্রে ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী না হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। তাই মৃত্যুবরণ করার সুরতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

خُتِبَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا الْإِعْتِقَاقُ فَلْيَبْسُرْ فِيهِ أَنْ لَا يَبْرِيحَ الْخ  
হলো, ক্ষতিপূরণ ফেরত না পাওয়া। কারণ, এ ক্ষেত্রে ফেরত দিতে না পারার পিছনে ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী। সুতরাং তা গোলামকে হত্যা করার মতো হলো। গোলামকে হত্যা করার পর দোষ প্রকাশ পেলে, ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী হওয়ায় যেক্ষণ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তেমনি আজাদ করার সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না। আর ইসতিহসান বা সুস্থ ক্রিয়াসের দাবি হলো ক্ষতিপূরণ ফেরত পাওয়া। এটা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। কারণ, মানুষকে মূলত মালিকানাধীন বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আজাদ করার সময়কাল পর্যন্ত তাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আজাদ করার মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমেই জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই আজাদকৃত গোলামের উত্তরাধিকারী না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি (۷۰) আজাদকারী পায়। সুতরাং বলা যায় আজাদ করা সত্ত্বেও যেন মালিকানা বাকি আছে। কিন্তু আজাদ করায় বিক্রেতাকে তা ফেরত দেওয়া অসাধ্য। এ অসাধ্যতা যদিও ক্রেতার নিজস্ব কর্মের কারণে, কিন্তু তা এমন একটি কর্ম যা শরিয়ত কামনা করে। আর তাই ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রেতার কর্মকে দায়ী করা হবে না। সুতরাং তা মৃত্যুবরণ করার মতো হয়ে গেল। মৃত্যুবরণ করার সুরতে ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রেতার কর্ম দায়ী না হওয়ায় যেক্ষণ ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পায়, তেমনি আজাদ করার সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

خُتِبَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَقُولَ وَالتَّذْيِيرُ وَالْإِسْتِغْلَادُ بِسَبْرَتِهِ، لَأَنْ تَعْدُرَ السَّلَ الْخ  
সমপর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ গোলাম আজাদ করার পর দোষ সম্পর্কে অবহিত হলে যেক্ষণ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় তেমনি গোলামকে মূলদায়ী বা বাদীকে উমে ওয়ালাদ বানানোর পর দোষ সম্পর্কে অবগত হলেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কারণ, মুদাব্বার ও উমে ওয়ালাদে ক্রেতার মালিকানা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। আর এ অসাধ্যতার জন্য ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী নয়; বরং শরিয়তের নির্দেশের কারণেই ফেরত দেওয়া অসাধ্য। কারণ, শরিয়ত মুদাব্বার ও উমে ওয়ালাদের মালিকানা পরিবর্তনকে অনুমোদন করে না। তাই ক্রেতা ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

خُتِبَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَرْجِعْ بَشْرَ الْخ  
কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয় যা বিক্রেতার কাছে থাকাকালে ছিল, তাহলে গ্রহণকার (র.)-এর মতে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, সে গোলামের বিনিময় আবদ্ধ করেছে। আর বিনিময় আবদ্ধ করা মূল বস্তু আবদ্ধ করার মতো। সুতরাং এটা গোলাম বিক্রি করে দেওয়ার মতো হলো। ক্রেতা গোলামকে বিক্রি করে দেওয়ার সুরতে- নিজস্ব কর্মের কারণে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হওয়ায় যেক্ষণ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তেমনি আলোচ্য সুরতেও পাবে না।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কারণ, বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে হলেও তার মাধ্যমে মালিকানার সমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমে জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। আর সে কারণেই বিনিময় গ্রহণ করে আজাদ করা হলেও আজাদকৃত গোলামের উত্তরাধিকারী না থাকলে আজাদকারী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি (۷۰) লাভ করে। সুতরাং তা বিনিময় গ্রহণ ছাড়া আজাদ করার মতো হলো। বিনিময় গ্রহণ ছাড়া আজাদ করার সুরতে ক্রেতা যেক্ষণ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায়, তেমনি বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে আজাদ করা হলেও ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে।

فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرَى الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِفَةَ (رحا)، أَمَّا الْقَتْلُ فَالْمَذْكُورُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحا) أَنَّهُ يَرْجِعُ، لِأَنَّ قَتْلَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ دُنْيَاوِيٌّ، فَصَارَ كَالْمَوْتِ حَتْفٍ أَنْفِهِ فَيَكُونُ إِنْهَاً، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يُوجَدُ إِلَّا مَضْمُونًا، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ هُنَا بِإِغْتِبَارِ الْمَلِكِ، فَيَصِيرُ كَالْمُسْتَفِيدِ بِهِ عَوْضًا بِخِلَافِ الْإِغْتِقِ، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ لَا مَحَالَةَ كِإِغْتِقِ الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَرَكًا، وَأَمَّا الْأَكْلُ فَعَلَى الْخِلَافِ، عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ، وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا .

**অনুবাদ :** যদি ক্রেতা গোলামকে হত্যা করে অথবা খাদদ্রব্য হলে তা খেয়ে ফেলে, [এরপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়] তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। হত্যা সম্পর্কিত উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি হলো জাহের রেওয়ায়েত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কেননা, মনিব কর্তৃক স্বীয় গোলামকে হত্যা করার সঙ্গে জাগতিক কোনো বিধান [কিনাস, দিয়ত ইত্যাদি] জড়িত নয়। সুতরাং [এদিক থেকে] এটা স্বাভাবিক মৃত্যুর মতো হয়ে গেল। তাই হত্যা করাটা হবে মালিকানার পরিসমাপ্তি। আর জাহের রেওয়ায়েতের দলিল হলো, কোনো হত্যা দায়মুক্ত হয় না। এ ক্ষেত্রে দায় রহিত হচ্ছে মালিকানার দিক বিবেচনায়। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মতো হবে- যে মালিকানার পরিবর্তে বিনিময় লাভ করে কিন্তু আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তা কোনোভাবেই দায়বদ্ধতাকে আবশ্যক করে না। যেমন- দরিদ্র ব্যক্তি কর্তৃক শরিকানাভুক্ত গোলামকে আজাদ করে দেওয়া। [তখন গোলামকেই উপার্জনের মাধ্যমে অপর মালিকের দায় পরিশোধ করতে হয়।] আর খাদদ্রব্যের বিষয়টিও মতবিরোধপূর্ণ। সাহেবাইন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইসতিহসান হিসেবে ফেরত নিতে পারবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَوْنُهُ فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرَى الْخ: উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. এক ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করে তাকে হত্যা করেছে। এরপর গোলামের এমন দোষ সম্পর্কে অবগত হয়েছে, যা বিক্রেতার কাছে ছিল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটি জাহের রেওয়ায়েত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। যানাবী'-এর বর্ণনা মতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও এটি।

২. এক ব্যক্তি খাদদ্রব্য ক্রয় করে খেয়ে ফেলেছে কিংবা কাপড় ক্রয় করে তা পরিধান করেছে এবং তা ছিড়ে ফেলেছে এরপর দোষ সম্পর্কে অরগত হয়েছে, তাহলে সাহেবান (র.)-এর অভিমতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতও এটি। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইসতিহসান হিসেবে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। -[বিনায়া, প্রাণ্ডক, পৃ. ১৫৭]

قَوْلُهُ لَأَنْ قَتَلَ النُّوْلَى عَيْدًا لَا يَتَمَلَّقُ بِهِ حُكْمُ الْخ: প্রথম মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মনিব কর্তৃক গোলামকে হত্যা করার সাথে জাগতিক কোনো হুকুম জড়িত নয়। অর্থাৎ মনিবের উপর কিসাস বা দিয়ত আবশ্যক হয় না। সুতরাং তা স্বাভাবিক মৃত্যুর মতো। স্বাভাবিক মৃত্যুর সুরতে যেরূপ ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে, তেমনি আলোচ্য সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। স্বাভাবিক মৃত্যুর সুরতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ এ জন্য ফেরত নিতে পারে যে, মৃত্যুর মাধ্যমে ক্রেতার মালিকানার সমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমে জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। অতএব যেন ক্রেতার গোলামে মালিকানা বাকি আছে, কিন্তু মৃত্যুবরণ করার কারণে গোলামটি বিক্রোক্তকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হচ্ছে। তবে এ অসাধ্যতার জন্য ক্রেতার কর্ম দায়ী নয়। আর নিয়ম হলো, ফেরত দিতে না পারার জন্য যদি ক্রেতার কর্ম দায়ী না হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে।

قَوْلُهُ وَوَجْهَ الظَّاهِرِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يُوْجَدُ إِلَّا مَضْرُوبًا الْخ: কিন্তু জাহের রেওয়ায়েতের দলিল হলো, কোনো হত্যা দায়মুক্ত হয় না। রাসুল্লাহ ﷺ বলেন: لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ دَمٌ مُتْرَكٌ “ইসলামে কোনো রক্ত বৃথা যায় না”। কিসাস কিংবা দিয়ত, দুটির যে কোনো একটি অবশ্যই অনিবার্য হবে। কিন্তু মনিব কর্তৃক গোলামকে হত্যা করার ক্ষেত্রে দায় (صَان) রহিত হচ্ছে মালিকানার দিক বিবেচনায়। যদি ক্রেতা অন্য কোনো ব্যক্তির গোলামকে হত্যা করত সেক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা (قَتْلُ عَدُوٍّ) করলে তার উপর কিসাস, আর ভুলক্রমে হত্যা (قَتْلُ خَطَا) করলে তার উপর দিয়ত আবশ্যক হতো। কিন্তু মালিকানার কারণে তার উপর কিসাস বা দিয়ত আবশ্যক হচ্ছে না। অতএব যেন মালিকানার বিনিময় স্বরূপ কেসাস বা দিয়ত থেকে সে বেঁচে যাচ্ছে। সুতরাং হত্যা করাটা বিক্রি করার মতো হলো। বিক্রি করার সুরতে যেমন ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে না, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

قَوْلُهُ يَخْلَا الْإِعْتِقَ، لَأَنَّهُ لَا يُوْجِبُ الْقِسَانَ الْخ: কিন্তু গোলাম আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তা কোনোভাবেই দায়বদ্ধতা (صَان)-কে আবশ্যক করে না। উদাহরণত একটি গোলামে দু-ব্যক্তির অংশীদারিত্ব আছে। তাদের একজন দরিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তি তার অংশকে আজাদ করে দিল। এতে গোলামের অপর অংশও আজাদ হয়ে যায়। কিন্তু এজন্য আজাদকারীর উপর কোনো দায় (صَان) আরোপিত হয় না; বরং গোলাম শ্রম ও মেহনতের মাধ্যমে এ অর্ধেকের মূল্য মালিককে পরিশোধ করবে। অতএব হত্যা করার সুরতে মালিকানার বিনিময় স্বরূপ কেসাস বা দিয়ত থেকে যেরূপ ক্রেতা মুক্তি লাভ করে, আজাদ করার সুরতে মালিকানার পরিবর্তে ক্রেতা এ ধরনের কোনো বিনিময় লাভ করছে না। তাই হত্যা করাটা বিক্রি করার মতো হলেও আজাদ করাটা বিক্রি করার মতো নয়; বরং তা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার মতো। স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার পর যদি ক্রেতা দোষ সম্পর্কে অবগত হয় সেক্ষেত্রে যেক্ষণ ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে, তেমনি আজাদ করার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হলেও ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ إِذَا لَبَسَ الثَّوْبَ حَتَّى تَحْرُقَ، لَهُمَا أَنَّهُ صَنَعَ فِي الْمَبِيعِ مَا يُقْصَدُ بِشِرَائِهِ وَنُعْتَادُ فَعْلَهُ فِيهِ فَاشْتَبَهَ الْإِعْتَاقَ، وَلَهُ أَنَّهُ تَعَدَّرَ الرَّدُّ بِفَعْلٍ مَضْمُونٍ مِنْهُ فِي الْمَبِيعِ، فَاشْتَبَهَ الْمَبِيعَ وَالْقَتْلَ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِكَوْنِهِ مَقْصُودًا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَبِيعَ مِمَّا يُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ، ثُمَّ هُوَ يَنْعَى الرَّجُوعَ، فَإِنَّ أَكْلَ بَعْضِ الطَّعَامِ ثُمَّ نَلِمَ بِالْعَيْبِ فَكَذًا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحم)، لِأَنَّ الطَّعَامَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، فَصَارَ مَبِيعُ الْبَعْضِ، وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنَقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرُدُّ مَا بَقِيَ، لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبَعِيضُ.

অনুবাদ : একই মতপার্থক্য রয়েছে, যদি [বিক্রীত-পণ্য কাপড় হয় আর] ক্রেতা কাপড় পরিধান করে এবং তা ছিড়ে-ফেটে যায়। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, যে উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করা হয়ে থাকে, ক্রেতা পণ্যে তাই করেছে। আর এ ধরনের আচরণ করার প্রচলনও আছে। সুতরাং তা আজাদ করার সদৃশ হলো। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- বিক্রীত দ্রব্যটি ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়েছে বিক্রীত দ্রব্যের মাঝে ক্রেতার দায়বদ্ধ কর্মের কারণে। সুতরাং তা বিক্রি করা ও হত্যা করার সদৃশ হলো। আর কৃতকর্মের [অর্থাৎ খাওয়া ও পরিধান করা] উদ্দেশ্যভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। তুমি কি দেখ না যে, কখনো কখনো বিক্রি করাও ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তা ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়াকে বাধ্যগ্রস্ত করে। যদি ক্রেতা [ক্রয়কৃত] খাদদ্রব্যের কিছু অংশ খায় তারপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একই বিধান। কারণ, সম্পূর্ণ খাবারটি একটি বস্তুর মতো। সুতরাং এটা বিক্রীত-পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করে দেওয়ার মতো হলো। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ খাবারটার দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। তাঁদের থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনা আছে যে, ক্রেতা অবশিষ্ট অংশটুকু বিক্রেতাকে ফেরত দেবে, আর ভক্ষিত অংশের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে। কেননা, খাদদ্রব্য খণ্ডিতকরণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّهُ صَنَعَ فِي الْمَبِيعِ مَا يُقْصَدُ بِشِرَائِهِ الخ : দ্বিতীয় মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে- পণ্য যে উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়ে থাকে ক্রেতা পণ্যে অর্থাৎ খাদদ্রব্যে এবং কাপড়ে তাই করেছে। আর মানুষের এ ধরনের কাজ অর্থাৎ খাবারের জিনিস খেয়ে ফেলা এবং কাপড় পরিধান করা একটি প্রচলিত বিষয়ও। খাদদ্রব্যকে খেয়ে ফেলার দ্বারা এবং কাপড়কে পরিধান করে ছিড়ে ফেলার দ্বারা ক্রেতার মালিকানার সমাপ্তি ঘটেছে। আর সমাপ্তির মাধ্যমে জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। অতএব খাদদ্রব্যকে খেয়ে ফেলা এবং কাপড়কে পরিধান করে ছিড়ে ফেলা গোলামকে আজাদ করার মতো হলো। আর গোলাম আজাদ করার সূরতে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে, তেমনি আলোচ্য সূরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّكُّ بِغَيْلٍ مَضْمُونِ الْح :

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হিসেবে গ্রহণকার (র.) বলেন, যখন ক্রোতা পণ্যকে খেয়ে ফেলল কিংবা পরিধান করে ছিড়ে ফেলল, তখন পণ্যকে বিক্রোতার কাছে ফেরত দেওয়া ক্রোতার এমন কর্মের কারণে অসাধ্য হলো যার উপর দায় (ضَمَانٌ) আরোপিত হয়। যদি ক্রোতা অন্যের মালিকানাধীন জিনিস খেত কিংবা অন্যের মালিকানাধীন কাপড় পরিধান করে ছিড়ে ফেলত, তাহলে তার উপর অবশ্যই দায় (ضَمَانٌ) আরোপিত হতো। কিন্তু ক্রোতা যেহেতু নিজেই মালিক, তাই দায় আরোপিত হয়নি। সুতরাং যেন ক্রোতা স্বীয় মালিকানা অর্থাৎ পণ্যের বিপরীতে বিনিময় স্বরূপ দায় থেকে মুক্তি লাভ করেছে। যখন ক্রোতা বিনিময় লাভকারী হলো, তখন এ সুরতও পণ্য বিক্রি করা এবং হত্যা করার মতো হলো। আর এ দু-সুরতে ক্রোতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে না, তেমনি পণ্যকে খেয়ে ফেলার বা পরিধান করে ছিড়ে ফেলার সুরতেও ক্রোতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَا مُغْتَبَرٌ بِكَرْبِهِ مَقْصُودُ الْح : গ্রহণকার (র.) সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের উত্তরে বলেন, দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রোতা খাদদ্রব্য বা কাপড় কি উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছে তা বিবেচ্য নয়। কারণ, অনেক সময় ব্যবসা হিসেবে বিক্রি করাও ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয়। আর পণ্য বিক্রি করার পর দোষ প্রকাশ পেলে ক্রোতা কিছুতেই ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ أَكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْبَعْثِ الْح : গ্রহণকার (র.) বলেন, যদি খাদদ্রব্যের কিছু অংশ খাওয়ার পর ক্রোতা দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একই বিধান অর্থাৎ ক্রোতা দোষের কারণে অবশিষ্ট অংশ ফেরতও দিতে পারবে না আবার ভক্ষিত অংশ ও অবশিষ্ট অংশের ক্ষতিপূরণ ফেরতও নিতে পারবে না। কারণ, সম্পূর্ণ খাবার একটি দ্রব্যের মতো। আর দোষের কারণে একই দ্রব্যের কিছু অংশ ফেরত দেওয়া, আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া জারাজ নেই। আর সম্পূর্ণ পণ্যটি ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রোতার নিজস্ব কর্ম দায়ী। আর ক্রোতার নিজস্ব কর্মের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া অসাধ্য হলে ক্রোতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না। তাই এ সুরতে ক্রোতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

এটা পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার মতো হলো। পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হলে ক্রোতা যেক্ষেপ ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে না, তেমনি আলোচ্য সুরতেও ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

সাহেবাইন (র.) থেকে এ মাসআলায় দুটি রেওয়ায়েত আছে। এক রেওয়ায়েত হলো, বিক্রোতা থেকে সম্পূর্ণ খাদদ্রব্যের দোষের ক্ষতিপূরণ ক্রোতা ফেরত নিতে পারবে। অর্থাৎ যেটুকু খেয়েছে তার ক্ষতিপূরণও ফেরত নিতে পারবে এবং যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুর ক্ষতিপূরণও ফেরত নিতে পারবে; কিন্তু অবশিষ্ট অংশটুকু বিক্রোতাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, সম্পূর্ণ খাবারটি একটি দ্রব্যের মতো। সুতরাং ভাগ করায় তাতে নতুন একটি দোষ সৃষ্টি হলো। আর ক্রোতার কজায় কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন অর্থাৎ বিক্রোতার কজায় থাকা দোষের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় না। তাই ক্রোতা অবশিষ্ট অংশ ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ খাদদ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কারণ, সাহেবাইন (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ খাদদ্রব্যটি খেয়ে ফেলার সুরতে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। সুতরাং কিছু খেয়ে ফেলার সুরতে আরো উত্তমভাবেই ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

অন্য রেওয়ায়েত হলো, যেটুকু খেয়ে ফেলেছে ক্রোতা সেটুকুর দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা বিক্রোতাকে ফেরত দিবে। কারণ, খাদদ্রব্য ভাগ করা ক্ষতিকর নয়। যখন ভাগ করা ক্ষতিকর নয় তখন ক্রোতার কজায় পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলো না। আর ক্রোতার কজায় নতুন দোষ সৃষ্টি না হলে পুরাতন দোষের কারণে ক্রোতা পণ্য ফেরত দিতে পারে। তাই ক্রোতা অবশিষ্ট খাবার ফেরত দিতে পারবে। আর ভক্ষিত অংশে দোষের কারণে ক্রোতার যেহেতু ক্ষতি হয়েছে, তাই ক্রোতা ভক্ষিত অংশের দোষের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

قَالَ : وَمَنْ اشْتَرَى بَيْضًا أَوْ بَطِيخًا أَوْ قِثَاءً أَوْ خِيَارًا أَوْ جَوْزًا فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، وَلَا يُغْتَبَرُ فِي الْجَوْزِ صَلَاحُ قَشِيرِهِ عَلَى مَا قِيلَ، لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ بِإِعْتِبَارِ اللَّبِّ، وَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدَّ، لِأَنَّ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِثٌ، وَلِكُنْهَ يَرْجِعُ بِنَقْصَانِ الْعَيْبِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ يَقْدِرُ الْإِمْكَانَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحا) : يَرُدُّهُ، لِأَنَّ الْكَسْرَ يَتَسَلِّطُ عَلَيْهِ، قُلْنَا : التَّسْلِيطُ عَلَى الْكَسْرِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لِأَنِّي مَلَكَهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ، وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضُ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيلٌ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ فَاسِدٍ، وَالْقَلِيلُ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ الْجَوْزُ عَادَةً كَالْوَاحِدِ وَالْإِنْتَيْنِ فِي الْمِائَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَجُوزُ، وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ، لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ، فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَرِّ وَعَبْدِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি ডিম, খরবুজা, কাঁকড়ি, শসা বা আখরোট ক্রয় করার পর ভেঙ্গে দেখতে পায় যে, তা নষ্ট। এখন যদি তা উপকার লাভের যোগ্য না হয়, তাহলে ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে। কারণ, তা মালই নয়। সুতরাং বিক্রয়চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এক মতানুসারে আখরোটের বেলায় তার খোসার উপযোগিতা বিবেচ্য হবে না। কারণ, তার মূল্যমান শাঁসের উপর নির্ভর করে। আর যদি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উপকার লাভের যোগ্য হয়, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, ভেঙ্গে ফেলাটা একটি নতুন দোষ। তবে ক্রেতা দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। যাতে যথাসম্ভব [উভয় পক্ষের] ক্ষতি রোধ করা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা তা ফেরত দেবে। কেননা, ভেঙ্গে ফেলাটা [যদিও একটি নতুন দোষ কিন্তু তা] বিক্রেতার প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হলো, ভাঙ্গার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ক্রেতার মালিকানা, বিক্রেতার মালিকানা নয়। সুতরাং এটা ঐ সুরতের মতো হলো যে, বিক্রীত, পণ্য ছিল কাপড়, আর ক্রেতা তা কেটে ফেলেছে, [এরপর দোষ প্রকাশ পেয়েছে] : যদি ক্রেতা কিছু [অংশ] নষ্ট পায় এবং তা সামান্য হয়, তাহলে ইসতিহসান হিসেবে বিক্রয় বৈধ হবে। কারণ, কোনো দ্রব্যই কিছু [অংশ] নষ্ট হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর আখরোট তো সাধারণত কিছু [অংশ] নষ্ট না হয়ে থাকে না। যেমন- শতের মধ্যে এক-দুটি। আর যদি নষ্টের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ নেই। ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে। কারণ, বিক্রেতা এখানে মাল এবং যা মাল নয় উভয়কে একত্র করেছে। সুতরাং এটা স্বাধীন মানুষ দাস একত্র করার মতো হলো।

قَوْلُهُ قُلْنَا: اَلتَّسْلِيْطُ عَلٰى الْكَفْرِ فِى ذٰلِكَ الْمُنْتَهٰى اِلَیْهِ  
ভাঙ্গার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে বিক্রেতার পক্ষ থেকে পেয়েছে, কিন্তু বিক্রেতা তাকে তার মালিকানায ভাঙ্গার ক্ষমতা দিয়েছে:



নিজের মালিকানায় নয়। কারণ, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কারণে ফলগুলোর মালিক ক্রেতা হয়ে গেছে। আর মালিক তার মালিকানাধীন জিনিস ভাঙ্গলে এর জন্য তার কর্মই দায়ী হয়। অতএব আলোচ্য সুরতে ফলগুলো ভাঙ্গার দ্বারা পণ্যে ক্রেতার পক্ষ থেকেই নতুন দোষ সৃষ্টি হয়েছে। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন দোষ সৃষ্টি হলে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যায় না। অতএব ক্রেতা ফলগুলো ফেরত দিতে পারবে না।

এর উদাহরণ হলো, ক্রেতা ক্রয়কৃত কাপড় কাটার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়েছে। এ সুরতে পণ্যটি ক্রেতার কাছে বিক্রি করার মাধ্যমে কাটার ক্ষমতা বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রদান করা সত্ত্বেও যেহেতু তা ক্রেতার মালিকানায় হয়েছে তাই ক্রেতা দোষের কারণে কাপড়টি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে না। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলাতেও ফলগুলো ক্রেতা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضُ نَاسِدًا وَهُوَ قَلِيلٌ الْخ : আর যদি আখরোট বা এ জাতীয় পণ্য কিছু অংশ নষ্ট বের হয়, তাহলে এর দূ সুরত—

১. নষ্টের পরিমাণ কম, তাহলে ইসতিহসান হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হবে। কারণ, অনেকগুলো আখরোটের মাঝে সামান্য কিছু নষ্ট হয়েই থাকে। সুতরাং তা গমের সাথে লেগে থাকা মাটির মতো। গম থেকে মাটি পরিষ্কার করে বিক্রি করা যেরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তেমনি নষ্টমুক্ত আখরোট বেছে বেছে বিক্রি করাও কষ্টসাধ্য। তাছাড়া গুটিকতক নষ্টের কারণে যদি অবশিষ্ট সবগুলোতেই বিক্রয় ফাসিদ হয়, তাহলে স্বাভাবিক বেচাকেনার রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে।

তবে কি পরিমাণকে অল্প বলা হবে তা নির্ধারণে গ্রন্থকার (র.) বলেন, শতের মাঝে এক-দুটোকে অল্প বলা হবে। ফকীহ আবুল লাইস (র.) জামে সগীরের ব্যাখ্যায় শতের মাঝে পাঁচ/ছয়টিকে কম বলে নির্ধারণ করেছেন। যখীরা গ্রন্থে আছে যে, 'কেউ যদি একশ' ডিম ক্রয় করে এবং তন্মধ্যে একটি বা দুটি কিংবা তিনটি পচা পায়, তাহলে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। সুতরাং যখীরা গ্রন্থকার শতের মাঝে তিনটিকে কম বলে নির্ধারণ করেছেন।

২. নষ্টের পরিমাণ বেশি, তাহলে সবগুলোই বিক্রয় নাজায়েজ। ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে ধরা হবে যে, বিক্রেতা মাল ও যা মাল নয় উভয়টাকে এক চুক্তিতে একত্র করেছে। আর মাল ও যা মাল নয় উভয়টাকে এক চুক্তিতে একত্র করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। যেমন— কেউ গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তিতে একত্র করল। গোলাম হলো মাল, আর স্বাধীন ব্যক্তি মাল নয়। দুটোকে এক চুক্তিতে একত্র করায় উভয়টিতেই বিক্রয় ফাসিদ।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بَعِيْبٍ، فَإِنْ قِيلَ بِقَضَاءِ  
الْقَاضِي بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءٍ يَمِينٍ، لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَانِعِهِ، لِأَنَّهُ قَسَخَ مِنَ  
الْأَصْلِ، فَجُعِلَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ، لَكِنَّهُ صَارَ  
مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ، وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالإِقْرَارِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الإِقْرَارَ، فَأَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ  
وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ بَعِيْبٍ بِالْبَيِّنَةِ، حَيْثُ يَكُونُ رَدًّا عَلَى  
الْمُوَكَّلِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ، وَالْمَوْجُودُ هُنَا بَيْعَانِ، فَيَفْسَخُ الشَّانِي  
لَا يَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা তা আবার বিক্রি করে, এরপর ক্রেতার কাছে [গোলামটি] দোষজনিত কারণে ফেরত আসে এখন যদি ক্রেতা স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ বা কসমে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে বিচারকের রায়ক্রমে [গোলামটি] গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে গোলামটি তার বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা, এটা হলো মূল বিক্রয়চুক্তি রহিতকরণ। অতএব ধরে নেওয়া হবে যেন দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তিটি অস্তিত্বই লাভ করেনি। [তাই বিক্রেতাকে ক্রেতা গোলামটি ফেরত দিতে পারবে।] অস্বীকৃতির ভিত্তিতে বিচারকের রায়ের সূরতে সর্বোচ্চ এটা বলা যেতে পারে যে প্রথম ক্রেতা দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল, কিন্তু বিচারকের রায়ের মাধ্যমে শরিয়ত কর্তৃক সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে। স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়ের অর্থ এই যে, দ্বিতীয় বিক্রেতা [পূর্বের] স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর তা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। বিক্রয়ের উকিলের চেয়ে আলোচ্য মাসআলাটি ভিন্ন। বিক্রয়ের উকিলের কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দোষজনিত কারণে যদি বিক্রীত-পণ্য ফেরত প্রদান করা হয়, তাহলে তা মুআকিলের কাছে ফেরত প্রদান বলে গণ্য হয় : কেননা, সেক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি একটিই, আর আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তি দুটি। সুতরাং দ্বিতীয়টি বিলুপ্ত হওয়ায় প্রথমটি বিলুপ্ত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا الْغ : এক ব্যক্তি একটি গোলাম বিক্রি করল, তারপর ক্রেতা আবার তা বিক্রি করল, এরপর দ্বিতীয় ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রথম ক্রেতার কাছে গোলামটি দোষজনিত কারণে ফেরত আসল, প্রথম ক্রেতা গোলামটিকে ফেরত গ্রহণ করল বিচারকের ফয়সালাক্রমে অথবা বিচারকের ফয়সালা ছাড়া। বিচারকের ফয়সালায় তিনটি ভিত্তি হতে পারে—

১. প্রথম ক্রেতার স্বীকারোক্তি (إِقْرَارٌ) গ্রন্থকার (র.) বলেন, وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالإِقْرَارِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الإِقْرَارَ الْغ অর্থাৎ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের ফয়সালায় অর্থ হলো, প্রথম ক্রেতা বিচারকের অনুপস্থিতিতে এ কথা স্বীকার করে যে, দ্বিতীয় ক্রেতা পণ্যে যে দোষের দাবি করেছে তা পণ্যটি তার কাছে থাকা অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু বিচারকের সম্মুখে এ স্বীকারোক্তিকে সে অস্বীকার করে। এরপর দ্বিতীয় ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তার স্বীকারোক্তিকে সাব্যস্ত করে।

আলামা আইনী (র.) বলেন, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) মতনের “স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের ফয়সালা” বক্তব্যের উক্ত ব্যাখ্যা এজন্য দিয়েছেন যে, প্রথমবার দোষের কথা স্বীকার করার পর যদি প্রথম ক্রেতা তা পুনরায় অস্বীকার না করে, তাহলে পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য বিচারকের ফয়সালার প্রয়োজন হয় না; বরং স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতেই তা ফেরত দেওয়া যায়।

২. দ্বিতীয় ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ। দ্বিতীয় ক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে পণ্যে যে দোষের দাবি করেছে তা পণ্যটি প্রথম ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই ছিল।

৩. প্রথম ক্রেতার কসমে অস্বীকৃতি। অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রেতা তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়ে প্রথম ক্রেতার কাছে এ মর্মে কসম দাবি করল যে, সে যে দোষের দাবি করেছে তা পণ্যটি তার [অর্থাৎ প্রথম ক্রেতার] কাছে থাকা অবস্থায় ছিল না। কিন্তু প্রথম ক্রেতা কসম করতে অস্বীকৃতি জানাল।

এ তিনটির কোনো একটির ভিত্তিতে বিচারকের ফয়সালাক্রমে যদি প্রথম ক্রেতা পণ্যটি ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে তার এ অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে ঐ পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে; যদি দোষটি তার নিজের কন্ডায় থাকা অবস্থায় সৃষ্টি না হয়ে থাকে। কারণ, বিচারকের ফয়সালাক্রমে দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে পণ্যটি ফেরত গ্রহণ করায় দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তি মূল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেন দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তি কখনো অস্তিত্বেই লাভ করেনি। অতএব ধরে নেওয়া হবে যে, ক্রয়ের পর পণ্যে প্রথম ক্রেতা এমন কোনো হস্তক্ষেপ করেনি, যার ফলে পণ্যটি দোষজনিত কারণে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়। তাই ক্রেতা ইচ্ছা করলে পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে।

قَوْلُهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَنْكَرَ فِيمَا الْعَبَّ الْخ: গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি মূলত ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিচারকের ফয়সালার ভিত্তিতে প্রথম ক্রেতা কর্তৃক বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অর্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে সে তার কাছে থাকা অবস্থায় পণ্যে দোষ থাকার কথা অস্বীকার করেছে, যার কারণে বিচারকের ফয়সালার প্রয়োজন হয়েছে। যখন সে পণ্যে দোষ থাকার কথা অস্বীকারই করল তখন কোন ভিত্তিতে সে প্রথম বিক্রেতাকে পণ্যটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে?

এর উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, প্রথম ক্রেতা দোষ থাকার কথা অস্বীকার করেছিল ঠিকই, কিন্তু বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে সে শরিয়ত কর্তৃক মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার কাছে থাকা অবস্থায় পণ্যটিতে উক্ত দোষ ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে এবং তার দোষ না থাকার উক্তি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং যেন সে দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেনি। তাই বিক্রেতার কাছে দোষজনিত কারণে পণ্যটি ফেরত দেওয়ায় কোনো বাধা নেই।

قَوْلُهُ وَمَا يَخْلِبُ الرُّكْبَلِ بِاتَّبَعِ إِذَا الْخ: গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যের মাধ্যমে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, বিক্রয়ের উকিলের কাছে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দোষজনিত কারণে ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য ফেরত প্রদান করা হয়, তাহলে তা মুআকিলের কাছে ফেরত প্রদান বলে গণ্য হয়। আলাদাভাবে উকিলের মুআকিলের কাছে ফেরত দিতে হয় না। তাহলে আলোচ্য মাসআলায় বিচারকের ফয়সালাক্রমে প্রথম ক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত প্রদানকে কেন বিক্রেতার কাছে ফেরত প্রদান বলে গণ্য করা হবে না?

এর উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, ওকালতির সুরতে বিক্রয়চুক্তি একটি। উকিল ও মুআকিলের মাঝে কোনো বিক্রয়চুক্তি হয়নি। বরং উকিলের বিক্রয় করা আর মুআকিলের বিক্রয় করা এক কথা। উকিলের কাছে ফেরত আসা মানে মুআকিলের কাছে ফেরত আসা। আর আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তি দুটি। প্রথমটি হলো, বিক্রেতা ও প্রথম ক্রেতার মাঝে। আর দ্বিতীয়টি হলো, প্রথম ক্রেতা ও দ্বিতীয় ক্রেতার মাঝে। যেহেতু উভয় চুক্তিই স্বতন্ত্র চুক্তি, তাই দ্বিতীয়টি বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারা প্রথমটি বিলুপ্ত হবে না। এ কারণেই প্রথমটি বিলুপ্ত করার জন্য প্রথম ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছে বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে হবে।

وَإِنْ قِيلَ يَغْيِرُ قَضَاءُ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ، وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّهِمَا وَالْأَوَّلُ ثَالِثُهُمَا، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِأَقْرَابِهِ يَغْيِرُ قَضَاءُ بَعْضٍ لَا يَخْدُثُ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الَّذِي بَاعَهُ، وَبِهَذَا يَتَّخِذَنَّ أَنَّ الْجَوَابَ فِيمَا يَخْدُثُ مِثْلُهُ وَفِيمَا لَا يَخْدُثُ سَوَاءٌ، وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِ الْبُيُوعِ: أَنَّ فِيمَا لَا يَخْدُثُ مِثْلُهُ يَرْجِعُ بِالتَّقْصَانِ لِلتَّيَقُّنِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْأَوَّلِ.

অনুবাদ : আর যদি বিচারকের রায় ব্যতীত [তথা দ্বিতীয় বিক্রেতা] ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে সে তা [প্রথম বিক্রেতাকে] ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, যদিও তাদের দু জনের [প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রেতার] ক্ষেত্রে এ ফেরত গ্রহণ [দ্বিতীয়] বিক্রয়চুক্তির বিলোপ বলে বিবেচিত, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন বিক্রয়চুক্তি। আর [আলোচ্য মাসআলায়] তাদের দু জনের জন্য প্রথম বিক্রেতাই তৃতীয়জন। জামে সগীরে আছে, যদি প্রথম ক্রেতার কাছে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের রায় ছাড়াই এমন দোষজনিত কারণে পণ্যটি ফেরত প্রদান করা হয় যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, তাহলে তার কাছে যে বিক্রি করেছে তার বিরুদ্ধে সে দাবি উত্থাপন করতে পারবে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে, আর যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না উভয় ক্ষেত্রেই হুকুম এক ও অভিন্ন। [মাবসূত কিতাবের] ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না সেক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা [প্রথম বিক্রেতা থেকে] ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, এটা নিশ্চিত যে, প্রথম বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় পণ্যে এ দোষটি ছিল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قِيلَ يَغْيِرُ قَضَاءُ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ الخ : আর যদি বিচারকের ফয়সালা ছাড়া প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে পণ্যটি ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে ইমাম কুদুরী (র.)-এর বক্তব্য হলো, প্রথম ক্রেতার এ অধিকার থাকবে না যে, সে ইচ্ছা করলে ঐ পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে।

দোষ দু ধরনের-

১. যে দোষ প্রথম ক্রেতার কাছে নতুন করে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। যেমন- বালগ গোলাম পলায়ন বা চুরি করেছে।
২. যে দোষ প্রথম ক্রেতার কাছে নতুন করে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়; বরং পূর্ব থেকেই ছিল। যেমন- গোলামের হাতের আঙ্গুল ছয়টি কিংবা একটি চোখ টেরা। এ দু ধরনের দোষের হুকুম কি এক, না ভিন্ন ভিন্ন, তা ইমাম কুদুরী (র.)-এর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি।

জামে সগীরে আছে, যদি প্রথম ক্রেতার কাছে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের রায় ছাড়াই এমন দোষজনিত কারণে পণ্যটি ফেরত প্রদান করা হয়, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, তাহলে তার কাছে যে ব্যক্তি বিক্রি করেছে তার বিরুদ্ধে সে দাবি উত্থাপন করতে পারবে না।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামে সগীরের এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারা আর নতুনভাবে সৃষ্টি হতে না পারা উভয় প্রকার দোষের ক্ষেত্রেই হকুম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যটি ফেরতও দিতে পারবে না এবং দোষের ক্ষতিপূরণও ফেরত পাবে না।

কিন্তু মাবসূত কিতাবের ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না সেক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে, তবে পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। এ বর্ণনায় দু ধরনের দোষের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে।

মাবসূত কিতাবের বর্ণনার দলিল হলো, যে দোষ নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে না তা যে পণ্য প্রথম বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই তাতে ছিল এ বিষয়টি নিশ্চিত। কিন্তু বিচারকের ফয়সালা ছাড়া ফেরত নেওয়ায় পণ্যটি বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হচ্ছে, তাই প্রথম ক্রেতা বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

জামে সগীর ও কুদূরীর বক্তব্যের দলিল হলো, বিচারকের ফয়সালা ছাড়া স্বীয় সম্মতিক্রমে গোলাম ফেরত গ্রহণ করাটা যদিও তাদের দুজনের [প্রথম ক্রেতা ও দ্বিতীয় ক্রেতার] ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তির বিলুপ্তি সাধন বলে বিবেচিত, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন বিক্রয়চুক্তি। আর বিক্রেতা এ ক্ষেত্রে তাদের দুজনের জন্য তৃতীয়জন। সুতরাং বিক্রেতার হিসাবে যেন প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে গোলামটি নতুন করে ক্রয় করল। আর নতুন করে ক্রয় করার সুরতে যেহেতু দোষের প্রতি সম্মতি বুঝায়, তাই বিক্রেতার বিরুদ্ধে প্রথম ক্রেতা দাবি উত্থাপনেরও অধিকার পাবে না এবং বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়ারও অধিকার পাবে না।

قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَبَضَهُ فَادَّعَى عَيْبًا لَمْ يُجِبْهُ عَلَيْهِ دَفْعَ الثَّمَنِ حَتَّى يَخْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ يَقِيمَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ ، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ وَجُوبَ دَفْعِ الثَّمَنِ حِينَ أَنْكَرَ تَعَيَّنَ حَقُّهُ بِدَعْوَى الْعَيْبِ ، وَدَفْعُ الثَّمَنِ أَوَّلًا لِتَتَعَيَّنَ حَقُّهُ بِإِزَاءِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَعِينِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَضِيَ بِالدَّفْعِ فَلَعَلَّهُ يَظْهَرُ الْعَيْبُ فَيَنْتَقِصُ الْقَضَاءُ فَلَا يَقْضَى بِهِ صَوْنًا لِقَضَائِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : شُهِدَنِي بِالشَّامِ أُسْتَخْلِفَ الْبَائِعُ وَدَفْعَ الثَّمَنِ ، يَعْنِي إِذَا حَلَفَ وَلَا يَنْتَظِرُ حُضُورَ الشُّهُودِ ، لِأَنَّ فِي الْإِنْتِظَارِ ضَرَرًا بِالْبَائِعِ ، وَلَيْسَ فِي الدَّفْعِ كَثِيرٌ ضَرَرٍ بِهِ ، لِأَنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ ، أَمَا إِذَا نَكَلَ الْإِزْمَ الْعَيْبُ ، لِأَنَّهُ حُجَّتُهُ فِيهِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে এবং তা কজা করে, এরপর কোনো দোষের দাবি করে, তাহলে তাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা যাবে না; যতক্ষণ না বিক্রেতা [দোষ নেই মর্মে] কসম করবে কিংবা ক্রেতা [দোষের প্রমাণে] সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। কেননা, দোষ দাবি করার মাধ্যমে ক্রেতা যেহেতু তার অধিকার নির্দিষ্ট হওয়ায় অস্বীকার করেছে সেহেতু সে [নিজের উপর] মূল্য পরিশোধ আবশ্যক হওয়ায় অস্বীকার করেছে। আর প্রথমে মূল্য পরিশোধ করা [-এর আবশ্যকতা] এজন্য যে, যাতে বিক্রীত-পণ্য নির্দিষ্ট হওয়ার বিপরীতে [বিক্রয়মূল্য] বিক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়। [অথচ আলোচ্য সূরতে বিক্রীত-পণ্যই নির্দিষ্ট হয়নি।] তাছাড়া বিচারক যদি [মূল্য] পরিশোধের ফয়সালা দেন, তাহলে হতে পারে যে, পরে দোষ প্রকাশিত হবে, ফলে উক্ত ফয়সালা বাতিল হয়ে যাবে। তাই বিচারক তার ফয়সালার সুরক্ষার্থে মূল্য পরিশোধের ফয়সালা দেবেন না। যদি ক্রেতা বলে যে, আমার সাক্ষীরা শাম দেশে রয়েছে, তাহলে বিক্রেতা থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি কসম করে, তাহলে মূল্য প্রদান করা হবে এবং সাক্ষীদের উপস্থিতির অপেক্ষা করা হবে না। কারণ, অপেক্ষা করার মাঝে বিক্রেতার ক্ষতি আছে; কিন্তু মূল্য পরিশোধে ক্রেতার খুব বেশি ক্ষতি নেই। কেননা, সে তো তার প্রমাণে অবশিষ্ট আছে। আর যদি বিক্রেতা কসমে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে দোষ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, দোষ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কসমের অস্বীকৃতি একটি দলিল।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَكُلُوْهُ مِنْ اَسْحَارِ مَا كُنْتُمْ لَافْقِهِيْنَ ۝۱۰۱  
 (র.) -এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করল এবং তাকে কজা করল। এরপর বিক্রিতে আদালতে তার বিরুদ্ধে মূল্য পরিশোধের দাবি জানাল। ত্রোতা বলল, গোলামে এই এই দোষ আছে, তুমি আমার কাছে তা গোপন করছ। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এ সবতে বিচারক মূল্য

পরিশোধে ক্রেতাকে বাধ্য করবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতা পণ্য বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই দোষটি ছিল মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে কিংবা সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিক্রেতা তার কাছে থাকা অবস্থাতেই দোষটি ছিল না মর্মে কসম করে। যদি ক্রেতা দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে ক্রেতার পণ্য ফেরত প্রদানের এখতিয়ার থাকবে। আর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তাহলে বিক্রেতা থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি বিক্রেতা তার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ ছিল না মর্মে কসম করে, তাহলে এ সূরতে ক্রেতাকে বিচারক মূল্য পরিশোধের জন্য বাধ্য করবে।

মাসআলাটির প্রকৃত বিবরণ এটাই। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) জামে সগীরের যে মতন (مَتْن) উল্লেখ করেছেন তাতে কিছু জটিলতা আছে। কারণ, মতন থেকে বাহ্যিকভাবে বিবরণটি এ রকম মনে হয় যে, যদি ক্রেতা গোলাম কজা করার পর তার মাঝে দোষের দাবি করে, তাহলে বিচারক তাকে মূল্য পরিশোধের উপর বাধ্য করবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিক্রেতা কসম করে কিংবা ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করে। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে, বিক্রেতা দোষ না থাকার উপর কসম করুক কিংবা ক্রেতা দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করুক উভয় সূরতে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কারণ, ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার সূরতে তাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হয় না; বরং গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার সে এখতিয়ার পায়। তাই জামে সগীরের ইবারতের সমাধানে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা করা হয়—

১. ইবারতের **لَمْ يُجَبِّرْ** [বাধ্য করা হবে না] শব্দের উদ্দেশ্য হবে **يَنْتَظِرُ** [অপেক্ষা করবে]। **لَمْ يُجَبِّرْ** শব্দটি **لَزِمَ** আর **يَنْتَظِرُ** তার **مَلَزَمَ**। বিচারক মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না— এর অবশ্যস্বার্থী পরিণতি হলো, বিচারক অপেক্ষা করবেন। ইবারতে **لَزِمَ** বলে মূলত **مَلَزَمَ** উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। সুতরাং পুরা ইবারতের অর্থ দাঁড়ায়, যদি ক্রেতা গোলামে দোষের দাবি করে তাহলে বিচারক অপেক্ষা করবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিক্রেতা দোষ না থাকার উপর কসম করে কিংবা ক্রেতা দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে। যদি বিক্রেতা কসম করে, তাহলে মূল্য পরিশোধে ক্রেতাকে বাধ্য করা হবে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে বিক্রেতার নিকট গোলাম ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার দেবেন।
২. ইবারতে একটি বাক্যকে উহ্য ধরা হবে। মূল ইবারতটি এভাবে ছিল যে, **لَمْ يُجَبِّرْ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ حَتَّى يَخْلِفَ الْبَائِعُ حَتَّى يَلْمِزَ الْبَائِعَ حَقَّ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَخْلِفَ الْبَائِعُ حَتَّى يَلْمِزَ الْبَائِعَ** তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, যদি কজা করার পর ক্রেতা গোলামে দোষের দাবি করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না এবং ক্রেতাও বিক্রেতাকে গোলাম ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না, যতক্ষণ না বিক্রেতা কসম করবে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, তাহলে বিক্রেতাকে গোলাম ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে।
৩. **حَتَّى يَخْلِفَ الْبَائِعُ حَتَّى يَلْمِزَ الْبَائِعَ** অর্থ অব্যয়টি **أَوْ** বাক্যের **أَوْ** অব্যয়টি **أَوْ** এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরতে **يَلْمِزُ الْبَائِعَ** হবে **يَلْمِزُ الْبَائِعَ** অর্থ দাঁড়াবে, যদি ক্রেতা কজা করা গোলামের মাঝে দোষের দাবি করে, তাহলে ক্রেতাকে বিচারক মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না, যতক্ষণ না বিক্রেতা পণ্যটি তার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ না থাকার ব্যাপারে কসম করে। কসম করলে তবেই ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন। কিন্তু ক্রেতা যদি দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে দেয়, তাহলেও তাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না; বরং সেক্ষেত্রে ক্রেতা গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে।  
এখন কথা হলো, ক্রেতা যদি কজাকৃত গোলামের মাঝে দোষের দাবি করে তাহলে তাকে মূল্য পরিশোধে কেন বাধ্য করা হবে না? এর দলিল হিসেবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যখন ক্রেতা পণ্যে দোষের দাবি করে, তার অধিকার নির্দিষ্ট হওয়ায় অস্বীকার করল, এর দ্বারা সে মূলত তার উপর মূল্য পরিশোধ আবশ্যক হওয়ায় অস্বীকার করল। কারণ, যখন পণ্যে দোষ

আছে তখন এ পণ্য ফেরত দেওয়ার উপযুক্ত। যেহেতু পণ্য ফেরত দেওয়ার উপযুক্ত, তাই তাতে ক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়নি। যখন ক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়নি, তখন তার উপর মূল্য পরিশোধও আবশ্যিক হয়নি। কেননা, ক্রেতার প্রতি প্রথমে মূল্য পরিশোধ আবশ্যিক তখন হয়, যখন বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়। দোষের দাবি করার কারণে যেহেতু পণ্যে তার অধিকার নির্দিষ্ট হয়নি তাই তার উপর মূল্য পরিশোধও আবশ্যিক হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেন, আর পরে দোষ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারকের নির্দেশটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। তাই বিচারক তাঁর ফয়সালার মর্যাদা রক্ষার্থে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেবেন না।

تَوَلَّاهُ فَإِنْ قَالَ الْمُسْتَعْرِى شُهُودُنِي بِالسَّامِ الخ: যখন ক্রেতা গোলাম কজা করার পর দোষের দাবি করল আর বিক্রেতা তার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করল, তখন ক্রেতা যদি বলে যে, আমার সাক্ষীগণ শাম দেশে আছে অর্থাৎ সফরের দূরত্বে [৪৮ মাইল] আছে, তাই আমাকে কয়েকদিনের সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে আমি এ ক'দিনে সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করতে পারি কিংবা এ সুযোগ দেওয়া হোক যে, সাক্ষীগণ যে শহরে আছে সেখানকার বিচারকের সম্মুখে তারা সাক্ষী দেবে আর সেই বিচারক লিখিতভাবে তা মামলা যে বিচারকের বিচারাধীনে আছে তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলে ক্রেতার এ ওজর ও আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং বিচারক বিক্রেতার কাছে গোলামটি থাকা অবস্থায় দাবিকৃত দোষটি ছিল না মর্মে বিক্রেতা থেকে কসম নেবেন। যদি বিক্রেতা এই মর্মে কসম করে যে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার কাছে বিক্রয়চুক্তির বিধানানুসারে এ গোলামটি অর্পণ করেছি, আর তখন এ দোষটি ছিল না, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন এবং সাক্ষীগণের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করবেন না। কেননা, সাক্ষীগণের উপস্থিতি পর্যন্ত অপেক্ষা করা বিক্রেতার জন্য বড় ধরনের ক্ষতি। কারণ, অপেক্ষার মেয়াদ নির্ধারিত নেই তাই তা দীর্ঘ হতে পারে। আর বিনিময়মূল্য ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে পণ্য অন্যের দখলে থাকা একটি ক্ষতি। পক্ষান্তরে মূল্য পরিশোধের মাঝে ক্রেতার তেমন কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, মূল্য পরিশোধের পরেও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার সুযোগ থাকছে। যখন তার সাক্ষীগণ ফিরে আসবে তখন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দিলে প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিতে পারবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, বিক্রেতার কসমের প্রেক্ষিতে যদি বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেন, তাহলে এ সুরতের তা বিচারকের নির্দেশ বাতিল হলো। কারণ, ক্রেতার সাক্ষীগণের উপস্থিতির পর বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ ছিল মর্মে যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয়, তাহলে মূল্য পরিশোধের নির্দেশটি বাতিল হয়ে যাবে; বরং ক্রেতা পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে।

আল্লামা আইনী (র.) এর উত্তরে বলেন, বিক্রেতার কসমের প্রেক্ষিতে বিচারকের মূল্য পরিশোধের নির্দেশটি মূলত ক্রেতার সাক্ষ্য পেশ করার পূর্ব পর্যন্তই। তাই সাক্ষ্য পেশ করা এবং ক্রেতা কর্তৃক মূল্য ফেরত নেওয়ায় বিচারকের নির্দেশ বাতিল হয় না; বরং নির্দেশের উপরই আমল করা হয়।—[বিনায়া, প্রাপ্তক, পৃ. ১৬৭]

تَوَلَّاهُ أَمْ إِذَا نَكَلَ أَرَزَمَ الْعَيْبُ. لِأَنَّهُ حَقٌّ فِيهِ: হ্যাঁ, বিক্রেতা যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে দোষ সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না; বরং বিক্রীত গোলামটি ক্রেতা তাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে। কেননা, কসম থেকে অস্বীকৃতি মূলত এ স্বীকারোক্তি যে, পণ্যে দোষ আছে। আর বিক্রেতার স্বীকারোক্তি স্বয়ং তার বিস্মক্ষে দলিল। তাই বিক্রেতার কসম খেতে অস্বীকৃতি জানানোর সুরতে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হবে না; বরং সে পণ্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে।



قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَادْعَى إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُحْلَفِ الْبَائِعُ حَتَّى يَقِيمَ الْمُشْتَرَى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبْقَى عِنْدَهُ، وَالْمَرَادُ التَّحْلِيفُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْبُقْ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ وَلَكِنْ إِنكَارُهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ فَيَأْمِ الْعَيْبِ بِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرَى، وَمَعْرِفَتِهِ بِالْحُجَّةِ، فَإِذَا أَقَامَهَا حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَمَا أَبْقَى عِنْدَهُ قَطُّ، كَذَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، وَإِنْ شَاءَ حَلَفَهُ بِاللَّهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَدْعَى أَوْ بِاللَّهِ مَا أَبْقَى عِنْدَكَ قَطُّ، أَمَّا لَا يُحْلَفُ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ وَلَا بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ، لِأَنَّ فِيهِ تَرَكَ النَّظَرَ لِلْمُشْتَرَى، لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَخْذُلُ بَعْدَ الْبَيْعِ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلرَّدِّ، وَالْأَوَّلُ ذَهْوٌ عَنْهُ، وَالثَّانِي يُؤْهِمُ تَعَلُّقَهُ بِالشَّرْطَيْنِ فَيَتَأَوَّلُهُ فِي السِّمَنِ عِنْدَ قِيَامِهِ وَقْتُ التَّسْلِيمِ دُونَ الْبَيْعِ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে তারপর [গোলামের মধ্যে] পলায়নের দোষ আছে বলে দাবি করে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করবে যে, গোলামটি তার নিকট থেকে পলায়ন করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতাকে কসম করানো হবে না। [বিক্রেতাকে] কসম করানোর উদ্দেশ্য হলো, এ মর্মে কসম করানো যে, গোলামটি তার কাছে থাকা অবস্থায় পলায়ন করেনি। কেননা, যদিও তার [বিক্রেতার] কথা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তার অস্বীকারটা ক্রেতার কজায় গোলামের মাঝে দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরই বিবেচ্য হবে। আর দোষ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি জানা যাবে সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা। যখন ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে তখন বিক্রেতাকে আত্মাহর নামে কসম করানো হবে যে, গোলামটি সে বিক্রি করেছে এবং তাকে অর্পণ করেছে, আর গোলামটি তার কাছে থাকা অবস্থায় কখনও পলায়ন করেনি। কিতাব [জামে সগীর/মাবসূত]-এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) এরূপই বলেছেন। [গ্রন্থকার (র.) বলেন,] যদি বিচারক চান তাহলে বিক্রেতাকে এ মর্মে আত্মাহর কসম করাবেন যে, যে সূত্রে ক্রেতা দাবি করে সে সূত্রে তোমার কাছে ফেরত দেওয়ার অধিকার তার নেই। কিংবা এ মর্মে আত্মাহর নামে শপথ করাবেন যে, তোমার কাছে সে কখনও পলায়ন করেনি। তবে বিচারক এ মর্মে কসম করাবেন না যে, আত্মাহর কসম! গোলামটি বিক্রি করার সময় তাতে এ দোষ ছিল না এবং এ মর্মেও কসম করাবেন না যে, আত্মাহর কসম! সে গোলামটি বিক্রি করার সময় এবং অর্পণ করার সময় তাতে এ দোষ ছিল না। কেননা, এ ধরনের কসমের বাক্যে ক্রেতার কল্যাণ উপেক্ষিত হয়। কারণ, কখনও বিক্রি করার পর অর্পণের আগে দোষ সৃষ্টি হয়। আর তা ফেরত প্রদানকে আবশ্যক করে। অথচ প্রথম বাক্যে এটা উপেক্ষিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্য এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, দোষ না থাকার বিষয়টি [যুগপৎ] উভয় শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে বিক্রেতা কসমে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে যে, দোষ পণ্য অর্পণের সময় ছিল, কিন্তু বিক্রি করার সময় ছিল না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পলায়ন করা হলো গোলামের ক্ষেত্রে একটি দোষ। কিন্তু পলায়নের কারণে ক্রেতা ক্রয়কৃত গোলাম বিক্রেতাকে তখনি ফেরত দিতে পারবে, যখন ক্রেতার নিকট থেকে যে অবস্থায় গোলামটি পলায়ন করেছে ঠিক ঐ একই অবস্থায় যদি বিক্রেতার নিকট থেকে পলায়ন করে থাকে। অর্থাৎ বিক্রেতার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করার পর ক্রেতার কাছেও যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে কিংবা বিক্রেতার কাছে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করার পর ক্রেতার কাছেও যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত প্রদান করতে পারে এবং দেয়-মুলা ফেরত নিতে পারে। কিন্তু বিক্রেতার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করার পর ক্রেতার কাছে যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে কিংবা শুধু বিক্রেতার কাছে পলায়ন করেছে— প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় হোক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় হোক, কিন্তু ক্রেতার কাছে পলায়ন করেনি তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে না এবং গোলামটিকে বিক্রেতা ফেরত প্রদান করতে পারবে না।

الْعَنْ قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَادَّعَى ابْنًا الْعَنْ : জামে সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ গোলাম ক্রয় করে কত্তা করার পর গোলামটিতে পলায়নের দোষ থাকার দাবি করে, আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে নির্দেশ দেন যে, তুমি আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে গোলামটি যে তোমার কাছ থেকে পলায়ন করেছে তা প্রথমে প্রমাণ কর। ক্রেতা তার কাছ থেকে পলায়ন করার বিষয়টি প্রমাণ করার পূর্বে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন না। কারণ, কসম হয় বাদীর দাবি অস্বীকারের প্রেক্ষিতে। আর অস্বীকারটা তখনই বিবেচ্য হবে, যখন ক্রেতার কাছ থেকে পলায়ন করার বিষয়টি প্রমাণিত হবে এবং ক্রেতা একই অবস্থায় বিক্রেতার কাছেও দোষ ছিল বলে দাবি করবে। সুতরাং ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি পলায়ন করেছে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পূর্বে বিক্রেতাকে বিচারক কসম করাবেন না।

الْعَنْ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ التَّعْلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ عِنْدَ الْعَنْ : বিক্রেতাকে কসম করানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ মর্মে কসম করানো যে, বিক্রেতার কাছে থাকাকালে গোলামটি পলায়ন করেনি কিংবা পলায়ন করেছে, কিন্তু ক্রেতার কাছে যে অবস্থায় পলায়ন করেছে ঐ একই অবস্থায় পলায়ন করেনি অর্থাৎ ক্রেতার কাছে পলায়ন করেছে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়, আর বিক্রেতার কাছে পলায়ন করেছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়।

الْعَنْ قَوْلُهُ فَإِذَا آتَاهَا حَلْفَ يَاللَّهِ تَعَالَى نَفَذَ بَاعَهُ وَكَلَّمَ الْعَنْ : যদি ক্রেতা তার কাছ থেকে গোলামটি পলায়ন করেছে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে লক্ষ্য করে বলবে, এ পলায়নের দোষটি কি তোমার কাছেও ঐ একই অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় ক্রেতার কাছে প্রকাশ পেয়েছে? যদি বিক্রেতা বলে, হ্যাঁ, আমার কাছেও এ দোষ ঐ অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় ক্রেতা দাবি করেছে, তাহলে ক্রেতা গোলামটি খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর যদি বিক্রেতা তার কাছে দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে কিংবা ভিন্ন অবস্থায় থাকার দাবি করে অর্থাৎ ক্রেতা দাবি করে যে, আমার কাছে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পলায়ন করেছে, আর বিক্রেতা বলে, আমার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করেছে, তাহলে এ সুরতে বিচারক ক্রেতাকে বলবে, তোমার কাছে গোলামটি যে অবস্থায় [প্রাপ্তবয়স্ক/অপ্রাপ্তবয়স্ক] পলায়ন করেছে, ঐ একই অবস্থায় বিক্রেতার কাছেও যে গোলামটি পলায়ন করেছে— এর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর। যদি ক্রেতা এর উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে গোলামটি ফেরত প্রদানের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু ক্রেতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে; বরং বিক্রেতা থেকে কসমের দাবি করে, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবে। কসমের বাক্য তিন ধরনের হতে পারে। যে কোনো একটি বাক্যে বিক্রেতা কসম করবে।

১. বিক্রেতা বলবে, আল্লাহর কসম! আমি গোলামটি বিক্রি করেছি এবং ক্রেতার কাছে সোপর্দ করেছি, আর সোপর্দ করা পর্যন্ত আমার কত্তায় থাকাকালে কখনো পলায়ন করেনি। গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামে সগীরে বা মতান্তরে মাযসূত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ বাক্য ব্যবহার করেছেন। —[বিনায়া, ফাতহুল কাদীর]

২. কিংবা বলবে, আল্লাহর কসম! ক্রেতা যে সূত্রে দাবি করছে সে সূত্রে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই।

৩. কিংবা এভাবে বলবে যে, আল্লাহর কসম! আমার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামটি কখনো পলায়ন করেনি।

قَرْنُهُ أَمَّا لَا يُحْلِفُهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَبْدُ الْحَرِّ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিচারক নিম্নোক্ত দু-বাক্যে বিক্রেতাকে কসম করাবেন না-

১. আল্লাহর কসম! আমি গোলামটি বিক্রি করেছি এমনভাবে যে, তাতে এ দোষ ছিল না।

২. আল্লাহর কসম! গোলামটি বিক্রয় করার সময় এবং অর্পণ করার সময় তাতে এ দোষ ছিল না।

এ দু-বাক্যে কসম এজন্য করাবেন না-যেহেতু এ ধরনের শপথ বাক্যে শুভঙ্করের ফাঁকি থাকায় ক্রেতার কল্যাণ উপেক্ষিত হয়। প্রথম বাক্যের কথা ধরুন- বিক্রেতা কসম করেছে যে, বিক্রি করার সময় এ দোষ ছিল না। কিন্তু বিক্রির পর অর্পণের সময় এ দোষ ছিল কিনা তা তার কসম থেকে জানা যায় না। অথচ অনেক সময় বিক্রির পরও অনেক দিন পণ্য বিক্রেতার কাছে থাকে। এ সময়ের মাঝে যদি পণ্যে দোষ সৃষ্টি হয়, তাহলেও ক্রেতা পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার লাভ করে। বিক্রেতার মতলব সম্পর্কে অবগতি না থাকায় বিচারক তার কসমের প্রেক্ষিতে গোলামটি ক্রেতা ফেরত প্রদান করতে পারবে না মর্মে রায় দেবেন, অথচ বিক্রি করার পর অর্পণের আগে দোষ সৃষ্টি হলে ক্রেতা ফেরত প্রদান করতে পারে। এতে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি দেখুন। দ্বিতীয় বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে-

১. বিক্রি ও অর্পণ উভয় সময়ের কোনো সময়েই দোষ ছিল না।

২. দোষ না থাকার বিষয়টি যুগপৎ উভয় শর্তের সাথে সম্পৃক্ত; বিক্রি ও অর্পণ এ উভয় সময় দোষ ছিল না, একটির সময় ছিল, অর্থাৎ পণ্য অর্পণের সময় ছিল, কিন্তু বিক্রি করার সময় ছিল না। বিক্রেতা যদি তার কসমে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয় আর বিচারক প্রথম অর্থ বুঝেন, তাহলে বিক্রেতা তার কসমেও সত্যবাদী থাকবে, আবার দোষ থাকা সত্ত্বেও পণ্যটি তার কাছে ফেরত প্রদান করা হবে না। অথচ অর্পণ করার সময় দোষ থাকায় ক্রেতা পণ্য ফেরত প্রদান করার অধিকার পায়। বিক্রেতার এ কৌশলময় বাক্যে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَرِيَّ بَيِّنَةً عَلَى قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ بِاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ يُحْلَفُ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَاخْتَلَفَ الْمُشَانِعُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حُشَيْمَةَ (رح)، لَهُمَا أَنَّ الدَّعْوَى مُفْتَبَّرَةٌ حَتَّى يَتَرْتَّبَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَكَذَا يَتَرْتَّبُ التَّحْلِيفُ، وَلَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ أَنَّ الْحَلْفَ يَتَرْتَّبُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَلَيْسَتْ تَصِحُّ إِلَّا مِنْ خَصْمٍ، وَلَا يَصْنُرُ حُضْمًا فِيهِ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ، وَإِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عِنْدَهُمَا يُحْلَفُ ثَانِيًا لِلرَّدِّ عَلَى الرَّجْعِ الَّذِي قَدَّمَاهُ : قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا كَانَ الدَّعْوَى فِي إِبَاقِ الْكَيْبِيرِ يُحْلَفُ مَا أَبَقَ مُنْذُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، لِأَنَّ الْإِبَاقَ فِي الصَّغِيرِ لَا يَوْجِبُ رَدَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ .

অনুবাদ : আর যদি ক্রেতা তার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ দেখায় অনুকূলে সাক্ষ্য পেশ করতে না পারে এবং বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করতে চায় যে, আল্লাহর কসম! ক্রেতার কাছে গোলামটি পলায়ন করেছে বলে আমার জানা নেই, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন। কিন্তু মাশায়েখগণ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। সাহেবাইন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ক্রেতার দাবি গ্রহণযোগ্য, ভাই তার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বর্তায়। অতএব কসম করানোর বিষয়টিও বর্তাবে। আর কারো কারো মত অনুসারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কসম করার বিষয়টি বর্তায় শুদ্ধ দাবির ভিত্তিতে। আর বাদীর অস্তিত্ব ছাড়া দাবি শুদ্ধ হয় না। আর আলোচ্য মাসআলায় [সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে] দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরই ক্রেতা বাদী হবে। আর যদি বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে [গোলামটি] ফেরত প্রদানের জন্য তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের পূর্ববর্ণিত বাক্যে কসম করানো হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি প্রাপ্তবয়স্ক গোলামের পলায়নের দাবি হয়, তাহলে বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করানো হবে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর [তার নিকট থেকে] গোলামটি পলায়ন করেনি। কেননা, শৈশবে পলায়ন করাটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ফেরত প্রদানকে আবশ্যক করে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ : قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَرِيَّ بَيِّنَةً عَلَى قِيَامِ الْعَيْبِ الخ : যদি ক্রেতা তার কাছে দোষ দেখা দেওয়ার অর্থাৎ গোলামটি যে তার কাছ থেকে পলায়ন করেছে এর অনুকূলে সাক্ষ্য পেশ করতে না পারে এবং বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করতে চায় যে, বোলা, আল্লাহর কসম! ক্রেতার কাছে গোলামটি পলায়ন করেছে বলে আমার জানা নেই, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতের ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত সাহেবাইন (র.)-এর অনুরূপ অর্থাৎ বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর অভিমত হলো, কসম করাবেন না। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এটাই বিতর্কিত অভিমত।—[বিনায়া, প্রাপ্তজ, পৃ. ১৭০]

قَوْلُهُ لَهَا أَنْ الدَّعْوَى مُغْتَبَرَةٌ حَتَّى يَتَرْتَبَ الْخ:

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : গোলামের মাঝে পলায়নের দোষ আছে- ক্রেতার এ দাবি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। সে কারণেই তার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বর্তছে এবং বিচারকের পক্ষ থেকে দোষ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। আর যে দাবির উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বর্তায় তার উপর কসম করানোর বিষয়টিও বর্তায়। তাই ক্রেতার দাবির প্রেক্ষিতে বিক্রেতাকে কসম করানো হবে।

قَوْلُهُ أَنَّ الْحَلْفَ يَتَرْتَبُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ الْخ:

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ অভিমতের সপক্ষে দলিল : কসম করার বিষয়টি বর্তায় শুদ্ধ দাবির ভিত্তিতে। আর বাদীর অস্তিত্ব ছাড়া দাবি শুদ্ধ হয় না। আর আলাচ্য সূরতে ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি যে পলায়ন করেছে তা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়ার পরই ক্রেতা বাদী হিসেবে বিবেচিত হবে। যেহেতু তা সাব্যস্ত হয়নি তাই ক্রেতা বাদী হিসেবে বিবেচিত হয়নি। আর বাদী না হওয়াতে তার দাবিও শুদ্ধ নয়। আর দাবি শুদ্ধ না হলে কসম করানোর বিষয়টি বর্তায় না। অতএব বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন না।

قَوْلُهُ وَإِذَا نَكَلَ عَنِ الْبَيْعِ عَنْدَهُمَا بَعْلَفَ نَائِبِ الْخ: সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী যদি বিচারক 'গোলামটি ক্রেতার কাছ থেকে পলায়ন করেছে বলে তার জানা নেই' মর্মে বিক্রেতার কাছে কসম তলব করেন, আর বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোলামটি ফেরত প্রদানের জন্য তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের পূর্ববর্ণিত বাক্যে কসম করানো হবে। কারণ, প্রথমবার কসমে অস্বীকৃতির কারণে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, গোলামটি ক্রেতার কাছ থেকে পলায়ন করেছে। ক্রেতার কাছে পলায়ন তথা দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরের পর্যায় হলো, বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেও এ দোষটি ছিল কিনা তা সাব্যস্ত করা। এজন্য ক্রেতাকে বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দেবেন। যদি ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে গোলামটি সে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামের মাঝে এ দোষটি ছিল কিনা? বিক্রেতা যদি দোষ থাকার কথা স্বীকার করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে। আর বিক্রেতা যদি তার কাছে এ দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে কিংবা ক্রেতা যে অবস্থায় অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় দোষের দাবি করেছে, সে ঐ অবস্থায় দোষ থাকার কথা অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক তার কাছে এ মর্মে কসম তলব করবেন যে, আল্লাহর কসম! আমার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামটি কখনো পলায়ন করেনি কিংবা এ মর্মে কসম তলব করবেন যে, ক্রেতা যে সূত্রে দাবি করছে সে সূত্রে গোলামটি ফেরত দেওয়ার সে অধিকার রাখে না। যদি বিক্রেতা কসম করে, তাহলে খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হবে না এবং ক্রেতা গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না। আর যদি কসমে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَ الدَّعْوَى فِي إِبَاقِ الْكَبِيرِ الْخ: গ্রন্থকার (র.) বলেন, ক্রেতা যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়নের দাবি করে, তাহলে বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করানো হবে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর আমার কাছ থেকে পলায়ন করেনি। কারণ, বিক্রেতার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে থাকলে তা হুবহু ক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষ বলে গণ্য হবে না এবং এর কারণে ক্রেতা গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَتَقَابُضًا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، فَقَالَ الْبَائِعُ بَعْتُكَ هَذِهِ  
وَأُخْرَى مَعَهَا ، وَقَالَ الْمَشْتَرِي بَعْتَنِيهَا وَخَذَهَا ، قَالَقَوْلُ قَوْلُ الْمَشْتَرِي لِأَنَّ  
الْإِخْتِلَافَ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ، كَمَا فِي الْغَضَبِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا  
اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوضِ لِمَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো দাসী ক্রয় করে এবং উভয় পক্ষ [পণ্য ও মূল্য] কজা করে নেয়। অতঃপর ক্রেতা দাসটিতে দোষ পায়, আর বিক্রেতা [ক্রেতাকে] বলে- আমি তোমার কাছে এটি এবং এর সঙ্গে আরেকটি [দাসী] বিক্রি করেছি, কিন্তু ক্রেতা বলে- তুমি আমার কাছে শুধু এ দাসীটিকেই বিক্রি করেছ, তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, মতবিরোধ হলো কজাকৃত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে। সুতরাং কজাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন আত্মসাৎকৃত [বস্তু] ক্ষেত্রে হয়। তদ্রূপ হুকুম হবে যদি পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতা একমত হয়, কিন্তু কজাকৃত পণ্যের বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীরে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল এবং ক্রেতা দাসীটি এবং বিক্রেতা বিক্রয়মূল্য কজা করল। এরপর ক্রেতা দাসীতে কোনো দোষ পেল। দোষের প্রেক্ষিতে ক্রেতা দাসীটি ফেরত দিয়ে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে চাইল। বিক্রেতা বলল, আমি তো তোমার কাছে দুটি দাসী বিক্রি করেছি- একটি এটি এবং এর সঙ্গে আরেকটি দাসী [বিক্রি করেছি]। তুমি একটি ফেরত দিতে চাইছ, তাই একটির পরিমাণ মূল্য ফেরত পাবে। ক্রেতা বলল, তুমি আমার কাছে একমাত্র এ দাসীটি বিক্রি করেছ, তাই তোমাকে পূর্ণ মূল্য ফেরত দিতে হবে। ঘটনাক্রমে দুজনের কারো পক্ষেই কোনো সাক্ষী নেই, তাহলে এ সুরতে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, দুজনের মাঝে মূলত কজাকৃত পণ্যের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিক্রেতা দাবি করছে যে, ক্রেতা দুটি দাসী কজা করেছে- আর ক্রেতা দাবি করছে, আমি একটি দাসী কজা করেছি। আর কজাকৃত পণ্যের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ হলে কজাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ, সে-ই কজাকৃত বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে ভালো জানে। আর এ ক্ষেত্রে কজাকারী হলো ক্রেতা। তাই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

এর উদাহরণ হলো, ছিনতাইকৃত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে আত্মসাৎকারী ও আত্মসাতের শিকার ব্যক্তির মধ্যবর্তী মতবিরোধ। যেমন- ছিনতাইকারী দাবি করল, আমি একটি গোলাম আত্মসাৎ করেছি, আর আত্মসাতের শিকার ব্যক্তি দাবি করে, তুমি দুটি গোলাম আত্মসাৎ করেছ, তাহলে ছিনতাইকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ সে কজাকারী।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ الخ : হুস্বকার (র.) বলেন, অনুরূপভাবে বিক্রীত-পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে একমত হয়, কিন্তু কজাকৃত পণ্যের ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়, যেমন- বিক্রীত-পণ্য দুটি গরু। বিক্রেতা বলছে, তুমি দুটিই কজা করেছ আর ক্রেতা বলছে, আমি একটি কজা করেছি, তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, সে কজাকারী। আর কজাকৃত বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে কজাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়।

قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَبَيْضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا أَوْ يَدْعُهَا، لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ بِقَبْضِهَا فَيَكُونُ تَفْرِيقُهَا قَبْلَ التَّحْقِيقِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شِبْهُ بِالْعَقْدِ، فَالْتَّفَرُّقُ فِيهِ كَالْتَّفَرُّقِ فِي الْعَقْدِ، وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوضِ عَيْبًا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ يَرُدُّهُ خَاصَّةً، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا أَوْ يَرُدُّهَا، لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ تَعَلُّقُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلِّ فَصَارَ كَحَبْسِ الْمَبِيعِ، لِمَا تَعَلَّقَ زَوَالُهُ بِاسْتِنْفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيعِهِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একই বিক্রয়চুক্তিতে দুটি গোলাম ক্রয় করে, আর দুটির একটি কজা করে আর অপরটিতে দোষ পায়, তাহলে হয় সে উভয়টা গ্রহণ করবে কিংবা উভয়টা পরিত্যাগ করবে। কেননা, উভয়টা কজা করার দ্বারাই বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং একটি গ্রহণ করা আর অপরটি পরিত্যাগ করার বিষয়টি পূর্ণতা লাভের পূর্বেই বিক্রয়চুক্তিকে খণ্ডিত করবে। এ বিষয়টি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর কজার ক্ষেত্রে বিক্রীত-পণ্যের মাঝে খণ্ডিতকরণ এজন্য জায়েজ নেই যে, বিক্রয়চুক্তির সাথে কজার সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং কজার ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণটা বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণের মতো হবে। [আর বিক্রয়চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ জায়েজ নেই, তাই কজায় খণ্ডিতকরণও জায়েজ হবে না।] আর যদি ক্রেতা কজাকৃত গোলামে দোষ পায়, তাহলে এর হুকুম সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কজাকৃতটিই শুধু ফেরত দেবে। [গ্রন্থকার (র.) বলেন,] কিন্তু বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, ক্রেতা হয় উভয়টিকে গ্রহণ করবে কিংবা উভয়টিকে ফেরত দেবে। কেননা, বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা বিক্রীত-পণ্যের কজার সাথে সম্পৃক্ত। আর বিক্রীত-পণ্য হলো চুক্তিভুক্ত সমগ্রপণ্য। সুতরাং চুক্তির পূর্ণতার বিষয়টি [মূল্য উসূল করার জন্য] বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখার মতো হলো। বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার সম্পর্ক যেহেতু মূল্য উসূল করার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু পূর্ণ মূল্য উসূল করা ছাড়া আটক রাখার অধিকার বিলুপ্ত হয় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে দুটি গোলাম ক্রয় করেছে এবং দুটির একটিকে কজা করেছে এবং সেটা ছিল দোষমুক্ত— আর অপরটিকে দোষগ্রস্ত পেয়েছে, তাহলে তার জন্য এটা জায়েজ নেই যে, সে দোষমুক্ত পণ্যটি গ্রহণ করবে, আর দোষগ্রস্ত পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দেবে; বরং গ্রহণ করলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে উভয়টিকে গ্রহণ করবে অথবা উভয়টি ফেরত দেবে। দলিল হলো— খেয়ারে আইবের সূরতে বিক্রীত-পণ্য কজা করার পর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আলোচ্য চুক্তিতে দুটি গোলাম মিলিতভাবে বিক্রীত-পণ্য। অতএব আলোচ্য

মাসআলায় চুক্তি তখন পূর্ণতা লাভ করবে যখন উভয়টিকে কজা করা হবে। যদি উভয়টি কজা না করে কোনো একটিকে ফেরত প্রদান করা হয়, তাহলে পূর্ণতা লাভের পূর্বেই চুক্তিকে খণ্ডিত করা হবে। আর পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ (تَفْرِيقُ الصَّنْفَةِ قَبْلَ التَّمَامِ) বৈধ নয়। অতএব কজার মাঝেও খণ্ডিতকরণ অর্থাৎ দোষমুক্ত গোলামটি রেখে দোষগ্রস্ত গোলামটি ফেরত দান বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَضَ لَهْ مِنْهُ بِالْعَقْدِ الْخ: কজার মাঝে খণ্ডিতকরণ (تَفْرِيقُ) কেন বৈধ নয়? কারণ, বিক্রয়চুক্তির সাথে কজার সাদৃশ্য রয়েছে। কজার উদ্দেশ্য হলো পণ্যে হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করা। আর চুক্তির মাধ্যমে বিক্রীত-পণ্যের মালিকানা লাভ হয়। আর মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যও হলো পণ্যে হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করা। উদ্দেশ্যের দিক থেকে কজাটি বিক্রয়চুক্তির মতো। সুতরাং কজার ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণটা বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণের মতো হবে। আর বিক্রয়চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ জায়েজ নেই, তাই কজায় খণ্ডিতকরণও জায়েজ হবে না।

বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণের উদাহরণ হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমি তোমার কাছে এ দুটি গোলাম এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম। ক্রেতা বলল, আমি একটি গোলামে বিক্রয় কবুল করলাম। এটা জায়েজ নেই। কারণ, এতে বিক্রয়চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ بِالصَّفْوِضِ عَيْبًا اِخْتَلَفُوا فِيهِ الْخ: যদি ক্রেতা কজাকৃত গোলামটিতে দোষ পায়, তাহলে তার হুকুম নিয়ে ফিকহবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা শুধু কজাকৃত গোলামটি ফেরত দিতে পারবে এবং তার অংশের মূল্য ফেরত নেবে। কিন্তু গ্রহুকার (র.) বলেন, বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, ক্রেতা হয় পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে উভয় গোলাম রাখবে অথবা উভয় গোলাম ফেরত দিয়ে দেবে। কারণ, বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা (تَمَامُ الصَّنْفَةِ) বিক্রীত-পণ্য কজা করার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্য কজা করার পর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আর বিক্রীত-পণ্য তা-ই, যার উপর চুক্তি হয়। আলোচ্য মাসআলায় দু গোলামের উপর চুক্তি হয়েছে। অতএব উভয় গোলাম কজা করার পরই বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করবে। এর উদাহরণ হলো, মূল্য উসুল করার জন্য বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখা। বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার সম্পর্ক যেহেতু মূল্য উসুল করার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু পূর্ণ মূল্য উসুল করা ছাড়া আটক রাখার অধিকার বিলুপ্ত হয় না। অনুরূপভাবে চুক্তির পূর্ণতা লাভের বিষয়টি চুক্তিভুক্ত পণ্য কজা করার সাথে সম্পৃক্ত, তাই সমগ্র পণ্য কজা করা না হলে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করবে না।

আলোচ্য সূরতে ক্রেতা যেহেতু একটি গোলাম কজা করেছে এবং অপর গোলামটি কজা করেনি, তাই আলোচ্য সূরতে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি। যখন চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি, তখন একটি গোলাম ফেরত দিলে পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তিকে খণ্ডিত করা আবশ্যিক হবে। আর পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তিকে খণ্ডিত করা জায়েজ নেই। তাই এ সূরতেও একটি গোলামকে রাখা এবং অপরটিকে ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।



وَلَوْ قَبَضُوهَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْنًا يَرُدُّهَ خَاصَّةً، خِلَافًا لِرُفْعِ (رَح). هُوَ يَقُولُ،  
 فِيهِ تَفَرُّقُ الصَّفَقَةِ، وَلَا يَعْرِى عَنْ صَرَرٍ، لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِصَمِّ الْجَدِيدِ إِلَى الرَّدِّ،  
 فَاشْبَهَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ، وَلَنَا أَنَّهُ تَفَرُّقُ الصَّفَقَةِ بَعْدَ التَّمَامِ،  
 لِأَنَّ بِالْقَبْضِ تَتِمُّ الصَّفَقَةُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، وَفِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ لَا تَتِمُّ بِهِ  
 عَلَى مَا مَرَّ، وَلِهَذَا لَوْ اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْآخَرَ.

অনুবাদ : যদি উভয় গোলাম কজা করে, এরপর কোনো একটিতে দোষ পায়, তাহলে দোষগ্রস্তটিই শুধু ফেরত দেবে। অবশ্য ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এতেও বিক্রয়চুক্তি বিখণ্ডিত হয়। আর এটা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। কেননা, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পণ্য মিলিয়ে বিক্রয় করাই প্রচলিত নিয়ম। সুতরাং তা কজা করার পূর্বে কিংবা দেখার এখতিয়ার বা শর্তভিত্তিক এখতিয়ারের কারণে [একটিকে ফেরত দেওয়ার] সাদৃশ্য হলো। আমাদের দলিল হলো, এটা হলো চুক্তি পূর্ণতা লাভের পর খণ্ডিতকরণ। কেননা, দোষজনিত খেয়ারের সুরতে [বিক্রীত-পণ্য] কজা করার দ্বারা চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আর শর্তভিত্তিক খেয়ার ও দেখার খেয়ারের সুরতে কজা করার দ্বারাও চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এ কারণেই কজা করার পর যদি দুই গোলামের একটির মালিক তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার অপর গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضُوهَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْنًا يَرُدُّهَ خَاصَّةً الخ : যদি উভয় গোলাম কজা করে এরপর কোনো একটিতে দোষ পায়, তাহলে যেটিতে দোষ পাবে শুধু সেটিকেই ফেরত দিতে পারবে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে হয় দুটোই রাখবে অথবা দুটোই ফেরত দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও এটি। ইমাম যুফার (র.) বলেন, কজা করার পরও একটা রেখে অপরটা ফেরত দেওয়ার মাঝে যদিও পূর্ণতা লাভের পর বিক্রয়চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয়, কিন্তু খণ্ডিত তো হয়। কেননা, চুক্তি হয়েছিল দুটি গোলামের উপর। আর এ খণ্ডিতকরণ ক্ষতিমুক্ত নয়। কারণ, প্রচলিত নিয়ম হলো, ব্যবসায়ীগণ ভালো ও খারাপ পণ্য মিলিয়ে বিক্রি করে। দোষের কারণে যদি ক্রেতা একটি গোলাম ফেরত দেয়, তাহলে খারাপটা ফেরত দেবে, আর ভালোটা তার কাছে রেখে দেবে। আর আলাদাভাবে খারাপটা বিক্রি করা বিক্রেতার পক্ষে কঠিন হবে। যদি বিক্রি করতে পারেও, কম দামে বিক্রি করতে হবে। এতে বিক্রেতার ক্ষতি হবে। তাই একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ فَاشْبَهَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ : গ্রন্থকার (র.) ইমাম যুফার (র.)-এর অনুকূলে তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন—

১. উভয় গোলাম কজা করার পূর্বে সর্বসম্মতভাবে একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ, এতে চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয় এবং এর ফলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর উভয় গোলাম কজা করার পর একটিকে ফেরত দেওয়াতেও চুক্তি খণ্ডিত হয় এবং এর ফলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব উভয় সুরতে হুকুম এক হবে। বিক্রেতার ক্ষতি রোধ করার উদ্দেশ্যেই প্রথম সুরতে সর্বসম্মতভাবে একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। অতএব এ সুরতেও জায়েজ হবে না।

২. খেয়ারে রুমতের সুরতে বিক্রীত-পণ্য দুটি গোলাম হলে উভয়টিকে কজা করার পর একটি গোলামকে ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। সেক্ষেত্রে যেক্ষণ একটিকে ফেরত দিলে চুক্তি খণ্ডিত হয় তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও একটি ফেরত দিলে চুক্তি খণ্ডিত হয়। তাই আলোচ্য সুরতেও একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

৩. তিন দিনের খেয়ারের শর্তে কেউ দুটি গোলাম ক্রয় করার পর উভয়টি কজা করুক বা না করুক- তার জন্য একটি গ্রহণ করা আর অপরটি ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ, এতে চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয়। আলোচ্য মাসআলায়ও কজা করার পর একটি ফেরত দিলে চুক্তি খণ্ডিত হয়। তাই আলোচ্য সুরতেও একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ أَنَّهُ تَغَرُّبُ الصَّفَقَةِ بَعْدَ التَّمَامِ الْخ : আমাদের দলিল হলো, উভয় গোলাম কজা করার পর কোনো একটিকে ফেরত দিলে চুক্তি অবশ্যই খণ্ডিত হয়, তবে পূর্ণতা লাভের পর খণ্ডিত হয়। আর পূর্ণতা লাভের পর চুক্তিকে খণ্ডিতকরণ জায়েজ আছে। অতএব আলোচ্য মাসআলায় একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে উভয় গোলাম কজা করার পূর্বে একটিকে ফেরত দেওয়া হলে যেহেতু সম্পূর্ণতা লাভের আগেই চুক্তিকে খণ্ডিতকরণ হয়, তাই তা জায়েজ হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের উত্তরে আমরা বলি, খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুমতকে খেয়ারে আইবের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুমত-এর সাথে খেয়ারে আইব [দোষজনিত খেয়ার]-এর পার্থক্য আছে। খেয়ারে আইবের সুরতে বিক্রীত-পণ্য কজা করার দ্বারা বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আর এ কারণেই কজা করার পর যদি দুই গোলামের একটির মালিক তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার অপর গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই। কারণ, কজা করার দ্বারা ঐ গোলামটিতে বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। আর বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভের পর ক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না। কিন্তু খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুমতের সুরতে পণ্য কজা করার দ্বারা চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না। খেয়ারে শর্ত বা খেয়ারে রুমতের সুরতে কজা করার পর যদি দুই গোলামের একটির মালিক তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার অপর মালিক গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে। কারণ, ঐ গোলামটিতে বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। আর বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভের পূর্বে ক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে। মোটকথা, এসব পার্থক্যের কারণে খেয়ারে আইবের উপর খেয়ারে শর্ত বা খেয়ারে রুমতকে কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَوَجَدَ بَعْضَهُ عَيْنًا رَدَّهُ كُفْلَهُ أَوْ أَخَذَهُ كُفْلَهُ، وَمُرَادَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ الْمَكِيلَ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَشْنَى وَاحِدٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَسْتَمَى بِاسْمِهِ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْكُرُّ وَتَحْوَهُ، وَقِيلَ : هَذَا إِذَا كَانَ فِي وَعَاءٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ فِي وَعَائَيْنِ فَهُوَ يَمْنُزِلَةُ عَبْدَيْنِ، حَتَّى يَرُدَّ الْوِعَاءَ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ الْعَيْبُ دُونَ الْآخَرِ وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ، لِأَنَّهُ لَا يَصْرُهُ التَّبْعِيضُ، وَالْإِسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفَقَةِ، لِأَنَّ تَمَامَهَا بِرِضَاءِ الْعَاقِدِ لَا بِرِضَاءِ الْمَالِكِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ لِيَتَمَرَّقَ الصَّفَقَةُ قَبْلَ التَّمَامِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا فَلَهُ الْخِيَارُ، لِأَنَّ التَّشْقِيقَ فِيهِ عَيْنٌ، وَقَدْ كَانَ وَقْتُ الْبَيْعِ حَيْثُ ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ، بِخِلَافِ الْمَكِيلِ وَالْمُوزَنِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপিত কিংবা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত কোনো দ্রব্য ক্রয় করে আর তার কিছু অংশে দোষ পায়, তাহলে সমগ্র দ্রব্য ফেরত দেবে অথবা সমগ্রটি রেখে দেবে। [যদ্ব্যবহার করেন] তাঁর উদ্দেশ্য হলো কজা করার পর [যদি কিছু অংশে দোষ পায় তাহলে]। কেননা, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য একই জাতিভুক্ত হলে তা একটি দ্রব্যের মতো। তাইতো সবগুলোর উপর একই নাম আরোপিত হয়। যেমন- এক 'কুর' এবং একপ শব্দ [মন, টন, ওয়াসাক ইত্যাদি]। কারো কারো মতে উল্লিখিত হুকুম প্রযোজ্য হবে সমগ্র দ্রব্য এক পাঠে হলে। যদি দুই পাঠে হয়, তাহলে তা দুই গোলামের পর্যায়ভুক্ত। তাই যে পাত্রটিতে দোষ পাওয়া যায় ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে, অপরটি নয়। যদি কিছু দ্রব্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মালিকানা প্রকাশ পায়, তাহলে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে না। কেননা, এক্ষেত্রে বিভক্তিকরণ ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। আর অন্যের মালিকানা প্রকাশ পাওয়া বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতাও বাধা দেয় না। কেননা, চুক্তির পূর্ণতা লাভ হয় চুক্তিকারীর সম্মতির মাধ্যমে, মালিকের সম্মতির মাধ্যমে নয়। তবে অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দিতে না পারার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন কজার পর অন্যের মালিকানা প্রকাশ পায়। যদি কজার আগে অন্যের মালিকানা প্রকাশিত হয়, তাহলে পূর্ণতা লাভের পূর্বে বিক্রয়চুক্তি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার কারণে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে। আর যদি দ্রব্যটি কাপড় হয়, তাহলে [কজার পর অন্যের মালিকানা প্রকাশিত হলেও] অবশিষ্ট কাপড় ক্রেতার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা, কাপড়ের ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণ একটি দোষ হিসেবে বিবেচিত। আর তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানা প্রকাশিত হওয়ায় সাব্যস্ত হয় যে, এ দোষটি বিক্রয়চুক্তির সময়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য ও পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের কথা ভিন্ন। [কারণ, তাতে খণ্ডিতকরণ দোষ হিসেবে বিবেচিত নয়।]

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَمِنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : জামে সগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত কোনো দ্রব্য ক্রয় করে এবং তা কজা করে, এরপর কিছু অংশে দোষ পায়, উদাহরণত তিন মন গম ক্রয় করল এবং তা কজা করার পর এক মন গমে দোষ পেল, তাহলে সমগ্র দ্রব্য এক পাঠে হোক বা একাধিক পাঠে হোক- ক্রেতা ঐ দ্রব্য রাখা/না রাখার এখতিয়ার পাবে। যদি রাখে, তাহলে পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে সমগ্র দ্রব্য রাখতে হবে। যদি না রাখে, তাহলে সমগ্র দ্রব্য ফেরত দিতে হবে। যে দুই মন গমে দোষ নেই তা রাখবে, আর যে মনে দোষ আছে তা ফেরত দেবে- তা পারবে না।

উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত মাসআলায় গেছে, যদি সম্পূর্ণ বিক্রীত-পণ্য কজা করার পর একাংশে দোষ পায়, তাহলে যে অংশে দোষ পাবে শুধু সে অংশ ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে। যেমন- বিক্রীত-পণ্য দুটি গোলাম। উভয়টা কজা করার পর কোনো একটিতে দোষ পাওয়া গেলে শুধু দোষগ্রস্ত গোলামটি ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে। উভয় গোলাম তথা সম্পূর্ণ বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। আর আলোচ্য মাসআলায় গেল যে, কজা করার পর একাংশে দোষ পেলে হয় সমগ্রটুকু রাখবে অথবা সমগ্রটুকু ফেরত দেবে। হকুমের এ ভিন্নতা মূলত দ্রব্যের শ্রেণীভিন্নতার কারণে। দ্রব্য যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (الْمَزْزُونُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (الْمَكْيَلُ) হয়, তাহলে হকুম হলো কজা করার পর দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে হয় সম্পূর্ণ দ্রব্য রাখবে কিংবা সম্পূর্ণ দ্রব্য ফেরত দেবে। আর দ্রব্য যদি এছাড়া অন্য শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে সম্পূর্ণ দ্রব্য কজা করার পর একাংশে দোষ পাওয়া গেলে সম্পূর্ণ দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে না; বরং শুধু দোষগ্রস্ত অংশ ফেরত দিতে পারবে। অবশ্য সম্পূর্ণ দ্রব্য কজা করার পূর্বে একাংশে দোষ পাওয়া গেলে দ্রব্য যে শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, হয় সম্পূর্ণ দ্রব্য রাখবে বা সম্পূর্ণ ফেরত দেবে।

قَوْلُهُ لَوْ أَنَّ الْمَكْيَلُ إِذَا كَانَ مِنْ جَنْبٍ وَاحِدٍ الْغ

আলোচ্য মাসআলার দলিল : পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (الْمَكْيَلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (الْمَزْزُونُ) বিক্রীত-দ্রব্য এক জাতিভুক্ত হলে তা সামষ্টিকভাবে একটি বস্তুর মতো। উদাহরণত বিক্রীত- দ্রব্য তিন মন গম, এ তিন মন গম সামষ্টিকভাবে একটি গোলামের মতো। কারণ, সামষ্টিকতার হিসেবেই এসব দ্রব্য মূল্যসম্পন্ন মাল। একটি গমের দানা আলাদাভাবে মূল্যসম্পন্ন নয় এবং সে কারণেই একটি গমের দানা বিক্রি করা যায়জ নেই। সুতরাং পণ্য হিসেবে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (الْمَكْيَلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (الْمَزْزُونُ) দ্রব্য সামষ্টিকভাবে একটি বস্তুর মতো। আর তাই সবগুলোর উপর এক নাম আরোপিত হয়। যেমন বলা হয়- এক 'কুর' গম, তিন মন গম, পাঁচ টন চাল ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নমুনা হিসেবে অল্প কিছু দেখাই সবগুলো দেখা বলে গণ্য হয়। আর একই বস্তুর একাংশকে দোষগ্রস্ত পাওয়া গেলে ক্রেতা হয় পুরাটা ফেরত দেয় কিংবা পুরোটাই রেখে দেয়। কারণ, ক্রেতা যদি দোষগ্রস্ত অংশটুকু ফেরত দেয় আর দোষমুক্ত অংশটি নিজের কাছে রেখে দেয়, তাহলে বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। আর পণ্যে অংশদারিত্ব একটি দোষ। ক্রেতা দোষগ্রস্ত অংশ ফেরত দিতে গেলে এ দোষটি ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন দোষের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় না। তাই ক্রেতাকে হয় পূর্ণ দ্রব্যটি গ্রহণ করতে হয় কিংবা পূর্ণ দ্রব্যটি ফেরত দিতে হয়। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (الْمَكْيَلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (الْمَزْزُونُ) দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতা হয় সমগ্র পণ্য রাখবে অথবা সমগ্র পণ্য ফেরত দেবে।

قَوْلُهُ وَقِيلَ : هَذَا إِذَا كَانَ فِى وَعَا وَاحِدٍ الْغ (الْمَكْيَلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (الْمَزْزُونُ) দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতা হয় সমগ্র পণ্য রাখবে অথবা সমগ্র পণ্য ফেরত দেবে। ফিক্‌হবিদগণের কারো কারো মতে এ বিধান ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন সমগ্র দ্রব্য একটি পাত্রে থাকে, দোষগ্রস্ত দ্রব্য ও দোষমুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। আর যদি দ্রব্য একাধিক পাত্রে থাকে, তাহলে তা দুই গোলামের পর্যাভুক্ত। বিক্রীত-পণ্য দুটি গোলাম হলে এবং উভয়টি কজা করার পর কোনো একটিতে দোষ পেলে যেকোনো দোষগ্রস্ত গোলামটিই শুধু ক্রেতা ফেরত দিতে পারে, তেমনি আলোচ্য মাসআলায় যে পাত্রটিতে দোষ পাওয়া যাবে ক্রেতা শুধু সেই পাত্রের দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে, অপর পাত্রেরগুলো নয়। ফকীহ আব্দুল লাইস (র.) জামে সগীরের শরাহতে এ মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে এক রেওয়াজেতে এ ধরনের মত বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ رَبَّنَا اسْتَمْسَكَ بِعَصَاكَ يَا خَيْرَ لَهْ فِى الْغ : যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত কোনো দ্রব্য ত্রয় করে এবং তা কজা করে, এরপর কিছু অংশের দাবিদার বের হয় এবং সে তার অংশ নিয়ে নেয়, উদাহরণত ক্রেতা তিন মন গম ক্রয় করল এবং তা কজা করার পর এক মন গমে দাবিদার বের হলো এবং সে তা নিয়ে গেল, তাহলে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রেতা তদনুপাত্ত মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

গ্রন্থকার (র.) এর যে দলিল পেশ করেছেন তা একটি প্রশ্নের উত্তরও বটে। প্রশ্নটি হলো, যেমন পূর্বোক্ত মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে যে, আংশিক দ্রব্যের দাবিদার বের হলে অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রেতা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে। যেমন-

বিক্রীত-পণ্য একটি কাপড় বা একটি গরু। যদি এগুলোর একাংশের দাবিদার বের হয়, তাহলে অবশিষ্টাংশ ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার আছে। তেমনিভাবে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের একাংশে দাবিদার বের হলেও অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকা উচিত।

এ ছাড়াও আরেকটি প্রশ্ন হয়। তা হলে, পূর্বাঙ্ক মাসআলায় গেল যে, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য এক জাতিভুক্ত হলে তা একটি দ্রব্যের মতো। সুতরাং কজার পর একাংশে দোষ পাওয়া গেলে হয় সমগ্র দ্রব্য ফেরত দেবে অথবা সমগ্র দ্রব্য রাখবে। আর দ্রব্যে অংশীদারিত্বও একটি দোষ। একাংশের দাবিদার বের হওয়ার সুরতে ক্রেতা ও দাবিদার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ দ্রব্যটির মালিক হবে। অতএব দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে যেদ্রুপ ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করে তদ্রুপ দাবিদার বের হওয়ার সুরতেও ক্রেতার এখতিয়ার লাভ করা উচিত।

গ্রহকার (র.) প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কাপড়, গোলাম ইত্যাদি যে সব দ্রব্য ভাগ ও খণ্ডিত করা হলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সব দ্রব্যের অংশবিশেষের দাবিদার বের হলে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার রাখে। কিন্তু পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য যেমন- ধান, চাল, গম ইত্যাদি ভাগ ও খণ্ডিত করা হলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রেতা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে না। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, যেহেতু পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য ভাগ ও খণ্ডিত করা হলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাই তাতে অংশীদারিত্ব দোষ নয়। অংশীদারিত্ব দোষ হলে তবেই দ্বিতীয় প্রশ্ন সঠিক হতো।

قَوْلُهُ وَالْإِسْتِحْقَاقُ لَا يَنْتَعِ تَمَامُ الْمَنْفَقَةِ الخ: গ্রহকার (র.) এ বাক্যে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না থাকা পূর্ণতার আগে বিক্রয়চুক্তির খণ্ডিতকরণকে আবশ্যক করে। কারণ, মালিক ও ক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি একাংশের দাবি করে তা নিয়ে নিল সে একাংশের মালিক। অথচ সে বিক্রয়চুক্তিতে সম্মত ছিল না। তার সম্মতি না থাকায় চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি। তাই উল্লিখিত বিধানানুসারে যদি ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না পায়, তাহলে পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তি খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তিকে খণ্ডিত করা জায়েজ নেই। আর নাজায়েজ কাজ থেকে বাঁচা জরুরি। তাই ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকা চাই।

এর উত্তরে গ্রহকার (র.) বলেন, দ্রব্যের একাংশের দাবিদার বের হওয়াটা চুক্তির পূর্ণতা লাভে বাধা দেয় না। কারণ, চুক্তির পূর্ণতা চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্মতির উপর নির্ভর করে, মালিকের সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না। আলোচ্য মাসআলায় চুক্তিকারীদ্বয় হলো ক্রেতা ও বিক্রেতা। ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তিতে সম্মত থাকায় চুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না থাকায় পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ আবশ্যক হয় না- পূর্ণতা লাভের পরে খণ্ডিতকরণ হয়। আর তা জায়েজ। সুতরাং কোনো সমস্যা নেই। -[বিনায়া, প্রাশ্নুজ খণ্ড, পৃ. ১৭৬]

قَوْلُهُ وَهَذَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ الخ: গ্রহকার (র.) বলেন, দ্রব্যের একাংশে দাবিদার বের হওয়ার সুরতে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না থাকাটা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন দাবিদার বের হওয়ার আগেই ক্রেতা দ্রব্য কজা করে নেয়। যদি কজার আগে দাবিদার বের হয় এবং সে অংশবিশেষ নিয়ে নেয়, তাহলে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে দু'জিনিসের কারণে। ১. চুক্তিকারীদ্বয়ের পারস্পরিক সম্মতি। ২. ক্রেতার দ্রব্য কজা করা। আলোচ্য সুরতে ক্রেতা যেহেতু দ্রব্য কজা করেনি, সেহেতু চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি। এখন দাবিদারের অংশ ছাড়া অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার যদি ক্রেতার না থাকে, তাহলে পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তিকে খণ্ডিত করা হবে। আর তা জায়েজ নেই। তাই আলোচ্য সুরতে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ تَوْنًا فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّ التَّنْظِيمَ الخ: আর যদি বিক্রীত-দ্রব্য কাপড় হয় এবং কজা করার পর তার একাংশের দাবিদার বের হয়, তাহলে ক্রেতা অবশিষ্টাংশ ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে। কারণ, কাপড়ে খণ্ডিতকরণ একটি দোষ। এর ফলে কাপড়ের মূল্যহ্রাস ঘটে। আর যে জিনিস দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটায় তা দোষ হিসেবে বিবেচিত। আর অংশবিশেষে দাবিদার বের হওয়ায় সাব্যস্ত হয় যে, এ দোষটি বিক্রয়চুক্তির সময়ই বিদ্যমান ছিল। অতএব দোষটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে এসেছে। আর যে দোষ বিক্রেতার কাছ থেকে আসে তার কারণে ক্রেতা খোবারে আইবের ভিত্তিতে দ্রব্য ফেরত দেওয়ার অধিকার পায়। তাই এ সুরতে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে। পক্ষান্তরে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য খণ্ডিত করা হলে যেহেতু ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাই তা তাতে দোষ নয়। যেহেতু দোষ নয় সেহেতু কজার পর দাবিদার বের হওয়ার সুরতে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে না।

وَمِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْحًا فَدَاوَاهَا أَوْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا فِي حَاجَتِهِ فَهُوَ رِضًا، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ قَصْدِهِ الْإِسْتِبْقَاءَ، بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ، لِأَنَّ الْخِيَارَ هُنَاكَ لِلْإِخْتِيَارِ وَائْتُهُ بِالْإِسْتِعْمَالِ، فَلَا يَكُونُ الرُّكُوبُ مُسْقِطًا، وَإِنْ رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَانِعِهَا أَوْ لِيَسْقِيَهَا أَوْ لِيَشْتَرِيَ لَهَا عَلَفًا فَلَيْسَ بِرِضًا، أَمَّا الرُّكُوبُ لِلرَّوْزِ فَلِأَنَّهُ سَبَبُ الرَّوْزِ، وَالْجَوَابُ فِي السَّقْيِ وَاشْتِرَاءِ الْعَلَفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بَدَأَ مِنْهُ، إِمَّا لِيَصْعُقَتِهَا أَوْ لِيَعْزِمَهُ أَوْ لِيَكُونَ الْعَلَفُ فِي عَدْلِ وَاحِدٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَجِدُ بَدَأَ مِنْهُ لِإِنْعَادِمِ مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ رِضًا .

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো দাসী ক্রয় করে এবং তাতে কোনো জখম পায় আর সে তার চিকিৎসা করে, কিংবা বিক্রীত-পণ্য ছিল বাহনজন্তু আর সে তার প্রয়োজনে তাতে আরোহণ করে, তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে। কেননা, এগুলো তার রেখে দেওয়ার ইচ্ছার প্রমাণ। তবে খেয়ারে শর্তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেক্ষেত্রে এখতিয়ার হলো যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে। আর তা হয় ব্যবহারের দ্বারা। সুতরাং [সেক্ষেত্রে] আরোহণ খেয়ারকে রহিত করবে না। আর যদি ক্রেতা তাতে এজন্য আরোহণ করে যে, তাকে নিয়ে যেয়ে বিক্রেতাকে ফেরত দেবে কিংবা তাকে পানি পান করাবে অথবা তার জন্য খাদ্য কিনে আনবে, তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে না। ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে আরোহণের বিষয়টি এজন্য সম্মতি বলে গণ্য হবে না যে, এটা হলো ফেরত প্রদানের মাধ্যম। আর পানি পান করানো ও খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে হুকুমটা প্রয়োগ হবে তখন যখন আরোহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে, জন্তুর অবাধ্যতার কারণে হোক কিংবা ক্রেতার অক্ষমতার কারণে হোক কিংবা খাদ্যের বোঝা একপার্শ্বে হওয়ার কারণে হোক। পক্ষান্তরে যখন আমাদের উল্লেখকৃত কারণগুলো না থাকায় আরোহণ করা ছাড়াও অন্য উপায় থাকে, [এতদসত্ত্বেও সে আরোহণ করে] তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল এবং কজা করার পর তার মাঝে কোনো জখম দেখতে পেল, ফলে সে তার চিকিৎসা করল। কিংবা বিক্রীত-পণ্য ছিল বাহনজন্তু আর সে তার প্রয়োজনে তাতে আরোহণ করল, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে এবং তার খেয়ারে আইব বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, দোষ দেখার পরও দাসীর চিকিৎসা করা কিংবা বাহনজন্তুতে আরোহণ করা এগুলো রেখে দেওয়ার ইচ্ছার প্রমাণ বহন করে। আর দোষগ্রস্ত পণ্য রেখে দেওয়ার ইচ্ছা করলে খেয়ারে আইব বাতিল হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের মাসআলার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, বিক্রীত-পণ্যের দোষ সম্পর্কে অবগতির পর তাতে দোষের প্রতি সম্মতি বুঝায়— এমন কোনো হস্তক্ষেপ করা হলে তা বিক্রীত-পণ্য ফেরত প্রদান এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণকে বাধ্যমিত করে। যেমন— বিক্রির জন্য পেশ করা, ইজারা দেওয়া, পরিধান করা, চিকিৎসা করা, বন্ধক রাখা, ক্রীতদাসের সাথে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তির চুক্তি করা, সেবা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ بِحَاثِ الْخَبَارِ الشَّرْطِ الْغ : তবে খেয়ারে শর্তের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, সেক্ষেত্রে এখতিয়ারটা হয় গণ্য কজা করার পর যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে। আর যাচাই-বাছাই হয় ব্যবহারের দ্বারা। সুতরাং খেয়ারে শর্তে বাহনজন্তু ক্রয় করার পর যদি তাতে ক্রেতা আরোহণ করে, তবে তা বাহনজন্তু রাখার প্রতি তার সম্মতি বলে গণ্য হবে না এবং এর ফলে তার খেয়ার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ رَكِبَهَا لِرَدِّهَا عَلَى بَائِعِهَا أَوْ الْغ : আর যদি দোষ সম্পর্কে অবগতির পর বাহনজন্তুর উপর এজন্য আরোহণ করে যে, তাকে নিয়ে বিক্রেতাকে ফেরত দেবে অথবা তাকে পানি পান করাবে অথবা তার জন্য ঘাস-পাতা ও খাদ্য কিনে আনবে, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে যাওয়ার পথে বাহনজন্তুতে আরোহণ করে, চাই আরোহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকুক বা না থাকুক, তা দোষযুক্ত বাহনজন্তুটি রাখার প্রতি সম্মতি বলে এজন্য গণ্য হবে না যে, তা ফেরত দানকে আরো জোরালো করে- সম্মতির প্রমাণ বহন করে না। তাই এ উদ্দেশ্যে আরোহণ করাকে দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য করা হবে না এবং এর ফলে তার খেয়ারে আইব বাতিল হবে না।

আর পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে কিংবা বাহনজন্তুর জন্য খাদ্য ক্রয় করে আনার উদ্দেশ্যে যদি ক্রেতা আরোহণ করে এবং তাছাড়া অন্য কোনো উপায় যদি না থাকে, উদাহরণত ক্রেতা অশীতিপর বৃদ্ধ; হেঁটে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তার অন্য কোনো বাহনজন্তুও নেই কিংবা বাহনজন্তুটি অবাধ্য; তার উপর আরোহণ করা ছাড়া তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না অথবা খাদ্যদ্রব্যের বোঝা একটি, যা বাহনজন্তুর পালানের একপাশে রাখা হয়েছে, এমতবস্থায় বোঝার ভারসাম্য রক্ষার জন্য যদি ক্রেতা বাহনজন্তুতে আরোহণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি আরোহণ করতে বাধ্য না হয়, উদাহরণত পূর্ববর্ণিত সমস্যা তার নেই, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَقُطِعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ؛ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، وَقَالَ : يَرْجِعُ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَارِقًا إِلَى غَيْرِ سَارِقٍ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا قُتِلَ بِسَبَبٍ وَجَدَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِحْقَاقِ عِنْدَهُ، وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا، لِهَذَا أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ سَبَبُ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ، وَإِنَّهُ لَا يُنَافِي الْمَالِيَّةَ فَتَنْفَذَ الْعَقْدُ فِيهِ، لِكُنْهَ مُتَعَبَّبٍ فَيَرْجِعُ بِنَقْصَانِهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ رَدِّهِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ بِالْوِلَادَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا إِلَى غَيْرِ حَامِلٍ، وَلَوْ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَالْوُجُوبُ يُفْضَى إِلَى الْوُجُودِ، فَيَكُونُ الْوُجُودُ مُضَاقًا إِلَى السَّبَبِ السَّائِقِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قُتِلَ الْمَغْضُوبُ أَوْ قُطِعَ بَعْدَ الرَّدِّ بِجَنَابَةٍ وَجَدَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَمْنُوعَةٌ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ না জেনে এমন গোলাম ক্রয় করে যে চুরি করেছে, আর ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় [তার হাত] কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতার গোলামটি ফেরত দেওয়ার এবং মূল্য ফেরত নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। আর সাহেবাইন [ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)]-এর মতে চোর গোলাম ও যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মাঝে মূল্যের যে ব্যবধান হয়, এ ব্যবধান পরিমাণ মূল্য ক্রেতা ফেরত নিতে পারবে। যদি বিক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় সংঘটিত কোনো কারণে গোলামকে হত্যা করা হয় সেক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য। এ মতপার্থক্যের মূলকথা হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এ দোষ [বিক্রীত-পণ্যের একাংশের] দাবিদার বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দোষের পর্যায়ভুক্ত। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় হাত কাটা ও প্রাণদণ্ড সাব্যস্তকারী কারণ পাওয়া গেছে। আর তা [গোলামের] সম্পদগুণ ও অর্থমূল্যতার পরিপন্থি নয়। সুতরাং তাতে বিরূপচুক্তি কার্যকর হবে। কিন্তু তা [ক্রেতার কজায় আসার সময়] দোষগ্ৰস্ত। তাই [হাত কাটা ও প্রাণদণ্ডের কারণে] তাকে ফেরত দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় ক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। আর বিষয়টি এমন হলো যে, না জেনে গর্ভবতী কোনো দাসী ক্রয়ের পর ক্রেতার হাতে প্রসবজনিত কারণে দাসীটি মারা গেল। এ সুরতে ক্রেতা গর্ভবতী এবং গর্ভবতী নয় এমন দাসীর মূল্যে যে ব্যবধান হয়, এ ব্যবধান পরিমাণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, [হাত কাটা বা মৃত্যুদণ্ড] অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ বিক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় বিদ্যমান হয়েছে। আর অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া অস্তিত্ব লাভ করাকে আবশ্যক করে। সুতরাং হাত কাটা ও মৃত্যুদণ্ডের অস্তিত্ব লাভটা পূর্ববর্তী কারণের দিকে সম্পৃক্ত হবে। আর বিষয়টি এমন হলো যে, অপহরণকারীর কজায় থাকা অবস্থায় সংঘটিত কোনো অপরাধের কারণে মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার পর অপহরণকৃত গোলামকে হত্যা করা হলো কিংবা তার হাত কাটা হলো। আর [গর্ভবতী দাসীর] যে মাসআলাটি [সাহেবাইনের পক্ষ থেকে] উল্লিখিত হয়েছে তা সর্বস্বীকৃত নয়।



### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدًا مَدَّ سَقِي الْخ :

বর্ণিত মাসআলাটির বিবরণ : যদি কেউ এমন কোনো গোলাম ক্রয় করে, যে বিক্রোতার কাছে থাকা অবস্থায় চুরি করেছে, কিন্তু ক্রয়ের সময়ও ক্রোতা তা জানত না এবং কজা করার সময়ও তা জানতে পারেনি। এরপর ক্রোতার কজায় ঐ গোলামের হাত কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে ক্রোতা এখতিয়ার পাবে। ইচ্ছা করলে ঐ গোলাম রেখে দেবে এবং কাটা হাতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিক্রোতা থেকে অর্ধেক মূল্য ফেরত নেবে। কারণ, মানুষের হাত তার অর্ধেকের মূল্য রাখে। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইসহাক (র.) বলেন, ক্রোতা ঐ গোলাম বিক্রোতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে না। তবে চুরির দোষে দূষিত গোলাম ও যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মূল্য নিরূপণ করবে এবং উভয়ের মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হয় সে পরিমাণ মূল্য ক্রোতা বিক্রোতা থেকে ফেরত নিতে পারবে। উদাহরণত চুরির দোষে দূষিত গোলামের মূল্য পাঁচশ' টাকা, আর যে গোলাম চোর নয় তার মূল্য এক হাজার টাকা। তাহলে ক্রোতা বিক্রোতা থেকে পাঁচশ' টাকা ফেরত নেবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا قِيلَ سَبَيْ وَجِدَ فِي يَدِ الْبَيْع : উল্লেখ্য যে, যদি বিক্রোতার কজায় থাকা অবস্থায় সংঘটিত কোনো কারণে গোলামকে হত্যা করা হয় সেক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য। অর্থাৎ কেউ যদি এমন কোনো গোলাম ক্রয় করে, যে বিক্রোতার কাছে থাকা অবস্থায় ডাকাতি করেছিল কিংবা কাউকে হত্যা করেছিল আর এর শাস্তিস্বরূপ ক্রোতার কজায় আসার পর তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মত পূর্ববর্তী মাসআলার মতো। সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গোলাম ও যে গোলাম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নয় উভয়ের মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং উভয়ের মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হয় সে পরিমাণ মূল্য ক্রোতা বিক্রোতা থেকে ফেরত নিতে পারবে। উদাহরণত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গোলামের দাম একশ' টাকা, আর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নয় এমন গোলামের দাম এক হাজার টাকা। তাহলে ক্রোতা বিক্রোতা থেকে নয়শ' টাকা ফেরত নেবে।

قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَمْنَعُ زِلَّةَ الْإِسْتِحْفَافِ عِنْدَهُ الْخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, সাহেবাইন ও ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মধাবর্তী এ মতপার্থক্যের মূলকথা হলো, গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে দাবিদার বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বিক্রীত-পণ্য এমন একটি দ্রব্য যা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত বা পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য নয়, যেমন- গোলাম, কজার পর এমন দ্রব্যের একাংশের দাবিদার বের হলে ক্রোতা যেক্ষেপ দ্রব্য ফেরত দিয়ে পূর্ণ মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার পায়, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রোতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার পাবে। আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া দোষের পর্যায়ভুক্ত। যদি পণ্য দোষগ্রস্ত হয় এবং তা বিক্রোতাকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়, তাহলে ক্রোতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত পায়। আলোচ্য মাসআলায়ও গোলামের হাত কর্তনযোগ্য হওয়া অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া একটি দোষ। এ দোষটি বিক্রোতার কাছে থাকা অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু গোলামটি বিক্রোতাকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। হত্যা করার সুরতে অসাধ্য হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট। কারণ, গোলামকে তো হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং তাকে ফেরত দেবে কি করে। আর হাত কাটার সুরতে অসাধ্য হওয়ার কারণ হলো, হাত কাটা একটি নতুন দোষ। অথচ বিক্রোতার মালিকানা থেকে বের হওয়ার সময় গোলামের হাত কাটা ছিল না। আর ক্রোতার কাছে থাকা অবস্থায় পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন দোষের কারণে বিক্রোতাকে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় না, তবে পুরাতন দোষের ক্ষতিপূরণ নেওয়া যায়। তাই আলোচ্য মাসআলায় ক্রোতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ لَهْمَا أَنْ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَيْعِ سَبَبُ النُّطْقِ الْخ :

সাহেবাইন (র.) -এর দলিল : বিক্রোতার কাছে থাকা অবস্থায় হাত কাটা ও প্রাণদণ্ডের কারণ পাওয়া গেছে। আর তা গোলামের সম্পদণ্ড ও অর্ধমূল্যতার পরিপন্থি নয়। যদি পরিপন্থি হতো অর্থাৎ গোলামটি মূল্যসম্পন্ন মাল না হতো, তাহলে

তাতে বিক্রয় শুদ্ধ হতো না, বিক্রয়ের পর তাকে আজাদ করা শুদ্ধ হতো না। অথচ তাতে বিক্রয় শুদ্ধ, তাকে আজাদ করাও শুদ্ধ। সুতরাং গোলামটি মূল্যসম্পন্ন মাল। আর বিক্রীত-পণ্য মূল্যসম্পন্ন মাল হলে তাতে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয়। অতএব আলোচ্য সুরতে গোলামে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে। তবে প্রাণদণ্ডযোগ্য বা হস্তকর্তনযোগ্য হওয়ায় গোলামটি দোষগ্রস্ত। দোষগ্রস্ত অবস্থায় ক্রেতার কজায় এসেছে। আর দোষগ্রস্ত পণ্য ফেরত দেওয়া অসাধ্য হলে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। অতএব উল্লিখিত সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ফেরত দেওয়া কেন এবং কিভাবে অসাধ্য হয় তা একটু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

এর উদাহরণ হলো, ক্রেতা একটি দাসী ক্রয় করল এবং তা কজা করল, পরে দেখা গেল দাসীটি গর্ভবতী। কিন্তু ক্রয়কালেও ক্রেতা তা জানতে পারেনি এবং কজা করার সময়ও জানতে পারেনি। এরপর ক্রেতার হাতে প্রসবজনিত কারণে দাসীটি মারা গেল। এ সুরতে ক্রেতা গর্ভবতী এবং গর্ভবতী নয় এমন দাসীর মূল্যে যে ব্যবধান হয়, এ ব্যবধান পরিমাণ মূল্য ফেরত নিতে পারে। অতএব আলোচ্য সুরতেও চুরির দোষে দৃষিত গোলাম এবং যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মূল্যে যে ব্যবধান হয় সে পরিমাণ মূল্য ক্রেতা ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ سَبَّ الْوَجُوبُ نِسْ يَدِ الْبَائِعِ الْخ: গোলামের হাত কাটা বা তার উপর প্রাণদণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিক্রেতার কাছে পাওয়া যায়। আর কোনো জিনিস ওয়াজিব হলেই তা অস্তিত্ব লাভ করে। ওয়াজিব হওয়ার কারণ যেহেতু বিক্রেতার কাছে পাওয়া গেছে, তাই অস্তিত্ব লাভটাও যেন তার কাছে হয়েছে। অতএব যেন বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই গোলামটিকে হত্যা করা হয়েছে কিংবা তার হাত কাটা হয়েছে। সুতরাং হত্যার ক্ষেত্রে গোলামটি যেন বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তই হয়নি; বরং বিক্রয়চুক্তির সময় তার অস্তিত্বই ছিল না। আর বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়াতে তাতে কজাও হয়নি। যখন কজা হয়নি, তখন ক্রেতা তার দেওয়া মূল্য বিক্রেতা থেকে ফেরত নিয়ে নেবে।

এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি একটি গোলাম অপহরণ করল। গোলামটি তার কাছে থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করল কিংবা ডাকাতি করল বা মুরতাদ হয়ে গেল। এরপর অপহরণকারী গোলামটিকে তার মালিকের কাছে ফেরত দিল। মালিকের কাছে আসার পর তার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হলো। এ সুরতে মালিকের কজায় থাকা অবস্থায় গোলামটির প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হলেও কিংবা হাত কাটা হলেও যেহেতু হত্যার কারণ অপহরণকারীর কজায় থাকাকালে পাওয়া গেছে, তাই মালিক অপহরণকারী থেকে পূর্ণ মূল্য উসুল করবে। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হলেও কিংবা হাত কাটা হলেও এর কারণ যেহেতু বিক্রেতার কাছে পাওয়া গেছে, তাই ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পূর্ণ মূল্য উসুল করবে।

قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَ مِنَ السَّلَاةِ مَنْعَةً: সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে গ্রন্থকার (র.) বলেন, গর্ভবতী দাসীর যে মাসআলাটি উল্লিখিত হয়েছে তা সর্বস্বীকৃত নয়। আর সর্বস্বীকৃত মাসআলা দ্বারাই উদাহরণ পেশ করা যায়। উল্লিখিত অভিমত সাহেবাইন (র.)-এর। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সেক্ষেত্রেও ক্রেতা বিক্রেতা থেকে দাসীর পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে। যেহেতু ইমাম আবু হানীফা (র.) গর্ভবতী দাসীর মাসআলায়ও সাহেবাইন (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, সুতরাং তা দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে দলিল দেওয়া চলে না।

وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَقُطِعَ بِهِمَا عَنْهُمَا بِرُجْعٍ بِالتَّفْصَانِ  
 كَمَا ذَكَرْنَا، وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُّهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ، وَرُجْعُ بَرُوعِ الثَّمَنِ،  
 وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ فَبِثْلَثَةِ الْأَرْبَاعِ، لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْأَدَمِيِّ نِصْفُهُ، وَقَدْ تَلَقَّتْ  
 يَالِحِنَايَتَيْنِ، وَفِي إِحْدَهُمَا الرُّجُوعُ فَيَتَنَصَّفُ، وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدَى ثُمَّ قُطِعَ فِي يَدِ  
 الْأَخِيرِ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ، كَمَا فِي الْإِسْتِحْقَاقِ، وَعِنْدَهُمَا  
 يَرْجِعُ الْأَخِيرُ عَلَى بَائِعِهِ، وَلَا يَرْجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ، لِأَنَّهُ يَمْنُزِلَةُ الْعَيْبِ، وَقَوْلُهُ  
 فِي الْكِتَابِ "وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي" يُفِيدُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ رِضًا بِهِ،  
 وَلَا يُفِيدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّحِيحِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْإِسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ.

অনুবাদ : যদি বিক্রীত গোলাম বিক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় চুরি করে, এরপর ক্রেতার কজায় এসেও চুরি করে এবং উভয় চুরির প্রেক্ষিতে হাত কাটা যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে আমাদের উল্লিখিত নিয়মে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে [ক্রেতার কাছে সৃষ্ট] নতুন দোষের কারণে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া তাকে ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে না। তবে এক-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। যদি বিক্রেতা তাকে ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে [ক্রেতা] তিন-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। কেননা, মানুষের হাত তার অর্ধেক [এর সমতুল্য]। আর [গোলাম] তা হারিয়েছে দুই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ; যার একটির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ ফেরত হবে। সুতরাং অর্ধেক মূল্য দুই অর্ধেকে বিভক্ত হবে। যদি [বিক্রেতার কজায় থাকাকালে চুরি করার পর গোলামের মালিকানা] কয়েক হাত বদল হয় এবং সর্বশেষ ব্যক্তির অধিকারে থাকা অবস্থায় [হাত] কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতাগণ একে অপরের কাছ থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে [এবং গোলাম ফেরত দেবে]; যেমন দাবিদার প্রমাণিত হলে হয়ে থাকে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সর্বশেষ ব্যক্তি তার বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে, কিন্তু তার বিক্রেতা উপরস্থ বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, [তাদের মতে] এটা দোষের পর্যায়ভুক্ত। জামে সগীরের ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য- 'যদি ক্রেতা না জানে' তা সাহেবাইন (র.)-এর মায়হাব মতে ঠিক আছে। কেননা, দোষ সম্পর্কে অবগতি [সত্ত্বেও পণ্য গ্রহণ করা] দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য। বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মায়হাব মতে তা কার্যকরী নয়। কেননা, দাবিদার সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে অবগতি ফেরত দানকে বাধ্যগত করে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَقُطِعَ بِهِمَا الخ : যদি বিক্রীত গোলাম বিক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় একবার চুরি করে, এরপর ক্রেতার কজায় এসেও চুরি করে এবং উভয় চুরির প্রেক্ষিতে তার হাত কাটা যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতা হাতকাটা গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। তবে উল্লিখিত নিয়মে অর্থাৎ চুরির দোষে

দৃষ্ট হ গোলাম এবং যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মূল্যে যে ব্যবধান হয় ক্রেতা সে পরিমাণ মূল্য বিক্রোতা থেকে ফেরত নিতে পারবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও ক্রেতা হাতকাটা গোলামটি বিক্রোতার সম্মতি ছাড়া ফেরত দিতে পারবে না। কেননা, ক্রেতার কাছে আসার পর গোলামটির মাঝে একটি নতুন দোষ সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হলো চুরি করা এবং হাত কাটা যাওয়া। আর পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় বিক্রীত-পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন দোষের কারণে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। তবে পুরাতন দোষের কারণে ক্রেতা বিক্রোতা থেকে এক-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। কেননা, মানুষের হাত তার অর্ধেকের মূল্য রাখা। আর তা কাটা গেছে দুই চুরির কারণে। তন্মধ্যে একটি চুরি পাওয়া গেছে বিক্রোতার কাছে, আরেকটি পাওয়া গেছে ক্রেতার কাছে। ক্রেতা বিক্রোতার কাছে করা চুরির বিপরীতে শুধু ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। আর এক চুরির বিপরীতে আসে অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ গোলামের পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ। তাই ক্রেতা বিক্রোতা থেকে এক-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে।

তবে বিক্রোতা যদি তাকে ফেরত গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে ক্রেতা তিন-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় চুরি করার বিপরীতে পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ক্রেতার পক্ষে থেকে যাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ ক্রেতা পাবে।

قَوْلُهُ لَوْ تَدَاوَلْتَهُ الْأَيْدِي ثُمَّ قُطِعَ نِصْفُ الْأَخِيرِ الخ : যদি বিক্রোতার কজায় থাকাকালে চুরি করার পর গোলামের মালিকানা কয়েক হাত বদল হয় এবং সর্বশেষ ব্যক্তির অধিকারে থাকা অবস্থায় তার হাত কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রোতাগণ একে অপরের কাছ থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে এবং গোলাম ফেরত দেবে; যেমন দাবিদার প্রমাণিত হলে হয়ে থাকে। শাফেয়ী ফিকহবিদদের অনেকের মতও এটি। সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা [হাত কাটা] দোষের পর্যায়ভুক্ত। আর বিক্রোতার কাছে থাকা দোষের কারণে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যে ফেরত দিতে পারে। কিন্তু ক্রেতার নিজস্ব হস্তক্ষেপ ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি ফেরত দান অসাধ্য হয়, তাহলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। আলোচ্য মাসআলায় সর্বশেষ বিক্রোতার মালিকানা থেকে গোলামটি বের হওয়ার সময় হাতকাটার দোষ থেকে মুক্ত ছিল। এখন ফেরত আসলে দোষযুক্ত অবস্থায় ফেরত আসবে। তাই বিক্রোতাকে ফেরত দান অসাধ্য। তবে এ অসাধ্যতার জন্য সর্বশেষ ক্রেতার নিজস্ব হস্তক্ষেপ দায়ী নয়; বরং বিক্রোতার কাছে থাকা দোষই এর জন্য দায়ী। তাই সর্বশেষ ক্রেতা উল্লিখিত নিয়মে অর্থাৎ চোর গোলাম এবং যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মাঝে মূল্যের যে ব্যবধান হয়, সে পরিমাণ মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার বিক্রোতা থেকে ফেরত নেবে। কিন্তু এ বিক্রোতা তার উপরস্থ বিক্রোতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, বিক্রোতাদের প্রত্যেকের পক্ষে তার উপরস্থ বিক্রোতাকে গোলামটি তাদের নিজস্ব হস্তক্ষেপের কারণে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। আর নিয়ম হলো, ফেরত দিতে না পারার জন্য নিজস্ব কর্ম দায়ী হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِيُ يَفِيدُ الخ : অঙ্কার (র.) বলেন, জামে সগীরের ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে বলেছেন, وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِيُ অর্থাৎ 'বিক্রোতার কাছে থাকাকালে গোলামটি চুরি করেছে এ বিষয়টি ক্রেতা ক্রয়কালে জানতে পারেনি' এ বক্তব্যটি সাহেবাইন (র.)-এর মাহাবাব অনুসারে ঠিক আছে। কারণ, তাঁদের মতে গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া একটি দোষ। আর দোষ সম্পর্কে অবগতি সত্ত্বেও ক্রয় করা কিংবা কজা করা দোষের প্রতি সম্মতির প্রমাণ। আর নিয়ম হলো, ক্রেতা দোষের প্রতি সম্মত থাকলে ক্ষতিপূরণও ফেরত পায় না এবং পণ্য ফেরতও দিতে পারে না। তাই অবগতি ছাড়া যদি ক্রেতা ক্রয় করে, তাহলেই শুধু ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) যেহেতু গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়াকে দোষ মনে করেন না, তাই এ বক্তব্য নিশ্চয়োক্ত। কারণ, তাঁর মতে এটা দাবিদার বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর দাবিদার সম্পর্কে অবগতি সত্ত্বেও ক্রয় করা হলে তা ক্ষতিপূরণ ফেরত দেওয়া কিংবা পণ্য ফেরত দেওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْعُيُوبَ بَعْدَهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) : لَا يَصِحُّ الْبَرَاءَةُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الْحَقُوقِ الْمَجْهُولَةِ لَا يَصِحُّ، هُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَتَمْلِيكِ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ، وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالََةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي ضَمْنِهِ التَّمْلِيكِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّسْلِيمِ، فَلَا تَكُونُ مُفْسِدَةً، وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْبَرَاءَةِ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (رح)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) : لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَادِثُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ (رح)، لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ، وَلِأَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّ الْغَرَضَ الزَّامُ الْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَنِ صِفَةِ السَّلَامَةِ، وَذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ عَنِ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ .

অনুবাদ : ইমাম রুদ্রী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম বিক্রি করে এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত আরোপ করে, তাহলে কোনো দোষের কারণে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকবে না; যদিও বিক্রেতা নাম ধরে ধরে দোষের উল্লেখ না করে। ইমাম শাফেরী (র.) বলেন, দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ নয়। কারণ, তাঁর মাহযাব মতে অজ্ঞাত অধিকার থেকে দায়মুক্তি শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, দায়মুক্তির মাঝে মালিক বানানোর অর্থ আছে, তাই তা প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। আর অজ্ঞাত জিনিসের মালিক বানানো শুদ্ধ নয়। আমাদের দলিল হলো, [দায়মুক্তির অর্থ হলো অধিকার রহিত করা, আর] অধিকার রহিতকরণের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত ঝগড়ার কারণ হয় না; যদিও তাতে পরোক্ষভাবে মালিকানা প্রদানের দিক রয়েছে। কারণ, এ ক্ষেত্রে [কোনো কিছু] অর্পণ করার প্রয়োজন হয় না। তাই এ ধরনের অজ্ঞাত চুক্তি বিনষ্টকারী নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে এ দায়মুক্তকরণের মাঝে বর্তমান দোষ এবং কজার আগে সৃষ্ট দোষ অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাতে নতুন সৃষ্ট দোষ অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটা ইমাম যুফার (র.)-এরও অভিমত। কেননা, দায়মুক্তকরণ তৎকালে বিদ্যমান দোষকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, [দায়মুক্তকরণ দ্বারা] উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা কর্তৃক নিজের দোষমুক্ত দ্রব্য লাভের অধিকার রহিতকরণের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তিকে অবশ্য সাব্যস্ত করা। আর তা হয় তৎসময়ে বিদ্যমান ও পরবর্তীতে নতুন সৃষ্ট উভয় প্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তকরণের মাধ্যমে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি গোলাম বিক্রি করে এবং বিক্রয়কালে সর্বপ্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে আর ক্রেতা তা মেনে নেয়, যেমন- বিক্রেতা বলল, এ গোলামে যদি কোনো দোষ পাওয়া যায় আমি তা থেকে মুক্ত, তার দায়দায়িত্ব আমার উপর আসবে না, তাহলে বিক্রেতা কি কি দোষ থেকে দায়মুক্ত- নাম ধরে ধরে তার উল্লেখ করুক বা না করুক, ঐ সকল দোষ সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবগতি থাকুক বা না থাকুক, ক্রেতা গোলামে কোনো দোষ পেলে গোলামটি ফেরত দিতে পারবে না।

عَلَّمَ : قَوْلُهُ وَقَالَ الثَّانِي (رَحْمَةً) : لَا يَصِحُّ الْبَرَاءَةُ : ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ ব্যাপারে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়—

১. প্রতিদ্বন্দ্বিতা মত হলো, এ ধরনের দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ নয় অর্থাৎ দায়মুক্তির শর্ত সহকারে বিক্রয় করলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ মতটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও এটি।

২. আমাদের অনুরূপ মত অর্থাৎ দায়মুক্তি শুদ্ধ আছে এবং ক্রেতা কোনো দোষের কারণে বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে পারবে না।

৩. যে সকল দোষ সম্পর্কে বিক্রেতা অবগত নেই সেগুলো থেকে দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ আছে। যেগুলো সম্পর্কে অবগত আছে সেগুলো থেকে দায়মুক্তির শর্ত করা শুদ্ধ নয়।

ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো পণ্যে দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ নয়। প্রাণীর যে সব দোষ জানা নেই সেগুলো থেকে দায়মুক্তি শুদ্ধ। যেগুলো জানা যায় সেগুলো থেকে দায়মুক্তি শুদ্ধ নয়।—[বিনায়া, প্রাণ্ডক, পৃ. ১৮৪] عِلْمُهُ : قَوْلُهُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الْغُفْرِ الْجَهْلِيَّ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতটি তাঁর ঐ মূলনীতির আলোকে যে, অজ্ঞাত অধিকার থেকে দায়মুক্তকরণ শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর অর্থ আছে। এ কারণেই পাওনাদার যদি দেনাদারকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করে দেয় আর সে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে এ দায়মুক্তকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তীতে দেনাদারকে এ দায় পরিশোধ করতে হয়। দেনাদারের প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাওয়া থেকে বুঝা যায় যে, দায়মুক্তকরণের মাধ্যমে পাওনাদার দেনাদারকে দেনার মালিক বানাতে চেয়েছে, কিন্তু দেনাদারের যেহেতু কোনো কিছুই মালিক না বনার অধিকার আছে, সেহেতু সে মালিক হওয়ার বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে। যদি দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর অর্থ না থাকত, তাহলে দেনাদারের প্রত্যাখ্যান দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হতো না। এ থেকে বুঝা যায় যে, দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর অর্থ আছে। আর অজ্ঞাত জিনিসের মালিক বানানো শুদ্ধ নয়। অতএব ক্রেতার অজ্ঞাতসারে দায়মুক্তকরণও শুদ্ধ নয়।

عِلْمُهُ : قَوْلُهُ وَلَكِنَّا أَنَّ الْجَهْلَةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تَنْفِي الْخ : আমাদের দলিল হলো, দায়মুক্তকরণের প্রত্যক্ষ অর্থ রহিতকরণ; মালিক বানানো তার পরোক্ষ অর্থ। কেননা, দায়মুক্তকরণ শব্দযোগে [يَمْنُ—الْإِبْرَاءُ] কোনো জিনিসের মালিক বানানো শুদ্ধ নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, দায়মুক্তকরণের প্রত্যক্ষ অর্থ মালিক বানানো নয়; বরং রহিতকরণ। আর দায় রহিতকরণের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ঋণভার কারণ হয় না। কেননা, অজ্ঞতা ঋণভার কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে হয় যেখানে কিছু অর্পণ করতে হয়। আর রহিতকরণের ক্ষেত্রে যেহেতু কিছু অর্পণের ব্যাপার নেই, তাই তা ঋণভার কারণ হয় না। আর যে অজ্ঞতা ঋণভার কারণ হয় না তা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে না। অতএব দায়মুক্তকরণ বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করবে না।

عِلْمُهُ : قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْبَرَاءَةِ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ الْخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিক্রেতা যদি বিক্রয়কালে পণ্যের সকল দোষ থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে, তাহলে এ শর্তের অধীনে বিক্রি করার সময় পণ্যে যে সব দোষ থাকবে এবং শর্ত করার পর কজার আগে যে সব দোষ নতুন সৃষ্টি হবে সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাহযাব। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমতও এটি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শর্ত করার পর কজার আগে সৃষ্টি হওয়া নতুন দোষগুলো শর্তের আওতায় আসবে না। এটাই ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত।

—[বিনায়া, প্রাণ্ডক খণ্ড, পৃ. ১৮৬]

তাঁদের দলিল হলো, দায়মুক্তি তৎসময়ে বিদ্যমান দোষগুলোকেই শুধু শামিল করে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তির পর কজার আগে সৃষ্টি হওয়া দোষ তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। ক্রেতা তার কারণে খেয়ার লাভ করবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, ক্রেতা কর্তৃক নিজের দোষমুক্ত দ্রব্য লাভের অধিকার রহিতকরণের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত করাই দায়মুক্তির শর্ত করার উদ্দেশ্য। আর তা অর্জিত হবে বিক্রয়চুক্তির সময়ের দোষ এবং পরবর্তীতে কজার আগে সৃষ্টি হওয়া দোষ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই। তাই বিক্রয়চুক্তির সময়ে বিদ্যমান এবং কজার আগে সৃষ্ট সকল দোষই দায়মুক্তির শর্তের আওতাভুক্ত হবে। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

## بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَوَظَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ وَالْدَمِّ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ : كَالْحَرِّ، قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ، هَذِهِ فُضُولٌ جَمَعَهَا، وَفِيهَا تَفْصِيلٌ نَبِيْنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَنَقُولُ : الْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالْدَمِّ بَاطِلٌ، وَكَذَا بِالْحَرِّ، لِانْعِدَامِ رُكْنِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُعَدُّ مَالًا عِنْدَ أَحَدٍ، وَالْبَيْعُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَاسِدٌ لِوُجُودِ حَقِيقَةِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَإِنَّهُ مَالٌ عِنْدَ الْبَعْضِ .

### পরিচ্ছেদ : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়

অনুবাদ : [ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে] দুই বিনিময় বস্তুর একটি অথবা উভয়টি যদি হারাম বস্তু হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। যেমন মৃত, রক্ত, মদ ও শূকরের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করা। এমনভাবে যদি বিনিময় দ্রব্যটি মালিকানাযোগ্য না হয় [তবে সে ক্ষেত্রেও বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে], যেমন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা। লেখক বলেন, ইমাম কুদুরী এখানে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি মাসআলাকে একত্রে আলোচনা করেছেন এবং এতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা এর বিবরণ দিব। আমাদের কথা এই যে, মৃত ও রক্তের বিনিময়ে [কোনো কিছু] বিক্রয় করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। এমনভাবে স্বাধীন ব্যক্তি বিনিময় বানালেও তা বাতিল হবে। কেননা, এতে বিক্রয়ের মূল রুকন অনুপস্থিত। আর তা হচ্ছে মালের বিনিময়ে মাল লেনদেন করা, অথচ এগুলো কারো কাছেই মাল বলে গণ্য নয়। পক্ষান্তরে মদ ও শূকরের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করা ফাসিদ। [বাতিল নয়।] কেননা, এতে বিক্রয়ের মূল রুকন তথা “মাল দ্বারা মালের বিনিময়” এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা এদুটো বস্তু কোনো কোনো [অমুসলিম সম্প্রদায়]-এর মতে মাল রূপে বিবেচিত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : ক্রয়-বিক্রয় প্রধানত দু'প্রকার, বৈধ ক্রয়-বিক্রয় ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়। বৈধ ক্রয়-বিক্রয় আবার দু'প্রকার, লাযেম ও গায়রে লাযেম তথা যা অনিবার্য এবং যা অনিবার্য নয়। পিছনের অধ্যায়গুলোতে বৈধ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের বিশদ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় মোট চার প্রকার—

১. বাতিল ক্রয়-বিক্রয়,

২. ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়,

৩. মূলতবি ক্রয়-বিক্রয়,

৪. মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয়।

**বাতিল ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি :** لَا يَكُونُ صَحِيحًا أَصْلًا وَوَصْفًا অর্থাৎ, যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত উভয়ভাবে অবৈধ, তাকে বাতিল ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

অন্যমতে وَوَصْفًا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ অর্থাৎ, যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত কোনভাবে শরিয়তসম্মত নয় তাকে বাতিল ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

কেউ কেউ এভাবে সংজ্ঞা বর্ণনা করেন যে, الْمَبِيعُ فَهُوَ مُبْطِلٌ অর্থাৎ, যা বিক্রীত দ্রব্যের মাঝে সমস্যা সৃষ্টিকারী তা ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে। যেমন— বিক্রয় অযোগ্য কোনো কিছু বিক্রয় করা। যেমন— মৃতজন্তু, মদ, মুদাব্বার দাস ইত্যাদি বিক্রয় করা অথবা অস্তিত্বহীন কোনো কিছু বিক্রয় করা।

**ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি :** هُوَ مَا يَكُونُ صَحِيحًا أَصْلًا لَا وَصْفًا অর্থাৎ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় এমন ক্রয়-বিক্রয়কে, যা মূলগতভাবে বিত্ত্ব, তবে গুণগতভাবে বিত্ত্ব নয়।

কেউ কেউ বলেন, هُوَ مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ অর্থাৎ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় এমন ক্রয়-বিক্রয়কে, যা মূলগতভাবে বৈধ, তবে গুণগতভাবে নয়। এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, كَلُّ مَا أُوْرَتْ خِلَافٌ لِّى غَيْرِ رُكْنِ الْمَبِيعِ অর্থাৎ, বিক্রীত দ্রব্য ছাড়া অন্য বিষয়ের সমস্যা সৃষ্টিকারীকে ফাসিদকারী বলা হয়। আর যে বিক্রয়ে এরূপ বিষয় পাওয়া যায় তাকে ফাসিদ বিক্রয় বলা হয়। যেমন— আদান-প্রদানের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করা অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করা অথবা শর্তহীন ক্রয়-বিক্রয় শর্তযুক্ত করে দেওয়া ইত্যাদি। যেমন— হস্তান্তরযোগ্য মালামাল বিক্রয় করা, পলাতক ক্রীতদাসকে বিক্রয় করা অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অযৌক্তিক শর্ত যুক্ত করা। যেমন— কেউ বলল, আমি তোমার কাছে বকরিটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, এর দুধ আমি ভোগ করব।

**মওকুফ তথা মূলতবি ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি :**

هُوَ مَبِيعٌ مَا يَكُونُ صَحِيحًا أَصْلًا وَوَصْفًا لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَارَةٍ الْآخِرِ عَنِ الْبَائِعِ وَالْمُسْتَعْرِ.

মওকুফ ক্রয়-বিক্রয় বলতে এমন ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয় যা মূলগত ও গুণগতভাবে বিত্ত্ব, তবে তা কার্যকর হওয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতির উপর নির্ভরশীল। যেমন— কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে দেওয়া। এ বিক্রয়ের বৈধতা মনিবের অনুমতির উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ নাবালক শিশু বা কিশোরের কোনো ক্রয়-বিক্রয় তার পিতার অনুমতির উপর নির্ভরশীল।

**মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি :** هُوَ مَا يَبِيعُ أَصْلًا وَوَصْفًا لَكِنْ يَنْصِلُ مَعَهُ فِعْلٌ مِنْهُنَّ عَنْهُ অর্থাৎ, মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়, এমন ক্রয়-বিক্রয়কে যা মূলগত ও গুণগত উভয়ভাবে বিত্ত্ব, তবে তাতে অন্য কোনো নিষিদ্ধ কর্ম যুক্ত হয়ে যায়। যেমন— জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা।

**উল্লিখিত ক্রয়-বিক্রয়সমূহের হুকুম :**

১. **বাতিল ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম :** এর দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। দখলের আগেও নয় এবং দখলের পরেও নয়। সুতরাং কেউ যদি মৃত লাশের বিনিময়ে ক্রীতদাস ক্রয় করে এবং তাকে দাসত্ব যুক্ত করে দেয়, তাহলে দাস তার মালিকানা আসবে না এবং দাস যুক্তও হবে না।



২. ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্য দখলে [কজায়] এলে ক্রেতার মালিকানা লাভ হয়, দখলের আগে মালিকানা লাভ হয় না। উদাহরণস্বরূপ কেউ একটি ক্রীতদাস মদের বিনিময়ে ক্রয় করল, অতঃপর ক্রীতদাস তার দখলে আসার পর তাকে আজাদ করে দিল, তাহলে তার মালিকানা নিশ্চিত হবে এবং আজাদ করা কার্যকর হবে। তবে ক্রেতাকে ক্রীতদাসের বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা, তার দেওয়া মদ মাল নয় এবং এ কারণেই তার ক্রয় ফাসিদ হয়েছে।

৩. মওকুফ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম : মওকুফ বা মূলতবি ক্রয়-বিক্রয় এক পর্যায়ে অর্থাৎ অনুমতি পাওয়ার পর মালিকানা নিশ্চিত করে। অনুমতি পাওয়ার আগে মালিকানা লাভ হয় না এবং বেচাকেনাও কার্যকর হয় না।

৪. মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম : মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয়ে মালিকানা লাভ হয়। তবে মাকরুহ হওয়ার কারণে ভিন্ন ওনাহ হয়। ইমাম কুদুরী (র.) ও হিদায়ার লেখক সহীহ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা প্রথমে করেছেন, এরপর ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, সহীহ হচ্ছে আসল ও মূল বিষয়, তাছাড়া এর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে- ক্রয়-বিক্রয়ে দীনি বিধি-বিধান সমুন্নত রাখা ও এর অনুসরণের মাধ্যমে যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করা। আর এসবই সহীহ ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় তো দীনি বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। আর ফাসিদ লেনদেনের দ্বারা যদিও এক পর্যায়ে মৌলিক উদ্দেশ্য তথা মালিকানা লাভ হয়, তবু এর দ্বারা কোনো পূর্ণতা অর্জিত হয় না। কেননা, এর দ্বারা বিক্রীত দ্রব্যে বিক্রতার অধিকার ও ক্রেতার দ্রব্যের মূল অধিকার রহিত হয় না, বরং প্রত্যেকের জন্য ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব।

জ্ঞাতব্য : এ পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু এতে অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের আরো তিন প্রকার যথা বাতিল, মাকরুহ ও মওকুফ সবই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের হেতুগুলো ব্যাপক। ফলে এটি ব্যাপকভাবে সমাজে সংঘটিত হয়, তাই এ পরিচ্ছেদের শিরোনাম ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ পরিচ্ছেদের কোথাও কোথাও বাতিল এর স্থলে ফাসিদ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও প্রকৃতার্থে আবার কোথাও বাতিলের স্থলে রূপকার্থে।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ الْخ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যদি বিক্রয়ের মাল ও বিনিময় মূল্যের কোনো একটি অথবা উভয়টি হারাম বস্তু হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হবে, যেমন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর ও মদের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করল এবং এগুলোকে বিনিময় মূল্যরূপে নির্ধারণ করল। হেদায়ার মুহান্নেফ (র.) [লেখক] বলেন, এসবগুলোর বিক্রয়কে ইমাম কুদুরী (র.) ফাসিদ বিক্রয় বলেছেন। সম্ভবত তিনি ফাসিদ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করেছেন, যাতে ফাসিদ ও বাতিল উভয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তার বর্ণিত সবগুলো ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ নয়; বরং এর কয়েকটি ফাসিদ এবং কয়েকটি বাতিল। লেখক বলেন, এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে। বিবরণটি হচ্ছে যদি মৃতজন্তু অথবা রক্ত অথবা কোনো স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে অন্য কোনো দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহলে লেনদেনটি বাতিল সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ লেনদেনটির বৈধতার কোনো সুযোগ নেই।

কেননা, এতে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল রুকন অনুপস্থিত। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল রুকন হচ্ছে مَبَادِلُ الْمَالِ بِالْمَالِ "মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা।" যেহেতু উপরিউক্ত তিনটি বস্তু কোনো ধর্ম মতেই মাল বলে স্বীকৃত নয়। অতএব এখানে মালের বিনিময়ে মাল হচ্ছে না; বরং মাল বলে স্বীকৃত নয় এমন কিছুকে মালের বিনিময়ে মেনে নেওয়া হচ্ছে।

সাধারণভাবে মাল-সম্পদ বলা হয় এমন কিছুকে, যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে এবং তা সংরক্ষণযোগ্য। রক্ত ও মৃতজন্তু কোনোটার প্রতি মানুষের কোনো আকর্ষণ নেই এবং এগুলো সংরক্ষণযোগ্য নয়। তাই এগুলোতে মালের সংজ্ঞা কার্যকর নয়। অতএব ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন এ ক্রয়ের মধ্যে অনুপস্থিত। আর যে ক্রয়-বিক্রয়ে মূল রুকন অবিদ্যমান থাকে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং রক্ত, মৃত ও স্বাধীন ব্যক্তি বিনিময় হওয়াতে বিক্রয়টি বাতিল হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে মদ কিংবা শূকরের বিনিময়ে কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয় করা হলে সে ক্রয় / বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কেননা, এতে বিক্রয়ের হাকীকত ও মূল রুকন [মালের বিনিময়ে মাল হওয়া] বিদ্যমান আছে। মদ ও শূকর ইসলামের দৃষ্টিতে মাল না হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে তা মাল হিসেবে বিবেচিত। উল্লেখ্য যে, মালের স্বীকৃতি শুধুমাত্র ইসলামি দৃষ্টিতে হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই; বরং কোনো না কোনো ধর্মের বিধান মতে তা মাল রূপে বিবেচিত হলেই তা বিনিময়যোগ্য হয়ে যাবে। মদ ও শূকর অমুসলিম নাগরিকদের কাছে মাল, তাই এখানে الْمَالُ بِالْمَالِ “মাল দ্বারা মালের বিনিময়” বিদ্যমান। অতএব বিক্রয়ের হাকীকত তথা মূল রুকনের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যেহেতু কোনো মুসলমানের পক্ষে শূকর কিংবা মদ আদান-প্রদান করা সম্ভব নয়। ফলে এটা غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ وَالْاِسْلَامِ - “আদান-প্রদান করার অযোগ্য” হয়ে গেছে। আর বেচা-কেনার মধ্যে আদান-প্রদানের অযোগ্য কোনো দ্রব্য থাকলে সেই বেচা-কেনা ফাসিদ হয়ে যায়। অতএব কিভাবে বর্ণিত মদ ও শূকরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম কুদুরী (র.) বর্ণিত মাসআলায় মদ ও শূকরকে পণ্যের মূল্য হিসেবে উল্লেখ করে তার বিধান পেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মদ ও শূকরকে যদি বিক্রীত-পণ্য করা হয়, আর তার মূল্য টাকা-পয়সাকে নির্ধারণ করা হয়। তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

বর্ণিত মাসআলা এবং এ মাসআলার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, মদকে যদিও বা কোনো সম্প্রদায়ের নিকট মাল বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু ইসলামি শরিয়ত মদকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। এটাকে বিক্রীত পণ্যরূপে গ্রহণ করা হলে এটি মুখ্য বিষয়ে পরিগণিত হয় এবং কাম্য বস্তু হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী মাসআলায় মদ ও শূকরকে বিনিময়মূল্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই সেই অবস্থায় ফাসিদ। কিন্তু এ মাসআলায় মদ ও শূকর পণ্যরূপে উপস্থাপিত হওয়াতে এ বিক্রয়চুক্তি বাতিল।

উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হওয়ার দলিল হলো এই- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন-

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ النَّحْلَ

উক্ত হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিবসে আমি সেই ব্যক্তিকে আসামী করব যে, কোনো স্বাধীন লোককে বিক্রয় করে।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ মদের সাথে জড়িত দশ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করেন, এদের মধ্যে বিক্রয়কারী এবং এর মূল্য ভোগকারীও রয়েছে।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَعَلُوهَا فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا, إِنَّا اللَّهُ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ. অন্যান্য তিনি বলেন,

শেষোক্ত দুটি হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হারাম দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন, এ থেকে এও বুঝা যায় যে, হারাম দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম এবং এর মূল্য ভোগ করাও হারাম।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাসআলায় মৃত জন্তু দ্বারা মাসআলায় এরূপ প্রাণী উদ্দেশ্য, যার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পক্ষান্তরে যে জন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা গর্ভে পতিত হয়ে মারা গেছে, তার বিক্রয় যদি অমুসলিম নাগরিকদের মাঝে সংঘটিত হয়, তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় তাদের জন্য বৈধ। কেননা এরূপ মৃতজন্তু অমুসলিমদের কাছে মাল বলে গণ্য। আর কোনো মুসলমান তাকে পণ্যমূল্য বানালে তখন বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

وَالْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ مِلْكَ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ يَكُونُ  
 أَمَانَةً عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرَ مُغْتَبَرٍ فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَعِنْدَ  
 الْبَعْضِ يَكُونُ مَضْمُونًا، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَذْنَى حَالًا مِنَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَ  
 قِيلَ: الْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، وَالثَّانِي قَوْلُهُمَا، كَمَا فِي بَيْعِ أُمِّ التَّوَلَّدِ وَالْمُدَبِّرِ  
 عَلَى مَا نَبَّيْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ إِتِّصَالِ الْقَبْضِ بِهِ  
 وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح)،  
 وَسَنَبَّيْنَهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَا بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالْدِّمِ وَالْحَرِّ بَاطِلٌ، لِأَنَّهَا  
 لَيْسَتْ أَمْوَالًا فَلَا تَكُونُ مُحَلًّا لِلْبَيْعِ -

অনুবাদ : বাতিল বিক্রয়দ্রব্য সত্তার মালিকানা এবং তাসাররুফ তথা পণ্য ক্রেতার অধিকার চর্চার মালিকানা সাব্যস্ত করে না। আর বাতিল বিক্রয়ের মধ্যে যদি ক্রেতার হাতে বিক্রীত পণ্য বিনষ্ট হয় তবে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে সেটা আমানত বলে গণ্য হবে। [অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।] কেননা, বিক্রয়চুক্তিটি অগ্রহণযোগ্য, সুতরাং ক্রেতার কজা মালিকের অনুমতি-ক্রমে বহাল রয়েছে। পক্ষান্তরে কারও কারও মতে বস্তুটি আর্থিক দায়যুক্ত হবে। কেননা, এটাতো সেই পণ্যের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়, যেটাকে কেবল ক্রয়ের মূল্য উল্লেখ করে কজা করা হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত, আর দ্বিতীয়োক্ত সিদ্ধান্তটি সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত। যেমন উম্মে ওলাদ ও মুদাব্বারের ক্ষেত্রে, যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বর্ণনা করব। ফাসিদ বিক্রয়-চুক্তির সাথে ক্রেতার দখল যুক্ত হলে তখন তা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত করে, আর এ ধরনের বিক্রয়ে বিক্রীত-পণ্যটি ক্রেতার হাতে আর্থিক দায়যুক্ত অবস্থায় থাকে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ অধ্যায়ের পর আমরা তা আলোচনা করব। এমনিভাবে মৃত, রক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। কেননা, এগুলো মাল নয়, সুতরাং তা বিক্রয়-পাত্র হতে পারে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বাতিল ও ফাসিদ বিক্রয়-চুক্তির ছকুম এবং এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে, লেখক (র.) বলেন, বাতিল বিক্রয়চুক্তি দ্বারা বিক্রীত পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ক্রেতা যদি উক্ত পণ্য কজা করে দখলে নেয় তবু তা ব্যবহার করা বা তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার তার নেই। তবে তার এ কজা কি আমানতের কজা, নাকি জামানতের কজা, এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মাশায়েখের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল মনে করেন, ক্রেতার হাতে বাতিল বিক্রয়-চুক্তির মাধ্যমে কজাকৃত পণ্য আমানতরূপে থাকবে। অর্থাৎ উক্ত পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতার কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁদের দলটি এই যে, বিক্রয়চুক্তিটি তো গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা বাতিল হওয়ার কারণে বিবেচনার মধ্যে পড়ে না। তবে ক্রেতা যে বিক্রীত পণ্যকে কজা করেছে তা বিক্রোতার অনুমতিক্রমে, ক্রয়ের ভিত্তিতে নয়।

আর যে দ্রব্য অনুমতিক্রমে কজা করা হয়, তা আমানত বলে গণ্য হয়। আর আমানতের বস্তু নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, ক্ষতিপূরণ বাজার মূল্য দ্বারাও হয়, আবার ক্রয়মূল্য দ্বারাও হয়, এ মাসআলায় ক্রেতার উপর কোনোটাই প্রদান করা আবশ্যিক নয়। এ মতটি পোষণ করেন আবুন নাছর ইবনে আহমদ তাওয়াবীসী। এরূপ একটি উক্তি ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়েদ রিয়ওয়াত করেন।

পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেন, ক্রেতার কজা দায়যুক্ত কজা হবে। অর্থাৎ ক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় সেই পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলে উক্ত পণ্যের মতো আরেকটি পণ্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে অথবা পণ্যের বাজার মূল্য পরিশোধ করবে। এ মতটি পোষণ করেন ইমাম শামসুল আইখ্বা সারাখসী (র.)। এটা ইমাম আহমদ (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত।

তাদের দলিল হচ্ছে, বাতিল বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কজাকৃত পণ্যটি কেবল ক্রয়মূল্য বলে কজা করে নেওয়া পণ্যের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে নয়। বরং তার চেয়ে উচ্চপর্যায়ের। কেননা, বাতিল বিক্রয়চুক্তির মধ্যে ক্রয় করার একটি বাহ্যিক রূপ পাওয়া গেছে, পক্ষান্তরে কেবল ক্রয়ের মূল্য উল্লেখ করে কজা করে নেওয়া পণ্যটিতে ক্রয় করার বাহ্যিক রূপও পাওয়া যায়নি। আর এরূপ পণ্য বিনষ্ট হলে তাতে বাজার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সুতরাং বাতিল বিক্রয়-চুক্তির দ্বারা কজাকৃত পণ্য বিনষ্ট হলে তাতেও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যিক হবে।

مَقْبُوضٌ عَلَى سَمِ النَّارِ -এর ব্যাখ্যা হলো, কেউ কারও নিকট থেকে কোনো বস্তু এ বলে নিয়ে গেল যে, আমি এটি নিয়ে গোলাম। তুমি সম্মত থাকলে দশ টাকা মূল্য দিয়ে দেব। পণ্যটি উক্ত ক্রেতার হাতে যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থাকে مَقْبُوضٌ عَلَى سَمِ النَّارِ বলা হয়। হিদায়ার লেখক বলেন, কারও কারও মতে, প্রথমোক্ত মতটি ইমাম আজম আবু হানীফা (র.)-এর। আর দ্বিতীয়োক্ত মতটি সাহেবাইন (র.)-এর। মুদাব্বার, ও উম্মে ওলাদের বিক্রয়ের মাসআলায়ও তাদের মধ্যে এরূপ মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ মুদাব্বার কিংবা উম্মে ওলাদকে ক্রয় করে এবং এগুলো ক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার উপর এগুলোর ক্ষতিপূরণ দান আবশ্যিক নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে এগুলোর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ক্রেতার উপর আবশ্যিক। লেখক বলেন, তাদের মতবিরোধ সংক্রান্ত মাসআলার বিশদ বিবরণ ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে প্রদান করব।

লেখক বলেন, ফাসিদ বিক্রয়চুক্তির দ্বারা ক্রেতার মালিকানা হয়। অর্থাৎ ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের পর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রীতপণ্যকে কজা করে, তাহলে সে সেই পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। এ অবস্থায় যদি বিক্রীত পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তা ক্রেতার উপর দায়যুক্ত থাকবে। সাদৃশ্যশীল বস্তু হলে সদৃশ বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে আর তা না হলে বাজারমূল্য পরিশোধ করবে। আর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয়চুক্তির মজলিসেই পণ্য কজা করে তার বিধানও এরূপই।

লেখক বলেন, এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন, ইমাম আহমদ (র.) এবং মালিক (র.)-এরও এই অভিমত। তাদের মতে ফাসিদ ও বাতিল একই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে ইমাম আজম (র.)-এর এ মতবিরোধ সংক্রান্ত আলোচনা পরবর্তী অনুচ্ছেদ (أَحْكَامُ بَيْعِ الْفَاسِدِ) -এ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

লেখক বলেন, মৃত, রক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তিকে যেমন কোনো কিছুর মূল্য নির্ধারণ করা যায় না এবং করলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়, তদ্রূপ এগুলোকে পণ্য স্থির করা হলেও বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এগুলো মাল নয়, আর যা মাল নয় এমন দ্রব্যকে বিক্রয় পাত্র বানানো যায় না। কারণ, বিক্রয়ের মধ্যে مَبَادِلُ الْمَالِ بِالْمَالِ বিদ্যমান হওয়া আবশ্যিক। অন্যথা বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ নয়।

وَأَمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخَنِزِيرِ إِنْ كَانَ قَوْلُ بِلَدَيْنِ كَالدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُ بَعَيْنٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، حَتَّى يَمْلِكَ مَا يُقَابِلُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخَنِزِيرِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْخَمْرَ مَالٌ، وَكَذَا الْخَنِزِيرُ مَالٌ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ، لِمَا أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِإِهَانَتِهِ وَتَرْكِ إِعْزَازِهِ، وَفِي تَمَلُّكِهِ بِالْعَقْدِ مَقْصُودًا إِعْزَازَ لَهُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مَتَى اشْتَرَاهُمَا بِالدَّرَاهِمِ فَالدَّرَاهِمُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، لِكُونِهَا وَسِيلَةً لِمَا أَنَّهُ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْخَمْرُ، فَسَقَطَ التَّقَوُّمُ أَصْلًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الثَّوْبَ بِالْخَمْرِ، لِأَنَّ مُشْتَرَى الثَّوْبِ إِنَّمَا يَقْصُدُ تَمْلُكَ الثَّوْبِ بِالْخَمْرِ، وَفِيهِ إِعْزَازُ الثَّوْبِ دُونَ الْخَمْرِ، فَبَقِيَ ذِكْرُ الْخَمْرِ مُعْتَبَرًا فِي تَمْلُكِ الثَّوْبِ، لَا فِي حَقِّ نَفْسِ الْخَمْرِ، حَتَّى فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجِبَتْ قِيَمَةُ الثَّوْبِ دُونَ الْخَمْرِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ بِالثَّوْبِ، لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ شِرَاءُ الثَّوْبِ بِالْخَمْرِ، لِكُونِهِ مُقَابِلَةً.

অনুবাদ : অনির্ধারিত মুদ্রা তথা দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে যদি মদ ও শূকর বিক্রয় করা হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। আর যদি তা সুনির্দিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। ফলে এর বিনিময়রূপে নির্ধারিত বস্তুটিতে [মূল্য আদায় করার শর্তে] মালিকানা অর্জিত হবে; যদিও মদ ও শূকর মালিকানাধীন হয় না। মাসআলাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে— মদ ও শূকর জিম্মী [তথা অমুসলিম] সম্প্রদায়ের কাছে মাল বলে গণ্য। তবে [শরিয়তের দৃষ্টিতে] তা মূল্যমানযোগ্য নয়। কেননা, শরিয়ত এগুলোর প্রত্যেকটিকে তুচ্ছজ্ঞান করতে এবং মর্যাদাহীন মনে করতে আদেশ দিয়েছে। অথচ বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে মুখ্য ও উদ্দিষ্টরূপে মালিক হলে এগুলোকে মর্যাদা দেওয়া হয়। আর মর্যাদা দানের ব্যাপারটি এভাবে ঘটে যে, যখন কেউ এ দু'টিকে মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে, তখন মুদ্রাগুলো বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য হয় না। কেননা, এগুলো জিম্মায় ওয়াজিব হয়। আর উদ্দেশ্য হয় মদ। ফলে তা মোটেও মূল্যমানযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে মদের বিনিময়ে কাপড় ক্রয় করার মাসআলাটি এর ব্যতিক্রম। কেননা, কাপড় ক্রয়কারী তো কেবল মদের বিনিময়ে কাপড়ের মালিক হতে চায়। আর এতে কাপড়কে মর্যাদা দান করা হয়, মদকে নয়। ফলে কাপড়ের মালিকানা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মদের উল্লেখ বিবেচ্য হবে। মদের আপন সত্তার ক্ষেত্রে তা ধর্তব্য নয়। ফলে [বিনিময় মাধ্যমরূপে] মদের উল্লেখ ফাসিদ হবে এবং মদের পরিবর্তে কাপড়ের বাজার মূল্য ক্রেন্তার উপর ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ কাপড়কে বিনিময় মাধ্যম করে মদ বিক্রয় করলে

একই বিধান প্রযোজ্য। কেননা, এখানে মদের বিনিময়ে কাপড় ক্রয় বিবেচ্য হবে। কারণ, এটি পণ্য বিনিময় মূলক বিক্রয়চুক্তি যাতে উভয় বিনিময়কে মূল্য এবং পণ্য বিবেচনা করা যায়। তাই আমরা এখানে কাপড়কে পণ্য বিবেচনা করেছি বিক্রয়চুক্তি বৈধ করার জন্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য অংশে লেখক বলেন, মদ ও শূকরকে দুভাবে লেন-দেন করা যায়—

১. হয়ত এগুলোকে অনির্ণয়যোগ্য বস্তু তথা মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করা হবে। উল্লেখ্য যে, সোনা-রূপা হচ্ছে সৃষ্টিগতভাবে অনির্দিষ্ট ও অনির্ণয়যোগ্য। এগুলোকে মূল্যরূপে ব্যবহার করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত এগুলো বিক্রয়বস্তু নয়। বর্তমান যুগের সব ধরনের মুদ্রা যথা টাকা, রুপিয়া, ডলার ইত্যাদি সোনা-রূপার হুকুম রাখে। এগুলোকে ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় **دِين** [দাইন] বলা হয়। মোটকথা, মদ ও শূকরকে মুদ্রা দ্বারা বিনিময় করা হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল সাব্যস্ত হবে।
২. হয়ত এগুলোকে সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যের বিনিময়ে ক্রয় করা হবে। যেমন, কাপড়ের বিনিময়ে মদ ক্রয় করা হলো।

এখানে একটি মূলনীতি প্রাধান্যযোগ্য, তা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রয়দ্রব্য (**مَبْعُوعٌ**) মুখ্য ও উদ্দেশ্য হয়। আর মূল্য (**ثَمَرٌ**) উদ্দেশ্য হয় না। অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তির মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে— বিক্রীতব্য পণ্যটি। তার মূল্য কি হলো তা বিবেচ্য নয়।

উপরের দুটি লেন-দেনের হুকুম হচ্ছে— প্রথমোক্ত লেন-দেন তথা মুদ্রা বিনিময়ে মদের ক্রয় চুক্তি বাতিল, এর দ্বারা মদ ও মুদ্রা কোনোটির উপর মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। দ্বিতীয়োক্ত লেন-দেন তথা কাপড়ের বিনিময়ে মদ ক্রয় চুক্তি ফাসিদ। এতে কাপড়ের ক্রেতা বাজার মূল্য পরিশোধের শর্তে কাপড়ের থানের মালিক হবে। তবে বিক্রেতা তার বিনিময়ে মদ কিংবা শূকরের মালিক হবে না। এরপর লেখক এ দুটি মাসআলার মাঝে যে হুকুমগত পার্থক্য, তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, মদ ও শূকর জিম্মি ও অমুসলিমদের কাছে মাল। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর কোনো মূল্যমান নেই এবং এগুলো দ্বারা কোনোরূপ সুবিধা ভোগ করা নিষিদ্ধ, শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর মূল্যমান না থাকার অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে ঘৃণা ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন যেন এগুলোকে কোনোভাবে মর্যাদা না দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** অর্থাৎ মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ অন্য কিছু নয়। অতএব তোমরা কল্যাণ ও সফলতা লাভ করার জন্য এগুলো থেকে নিরস্ত থাক। — [সূরা মায়িদা : ৯০]

এ আয়াতে মদকে অপবিত্র ও শয়তানের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোনো নাপাক বস্তু মর্যাদা লাভ করতে পারে না; বরং তা ঘৃণার পাত্র, শূকর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ** অর্থাৎ মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের গোশত তোমাদের জন্য হারাম, [সূরা মায়িদা : ৩]। বলা বাহুল্য যে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম, তা কোনোভাবেই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নয়; বরং হারাম বস্তু ঘৃণার পাত্র, সুতরাং আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শূকর ও মদ ঘৃণার পাত্র এবং এগুলোকে মর্যাদা দেওয়া যায় না।

মদ ও শূকরকে যদি মুদ্রার বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়, তখন মদ ও শূকর হয় বিক্রয়পণ্য, আর মুদ্রা হয় তার মূল্য। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পণ্যটি উদ্দেশ্য ও মুখ্য হয়। মূল্য উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা পণ্য সংগ্রহ করার একটি মাধ্যম ও অসিলা হিসেবে বিবেচিত। কেননা, মূল্য তথা মুদ্রা সোনা-রূপা অথবা টাকা যাই হোক না কেন তা জিম্মায় ওয়াজিব হয়। আর যে বস্তু জিম্মায় ওয়াজিব হয়, তা উদ্দেশ্য হয় না। মোটকথা, এটাই প্রমাণিত হলো যে, মুদ্রা ও মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ে উদ্দেশ্য ও মুখ্য হয় না। বরং উদ্দেশ্য হয় বিক্রয়দ্রব্য বা পণ্য। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলায় মুদ্রা তথা দিরহাম ও দিনার হচ্ছে গৌণ বিষয় রূপে বিবেচিত। আর মদ ও শূকর হলো মুখ্য ও উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, মদ ও শূকরকে উদ্দেশ্য করা হলে

এগুলোকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়। অথচ এগুলোকে মর্যাদা দেওয়া শরিয়তে নিষিদ্ধ। এগুলোকে মর্যাদাহীন করার উদ্দেশ্যে [শরিয়ত কর্তৃক] মূল্যহীন ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং যখন এগুলো মূল্যহীন ও ঘণ্যর বস্তু হিসেবে বিবেচিত, তখন এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় মূল্যহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হলো। আর মূল্যহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়। তাই উপরিউক্ত প্রথম অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। আর এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, বাতিল বিক্রয় দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। তাই এখানেও কোনো বিনিময়ের মালিকানা লাভ হবে না।

পক্ষান্তরে মদ ও শূকরের বিনিময়ে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু [মূল্যরূপে নির্ধারিত নয় এমন] উল্লেখ করা হয়, যেমন কাপড়ের বিনিময়ে মদ অথবা শূকর উল্লেখ করা হয়, এ অবস্থায় লেন-দেন বা বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। এতে মদ অথবা শূকরকে পণ্য অথবা মূল্য যে হিসেবেই উপস্থাপন করা হোক না কেন? যদি বলা হয় কাপড় পণ্য আর মদ হচ্ছে মূল্য তাহলেও বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি বলা হয় মদ পণ্য আর কাপড় তার মূল্য, তবুও বিক্রয় ফাসিদ হবে বাতিল নয়। এ অবস্থায় উভয়টিকে পণ্য ও মূল্যরূপে সাব্যস্ত করা বৈধ হওয়ার কারণ এই যে, এটি **بَيْعٌ مَفَاضَةً** [পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়]। বাইয়ে মুকায়াযার মধ্যে দুই বিনিময়ের প্রত্যেকটি মূল্যও হতে পারে, আবার পণ্যও হতে পারে। সুতরাং আমরা কাপড়ের থানকে পণ্য এবং মদকে মূল্য সাব্যস্ত করব। তাহলে বিক্রয়চুক্তিতে কাপড়কে মর্যাদাদান করা হবে, মদকে নয়। কেননা, এখানে মদ কাপড় লাভ করার একটি মাধ্যম, মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই এ ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্দেশের উপেক্ষা বা খেলাফ হয় না। অতএব বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে না; বরং ফাসিদ হবে। কারণ, এতে মূল্য হলো মদ। শরিয়তের দৃষ্টিতে মদের কোনো মূল্য নেই এবং মুসলমানের জন্য এর আদান-প্রদান উভয়টিই নাজায়েজ।

মোটকথা, বিক্রয়চুক্তিতে মদ ও শূকরকে মূল্যরূপে উপস্থাপন করা ফাসিদ এবং এ কারণে বিক্রয়চুক্তিও ফাসিদ হবে। এ অবস্থায় বিক্রয়টি শুদ্ধ করার উপায় হচ্ছে কাপড়ের ক্রেতা মদের পরিবর্তে কাপড়ের বাজারমূল্য পরিশোধ করলে বিক্রয় সहीহ হয়ে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যখন উভয় পণ্যকে বিনিময় মূল্য ও পণ্য আখ্যা দেওয়া যায়, তখন কাপড়কে পণ্য আর মদকে বিনিময়মূল্য কেন সাব্যস্ত করা হলো? এর উত্তর হলো, মদকে পণ্য বিবেচনা করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে মদকে মূল্য বিবেচনা করলে বিক্রয়টি ফাসিদ হয়। সুতরাং মুসলমানের কারবারকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বিক্রয়কে বাতিল না বলে ফাসিদ বলা হয়েছে। কারণ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধরূপ দেওয়া যায়, কিন্তু বাতিল ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধরূপ দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

قَالَ : وَبَيَعَ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرَ وَالْمُكَاتِبَ فَاِسِدَّ، وَمَعْنَاهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ اسْحِقَاقَ الْعِنْتِ قَدْ ثَبَتَ لِأُمِّ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ (ع) اَعْتَقَهَا وَلَدَهَا، وَسَبَبُ الْحُرِّيَةِ اِنْعَقَدَ فِي حَقِّ الْمُدَبِّرِ فِي الْحَالِ لِطُلَانِ الْأَهْلِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْمُكَاتِبُ اسْتَحَقَّ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ لِأَزْمَةِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ لَبَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَلَا يَجُوزُ، وَلَوْ رَضِيَ الْمُكَاتِبُ بِالْبَيْعِ فَفِيهِ رَوَايَتَانِ، وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ، وَالْمُرَادُ الْمُدَبِّرُ الْمُطْلَقُ دُونَ الْمُقَيَّدِ، وَفِي الْمُطْلَقِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح)، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْعِتَاقِ.

**অনুবাদ :** ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার ও মুকাতাবকে ক্রয়-বিক্রয় করা ফাসিদ অর্থাৎ বাতিল। কেননা, উম্মে ওয়ালাদের স্বাধীনতা লাভ করার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কারণ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, “তাকে [মারিয়া কিবতিয়াকে] তার সন্তান স্বাধীন করে দিয়েছে।” আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের কারণ বর্তমানেই সাব্যস্ত যুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, মৃত্যুর পর তো মনিবের মুক্তি দানের যোগ্যতা বাতিল হয়ে যায়। আর মুকাতাবের এমন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ হয়েছে, যা তার মনিবের জন্য কার্যকর। যদি এদের বিক্রয় করার দ্বারা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের প্রাপ্ত সব অধিকার বাতিল হয়ে যায়। অতএব এদের ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হবে না। আর মুকাতাব যদি তাকে বিক্রয় করার বিষয়টি মেনে নেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে দু’টি বর্ণনা রয়েছে। অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট নীতি অনুসারে তা জায়েজ। এখানে মুদাব্বার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিঃশর্ত মুদাব্বার, শর্তযুক্ত মুদাব্বার নয়। নিঃশর্ত মুদাব্বার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। দাসমুক্তি অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ক্রীতদাসের আরো কয়েকটি প্রকারের বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন— উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার ও মুকাতাব।

উম্মে ওয়ালাদ বলা হয় ঐ দাসীকে, যার সাথে তার মনিব সহবাস করার ফলে সে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করেছে। মুদাব্বার দু’প্রকার— ১. মুদাব্বারে মুতলাক। ২. মুদাব্বারে মুকাইয়াদ।

১. মুদাব্বারে মুতলাক বলা হয় এমন দাসকে, যার দাসমুক্তি তথা স্বাধীনতা তার মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ যাকে তার মালিক বলেছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত।

২. মুদাব্বারে মুকাইয়াদ বলা হয় এমন দাসকে, যার দাস মুক্তিকে মালিক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। যেমন মালিক বলল, অমুকের শরীর সুস্থ হলে তুমি মুক্ত। অথবা বলল, অমুক মারা গেলে তুমি মুক্ত।

**মুকাতাব পরিচিতি :** মোকাতাব বলা হয় এমন দাসকে, যে তার মালিকের সাথে দাসত্বমুক্তির জন্য আর্থিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যেমন কোনো দাস তার মালিককে বলল, আমি বিশ হাজার টাকা দিলে আমাকে মুক্ত করে দিবেন। আর মালিক উক্ত চুক্তি মেনে নিল। চুক্তির টাকাকে ‘বদলে কিতাবাত’ বলা হয়।



ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব ও মুদাক্বারের ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ। লেখক বলেন, এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। অর্থাৎ ইমাম কুদুরী (র.)-এর ফাসিদ শব্দটি এখানে বাতিলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাতিল বলার কারণ হলো, এগুলোর দ্বারা কোনোরূপ মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, এমনকি যদি ক্রেতা এগুলোকে কজাও করে নেয় তবুও নয়। কিন্তু ফাসিদ বলা হলে এ ধারণা হতো যে, এগুলোর উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে না, তাই এগুলো বাতিলই হবে। উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, তার মধ্যে আজাদ হওয়ার অধিকারের আগমন অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদ হওয়া মাত্রই দাসী স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ তার দাসী মারিয়া কিব্তিয়া (রা.) সম্পর্কে বলেন, "أَعْتَقَهَا وَلَدَهَا" পুরো হাদীসটি হচ্ছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ (مَارَةُ النَّظِيَّةِ) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدَهَا.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِ قُطَيْبٍ)

অর্থ— রাসূল ﷺ -এর কাছে [তার পুত্র ইব্রাহীমের জন্মের পর] তার মা মারিয়া কিব্তিয়া এর স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বললেন, তার পুত্র তাকে মুক্ত করে দিয়েছে। হাদীসের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছেলে প্রকৃতই তাকে আজাদ করে দিয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কোরাম এর অর্থ করেছেন যে, আজাদের অধিকার দিয়েছে। এ অর্থ সকলের একমত্যে গৃহীত। সারকথা হচ্ছে— এ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, উম্মে ওয়ালাদের মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে দাসমুক্তির গুণ এসে গেছে তা বিক্রয় করার কার্য বৈধ নয়। এ হাদীস দাউদ জাহেরী-এর বিপক্ষে দলিল। উল্লেখ্য যে, দাউদ জাহেরী উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় বৈধ মনে করেন। এমনভাবে মুদাক্বার বিক্রি করাও বাতিল। কারণ, তার মধ্যে মুদাক্বার হওয়ার সাথে সাথে স্বাধীন হওয়ার গুণ চলে আসে। তবে তৎক্ষণাৎ দাসত্বমুক্তির উপস্থিতিকে লেখক এভাবে প্রমাণ করেন যে, মালিকের মৃত্যুর পর তার দাসমুক্ত করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। যদি কেউ বলে বর্তমানে তো সে দাসত্বমুক্ত নয়, বরং মালিকের মৃত্যুর পর তার মাঝে দাসমুক্ত হওয়ার গুণ আসে। তাহলে এ কথা বলা আবশ্যক হয় যে, মালিকের মৃত্যুর পর তার মাঝে দাসমুক্ত করার যোগ্যতা থাকে। অতএব বুঝা গেল যে, মুদাক্বারের মাঝে বর্তমানেই দাসত্ব মুক্তির কারণ রয়েছে। কিন্তু তার হুকুম বিলম্বিত হয়ে তার মনিবের মৃত্যুর পরে তার কাছে আগমন করবে। অতএব এটা অসিয়তের মতো হয়ে গেল। কেননা, যাকে অসিয়ত করা হয় সে সেই অসিয়ত দ্বারা বর্তমানে অসিয়তকারীর স্থলবর্তী হবে। কিন্তু তার কার্যকারিতা হয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর।

মুকাতাবের ব্যাপার এই যে, মুকাতাব তার নিজের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার যোগ্যতা লাভ করে, তার এই হস্তক্ষেপ তার মনিবের ক্ষেত্রে অবশ্য কার্যকর, কিন্তু তার নিজের ব্যাপারে কার্যকর নয়। মালিকের ব্যাপারে তার তাসাররুফ কার্যকর এ কারণে যে, মালিক তার মুকাতাবের সম্মতি ছাড়া 'বদলে কিতাবাত' তথা আর্থিক চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

পক্ষান্তরে মুকাতাব চুক্তিমতে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে মালিকের সম্মতি ছাড়াই চুক্তিটি বাতিল করতে পারে। তাই তার জন্য এ হস্তক্ষেপ-তাসাররুফ অনাবশ্যক। মুকাতাবের আপন নিয়ন্ত্রণাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তার বিক্রয় বৈধ হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, যদি উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের বিক্রয় দ্বারা ক্রেতার মালিকানা প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ ক্রেতা যদি প্রকৃতই উম্মে ওয়ালাদ, মুদাক্বার ও মুকাতাবের মালিক হয়ে যায়, তাহলে উম্মে ওয়ালাদের স্বাধীন হওয়ার অধিকার, মুদাক্বারের স্বাধীন হওয়ার সবব ও মুকাতাবের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সবই বাতিল ও অর্থহীন হয়ে যাবে। কেননা, উম্মে ওয়ালাদের স্বাধীনতা লাভের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া এবং ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এ দু'য়ের মাঝে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। তদ্রূপ মুদাক্বারের মুক্ত হওয়ার কারণ ও ক্রেতার মালিকানা এবং মুকাতাবের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও ক্রেতার মালিকানা লাভ— এর মধ্যেও পরস্পর বৈপরীত্য বিদ্যমান। এমতানুসারে দুই বিপরীতধর্মী বিষয়ের একটি বহাল থাকবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে অপরটি তিরোহিত হবে। কেননা, এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, এ দুই বিপরীতধর্মীর একটির অস্তিত্ব অপরটির অনস্তিত্ব ঘোষণা করে। এ নিয়মানুসারে যখন ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন স্বাধীনতার অধিকার, স্বাধীন হওয়ার সবব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সবই বাতিল হয়ে যাবে।

অণ্য এ তিন বিষয় যে প্রমাণিত তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যখন এ তিনটি প্রমাণিত হলো, তখন ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'টি বিষয় একত্রিত হতে পারে না। কাজেই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। আর যে বিক্রয়চুক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে। অতএব উল্লিখিত দাসদের বিক্রয় বাতিল হবে।

গ্রন্থকার বলেন, মুকাতাব যদি নিজের বিক্রির ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে এ বিক্রয় বৈধ হবে কি না? এ ব্যাপারে দু'টি রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। এক রিওয়ায়েত অনুসারে তা বৈধ। অন্য বর্ণনা মতে তা অবৈধ। লেখক বলেন, বৈধতার পক্ষের মতটি অধিকতর জাহির। কারণ, মুকাতাবের বিক্রয়ের অবৈধতার কারণ স্বয়ং মুকাতাবই। সে চুক্তির মাধ্যমে এ অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার নিজ অধিকার প্রত্যাখ্যান করল, তখন চুক্তি বাতিল হয়ে তার বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। এর সমর্থন বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়। বর্ণনাটি হচ্ছে, হযরত আয়েশা (রা.) বনু হিলাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সাথে অর্থ পরিশোধের চুক্তিতে আবদ্বা দাসী বারীরাতে তার সম্মতিক্রমে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নাওয়াদিরের রিওয়ায়েত অনুসারে মুকাতাব বিক্রয় নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। বিতর্কিতম অভিমত হলো নাজায়েজ। ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত হলো, বিক্রয় বৈধ। লেখক বলেন, মূল ইবারতে বর্ণিত মুদাক্বার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুদাক্বারের মুতলাক। মুকায়াদ নয়, মুকায়াদের ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, তাকে বিক্রয় করা বৈধ। মুদাক্বারের মুতলাক বিক্রয় করা হানাফী ফিকহ অনুসারে বৈধ নয়, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে মুতলাক মুদাক্বারের ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হচ্ছে এ হাদীস, যাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মুদাক্বার বিক্রয় করেছিলেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে তাদের যৌক্তিক দলিল, মুদাক্বারের মুতলাকের মধ্যে দাসের মুক্তিকে মালিক তার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করেছে। মুক্ত জীবনকে কোনো বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা [যেমন- **إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ قَاتِلْتُ حُرًّا** - তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে মুক্ত] বিক্রয় ও দান-হেবার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সুতরাং মুদাক্বারের মুতলাক তথা দাসের স্বাধীন হওয়াকে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করা তার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে না।

আমাদের [হানাফীদে] দলিল হলো হাদীসে রাসূল। রাসূল ﷺ বলেন, **الْمُدَبَّرُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ** অর্থাৎ মুদাক্বারকে বিক্রয় ও দান করা যাবে না এবং কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে এর মালিক হবে না। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুদাক্বারকে বিক্রয় করা যায় না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব, রাসূল ﷺ নিঃশর্ত মুদাক্বারকে বিক্রয় করেননি; বরং তিনি শর্তযুক্ত মুদাক্বারকে বিক্রয় করেছিলেন। এ বিষয়ে **عَنْ** অধ্যায়ের **الْمُدَبَّرُ** পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

قَالَ : وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبِّرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، وَقَالَ : عَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْهُ ، لَهُمَا أَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحَقِّهِ الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ مَضمُونًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُدَبِّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ يَدْخُلَانِ تَحْتَ الْبَيْعِ حَتَّى يَمْلِكَ مَا يَضُمُّ إِلَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ ، بِخِلَافِ الْمُكَاتِبِ ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ الْقَبْضُ ، وَهَذَا الضَّمَانُ بِالْقَبْضِ ، وَلَهُ أَنَّ جِهَةَ الْبَيْعِ إِنَّمَا تَلْحَقُ بِحَقِيقَتِهِمْ فِي مَحَلِّ يَقْبَلُ الْحَقِيقَةَ ، وَهَذَا لَا يَقْبَلَانِ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ ، فَصَارَا كَالْمُكَاتِبِ ، وَلَيْسَ دُخُولُهُمَا فِي الْبَيْعِ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِيُثَبَّتَ حُكْمُ الْبَيْعِ فِيمَا ضُمَّ إِلَيْهِمَا ، فَصَارَ كَمَالِ الْمُشْتَرِي لَا يَدْخُلُ فِي حُكْمِ عَقْدِهِ بِإِنْفِرَادِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الدُّخُولِ فِيمَا ضُمَّ إِلَيْهِ ، كَذَا هَذَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি উম্মে ওয়ালাদ অথবা মুদাব্বার ক্রেতার হস্তাধীনে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এর জন্য ক্রেতার উপর কোনো আর্থিক দায় আবশ্যক হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতার উপর তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। ইমাম আজম (র.) থেকে এরূপ একটি অতিমত বর্ণিত রয়েছে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল এই যে, এটা বিক্রয়ের সুরতে ক্রেতার হস্তাধীনে এসেছে। সুতরাং অন্য সব বস্তুর মতো এটাও বাজারমূল্য দ্বারা দায়যুক্ত হবে। আর এটা [অর্থাৎ মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয়ের সুরতে ক্রেতার হস্তাধীনে আসা] এভাবে যে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাই তাদের সাথে বিক্রয়চুক্তিতে অন্য যেকোনো বিক্রয়পণ্য যুক্ত করা হয় তাতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য মুকাতাবের বিষয়টি এরূপ নয়। কারণ, মুকাতাব নিজ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে তার উপর অন্যের দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর এ [উপরিউক্ত] আর্থিক দায় দখলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- বিক্রয়ের সুরতকে প্রকৃত বিক্রয়ের সাথে কেবল এমন ক্ষেত্রেই যুক্ত করা হবে, যে ক্ষেত্র প্রকৃত বিক্রয়কে গ্রহণ করতে পারে। অথচ উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার প্রকৃত বিক্রয়কে গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। ফলে এ দুটি মুকাতাবের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। আর তাদের বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি- সেতো আপন সঙ্গাত যোগ্যতা বলে নয়। এটা তো কেবল তাদের সাথে যুক্ত করা দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। সুতরাং এটা ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তুর মতো হয়ে গেল, যা স্বতন্ত্রভাবে তো তার সম্পাদিত চুক্তির বিধানভুক্ত হয় না। তবে তার মালের সাথে বিক্রোতা যে মাল যুক্ত করেছে তাতে [ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য] অন্তর্ভুক্তির বিধান সাব্যস্ত হয়। আলোচ্য মাসআলাটিও তদ্রূপ।

عَنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ أ: একা দ্বারা লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, কোনো বস্তু বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকা এবং এর সাথে যুক্ত অন্য বস্তুর উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি যদি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হওয়া কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণকে আবশ্যিক করে তবে মুকাতাব ক্রেতার আয়ত্তে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাতেও বাজারমূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সাহেবাইনের মতে আবশ্যিক হওয়া উচিত ছিল। অথচ সাহেবাইন (র.) মুকাতাবের ক্ষেত্রে তা বলেন না। এ পার্থক্যের কারণ কি? এর উত্তরে লেখক বলেন, মুকাতাবের নিয়ন্ত্রণ তার নিজ হাতেই থাকে। তাই তার উপর ক্রেতার দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না, অথচ দখলের কারণেই ক্ষতিপূরণ আবশ্যিক হয়। এখানে দখলই যেহেতু প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই তার মৃত্যুতে ক্রেতার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, দখল প্রতিষ্ঠা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সবব, কোনো বস্তু বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকা এবং বিক্রয়চুক্তিভুক্ত অন্য

বস্তুর উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হওয়া কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার সর্বনয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- বিক্রয়চুক্তির সুবতে হাসিল হওয়া দখল কেবল সেসব মালের মধ্যে ক্ষতিপূরণকে ওয়াজিব করে, যেসব মালে বিক্রয়চুক্তির সুরতকে প্রকৃত বিক্রয়-চুক্তির সাথে যুক্ত করা যায়। প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি দ্বারা এরূপ বিক্রয়চুক্তি উদ্দেশ্য যা বিক্রয়ের হুকুম তথা মালিকানাকে অপরিহার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ যেসব মালে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেসব মালে ক্ষতিপূরণ যুক্ত হয়। কেননা, ক্ষতিপূরণ মালিকানার পরিবর্তে আসে। আমাদের আলোচ্য মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে যদিও বিক্রয়ের সুরত পাওয়া যায়, কিন্তু মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব, তাদের উপর ক্ষতিপূরণ যুক্ত হবে না। ফলে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ মুকাতা'বের মতোই হয়ে গেল। মালিকানা ছাড়া কেবল বিক্রয়ের সুরত যেহেতু গ্রহণযোগ্য নয়, তাই যেন ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদকে কজা করল। এ ধরনের কজা আমানতের কজারূপে সাব্যস্ত হয়। তাই কজাকৃত ব্যক্তি বা বস্তু বিনষ্ট হলে এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

الْبَيْعُ الْخَالِصُ : قَوْلُهُ وَلَيْسَ دُخُولُهُمَا فِي الْبَيْعِ : এ বাক্য দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য ছিল, যেহেতু মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাই এগুলো ক্রেতার কজায় বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণও আসবে।

এর উত্তরে বলা হবে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ যেহেতু বিক্রয়ের পাত্র নয়, তাই এগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না; বরং এগুলো বিক্রয়ের অন্তর্গত হয় ঐ দ্রব্যের বা ব্যক্তির মাঝে বিক্রয়ের হুকুম তথা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যা এদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর এরকম প্রক্রিয়া শরিয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এমনই একটি উদাহরণ যেমন : কোনো ব্যক্তি তার নিজ ক্রীতদাস ও রাশেদের দাস একত্রে রাশেদের কাছে বিক্রয় করল। তাহলে রাশেদ বিক্রেতার দাসের মূল্যের বিনিময়ে দাসটির মালিক হয়ে যাবে। এখানে বিক্রেতার দাসের ক্ষেত্রে বিক্রয় বিশুদ্ধ হয়েছে। আর ক্রেতার অর্থাৎ রাশেদের দাস বিক্রয়ের মধ্যে হুকুমের মাঝে স্বীয় সন্তাগতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বরং বিক্রেতার দাসের মধ্যে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য মাসআলাতেও মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ সন্তাগতভাবে বিক্রয়ের হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বরং যে দাসকে মিলিয়ে বিক্রয় করা হয়েছে তাতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিক্রয়ের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেহেতু মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ আপন সন্তাগতভাবে বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই ক্রেতা এদের কজা করলে সেই কজাও বিক্রয়ের ভিত্তিতে হলো না। বিক্রয়ের ভিত্তিতে কজা না হওয়াতে এটা বিক্রেতার অনুমতি নিয়ে কজা করা হলো। আর এ রকম কজাতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না যা ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ قَبْلَ أَنْ يَضْطَادَّ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَلَا فِي حَظِيرَةٍ إِذَا كَانَ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِصَيْدٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ التَّسْلِيمِ ، وَمَعْنَاهُ إِذَا أَخَذَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِيهَا ، وَلَوْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ حَيْلٍ جَازٍ ، إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا بِأَنْفُسِهَا وَلَمْ يَسُدَّ عَلَيْهَا الْمَدْخَلُ لِعِدَمِ الْمِلْكِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মাছ ধরার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, সে এমন দ্রব্য বিক্রয় করলে যার সে মালিক নয়। তদ্রূপ ঘেরের মাছ বিক্রয় জায়েজ নেই, যখন তা শিকার করা ব্যতীত ধরা না যায়। কারণ, এটা অর্পণ করা বিক্রেতার ক্ষমতা বহির্ভূত। এর অর্থ হলো “যখন বিক্রেতা মাছ ধরে ঘেরের মধ্যে ফেলে দেয়। আর [এমতাবস্থায়] যদি বিশেষ কৌশল ব্যতীত মাছ ধরা যায়, তাহলে বিক্রয় বৈধ। তবে যদি ঘেরের মধ্যে মাছ এমনভাবেই নিজে নিজে জমা হয়ে থাকে এবং ঘেরের প্রবেশ মুখ বন্ধ না থাকে [তাহলে বিক্রয় জায়েজ নয়] মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত ইবারতে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি পরিচিত পদ্ধতি তথা- নিজস্ব চাষ করা মাছ ব্যতীত সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল বা পুকুর ইত্যাদিতে যেসব মাছ এমনভাবে হয় তার ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরতে মাসআলা বর্ণনার পূর্বে حطيرة সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন। حطيرة -এর বাংলা প্রতিশব্দ ঘের বা চট্টদিকে পরিবেষ্টিত বিশেষ সংরক্ষিত স্থান। যেমন পশু ধরার বিশেষ বেঠনী বা মাছ ধরার বিশেষ ঘের। আমাদের দেশে দুরকম ঘের দেখা যায়। তথা-

১. নদ-নদী বা খাল-বিল থেকে নালা কেটে অদূরবর্তীস্থানে গর্ত করা যাতে নদী/খালের মাছ সেটিতে আটকা পড়ে।
  ২. বাঁশের তৈরি বিশেষ বেড়ার সাহায্যে হাওড়-বিলে সংরক্ষিত মাছ ধরার স্থান।
- মাসআলার স্বরূপ এই যে, মাছ ধরার পূর্বে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, বড় পুকুর ও হাওড়ের মাছ বিক্রয় করা নাজায়েজ। কেননা, এ ধরনের মাছ বিক্রয়ে দু'টি অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত নদ-নদী, খাল-বিলের মাছ কারো মালিকানাধীন নয়। সকলের জন্য এ মাছ ধরা ও খাওয়া বৈধ। মালিকানাধীন নয় এমন বস্তু বিক্রয় অবৈধ। দ্বিতীয়ত এসব মাছ বিক্রয়ের সময় অর্পণের অযোগ্য। অর্পণ-অযোগ্য বস্তুর বিক্রয় বৈধ নয়।

যদি মাছ ঘেরের মধ্যে থাকে তাহলে দু'অবস্থা-

১. বড় ঘের। যার মাছ হাতে ধরা যায় না। জাল ইত্যাদির সাহায্যে ধরা হয়।
২. ছোট ঘের বা এমন ঘের যার মাছ হাতে ধরা যায়।

যদি ঘের বড় হয় যাতে ভিন্নস্থান থেকে মাছ ঘেরে ফেলা হয়েছে এবং ঘের থেকে মাছ বের হওয়ার কোনো রাস্তা না থাকে, তবুও মাছ বিক্রয় অবৈধ। কারণ মাছ বিক্রেতার মালিকানাধীন হলেও তা অর্পণ অযোগ্য।

আর যদি ঘের ছোট হয় তাহলে দু'অবস্থা-

- ক. যদি এতে মাছ ধরে রাখা হয় এবং তার থেকে মাছ বের হওয়ার কোনো রাস্তা না থাকে তাহলে মাছ বিক্রয় বৈধ। কেননা, মাছ বিক্রেতার মালিকানাধীন ও অর্পণযোগ্য।
- খ. ছোট ঘের যাতে আপনা-আপনি মাছ এসে গেছে কিংবা ঘের বা গর্তের মুখ খোলা থাকে এবং গমনাগমনের পথও খোলা থাকে তাহলে এ মাছ বিক্রয় অবৈধ। কেননা, বিক্রেতা মাছ জমা করার কিংবা সংরক্ষণ করার কোনো দায়িত্বই পালন করেনি। তাই এ মাছ তার মালিকানাধীন বলে সাব্যস্ত হবে না। আর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, মালিকানাধীন নয় এমন বস্তু বিক্রয় করা নাজায়েজ। তবে যদি বিক্রেতা ঘেরের প্রবেশ মুখ বন্ধ করে ফেলে তাহলে মাছ বিক্রয় বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, যেসব অবস্থায় মাছ বিক্রয় বৈধ সেসব অবস্থায় ক্রেতার মাছ ধরার পর خبر روية লাভ হবে। কেননা পানির ভিতর থাকা মাছ দেখা এবং পানি থেকে উপরে তোলা মাছ দেখার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই মাছ ধরার পর ক্রেতার خبر روية হাসিল হবে।

নোট : যদি কেউ খাল থেকে মাছ ধরে ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে তাহলে উক্ত মাছ তার মালিকানাধীন হয়ে যায়। এতে অন্য কারো কোনো অধিকার থাকে না।

قَالَ : وَلَا يَبْنَعُ الطَّيْرُ فِي الْهَرَاءِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْأَخْذِ. وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ التَّسْلِيمِ، وَلَا يَبْنَعُ الْحَمَلُ وَلَا الْبَتَّاجُ لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بِنْعِ الْحَمَلِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَلَإِنَّ فِيهِ غَرًّا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করা অবৈধ। কেননা, তা ধরার পূর্বে মালিকানাধীন নয়। তদ্রূপ যদি ক্রেতা তার হাত থেকে ছেড়ে দেয়। কেননা, এটা অর্পণ অযোগ্য। গর্তস্থ জগ এবং গর্তস্থ মাদি জগের জগ বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, রাসূল ﷺ গর্তস্থ জগ এবং গর্তস্থ জগের পরবর্তী সম্ভাব্য গর্তের জগ বিক্রয় করতে নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এতে এক ধরনের প্রতারণা রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আরো কয়েকটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ এরূপ যে, পাখি বিক্রয় মোট চার ধরনের-

১. আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করা।
২. শিকার করার পর হাত অথবা সংরক্ষিত স্থান থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বিক্রয় করা।
৩. এমন পাখি যা আসা-যাওয়া করে যেমন কবুতর ইত্যাদি বিক্রয় করা।
৪. পাখি শিকার করার পর সংরক্ষিত স্থানে হেফাজত করে বিক্রয় করা।

উল্লিখিত প্রকারগুলোর প্রথম দু'অবস্থায় পাখি বিক্রয় অবৈধ। ৩য় অবস্থায় শর্তসাপেক্ষে বিক্রয় বৈধ। আর ৪র্থ অবস্থায় বিনাশর্তে বিক্রয় বৈধ।

প্রথম অবস্থায় অবৈধ হওয়ার মূল কারণ হলো পাখিটি বিক্রেতার মালিকানাভুক্ত না থাকা, যেহেতু বিক্রেতা পাখিটির মালিক নয়। তাই এর বিক্রয় বৈধ নয়। বরং বিক্রয় করা ফাসিদ, তাছাড়া এটা অর্পণযোগ্যও নয়।

দ্বিতীয় অবস্থায় পাখিটির মালিকানা যদিও শিকার করার দ্বারা হাশিল হয়েছে। কিন্তু বিক্রেতা পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে পাখিটি অর্পণযোগ্য নয়। আর অর্পণ অযোগ্য বস্তু বিক্রয় অবৈধ, তাই পাখিটির বিক্রয় অবৈধ হবে। তৃতীয় অবস্থায় ব্যাখ্যা হলো, যদি পাখিটিকে কোনো কৌশল ছাড়া এমনভাবেই ধরা সম্ভব হয় তাহলে এ বিক্রয় বৈধ। কেননা তখন এটা অর্পণযোগ্য বিবেচিত হবে। আর যদি কোনো কৌশল ছাড়া ধরা সম্ভব না হয় তাহলে এর বিক্রয় অবৈধ।

চতুর্থ অবস্থায় বিক্রয় সার্বিক বিবেচনায় বৈধ। কেননা, শিকার করার দ্বারা বিক্রেতা পাখির মালিক হয়েছে, আর হিফাজত করার দ্বারা পাখিটি অর্পণযোগ্যও হয়েছে।

ইবারতে উল্লিখিত দ্বিতীয় মাসআলাটি হচ্ছে, গর্তের জগ বিক্রয় সংক্রান্ত। জাহেলী যুগে জগ বিক্রয়ের রেওয়াজ ছিল। এমন কি তারা গর্তে যে জগ রয়েছে তা মাদি হলে এবং সেটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাতে যে জগ জন্মাবে তাও বিক্রয় করত। এ সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জগ এবং মাদি জগের সম্ভাব্য জগ কে বিক্রয় করা অবৈধ। যেমন কোনো ক্রেতা উটনী বা বকরির মালিক কে বলল, তোমার উটনী অথবা বকরির গর্তস্থ জগ-বাকাকে একশত টাকায় ক্রয় করলাম। উত্তরে বিক্রেতা বলল, আমি তা গ্রহণ করলাম। حَبْلُ الْحَبْلَةِ -এর বিক্রয়ের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, ক্রেতা বলল, এই উটনীর

গর্তে যদি মাদি বাচ্চা হয়, তাহলে উক্ত বাচ্চা বড় হওয়ার পর যে বাচ্চা প্রসব করবে আমি তা ক্রয় করলাম পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে। বিক্রোতা তার প্রস্তাব গ্রহণ করল। জাহেলী-অন্ধকার যুগে এসব ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ছিল। ইসলাম এসব ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

হাদীসে রাসূল ﷺ এ বর্ণিত- الْحَبْلَةُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (র.হা.) হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কয়টি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণিত-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا فِي الْحَبْوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْحَبْوَانِ عَنِ الثَّلَاثِ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاتِيْعِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ .

একই হাদীস মু'জামে তাব্রানীতে হযরত ইবনে আক্বাস (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাককে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, দ্বিতীয়োক্ত হাদীসটি মাকতু' রূপে বর্ণিত হলেও হযরত ইবনে আক্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে সেটি মারফু'রূপে বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লিখিত مَضَامِين শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরুষ উটের ঔরশে-বীর্ষের মাধ্যমে যে সন্তান অবস্থান করছে তা বিক্রয় করা। مَلَاتِيْع শব্দের অর্থ হচ্ছে গর্ভস্থ ভ্রূণ। তবে শব্দ দুটির ব্যাখ্যা বর্ণিত ব্যাখ্যার ঠিক উল্টোরূপেও বর্ণিত আছে।

মোটকথা হচ্ছে, উপরিউক্ত দুটি হাদীস দ্বারা ভ্রূণ এবং মাদি ভ্রূণের সম্ভাব্য পরবর্তী ভ্রূণের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। আর নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হেদায়ার লেখকের বর্ণিত হাদীস الْحَبْلَةُ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ শাব্দিকভাবে প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ এ শব্দে হাদীসটি কোনো প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ হয়নি। তবে হাদীসের অর্থ হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকলানী (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে لَمْ أَرَهُ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকলানী (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে غَرِبَ بِهَذَا اللَّفْظُ (এ শব্দে হাদীসটি গরীব)। সারকথা হচ্ছে, হাদীস দ্বারা লেখক যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা যেহেতু অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাই আর কোনো সমস্যা নেই।

লেখক কর্তৃক উল্লেখিত দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে যুক্তি; আর তা হচ্ছে এ ধরনের বিক্রয়ে প্রতারণা রয়েছে। কেননা একে তো গর্ভে ভ্রূণ আছে কি নাই? তা নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয়ত ভ্রূণ যদি থেকেও থাকে তা জীবিত অবস্থায় জন্মাবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। রাসূল ﷺ প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব, ভ্রূণ এবং ভ্রূণের ভ্রূণ বিক্রয় নিষিদ্ধ।



قَالَ : وَلَا اللَّبَنُ فِي الصَّرْعِ لِلْفَرَرِ ، فَعَسَاهُ انْتِفَاحٌ ، وَلَئِنَّهُ يُنَازَعُ فِي كَيْفِيَةِ الْحَلَبِ ، وَرُبَّمَا يَزْدَادُ ، فَيَخْتَلِطُ الْمَيْعُ بغيرِهِ ، قَالَ : وَلَا الصُّوْفُ عَلَى ظَهْرِ الْعَنَمِ ، لِأَنَّهُ مِنْ أَوْصَافِ الْحَيَوَانِ ، وَلَئِنَّهُ يَنْبْتُ مِنْ أَسْفَلٍ فَيَخْتَلِطُ الْمَيْعُ بغيرِهِ ، بِخِلَافِ الْقَوَائِمِ ، لِأَنَّهَا تَزِيدُ مِنْ أَعْلَى ، وَبِخِلَافِ الْقَصَبِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قَلْعُهُ ، وَالْقَطْعُ فِي الصُّوْفِ مُتَعَيَّنٌ فَيَقَعُ التَّنَازُعُ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوْفِ عَلَى ظَهْرِ الْعَنَمِ وَعَنْ لَبَنِ فِي صَرْعٍ ، وَسَمِنَ فِي لَبَنِ ، وَهُوَ حَجَّةٌ عَلَى أَبِي يُوسُفَ (رح) فِي هَذَا الصُّوْفِ حَيْثُ جَوَزَ بَيْعَهُ فِيمَا يُرَوَى عَنْهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ওলানে অবস্থিত দুধ বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, এতে প্রভারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে ওলান এমনিতেই ফোলা রয়েছে। তা ছাড়া দোহন পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ ঘটতে পারে। কখনও দুধ নতুন করে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে বিক্রীত দুধ অবিক্রীত দুধের সাথে মিশে যাবে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ক্ষেত্রে পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, এটা পশুর গুণবিশেষ। তাছাড়া এটা নিচ থেকে গজায়। ফলে বিক্রীত পশম অবিক্রীত পশমের সাথে মিশে যাবে। গাছের ডালপালা এর ব্যতিক্রম। কেননা, তা উপর থেকে বাড়ে। এবং সবুজ শস্য-সবজিও এর থেকে ভিন্ন। কেননা, তার মূলোৎপাটন সম্ভব। পশমের কেটে নেওয়ার পদ্ধতিটি নির্ধারিত। অতএব এতে কাটার স্থান নিয়ে বিবাদ হবে। আর সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ পিঠে অবস্থিত পশম, ওলানস্থিত দুধ ও দুধস্থিত ঘি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। এ হাদীস ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর বিপক্ষে পশম বিক্রয়ের ব্যাপারে দলিল। কেননা, তার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পিঠস্থ পশম বিক্রয় বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদুরী (রা.) বলেন, পশুর ওলানের দুধ ওলানে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, এতে ক্রেতার প্রভারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন পশুর ওলান ফোলা দেখা গেল। ক্রেতা মনে করল যে, এতে প্রচুর দুধ আছে অথচ তাতে দুধ নেই। অন্য কোনো কারণে ফুলে আছে। এক্ষেত্রে ক্রেতা দুধ মনে করে প্রভারিত হতে পারে। আর যে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রভারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার লেন-দেন রাসূল ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন। নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— দোহন পদ্ধতি নিয়ে বিক্রোতা ও ক্রেতার মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রেতার চাহিদা থাকবে যে, ওলানে যেন এক ফোটা দুধও না থাকে। পক্ষান্তরে বিক্রোতা চাইবে যেন ওলানে কিছু দুধ অবশিষ্ট থাকে। ইতঃপূর্বে এ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেসব ক্রয়-বিক্রয় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে সেসব ক্রয়-বিক্রয় শরিয়ত অনুমোদিত নয়। অতএব ওলানস্থ দুধের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

তৃতীয় দলিল হচ্ছে— ওলানে দুধ বিন্দু বিন্দু করে একত্রিত হয় এবং দুধ দোহন কিংবা বাচ্চা দুধপানের সময় আরো দুধ পর্যায়ক্রমে জমা হয়। অর্থাৎ বিক্রয়ের সময় ওলানের মধ্যে যে দুধ ছিল না তা দোহনের সময় জমা হয়। আর এটা স্পষ্ট যে, বিক্রয়ের পর উৎপাদিত দুধ অবিক্রীত, যার মালিক ও হকদার হচ্ছে বিক্রোতা। আর যে দুধ বিক্রয়ের সময় ওলানে জমা ছিল, সেগুলো হচ্ছে বিক্রীত, যার মালিক হচ্ছে ক্রেতা। দুধ দোহনের পর দোহনকৃত দুধে বিক্রীত ও অবিক্রীত দুধ এমনভাবে মিশে গেছে যে, এখন আর পৃথক করার কোনো অবকাশ নেই। বরং এটা অসম্ভব। আর মূলনীতি অনুসারে বিক্রীত দ্রব্যের সাথে প্রকৃত দ্রব্যের এমন মিশ্রণ, বিক্রয়কে বাধ্যগ্রস্ত করে এবং বিক্রয়কে বাতিল করে দেয়। তাই আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয় অবৈধ হবে। একে বৈধ করার কোনো অবকাশ নেই।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ভেড়া-বকরির গায়ে ও পিঠে যে পশম রয়েছে, তা না কেটে শরী'রে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা নাজায়েজ। কেননা, তা পশুর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত পশুর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত থাকে। গুণাবলি অনুবর্তী হয়। অনুবর্তী বিষয় মূল্যমানের উপযুক্ত নয়। তাই তার মূল বা যার মাধ্যমে সেটা অস্তিত্বমান হয় তা ব্যতীত তাকে বিক্রয় করা বৈধ হয় না।

অবৈধতার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— পশম গোড়া থেকে বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ এই যে, বকরির পশমে যদি রং দেওয়া হয়। এবং এরপর কিছুদিন অভিবাহিত হয়, তাহলে দেখা যাবে তার পশমের উপরিভাগ উক্ত রং দ্বারা রান্ধানো আর নিচের দিকে সেই কৃত্রিম রং নেই। বরং প্রাকৃতিক রং বিদ্যমান। অতএব পশম যে নিচ থেকে বাড়ে তাই প্রমাণিত হলো। আর এটাও আমরা জানি যে, পশম ক্রমবর্ধমান। সুতরাং ক্রেতার ক্রয়ের পর বিক্রীত পশম গ্রহণ করার পূর্বে যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাতেও পশমের কিছুটা প্রবৃদ্ধি ঘটবে। বাড়তি যোগ হওয়া পশম বিক্রীত দ্রব্য নয়; বরং এটা বিক্রেতার মালিকানাধীন। আর ক্রয়ের সময় যে পশম শরীরে ছিল তা হচ্ছে ক্রেতার অংশ। এখন ক্রেতার অংশ বিক্রেতার অংশ এমনভাবে মিশে গেছে যা পৃথক করা আদৌ সম্ভব নয়। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ক্রেতার অংশ যদি বিক্রেতার অংশের সাথে মিশে যায় এবং সেটাকে পৃথক করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিক্রয় অবৈধ। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলাটিতেও ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, গাছের ডাল-পালা গাছে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা তো নিষিদ্ধ নয়। অথচ সেটাও ক্রমবর্ধমান। এবং ক্রয় ও তা গ্রহণ করার মধ্যবর্তী সময়ে এর বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং গাছের ডাল-পালা বিক্রয় বৈধ হলে, পশম বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে কেন? এর উত্তর হচ্ছে— গাছের ডাল-পালা বিক্রয়টি এমন নয়। কারণ, গাছের ডাল-পালায় প্রবৃদ্ধি ঘটে উপর দিক থেকে। এর প্রমাণ হচ্ছে যদি ডালের গোড়ার দিকে একটি সুতা বেঁধে দেওয়া হয়, এরপর কিছু দিন অভিবাহিত হয় তাহলে সুতাটি আগে যে স্থানে ছিল সে স্থানেই থাকবে। ডালের গোড়ার সাথে বাধার সময় যে দূরত্ব ছিল পরেও সেই সমান দূরত্ব বজায় থাকবে, তবে সুতার সাথে ডগার দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। উদাহরণের সাহায্যে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, গাছের ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা উপর দিক থেকেই বাড়ে, ডালের উপরিভাগের মালিকানা ক্রেতার। অতএব যতটুকুই বৃদ্ধি পাক না কেন? তা ক্রেতার মালিকানাধীন থাকবে, ফলে বিক্রীত দ্রব্যের সাথে অবিক্রীত দ্রব্যের মিশ্রণ ঘটবে না। আর মিশ্রণ না ঘটলে ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল হবে না।

অতঃপর সবজি ক্ষেতের মাসআলাটি পশমের মাসআলা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। কেননা, সবজি মাটি থেকে উপড়ে ফেলা সম্ভব যদি কাটার স্থান নিয়ে মতবিরোধ হয়। আর উপড়ে ফেললে মতবিরোধ নিঃশেষ হবে। মোটকথা, সবজি পশমের মতো হলেও এর মতবিরোধ ও বিবাদ নিরসন করার পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু পশমের মধ্যে কেটে নেওয়া ছাড়া অন্যকোনো উপায় নেই। তাই কাটার স্থান নিয়ে বিবাদ থাকবে, যেমন ক্রেতা দাবি করবে, যেন চামড়ার সাথে মিলিয়ে পশম কাটা হয়, পক্ষান্তরে বিক্রেতা চাইবে যেন কিছু পশম রেখে কাটা হয়। তাদের এই বিবাদ বিরূপচুক্তি বাতিল করে দিবে। কেননা, ইতঃপূর্বে মূলনীতি আকারে বলা হয়েছে যে, যা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে তা বিরূপচুক্তি ফাসিদ করে দেয়। অতএব পশুর পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রি করা অবৈধ হবে। কিন্তু ক্ষেতে থাকা সবজি বিক্রয় করা শুদ্ধ হবে।

হিদায়ায় লেখক এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হাদীসটি এরূপ —

عَنْ أَبِي عَيَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا يُبَاعَ صَوْرٌ عَلَى ظَهْرِ وَلَا لَبَنٌ فِي صَرْعٍ. (رواه الطبرانی)

হাদীস এখানে মারফু' রূপে বর্ণিত হয়েছে, এটি কখনো মাওকুফ আবার কখনো মুরসাল রূপেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি “হাসান” পর্যায়ে। এর রাবী ওমর ইবনে ফাররুখ সম্পর্কে جَوَّحٌ وَتَعْدِيلٌ উভয়টি পাওয়া যায়। যদি হাদীসের মারফু' সনদকে দুর্বল ও বলা হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, মুরসাল এবং মাওকুফ বর্ণনাগুলো মারফু' হাদীসকে শক্তিশালী করেছে। হাদীসটি তাবরানীসহ বায়হাকী ও দারাকুতনীও বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অর্থ রাসূল ﷺ খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল, পিঠে থাকা অবস্থায় পশম এবং স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রি করা বৈধ। তার দলিল হচ্ছে— পশম মূল্যমানযোগ্য সম্পদ। এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এটাকে অর্পণ করাও সম্ভব। যে মালে এ তিনটি বিষয় [মূল্যমান যোগ্য, উপকারী ও অর্পণ সম্ভব] পাওয়া যায় তার বিক্রি বৈধ। অতএব বকরির পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রি করা বৈধ হবে। কিন্তু উল্লিখিত হাদীসটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতের বিপক্ষে দলিল, তাই হাদীসের বিপক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

قَالَ : وَجَدْعٌ فِي السَّفْفِ وَ ذِرَاعٌ مِنْ ثَوْبٍ ذَكَرَا الْقَطْعَ أَوْ لَمْ يَذْكُرَاهُ لِأَنَّهُ لَا مُمَكِّنَ تَسْلِيمُهُ إِلَّا بِضَرْبٍ بِخِلَافٍ مَا إِذَا بَاعَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ نُقْرَةٍ فَضَّعَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِلْجَهَالَةِ أَيْضًا وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الذِّرَاعَ أَوْ قَلَعَ الْجَدْعَ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ الْمُشْتَرِي يَعُودُ صَحِيحًا لِزَوَالِ الْمُنْهِيهِ بِخِلَافٍ مَا إِذَا بَاعَ الثَّوْبَ فِي التَّمَرِ وَالْبَدْرَ فِي الْبَطْنِخِ حَيْثُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَإِنْ شَقَّهَا وَأَخْرَجَ الْمِنْعَ لِأَنَّهُ فِي وُجُودِهِمَا إَحْتِمَالًا أَمَّا الْجَدْعُ فَعَيْنٌ مَوْجُودٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ছাদের সাথে সংযুক্ত কড়িকাঠ এবং কাটার দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ হয় অথবা চতুষ্পাশ্ব একই মানের নয় এমন) কাপড়ের একগজ বিক্রি করা বৈধ নয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা কেটে দেওয়ার কথা উল্লেখ করুক অথবা নাই করুক। কেননা, এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত অর্পণ করা সম্ভব নয়, তবে রূপার পাত থেকে দশ দিরহাম পরিমাণ বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ এ রকম বিক্রি জায়েজ], কেননা, রূপা খণ্ডিত করাতে কোনো ত্রুটি হয় না। কিন্তু যুদি নির্দিষ্ট না হয়, তাহলে আমাদের বর্ণিত দলিলের কারণে বৈধ হবে না। তাছাড়া বিক্রীত অংশ অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে অবৈধ হয়ে যাবে। যদি ক্রেতার বিক্রয় প্রত্যাখান করার পূর্বেই বিক্রেতা একগজ কেটে দেয় কিংবা কড়িকাঠ পৃথক করে ফেলে তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, বিক্রয় বিনষ্টকারী কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি খেজুরের অথবা তরমুজের বিচি বিক্রয় করে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে না, যদিও বিক্রেতা তা ভেঙ্গে বিক্রীত বিচি বের করে দেয়। কেননা, বিক্রয়ের সময় বিচির অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। আর কড়িকাঠ তো বিদ্যমান বস্তু।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

جَدْعٌ বলা হয় ঘরের ছাদ ধারণের কাঠকে। সংক্ষেপে একে কড়ি বা কড়িকাঠ বলা হয়। এগুলো সাধারণত পৃথক করা যায় না বা পৃথক করলে ছাদ ধরে পড়ে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কড়িকাঠ ছাদে সংযুক্ত অবস্থায় বিক্রয় করা নাজায়েজ। হক্রপ এমন কাপড় যা থেকে কিছু অংশ কেটে নিলে ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায় যেমন, জামা, পাগড়ি, পায়জামা ইত্যাদি তার একগজ বিক্রয় করা বৈধ নয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রয়ের আলোচনা চলাকালে এগুলো কেটে নেওয়ার কথা উল্লেখ করুক কিংবা না করুক তাতে মাসআলার হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না। নাজায়েজ হওয়ার কারণ এই যে, বিক্রেতার পক্ষে ক্ষতি স্বীকার করা ব্যতীত বিক্রীত কাঠ কিংবা কাপড় অর্পণ করা সম্ভব নয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, বিক্রেতা যদি নিজের ক্ষতি নিজে স্বীকার করে নেয় তাহলে সমস্যা কোথায়? এর উত্তর হচ্ছে— সে শুদ্ধ বিক্রয়চুক্তি করছে। আর শুদ্ধ বিক্রয়চুক্তি এরূপ ক্ষতিকর হয় না। অতএব শুদ্ধ চুক্তির দাবি মতে এ বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা এমন কাপড়ের একগজ বিক্রয় করে, যা খণ্ডিত করলে ত্রুটিযুক্ত হয় না, যেমন ধান কাপড়; তাহলে বিক্রয় সহীহ হবে। এর উদাহরণ হলো, শস্যস্তুপের থেকে এক বা একাধিক সের শস্য বিক্রয় করা বৈধ। কেননা, স্তুপ থেকে কিছু অংশ বিক্রি করলে কোনো ক্ষতি হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যেদ্রব্য খণ্ডিত করলে দ্রব্যটি ত্রুটিযুক্ত

করে দেয় তার খণ্ড বা অংশবিশেষ বিক্রয় বৈধ, আর যেদ্রব্য একরূপ নয় তার অংশ বিশেষ বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন কেউ রূপার পাত থেকে দশ দিরহাম পরিমাণ বিক্রি করল, তাহলে তার এ বিক্রয়চুক্তিটি শুদ্ধ। কারণ, দিরহাম বা রূপা বিক্রিতে অবশিষ্টাংশের কোনো ক্ষতি হয়নি। এরপর লেখক বলেন, যদি ক্রেতা বিক্রয়চুক্তি নাকচ করার আগেই বিক্রেতা কড়িকাঠ ছাদ থেকে পৃথক করে নেয় কিংবা কাটলে ক্ষতি হয় এমন কাপড় থেকে একগজ কেটে দেয় তাহলে বিক্রয় চুক্তিটি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, ফাসাদ সৃষ্টিকারী বিষয় এখন আর নেই। অর্থাৎ বিক্রয়ের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গিয়েছে। এরপর লেখক বলেন, যদি কড়িকাঠ ও কাপড়ের একগজ নির্দিষ্ট না হয় বিক্রয় বৈধ হবে না। এর দু'টি কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন—

১. বিক্রেতা কোনো ক্ষতি স্বীকার করা ছাড়া বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ করতে সক্ষম নয়;
২. এ অবস্থায় বিক্রীত দ্রব্যটি অনির্দিষ্ট।

আর বিক্রীত পণ্য অনির্দিষ্ট থাকলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। সে মতে এখানেও বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

এর পরের মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি খেজুরের মধ্যে অবস্থিত বিচি কিংবা তরমুজের মধ্যে অবস্থিত বিচি বিক্রয় করে তাহলে এ বিক্রয় সহীহ হবে না। এমনকি বিক্রেতা যদি ক্রেতার বিক্রয়চুক্তি নাকচ করে দেওয়ার পূর্বেই খেজুর ও তরমুজ কেটে কিংবা ভেঙ্গে বিচি বের করে ফেলে তবুও বিক্রি সহীহ হবে না। এর কারণ হচ্ছে— বিক্রয়চুক্তির সময় বিচিগুলো দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই এগুলোর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত ছিল না। এ সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল যে, খেজুরের ভিতর হয়তো বিচি নেই; কিংবা আছে, কিন্তু তা খারাপ। ফলে চুক্তিটির অবস্থা এ দাড়ায় যে, বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রয়পণ্য অবিদ্যমান। আর বিক্রয় পণ্য ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করা বাতিল। আর নিয়মানুসারে বাতিল ক্রয়-বিক্রয়কে কোনোভাবে শুদ্ধ করা যায় না। তাই বিক্রেতা যদি খেজুর ও তরমুজ কেটে কিংবা ভেঙ্গে বিচি বের করেও ফেলে তবু বিক্রয় বৈধ হবে না। কেননা, বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দেওয়ার পর তা শুদ্ধ করা যায় না। পক্ষান্তরে ছাদের কড়িকাঠ কিংবা কাপড়ের একগজ প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এবং বিদ্যমান, তাই এর বিক্রয় বৈধ বলে গণ্য হবে, বাতিল হবে না; বরং এখনই অর্পণযোগ্য নয় এ কারণে ফাসিদ। তবে ফাসাদ যে কারণে হয়। তা যদি দূর হয়ে যায় তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি শুদ্ধ হয়ে যায়।

قَالَ : وَضَرَبَهُ الْقَانِصُ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّيْدِ يَضْرِبُ الشَّبَكَةَ مَرَّةً لِأَنَّهُ مَجْهُوذٌ  
وَلَاذَنْ فِيهِ غَرَرًا قَالَ : وَيَبْعُ الْمُزَابِنَةُ وَهُوَ يَبْعُ الثَّمَرِ عَلَى النَّخِيلِ بِتَمَرٍ مَجْذُودٍ  
مِثْلَ كَيْلِهِمْ خَرَصًا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنِ الْمُزَابِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ فَالْمُزَابِنَةُ مَا  
ذَكَرْنَا وَالْمُحَاقَلَةُ يَبْعُ الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلَ كَيْلِهَا خَرَصًا وَلِأَنَّهُ بَاعَ  
مَكِينًا بِمَكِينٍ مِنْ جَنْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بِطَرِيقِ الْخَرِصِ كَمَا إِذَا كَانَ مَوْضُوعَيْنِ عَلَى  
الْأَرْضِ وَكَذَا الْعَنْبُ بِالزَّيْنِبِ عَلَى هَذَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحه) يَجُوزُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ  
أَوْسُقٍ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنِ الْمُزَابِنَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَابِ وَهُوَ أَنْ يُبَاعَ بِخَرِصِهَا  
تَمَرًا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قُلْنَا الْعَرَبِيَّةُ الْعَطِيَّةُ لُغَةً وَتَأْوِيلُهُ أَنْ يَبْيَعُ الْمُعَرِّي لَهُ  
مَا عَلَى النَّخِيلِ مِنَ الْمُعَرِّي بِتَمَرٍ مَجْذُودٍ وَهُوَ يَبْعُ مَجَازًا لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ  
فَيَكُونُ بَرًّا مُبْتَدَأً .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, শিকারীর এক ক্ষেপ বিক্রি করা জায়েজ নয়। শিকারীর এক ক্ষেপ দ্বারা উদ্দেশ্য  
একবার জাল মারার দ্বারা যতটুকু শিকার ধরা পড়ে। কেননা, এখানে বিক্রয় পণ্য অজ্ঞাত, আর এজন্য যে, এতে  
প্রতারণা রয়েছে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুযাবানা পদ্ধতির বিক্রয়-চুক্তি বৈধ নয়। মুযাবানা মানে গাছে অবস্থিত  
খেজুরকে অনুমান করে কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা। কেননা, রাসূল ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালার  
ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। আর মুযাবানা মানে তা-ই, আমরা যা উল্লেখ করলাম। আর মুহাকলা মানে শিষের  
তিতরের গমকে অনুমান করে সে পরিমাণ শিষমুক্ত গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর এটা নিষিদ্ধ এ কারণে যে,  
বিক্রেতা পাত্র পরিমাপ্য দ্রব্যকে তদ্রূপ পাত্র-পরিমাপ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে আর এটা অনুমানের মাধ্যমে  
সম্পাদন করা জায়েজ নয়। যেমন একই শ্রেণীর দ্রব্য [গম বা চাল] দুটিকে মাটিতে রাখা অবস্থায় অনুমান করে বিক্রয়  
করা বৈধ নয়। একই পদ্ধতিতে আড়ুরকে কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাঁচ  
ওসাকের চেয়ে কম পরিমাণে [এ পদ্ধতিতে] বিক্রয় করা জায়েজ; কেননা, রাসূল ﷺ মুযাবানা নিষিদ্ধ করেছেন,  
আর আরায়া (عَرَايَا) -এর অনুমতি প্রদান করেছেন। আর আরায়া মানে পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণ গাছের খেজুরকে  
কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে عَرِيَّة শব্দটি অভিধানে দান ও  
উপটোকনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হাদীসের অর্থ এই যে, দানগ্রহীতা গাছে বিদ্যমান খেজুর দাতার কর্তিত  
খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। এটা রূপকার্থে বিক্রয়চুক্তি। কেননা, গ্রহীতা তো [কজা না করার কারণে]  
এখানে [খেজুরের] মালিক হয়নি। ফলে কর্তিত খেজুর দান যেন নতুন আরেকটি অনুগ্রহ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদুরী (র.) তৎকালীন প্রচলিত কতিপয় ফাসিদ বিক্রয়ের উল্লেখ করে সেগুলোর হুকুম বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে প্রথম উল্লেখ করেছেন **صَرَبُ الْفَانِيسِ** বিক্রয়ক্রি ক্রি। **صَرَبُ الْفَانِيسِ** -এর ব্যাখ্যা হিদায়ার লেখক বলেন, শিকারী ক্রোতাকে বলল, এ ক্ষেপে অর্থাৎ এইবার জালে যে পরিমাণ শিকার [মাছ ও পাখি] ইত্যাদি উঠবে তা তোমার কাছে এতো টাকায় বিক্রি করলাম। এ ধরনের বিক্রি অবৈধ হওয়ার দুটি কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন-

১. এতে বিক্রীত দ্রব্য অজ্ঞাত, এটা ক্রোতা কিংবা বিক্রেতা কারো জানা নেই যে, কি পরিমাণ শিকার-মাছ, পাখি ইত্যাদি জালে আটকিবে। বরং এ আশঙ্কা রয়েছে যে, এতে কোনো শিকারই উঠবে না।

২. এতে প্রতারণা ও ধোকা রয়েছে। কারণ, হতে পারে জালে কোনো মাছ আটকিল না। মাছের পরিবর্তে এতে সাপ, শামুক আটকিল।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো অনুলিপিতে **فَانِيسٌ** শব্দের পরিবর্তে **غَانِيسٌ** শব্দটি রয়েছে। এর সমর্থন পাওয়া যায় তাহযীবুল আজহারীর এক বর্ণনা দ্বারা। **غَانِيسٌ** শব্দের অর্থ ডুবুরী। যে মুক্তা তোলার উদ্দেশ্যে ডুব দেয়। সে মতে এক ডুবে যা তোলা যায় তা বিক্রি করা অবৈধ। এরপর ইমাম কুদুরী মুযাবানা ও মুহাকাল্লা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ দুটি বিক্রয়ও ফাসিদ লেন-দেনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অবৈধ।

**মুযাবানা**-এর সংজ্ঞা : মুযাবানা বলা হয় গাছে বিদ্যমান খেজুর [বা অন্যান্য ফল] কে একই পরিমাণ কর্তিত-আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা। যেমন গাছের খেজুর বা ফল অনুমান করে বলা হলো যে, পাঁচচম খেজুর রয়েছে। এরপর গাছ থেকে আহরিত-কর্তিত খেজুর পাঠ কিংবা ওজনের মাধ্যমে পাঁচচম পরিমাণ করে তা বিক্রি করা হলো গাছের খেজুরের বিনিময়ে। এখানে লক্ষণীয় যে, গাছে যে পরিমাণ খেজুর অনুমান করা হয়েছে, বাস্তবে খেজুর তার চেয়ে বেশিও হতে পারে, আবার অনুমানের চেয়ে কমও হতে পারে, আবার যা অনুমান করা হয়েছে ঠিক তাও হতে পারে [যা এক রকম অসম্ভব]। অনুমানের চেয়ে গাছের খেজুর কম কিংবা বেশি হলে রিবা-সুদ হয়ে যাবে। আর সুদি কারবার শরিয়তে হারাম। সে জন্যে এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম হবে।

**মুহাকাল্লা**-এর সংজ্ঞা : মুহাকাল্লা এর সংজ্ঞা মুযাবানা এর অনুরূপ। পার্থক্য এতটুকু যে, শস্যের ক্ষেত্রে এমন অনুমান নির্ভর ক্রয়-বিক্রয়কে মুহাকাল্লা বলা হয়। যেমন কেউ শিষের মধ্যে বিদ্যমান গম অনুমান করার পর একই পরিমাণ শিমমুক্ত গমের বিনিময়ে বিক্রি করল। উদাহরণ স্বরূপ শিষের মধ্যে বিদ্যমান গমের অনুমান করা হলো যে, এতে পাঁচচম গম রয়েছে, তারপর এর বিনিময়ে পাঁচচম শিমমুক্ত গম মেপে দেওয়া হলো। পূর্বোক্ত কারণে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অতিশত অবশ্য ভিন্ন। তিনি বলেন, পাঠ ও সাকের কম পরিমাণে মুযাবানা ও মুহাকাল্লা বৈধ। পাঠ ও সাকের বেশি পরিমাণে অবৈধ। আর সমান পাঠ ও সাকের ক্ষেত্রে তার দুটি অভিমত রয়েছে, বৈধ ও অবৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল একটি হাদীস। নিম্নে হাদীসটি তুলে ধরা হলো-

عَنْ أَبِي سُوَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَابِ بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَرْصِ أَوْسِيٍّ أَوْ فِي خَرْصِ أَوْسِيٍّ شَكَّ دَاوُدَ . (رواه البخاري ومسلم)

অন্য রিওয়াযাতে বর্ণিত,

عَنْ سَهْلِ بْنِ جَنْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِكَ رِبَاً تِلْكَ الزَّوَائِدُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَابِ النُّخْلَةَ وَالتَّخْلَتَيْنِ بِأَخْذِهَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا كَيْلًا . (رواه مسلم)

হাদীস দুটি দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল পেশ করেন এভাবে যে, **عَرَبِيٌّ** শব্দটি **عَرَبِيٌّ** -এর বহুবচন। আর **عَرَبِيٌّ** বলা হয় পাঠ ও সাকের কম পরিমাণে গাছে অবস্থিত খেজুর অনুমান করে একই পরিমাণ কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা, যেমন : গাছের খেজুর অনুমান করা হলো যে, এতে চার ওসাক খেজুর রয়েছে। এরপর কর্তিত খেজুর চার ওসাক মেপে তার বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করে দেওয়া। যেহেতু রাসূল ﷺ মুযাবানা নিষিদ্ধ করে আরাযার অনুমতি দিয়েছেন [যেমনটি হাদীস

থেকে বুঝা গেল। তাই পাঁচ ওয়াসাকের কমে অনুমান করে গাছের খেজুর/ফল ইত্যাদি বিক্রি করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর সংজ্ঞাটি হাদীসের শব্দের সাথেও মিলে যায়। কেননা পূর্বোক্ত হাদীসের শব্দ হচ্ছে—

رَحَصَ فِي الْعَرَابِ بِخَرْيَمِهَا فِيمَا دُونَ حَسَبَةِ أَوْسَىٰ أَوْ بَيْنَ حَسَبَةِ أَوْسَىٰ .

আহনাফের দলিল : রাসূল ﷺ জাহেলিযুগে প্রচলিত মুযাবানা ও মুহাকালার বিক্রয়চুক্তি নিষিদ্ধ করেন।

১. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ زَادَ مُسْلِمٌ وَعَنِ الثُّنْيِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ كَرِهْنَهُ .

২. হযরত আবু সালিদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي سَلِيمَةَ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمَزَابِنَةُ إِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقِلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ .

৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّمْحَاقِلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ .

৪. عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَحَاقِلَةِ وَالْمُخَابِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمَنَابِذَةِ وَالْمَزَابِنَةِ .

উপরউক্ত হাদীসগুলোর দ্বারা স্পষ্টতই মুযাবানা ও মুহাকালার নিষিদ্ধতা প্রমাণ হয়।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, মুযাবানা ও মুহাকালার বিক্রীত পণ্য ও মূল্য উভয়টা একই জিনসের, আর পরিমাপের ক্ষেত্রেও এক [হয়তো ওজন কিংবা পাত্র পরিমাপ]। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, জিনস ও কদর এক হয়ে গেলে অনুমানের উপর ভিত্তি করে পণ্য বিনিময় করা যায় না, কেননা, এতে সুদের সন্দেহ ও আশঙ্কা থাকে। আর প্রকৃত সুদ যেমন হারাম তেমনি সুদের সন্দেহ যাতে থাকে এমন বিষয়ও হারাম। অতএব মুযাবানা ও মুহাকালার এর পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে। লেখক বলেন, খেজুর কিংবা শস্য দানা যদি পণ্য ও মূল্য হয় আর উভয়টা কর্তিত অবস্থায় থাকে, তাহলে যেমন পণ্য [খেজুর]-কে ও মূল্য [খেজুর] -কে অনুমান করে বিনিময় করা যায় না; বরং প্রত্যেকটিতে আলাদা করে মাপতে হয়, তেমনি গাছের খেজুর [পণ্য]-কে এবং কর্তিত খেজুর [মূল্য]-কে অনুমান করে বিক্রয় ও বিনিময় করা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : আহনাফ বলেন, عَرِيَّةٌ -এর যে সংজ্ঞা ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণনা করেছেন তা সঠিক নয়, বরং এর সংজ্ঞা হলো এই عَرِيَّةٌ শব্দটির অভিধানিক অর্থ দান। পরিভাষায় عَرِيَّةٌ বলা হয়, কোনো বিতৃণালী ব্যক্তি কোনো দরিদ্র লোককে তার বাগানের কয়েকটি গাছের খেজুর দান করল। দরিদ্র লোকটি তার খেজুরের জন্য বাগানে আসা-যাওয়া করে। ফলে বাগানের মালিকের কষ্ট হয়। মালিক তার কষ্ট লাঘব করা এবং দরিদ্র ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে চিন্তা করে যে, আমি তাকে আমার কাছে সংরক্ষিত খেজুর দিয়ে দিলে তার প্রয়োজনও পূরণ হলো, আর আমার কষ্টও দূর হলো। কিন্তু সেই সাথে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গেরও ভয় ছিল। কারণ, বাগানের মালিক দরিদ্র লোকটিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তাকে গাছের খেজুরগুলো দেওয়া হবে। হাদীসের মাধ্যমে তার উক্ত সমস্যার সমাধান দেওয়া হয় যে, এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নয়; বরং এটা রূপকার্থে বিক্রয়। যদিও মূলত এটা বিক্রয়চুক্তি নয়। কারণ, عَرِيَّةٌ এক ধরনের দান বা হেবা। আর হেবার নিয়মানুসারে গ্রহীতা দানকৃত বস্তু কজা না করলে তার মালিক হয় না। এ কারণে হেবার মূল্যে সবার মতে কজা করা আবশ্যিক। এখানে গ্রহীতা খেজুরগুলো গাছে থাকার কারণে কজা করতে পারেনি। যার ফলে খেজুরের উপর তার মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর এটা পূর্ব থেকেই জানা যে, মালিকানা বহির্ভূত বস্তু বিক্রি করা যায় না। ফলে এখানে যেন দাতা দরিদ্র গ্রহীতার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তাকে পুনরায় দান করল। তাই এটি কোনো বিক্রয় নয় এটাই সাব্যস্ত হলো। তাহলে হাদীসে পাঁচ ওয়াসাকের কথা কেন বলা হলো? এর উত্তর হচ্ছে তাদের এ ধরনের লেন-দেন পাঁচ ওয়াসাকের কমেই হতো। আর হাদীসে رَحَصَ -এর অর্থ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে অবকাশ দান।

উল্লেখ্য যে, আরায়ার আরেকটি সংজ্ঞা ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণিত আছে। তা হলো, কোনো ব্যক্তি একটা অথবা দুইটা খেজুর গাছের মালিক। তার এ খেজুর গাছগুলো আবার কোনো এক লোকের বাগানের মাঝে অবস্থিত। তার গাছগুলো ছাড়া সবই বাগানের মালিকের। ফল পাকার সময় হলে মদীনাবাসীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে বাগানে আসে। তখন দু'একটি গাছের মালিকও তার পরিবার নিয়ে বাগানে যায় ফলে বেশি সংখ্যক গাছের মালিকের কাজে বিঘ্ন ঘটে। তখন বেশি গাছের মালিক সেই স্বল্প গাছের মালিককে তার ফল অনুমান করে সেই পরিমাণ কর্তিত ফল দিয়ে দেয়, যাতে স্বল্প গাছের মালিক তার পরিবার নিয়ে প্রস্থান করে। এটিকে আরায়া বলা হয়। এ সংজ্ঞাটিকে ইমাম মালেক (র.)-এর অনুসৃত বলা হলে মূলত ইমাম মালিক (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) বর্ণিত সংজ্ঞাকেই সমর্থন করেন।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، وَهَذِهِ بَيِّنَةٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ أَنْ يَتَرَاوَضَ الرَّجُلَانِ عَلَى سِلْعَةٍ أَوْ يَتَسَاوَمَانِ فَاذًا لِمَسَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ نَبَذَهَا إِلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ وَضَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ فَلَاوَلَّ بَيْعُ الْمَلَامَسَةِ وَالثَّانِي بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَالثَّالِثُ الْبَيْعُ الْحَجَرِ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَلِأَنَّ فِيهِ تَغْلِيْقًا بِالْخَطَرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, পাথর নিষ্ক্ষেপের দ্বারা, স্পর্শ করার দ্বারা এবং বিক্রীত-পণ্য ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে বিক্রয় বৈধ নয়। এ বিক্রয়-পদ্ধতিগুলো জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। এর প্রক্রিয়া ছিল এরূপ যে, দু'ব্যক্তি পণ্য সম্পর্কে দরদাম করত, ইতোমধ্যে ক্রেতা যদি পণ্যটি স্পর্শ করত কিংবা বিক্রেতা পণ্যটি ক্রেতার প্রতি ছুঁড়ে দিত, অথবা ক্রেতা পণ্যের উপর কঙ্কর রেখে দিত তাহলে উল্লিখিত মূল্যে বিক্রয়চুক্তি অপরিহার্য হয়ে যেতো। প্রথমটি “বাইয়ে মুলামসা” আর দ্বিতীয়টি “বাইয়ে মুনাবাযাহ” এবং তৃতীয়টি “বাইয়ে ইলকায়ে হাজার” [পাথর নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয়] আর মহানবী ﷺ: মুলামসা ও মুনাবাযা এর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এ কারণেও যে, এতে মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে লেখক জাহেলী যুগে প্রচলিত আরো কয়েকটি ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন। সে ক্রয়-বিক্রয়গুলো এই- (১) بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ (২) بَيْعُ الْمَلَامَسَةِ الْحَجَرِ (৩) بَيْعُ الْبَائِقِ الْحَجَرِ -এর পরিচয় : এ ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি ছিল, একই ধরনের কয়েকটি বস্তু বিদ্যমান থাকত, যেমন- কয়েকটি থান কাপড়, ক্রেতা ও বিক্রেতা সেগুলোর মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করত। বিক্রেতা পণ্য বিষয়ক তথ্য দিত, আর পণ্যের মূল্য উল্লেখ করত, এমনকি বস্তুয় ক্রেতা একটি কঙ্কর কোনো একটি থানে ছুঁড়ে মারত। যে থানটিতে কঙ্কর নিক্ষেপ হতো, তাতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যেতো। এতে বিক্রেতা সম্মত হোক বা না হোক, এবং এতে ক্রেতারও মত পরিবর্তন করার সুযোগ থাকত না।

بَيْعُ الْمَلَامَسَةِ -এর পরিচয় : এর পদ্ধতি ছিল, ক্রেতা ও বিক্রেতা পণ্যের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করত। ইতোমধ্যে ক্রেতা পণ্যটি স্পর্শ করলে পণ্য ক্রেতার হয়ে যেতো। বিক্রেতা বিক্রয়ে সম্মত হোক কিংবা না হোক।

بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ -এর পরিচয় : এর পদ্ধতি ছিল, দুজন ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে পণ্যের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করত। সেই মুহূর্তে বিক্রয়কে অপরিহার্য করার জন্য বিক্রেতা ক্রেতার প্রতি পণ্যটি নিষ্ক্ষেপ করত এতে বিক্রয়চুক্তি অপরিহার্য হয়ে যেত। চাই এতে ক্রেতার সম্মতি থাকুক কিংবা না-থাকুক এতে ক্রেতার বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করারও কোনো সুযোগ থাকত না।

হাদীস : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَأَنَّ مُسْلِمًا إِذَا مَلَسَ ثَوْبًا فَلْيَبْسُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُمَا نَوْبًا صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأْخُلٍ فَلْيَرْوِ الْأَمْسَ الْبَائِقَ أَلْبَسَ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ لَهُ عِنْدَ الرَّؤُفِ . (رواه البخاري و مسلم)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বৈধ : مُنَابَذَةٌ ও مَلَامَسَةٌ -এর নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। ইতিমধ্যে যদিও স্পষ্ট কোনো হাদীস পাওয়া যায় না, কিন্তু এটাকে মুনাবাযা ও মুলামাসার সমগোষ্ঠীরূপে গণ্য করা হয়। নিষেধাজ্ঞা কারণ হলো- ১. ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি আবশ্যিক। এখানে তা পাওয়া যায়নি। ২. বিক্রয় দ্বারা মালিকানা প্রমাণিত হয় আর মালিকানাতে একটি দোদুল্যমান বিষয়ের সাথে যুক্ত করা এক ধরনের জুয়া, আর জুয়া নিঃসন্দেহে হারাম। অতএব এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হবে। এগুলোর মধ্যে জুয়ার অর্থ এভাবে পাওয়া যায় যে, বিক্রেতা এসে তাকে বলল, তুমি যে পণ্যের উপর কঙ্কর মারবে, সেটি আমি তোমার কাছে বিক্রয় করলাম। কঙ্কর সেই পণ্যের গায়ে লাগতে পারে, আবার নাও লাগতে পারে। মুনাবাযার মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে তুমি উদাহরণ রূপে কাপড়টি আমার প্রতি নিষ্ক্ষেপ কর নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়া সাপেক্ষে আমি তা ক্রয় করলাম। আর মুলামাসার মধ্যে বিক্রেতা-ক্রেতাকে বলে, তুমি এই কাপড়গুলোর মধ্যে যেটা স্পর্শ করবে, সেটি আমার কাছে বিক্রয় করলাম। যেটুকি, এ তিন প্রকার বিক্রয়ে শর্তগুলো কারণে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ঝুঁকি দিচ্ছিল। আর এরূপ অনিশ্চয়তা গম্যার সাথে তুলনীয়। অতএব, এ বিক্রয়চুক্তিগুলোও বৈধ নয়।



قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ لِحَالَةِ الْمَيْعِ، وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَأْخُذَ أَيُّهُمَا شَاءَ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِفُرُوعِهِ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرَاغَى وَلَا إِجَارَتَهَا، وَالْمَرَادُ الْكَلًّا، أَمَّا الْبَيْعُ فَلِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ، لِاشْتِرَاكِ النَّاسِ فِيهِ بِالْحَدِيثِ، وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَلِأَنَّهُ عَقْدَتْ عَلَى اسْتِهْلَاكِ عَيْنٍ مُبَاجٍ، وَلَوْ عَقْدَتْ عَلَى اسْتِهْلَاكِ عَيْنٍ مَمْلُوكٍ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ بَقْرَةً لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا لَا يَجُوزُ، فَهَذَا أَوَّلِي .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দু' কাপড়ের মধ্য হতে অনির্দিষ্টভাবে একটি কাপড় বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, এতে বিক্রয়পণ্যটি অজ্ঞাত। আর যদি বিক্রেতা বলে যে, ক্রেতার এ অর্থিতয়ার আছে যে, সে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে, তাহলে ইস্তিহসানের বিবেচনায় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আমরা এ বিষয়টি তার শাখাগত মাসায়েল সহকারে ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, চারণভূমি বিক্রয় কিংবা ইজারা দেওয়া বৈধ নয়। চারণভূমি দ্বারা উদ্দেশ্য ঘাস [যা সংরক্ষিত নয়]। এ বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, বিক্রয়চুক্তি এমন জিনিসের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে, বিক্রেতা যার মালিক নয়। কেননা, হাদীস দ্বারা [প্রমাণিত যে,] এতে সকল মানুষের শরিকানা রয়েছে। আর ইজারা অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, সকলের জন্য বৈধ, [কারো একক মালিকানাধীন নয়] এমন একটি জিনিস যা ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে ইজারা-চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, অথচ যদি কোনো মালিকানাধীন জিনিস ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইজারা-চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবু তা বৈধ হয় না। যেমন- কেউ দুধ পানের উদ্দেশ্যে গাভী ইজারা নিল, [যা বৈধ নয়]। সুতরাং এটা বৈধ না হওয়া আরও স্বাভাবিক।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ الْخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, একাধিক কাপড় থেকে অনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি ক্রয় বা বিক্রয় করা বৈধ নয়। কারণ, এখানে বিক্রীত কাপড়টি অজ্ঞাত। তাও আবার এমন অজ্ঞাত যে, এ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিতে পারে, যেমন- তিন কাপড়ের মধ্যে একটি ভালো, আরেকটি মধ্যম, আর তৃতীয়টি নিম্নমানের। এমতাবস্থায় ক্রেতা সবচেয়ে ভালো মানের কাপড়টি নিতে চাইবে, বিক্রেতা দিতে চাইবে নিম্ন বা মধ্যমমানের কাপড়। এ নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হবে। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ঝগড়া সৃষ্টিকারী কোনো কিছুর উপস্থিতি বিক্রয়চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। অতএব এখানে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে, কিংবা ক্রেতা বেছে নেওয়ার শর্ত করে বিক্রয়চুক্তিতে সম্মত হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ইস্তিহসানের বিবেচনায় সহীহ হয়ে যাবে। হিনায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইতঃপূর্বে [خِيَارُ شَرْطٍ -এর পরিচ্ছেদে] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর লেখক জামিউস সাগীর গ্রন্থের একটি মাসআলা উল্লেখ করেন। উক্ত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, চারণভূমি বিক্রয় কিংবা ইজারা দেওয়া বৈধ নয়। লেখক চারণভূমির ব্যাখ্যা বলেন, চারণভূমি দ্বারা উদ্দেশ্য এর ঘাস। কারণ, আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ব্যবহার রীতি অনুসারে স্থান বলে স্থানের দ্রব্যাদি উদ্দেশ্য করা হয়।

এরপর লেখক অসংরক্ষিত ঘাস বিক্রয়ের অবৈধতার কারণ বর্ণনা করেন। তা হলো, ঘাস কারও মালিকানাধীন নয়; বরং এতে সব মানুষের অংশিদারিত্ব রয়েছে। সবার অংশিদারিত্বের বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বর্ণিত হয়েছে—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : أَلْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ . (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)  
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : أَلْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ  
وَتَمْنَهُ حَرَامٌ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

হাদীস দুটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ঘাস, পানি ও আগুনে সব মানুষের অংশিদারিত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত হাদীসে বিশেষভাবে বলা হয়েছে এগুলোর বিক্রয়ের মূল্য ভোগ করা হারাম। মোটকথা, অসংরক্ষিত ঘাসে সবার অংশিদারিত্ব রয়েছে, তাই এটি ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। ঘাস ইজারা দান অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, এখানে ইজারা-চুক্তিটি সকলের জন্য বৈধ এমন জিনিস নিঃশেষ করার জন্য সম্পন্ন হচ্ছে। অতএব এটা বৈধ হবে না। এর দলিল হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কারও ব্যক্তি মালিকানাধীন দ্রব্যকে নিঃশেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইজারা নেয়, তবু তা জায়েজ নয়। যেমন, কারও গাভীর দুধ পানের উদ্দেশ্যে গাভীটি ভাড়া নেওয়া জায়েজ নয়। মালিকানাধীন দ্রব্য যদি ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য ইজারা নেওয়া বৈধ না হয়, তাহলে তো যা মালিকানাধীন নয়; বরং সকলের শরিকানাভুক্ত বস্তুতে তা কোনোভাবেই বৈধ হবে না। কারণ, ইজারা নেওয়ার বিধান কেবল (مَنَافِع) সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে, মূল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এবং তা নিঃশেষ করার জন্য নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাড়া নেয়, সে কেবল সুবিধাদি ভোগ করে। সে মূল দ্রব্যটি নষ্ট করা বা নিঃশেষ করার মালিক হয় না। মূল দ্রব্যটির মালিক ইজারাদাতা থেকে যায় অথচ এখানে ইজারা প্রদান করা হচ্ছে মূল দ্রব্য যথা ঘাস এবং তা নিঃশেষ করা হচ্ছে। যেমন— কেউ যদি দুধ পানের উদ্দেশ্যে কোনো গাভী ভাড়া নিতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে না। মোটকথা, আমাদের আলোচ্য ঘাস ইজারা প্রদান দু কারণে অবৈধ।

১. এতে মালিকানাধীন নয় এমন জিনিস ইজারা দেওয়া হয়, যা শরিয়তসম্মত নয়।

২. এতে কোনো বস্তুকে ইজারার মাধ্যমে গ্রহণ করে ব্যবহারের মাধ্যমে তা নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। অথচ এটা জায়েজ নয়।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِسْمَاعِيلَ (رحمہ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحمہ) : يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَحْرُورًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحمہ)، لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُنْتَفِعٌ بِهِ حَقِيقَةً وَشَرْعًا، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ، كَالْبَقْلِ وَالْحِمَارِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِّ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالزَّنَابِيرِ، وَالْإِنْتِفَاعُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَا يَعْينُهُ، فَلَا يَكُونُ مُنْتَفَعًا بِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ، حَتَّى لَوْ بَاعَ كُورًا، فِيهَا عَسَلٌ، بِمَا فِيهَا مِنَ النَّحْلِ، يَجُوزُ تَبَعًا لَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْحِيُّ (رحمہ)۔

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণনা করেন, মৌমাছি বিক্রি করা জায়েজ নয়। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত। আর মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি তা সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তবে বিক্রি করা জায়েজ হবে। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত। কেননা, বাস্তবিকপক্ষে এবং শরিয়তের বিধান মতে এটা এমন একটি প্রাণী যা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায়। ফলে তা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। যদিও তা খাওয়া যায় না। যেমন-গাধা ও খচ্চর। শায়খাইনের দলিল এই যে, এটা কীট-পতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। ফলে তা বিক্রি করা বৈধ হবে না। যেমন-ভিন্নরুল। আর উপকার লাভ করা হয় তার থেকে নির্গত পদার্থ দ্বারা, ঐ প্রাণীর সত্তা দ্বারা নয়। সুতরাং মধু বের হওয়ার আগে মৌমাছি উপকারযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তবে যদি কেউ মধুপূর্ণ মৌচাক বিক্রি করে যাতে মৌমাছি রয়েছে, তাহলে মৌচাকের অনুবর্তীভাবে বিক্রয় বৈধ হবে। ইমাম কারখী (র.) এরূপ উল্লেখ করেছেন :

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ : উপরিউক্ত ইবারতে মৌমাছি বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মৌমাছি বিক্রয় অবৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সংরক্ষিত অবস্থায় মৌমাছি বিক্রয় করা বৈধ। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মৌমাছি এমন প্রাণী যা বাস্তবেও উপকারী এবং শরিয়তের দৃষ্টিতেও উপকারী। এ হতে উপকারী হওয়া তো বলা স্বাভাবিক। এর থেকে মধু ও মোম তৈরি করা হয়, যা মানুষের বহু প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শরিয়তগতভাবেও উপকারী। এ কারণেই শরিয়ত এর ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। তাই বাস্তবিকপক্ষে এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে উপকারী প্রমাণিত হয় তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বিবেচিত হয়। সুতরাং মৌমাছি বিক্রি করাও বৈধ হবে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মৌমাছি তো খাবারের উপযুক্ত নয়, তবে এর বিক্রয় কিতাবের পক্ষে হতে পারে না। খাওয়ার অযোগ্য হওয়া বিক্রয়ের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন- গাধা ও খচ্চর খাওয়ার অযোগ্য, কিন্তু এর ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে বৈধ। তদ্রূপ ভূমি খাওয়ার অনুপযোগ্য, কিন্তু এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। সুতরাং মৌমাছি খাওয়ার অযোগ্য হলেও তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে মৌমাছি কীট-পতঙ্গের শ্রেণীভুক্ত। আর কীট-পতঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। যেমন-ভিন্নরুল, সাপ ও বিষ্ণু ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। সুতরাং মৌমাছিও যেহেতু কীট-পতঙ্গের অন্তর্গত, তাই এর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল উপকারী প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল- এর উত্তরে শায়খাইন (র.) বলেন, মৌমাছি সরাসরি উপকারী নয়; বরং উপকারী হলো মৌমাছি থেকে নির্গত রস ও মোম। এজন্যই মোম ও মধু নির্গত হওয়ার পূর্বেই মৌমাছি উপকারী নয়। যখন প্রমাণিত হলো যে, মৌমাছি স্বয়ং উপকারী নয়, তাহলে তা মাল রূপে বিবেচিত হবে না। আর যে জিনিস মাল নয় তার ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়।

লেখক বলেন, এ কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি মধুপূর্ণ মৌচাক বিক্রি করে, যাতে মৌমাছি আছে, তাহলে মধুপূর্ণ মৌচাকের অনুবর্তীভাবে মৌমাছির বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। ইমাম কারখী (র.) এভাবেই মাসআলাটিকে তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এমনভাবে যদি কেউ মৌমাছিসহ মধু বিক্রি করে, তাহলে মৌমাছি অনুবর্তীভাবে বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دُورِ الْقَرْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) لِأَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِّ، وَعِنْدَ أَبِي يُونُسَ (رحا) يَجُوزُ إِذَا ظَهَرَ فِيهِ الْقَرْعُ تَبَعًا لَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحا) يَجُوزُ كَيْفَ مَا كَانَ، لِكُونِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَيْضِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ، لِمَكَانِ الصَّرُورَةِ، وَقِيلَ : أَبُو يُونُسَ (رحا) مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا)، كَمَا فِي دُورِ الْقَرْعِ وَالْحَمَامِ إِذَا عَلِمَ عَدُّهَا وَأَمَكَّنَ تَسْلِيمَهَا جَارَ بَيْعُهَا، لِأَنَّهُ مَالٌ مَقْدُورٌ التَّسْلِيمِ .

**অনুবাদ :** ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে গুটিপোকা [রেশমকীট] বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, এটা কীট-পতঙ্গের শ্রেণীভুক্ত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে গুটিপোকায় রেশমের আচ্ছাদন প্রকাশিত হলে [রেশমের] অনুবর্তীরূপে বিক্রি করা বৈধ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে কোনো অবস্থায় গুটিপোকা বিক্রি করা জায়েয। কেননা, এটা উপকারী প্রাণী। গুটিপোকার ডিম বিক্রয় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নাজায়েজ। তবে সাহেবাইন (র.)-এর মতে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা জায়েজ। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে রয়েছেন। যেমন- [গায়ে রেশম প্রকাশ না পাওয়া] গুটিপোকার ক্ষেত্রে। কবুতরের সংখ্যা যদি জানা থাকে এবং তা অর্পণ করা সম্ভব হয়, তবে তা বিক্রি করা জায়েজ হবে। কেননা, তা অর্পণযোগ্য মাল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دُورِ الْقَرْعِ الخ** : উপরিউক্ত ইবারতে রেশমকীট ও কবুতরের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে : রেশমকীট যা আমাদের দেশে গুটিপোকা নামে পরিচিত, এর ক্রয়-বিক্রয় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। কেননা, এটা কীট-পতঙ্গের শ্রেণীভুক্ত। জমিনের কীট-পতঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ, তাই রেশমকীট বিক্রি করা অবৈধ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি পোকার শরীরে রেশম বিদ্যমান থাকে, তাহলে রেশমের অনুবর্তীরূপে কীটের বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। যেমন- মৌমাছিকে মধুর সাথে বিক্রয় করা জায়েজ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুটিপোকা যে কোনোভাবে বিক্রয় করা বৈধ। অর্থাৎ গুটিপোকার শরীরে রেশম প্রকাশ পাক বা না পাক- উভয় অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ। তাঁর দলিল হলো, রেশমকীট দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তাছাড়া এর ক্রয়-বিক্রয়ের চাহিদাও রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফাতওয়া।

**قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَيْضِهِ الخ** : গুটিপোকার ডিম বিক্রয় করা সাহেবাইন (র.)-এর মতে বৈধ, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে অবৈধ। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল এই যে, গুটিপোকার ডিম ক্রয়-বিক্রয় করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে তা জায়েজ হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে, ডিম দ্বারা সরাসরি কোনো উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই; বরং ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলে এবং তা বড় হলে এক পর্যায়ে উপকারযোগ্য হয়।

মোটকথা, বর্তমানে তা উপকারযোগ্য না হওয়ার কারণে এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। কতিপয় মাশায়েখের মতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। যেমন- তিনি গুটিপোকার উপর রেশম না থাকলে এর বিক্রয় নাজায়েজ বলেন- তেমনি গুটিপোকার ডিমের বিক্রয়ও তাঁর মতে নাজায়েজ। এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) মৌমাছির ক্ষেত্রে যে অভিমত পোষণ করেছেন গুটিপোকার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও একই রকম। অর্থাৎ তিনি মৌমাছি বিক্রি করা যেমন বৈধ বলেছেন, তেমনি গুটিপোকার বিক্রয়ও বৈধ বলেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তাঁর পূর্ব মতানুসারে অবৈধ বলা উচিত ছিল। আবার ইমাম কারখী (র.)-এর বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতের সাথে ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র.)-এর একমত হওয়া উচিত। অর্থাৎ রেশম ছাড়া গুটিপোকার বিক্রয় অবৈধ, আর রেশমসহ অবস্থায় রেশমের অনুবর্তীরূপে গুটিপোকার বিক্রয়ও বৈধ। অতএব এ মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.) একাকী ভিন্নমত পোষণ করার বিষয়টি ইমাম কারখী (র.)-এর বর্ণনানুসারে কিছুটা বেমানান। তবে গুটিপোকা আর মৌমাছি ছাড়া অন্য যে-কোনো কীট বিক্রয় অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এরপর লেখক কবুতর বিক্রি সম্পর্কে বলেন, কবুতরের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে এবং ক্রেতার কাছে অর্পণ করা সম্ভব হলে এ বিক্রয় জায়েজ। কেননা, এটা মাল এবং অর্পণ করার উপযুক্ত। যে কোনো দ্রব্যের মধ্যে এ দুটো বিষয় বিদ্যমান থাকলে এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়ে যায়। অতএব কবুতরের মাঝে উক্ত দু' শর্ত পাওয়া গেলে তা বিক্রি বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, কবুতর যদি তার ঘরে থাকে এবং তার ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে, তাহলে তো নিঃসন্দেহে বিক্রয় বৈধ। আর যদি তা উড়ন্ত অবস্থায় থাকে এবং অভ্যাসমতো ঘরে ফিরে আসে, তবু বিক্রয় বৈধ। যদি বলা হয়- না আসার তো সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা কোনো বিপদাপদেরও তো সম্ভাবনা আছে, তবু কি বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে? এর উত্তর হলো, এরূপ আশঙ্কা বৈধতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন- সাধারণ বিক্রিতে পণ্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিক্রয়কে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। যদি প্রকৃতই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিক্রয় রহিত হয়ে যাবে।

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَبِيقِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ رَجُلٍ رَعِمَ أَنَّهُ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْمَنْهَى بَيْعُ أَبِي مُطَلِّقٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ابْنًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَهَذَا غَيْرُ أَبِي فِي حَقِّ الْمُشْتَرَى، وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرَى إِنْتَفَى الْعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ، وَهُوَ الْمَانِعُ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ قَائِضًا بِمَجْرَدِ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَكَانَ أَشْهَدَ عِنْدَ أَخْذِهِ، لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ، وَقَبْضُ الْأَمَانَةِ لَا يَتَوَبُّ عَنْ قَبْضِ النَّبِيعِ وَلَوْ كَانَ لَمْ يُشْهَدَ يَجِبُ أَنْ يَصْنَعَ قَائِضًا، لِأَنَّهُ قَبْضُ عَصَبٍ، وَلَوْ قَالَ : هُوَ عِنْدَ فُلَانٍ فِيعَهُ مِثْلُ فَبَاعَهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ ابْنُ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَلَوْ بَاعَ الْأَبِيقُ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْإِبَاقِ لَا يَتِمُّ ذَلِكَ الْعَقْدُ، لِأَنَّهُ وَقَعَ بِاطْلَاقٍ لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ، كَبَيْعِ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) أَنَّهُ يَتِمُّ الْعَقْدُ إِذَا لَمْ يَفْسَخْ، لِأَنَّ الْعَقْدَ انْعَقَدَ بِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ، وَالْمَانِعُ قَدْ ارْتَفَعَ، وَهُوَ الْعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ، كَمَا إِذَا أَبَقَ بَعْدَ النَّبِيعِ، وَهَكَذَا يَرَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رحا) .

অনুবাদ : পলাতক দাস বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, এ সম্পর্কে নবী ﷺ-এর নিষধাজ্ঞা রয়েছে। আর এ কারণে যে, বিক্রো তা সমর্পণ করতে সক্ষম নয়। তবে যদি কেউ এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে যে দাসটি তার কাছে আছে বলে সে দাবি করে। কেননা, হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে পরিপূর্ণ পলাতক গোলাম বিক্রি করা। আর পূর্ণ পলাতক মানে ক্রেতা ও বিক্রোতা উভয়ের কাছে পলাতক। আর এখানে তো ক্রেতার ক্ষেত্রে সে পলাতক নয়। আর এ কারণে যে, যখন সে [দাস] ক্রেতার কাছেই রয়েছে তখন অর্পণের অক্ষমতা রইল না। আর সেটিই ছিল বাধা। অতঃপর শুধুমাত্র চুক্তি দ্বারাই ক্রীতদাস কজাকারী সাব্যস্ত হবে না, যদি পলাতক ক্রীতদাস তার হাতে থাকে এবং সে তাকে নেওয়ার সময় সাক্ষী রেখে থাকে। কেননা, পলাতক দাস তার কাছে আমানত ছিল, আর আমানতের কজা বিক্রয়ের কজার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। আর যদি সে দাসটি নেওয়ার সময় সাক্ষী না রাখে, তাহলে কেবল বিক্রয়চুক্তি দ্বারাই নিশ্চিত কজাকারী বা দখলদার সাব্যস্ত হবে। কেননা, তা ছিল অপহরণমূলক কজা। যদি ক্রেতা বলে, পলাতক দাসটি অমুকের কাছে রয়েছে, সুতরাং আপনি তা আমার কাছে বিক্রয় করুন। অতঃপর সে বিক্রয় করল, তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা, সে এখানে ক্রেতা ও বিক্রোতা উভয় চুক্তিকারীর কাছেই পলাতক রয়েছে। তাছাড়া এ কারণে যে, মালিক তাকে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। যদি কেউ পলাতক দাস বিক্রয় করে, অতঃপর সে পলাতক অবস্থা থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঐ বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা পাবে না। কেননা, গোলামটিতে বিক্রয়পাত্র হওয়ার গুণ বিদ্যমান না থাকার কারণে উক্ত বিক্রয়চুক্তি বাতিলরূপে সংঘটিত হয়েছিল। যেমন- শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রয়

করা : আর ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, চুক্তি রহিত না করে থাকলে চুক্তিটি সুসম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা চুক্তিটি সংঘটিত হয়েছিল মাল হওয়ার গুণ বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে। আর প্রতিবন্ধকটি উঠে যাচ্ছে। আর তা হলো অর্পণের অক্ষমতা। যেমন- যদি পলাতক হয় বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করার পর। এরূপই ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও বর্ণিত আছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَمِينِ: পলাতক দাস দু ধরনের হতে পারে। পূর্ণপলাতক অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছে পলাতক, আর এমন পলাতক- যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছে পলাতক নয়। মাসআলা হলো, পূর্ণ পলাতক দাসের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ পলাতক দাসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসটি এই-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بَطْنِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضَرْعِهَا وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ أَيْقُ الْخ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পলাতক দাসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয় কারণ এই যে, পলাতক দাস অর্পণ করার যোগ্য না হওয়া। যে বস্তু অর্পণ করার যোগ্য নয়, তার বিক্রয় নিষিদ্ধ। তবে যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে, পলাতক দাসটি তার কাছে আছে, আর মালিক তার কাছেই বিক্রি করে দেয়, তাহলে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা, এ দাস পূর্ণ পলাতক দাস নয়। কারণ, সে বিক্রেতার কাছে পলাতক হলেও ক্রেতার কাছে পলাতক নয়। আর ক্রেতার কাছে পলাতক না হলে সে পূর্ণ পলাতক হিসেবে বিবেচিত হবে না। অতএব এর বিক্রি অবৈধ হবে না। হাদীসে পূর্ণ পলাতক দাসের বিক্রয়চুক্তিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় দলিল হলো, যখন দাস ক্রেতার কাছেই রয়েছে, তখন বিক্রেতার পক্ষে দাস অর্পণ করা কঠিনসাধ্য কিংবা অসম্ভব নয়। অথচ বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার মুখ্য কারণ এটাই ছিল। সুতরাং যখন অর্পণের অক্ষমতা রইল না, তখন বিক্রয়চুক্তিও নিষিদ্ধ হবে না। লেখক বলেন, যেহেতু দাস ক্রেতার কাছেই রয়েছে সেহেতু ক্রয়ের সাথে সাথে ক্রেতা দাসটির কজাকারী বলে গণ্য হবে কিনা তা নির্ভর করবে ক্রেতা গোলামকে প্রথম কজা কিভাবে করেছিল তার উপর। ক্রেতা গোলামকে তিনভাবে কজা করতে পারে- ১. ক্রেতা নিজের জন্যই কজা করেছে। ২. মালিকের কাছে ফেরত দানের উদ্দেশ্যে কজা করেছে এবং গোলামকে ধরার সময় দুজন সাক্ষী করেছে এই মর্মে যে, সে গোলামটি মালিকের কাছে ফেরত দানের উদ্দেশ্যে ধরেছে। ৩. মালিককে ফেরত দানের উদ্দেশ্যে ধরেছে, কিন্তু কোনো সাক্ষী রাখেনি।

প্রথম অবস্থায় ক্রেতা দাসটি ক্রয়মাত্রই কজাকারী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রয়ের পর যদি দাস ক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে বিক্রয় ও দখল সম্পন্ন হয়েছে সাব্যস্ত হবে এবং ক্রেতার পক্ষে দাসের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। কেননা, তার দাসটির দখল ছিল অপহরণের দখল, তার অপহরণের দখল ক্রয়ের দখলে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই কেনমাত্রই ক্রেতা দাসটির মালিক হয়ে যাবে এবং তার দখল পূর্ণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় ক্রয় করা মাত্রই ক্রেতা দখলদার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, ক্রয়ের পূর্বে বর্তমান ক্রেতার দখল ছিল আমানতের দখল। এজন্যই দাসটি যদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করানোর পূর্বেই মারা যায়, তবে এজন্য দখলদারের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না; বরং মালিকের মাল থেকে এটি বিনষ্ট হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা, যদি ক্রয়মাত্রই ক্রেতার কজা সাব্যস্ত হতো, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হতো এবং তার কজাটি দায়মুক্ত কজা বিবেচিত হতো। অথচ ক্রেতার পূর্ববর্তী কজাটি ছিল আমানত তথা দায়মুক্ত কজা। আর ক্রয়ের কারণে সে যে দখলের উপভুক্ত হয়েছে, তা হলো ক্রয়ের দখল বা দায়মুক্ত কজা দখল। আর এটা জানা কথা যে, আমানতের কজা হলো সাধারণ কজা, আর বিক্রয়ের কজা হলো সেই তুলনায় শক্তিশালী ও মজবুত কজা এবং এতে আর্থিক দায়মুক্ত থাকে। তাই বিক্রয়ের কজা আমানতের কজার হুলাতিভিত্তিক হতে পারে না। কারোই ক্রয়ের দ্বারা আমানতের কজাকারী ক্রয়ের কজাকারী সাব্যস্ত হবে না; বরং ক্রেতাকে তা প্রথমে মালিকের হাতে হস্তান্তর করতে হবে, অতঃপর মালিক ক্রেতার হাতে অর্পণ করবে এবং ক্রেতা ক্রয়ের কজা করবে।

তৃতীয় অবস্থায় শুধুমাত্র বিক্রয়ের দ্বারাই ক্রেতার দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, ক্রেতা ইতঃপূর্বে কজা করার সময় যেহেতু কোনো সাক্ষী রাখেনি, তাই তার কজা অপহরণের কজা সাব্যস্ত হবে। অপহরণের কজা আর্থিক দায়যুক্ত হয়। আর বিক্রয়ের কজাও দায়যুক্ত কজা অর্থাৎ উভয়টিই দায়যুক্ত কজা। সুতরাং এদের একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এ কারণে তৃতীয় অবস্থায় ক্রেতা শুধুমাত্র বিক্রয়চুক্তি করার দ্বারা দখলদার সাব্যস্ত হবে। এ অবস্থায় বর্তমান ক্রেতার দাসটিকে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার, অতঃপর পুনরায় এহণ করার প্রয়োজন নেই।

যদি ক্রেতা দাস-মালিককে বলে, তোমার পলাতক দাসটি অমুক ব্যক্তির কাছে রয়েছে, আমার কাছে বিক্রি কর। তারপর মালিক ক্রেতার কাছে বিক্রয়ও করে তবু তাদের ক্রয়-বিক্রয় শিদ্ধ হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় দাসটি বিক্রোতা ও ক্রেতা কারো কাছে নেই। সুতরাং দাসটি পলাতক হওয়ার কারণে এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বিক্রোতা পলাতক দাসটিকে ক্রেতার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। আর অর্পণ অযোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় অবৈধ হওয়ায় এ দাসের বিক্রয়ও অবৈধ সাব্যস্ত হবে।

যদি কেউ কোনো পলাতক দাস বিক্রয় করল, অতঃপর দাসটি পলাতক অবস্থায় থেকে মালিকের কাছে ফিরে আসল, তাহলে এ বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে কিনা? এ ব্যাপারে জাহিরুর রিওয়াযাতের বক্তব্য হলো, পূর্বের বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুনভাবে বিক্রয়চুক্তি করতে হবে। কেননা, পলাতক অবস্থায় তার বিক্রয়চুক্তি বাতিল ছিল। কারণ, বিক্রয়ে দ্রব্যটি অর্পণযোগ্য না হওয়াতে যেন অন্তিভূতীন একটি পণ্য বিক্রয় করা হলো। আর অন্তিভূতীন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হয়। সুতরাং আমাদের ফিরে আসা গোলামের ইতঃপূর্বে সম্পাদিত চিক্রয়চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর নিয়মানুসারে বাতিল হয়ে যাওয়া বিক্রয়চুক্তি কখনও শুদ্ধ হতে পারে না, ফলে উল্লিখিত বিক্রয়চুক্তি পলাতক দাস ফিরে আসার পর সইহ বিক্রয়ে রূপান্তরিত হবে না; বরং নতুনভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এর উদাহরণ হলো এমন যে, কোনো ব্যক্তি আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করে দিল। অতঃপর বিক্রয় বৈঠকেই পাখিটি ধরে ক্রেতার হাতে অর্পণ করল, তবু বিক্রয়চুক্তিটি সইহ হয় না। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা এরূপ পাওয়া যায় যে, যদি দাস ফিরে আসার পূর্বে বিক্রয়চুক্তি রহিত না করা হয়, তাহলে কৃতচুক্তি বহাল থাকবে। কেননা, দাসের মধ্যে মাল হওয়ার গুণাগুণ বিদ্যমান ছিল। আর এ কারণেই বিক্রয়চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছিল। মাল হওয়ার গুণাগুণ বিদ্যমান বলেই মনিব পলাতক দাসকে পূর্ণ আজাদ কিংবা মুদাব্বার করলে তা সঠিক বিবেচিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, পলায়নের কারণে যদি তার সম্পদরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রহিত হয়ে যেত, তাহলে তার আজাদ করা ও মুদাব্বার করা সঠিক এবং কার্যকর হতো না। তবে বিক্রয় বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকটি ছিল তা হচ্ছে অর্পণ করার অক্ষমতা। তা তো দাসটি ফিরে আসার কারণে দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না। তাই পূর্ববর্তী বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর হবে। এতে আপত্তি করার মতো কিছু নেই। এটা যেন এমনই হলো যে, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা দাসটি হস্তগত করার পূর্বেই পালিয়ে গেল। তাহলে যেমন বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়, তেমনি এখানেও চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)ও একই মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ পলাতক দাস বিক্রয় করল এবং দাস পলায়নের কারণে বিক্রোতা অর্পণ করতে অক্ষম হয়ে গেল। ক্রেতা দাস আদায়ের উদ্দেশ্যে বিচারকের সমীপে মোকাদ্দমা পেশ করল, অতঃপর বিচারকের মাধ্যমে বিক্রোতার কাছে দাসটি দাবি করল, কিন্তু বিক্রোতা দাস প্রদানে তার অপারগতা জানাল। এ পরিস্থিতিতে বিচারক বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার পর পলাতক দাসটি ফিরে আসলে পূর্ববর্তী বিক্রয় কার্যকর হবে না; বরং নতুনভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।



قَالَ : وَلَا بَيْعَ لَبَنِ امْرَأَةٍ فِي قَدَحٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحا) : يَجُوزُ بَيْعُهُ ، لِأَنَّهُ مَشْرُوبٌ طَاهِرٌ ، وَلَنَا أَنَّهُ جُزْءُ الْأَدْمِيِّ ، وَهُوَ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُكْرَمٌ مَصُونٌ عَنِ الْإِسْتِذَالِ بِالتَّبْيِيعِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ لَبَنِ الْحَرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحا) أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْأَمَةِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ إِبْرَادُ الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا ، فَكَذَا عَلَى أَجْزَائِهَا ، فَلَنَا : الرِّقُّ قَدْ حُلَّ نَفْسِهَا ، فَمَا اللَّبَنُ فَلَا رِقَّ فِيهِ ، لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْقُوَّةُ الَّتِي هِيَ ضِدُّهُ ، وَهُوَ الْحَيُّ ، وَلَا حَيَوَةٌ فِي اللَّبَنِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পাত্রে রাখা কোনো স্ত্রীলোকের দুধ বিক্রি করা বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে বিক্রি করা বৈধ হবে। কেননা, তা পবিত্র পানীয়। আমাদের দলিল হলো, এটা তো মানুষের অংশ। আর মানুষের শরীর তার সব অংশসহ সম্মানযোগ্য এবং পণ্যায়নের হীনতা থেকে হেফাজতযোগ্য। জাহের রেওয়াজে অনুযায়ী স্বাধীন নারীর দুধ ও দাসীর দুধে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে, দাসীর দুধ বিক্রি করা বৈধ। কেননা, তার দেহসত্তার উপর বিক্রয়চুক্তি আরোপ করা বৈধ। সুতরাং তার অংশবিশেষের উপরও তদ্রূপ বিক্রয়চুক্তি আরোপ করা বৈধ হবে। আমাদের বক্তব্য হলো, তার দেহ সত্তায় প্রতিষ্ঠ হয়েছে, কিন্তু দুধের মধ্যে তো কোনো দাসত্ব গুণ নেই। কেননা, দাসত্ব এমন ক্ষেত্রের সাথে বিশিষ্ট, যেখানে তার বিপরীত শক্তি [স্বাধীনতা] সাব্যস্ত হতে পারে। আর সে ক্ষেত্র হলো জীবন্ত সত্তা। অথচ দুধে কোনো প্রাণ নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَيْعَ لَبَنِ امْرَأَةٍ : উপরিউক্ত ইবারতে জামিউস সাগীরের আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে : মাসআলাটি হলো, কোনো মহিলার স্তনের দুধ পেয়ালায় রেখে তা বিক্রি করা বৈধ কিনা। হানীফী মাযহাব মতে, এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ অবৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, স্বাধীন নারী কিংবা দাসী যে কোনো নারীর দুধ পবিত্র ও পানীয়। আর যে দ্রব্য পবিত্র ও পান্যহারযোগ্য হয় তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়। যেমন- গাভী ও ছাগীর দুধ ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। একরূপভাবে স্ত্রীলোকের দুধও ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে, দাসীর দুধ বিক্রি করা যাবে। তাঁর দলিল হলো, দাসীকে যেহেতু বিক্রি করা যায়, তাই তার অংশবিশেষও বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (র.) কে-জ-এর উপর ক্রিয়াস করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, মহিলার দুধ তার শরীরের অংশবিশেষ তথা মানুষের শরীরের অংশবিশেষ। মানবদেহের কোনো অংশ মাল অর্থাৎ পণ্য হতে পারে না। আর যে দ্রব্য মাল অর্থাৎ পণ্য নয় তার বিক্রয় বৈধ নয়। স্ত্রীলোকের দুধ যে তার অংশবিশেষ তার প্রমাণ হলো, শরিয়তে দুধপানের দ্বারা যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করা হয়,

তার ভিত্তি হলো দুধমা ও দুধপানকারী সন্তানের মাঝে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক। অর্থাৎ দুধপান করার কারণে সন্তান তার দুধমায়ের অংশ সাব্যস্ত হয়। আর মানুষের অংশ মাল সাব্যস্ত হয় না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মানবদেহ তার সব অঙ্গসহ সন্তানের যোগ্য। একে পণ্য বানানোর দ্বারা এর মর্যাদা হানি হয়। আর মর্যাদাহীনতা থেকে হেফাজত করার জন্য তার বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, মহিলাদের দুধ তো সাধারণভাবে পানীয়রূপে গণ্য নয়। শিশুর দুধপানের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে দু বছর। এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের দুধ শিশুর জন্য পানীয়। এরপর স্ত্রীলোকের দুধপান হারাম। আর যে বস্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে খাদ্য বিবেচিত হয় তা মাল হওয়া আবশ্যিক নয়। যেমন- মৃতব্যক্তির গোশত অপারগ অবস্থায় খাওয়া বৈধ, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা মাল নয়। মোটকথা, নারীর দুধ মাল নয়। আর যা মাল নয় তার বিক্রয়ও বৈধ নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব এই যে, দাসীর দাসত্ব কেবল তার দেহ-সত্তার মধ্যে, দুধের মধ্যে কোনো দাসত্ব নেই। কেননা, দাসত্ব এমন ক্ষেত্রে থাকতে পারে যেখানে তার বিপরীত শক্তি [অর্থাৎ স্বাধীনতা] অবস্থান করতে পারে। আর স্বাধীনতা অবস্থানের জায়গা জীবন্ত সত্তা। দুধের মধ্যে যেহেতু প্রাণসত্তা নেই, তাই এতে স্বাধীনতা আসবে না। ফলে এতে দাসত্বও আসবে না। সুতরাং তা বিক্রি করা যাবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, জাহেহরী রেওয়ায়েত অনুসারে স্বাধীনা স্ত্রী ও দাসীর দুধে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, স্বাধীনা স্ত্রীর দুধ তো বিক্রয়যোগ্য নয়; কিন্তু দাসীর দুধ বিক্রয়যোগ্য। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন, যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ، لِأَنَّهُ نَجَسٌ الْعَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِهَانَةً لَهُ، وَ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ لِلْخَزْرِ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ لَا يَتَأْتَى بِذَوْبِهِ، وَيُوجَدُ مَبَاحُ الْأَصْلِ، فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الْبَيْعِ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ أَفْسَدَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا يَفْسِدُهُ، لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ دَلِيلُ طَهَارَتِهِ، وَلَا يَنْبَغِي يُوسُفَ (رح) أَنَّ الْإِطْلَاقَ لِلضَّرُورَةِ، فَلَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي حَالَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، وَحَالَةِ الْوُقُوعِ تَغَايَرَهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শূকরের পশম বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, শূকর সমস্তটাই নাপাক। সুতরাং তার হীনতা প্রকাশার্থে বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জুতা-মোজা সেলাইয়ের কাজে তার পশম ব্যবহার বৈধ। কারণ, জুতা ও মোজা সেলাইয়ের কাজ সাধারণত তা ব্যতীত সম্ভব হয় না। [এটা লেখকের যুগের কথা।] আর তা এমনিতে মালিকানাবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়, ফলে তার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন নেই। আর যদি তা [শরিয়ত নির্ধারিত] অল্প পানিতে পতিত হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তা পানিকে নাপাক করে দেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা নাপাক করবে না। কেননা, তা ব্যবহার করার শর্তহীন বৈধতা তার পবিত্র হওয়ার প্রমাণ। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, শর্তহীন ব্যবহারানুমতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দেওয়া হয়। সুতরাং এ প্রয়োজন শুধুমাত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর পানিতে পতিত হওয়ার অবস্থা ব্যবহারের অবস্থার বিপরীত। [তাই পানি নাপাক বলে গণ্য হবে।]

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ الْح : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, [সর্বসম্মত অভিমতানুসারে] শূকরের পশম বিক্রয়যোগ্য নয়। কারণ, এর গোটা দেহটাই নাপাক। সুতরাং শূকরের বা তার দেহাংশের হীনতা প্রকাশ করার জন্য এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। তবে জুতা বা মোজা সেলাইয়ের কাজে শূকরের পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। জুতা বা মোজা সেলাই ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে এ জাতীয় কাজ শূকরের পশম দ্বারা সম্পন্ন করা হতো। তবে বর্তমানে জুতা মোজা সেলাইয়ের কাজ শূকরের পশমের উপর নির্ভরশীল তো নয়ই; বরং কদাচিৎ এর ব্যবহার দেখা যায়। তাই এর ব্যবহার বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَيُوجَدُ مَبَاحُ الْأَصْلِ الْح : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, যদি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শূকরের পশম ব্যবহার করা বৈধ হয়, তাহলে তো এর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হওয়া উচিত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, শূকরের পশম মালিকানাবিহীন হওয়াতে বিনামূল্যে এটা লাভ করা যায়, তাই এটার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন হয় না। তবে স্মরণযোগ্য যে, যদি তা বিনামূল্যে লাভ করা না যায়, তাহলে ফকীহ আবুল লাইছ সামারকানী (র.)-এর মতে এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

এর পরবর্তী মাসআলা হলো, যদি অল্প পানিতে অর্থাৎ জারি অথবা শরিয়তের সংজ্ঞামতে বড় হাউজ না হলে অল্প পানিতে শূকরের পশম পড়ে গেলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি নাপাক হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, শূকরের পশম দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান প্রকারণত্রে থাকে পবিত্র বলে ঘোষণা দেওয়া। আর পবিত্র বস্তু পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হয় না। অতএব শূকরের পশম পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, শূকরের পশম দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। আর যে হুকুম বিশেষ প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে প্রদান করা হয়, তা অন্যদিকে সম্প্রসারিত হয় না, বরং যে স্থলে হুকুম এসেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণে শূকরের পশম ব্যবহারের প্রয়োজন জুতা ইত্যাদি সেলাইয়ের কাজে তো প্রমাণিত। তাই এছাড়া অন্য কাজে এর ব্যবহার আবশ্যিক নয়। পানিতে পতিত হওয়ার বিষয়টি কোনো প্রয়োজন নয়, যাতে ব্যবহারানুমতি দেওয়া যেতে পারে; বরং পানিতে পতিত হওয়ার বিষয়টি ব্যবহারের বিপরীত। তাই এর পবিত্রতার বিধানও এক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। এতে পবিত্রতার বিধান জারি না হলে পতিত হওয়ার কারণে পানি নাপাক হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর ফতোয়া।

প্রকাশ থাকে যে, যারা জুতা সেলাইয়ের কাজ করে তারা যদি শূকরের পশমসহ নামাজে দাঁড়ায় এবং পশম এক দিরহামের চেয়ে বেশি হয়, তাহলেও নামাজ হয়ে যাবে। এ মাসআলা যারা পশম পবিত্র বলেন তাদের মতানুসারে সঠিক হলেও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে সঠিক নয়। কারণ, তারা নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পশম সাথে রাখার প্রতি বাধ্য নয়; বরং তাদের পক্ষে পশম পৃথক কোনো স্থানে রেখে নামাজ আদায় করা সম্ভব। তাই নামাজরত অবস্থায় পশম থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সাথে এক দিরহাম পরিমাণ পশম থাকলে নামাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একটি পর্যালোচনা : হিদায়া প্রণেতার দুটি ইবারতের মধ্যে দৃশ্যত বৈপরীতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর তা এভাবে যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা বস্তুর মান কমে যায়। যেমন- তিনি বলেছিলেন, মানুষের অঙ্গসমূহ সম্মানিত। তাই এগুলোকে বিক্রয়ের দ্বারা অপমান করা যায় না, সম্মান বজায় রাখার জন্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক কথায় বিক্রয়কে মানহানির কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে। আর এখানে তিনি বলেছেন, শূকরের পশম বিক্রির বৈধতা পশমের জন্য সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়। কেননা, তিনি বলেছেন, শূকরের পশম বিক্রি এজন্য অবৈধ যে, এটাকে তুচ্ছ করা উদ্দেশ্য। আর এটা তুচ্ছ বিবেচিত হবে যদি এর বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। আর এ কারণেই শূকরের পশম বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, একই বস্তু তুচ্ছতা ও সম্মানের দলিল হয় কিভাবে? এর উত্তর হলো, একটি বিষয় কারও জন্য সম্মানের কারণ হয়, আবার কারও জন্য সেটা তুচ্ছতারও কারণ হয়। যেমন- সম্রাট যদি এক হতদরিদ্র কৃষককে বলেন, তুমি লোকদের সাথে দরবারে বস, তাহলে এটা কৃষকের জন্য সম্মান ও সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। পক্ষান্তরে সম্রাট যদি প্রধান বিচারককে বলেন, আপনি দরবারে উপস্থিত লোকদের সাথে বসে পড়ুন, তাহলে এটা প্রধান বিচারকের জন্য দূর্ভাগ্য ও অপমানের বিষয় হবে। এ উদাহরণ দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, একই বিষয় কারও জন্য সম্মানের হয়, আবার কারও জন্য অসম্মানের হয়। আরেকটি উদাহরণ দেখুন- বোঝা বহন করা গাধার জন্য একটা সম্মানজনক কাজ, কিন্তু বোঝা বহন মানুষের জন্য অসম্মানের কাজ। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে মানুষ অনেক সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন, সেই তুলনায় শূকরের পশম নাপাক ও তুচ্ছ বস্তু। তাই মানুষের অঙ্গ-পতঙ্গ, তার অংশবিশেষ বিক্রয় করা ও এর বিনিময় গ্রহণ করা এবং মানুষকে জড় পদার্থের স্থলে নামিয়ে দেওয়া তার জন্য মর্যাদাহানিকর। তাই স্ত্রীলোকের দুধ বিক্রয় করা তার অসম্মানের কারণ। পক্ষান্তরে শূকর সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী; তার গোটা দেহই নাপাক এবং এটা তুচ্ছ বস্তু। এটাকে যদি পণ্যরূপে বিক্রি করে এর বিনিময় গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা মর্যাদা লাভ করল এবং সম্মানের যোগ্য হয়ে গেল। তাই শূকরের পশম বিক্রয় একটি মর্যাদা লাভের দলিল হবে

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعُورِ الْإِنْسَانِ، وَلَا الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، لِأَنَّ الْأَذْمَى مَكْرُمٌ لَا مُبْتَدَلٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ مُهَانًا مُبْتَدَلًا، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، الْحَدِيثُ، وَإِنَّمَا يُرَحَّصُ فِيمَا يَتَّخِذُ مِنَ الْوَرْرِ، فَيُرِيدُ فِي قُرُونِ النِّسَاءِ وَذَوَائِبِهِنَّ.

অনুবাদ : মানুষের চুল বিক্রি করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। কেননা, মানুষ সম্মানযোগ্য- হীনকরণের বস্তু নয়। সুতরাং তার দেহের কোনো অংশকে অসম্মান ও হীন করা বৈধ হতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের চুল সংযুক্তকারী এবং সংযুক্ত করার আদেশকারিণীকে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করছেন। তবে মেয়েদের খোঁপা ও বেণি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পশুর পশম ব্যবহারের অনুমতি আছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعُورِ الْإِنْسَانِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের প্রথম মাসআলাটি হলো, মানব কেশ ক্রয়-বিক্রয় কিংবা তার দ্বারা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। আর এর অবৈধতার কারণ হলো মানবদেহ এবং দেহের অংশবিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তাঁর মতে মানুষের চুল দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথার চুল মুঠিয়ে সাহাবীগণের মাঝে বন্টন করে দেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল দ্বারা বরকত লাভ করতেন, তাদের রোগ-ব্যাদি ইত্যাদিতে তাঁর চুল ভিজানো পানি খেয়ে অরোগ্য লাভ করতেন। মানুষের চুল যদি ব্যবহার অযোগ্য হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল এভাবে বন্টন করে দিতেন না। এমনকি সাহাবীগণও এর দ্বারা উপকৃত হতেন না। নাপাক তো নয়ই। এ বিষয়ে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু তায়বা মতান্তরে আবু যাবহিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রক্ত বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেবন করেছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ভবিষ্যতে একগুণ করতে বারণ করেন। এতে বুঝা যায় যে, নাপাক দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। সুতরাং পূর্বেই ঘটনা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল বন্টন করা এবং সাহাবীগণের দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানবকেশ পবিত্র এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

মূল ইবারতে বর্ণিত জাহের রেওয়ায়েতের দলিল হচ্ছে মানুষ সম্মানযোগ্য। অসম্মান ও ভুল্ল করার পাত্র মানুষ নয়। যে জিনিস সম্মান লাভের যোগ্য তার অংশবিশেষ কিংবা কোনো অঙ্গ-পভঙ্গকে হয়ে করা বৈধ নয়। মানুষের চুল বিক্রয় কিংবা তা ব্যবহার করার দ্বারা তার চুলের অবমাননা হয়। এ কারণে তা বিক্রয় কিংবা তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। এর সমর্থন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَائِسَةَ.

বলা হয় এমন মহিলাকে যে কোনো মহিলার চুল আরেকজনের চুলের সাথে সংযুক্ত করে। আর যে মহিলা একগুণ করার নির্দেশ প্রদান করে, তাকে **مُسْتَوْصِلَةٌ** বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'ধরনের নারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অভিশাপের উল্লেখ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের চুল দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। আর এটোটা স্বাভাবিক কথা যে, যখন উপকৃত হওয়াই বৈধ নয় তখন বিক্রি করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

এর বিভিন্ন শ্রাণীর লোম-পশম ব্যবহার করে রমণীদের চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে কোনো বাধা নেই।

قَالَ : وَلَا يَبِيعُ جُلُودَ الْمَيِّتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَعَ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِأَهَابٍ ، وَهُوَ اسْمٌ لِعَظِيمِ الْمَذْبُوحِ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَلَا بِأَسْ يَبِيعُهَا وَالْإِنْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ الدِّبَاحِ ، لِأَنَّهَا طَهِّرَتْ بِالدِّبَاحِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَلَا بِأَسْ يَبِيعُ عِظَامَ الْمَيِّتَةِ وَعَصِيهَا وَصُوفَهَا وَقَرْنَهَا وَشَعْرَهَا وَبَرِّهَا وَالْإِنْتِفَاعُ بِذَلِكَ كُتِلَ ، لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ ، لَا يَحِلُّهَا الْمَوْتُ ، لِعَظِيمِ الْحَيَاةِ ، وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالْفَيْلُ كَالْخِنْزِيرِ نَجَسُ الْعَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح)، وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ السَّبَاعِ ، حَتَّى يُبَاعَ عَظْمُهُ وَيَنْتَفَعَ بِهِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দাবাগাত করার পূর্বে মৃত পশুর চামড়া বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, তা উপকার লাভযোগ্য নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা মৃত পশুর কাঁচা [অর্থাৎ দাবাগাত করা হয়নি এমন] চামড়া দ্বারা উপকৃত হয়ে না। আর [উক্ত হাদীসে উল্লিখিত] ইহাব বলা হয় দাবাগাতহীন কাঁচা চামড়াকে [যা এখনও পাকা করা হয়নি]। যেমন সালাত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দাবাগাত করার পর তা বিক্রয় করা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা, তা দাবাগাত দ্বারা পবিত্র হয়ে গেছে। আমরা সালাত অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি। মৃতপশুর হাড়, রগ, পশম, শিং, চুল ও লোম বিক্রি করা এবং এসব দ্বারা উপকার লাভ করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এগুলো পবিত্র, এগুলোতে প্রাণ বিদ্যমান না থাকায় মৃত্যু প্রবিশ্ট হয় না। আমরা ইতঃপূর্বে [তাহারাত অধ্যায়ে] বিষয়টি প্রমাণ করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, হাতিও শূকরের মতো সামগ্রিকভাবে নাপাক। আর শায়খাইনের মতে, হাতি হিংস্রজন্তুর পর্যায়ভুক্ত। তাই এর হাড় বিক্রয় করা যায় এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ جُلُودَ الْمَيِّتَةِ الْخ : অর্থাৎ মৃত জন্তু তথা জবাইকৃত নয় এমন মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগাত করার পূর্বে বিক্রি করা নাজায়েজ। এর কারণ হলো, দাবাগাত করার পূর্বে চামড়া নাপাক থাকে। আর নাপাক বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করার বিধান নেই। যেমন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِأَهَابٍ অর্থাৎ 'তোমরা মৃত পশুর ইহাব দ্বারা উপকৃত হয়ে না।' ইহাব বলা হয় দাবাগাত করা হয়নি এমন কাঁচা চামড়াকে। এমন কাঁচা চামড়া নাপাক বিধায় এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই। মোটকথা, মৃত পশুর কাঁচা চামড়া শরিয়তের দৃষ্টিতে অব্যবহারযোগ্য এবং নাপাক হওয়ার কারণে এর বিক্রয় অবৈধ। তবে দাবাগাত করার পর এর বিক্রয় ও এর দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কারণ, দাবাগাত দ্বারা চামড়া

ওকিয়ে তার অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। যেমন- জবাই করার দ্বারা অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। كِتَابُ الصَّلَاةِ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সালাতের প্রকৃতি পর্ব তথা তাহারাত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

দাবাগাত মানে রোদে ওকান কিংবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চামড়া পরিশোধন করা। পরিশোধন দ্বারা চামড়া শুকিয়ে পবিত্র হয়। মৃত পশুর হাড়, শিরা-রগ, মৃত ভেড়া-বকরির পশম, শিং, অন্য মৃত পশুর লোম ও চুল বিক্রয় এবং এর দ্বারা যে কোনোভাবে উপকৃত হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এসব বস্তু পবিত্র। প্রথম থেকেই এগুলো প্রাণহীন হওয়ার কারণে এগুলোতে মৃত্যু প্রবিষ্ট হয় না। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, নিষ্পাণ বস্তুর মৃত্যু হয় না।

قَوْلُهُ وَالْفَيْلُ كَالْخِنْزِيرِ : এখানে লেখক হাতি সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে হাতিও শূকরের মতো সর্বস্ব নাপাক অর্থাৎ তার শরীরের কোনো অংশই পবিত্র নয়। তার চামড়া জবাই করার দ্বারা কিংবা দাবাগাত করার দ্বারা কোনোভাবেই পবিত্র হবে না।

পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.) বলেন, হাতি হিংস্রপ্রাণীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এর ঝুটা ও গোশত নাপাক, তবে তা সত্তাগতভাবে সর্বস্ব নাপাক নয়। তাই এর হাড়, দাঁত ইত্যাদি বিক্রয় করা ও ব্যবহার করা বৈধ। যেমন- হাতির দাঁত থেকে চিরুনি ও অন্যান্য অলঙ্কার তৈরি হয় এবং নারীরা ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া হাতির উপর মানুষ আরোহী হয়ে একস্থান হতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে এবং হাতির উপর বোঝা বহন করে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ফাতিমা (রা.) -এর জন্য হাতির দাঁতের তৈরি একজোড়া চুড়ি ক্রয় করেছিলেন। এসবের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাতি “নাজিসুল আইন”তথা সত্তাগতভাবে সর্বস্ব নাপাক নয়।

قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْيَسْفَلُ لِرَجُلٍ وَعِلْوُهُ لِآخَرَ، فَسَقَطَا أَوْ سَقَطَ الْعِلْوُ وَحْدَهُ، فَبَاعَ صَاحِبُ الْعِلْوِ عِلْوَهُ لَمْ يَجْزُ، لِأَنَّ حَقَّ التَّعَلُّي لِنَسِ بِمَالٍ، لِأَنَّ الْمَالَ مَا يُمْكِنُ إِخْرَازُهُ، وَالْمَالَ هُوَ الْمَحَلُّ لِلْبَيْعِ، بِخِلَافِ الشَّرِبِ، حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَمُفْرَدًا فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ اخْتِبَارُ مَشَايِخِ بَلْخ (رح)، لِأَنَّهُ حَظٌّ مِنَ الْمَاءِ، وَلِهَذَا يُضْمَنُ بِالْآتِلَافِ، وَلَهُ فَسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ عَلَى مَا نَذَكْرُهُ فِي كِتَابِ الشَّرِبِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ভবনের নিচতলা একজনের এবং উপরতলা আরেকজনের হয়, আর উভয়তলা [কোনো কারণে] ধ্বংস যায় অথবা শুধু উপরতলা ধ্বংস যায়। অতঃপর উপরতলার মালিক উপরতলা বিক্রি করে দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা, উপরতলার অধিকার মাল নয় [যে, তা বিক্রি করা যাবে]। কেননা, মাল বলা হয় এমন দ্রব্যকে, যা সংরক্ষণ করা সম্ভব। আর মালই হলো বিক্রয়ের বস্তু, তবে শিরব তথা জমি সেতের অধিকারের প্রশ্নটি ভিন্ন। বর্ণিত সব মতানুসারে ভূমির অনুবর্তীরূপে তার বিক্রয় বৈধ। একটি রেওয়াজে তো এমনও আছে যে, পৃথকভাবেও এর বিক্রি বৈধ। এটা বলথের মাশায়েখগণের গৃহীত অভিমত। কেননা, এটা পানির অংশ, তাই [কারো] পানির হক নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং জমির দামের একটি অংশ তার জন্য ধার্য হয়। শিরব-বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْعِلْوُ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যদি কোনো ভবনের নিচতলার মালিক একজন হয় এবং আরেকজন উপরতলার মালিক হয়, [বর্তমান যুগে বহুতল বিশিষ্ট ভবনের এপার্টমেন্ট ও ফ্ল্যাটের যেমন একাধিক মালিক থাকে] অতঃপর কোনো কারণে উভয়তলা কিংবা উপরতলা ধ্বংস পড়ে। এমতাবস্থায় উপরতলার মালিক যদি উপরতলা তৈরি করার অধিকার অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। কেননা, তার বিক্রীত বস্তু হলো উপরতলার অধিকার। আর উপরতলার অধিকার মাল নয়। আর মাল নয় এমন জিনিস বিক্রি করা বৈধ নয়। মাল না হওয়ার কারণ এই যে, উপরতলার অধিকার এমন খোলা স্থান যাতে শুধুমাত্র বাতাস রয়েছে। বাতাস কোনো মাল নয়। কারণ, বাতাস অধিকারে আনা যায় না এবং সংরক্ষণ করা যায় না। তবে উপরতলা যদি ভূপতিত না হয় এবং বসবাসযোগ্য হয়, তাহলে এর বিক্রয় বৈধ। কেননা, তখন বিক্রীত দ্রব্য হবে উপরতলা, যাতে দেয়াল-ছাদ, দরজা ও জানালা ইত্যাদি রয়েছে। আর এসব নিঃসন্দেহে মালরূপে গণ্য, আর মালতো বিক্রি করা যায়। যদি বিক্রয়ের সময় উপরতলা থাকে, কিন্তু ক্রেতার দখলে আসার পূর্বেই তা ধ্বংস পড়ে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, ক্রেতার দখলের পূর্বেই বিক্রীত পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। নিয়মানুসারে কজার পূর্বে পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং একই নিয়মে এখানেও বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।



قَوْلُهُ يَخْلَافُ الشَّرْبِ : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, شَرِبَ বা পানি সেচের অধিকার তো জমির অধিকার সাব্যস্ত হয়, এতদসত্ত্বেও এর বিক্রয় বৈধ, অথচ এখানে উপরতলার অধিকার বিক্রয় বৈধ নয়। এ দুই হকের মাঝে তারতম্য কেন করা হলো? এর উত্তর হচ্ছে, شَرِبَ [পানি সেচের অধিকার] বলা হয় পানির একটি অংশকে। পানি তো মাল। এ কারণে কেউ যদি অন্যের شَرِبَ তথা পানির অংশ নিজের জমিতে সেচ দেয়, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা আবশ্যিক হয়।

আর আমরা জানি মাল বিনষ্ট করার দ্বারা ক্ষতিপূরণ আবশ্যিক হয়, মাল নয় এমন বস্তু নষ্ট করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, সেচের অধিকার মাল, যার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় এবং শিরব এর বিনিময়ে মূল্য প্রদান করতে হয়। যেমন—কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে ভূমি এবং ভূমির হক তথা শিরবসহ ক্রয় করল দশ হাজার টাকায়। এরপর পানি সেচের অংশের ভিন্ন এক দাবিদার বের হলো। অর্থাৎ অন্য এক ব্যক্তি শিরব দাবি করে তা নিয়ে নিল। অতঃপর ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পানির সেচের অংশ বাবদ কিছু ফেরত নিল। বিক্রেতাও তা সহজভাবে ফেরত দিল। এতে প্রমাণিত হলো যে, 'শিরব'-এর বিনিময়ে টাকা আসে এবং এটা আর্থিক দায়যুক্ত। আর যে জিনিসের বিনিময়ে মূল্য প্রদান করতে হয় তা অবশ্যই মাল। সুতরাং পানির হিস্যা মাল। আর মাল তো বিক্রয় করা যায়। সে মতে পানির হিস্যা বিক্রয় করা যাবে।

আর উপরতলার অধিকার সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, এটা মাল নয়। তাই তার বিক্রয় বৈধ হয় না। শিরব তথা পানির হিস্যা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা শিরব-বিষয়ক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য যে, পানির হিস্যা বিক্রয়ের ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। সবার ঐকমত্যে ভূমির অনুবর্তীরূপে পানির হিস্যা বিক্রয় বৈধ। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী পৃথকভাবেও পানির হিস্যা বিক্রি করা বৈধ। দ্বিতীয় মতটি বলখের মাশায়েখগণ কর্তৃক গৃহীত।

এখানে একটি প্রশ্ন এটাও সৃষ্টি হতে পারে যে, পানির হিস্যা বিক্রি বৈধ হওয়ার কারণ হলো, পানি মাল। আর মালের ক্রয়-বিক্রয় তো বৈধ। কিন্তু যদি ব্যাপার এমন হয় যে, পানি আগমনের স্থানে পানি অবদ্যমান। এমতাবস্থায় শিরব বিক্রি বৈধ বলা হলে অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয় করা হচ্ছে। আর অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রি তো বৈধ নয়। সে মতে এ বিক্রি অবৈধ হওয়া সমীচীন। এর উত্তর হলো, পানির অবর্তমানে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পানির অস্তিত্ব কল্পনা করে বিক্রি করা হবে। যেমন—বাইয়ে সলামের মধ্যে একই ভিত্তিতে বিক্রয়কে বৈধ করা হয়েছে। বাইয়ে সলামের মধ্যে পণ্য অনুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে যেমন বিক্রয় বৈধ, তেমনি এখানেও পানির অনুপস্থিতিতে বিক্রয় বৈধ হবে। মোটকথা, পানির অবর্তমানে পানির অস্তিত্ব ধরে নিয়ে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিক্রয় বৈধ করা হয়েছে।

قَالَ : وَيَبْعُ الطَّرِيقَ وَهَيْبَتُهُ جَائِزٌ، وَيَبْعُ مَسِيلَ الْمَاءِ وَهَيْبَتُهُ بَاطِلٌ، وَالْمَسَالَةَ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : يَبْعُ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ، وَيَبْعُ حَقَّ الْمُرُورِ وَالتَّسْيِيلِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسَالَتَيْنِ أَنَّ الطَّرِيقَ مَعْلُومٌ، لِأَنَّهُ لَهُ طَوْلًا وَعَرْضًا مَعْلُومًا وَأَمَّا الْمَسِيلُ فَمَجْهُولٌ، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى قَدْرُ مَا يَسْغُلُهُ مِنَ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيَنْبِيعُ حَقَّ الْمُرُورِ رَوَايَتَانِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى أَحَدِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ التَّسْيِيلِ أَنَّ حَقَّ الْمُرُورِ مَعْلُومٌ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ مَحَلٌّ مَعْلُومٌ، وَهُوَ الطَّرِيقُ، أَمَّا الْمَسِيلُ عَلَى السَّطْحِ فَهُوَ نَظِيرُ حَقِّ التَّعْلَى، وَعَلَى الْأَرْضِ مَجْهُولٌ لِبُجَاهَةِ مَحَلِّهِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ التَّعْلَى عَلَى إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ أَنَّ حَقَّ التَّعْلَى يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ لَا تَبْقَى، وَهُوَ الْبِنَاءُ، فَاشْبَهَ الْمَنَافِعَ، أَمَّا حَقَّ الْمُرُورِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ تَبْقَى، وَهُوَ الْأَرْضُ، فَاشْبَهَ الْأَعْيَانَ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাস্তা বিক্রি করা এবং দান করা উভয়টি বৈধ। তবে পানির প্রবাহস্থান বিক্রি করা ও দান করা উভয় বাতিল। আলোচ্য মাসআলার দুটি সূরত রয়েছে— ১. খোদা রাস্তা এবং প্রবাহের স্থানটাই বিক্রয় করা, ২. পথ চলাচলের ও পানি প্রবাহিত করার অধিকার বিক্রয় করা। যদি এখানে প্রথম সূরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, রাস্তা জ্ঞাত হয়। কেননা, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জানা থাকে। পক্ষান্তরে পানি প্রবাহের স্থান অজ্ঞাত। কেননা, এটা জানা যায় না যে, পানি কতটুকু স্থান পরিব্যাপ্ত করবে। আর যদি দ্বিতীয় সূরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে চলাচলের অধিকার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে। [এক বর্ণনা মতে বিক্রয় বৈধ, অন্য মতে অবৈধ।] এক বর্ণনা [তথা বৈধ] মতে চলাচলের অধিকার ও পানি প্রবাহের অধিকারের মাঝে পার্থক্য হলো, নির্দিষ্টস্থানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে চলাচলের অধিকারও জ্ঞাত এবং সুনির্দিষ্ট হয়। সে নির্দিষ্টস্থান হলো রাস্তা। আর ছাদের উপর পানি প্রবাহিত করার অধিকার তো কোনো ভবনের উপরিভাগের অধিকারের মতো। আর ভূমির উপর প্রবাহের অধিকার, সে তো জায়গার পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে অনির্দিষ্ট। দু বর্ণনার এক বর্ণনা মতে পথ চলাচলের অধিকার এবং বাড়ির উপরিভাগের অধিকারের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, বাড়ির উপরিভাগের অধিকারের সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী বস্তুর সাথে [অর্থাৎ নিচতলা]। ফলে তা সংশ্লিষ্ট বস্তুর সুবিধার সদৃশ হলো। আর পথচলার অধিকারের সম্পর্ক স্থায়ী বস্তু তথা ভূমির সাথে, ফলে এটা বস্তু সদৃশ হলো।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَبَعَّ الطَّرِيقَ وَهَبَهُ الْبَيْعُ: ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে মানুষ চলাচলের পথ ও পানি প্রবাহের স্থান সম্পর্কিত যে মাসআলা আলোচনা করেছেন উপরিউক্ত ইবারতে সে আলোচনাই করা হয়েছে। তিনি বলেন, চলাচলের পথ বিক্রি করা ও দান করা উভয় বৈধ, আর পানি প্রবাহের স্থান বিক্রি করা ও দান করা বৈধ নয়। আর উল্লিখিত মাসআলার বিশেষণে হিদায়া প্রণেতা বলেন, মাসআলাটির দুটি সূরত হতে পারে—

১. মানুষ চলাচলের পথ বিক্রি করা ও পানি প্রবাহের স্থান বিক্রি করা।
২. চলাচলের পথ বিক্রি দ্বারা উদ্দেশ্য চলাচলের অধিকার বিক্রি করা, আর প্রবাহের স্থান বিক্রি দ্বারা উদ্দেশ্য পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা।

দ্বিতীয় সূরতে কোনো স্থান বিক্রি হচ্ছে না; বরং স্থানের উপর দিয়ে চলাচলের কিংবা প্রবাহিত হওয়ার অধিকারটুকু বিক্রি করা হচ্ছে। এরপর লেখক বলেন, প্রথম অবস্থায় স্বয়ং চলাচলের রাস্তাটুকু বিক্রি করা বৈধ, কিন্তু স্বয়ং পানি প্রবাহের স্থান বিক্রি করা অবৈধ। এ অবস্থায় একটির বিক্রয় অবৈধ আর অপরটির বিক্রয় বৈধ এ দুয়ের মাঝে স্পষ্টত পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, রাস্তা ও চলাচলের পথ সুনির্দিষ্ট। কেননা, এর নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ রয়েছে। যদি রাস্তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা করে দেওয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। আর যদি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা নাও করা হয়, তবু তা শরিয়তগত বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নির্ধারিত থাকে। যেমন— আমরা দেখতে পাই পৌরসভা, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কিংবা ইউনিয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে কোন রাস্তা কতটুকু হবে তা নির্ধারিত করা থাকে, শরিয়তগত নির্ধারণ সম্পর্কে বলা হয় বাড়ির প্রধান ফটক সমান রাস্তার প্রস্থ, আর তার দৈর্ঘ্য হবে মূল সড়কের সাথে সংযুক্ত হওয়া পর্যন্ত স্থানটুকু। মোটকথা, যেহেতু রাস্তার স্থানটুকু সুনির্দিষ্ট এবং জ্ঞাত, সেহেতু তা নিয়ে বিবাদ ও ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কা নেই কিংবা খুবই কম। আর বিবাদ না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হলে বিক্রয় বৈধ হয়।

পক্ষান্তরে পানি প্রবাহের স্থান পরিজ্ঞাত হয় না। প্রথমত এর কোনো দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সুনির্দিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়ত পানির প্রবাহ কম ও বেশি হওয়ার ভিত্তিতে কখনো বেশি স্থান জুড়ে পানি প্রবাহিত হয়, ফলে পানি প্রবাহের স্থান অজ্ঞাত থাকে কিংবা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হয় না। আর এর দ্বারা বিক্রীত অংশ অজ্ঞাত হওয়াই প্রমাণিত হয়। আর নিয়মানুসারে বিক্রীত অংশ অজ্ঞাত হলে বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হয়, তাই এ অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হবে। তবে যদি পানি প্রবাহের স্থানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্দিষ্ট হয় এবং তা বিক্রয়চুক্তির মাঝে বর্ণনা ও করা হয়, তাহলে পানি প্রবাহের স্থান বিক্রয় বৈধ হবে।

আর দ্বিতীয় সূরত যদি উদ্দেশ্য হয় [অর্থাৎ রাস্তার দ্বারা উদ্দেশ্যে] পথচলাচলের অধিকার ও পানি প্রবাহের অধিকার। এমতাবস্থায় পথ চলাচলের অধিকার বিক্রয়ের ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। প্রথমত ইবনে সামাআর বর্ণনা অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি বৈধ। আর এটা অধিক সংখ্যক আলিমের মত।

দ্বিতীয়ত মিয়াদাত গ্রন্থের বর্ণনানুসারে বিক্রয়চুক্তি অবৈধ। এ মতটি ইমাম কারখী (র.) ও ফকীহ আবুল লাইছ (র.) গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটির তথ্য অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, পথচলাচলের অধিকার হলো সুবিধা ভোগের অধিকার। আর স্বতন্ত্রভাবে তা বিক্রি করা অবৈধ, তাই এর বিক্রিও অবৈধ হবে।

পক্ষান্তরে সব বর্ণনা অনুযায়ী পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা নাজায়েজ। সুতরাং মিয়াদাত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী পথ চলাচলের অধিকার ও পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রয়ের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। কেননা, উভয়ের বিক্রি অবৈধ, তবে ইবনে সামাআর বর্ণনা মতে পানি প্রবাহের অধিকার ও পথ চলাচলের অধিকার বিক্রির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে পথ চলাচলের অধিকার বিক্রি করা বৈধ, আর পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা অবৈধ। এ দুটির মাঝে পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে

লেখক বলেন, পথ চলাচলের অধিকার জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট। কারণ, এর সম্পর্ক নির্দিষ্ট স্থানের সাথে যুক্ত, সেই নির্দিষ্ট স্থান হচ্ছে রাস্তা। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা করার দ্বারা কিংবা শরিয়ত/স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে রাস্তার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেটুকু, যেভাবে হোক না কেন রাস্তা পরিজ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট থাকে। তাই চলাচলের অধিকার রাস্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে পরিজ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট হয়। আর যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়। এর বিপরীতে রয়েছে পানি প্রবাহের অধিকার। সাধারণভাবে পানি প্রবাহের অধিকার দু'ধরনের হয়। পানি ছাড়ের উপর প্রবাহিত হয় অথবা পানি ভূমির উপরে প্রবাহিত হয়। যদি পানি ছাড়ের উপর প্রবাহিত হয়, তাহলে এর অধিকার বিক্রি করা দু'কারণে অবৈধ। প্রথমত ছাদে পানি প্রবাহের অধিকারের সম্পর্ক শূন্যের সাথে। আর শূন্যস্থান মাল নয়। ফলে এটা বাড়ির উপরিভাগের অধিকার সদৃশ হয়ে গেল। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বাড়ির উপরিভাগের অধিকার বিক্রি করা নাজায়েজ। সুতরাং পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করাও নাজায়েজ হবে। দ্বিতীয়ত পানি প্রবাহের অধিকার অজ্ঞাত। কেননা, পানির স্বল্পতা ও আধিকার কারণে প্রবাহের মধ্যে কমবেশি হয়ে থাকে। আর যে কোনো অজ্ঞাত বিষয়ের ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। তাই পানির প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা অবৈধ হবে। আর যদি পানি ভূমির উপরে প্রবাহিত হয়, তাহলে এর অবৈধতার কারণ হলো অজ্ঞাত। অর্থাৎ পানি প্রবাহের স্থান জ্ঞাত হয় না। আর যে কোনো অজ্ঞাত-অনির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু বিক্রি অবৈধ হয়ে থাকে। হয়রত ইবনে সামাআর বর্ণনা অনুযায়ী পথ চলাচলের অধিকার বিক্রি করা বৈধ।

পক্ষান্তরে বাড়ির উপরিভাগের অধিকার [পূর্ব বর্ণিত] অবৈধ। এ দুয়ের মাঝের পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, উপরত্বের অধিকারের সম্পর্ক এমন বস্তুর সাথে জড়িত, যা ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। সে বস্তু হলো নিচতলার ভিত্তি। ফলে বাড়ির উপরিভাগের অধিকার সুবিধাদির সদৃশ হয়ে গেল। সুবিধাদির মতো বলার যুক্তি হলো, সুবিধাদি ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, এমনই বিন্দিং ও ক্ষণস্থায়ী হয়। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হওয়ার দিক থেকে একটি অপরটির মতো। আর বস্তুর সুবিধাদি বস্তু ছাড়া স্বতন্ত্র বিক্রি করা যায় না। সে মতে ঘর বা বাড়ির উপরিভাগের অধিকারও বিক্রি করা যাবে না। অন্যদিকে পথ চলাচলের অধিকারের সম্পর্ক স্থায়ী বস্তুর সাথে। এখানে সেই স্থায়ী বস্তুটি হলো ভূমি। এর ফলে পথ চলাচলের অধিকার মূলবস্তু সদৃশ হয়ে গেল। এখানেও দুয়ের মাঝে সাদৃশ্য স্থায়িত্বের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন মূলবস্তু স্থায়ী হয় তেমনি পথ চলাচলের অধিকারও স্থায়ী থাকবে। কথ্যটিকে এভাবেও বলা যায় যে, স্থায়ী বস্তুর সাথে যার সম্পর্ক হয় সেটাকেও স্থায়ী গণ্য করা হয়। আর যে কোনো মূলবস্তুর বিক্রয় বৈধ। সুতরাং পথ চলাচলের অধিকার বিক্রয়ও বৈধ হবে। তবে অনেকে লেখকের উক্ত পার্থক্য বর্ণনাকে নাকচ করে দেন এভাবে যে, স্থায়ী বস্তুর বিক্রয় যেমন বৈধ হয়, তেমন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর বিক্রয়ও ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ হয়, যদিও তা সুবিধাদির সদৃশ হয়ে থাকে। আবার স্থায়ী বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের বিক্রয়ও ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ হয় না। যেমন-বসবাসের অধিকার। বসবাসের সম্পর্ক বাড়ির সাথে। বাড়ি একটা স্থায়ী বস্তু এবং নিঃসন্দেহে মাল। তাবু বসবাসের অধিকার বিক্রি করা অবৈধ। এসব বিবেচনা করে ফকীহ আবুল লাইছ সামারকানী সব ধরনের সুবিধা ভোগের অধিকার বিক্রয়কে অবৈধ বলেছেন। চাই সেটা পথ চলাচলের অধিকার হোক কিংবা পানি প্রবাহের অধিকার হোক। এজন্যই তিনি যিয়াদাতের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ، فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ كَبْشًا فَإِذَا هُوَ نَعَجَةٌ، حَيْثُ يَتَعَقَّدُ الْبَيْعُ وَيُتَخَيَّرُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَتَيْنِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي النِّكَاحِ لِمُحَمَّدٍ (رح)، وَهُوَ أَنَّ الْإِشَارَةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ إِذَا اجْتَمَعَتَا فَيُنْفِي مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى وَيَبْطُلُ لِإِنْعِدَامِهِ، وَفِي مُتَحَدِّي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَيَتَعَقَّدُ لَوْجُودِهِ وَيُتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ، كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ حُبَّارٌ، فَإِذَا هُوَ كَاتِبٌ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ بَيْنِ أَدَمَ جِنْسَانِ، لِلتَّفَاوُتِ فِي الْأَعْرَاضِ، وَفِي الْحَيَوَانَاتِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِلتَّقَارُبِ فِيهَا، وَهُوَ الْمَغْتَبَرُ فِي هَذَا دُونَ الْأَصْلِ، كَالخَلِّ وَالِدَبْسِ جِنْسَانِ، وَالْوَذَارَى وَالزَّنْدَنِيحَى عَلَى مَا قَالُوا جِنْسَانِ مَعَ اتِّحَادِ أَصْلِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি দাসী বিক্রি করল, অতঃপর দেখা গেল যে, সে দাস [দাসী নয়] তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে ভেড়া বিক্রি করে অতঃপর দেখা গেল যে, সেটা ভেড়ি তাহলে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হবে। তবে ক্রেতা [গ্রহণ ও বর্জনের] ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। এ দুটি মাসআলার পার্থক্য একটি মূলনীতির ভিত্তিতে হয়েছে, যা আমরা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অনুসৃত নীতিরূপে বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। মূলনীতিটি হচ্ছে, কোনো বস্তুর নামোল্লেখ এবং তার প্রতি ইশারা যদি একই সাথে হয় অতঃপর ইশারাকৃত বস্তুটি ও উল্লিখিত নামের বস্তু ভিন্ন শ্রেণী হয়, তাহলে চুক্তিটি উল্লিখিত নামের বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর সেই উল্লিখিত নামের বস্তুটি অবিদ্যমান হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উল্লিখিত নাম ও ইশারাকৃত বস্তু একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে ইশারাকৃত বস্তুর সাথে চুক্তি সম্পৃক্ত হবে এবং সেই বস্তুটি বিদ্যমান হওয়ার কারণে চুক্তি সম্পাদিত হবে। তবে উল্লিখিত গুণের অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। যেমন—কেউ এ শর্তে একজন দাস ক্রয় করল যে, সে রশটি প্রস্তুত করার কাজে অভিজ্ঞ। অতঃপর দেখা গেল যে, সে একজন লেখক। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় মানবের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগত বেশি পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষকে ভিন্ন শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা হয়। আর পশুদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত নৈকট্যের কারণে দুটিকে একই শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করা হয়। আর শ্রেণীগত ভিন্নতা-অভিন্নতার ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যগত দিকটিই গ্রহণযোগ্য, সত্ত্বেও বিবাহ বিবেচ্য নয়। যেমন—সিরকা ও আসুরের সিরাকে [মূল এক হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কারণে] দুটি ভিন্নশ্রেণী বিবেচনা করা হয়। আর ওয়াযারী ও যানদানিজী কাপড়কে ফিকহবিদগণের মতানুযায়ী উভয়টির উৎস অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও দুটি ভিন্ন শ্রেণী বিবেচনা করা হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَرْكَهَ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাগুলো আলোচনা করেন। প্রথম মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি এক দাসী বিক্রয় করল, ক্রেতা দাসী হিসেবে সেটিকে ক্রয় করে নিল, অতঃপর দেখা গেল যে, ক্রয়কৃত মানুষটি দাস-দাসী নয়। তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে অনুষ্ঠিত চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। এরপর

তিনি দ্বিতীয় মাসআলাটি উল্লেখ করেন। মাসআলাটি হলো, কেউ একটি ভেড়া বিক্রি করল, বিক্রেতা বলল, আমি ভেড়া বিক্রি করলাম, উত্তরে ক্রেতা বলল, আমি ভেড়াটি ক্রয় করলাম। পরবর্তীতে যাচাই করে দেখা গেল যে, ক্রয়কৃত জন্তুটি ভেড়া নয়, ভেড়ি তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে অনুষ্ঠিত বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে না; বরং চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে।

মাসআলা দুটির মাঝে বিধানগত সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথম মাসআলায় চুক্তি বাতিল। আর দ্বিতীয় মাসআলায় উল্লিখিত পত এবং বাস্তব পত ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি বহাল থাকবে। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হয়েছে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অনুসৃত একটি মূলনীতির ভিত্তিতে। সেই মূলনীতির আলোচনার পূর্বে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানা দরকার।

১. মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন শ্রেণী, কিন্তু পত-প্রাণীর মধ্যে নারী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন শ্রেণী নয়; বরং একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া কিংবা ভিন্ন হওয়া নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর। যদি দুটির উদ্দেশ্য ভিন্ন হয় তাহলে ভিন্ন শ্রেণী, যদিও উভয়ের মূল ও উৎস একই হয়। পক্ষান্তরে যদি দুটির উদ্দেশ্য এক হয় তাহলে একই শ্রেণীভুক্ত হবে, যদিও উভয়ের মূল ও উৎস ভিন্ন হয়। যেমন- আন্সুরের তৈরি সিরিা ও আন্সুরের তৈরি সিরকা দুটি ভিন্ন শ্রেণী। যদিও উভয়ের উৎস ও মূল এক, অর্থাৎ আন্সুর। কেননা, যে উদ্দেশ্যে সিরকা তৈরি, সে উদ্দেশ্যে সিরিা তৈরি নয়; বরং ভিন্ন। এমনিভাবে ওয়াযারী কাপড়, যা সমরকন্দের একটি গ্রাম ওয়ায়ে প্রস্তুত হয় এবং যানদানিজী কাপড়, যা বুখারার একটি গ্রাম যানদানায় প্রস্তুত হয়, এ দুটিকে ভিন্ন শ্রেণী গণ্য করা হয়। অথচ উভয় কাপড়ের মূল উৎস হচ্ছে তুলা। কারণ, দুটি উদ্দেশ্যে তৈরি এবং দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, মানবের পুরুষ ও স্ত্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। তাই পুরুষ ও নারী ভিন্ন শ্রেণী বিবেচিত হবে। দাস ও দাসীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, দাসী ঘরের অভ্যন্তরীণ ও গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত হয়, তা ছাড়া দাসী কখনো বিছানার সজিনী ও জননীরূপে ব্যবহৃত হয়। আর দাসকে ব্যবহার করা হয় ঘরের বাইরের কাজে। যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ ও অন্যান্য কাজে। পক্ষান্তরে পতনের স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ সবার মূল উদ্দেশ্য একটাই। যেমন- গোশত খাওয়া, আরোহণ করা ও বোঝা বহন করানো ইত্যাদি। তাই পতদের স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ একই শ্রেণীর অন্তর্গত হবে।

২. যদি কোনো বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় এবং তার প্রতি ইশারাও করা হয়, তাহলে দেখতে হবে ইশারাকৃত এবং নাম উচ্চারিত বস্তুটির শ্রেণী একই কিনা? যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে চুক্তির সম্পর্ক হবে ইশারাকৃত বস্তুর সাথে। আর শ্রেণী যদি ভিন্ন হয়, তাহলে চুক্তির সম্পর্ক হবে নামোল্লিখিত বস্তুর সাথে।

৩. বিক্রয়চুক্তির মধ্যে বিক্রীত-পণ্য যদি অস্তিত্বহীন হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর যদি বিক্রীত-পণ্যটি উপস্থিত থাকে, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষণ অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয়। তবে ক্রেতার চুক্তি বাতিল করার অধিকার লাভ হয়। এ তিনটি বিষয়ের সাথে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতি জড়িত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ইশারা এবং নাম উচ্চারণ একত্রিত হয়, তাহলে দু'সুত্র-

১. ইশারাকৃত বস্তু এবং নাম উচ্চারিত বস্তুর শ্রেণী এক হলে চুক্তির সম্পর্ক হবে ইশারাকৃত বস্তুর সাথে এবং চুক্তিটি বিদ্যমান হওয়াতে চুক্তি বহাল থাকবে। তবে বিশেষ গণের অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

২. ইশারাকৃত বস্তু ও নাম উচ্চারিত বস্তুরয়ের শ্রেণী ভিন্ন হলে চুক্তির সম্পর্ক হবে নাম উচ্চারিত বস্তুর সাথে এবং সেই বস্তুটি অবিদ্যমান হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

এখন আসা যাক আমাদের আলোচ্য মাসআলায়: প্রথম মাসআলায় ইশারাকৃত হলো দাস, আর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে দাসীর। দাস ও দাসী ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। অতএব বিক্রয়-চুক্তির সম্পর্ক হবে নাম উচ্চারিত তথা দাসীর সাথে এবং দাসী এখানে অনুপস্থিত। আর অনুপস্থিত বস্তুর বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়। সেমতে এখানেও ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কৃতচুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং পূর্বের চুক্তিটি রহিত হবে। আলোচ্য দ্বিতীয় মাসআলায় ইশারাকৃত হলো ভেড়ি, আর নাম উচ্চারিত হয়েছে ভেড়ার। এ দুটির শ্রেণী এক। এ কারণে বিক্রয়চুক্তির সম্পর্ক হবে ভেড়ির সাথে। আর ভেড়ি বিদ্যমান। নিয়মানুযায়ী বিক্রীত-পণ্য বিদ্যমান থাকলে বিক্রয়চুক্তি সহীহ হয়ে যায়। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে নাম উচ্চারিত হয়েছিল ভেড়ার অর্থাৎ পুংলিঙ্গের। পুংলিঙ্গ হওয়া পতদের মধ্যে একটি গণবিশেষ। সেই গণটি আমাদের এ বিক্রয়চুক্তিতে অবিদ্যমান। অথচ বিক্রয়চুক্তির সময় তা বিদ্যমান হওয়ার প্রতিশ্রুতি বিক্রেতার পক্ষ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে ক্রেতা সেটা অনুপস্থিত পেল, তাই ক্রেতার বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার অধিকার লাভ হবে। এখন ক্রেতা ইচ্ছা করলে চুক্তি রহিত করতে পারে, আবার রাখতেও পারে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ ذَرَاهِمَ حَالَةً أَوْ نَسِينَةً، فَقَبَضَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ  
الْبَائِعِ بِخَمْسِ مِائَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْقُذَ الثَّمَنَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ الثَّانِي، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  
(رح) : يَجُوزُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَمَّ فِيهَا بِالْقَبْضِ، فَصَارَ الْبَيْعُ مِنَ الْبَائِعِ وَمِنْ غَيْرِهِ  
سَوَاءً، وَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالزِّيَادَةِ أَوْ بِالْعَرَضِ، وَلَنَا قَوْلُ  
عَائِشَةَ (رض) لَيْتَكَ الْمَرْأَةُ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتِّ مِائَةٍ بَعْدَمَا اشْتَرَتْ بِثَمَانٍ مِائَةٍ : بِئْسَ  
مَا شَرَيْتِ وَاشْتَرَيْتِ، أَبْلَغُنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبْطَلَ حَجَّه وَجِهَادَهُ مَعَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتَّبَعْ، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ،  
فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمَبِيعُ وَوَقَعَتِ الْمُقَاصَّةُ، بَقِيَ لَهُ فَضْلُ خَمْسِ مِائَةٍ، وَذَلِكَ بِإِلَا  
عَوْضٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ بِالْعَرَضِ، لِأَنَّ الْفَضْلَ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُجَانَسَةِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি নগদ অথবা বাকিতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করে অতঃপর তা কজা করে। তারপর মূল্য পরিশোধের পূর্বেই বিক্রেতার কাছে পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয় বৈধ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বৈধ হবে। কেননা, কজা করার দ্বারা দাসীর উপর ক্রেতার মালিকানা পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে এখন বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করা আর অন্যদের কাছে বিক্রয় করা একই পর্যায়ের হয়ে গেছে। তাছাড়া [কমমূল্যে] বিক্রয়টি প্রথম মূল্যে বিক্রি করা অথবা বেশি মূল্যে বিক্রি করা কিংবা পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করার মতোই হলো। আমাদের দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি “তোমার ক্রয় ও বিক্রয় খুবই নিকৃষ্ট হয়েছে।” কথাটি তিনি সেই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যে আটশ দিরহামে ক্রয় করে ছয়শ দিরহামে বিক্রি করেছিল। [তিনি আরও বলেছিলেন,] তুমি যায়েদ ইবনে আরকামকে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, সে যদি তওবা না করে, তাহলে আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে করা তার হজ ও জিহাদ বাতিল করে দেবেন। তাছাড়া এজন্য যে, [বিক্রেতা মূল্য কজা না করার কারণে] মূল্য এখনো বিক্রেতার দায়ভুক্ত হয়নি। এখন যদি বিক্রীত-পণ্য তার মালিকানায় পৌছে যায় এবং [প্রথম বিক্রয় ও দ্বিতীয় বিক্রয়ের] মূল্য কাটাকাটি হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতার কাছে পাঁচশ দিরহাম উদ্ধৃত থেকে যায়। আর এটা থাকে কোনো বিনিময় ছাড়াই [যা শরিয়তে নিষিদ্ধ]। পণ্যের বিনিময়ে বিক্রির মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা, উদ্ধৃষ্টা শ্রেণী অভিন্নতার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْعِ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উপরিউক্ত মাসআলাটি আলোচনা করেন :

মাসআলা : কেউ নগদ কিংবা বাকিতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করল এবং তা কজাও করল। তারপর মূল্য পরিশোধের আগেই বিক্রেতার কাছেই পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে দাসীটি বেচে দিল, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রিটি শুদ্ধ হলে? কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আহনাফের অভিমত হলো, দ্বিতীয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, দ্বিতীয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। উল্লেখ্য যে, এখানে উদাহরণস্বরূপ দাসী ও পাঁচশ দিরহামের উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং যদি দাসী ছাড়া অন্য কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয় এবং প্রথম মূল্যের চেয়ে কম যে কোনো অঙ্ক হয়, তাহলেও একই কথা প্রযোজ্য। যেমন- কেউ বিক্রেতার কাছে এক হাজার টাকায় পণ্য কিনে সেটাকে আবার নয়শত পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করল তাতেও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ আমাদের মতে দ্বিতীয় বিক্রয় অবৈধ, আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বৈধ। ফকীহগণের পরিভাষায় এ মাসআলাটিকে "سَبْعُ مِائَةٍ بَيْعٌ قَبْلَ نَقْدِ الْكَيْسِ" বলে অভিহিত করা হয়। এটিকে "بَيْعٌ عَيْنِ" -ও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, মাসআলাটির কয়েকটি সূরত হতে পারে। প্রথমত ক্রেতা যার কাছ থেকে কিনেছে তার কাছে সরাসরি বিক্রি না করে অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে এবং সেই ব্যক্তি প্রথম বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে, তাহলে এ বিক্রয়ক্রিটি শুদ্ধ হবে। এ সূরত অর্থাৎ কোনো মাধ্যমে যদি প্রথম বিক্রেতার কাছে পূর্ব মূল্যে কিংবা তার চেয়ে কমে অথবা তার চেয়ে বেশি মূল্যে কিংবা অন্য পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে, তাহলে সবার ঐকমত্যে বিক্রি শুদ্ধ হবে। আর যদি প্রথম বিক্রেতার কাছে সরাসরি বিক্রি করে, তাহলে দু সূরত-

১. প্রথম মূল্যের কমে বিক্রি করবে।

২. প্রথম মূল্যের কম ছাড়া যে কোনো পদ্ধতিতে বিক্রি করবে।

দ্বিতীয় সূরতটি সবার ঐকমত্যে বৈধ। প্রথম সূরতটির মধ্যেই কেবল মতবিরোধ। এ সূরতটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বৈধ, আর অন্যদের মতে অবৈধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, যখন ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য অধিকার করে ফেলে, তখন তার মালিকানা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। মালিকানা সম্পূর্ণ হওয়ার কারণেই বিক্রেতা ছাড়া অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা বৈধ হয়ে যায়। সেহেতু অন্য যে কারোর হাতে বিক্রি বৈধ, তাই বিক্রেতার কাছেও বিক্রি করা বৈধ হবে। তাছাড়া বিক্রেতার কাছে প্রথম মূল্যে কিংবা প্রথম মূল্যের বেশি দামে অথবা পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা যেহেতু বৈধ, সুতরাং প্রথম মূল্যের কমেও বিক্রি করা বৈধ হবে মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী (র.) বিরোধপূর্ণ এ মাসআলাটিকে বিরোধমুক্ত বৈধ মাসআলার উপর কিয়াস করেছেন।

আমাদের দলিল হলো যুক্তি এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। হিদায়ায় বর্ণিত হাদীসটি এই-

قَوْلُ عَائِشَةَ بِلَيْلِكَ الْمَرَّةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتِّ مِائَةٍ نَعْدَمَا اشْتَرَتْ بِمِائَتَيْنِ مِائَةً : بَيْسَ مَا شَرَيْتَ وَاشْتَرَيْتَ أَيْلَيْغِي زَيْدٌ بِنِ زَيْدٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبْطَلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَبْئُ .

এ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রেতা ছিলেন যায়েদ ইবনে আরকাম, আর ক্রেতা ছিলেন মহিলা। সুতরাং অতিরিক্ত মুনাফা হয়েছে হযরত যায়েদ (রা.)-এর। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর রেওয়ায়েত। এ রেওয়ায়েতটি মুসনাদে ইমামে আযমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّجَمِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ أَيْبَى الْعُمَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بَاعَنِي حَارِبَةَ بِمِائَتَيْنِ مِائَةً ثُمَّ اشْتَرَاَهَا مِائَتِي بِسِتِّ مِائَةٍ فَقَالَتْ أَيْلَيْغِي عَيْشُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَبْئُ .



হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ঘটনায় হযরত য়ায়েদ (রা.) ছিলেন বিক্রেতা এবং তাঁরই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। তবে হাদীসটি ইমাম আবু হানীফা (র.) ব্যতীত অন্যরা এভাবে বর্ণনা করেন যে,

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيِّعِيِّ عَنْ إِمْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ هِيَ وَأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدٍ لِعَائِشَةَ إِنِّي بَعْتُ مِنْ زَيْدٍ غُلَامًا يَسْمَانُ مَانَةَ وَزَوْجِي تَيْسَبَةُ وَاشْتَرَيْتُهُ بِسِتٍّ مَانَةَ فَقَالَتْ أَبْلَغِي زَيْدًا أَنَّكَ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ تَنْزُبَ يَسْرًا مَا اشْتَرَيْتَ وَيَسْرَ مَا كَرَيْتَ .

এ রেওয়ায়েতটিতে দেখা যাচ্ছে বিক্রেতা ও মুনাফা অর্জনকারী হচ্ছে মহিলা আর ক্রেতা হচ্ছেন হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম। দুটি রেওয়ায়েতের মধ্যে দ্বিতীয়টি সনদের বিচারে উত্তম। হাদীসটি বর্ণনাকারী আবু ইসহাকের স্ত্রী 'আলিয়া' সম্পর্কে দারাকুত্নীর মন্তব্য যে, 'তিনি অজ্ঞাত পরিচয় ছিলেন' তা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইবনে সা'দ তাবাকাতে উল্লেখ করেন।

সারকথা হলো, ইমাম আবু হানীফা ও অন্যদের বর্ণনার মাঝে সামান্য পার্থক্য থাকলেও প্রথম মূল্যের কমে দ্বিতীয় বিক্রয় হারাম হওয়া কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যায় দুই রেওয়ায়েত দ্বারাই। একথা তো বলাই বাহুল্য যে, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে জেনেই উক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী তা করেননি। কেননা, এটা ইজতিহাদী বিষয়ও নয়। কারণ, হযরত আয়েশা (রা.) এ ধরনের চুক্তি যারা করে তাদের শাস্তি বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ তার হজ ও জিহাদ বাতিল করে দেবেন। যে কোনো কাজের শাস্তি কিংবা পুরস্কার ইজতিহাদ বা যুক্তির আলোকে বর্ণনা করা যায় না। তাই তিনি যা কিছু এ ব্যাপারে বলেছেন, অবশ্যই তা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রুত হয়েছে বলেছেন। আর এটাও সুনিশ্চিত যে, এ ধরনের ধর্মক ও শাস্তি কোনো শুদ্ধ চুক্তির ব্যাপারে বলা হবে না, বরং অশুদ্ধ চুক্তির ব্যাপারেই ধর্মক আসতে পারে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, **يَسْرًا**, **مَا** অংশই ফাসিদ ও অগ্রহ্য চুক্তি। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, হাদীসের শব্দ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এরূপ যে, **بَاعَ بِأَقْلٍ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَعْدِ الثَّمَنِ** অবশ্যই ফাসিদ ও অগ্রহ্য চুক্তি। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, হাদীসের শব্দ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এরূপ যে, **بَاعَ بِأَقْلٍ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَعْدِ الثَّمَنِ** অর্থৎ মূল্য পরিশোধ করা হবে সরকারী কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা পাওয়ার পর এই শর্তে বিক্রয় করেছে। **إِلَى الْعَطَاءِ** -এর কয়েদের কারণে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যায়। **إِلَى الْعَطَاءِ** অর্থৎ 'বেতন-ভাতা পাওয়ার পর' কথাটি একটি অনির্দিষ্ট সময়। আর বিক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সময় অনির্দিষ্ট থাকলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। অতএব একই কারণে এখানেও বিক্রয় ফাসিদ হয়েছে এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে শাস্তির বর্ণনা এসেছে। মোটকথা, শাস্তির বর্ণনা **بَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ** -এর কারণে এসেছে; প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয়ের কারণে নয়। এর উত্তর হলো, এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) -এর মাযহাব হলো, **بَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ** শুদ্ধ এবং বৈধ। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.) -এর মতে **إِلَى الْعَطَاءِ** শুদ্ধ ও বৈধ, সেহেতু তিনি এ ব্যাপারে শাস্তি বর্ণনা করতে পারেন না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, **بَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ** -এর উপর, তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) দ্বিতীয় চুক্তিটি সম্পর্কে তাঁর অসম্মতি প্রকাশ করে বলেছেন **يَسْرًا** **مَا** **كَرَيْتَ**। আর দ্বিতীয় বিক্রিতে মূল্য বাকি রাখা হয়নি, এভাবেও প্রমাণিত হয় যে, মেয়াদ অজ্ঞাত রাখার কারণে শাস্তির বর্ণনা আসেনি।

এখানে এ প্রশ্নও জাগতে পারে যে, হাদীসে শাস্তি বর্ণনা এ কারণে এসেছে যে, মহিলাটি দাসী নিজ কজায় নেওয়ার আগেই তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। অর্থৎ **الْكَفْرُ قَبْلَ تَحْيِثِ الْمَبِيعِ** -এর কারণেই শাস্তির ঘোষণা এসেছে। এর উত্তর হলো, যখন হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীসের কথা হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) জানতে পারেন, তখনই তিনি এ ব্যাপারে

দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ফুল হীকার করেন। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) তার সামনে সুদ সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন : সুদের আয়াত তিলাওয়াত এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, তাঁর শাফি বর্ণনা মূলত সুদের কারণেই- কজা করার পূর্বে হস্তক্ষেপের কারণে নয়। উল্লেখ্য যে, আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি যে, **يَسْرًا مَّا بَاعَ بِأَقْلٍ مِّمَّا بَاعَ قَبْلَ تَحْدِ الثَّمَنِ** -এর মধ্যে সুদের অস্তিত্ব বিন্যাস। সুতরাং এ পদ্ধতির বিক্রয়ের ব্যাপারেই শাফি বর্ণিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে আমরা এও বর্ণনা করেছি যে, এ ধরনের বিক্রয়কে **بَيْعٌ عَيْنِي** বলা হয়। আর **بَيْعٌ عَيْنِي** সম্পর্কে অন্য হাদীসেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদীসটি এই-

**عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُنِيَ عَلَيْنَا زَكَاةً وَمَا بَرَى أَحَدًا أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْيَدْنَارِ وَالْقَرَاهِمِ مِنَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ أَصْبَحَ الدَّيْنَارُ وَالْقَرَاهِمُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَيَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَمِنَ النَّاسُ بِالْيَدْنَارِ وَالْقَرَاهِمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعُوا أَذْ نَابَ الْبَقْرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فَمَنْ سَبَّلَ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعَهُ عَنْهُمْ حَتَّى يَرَايَهُمَا مَا يَبْتَنُهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .**

এ হাদীস দ্বারাও **بَيْعٌ عَيْنِي** নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়। এ জাতীয় বিক্রয় অবৈধ হওয়ার যুক্তি হলো, মূল্য এখনও বিক্রেতার আয়ত্তে আসেনি। এরপর যখন পণ্য পুনরায় বিক্রেতার কাছে চলে আসল অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিক্রয় হলো এবং মূল্য কাটাকাটি হয়ে গেল, তারপরেও বিক্রেতার পাওনা হলো পাঁচশত টাকা। এ পাঁচশ টাকা সে কোনো কিছুই বিনিময় ছাড়াই লাভ করল। এর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম বিক্রিতে [উদাহরণস্বরূপ] যায়েদ এক হাজার টাকায় একটি দাসী খালেদের কাছে বিক্রি করল। খালেদ দাসী কজা করল, কিন্তু এখনও মূল্য পরিশোধ না করেই আবার দাসীটি যায়েদের কাছেই বিক্রি করে দিল পাঁচশ টাকায়। এত পরস্পরে মূল্য কাটাকাটি করার পর খালেদের পাওনা মিটে গেল এবং যায়েদের পাঁচশ পাওনাও মিটে গেল। এরপরেও যায়েদের পাঁচশ পাওনা রয়ে গেল। এ পাঁচশ টাকা যায়েদ পাচ্ছে, অথচ বিনিময়ে তাকে কোনো কিছুই দিতে হচ্ছে না। আর বিনিময় ছাড়া যে কোনো লাভ বা অতিরিক্ত পাওনা সুদ বিবেচিত হয়, আর সুদ হারাম। এখানে যেহেতু দ্বিতীয় বিক্রয় সুদের উৎস, তাই দ্বিতীয় বিক্রয় অবৈধ ও হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা বিক্রেতার কাছে দাসীটি পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে- উদাহরণস্বরূপ দাসীটি গমের বিনিময়ে বিক্রি করল, তাহলে এ বিক্রয় বৈধ, যদিও পণ্যের মূল্য প্রথম মূল্যের চেয়ে কম হয়ে থাকে। তবে এ কম হওয়া ধর্তব্য নয়। কেননা, প্রকৃত কমবেশি তখনই প্রকাশ পাবে, যখন প্রথম মূল্য ও দ্বিতীয় মূল্য এই শ্রেণীর হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথম বিনিময় মাধ্যম ছিল দিরহাম এবং পরবর্তী বিনিময় মাধ্যমও দিরহাম, তাহলে একই শ্রেণীর হলো। এখন প্রথম দিরহামের চেয়ে পরবর্তী দিরহাম পরিমাণে ও সংখ্যায় কম হলে প্রকৃত কমবেশি হলো। একই শ্রেণীভুক্ত না হলে প্রকৃতার্থে কমবেশি নিরূপণ করা যায় না। যেমন- কেউ প্রশ্ন করল যে, হাতি বড় নাকি গাছ বড়? এর উত্তরে বলা হবে, এটা একটা অনর্থক প্রশ্ন। কেননা, ছোট-বড় একই শ্রেণীর দুটি জিনিসের মধ্যে প্রকাশ করা যায়। ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছোট-বড় নিরূপণ করা যায় না। হাতি এবং গাছ দুটি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। এর কোনোটি ছোটও না, আবার কোনোটি বড় নয় : সুতরাং প্রথম মূল্য ও দ্বিতীয় মূল্য যদি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে এদের মাঝে অতিরিক্ত অংশ নির্ধারণ করা যাবে না, যা সুদ বলে গণ্য হতে পারে। আর সুদই ছিল নিষেধাজ্ঞার কারণ। যেহেতু পণ্যের বিনিময়ে সুদ হয় না, তাই দ্বিতীয় বিক্রি অবৈধ হবে না। এমনভাবে যদি বিক্রেতা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, তাহলেও বৈধ। কেননা, তখন লাভ বিক্রেতার হচ্ছে না; বরং লাভ হচ্ছে অন্য ব্যক্তির। আর বিক্রেতার বিনিময় ছাড়া লাভই সুদ গণ্য হয়।

এমনিভাবে যদি ক্রেতা বিক্রেতার কাছে প্রথম মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে [সুদ না হওয়ার কারণে] দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ। তদ্রূপ ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছে প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে, তাহলেও দ্বিতীয় বিক্রয় বৈধ হবে। এ অবস্থায় মুনাফা হবে ক্রেতার, আর পণ্য/ দাসীটি বিক্রেতার হাতে চলে যাবে। আর ক্রেতার যে লাভ হলো তা অবশ্য কোনো বিনিময় ছাড়া নয়; বরং তার এ মুনাফা হয়েছে বিক্রীত-পণ্যের পরিবর্তে বা বিনিময়ে। আমরা জানি যে, যে মুনাফা কোনো কিছুই বিনিময়ে হয় তা সুদ নয়। অতএব এ সুরতটিও নিষেধক্কেই বৈধ।

قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِخَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا وَأَخْرَى مَعَهَا مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُذَ الثَّمَنَ بِخَمْسِ مِائَةٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا مِنَ الْبَائِعِ وَبَطُلَ فِي الْأُخْرَى، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ بِمُقَابِلَةِ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْهُ، فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لِلْأُخْرَى بِأَقْلَ مِمَّا بَاعَ ، وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَنَا ، وَلَمْ يُوَحِّدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي صَاحِبَتِهَا ، وَلَا يَشْتَبِعُ الْفَسَادُ ، لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِيهَا ، لِكُونِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ ، أَوْ لِأَنَّهُ يَاجْتَنِبُ شُبْهَةَ الرِّبَا ، أَوْ لِأَنَّهُ طَارٍ ، لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِإِنْقِسَامِ الثَّمَنِ أَوْ النِّمَاصَةِ ، فَلَا يَسِيرُنِي إِلَى غَيْرِهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ একটি দাসী পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল, তারপর এটি এবং এর সাথে আরেকটি দাসীকে একত্রে বিক্রেরতার কাছে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই পাঁচশ দিরহামে বিক্রি করে দিল, তাহলে যে দাসীটি বিক্রেরতা থেকে ক্রয় করেনি তার ক্ষেত্রে বিক্রয় শুদ্ধ ও বৈধ হবে। আর অন্যটির ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, যে দাসীটি সে বিক্রেরতা থেকে কিনেনি তার জন্য কিছু মূল্য ধরা আবশ্যিক, আর তখন অন্যটি বিক্রয়মূল্য থেকে কমে কেনা হলো। আর তা আমাদের কাছে ফাসিদ। তার সঙ্গী দাসীর মধ্যে এ ব্যাপারটি পাওয়া যাচ্ছে না। আর বিক্রয়ের একাংশের ফাসাদ ও অবৈধতা এই দাসীর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হবে না। কেননা, মাসআলাটি ইজতিহাদ নির্ভর হওয়ার কারণে যে দাসী কিনে বিক্রি করা হয়েছে তার মধ্যে ফাসাদের উপস্থিতি দুর্বল। অথবা সুদের সাদৃশ্যের কারণে ফাসাদ এসেছে। [এখন যদি আমরা পরবর্তী দাসীটির ক্ষেত্রে ফাসাদকে প্রসারিত করি, তাহলে তা হবে সুদের সদৃশ এর সদৃশ। আর তা ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে না।] অথবা তা পরবর্তীতে উদ্ভূত। কেননা, তা [ফাসাদ] মূল্যকে বন্টন করার দ্বারা অথবা কাটাকাটি করার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তা অন্যের প্রতি প্রসারিত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْهُ قَالَ : وَقَوْلُهُ قَالَ : উপরিউক্ত ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত একটি মাসআলা জামিউস সাগীর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ মাসআলাটি পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। মাসআলাটির সূরত হলো, এক ব্যক্তি পাঁচশ দিরহামে একটি দাসী কিনে নিল। তারপর মূল্য শোধ করার আগেই ক্রেতা এই দাসী ও তার সাথে অন্য এক দাসী একত্রে বিক্রেরতার কাছেই পাঁচশ দিরহামে বেচে দিল। তাহলে যে দাসীটি বিক্রেরতা থেকে ক্রয় করেনি তার বিক্রয় বৈধ হবে আর যে দাসীটি বিক্রেরতা থেকে ক্রয় করেছিল তার বিক্রয় বৈধ হবে না। এর দলিল হলো, ক্রেতা দুটি দাসী বিক্রেরতার কাছে বিক্রয় করছে পাঁচশ টাকায়; তাই এ পাঁচশ টাকা উভয় দাসীর বিনিময় সাব্যস্ত হলো। অর্থাৎ পাঁচশ দিরহামের কিছু অংশ সেই দাসীর বিনিময় হবে যা সে বিক্রেরতার কাছ থেকে ক্রয় করেনি। আর বাকি অংশ সেই দাসীর বিনিময়ে হবে যা সে ক্রেতার কাছ থেকে কিনেছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, দাসীটি পাঁচশ টাকায় কেনা হয়েছে। এখন আবার দাসীটি পাঁচশ দিরহামের কমে বিক্রেরতার কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এতে نَقْدُ الثَّمَنِ বৈধ। আমাদের মতে এটা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং বিক্রেরতা থেকে কেনা দাসীটির ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়

দাসী যাকে ক্রেতা তার নিজের পক্ষ থেকে যুক্ত করেছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এতে **بَاعَ بِأَمْلٍ مَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الْكَسَنِ** য়েহেতু হয়নি এবং এতে সুদের সৃষ্টি হয়নি, তাই এর বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে।

লেখক এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের অপনোদন করছেন। প্রশ্নটি হলো, বিক্রেতা যে দাসীটি বিক্রি করেছিল সেটা কেনা যেহেতু তার জন্য ফাসিদ ও অবৈধ হওয়া প্রমাণিত হলো, তখন যে দাসীটি সে বিক্রি করেনি সেটির ক্রয়ও ফাসিদ ও অবৈধ হওয়া উচিত। কারণ, দুটি দাসীকে একন সে একত্রে এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে ক্রয় করছে। একই চুক্তির অধীনে দুটি দাসীর মধ্যে একটিতে বিক্রি বৈধ- অন্যটিতে বিক্রি অবৈধ তা কি করে হয়? এর উত্তর হলো, বিক্রেতা যে দাসীটি পাঁচশ টাকা বিক্রি করেছিল তা কিনতে গিয়ে যে সমস্যা তাতে সৃষ্টি হয়েছে তাতো একান্ত তার মাঝেই হয়েছে দ্বিতীয়টির মধ্যে তা হয়নি। আর প্রথমটির অবৈধতা ও বাতিল হওয়া দ্বিতীয়টির মধ্যে সম্প্রসারিত হবে না। কেননা, প্রথম দাসীর মধ্যে যে ফাসাদের উপস্থিতি রয়েছে তা দুর্বল ও কম শক্তিশালী। আর দুর্বল ফাসাদ ও অবৈধতা অন্যটির প্রতি স্থানান্তরিত ও প্রসারিত হতে পারে না। তাই এ ফাসাদ দ্বিতীয় ও পরবর্তীতে যুক্ত করা দাসীর মধ্যে স্থানান্তরিত হবে না। এখন এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, প্রথমটির মধ্যে ফাসাদ ও অবৈধতা দুর্বল কেন? এর উত্তর হলো, কয়েক কারণে এর মধ্যে ফাসাদের উপস্থিতি দুর্বল-

১. উল্লিখিত 'প্রথম মূল্যের কম মূল্যে দ্বিতীয় বিক্রি' অবৈধ হওয়ার ব্যাপারটি একটি ইজতিহাদ নির্ভর মাসআলা। এর সম্পক্ষে প্রত্যক্ষ নস নেই। ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে আহনাফ এটাকে অবৈধ বলেন আবার ইমাম শাফিঈ (র.) একে বৈধ বলেন। উল্লেখ্য যে, যে মাসআলায় ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে মতবিরোধ হয় সে মাসআলার অবৈধতার বিষয়টি দুর্বল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এ মাসআলার অবৈধতা-ফাসাদ দুর্বল।
২. দ্বিতীয় কারণ হলো, যে দাসীকে বিক্রেতা পাঁচশ টাকায় বিক্রি করেছিল সেটাকে আবার মূল্য পরিশোধের পূর্বেই প্রথম মূল্যের কমে ক্রয় করার কারণে এতে সুদের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, আর সুদ যেমন অবৈধ, তেমনই সুদের সন্দেহপূর্ণ বিষয়ও অবৈধ। তবে এটা স্পষ্ট যে, কোনো বিষয়ে সুদের সন্দেহ থাকা নিশ্চিত সুদের উপস্থিতির চেয়ে দুর্বল। এ কারণে বেচে দেওয়া দাসী কেনাতে যে ফাসাদ ও অবৈধতা সৃষ্টি হয়েছে তাও দুর্বল।
৩. দুর্বলতার তৃতীয় কারণ হলো, বিক্রেতা যে দাসী বেচে দিয়েছিল তা আবার কম মূল্যে ক্রয় করতে যাওয়ার কারণে যে দুর্বলতা তাতে সৃষ্টি হয়েছে তা দ্বিতীয় বিক্রয়ের কারণে উদ্ভব হয়েছে। সে অবৈধতা প্রথম চুক্তি ও বিক্রির মধ্যে ছিল না। অবৈধতা দুভাবে সৃষ্টি হয়-
১. ক্রেতা যখন দুটি দাসী একত্রে পাঁচশ টাকায় বিক্রেতার কাছে পুনরায় বিক্রি করছে, তখন দুটি দাসীর বিনিময় পাঁচশ টাকা নির্ধারণ করা শুদ্ধ হবে। কেননা, ক্রেতার পক্ষ থেকে কোন দাসীর কত মূল্য তা নির্ধারণ করা হয়নি। কিন্তু উভয়টির জন্য এক এক অংশ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এখন বিক্রেতা যে দাসী বিক্রি করেছিল তার মূল্য হবে পাঁচশ দিরহামের একাংশ, আর অন্য দাসীর বাকি অংশ। এখন বিক্রেতা তার বেচে দেওয়া দাসী পুনরায় গ্রহণ করলে তাতে প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে দাসীটি গ্রহণ করা হচ্ছে। আর এতেই এর মধ্যে অবৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।
২. দ্বিতীয়ত বিক্রেতা ক্রেতার কাছে দাসী বাবদ পাঁচশ টাকা পায় এবং ক্রেতার জিম্মায় সেটা আদায় করা আবশ্যিক। এরপর সেই দাসীটি বিক্রেতার কাছে ফিরে আসার ফলে ক্রেতার পাঁচশ টাকা বিক্রেতার উপর প্রদান করা আবশ্যিক হলো। এখন বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পায় পাঁচশ এবং ক্রেতা বিক্রেতার কাছে পায় পাঁচশ, উভয়ের টাকা কাটাকাটি হয়ে গেল, এখন কেউ কারো কাছে টাকা পায় না। দেনা-পাওনা শেষ করার পর দেখা গেল বিক্রেতার হাতে একটি অতিরিক্ত দাসী রয়ে গেল, যার বিনিময়ে বিক্রেতাকে কোনো কিছুই খরচ করতে হলো না। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিনিময় ছাড়া এমনভাবে অর্জিত বস্তু সুদ বিবেচিত হয়, যেহেতু দ্বিতীয় বিক্রির কারণে একটি দাসী অতিরিক্ত হাতে আসল, তাই দ্বিতীয় বিক্রির মধ্যে ফাসাদের উদ্ভব ঘটল।

মোটকথা, বিক্রেতার বেচে দেওয়া দাসী পুনরায় কম মূল্যে ক্রয় করার ক্ষেত্রে যে ফাসাদ ও অবৈধতা তা নতুন আগমনকারী। আর নতুন আগমনকারী ফাসাদ ও অবৈধতা দুর্বল হয়ে থাকে, তাই এই ফাসাদও দুর্বল। আর যে কোনো দুর্বল ফাসাদ-অবৈধতা প্রসারিত হয় না। এ কারণে বিক্রেতার বেচে দেওয়া দাসীর ক্ষেত্রেই কেবল ফাসাদ হবে, অন্য দাসীর ক্ষেত্রে ফাসাদ আসবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى زَيْتًا عَلَى أَنْ يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ خَمْسِينَ رَطْلًا فَهُوَ فَاسِدٌ، وَإِنْ اشْتَرَى عَلَى أَنْ يَطْرَحَ عَنْهُ يَوْزَنُ الظَّرْفِ جَارٌ، لِأَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَالثَّانِي يَقْتَضِيهِ .

**অনুবাদ :** ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এই শর্তে তেল ক্রয় করে যে, বিক্রেতা তাকে তার পাত্রসহ তেল মেপে দিবে এবং প্রত্যেক পাত্রের পরিবর্তে সে পঞ্চাশ রিতল ক্রেতার প্রাপ্ত হিসাব থেকে বাদ দিবে। তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। আর যদি এই শর্তে ক্রয় করে যে, পাত্রের ওজন পরিমাণ তার থেকে বাদ দিবে, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা, প্রথম শর্তটিকে বিক্রয় চুক্তি চায় না, আর দ্বিতীয়টি বিক্রয়চুক্তির চাহিদা অনুসারে হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ : قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى زَيْتًا عَلَى أَنْ يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ خَمْسِينَ رَطْلًا فَهُوَ فَاسِدٌ : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত উপরিউক্ত মাসআলাটি জামিউস সাগীর থেকে হিদায়াত লেখক সংগ্রহ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এই শর্তে তেল কিনে যে, বিক্রেতা তাকে পাত্রসহ তেল মেপে দিবে এবং প্রত্যেক পাত্রের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চাশ রিতল তেল কম দিবে, তাহলে এটা ফাসিদ বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত হবে।

মাসআলাটির উদাহরণ এরূপ যে, কোনো ব্যক্তি এক হাজার রিতল যাইতুনের তেল কিনল। অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতা-কে একটি পাত্রসহ দিল মেপে দেওয়ার জন্য। সেই পাত্রে তেল ভরা হলো, এরপর পাত্রভর্তি তেল ওজন দেওয়া হলো, এতে দেখা গেল পাত্রসহ তেলের ওজন হচ্ছে একশত রিতল। ক্রেতা বলল, পাত্রের ওজন পঞ্চাশ রিতল হিসাব থেকে বাদ দাও। অথচ পাত্রের সঠিক ওজন কতটুকু তা জানা নেই। যেন ক্রেতা বলল, এ পাত্র দিয়ে বিশবার তেল ঢেলে দাও তাহলে এক হাজার রিতল হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক বার পাত্রের ওজন বাবদ পঞ্চাশ রিতল বাদ পড়বে। ক্রেতার এ ধরনের শর্ত দ্বারা চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, ক্রেতার এই শর্তটি বিক্রয়চুক্তির চাহিদার বিপরীত শর্ত। বিক্রয়চুক্তি এ ধরনের শর্তকে গ্রহণ করে না। কেননা, পাত্রের সঠিক মাপ জানা নেই, তাই হতে পারে পাত্রের ওজন পঞ্চাশ রিতল থেকে কম, আবার পাত্রের ওজন পঞ্চাশ রিতল থেকে বেশিও হতে পারে। এ অজ্ঞাত অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল হিসাব থেকে বাদ দেওয়ার শর্তারোপ করা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী। আর বিক্রয়চুক্তি পরিপন্থী যে কোনো শর্তের আরোপ বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। এ কারণে এ অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এ শর্তের উপর তেল ক্রয় করে যে, পাত্রের সঠিক ওজন যতটুকু ততটুকুই মূল পরিমাণ থেকে বাদ দেওয়া হবে তাহলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হবে। কেননা, এই শর্তটি এমন যা চুক্তির পরিপন্থী নয়; বরং চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী। এটা এমন একটা শর্ত যার দ্বারা পণ্যের প্রকৃত ওজন সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। যাতে সঠিক মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

এর সূরত এই যে, প্রথমে বিক্রেতা পাত্রটি [তেল ছাড়া] ওজন দিয়ে দেখবে কি পরিমাণ পাত্রের ওজন। এরপর প্রত্যেকবার ততটুকু পরিমাণ মূল হিসাব থেকে বাদ দিবে, আর এভাবেই সঠিক ওজন বের হয়ে আসবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى سَمْنًا فِي زَيْ قَرَدَ الظَّرْفِ، وَهُوَ عَشْرَةُ أَرْطَالٍ، فَقَالَ الْبَائِعُ الزُّيُّ غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ، فَاَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ إِنْ اغْتَبَرَ اخْتِلَافًا فِي تَغْيِينِ الزُّيِّ الْمَقْبُوضِ فَاَلْقَوْلُ قَوْلُ الْقَائِضِ ضَمِينًا كَانَ أَوْ أَمِينًا، وَإِنْ اغْتَبَرَ اخْتِلَافًا فِي السَّنَنِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اخْتِلَافٌ فِي الثَّمَنِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَنْكِرُ الزِّيَادَةَ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি চামড়ার পাত্রে যি ক্রয় করে, তারপর পাত্রটি ফেরত দেয়। [খালি পাত্রটি মেপে দেখা গেল] এর ওজন দশ রিতল। কিন্তু বিক্রেতা বলে ঘিয়ের পাত্র এটা নয়, অন্যটা সেটার ওজন ছিল পাঁচ রিতল। এমতাবস্থায় ক্রেতার মতটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যদি বলা হয় এ মতবিরোধ কজাকৃত চামড়ার পাত্র সম্পর্কে তাহলে তো কজাকারীর কথাই ধর্তব্য হবে। চাই সে যামীন হোক অথবা আমানতদার হোক। আর যদি মতবিরোধ ঘিয়ের পরিমাণ সম্পর্কে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এটা প্রকৃতপক্ষে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কিত মতবিরোধ। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ: قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى سَمْنًا الْخ: ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ চামড়ার একটি পাত্রে করে যি ক্রয় করল এবং তা সে কজা করল এরপর ক্রেতা পাত্রটি খালি করে ফেরত দিল। খালি পাত্রটির ওজন মেপে দেখা গেল, তার ওজন দশ রিতল। কিন্তু বিক্রেতা পাত্রটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, এটা সেই পাত্র নয়। বরং আমার পাত্রটির ওজন পাঁচ রিতল ছিল। মোটকথা বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেল। ক্রেতার ফেরত দেওয়া পাত্রের ওজন দশ রিতল। আর বিক্রেতার দাবি অনুযায়ী সেটার ওজন ছিল পাঁচ রিতল। এ অবস্থায় ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে শর্ত এই যে, দু'টি [এক] বিক্রেতার পক্ষে কোনো সাক্ষী নেই ঘিয়ের পাত্রের [দুই] ক্রেতা শপথ করে বলছে, এটা সেই পাত্র যাতে যি ছিল। এখানে দলিলের পূর্বে সুরতে মাসআলাটি আলোচনা করা দরকার। সুরতে মাসআলা এরূপ: এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি থেকে একটি পাত্রে রাখা যি কিনল, প্রত্যেক রিতল এক দিরহাম করে। পরে পাত্রসহ যি মেপে দেখা গেল যে, একশত রিতল। এরপর ক্রেতা পাত্রসহ যি কজা করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বাড়িতে যি রেখে খালি পাত্রটি নিয়ে আসল এবং বিক্রেতাকে বলল, আমি নব্বই রিতল যি পেয়েছি আর পাত্রটির ওজন হচ্ছে দশ রিতল। বিক্রেতা বলল, না, পাত্রের ওজন পাঁচ রিতল, আর ঘিয়ের ওজন ছিল পচান্নকই রিতল। এ অবস্থায় আমরা তাদের মতবিরোধকে দু'ভাবে মূল্যায়ন করতে পারি—

১. তাদের মতবিরোধ পাত্রটির ওজন নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে।
২. তাদের মতবিরোধ ঘিয়ের ব্যাপারে। যেহেতু ঘিয়ের পরিমাণ পাত্রের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তাই বাহ্যিকভাবে পাত্র নিয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে।

লেখক বলেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাদের মত বিরোধ পাত্রকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে হয়েছে, তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। কারণ, ক্রেতা ছিল কজাকারী। কজাকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। চাই তার দখল আমানতের দখল হোক কিংবা

জামানতের দখল হোক। জামানত বা দায়যুক্ত কজা যেমন ডাকাত-ছিনতাইকারীর কজা। আমানত বা দায়যুক্ত কজা যেমন আমানতদারের কজা, অর্থাৎ আপনি কারো কাছে কোনো বস্তু আমানত রাখলেন তারপর সেটা আমানতদারের হাতে বিনষ্ট হয়ে গেলে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন।

আর যদি বলা হয়, ক্রেতা ও বিক্রেতার মতবিরোধ মূলত ঘিয়ের পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে হয়েছে, তাহলে এটা প্রকৃতার্থে মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ। অর্থাৎ ঘিয়ের মূল্য কত। বিক্রেতা পাঁচ রিতল অতিরিক্ত [৯০ + ৫ = ৯৫] দাবি করছে। আর ক্রেতা অতিরিক্ত পাঁচ রিতলের মূল্য প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এক কথায় বিক্রেতা হচ্ছে দাবিদার, আর ক্রেতা অস্বীকারকারী। নিয়মানুযায়ী দাবিদারের পক্ষে সাক্ষী না থাকলে বা সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং এখানে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এ মাসআলার উপর দু'টি আপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ দু'মাসআলা দ্বারা এর উপর আপত্তি তোলা হয়—

১. কেউ দু'টি দাস ক্রয় করে কজা করল। ঘটনাচক্রে ক্রেতার হাতে একটি দাসের মৃত্যু হলো আর অন্যটিকে ক্রেতা দোষণ কারণে ফেরত দিল, এরপর তাদের মাঝে মৃত দাসটির মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে মতবিরোধ হয়ে গেল। এমতবস্থায় বিক্রেতার কথামত ফয়সালা হবে। [মাসআলাটি **بَابُ الْمُحَالِ** এ আলোচিত হবে]
২. নিয়ম হলো, মূল্যের ব্যাপারে যে কোনো মতবিরোধ হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের শপথ করতে হয়। অথচ আলোচ্য মাসআলায় শুধুমাত্র ক্রেতা শপথ করছে। সারকথা, উল্লিখিত দু'টি মাসআলা আমাদের আলোচ্য মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং মাসআলা দু'টির ব্যাপারে আমাদের কী জবাব হবে?

প্রথম মাসআলাটির জবাব হচ্ছে— এখানে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্যের দাবি অস্বীকার করার কারণে। অর্থাৎ ক্রেতা এখানে অস্বীকারকারী। সেখানে বিক্রেতার কথা একই কারণে গ্রহণযোগ্য। সেখানে বিক্রেতা ক্রেতার দাবিকৃত অতিরিক্ত মূল্য অস্বীকার করছে এ কারণে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় মাসআলাটির জবাব হলো, উভয়ের শপথ যুক্তি বিরুদ্ধভাবে সেখানেই প্রয়োগ হয়, যেখানে প্রকৃতই এবং উদ্দেশ্যগতভাবে মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়। আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে উদ্দেশ্যগতভাবে মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ নয়, উদ্দেশ্যগত মতবিরোধ হলো ঘিয়ের পরিমাণের ব্যাপারে। অনুবর্তী হিসেবে পরে তা মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধে পরিণত হয়েছে, অথবা মূলত মতবিরোধ হলো পাত্রের ব্যাপারে।

قَالَ : وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ بِشْرَانِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ حَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخِنْزِيرُ، وَعَلَى هَذَا تَوْكِيلُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ، لَهُمَا أَنَّ الْمُؤَكَّلَ لَا يَلِينُهُ فَلَا يَوَلِّيهِ غَيْرَهُ، وَلَا أَنَّ مَا يَثْبُتُ لِلْمُؤَكَّلِ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤَكَّلِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ بِأَشْرِهِ يَنْفُسِهِ فَلَا يَجُوزُ، وَلَا بِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْمُؤَكَّلُ بِأَهْلِيَّتِهِ وَوَلَايَتِهِ، وَإِنْتَقَالَ الْمِلْكُ إِلَى الْأَمْرِ أَمْرٌ حَكْمِيٌّ، فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ، كَمَا إِذَا وَرِثَهُمَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ خَمْرًا يُخْلِلُهَا، وَإِنْ كَانَ خِنْزِيرًا يُسَبِّهُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুসলিম যদি কোনো খ্রিস্টানকে মদ ক্রয় বা বিক্রি করার আদেশ করে, অতঃপর খ্রিস্টান ব্যক্তিটি তাই করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, মুসলমানের জন্য তা [প্রতিনিধি নিয়োগ] বৈধ নয়। একই মতবিরোধ রয়েছে শূকরের ব্যাপারেও। মুহরিম কর্তৃক অন্য কাউকে তার ইহরামের পূর্বে শিকারকৃত জন্তুর বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করার ব্যাপারেও একই মতবিরোধ রয়েছে। সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে- মক্কেল যে বিষয়ের ক্ষমতা রাখে না সে বিষয়ে অন্যকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে না। তা ছাড়া উকিলের পক্ষে যা সাব্যস্ত হবে, তা মক্কেলের দিকে স্থানান্তরিত হবে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন মক্কেল নিজেই তা সম্পাদন করল। আর তা সম্পাদন করা মক্কেলের জন্য বৈধ নয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- [এখানে] চুক্তিকারী হচ্ছে স্বয়ং উকিল, যে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা বলে চুক্তি সম্পাদন করছে। আর নিয়োগ দাতার প্রতি মালিকানার স্থানান্তর সে তো বিধানগত ব্যাপার। সুতরাং ইসলামের কারণে উকিলের চুক্তি নিষিদ্ধ হবে না। যেমন মুসলমান যদি মদ ও শূকরের উত্তরাধিকারী হয়। তারপর যদি মদ হয় তাহলে সিরকায় রূপান্তরিত করবে। আর যদি শূকর হয় তবে ছেড়ে দিবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا الْخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীরের কয়েকটি মাসআলা উদ্ধৃত করেছেন। ইবারতে মোট তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে-

প্রথম মাসআলা : মুসলিম কোনো খ্রিস্টানকে মদ বেচার কিংবা কেনার জন্য উকিল নিযুক্ত করল।

দ্বিতীয় মাসআলা : কোনো মুসলিম কোনো খ্রিস্টানকে শূকর বিক্রি অথবা ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করল।

তৃতীয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পূর্বে শিকার করল, অতঃপর ইহরাম বোঁধে ফেলল। তারপর ইহরাম বাঁধেনি এমন ব্যক্তিকে তার শিকারকৃত জন্তু বেচে দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। এ তিনটি মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উকিল নিযুক্ত করা এবং উকিলের ক্রয়-বিক্রয় করা উভয়ই বৈধ। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, উকিল বানানো এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয় কোনোটাই বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এরও একই অভিমত।



উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশীয় পরিভাষায় যারা কোর্টে মামলা-মোকাদ্দমা পরিচালনা করে তাদেরই কেবল উকিল বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ও নিয়োগকৃত যে কোনো লোককে উকিল বলা হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে জ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো লোক উকিল হতে পারে।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : মক্কেল প্রথম দুটি মাসআলায় মুসলমান, আর তৃতীয় মাসআলায় মুহরিম, তারা স্বয়ং উক্ত লেন-দেন করার ক্ষমতা রাখেন না। অর্থাৎ মুসলিম কোনো অবস্থাতেই মদ ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। এবং মুহরিম ইহরামের পূর্বে কৃত শিকারকে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিক্রি করতে পারে না। মানুষ যে বিষয়ের অধিকার রাখে না সে অধিকার অন্য কাউকে প্রদান করতে পারে না। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি অবস্থায় মক্কেলের পক্ষে উকিল বানানো বৈধ নয়।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে- যে বিষয় উকিলের অনুকূলে সাব্যস্ত হয় তা হুবহু মক্কেলের পক্ষে সাব্যস্ত হয় বা মক্কেলের প্রতি স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং খ্রিস্টান উকিলের মদ ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় মুসলমান মক্কেলের জন্য সাব্যস্ত হবে এবং তার দিকে স্থানান্তরিতও হবে। তদ্রূপ শিকারকৃত জন্তুর বিক্রির বিষয়টি উকিলের নির্দেশদাতা ও নিয়োগদাতা মক্কেলের প্রতি স্থানান্তরিত হবে। ফলে বিষয়টি এমনই হলো যে, মক্কেল নিজেই যেন উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেছেন। সুতরাং যেহেতু প্রথম দুটি মাসআলায় মুসলমানের পক্ষে মদ ও শূকর বেচা-কেনা করা এবং তৃতীয় মাসআলায় মুহরিমের শিকারকৃত জন্তু বিক্রি করা অবৈধ, কাজেই, এসব বিষয়ে উকিল বানানোও অবৈধ।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, বেচা-কেনার ক্ষেত্রে দুটো যোগ্যতাই গ্রহণযোগ্য। একটি উকিলের, অপরটি মক্কেলের। উকিলের জন্য লেন-দেন করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যিক। খ্রিস্টানের লেন-দেন করার যোগ্যতা আছে। কেননা, সে স্বাধীন, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক। পক্ষান্তরে মক্কেলের জন্য এতটুকু যোগ্যতা থাকা আবশ্যিক যে, বিক্রয়ের হুকুম তথা মূল্য অথবা পণ্যের মালিকানা তার দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে। কাউকে উকিল বানালে মালিকানা মক্কেলের দিকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানান্তরিত হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ ও শূকর-এর মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা মক্কেল তথা মুসলমানের অবশ্যই রয়েছে যেমন উত্তরাধিকারের সূত্রে মুসলমান অনিচ্ছা সত্ত্বেও শূকর ও মদের মালিক হয়ে যায়। উত্তরাধিকারী সূত্রে মদ ও শূকরের মালিক হওয়ার সূত্রে মাসআলা হচ্ছে এরূপ যে, কোনো ব্যক্তি পূর্বেই খ্রিস্টান ছিল এবং সে অবস্থায় তার কাছে মদ ও শূকর ইত্যাদি ছিল, অতঃপর সে মুসলমান হয়ে যায়। আর তার ছেলে পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিল। তারপর নও মুসলিম (খ্রিস্টান) পিতা ইন্তেকাল করল। ফলে তার মুসলমান পুত্র পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে অন্যান্য মালের সাথে মদ ও শূকরের মালিক হয়ে গেল। এখানে শূকর ও মদের মালিকানা পুত্রের প্রতি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তার এতটুকু যোগ্যতা অবশ্যই রয়েছে যে, তার প্রতি মালিকানা স্থানান্তরিত হলে সে মালিক হয়ে যায়। এমনিভাবে খ্রিস্টান উকিল মদ ও শূকর বিক্রি করলে অথবা ক্রয় করলে তার মক্কেল তথা মুসলমান উকিল নিয়োগদাতা মদ ও শূকর অথবা তার মূল্যের মালিক হয়ে যাবে। আর মালিকানা মক্কেলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। মোটকথা, যখন উকিল এবং মক্কেল উভয়ের মাঝে পূর্ণযোগ্যতা রয়েছে, তখন উকিল বানানো শুদ্ধ হবে, আর উকিল বানানো শুদ্ধ হলে উকিলের কর্মকাণ্ডও শুদ্ধ হবে। কেউ যদি এখানে আপত্তি করেন যে, মালিকানা অনিচ্ছাকৃতভাবে চলে আসে ঠিক, কিন্তু এখানে মালিকানার সবব তো উকিল বানানো, যা মক্কেল ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। সুতরাং সে যেন ইচ্ছাকৃতই মালিক হশো। এর উত্তর হচ্ছে, মালিকানার সবব উকিল বানানো নয়। বরং মালিকানার সবব হলো ক্রয় করা, আর ক্রয় করা উকিলের ইখতিয়ারভুক্ত কাজ, মক্কেলের নয়। আর ক্রয়ের সববও ওকালত নয়। বরং ওকালত ক্রয়ের জন্য শর্ত।

তবে জ্ঞান উচিত যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এমন রয়েছে যে, এ ধরনের উকিল বানানো মাকরুহে তাহরীমী। অতএব এটা বৈধ হলেও মাকরুহে তাহরীমী হওয়ার কারণে তা থেকে বেঁচে থাকা দরকার।

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন হয় যে, যদি ঘটনাচক্রে মুসলমান মদ ও শূকরের মালিক হয়ে যায় তাহলে সে এগুলোকে কি করবে? এর উত্তরে গ্রন্থকার বলেন, এতাবস্থায় মুসলমান মদকে সিরকা বানিয়ে তা ব্যবহার করতে পারে। আর শূকরকে অজ্ঞান গভবোর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিবে। আর যদি এগুলো বিক্রি করা হয় আর মুসলমান তার মূল্যের মালিক হয় তাহলে সে তা দান-সদকা করে দিবে। কেননা, শূকর ও মদের বিনিময়ে অর্জিত হওয়ার কারণে এতে অবৈধতা সৃষ্টি হয়েছে আর যে অর্থ তোলা করা অবৈধ হয় তা সদকা করা ওয়াজিব।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَبْتِغِيَ الْمُشْتَرِيَ أَوْ يُدِيرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ أَمَدًا عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِيَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ وَشَرْطٌ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، ثُمَّ جُمِلَ الْمَذْهَبُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ شَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي لَا يَفْسِدُ الْعَقْدَ لِثُبُوتِهِ بِذَوْنِ الشَّرْطِ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِحْقَاقِ يَفْسِدُهُ، كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الْمُشْتَرِيَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَارِيَةً عَنِ الْعَوِضِ، فَيُؤَدَّى إِلَى الرِّبَا، أَوْ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِسَبَبِهِ الْمُنَازَعَةُ فَيَغْري الْعَقْدُ عَنْ مَقْصُودِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَارَفًا، لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَوْ كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا مَنْفَعَةٌ فِيهِ لِأَحَدٍ لَا يَفْسِدُهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ، كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الْمُشْتَرِيَ الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ، لِأَنَّهُ إِنْ عَدِمَتِ الْمَطَالَبَةُ، فَلَا يُؤَدَّى إِلَى الرِّبَا وَلَا إِلَى الْمُنَازَعَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কেউ যদি এ শর্তে দাস বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাকে মুক্ত করে দিবে, বা মুদাক্কর বানাবে কিংবা মুকাতাব বানাবে। অথবা দাসী বিক্রি করে এই শর্তে যে, ক্রেতা তাকে উম্মে ওলাদ বানাবে, তাহলে এ বিক্রি ফাসিদ হবে। কেননা, এটা হলো শর্তযুক্ত বিক্রি। অথচ মহানবী ﷺ শর্তযুক্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের মূলনীতি হলো, যেসব শর্ত বিক্রয়চুক্তির চাহিদা মুতাবিক হয়, যেমন ক্রেতার জন্য মালিকানার শর্ত করা, এর দ্বারা চুক্তি বাতিল হবে না। কেননা, এগুলো তো শর্ত করা ছাড়াই সাব্যস্ত হয়। আর যে সব শর্ত বিক্রয়চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী না হয় এবং এতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের কোনো এক পক্ষের অথবা চুক্তিকৃত পণ্যের স্বার্থ আছে এবং পণ্যটিও স্বার্থ ভোগ করার যোগ্যতা সম্পন্ন, তাহলে এমন শর্ত চুক্তিকে ফাসিদ করে দিবে। যেমন শর্ত হলো যে, ক্রেতা বিক্রয়কৃত দাসটি বিক্রয় করতে পারবে। কেননা এতে বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত হয়েছে। ফলে তা সুদ জন্ম দিবে। অথবা এর কারণে বিবাদ ও ঝগড়া সংঘটিত হবে। আর তখন বিক্রয়চুক্তি তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে কোনো শর্ত যদি প্রচলিত বিষয় হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা, প্রচলন কিয়াসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। আর যদি শর্ত বিক্রয় চুক্তির চাহিদা মুতাবিক না হয় এবং তাতে কোনো পক্ষের স্বার্থ না থাকে তাহলে তা বিক্রয়-চুক্তিকে ফাসিদ করবে না। এটাই আমাদের মাযহাবের স্পষ্ট বক্তব্য। যেমন এ শর্ত করা যে, ক্রেতা বিক্রীত জন্তুটি বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, এতে পশুর পক্ষ থেকে কোনো দাবি নেই, ফলে এটা সুদ কিংবা বিবাদ কিছুই সৃষ্টি করবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَغُتَّقَ الْخ : উক্ত ইব্বারাত ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দেওয়া। শর্ত জুড়ে বেচা-কেনা করলে তা ফাসিদ হয়ে যায়। তবে যে কোনো শর্ত জুড়লেই ফাসিদ হয় না; বরং এ ব্যাপারে কিছু মূলনীতি রয়েছে যা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে লেখক কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে শর্ত করার বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছেন। যেমন কোনো ব্যক্তি নিজ দাস এ শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা তার দাসটি মুক্ত করে দিবে, কিংবা মুদাক্কার বানাবে অথবা মুকাতাব বানাবে। অথবা কেউ নিজ দাসী এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা দাসীটিকে উম্মে ওলাদ বানাবে। লেখক বলেন, এসব শর্ত দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। ফাসিদ হওয়ার কারণ এই যে, এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এতে সুদের উপস্থিতি রয়েছে। এ জাতীয় বিক্রয়কে بَيْعٌ مَعَ شَرْطٍ অর্থাৎ, শর্তযুক্ত বিক্রয় বলা হয়। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে মু'জামে তাবারানীর বরাতে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়, হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَرَجَدْتُ بِهَا أَبَا حَنِيفَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شَبْرَمَةَ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا وَشَرَطَ شَرْطًا فَقَالَ الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شَبْرَمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثَةً مِنْ فَعَالٍ الْإِمْرَاقِ اخْتَلَفُوا فِي مَسْئَلَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَاتَّيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا قَالَا حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ.

অর্থাৎ আব্দুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ মক্কায় আগমন করে বিখ্যাত তিন ফকীহ আবু হানীফা (র.), ইবনে আবু লায়লা ও ইবনে সিবরুমার সাক্ষাৎ করেন এবং শর্তযুক্ত বিক্রির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তারপর তিনি তিনজন থেকে তিন ধরনের বক্তব্য। এরপর তিনি আবু হানীফা (র.)-কে তার মতের পক্ষে প্রমাণ চাইলে তিনি রাসূল ﷺ-এর হাদীস পেশ করেন। যাতে রাসূল ﷺ শর্ত যুক্ত বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেন। এর দ্বারা এও বুঝা যায় যে, বিক্রয় বাতিল এবং শর্তও বাতিল, আর ইবনে আবু লায়লা তাঁর অভিমতের সপক্ষে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল দেন। হাদীসটি এই :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْرَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَعْيَقَهَا .

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিক্রয় বৈধ আর শর্ত বাতিল। এরপর ইবনে সিবরুমা তার মতের পক্ষে হাদীস পেশ করেন, عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْعٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً وَشَرَطَ لِي حَمَلَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শর্তসহ বিক্রয় বৈধ এবং শর্তও বৈধ।

হিদায়ার লেখক বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মায়হাবের সারকথা হচ্ছে- বিক্রয় চুক্তির মধ্যে যে সব শর্ত করা হয় তা মোটামুটি তিন ধরনের- ১. এমন শর্ত যা চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী হয়। ২. এমন শর্ত যা চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং এর দ্বারা কোনো চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো এক পক্ষের কিংবা বিক্রীত-পণ্যের স্বার্থ রক্ষিত হয়। ৩. এমন শর্ত যা চুক্তির পরিপন্থি, কিন্তু এর দ্বারা কোনো দুই পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষের কিংবা পণ্যের কোনোরূপ স্বার্থ জড়িত থাকে না।

এ তিন ধরনের শর্তের মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত বিক্রয়চুক্তিতে থাকলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম ও তৃতীয় শর্ত থাকে তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে না।

১. প্রথম শর্তের ব্যাখ্যা : এরূপ শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদা মুতাবিক ও অনুযায়ী হয় অর্থাৎ শর্ত করার দ্বারা সেই উপকার পাওয়া যায়, যা শর্ত করা ছাড়া এমনিতেই শর্তবিহীন চুক্তি দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন কোনো ক্রীতাদাসকে এই শর্তে বিক্রি করা যে, ক্রেতা উক্ত ক্রীতাদাসের মালিক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, যদি এ শর্ত নাও করা হতো তাবুও ক্রেতা দাস কেনার সাথে সাথেই দাসের মালিক হয়ে যেত। অথবা শর্ত করা হলো যে, দাস কেনার পর ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করবে, কিংবা ক্রেতা বলল, আমি দাস এই শর্তে ক্রয় করছি যে, বিক্রেতা আমাকে দাসটি হস্তান্তর করবে। দুটি শর্তও এমন যে, যদি শর্ত না করা হতো তাবুও ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করতে এবং বিক্রেতা দাস হস্তান্তর করতে বাধ্য হতো। এ জাতীয় শর্ত বৈধ এবং

এ জাতীয় শর্ত একটা অতিরিক্ত বিষয়, যা করা বা না করা উভয়ই সমান। কেউ যদি আপত্তি করে যে, রাসূল ﷺ তো মৃতলাকভাবে বিক্রয়ে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ-এর হাদীস মতে তো এ জাতীয় শর্তও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অথচ এ জাতীয় শর্ত বৈধ। এর উত্তর এই যে, এটা প্রকৃতপক্ষে শর্তই নয়। কারণ, শর্ত বলা হয় এমন কিছু যা দ্বারা নতুন কোনো কিছু আবশ্যক হয়। অথচ এই শর্তগুলো এমন অর্থ দিচ্ছে যা সাধারণ বিক্রয়চুক্তিতে বিদ্যমান। সুতরাং এগুলো শর্ত করা বা না করা উভয়ই সমান।

## ২. দ্বিতীয় শর্তের ব্যাখ্যা :

ক. এমন শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং শর্ত করার দ্বারা ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কিংবা বিক্রীত ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা হয়। যেমন বিক্রেতা দাস বিক্রি করল এই শর্তে যে, ক্রেতা এ দাসটি বিক্রি করতে পারবে না। এই শর্তের মধ্যে বিক্রীত দাসের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে। কারণ, দাস বিভিন্ন লোকের দাসত্ব গ্রহণ করা পছন্দ করে না। বরং এক লোকের অধীন থাকটাই বেশি পছন্দ করে। এখানে দাস তার শর্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার পাওয়ার জন্য দাবিও করতে সক্ষম।

আরেকটি উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি দুগ্ধ কিনল এই শর্তে যে, বিক্রেতা এটাকে সেলাই করে দিবে। এ শর্তের দ্বারা ক্রেতার স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে। অথবা কেউ বাড়ি বিক্রি করল এই শর্তে যে, বিক্রেতা বাড়িটিতে একমাস থাকবে, তারপর ক্রেতার হাতে বাড়িটি অর্পণ করবে। এই শর্তটি দ্বারা বিক্রেতার স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে। উপরের তিন উদাহরণে শর্তগুলোর কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে, ফাসিদ হওয়ার কারণ হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন তাদের পণ্য ও মূল্য বিনিময় করল তখন তাদের এই বিনিময় শর্তবিহীন হলো এবং শর্ত বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হলো না; বরং তা বিনিময়ের অতিরিক্ত বলে গণ্য হলো। আর বিনিময়ের অতিরিক্ত যে কোনো বস্তু বা বিষয় সুদ বিবেচিত হয়। এখানে শর্তের কারণে উক্ত সুদ আবশ্যক হচ্ছে। আর সুদ হলো অবৈধ ও হারাম। আর যে বিষয়ের দ্বারা হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয় তাও হারাম ও অবৈধ বলে গণ্য হয়। উক্ত অবৈধ শর্ত যুক্ত হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তি অবৈধ বলে গণ্য হয়।

অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ জাতীয় শর্তের কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। বিক্রয়চুক্তি উভয়ের সন্তুষ্টিক্রমে সম্পাদন হওয়া আবশ্যক। যেখানে ঝগড়া উদ্ভূত হয় সে বিক্রি অবৈধ বলে গণ্য হয়। আর লেন-দেনের উদ্দেশ্য হলো কোনো বিবাদ ছাড়া পণ্য ইত্যাদি বিনিময় করা।

খ. এমন শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং এর দ্বারা ক্রেতা বা বিক্রেতার স্বার্থ হাসিল হয়। কিন্তু শর্তটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও প্রচলিত। অর্থাৎ, সর্বস্তরের লোকজন এরূপ শর্তের সাথে কেনাবেচা করে। যেমন কেউ জুতা এই শর্তে খরিদ করল যে, বিক্রেতা এতে ফিতা লাগিয়ে দিবে। অথবা মাছ এই শর্তে খরিদ করল যে, বিক্রেতা মাছের জন্য পলিধিন দিয়ে দিবে। এ ধরনের শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। কেননা, যে বিষয় সামাজিকভাবে প্রচলিত তা অনেকটা শরিয়তের দলিলের মতো। তবে শর্ত এই যে, সামাজিক প্রচলন শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হতে হবে। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর বক্তব্য হচ্ছে—**مَرَأَةُ الْمُسْلِمِ حَسَنَةٌ فَهَوَّ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ** অর্থাৎ, মুসলিম সম্প্রদায় যাকে উত্তম মনে করে, তা আদ্যাহর কাছেও উত্তম। অথবা আমরা বলব, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া হচ্ছে ‘ইজমা’। আর ইজমা হলো শরিয়তের দলিল। সুতরাং সামাজিক প্রচলন যদি কিয়াসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়, তাহলে **عرف** বা সামাজিক প্রচলনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, এই ভিত্তিতে যে, সামাজিক প্রচলনের গ্রহণযোগ্যতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিংবা বলব, সামাজিক প্রচলন হলো “ইজমা”। ইজমা ও হাদীস কিয়াসের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পাবে।

গ. তৃতীয় শর্তের ব্যাখ্যা : তৃতীয় প্রকারের শর্ত হচ্ছে— এমন শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি, কিন্তু এর সাথে কোনো পক্ষের স্বার্থ জড়িত নেই। যেমন বিক্রেতা শর্তারোপ করল যে, ক্রেতা তার গরুটি অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে পারবে না। এ জাতীয় শর্তের ক্ষেত্রে জাহেদী মাযহাব হচ্ছে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হবে। তবে এ প্রকারের শর্ত অনর্থক। এর প্রতি জরুজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ শর্তের কারণে গরুর পক্ষ থেকে কোনো আবদার-দাবি আসবে না। সুতরাং এতো সুদের অর্থ পাওয়া যাবে না এবং এর কারণে কোনো বিবাদও লাগবে না। অথচ এ দুটি বিষয়ই বিক্রয়চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং অবৈধ করে দেয়। যেহেতু এ দুটি বিষয় অনুপস্থিত তাই বিক্রয় শুদ্ধ হবে। তবে এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ জাতীয় শর্ত করলেও তা বিক্রয়চুক্তি বাতিল তথা ফাসিদ করে দিবে।

إِذَا ثَبَتَ هَذَا تَقُولُ : هَذِهِ الشُّرُوطُ لَا يَفْتَضِيهَا الْعَقْدُ ، لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ الْإِطْلَاقُ فِي التَّصَرُّفِ وَالتَّخْيِيرِ لَا الْإِلْزَامَ حَتْمًا ، وَالشَّرْطُ يَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالشَّافِعِيُّ (رح) وَإِنْ كَانَ يَخَالِفُنَا فِي الْعِنَقِ وَيَقْبِسُهُ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ نَسَمَةً فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَتَفْسِيرُ الْبَيْعِ نَسَمَةً أَنْ يُبَاعَ مَنْ يُمْرُ أَنْهُ يُعْتَقُ ، لَا أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ ، فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِنَقِ صَحَّ الْبَيْعُ ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) ، وَقَالَ : يَبْقَى فَاسِدًا ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِيَمَةُ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا ، كَمَا إِذَا تَلَفَ بِوَجْهِ آخَرَ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّ شَرْطَ الْعِنَقِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا يَلِإِ نِمْ الْعَقْدُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ حُكْمِهِ يُلَإِئِمَّةُ ، لِأَنَّهُ مِنْهُ لِلْمَلِكِ ، وَالشَّيْءُ بِأَنْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ ، وَلِهَذَا لَا يَمْنَعُ الْعِنَقُ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ، فَإِذَا تَلَفَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُلَإِئِمَّةُ ، فَيَتَقَرَّرُ الْفَسَادُ ، وَإِذَا وَجِدَ الْعِنَقُ تَحَقُّقَتِ الْمُلَإِئِمَّةُ ، فَتَرْجَعُ جَانِبُ الْجَوَازِ ، فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْقُوفًا .

অনুবাদ : যখন এটি সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলব, [মূল পাঠে উল্লিখিত] এই শর্তগুলোকে বিক্রয়চুক্তি চায় না। কেননা, বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য দাবি হলো, ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান, জবরদস্তিমূলক দায় আরোপ নয়, অথচ আরোপিত শর্ত জবরদস্তিমূলক দায়কেই দাবি করে এবং এতে বিক্রীত-পণ্যের স্বার্থ বিদ্যমান। ইমাম শাফেয়ী (র.) আজাদ করার শর্তের ব্যাপারে যদিও আমাদের বিপক্ষে মত পোষণ করেন এবং তিনি মাসআলাটিকে ক্রীতদাসের সত্তা বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেন, কিন্তু আমরা যে দলিল উল্লেখ করেছি তা তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ। [ক্রীতদাসের সত্তা বিক্রয়] এর ব্যাখ্যা এই যে, ক্রীতদাস এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা যার সম্পর্কে জানা যায় যে, সে দাসটি মুক্ত করে দিবে। মুক্ত করার শর্ত করে বিক্রি করা নয়। যদি ক্রেতা আজাদ করে দেওয়ার শর্তে খরিদ করার পর আজাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় শুদ্ধ ও বৈধ হয়ে যাবে এবং তার উপর মূল্য আদায় করা আবশ্যিক হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বিক্রয় ফাসিদরূপে বহাল থাকবে সুতরাং ক্রেতার উপর বাজার মূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হবে। কেননা, বিক্রয় ফাসিদরূপে সম্পাদিত হয়েছে, তাই তা বৈধ অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে না। যেমন দাসটি অন্যভাবে নষ্ট হয়ে গেলে তা বৈধ হিসেবে রূপান্তরিত হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- আজাদ করার শর্ত সত্ত্বগতভাবে বিক্রয়চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। তবে হুকুমের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, এটা মালিকানাকে সম্পূর্ণ করে দেয়। আর যে কোনো বস্তু সম্পূর্ণ হলে স্থিতিশীল হয়। এ কারণেই মুক্তিদান দোষজনিত ক্ষতিপূরণ গ্রহণে বাধা দেয় না। আর

যদি অন্য কোনো কারণে বিনষ্ট হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য সাব্যস্ত হয় না। ফলে বিক্রয়ের মধ্যে ফাসাদ স্থিত হয়ে পড়ে। আর যখন মুক্তি দান পাওয়া গেল, তখন বিক্রয়চুক্তির সাথে মুক্তি দানের শর্তের সামঞ্জস্য সাব্যস্ত হলো ফলে বৈধতার দিকটি প্রাধান্য লাভ করল। তাই মুক্তি দানের পূর্বে বিক্রয়চুক্তি অবস্থাপ্তি মূলতবী থাকবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا نَبَتْ هَذَا فَقَرُّ الْعِلْق: উপরিউক্ত ইবারতে হিদায়ার লিখক পূর্ববর্তী আলোচনার বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী ইবারতে শর্ত সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মূল ইবারতে যে শর্তগুলি উল্লেখ করা হয়েছে এর সবগুলোই বিক্রয়চুক্তির পরিপন্থী। কেননা, বিক্রয়চুক্তির দাবি হলো বিক্রতার মূল্যের উপর ও আর ক্রেতার পণ্যের উপর যথেষ্ট ব্যবহারে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিঃশর্ত অধিকার লাভ হওয়া। বিক্রয়চুক্তির দাবি নয় যে, ক্রেতার উপর মুক্তি দেওয়া ইত্যাদি আবশ্যক হতে হবে। অথচ শর্তের দাবি হলো ক্রেতা দাসমুক্তি দিক এবং শর্ত মুতাবিক অন্যান্য কাজগুলো সম্পাদন করুক। আর এ শর্তের মধ্যে বিক্রীত দাসের উপকারিতাও বিদ্যমান। সুতরাং চুক্তির দাবি ও শর্তের দাবির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এ দুটির মধ্যে থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমরা উভয়ের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে বলেছি যে, এ বিক্রয় ফাসিদ। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে এটা শরিয়তসম্মত হলেও গুণগতভাবে এটা শরিয়তসম্মত নয়। আর এ কারণেই বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ। ইমাম শাফেয়ী (র.) মুদাক্কার বানানোর শর্ত, মুকাতাব করার শর্ত ও দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর শর্তের ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত অর্থাৎ এসব শর্তের কারণে তার মতেও বিক্রয় ফাসিদ হবে। কিন্তু দাসকে মুক্তি দেওয়ার শর্তের ব্যাপারে তার ভিন্নমত রয়েছে। যেমন তার থেকে বর্ণিত আছে যে, মুক্তি দেওয়ার শর্ত করা সত্ত্বেও বিক্রয় বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.) দাসমুক্তির শর্তকে بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَنَةً [দাসকে এমন কারো কাছে বিক্রি করা যে, তাকে আজাদ করে দিবে] এর উপর কিয়াস করেন। بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَنَةً -এর একটি ব্যাখ্যা মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত এভাবে যে, দাসমুক্তি দানের শর্তে দাসকে বিক্রি করা। তখন ইমাম শাফেয়ী مَقْبُوسٌ عَلَيْهِ وَ مَقْبُوسٌ -এর উপর এ আপত্তি হবে যে, তাহলে তো بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَنَةً لَا يَمُومُ হলো। তবে হিদায়ার লেখকের بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَنَةً -এর বর্ণিত সংজ্ঞা দ্বারা কোনো আপত্তি আসবে না। তিনি বলেছেন যে, بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَنَةً -এর অর্থ হলো এমন ব্যক্তির কাছে দাস বিক্রি করা, যার ভাবসাব দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে দাসটি ক্রয় করেই মুক্ত করে দেবে অর্থাৎ সে মুক্ত করার জন্যই কিনছে। তবে তাকে মুক্ত করতে হবে এমন শর্ত দিয়ে বিক্রি করা নয়।

লেখকের সংজ্ঞা অনুসারে ইমাম শাফিযী (র.)-এর কিয়াস যথার্থ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল রূপে কেউ কেউ হযরত বারিরা (রা.) সম্পর্কিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস পেশ করেন- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ أَنْ أُتْرِكَ بَرْتُهُ فَأَتَيْتُهَا -এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ আজাদ করার শর্তে ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং আজাদ করার শর্তে বিক্রি করা বৈধ। এ হাদীসের জবাব হচ্ছে হযরত আয়েশা (রা.) রাবিরাকে মুক্তি দেওয়ার শর্তে ক্রয় করেননি, বরং তিনি কোনো শর্ত ছাড়াই ক্রয় করেছিলেন। তবে তিনি হযরত বারিরাকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাতে তিনি বিক্রয়ে রাজি হয়ে যান। কেননা, বারিরা তার মনিবের সাথে চুক্তিপত্র করে ফেলেছিল যে, এত টাকা দিলে তারা তাকে মুক্ত করে দিবেন। নিয়মানুযায়ী মুকাতাবের বিক্রি তার সত্ত্বাষ্টি ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। তাই তাকে সত্ত্বাষ্টি করার জন্য মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) তাকে ক্রয় করে তার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছিলেন, তাছাড়া আমাদের বর্ণিত হাদীস رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ وَرَثَتِهِ স্পষ্টভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল এবং তাছাড়া আমাদের বর্ণিত যুক্তিও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিরুদ্ধে দলিল।

উল্লেখ্য যে, **الْمُسْكَنُ** শব্দটির অর্থ হলো মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে দাসকে পেশ করা হয়েছে। **الْمُسْكَنُ** শব্দটি মুক্ত করার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, **فَكَ الرِّقَّةُ وَأَعْتَبِي السَّكَّةَ**, তাই এখানে এ মুক্ত করার অর্থে **الْمُسْكَنُ** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এর পূর্বের মাসআলা হলো, যদি কেউ মুক্ত করার শর্তে দাস বিক্রি করে আর ক্রেতা উক্ত শর্তের সাথে কিনে দাসটিকে আজাদ করে দেয়, তাহলে তার মুক্তিদান সঠিক হবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর অভিমত হলো, বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার মুক্ত করাও শুদ্ধ হবে। বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার কারণেই ক্রেতার উপর তাদের ধার্যকৃত মূল্য (**ثَمَنٌ**) প্রদান করা আবশ্যিক হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, তার বিক্রয় পূর্বাবস্থার ন্যায় ফাসিদই থাকবে। এ কারণে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য (**فَيْسَنٌ**) প্রদান করা আবশ্যিক হবে। কেননা বিক্রয় ফাসিদ হলে বাজার মূল্য আবশ্যিক হয়।

সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, বিক্রয়ের শর্ত ছিল চুক্তিবিরোধী ও এর পরিপন্থি। তাই বিক্রয়চুক্তি প্রথমেই ফাসিদ হয়ে যায়। নিয়মানুসারে (**الْفَيْسَدُ لَا يَنْفَعُ جَائِزًا**) ফাসিদ কখনো জায়েজ রূপান্তরিত হতে পারে না। এর উদাহরণ এই যে, যদি দাসটি মুক্ত না হয়ে অন্যভাবে ধ্বংস কিংবা হাত ছাড়া হয়ে যেত যেমন ক্রেতা সেটাকে নিজ আয়ত্তে নেওয়ার পর মরে গেল কিংবা পালিয়ে চলে গেল, তখন বিক্রয় ফাসিদ রূপেই বহাল থাকে এবং ক্রেতার উপর বাজার মূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হয়। তদ্রূপ ক্রেতা দাসকে মুক্ত করে দিলে তার উপর বাজার মূল্য আবশ্যিক হবে এবং বিক্রয়চুক্তি ফাসিদরূপে বহাল থাকবে। এমনিভাবে তাদের মতে যদি মুদাক্কার অথবা মুকাত্ভা বানানোর শর্তে কিংবা দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর শর্তে বিক্রি করে, আর সেই শর্তসমূহ পূরণ করে তবুও বিক্রি ফাসিদরূপেই বহাল থাকবে। জায়েজ রূপান্তরিত হবে না। ক্রেতার উপর বাজার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, বিক্রয়ের মধ্যে আজাদ করার শর্তারোপ করা সত্তাগতভাবে বিক্রয়চুক্তির সাথে সাম্য সম্পূর্ণ নয়। এ বিষয় ইতিপূর্বে আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যে, আজাদ করে দেওয়ার শর্ত ক্রেতার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ। কেননা, বিক্রয়চুক্তির দাবি হলো ক্রেতার নিঃশর্ত অধিকার ও স্বেচ্ছাব্যবহারের স্বাধীনতা, আর শর্তারোপের দ্বারা সেই স্বাধীনতা বাহত হয়। আজাদীর শর্তারোপ করা তাই সত্তাগতভাবে চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে হকুম হিসেবে আজাদ করার শর্ত চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, আজাদকরণ ক্রেতার মালিকানা সমাপ্ত করে দেয়। আর যে বস্তু তার সমাপ্তিতে পৌছে তা স্থিতিশীল হয়ে যায়। তাই ক্রেতা দাসকে মুক্ত করে দেওয়ার পর যদি তার কোনো ক্রটি সম্পর্কে অবহিত হয়, তাহলে ক্রেতা বিক্রোতা থেকে ক্রটির ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারে। তার এই অধিকার এ কথাই প্রমাণ করে যে, তার মালিকানা নিঃশেষ হয়নি, বরং চূড়ান্তে পৌছে স্থিতিশীল হয়েছে। কিন্তু যদি অন্যভাবে দাস হাতছাড়া হয় যেমন, দাসটি মারা গেল বা নিহত হলো কিংবা ক্রেতা বিক্রি করে দিল বা দান করে দিল, তখন ক্রেতা তার কোনো ক্রটি সম্পর্কে জানতে পারলেও তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে না। তাহলে অন্যভাবে হাত ছাড়া হওয়া ও আজাদ করে দেওয়া এক নয়। তাই একটিকে অন্যটির উপর কিয়দাস করা ঠিক নয় এবং এও বুঝা গেল যে, অন্যভাবে নষ্ট হলে তাতে মালিকানা থাকে না। তবে আজাদ করার পরও মালিকানা নিঃশেষ হয় না; বরং তা অবশিষ্ট থাকে।

তাহাড়া আজাদির শর্ত করার পর আজাদ করলে তাতে মালিকানা স্থিতিশীল হয়, পক্ষান্তরে ফাসিদ হলে তার কোনো স্থিতিশীলতা থাকে না। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আজাদ করার পর সেটা সহীহরূপে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অন্য কোনোভাবে হাতছাড়া হলে তা সহীহরূপে রূপান্তরিত হয় না, বরং এতে ফাসাদ আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং যখন দাসটিকে আজাদ করা হলো তখন শর্তটি চুক্তির অনুযায়ী হলো এবং অবৈধতার উপর বৈধতা প্রাধান্য লাভ করল। মুক্তিদানের পূর্বে বিক্রয়চুক্তি মূলতবি ছিল, অর্থাৎ যখন আজাদ করার শর্তে দাস বিক্রি করা হলো তখন বিক্রয় বৈধতা ও অবৈধতার মাঝে সোদৃশ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় দাস যদি আজাদ না করে অন্যভাবে বিনষ্ট বা হাতছাড়া হয়ে যেত তাহলে ফাসিদ হওয়ার বিষয় স্থির হয়ে যেত। কিন্তু যদি ক্রেতা দাসটি মুক্ত করে দেয় তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوَبَّاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ الْبَائِعُ شَهْرًا أَوْ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا  
أَوْ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُشْتَرِي دِرْهَمًا أَوْ عَلَى أَنْ يُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةً ، لِأَنَّهُ شَرَطَ لَا يَقْتَضِيهِ  
الْعَقْدُ ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ (ع) نَهَى عَنِ بَيْعِ وَسَلْفٍ ، وَلِأَنَّهُ  
لَوْ كَانَ الْخِدْمَةُ وَالسُّكْنَى يُقَابِلُهُمَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ يَكُونُ إِجَارَةً فَبَيْعٌ ، وَلَوْ كَانَ  
لَا يُقَابِلُهُمَا يَكُونُ إِعَارَةً فَبَيْعٌ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ (ع) عَنِ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তদ্রূপ [বিক্রয়-চুক্তি ফাসিদ হবে] যদি কেউ ক্রীতদাস এই শর্তে বিক্রি করে যে, বিক্রেতা তার থেকে একমাস খিদমত গ্রহণ করবে। অথবা বাড়ি বিক্রি করে এই শর্তে যে, বিক্রেতা তাতে বাস করবে, কিংবা এ শর্তে যে, ক্রেতা তাকে এক দিরহাম ঋণ দিবে অথবা তাকে কোনো উপটোকন প্রদান করবে। কেননা, এগুলো চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী শর্ত নয় এবং এতে দু'পক্ষের কোনো এক পক্ষের স্বার্থ রয়েছে। আর এ কারণে যে, রাসূল ﷺ ঋণসহ বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করেছেন। আর এ কারণে যে, যদি খিদমত ও বসবাসের বিনিময়ে মূল্যের একটা অংশ নির্ধারিত হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তির সাথে ইজারা প্রদান করা হলো। আর যদি খিদমত ও বসবাসের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ নির্ধারিত না থাকে, তাহলে বিক্রয়চুক্তির সাথে বিনিময়হীন ব্যবহারানুমতি প্রদান করা হল। অথচ রাসূল ﷺ এক চুক্তির মধ্যে দুই চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوَبَّاعَ عَبْدًا عَلَى : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বে আলোচিত বিক্রয়ের মধ্যে অন্যাক্ষিক্ত শর্তাদিকে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে এবং এগুলোর ফাসিদ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরতে মাসআলা : কোনো ব্যক্তি একটি দাস এই শর্তে বিক্রি করল যে, দাসটি একমাস বিক্রেতার খিদমত করবে। অর্থাৎ সে বিক্রীত-পণ্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার শর্ত করল। অথবা বিক্রেতা বাড়ি বিক্রি করল এই শর্তে যে, বিক্রীত বাড়িটিতে সে একমাস থাকবে অথবা বিক্রেতা কোনো কিছু এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা তাকে এক দিরহাম ঋণ দিবে কিংবা এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা তাকে কিছু উপহার-উপটোকন প্রদান করবে। এসব শর্ত করলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। এর ফাসিদ হওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন।

১. এ শর্তাবলি বিক্রয়ের চাহিদা অনুযায়ী তো হয়ইনি; বরং এগুলো বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী এবং এগুলো দ্বারা কোনো এক পক্ষের [এখানে বিক্রেতার] স্বার্থ রয়েছে। আর ইতঃপূর্বে মূলনীতি আকারে বলা হয়েছে যে, যেসব শর্ত চুক্তির পরিপন্থী এবং এতে কোনো পক্ষের স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে তা বিক্রয়কে বাধাগ্রস্ত করে এবং ফাসিদ করে দেয়। তাই এসব শর্তের বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

২. অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بَيْعِ وَسَلْفٍ .



আরেকটি হাদীস এই-

رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَالٌ يَضُمُّ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

উপরিসৃত দু'টি হাদীস দ্বারা রাসূল ﷺ কোনো শর্তসহ বিক্রয় চুক্তি করতে এবং ঋণসহ বিক্রয়চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ এমন বিক্রয় যাতে বিক্রয়ের সাথে এই শর্ত থাকবে যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে ঋণ দিবে। এ হাদীস তৃতীয় শর্তটির ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল।

৩. অবৈধ হওয়ার তৃতীয় দলিল এই যে, দাসের থেকে একমাস খিদমত নেওয়ার শর্ত অথবা বাড়িতে একমাস থাকার শর্তকে দু'ভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে-

ক. বিক্রেতা একমাস থাকবে বা খিদমত নিবে এর বিনিময়ে মূল্যের একটা অংশ নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ মূল্য ধরা হলো এক হাজার টাকা, এর মধ্য থেকে আটশ টাকা বিক্রয় মূল্য, আর বাকি দু'শ টাকা থাকার বা খিদমতের বিনিময়।

খ. অথবা বিক্রেতা বাড়িতে একমাস থাকবে অথবা খিদমত নিবে এর বিনিময়ে মূল্যের একটা অংশ নির্ধারিত থাকবে না। বরং বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকার প্রদানের অনুমতি হিসেবে সেটাকে গ্রহণ করবে।

প্রথম সুরতে তার সুবিধা গ্রহণ হলো ইজারা বা ভাড়া হিসেবে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকার প্রদান হিসেবে, যাই হোক না কেন তা বিক্রয়চুক্তির সাথে হচ্ছে অর্থাৎ বিক্রয়ের সাথে বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকারের অনুমতি কিংবা বিক্রয়ের সাথে ইজারা-চুক্তি। অথচ রাসূল ﷺ এক লেন-দেনের মাঝে অন্য লেন-দেন যুক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

নিষেধের হাদীসটি এই-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ .  
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বাড়িতে অবস্থান করা কিংবা দাস থেকে খিদমত গ্রহণ করার [বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকারে অনুমতি বা ইজারা হিসেবে] শর্তারোপ করার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلَى أَنْ لَا يَسْلِمَهُ إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ قَاسِدٌ ، لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْمَبِيعِ الْعَيْنِ بَاطِلٌ ، فَيَكُونُ شَرْطًا قَاسِدًا ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَجَلَ شُرْعٌ تَرْفِيهَا ، فَيُلْطَقُ بِالذُّبُونِ دُونَ الْأَعْيَانِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কেউ কোনো জিনিস এই শর্তে বিক্রি করে যে, মাস শেষের পূর্বে তা অর্পণ করবে না, তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। কেননা, বিক্রীত নগদ বস্তুর ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণ করা বাতিল। সুতরাং এটা একটা ফাসিদ শর্ত হবে। আর এ ধরনের মেয়াদ বাতিল হওয়ার কারণ হলো, শরিয়তে মেয়াদ গ্রহণকে অনুমোদন করেছে লেন-দেন সহজ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এ সহজীকরণ দায়ন [স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা ইত্যাদি]-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তির মধ্যে মেয়াদ গ্রহণ করা যায় বিক্রীত বস্তু যদি দায়ন জাতীয় হয়, আর ঐ বিক্রীত-পণ্য যদি আইন হয় তাহলে তাতে মেয়াদ নেওয়া যায় না।

প্রথমতঃ আমাদের অَدِين ও عَيْن -এর পরিচয় জানতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা ছাড়া যাবতীয় বস্তুকে আইন বলা হয়। আইন এর শাব্দিক অর্থ বস্তু বা জিনিস।

আর স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা দায়ন বলা হয় এগুলোকে বস্তুর মূল্যরূপে ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে নির্দিষ্ট করা যায় না।

মাসআলা : কেউ যদি কোনো জিনিস আইন বিক্রয় করে এই শর্তে যে, তা সে চলতি মাসের শেষে কিংবা আগামী মাসের শুরুতে প্রদান করবে, তাহলে তার এই শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। এর দলিল হলো—

১. মেয়াদ এজন্যই শরিয়ত অনুমোদন করেছে, যাতে উক্ত মেয়াদের মধ্যে সেই দ্রব্য অর্জন করা যায় যার জন্য মেয়াদ নেওয়া হয়েছে। তাই মেয়াদ মুদ্রা দ্রব্যের জন্য উপযোগী। জিনিস পত্রের ক্ষেত্রে সেটা উপযোগী এবং প্রযোজ্য নয়।

২. নির্দিষ্ট জিনিসপত্র যেহেতু হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাই তার জন্য মেয়াদ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, মেয়াদ নেওয়াই হয় অনুপস্থিত বস্তু অর্জন করার জন্য। যেমন 'বাইয়ে সলমের' মধ্যে সময় নেওয়া হয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য। তাই যে দ্রব্য উপস্থিত আছে তাতে সময় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে দায়ন তথা স্বর্ণ, রূপা ও মুদ্রা প্রথমত এগুলো নির্দিষ্ট করা যায় না। দ্বিতীয়ত এগুলো মানুষ ধীরে ধীরে অর্জন করে, আর যদি এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর স্থলে অন্য স্বর্ণ, রূপা ও মুদ্রা প্রদান করলে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, হিদায়ার লেখক مَبِيع শব্দের পর عَيْن শব্দটি এ জন্য বৃদ্ধি করেছেন, যাতে বাইয়ে সলমের مُسَلَّمٌ فِيهِ -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়। কেননা, বাইয়ে সলমের মধ্যে مُسَلَّمٌ যদিও বিক্রীত-পণ্য বটে, কিন্তু সেটা আইন নয়। বরং مُسَلَّمٌ (বিক্রেতা) -এর জিম্মায় ওয়াজিব হয় এবং তা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অর্পণ করা হয়। আর এটা স্বীকৃত যে, বাইয়ে সালামের মধ্যে مُسَلَّمٌ فِيهِ অর্পণের-এর জন্য সময় নেওয়া আবশ্যিক।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً إِلَّا حَمَلَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا لَا يَصِحُّ انْفَرَادُهُ بِالْعَقْدِ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْعَقْدِ، وَالْحَمْلُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ يَمْنَزِلُهُ أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ لِاتِّصَالِهِ بِهِ خَلْقَةً، وَيَبْعُ الْأَصْلَ يَتَنَاوَلُهَا، فَالْإِسْتِثْنَاءُ يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الْمَوْجِبِ فَلَمْ يَصَحَّ، فَيَصِيرُ شَرْطًا فَاسِدًا، وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِهِ، وَالْكِتَابَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهْنُ يَمْنَزِلُهُ الْبَيْعُ، لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الْكِتَابَةِ مَا يَتِمَّكُنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْهَا، وَالْهَبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصَّلْحُ عَنْ دِمِ النِّعَمِ لَا تَبْطُلُ بِاسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ، بَلْ يَبْطُلُ الْإِسْتِثْنَاءُ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِهِ، لَكِنْ يَصَحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ، حَتَّى يَكُونَ الْحَمْلُ مِيرَاثًا وَالْجَارِيَةُ وَصِيَّةً، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أَخْتُ الْمِيرَاثِ، وَالْمِيرَاثُ يَجْرِي فِيمَا فِي الْبَطْنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتُفْتِيَ خِدْمَتُهَا، لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يَجْرِي فِيهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ গর্ভস্থ সন্তান বাদ দিয়ে শুধু কোনো দাসীকে ক্রয় করে তাহলে ক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, যে জিনিসকে স্বতন্ত্রভাবে চুক্তিবদ্ধ করা যায় না, তা বিক্রয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও যায় না। গর্ভস্থ সন্তান এ পর্যায়ভুক্ত। আর এটা এ কারণে যে, গর্ভস্থ সন্তান প্রাণীর সাথে সৃষ্টিগতভাবে যুক্ত হওয়ার কারণে তা প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পর্যায়ভুক্ত। আর মূল জিনিসের বিক্রি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্ন্তভুক্ত করে। সুতরাং সেগুলোকে পৃথক রাখা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি হবে কাজেই তা শুদ্ধ নয়। ফলে এটা ফাসিদ শর্ত হয়ে যাবে। আর ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কিতাবাত চুক্তি, ইজারা চুক্তি ও বন্ধকী চুক্তি বিক্রয়চুক্তির পর্যায়ভুক্ত। কেননা, এগুলোও অবৈধ শর্তারোপ করার দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। তবে পার্থক্য এটুকু যে, কিতাবাতচুক্তি এমন শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয়, যে শর্ত মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। হেবা, সদকাহ, বিবাহ, খোলা ও ইচ্ছাকৃত খুনের আপোষচুক্তি গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়ার দ্বারা বাতিল হয় না, বরং বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা বাতিল হয়। কেননা, এসব চুক্তি অবৈধ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না [বরং অবৈধ শর্তই বাতিল হয়ে যায়।] এমনভাবে ওসিয়ত অবৈধ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না। তবে এতে বাদ দেওয়া শুদ্ধ হয় ফলে গর্ভস্থ সন্তান উত্তরাধিকার-সম্পদরূপে গণ্য হবে, আর দাসীটি ওসিয়ত হবে। কেননা, ওসিয়ত উত্তরাধিকারী সম্পদের সমপর্যায়ের। গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যেও উত্তরাধিকারের বিধান জারি হয়। তবে যদি দাস বা দাসীর সেবাহরণকে পৃথক করা হয় সেটা বৈধ হবে না। কেননা, সেবা গ্রহণের মধ্যে উত্তরাধিকার চলে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً الْغ: উপরিউক্ত ইবারতে ফাসিদ বিক্রয়ের আরেকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে মাসআলাটির দ্বারা এও উদ্দেশ্য যে, কোন কোন দ্রব্য মূল বস্তু থেকে ইস্তিছনা বা বাদ রাখা যায়, আর কোনগুলো বাদ রাখা যায় না, তা বর্ণনা করা।

মাসআলা : কেউ একটি গর্ভবতী দাসী বিক্রয় করল, তবে সে দাসীটির গর্ভস্থ সন্তান তথা জগ্ণটিকে বিক্রয় থেকে বাদ দিল, তাহলে তার বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। ফাসিদ হওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক যা বলেন, তা এই যে, মূল বস্তু থেকে কোনো কিছু ইস্তিছনা করার তিনটি সূরত হতে পারে— ১. এমন চুক্তি যা থেকে কোনো কিছু ইস্তিছনা করার দ্বারা চুক্তি ও ইস্তিছনা উভয় বাতিল হয়ে যায়। ২. মূল বস্তুর ক্ষেত্রে চুক্তিটি সहीহ থাকে তবে ইস্তিছনা বাতিল হয়ে যায়। ৩. মূল বস্তুর ক্ষেত্রে চুক্তি ঠিক থাকে এবং এর থেকে ইস্তিছনাও শুদ্ধ হয়। প্রথম প্রকারের চুক্তিগুলো হলো বিক্রয়চুক্তি, কিতাবাত বা মালিকের সাথে দাস/দাসীর মুক্তিপণচুক্তি, ইজারাহুক্তি ও বন্ধকীচুক্তি। এর উদাহরণ হলো— ১. কেউ দাসী ক্রয় করল, কিন্তু দাসী গর্ভস্থ বাল্যকে বিক্রয় চুক্তি থেকে বাদ দিল। ২. কেউ দাসীর বিনিময়ে ঘর ভাড়া দিল, তবে দাসী থেকে তার গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দিল। ৩. কেউ তার দাসীকে অন্যের কাছে বন্ধক দিল, তবে বন্ধক থেকে দাসীর জগ্ণকে পৃথক রাখল। তদ্রূপ কেউ তার দাসের সাথে মুক্তিপণ পরিশোধের শর্তে মুক্ত করার চুক্তি করল এবং দাসের মুক্তিপণ নির্ধারণ করল একটি গর্ভবতী উটনী, তবে তার গর্ভস্থ বাল্যটি ব্যতীত ইস্তিছাদি।

উপরোক্ত উদাহরণগুলোর সবকটিতেই বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ শর্তগুলো অবৈধ। আর অবৈধ শর্ত বিক্রয়চুক্তির মধ্যে জুড়ে দিলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল তথা ফাসিদ হয়ে যায়। বিক্রয়চুক্তি ব্যতীত তিনটি চুক্তি তথা কিতাবাত, বন্ধক এবং ইজারাও যেহেতু বিনিময়চুক্তি তাই এতে বিক্রয়চুক্তির অনুরূপ হুকুম প্রদান করা হবে। ইস্তিছনা তথা পৃথকীকরণ চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি বিষয়, তাই এটা ফাসিদ ও অবৈধ শর্ত গণ্য হবে। আর অবৈধ শর্তের কারণে এসব চুক্তিগুলো বাতিল হয়ে যাবে। তবে স্মরণযোগ্য এই যে, সব বস্তুর ইস্তিছনা অগ্রাধ্য নয়। বরং ফকীহগণের পরিভাষায় এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যেসব দ্রব্য পৃথক ও স্বতন্ত্র বিক্রি করা যায় সেগুলো মূল বস্তু থেকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইস্তিছনা তথা পৃথক রাখা যায়। যেমন এক পাত্র গম পৃথকভাবে বিক্রি করা যায়, আবার একত্ব গম থেকে এক পাত্র পৃথক রাখাও যায়। পক্ষান্তরে যে বস্তু পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা যায় না, তা মূল বস্তু থেকে পৃথক রেখে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করা যায় না, জগ্ণ বা গর্ভস্থ সন্তান এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। জগ্ণ আলাদাভাবে বিক্রি করা যায় না। তাই এটাকে বিক্রয়চুক্তির মধ্যে দাসী থেকে পৃথকও রাখা যায় না। জগ্ণ আলাদাভাবে বিক্রয় করা যায় না। এর কারণ এই যে, জগ্ণ প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পর্যায়াভুক্ত। যেমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জগ্ণগতভাবে প্রাণীর সাথে যুক্ত, তেমনি গর্ভস্থ সন্তানও মায়ের সাথে জগ্ণগত ও সৃষ্টিগতভাবে যুক্ত। কোনো প্রাণী বিক্রি করা হলে তার থেকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চুক্তি থেকে পৃথক রাখা চুক্তির চাহিদার বিপরীত ও পরিপন্থি। তদ্রূপ গর্ভস্থ সন্তানকে বিক্রয়চুক্তি থেকে পৃথক রাখা চাহিদার পরিপন্থি। আর যে শর্ত বিক্রয়চুক্তির স্বাভাবিক দাবির পরিপন্থি হয়, তা ফাসিদ ও অবৈধ হয়। এ কারণে গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়া ফাসিদ ও অবৈধ হবে। ফাসিদ শর্তের অন্তর্ভুক্তির কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাই বিক্রয়চুক্তি থেকে জগ্ণকে বাদ দিলে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কিতাবাত, ইজারা ও বন্ধক যেহেতু বিক্রয়ের সমপর্যায়ের তাই এগুলোর মধ্যে এমন শর্ত করা হলে এগুলো বাতিল হয়ে যাবে।

তবে কিতাবাতের সাথে বিক্রয়ের সামান্য পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এই যে, বিক্রয়ের মধ্যে যে কোনো ফাসিদ শর্ত যুক্ত হলে চুক্তি ফাসিদ হয়। চাই সে শর্ত বিক্রয়ের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হোক কিংবা না হোক। উভয় অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। পক্ষান্তরে কিতাবাত যে কোনো ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না। বরং শর্তটি কিতাবাতের সত্তার সাথে যুক্ত হলে কেবল তখনই ফাসিদ হবে। যেমন কোনো মুসলিম মালিক তার দাসের মুক্তিপণ নির্ধারণ করল মদ কিংবা শূকরকে। এমন শর্ত করার দ্বারা কিতাবাত বাতিল হবে। অন্যথায় যদি সে এমন শর্তারোপ করে যা তার সত্তার সাথে যুক্ত নয়, যেমন কোনো ব্যক্তি তার মুকাতাবকে শর্ত দিল যে, মুকাতাব ঢাকার বাইরে যেতে পারবে না। প্রথম শর্ত ছিল চুক্তির সত্তার সাথে সম্পৃক্ত পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শর্তটি কিতাবাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এজন্য প্রথম সূরতে মুক্তিপণ চুক্তি শুদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে কিতাবাতচুক্তি ফাসিদ হবে না, শুদ্ধ হবে। মুকাতাব শর্ত অমান্য করে ঢাকার বাইরে যেতে পারবে। শর্তটি বাতিল ও অর্থহীন হয়ে যাবে। কিতাবাতের ক্ষেত্রে শর্তগত পার্থক্য হওয়ার কারণ এই যে, কিতাবাত বিক্রয় ও বিবাহ উভয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, কিতাবাত চূড়ান্ত বিচারে বিক্রয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, কারণ মুকাতাব তার মনিবের কাছে মালরূপে বিবেচিত। তাই মনিব মুকাতাবে

বিনিময়ে মুক্তিপণ লাভ করে। আবার কিতাবাত বিবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা মুকাভাব তার নিজের কাছে মাল নয়, তাই মুকাভাব মুক্তিপণের বিনিময়ে কোনো কিছুই লাভ করে না। কিতাবাতের এই দ্বৈত অবস্থার কারণে যে সব শর্ত কিতাবাতের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, সে সব শর্তের ক্ষেত্রে তাকে আমরা বিক্রয়চুক্তির সাথে যুক্ত করেছি। অর্থাৎ যেভাবে ফাসিদ শর্ত দ্বারা বিক্রয় বাতিল হয়, তেমনি কিতাবাত চুক্তি বাতিল হবে। আর যে সব শর্ত মূল সত্তার সাথে যুক্ত নয়, সেসব শর্তের বেলায় কিতাবাতকে বিবাহের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি। অর্থাৎ বিবাহ যেমনটা ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না, বরং শর্তগুলিই অর্থহীন হয়ে যায়। তেমনি এমন শর্তাদি যা কিতাবাতের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়, তার উপস্থিতিতে কিতাবাত বাতিল হবে না। বরং অবৈধ শর্তগুলোই অকার্যকর হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার এমন চুক্তিসমূহ, যাতে ফাসিদ শর্তাদি করা হলেও চুক্তি বাতিল হয় না; বরং ফাসিদ শর্তাদি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এতে এসব চুক্তিতে ইস্তিসনা করা হলে চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ইস্তিসনা বাতিল হয়ে যায়। এ প্রকারের চুক্তিগুলো হচ্ছে: হেবা, সদকা, বিবাহ-শাদী, খোলা' ও ইচ্ছাকৃত হত্যা করার পর শান্তির ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের সাথে আপোষচুক্তি। উদাহরণস্বরূপ - ১. কোনো ব্যক্তি তার গর্ভবতী দাসীটি হেবা করল, কিন্তু তার জগকে বাদ রাখল এবং এটাকে দান-হেবা করল না। ২. দাসীকে সদকা করে দিল, কিন্তু তার গর্ভস্থ সন্তানকে দান করল না ৩. দাসীকে মহর নির্ধারণ করল, কিন্তু দাসীর জগকে বাদ দিল। ৪. অথবা কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সাথে খোলা' করল একটি গর্ভবতী দাসীর বিনিময়ে, তবে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়া হলো। ৫. স্বেচ্ছায় হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের সাথে একটি গর্ভবতী দাসীর সাহায্যে আপোষ করল, তবে দাসীর গর্ভের সন্তানকে বাদ দিল। দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তিগুলোতে গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়ার যে ফাসিদ শর্ত করা হয়েছে, এর কারণে চুক্তিগুলো বাতিল হবে না। তবে এই শর্তসমূহ সবই অর্থহীন হয়ে যাবে। তবে চুক্তির মধ্যে গর্ভস্থ সন্তান এবং মা উভয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং শুধুমাত্র মা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এসব চুক্তি ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না। এর কারণ এই যে, প্রথম প্রকার অবৈধ শর্তের দ্বারা ফাসিদ হতো সুদের জন্য। অর্থাৎ শর্তগুলো সুদের অস্তিত্ব ডেকে আনত। আর আমার জানি সুদ উদ্ভব হয় শুধুমাত্র বিনিময় চুক্তিসমূহের মধ্যে, অথচ দ্বিতীয় প্রকারে উল্লিখিত চুক্তিসমূহ যথা: হেবা, সদকা, ইত্যাদি বিনিময় চুক্তি নয়; বরং এগুলো হচ্ছে স্বেচ্ছাদান ও এক পক্ষের বরচ। এতে সুদের উদ্ভব কোনোভাবেই হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু এই চুক্তিগুলোতে অবৈধতার হেতুই পাওয়া যাচ্ছে না তখন এগুলো অবৈধ শর্তের কারণে ফাসিদ হবে না। বরং অবৈধ শর্ত অকার্যকর ও অর্থহীন হয়ে যাবে। হেবা দ্বারা যদিও মালিক বানানো হয় তবু এটা অবৈধ শর্ত দ্বারা ফাসিদ না হওয়ার কারণ এই যে, হাদীসে রাসূল ﷺ: যেমন রাসূল ﷺ এই শর্তের সাথে হেবা করাকে বৈধ বলেছেন। যেমন কেউ দান গ্রহীতাকে বলল, এই গোলাম আপনার মৃত্যু পর্যন্ত আপনার জন্য। আপনার মৃত্যুর পর আমার [দাতার] কাছে দানকৃত বস্তুটি ফেরত আসবে। এধরনের শর্তের সাথে হেবা করলেও হেবা শুদ্ধ হবে এবং শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। দান গ্রহীতার মৃত্যুর পর দানকৃত বস্তুটি দাতার কাছে ফেরত যাবে না। বরং দানগ্রহীতার উত্তরাধিকারীরা সেটা পাবে। রাসূল ﷺ কর্তৃক উক্ত বৈধ শর্তের সাথে হেবাকে শুদ্ধ বলার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফাসিদ ও অবৈধ শর্ত হেবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করত পারে না। বরং অবৈধ শর্তই অকার্যকর ও বাতিল হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রকার এই যে, এমন চুক্তি যাতে উপরিউক্ত ইস্তিহনা করা সত্ত্বেও ইস্তিহনা ও চুক্তি উভয়ই শুদ্ধ হবে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ মুমূর্খ অবস্থায় তার দাসীকে এক ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করল, তবে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ রাখল, এমতাবস্থায় গর্ভকে বাদ রাখার কারণে অসিয়ত বাতিল হবে না এবং বাদ রাখাও অকার্যকর হবে। এভাবে অসিয়ত করার কারণে দাসী পাবে ঐ ব্যক্তি, আর জন্য দাসীর মালিক ওসিয়ত করেছে। আর দাসীর গর্ভস্থ সন্তান পাবে অসিয়তকারীর উত্তরাধিকারগণ। উক্ত শর্ত সত্ত্বেও অসিয়ত বাতিল না হওয়ার কারণ এই যে, অসিয়ত বিনিময়চুক্তি না। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিনিময়চুক্তি না হলে তাতে সুদের সন্ধাননা থাকে না, তাই এগুলো বাতিল হয় না। তবে শর্ত তথা ইস্তিহনা শুদ্ধ হওয়ার কারণ ভিন্ন আরেকটি বিষয়। আর তা হলো অসিয়ত হতো উত্তরাধিকারের মতো। কেননা, উভয়ের বাস্তবায়ন ও কার্যকরিতা মৃত্যুর পর। উত্তরাধিকার গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে জারি হয়। কারণ, গর্ভস্থ সন্তান অস্তিত্ববান সত্তা। যে কোনো অস্তিত্ববান সত্তাতে উত্তরাধিকার কার্যকর হয়, তাই গর্ভস্থ সন্তানে উত্তরাধিকার জারি হবে।

পাক্ষাতের কেউ যদি দাসীকে অসিয়ত করে তার সেবা গ্রহণকে ইস্তিহনা করে তাহলে এ ইস্তিহনা শুদ্ধ হবে না, কেননা, খিদমত বা সেবাগ্রহণ কোনো বস্তু নয়, যাতে উত্তরাধিকার চলবে। যার মধ্যে উত্তরাধিকার কার্যকর হয় না তা ইস্তিহনা করা যায় না, সুতরাং এমন শর্ত করা হলে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আর খিদমত ও যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সেই লাভ করবে, উত্তরাধিকারীগণ লাভ করবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَيَخِيْطَهُ قَمِيْصًا أَوْ قَبَاءً ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ، وَفِيهِ مَنَفْعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ يَصْنُرُ صَفَقَةً فِيْ صَفَقَةٍ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى نَعْلًا عَلَى أَنْ يَخْذُوهُ الْبَائِعُ أَوْ يُشْرِكَهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، قَالَ (رض) : مَا ذَكَرَهُ جَوَابُ الْقِيَاسِ ، وَ وَجْهُهُ مَا بَيْنَنَا ، وَفِي الْأِسْتِحْسَانِ يَجُوزُ لِلتَّعَامُلِ فِيهِ ، فَصَارَ كَصَبْغِ الثُّوبِ ، وَلِلتَّعَامُلِ جَوَازًا إِلَّا سِتْنَاءً .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কেউ কাপড় কিনল এই শর্তে যে, বিক্রেতা কাপড় কেটে জামা কিংবা আলখেল্লা সেলাই করে দিবে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কেননা, এটা এমন শর্ত, যা চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী হয়নি এবং এতে এক পক্ষের স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এতে এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার নিষিদ্ধতা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, যদি কেউ এই শর্তে চামড়া কিনল যে, বিক্রেতা চামড়া দ্বারা জুতা বানাবে কিংবা ফিতা বানাবে তাহলে তার বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। হিদায়ার মুসান্নিফ বলেন, ইমাম কুদুরী (র.) বর্ণনা যা করলেন তা তো কiyাসানুযায়ী এবং এর অবৈধ হওয়ার কারণও আমরা বর্ণনা করেছি। তবে ইস্তিহসান হিসেবে এটা বৈধ। কারণ, সমাজে এটা প্রচলিত। ফলে এটা কাপড় রং করে দেওয়ার শর্তে কাপড় ক্রয়ের মতো হয়ে গেল। আর প্রচলনের কারণেই আমরা কারিগর দ্বারা [অর্ডার দিয়ে] কোনো বস্তু তৈরি করাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى النِّح : উপরিউক্ত ইবারতে দু'টি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : কেউ কাপড় বিক্রেতা থেকে এই শর্তে কাপড় ক্রয় করল যে, বিক্রেতা কাপড় কেটে জামা [সেলাই করে] বানিয়ে দিবে অথবা আলখেল্লা বানিয়ে দিবে। তাহলে উক্ত শর্তের সাথে বিক্রয়চুক্তিটি চার ইমামের সকলের মতে ফাসিদ হবে। কেননা, তার শর্তটি চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী এবং এতে একপক্ষ তথা ক্রেতার লাভও বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ব বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী যেসব শর্ত চুক্তি বিরোধী এবং এতে কোনো একপক্ষের স্বার্থ থাকে তার উপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। সে মতে এখানেও বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, কাপড় কাটা ও সেলাই বাবদ মূল্যের অংশ নির্ধারণ থাকবে কিনা? যদি বলা হয় মূল্যের একট! অংশ কাপড় কাটা ও সেলাইয়ের জন্য হবে তাহলে তা হবে ইজারা, যা বিক্রয় চুক্তির মাঝে প্রবিষ্ট করা হয়েছে অথবা এর বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ নির্ধারণ করা হবে না। তাহলে এটা হবে ঋণ ও ধার। আর তখন বিক্রয়চুক্তির মাঝে ঋণ প্রবিষ্ট হচ্ছে। উভয় অবস্থাতে চুক্তির মাঝে অন্য চুক্তি প্রবিষ্ট হচ্ছে। আর এক চুক্তির সাথে অন্য চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই এ ধরনের চুক্তি করা হলে রাসূল ﷺ -এর নিষেধের লঙ্ঘন হবে। এর ফলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِيْ صَفَقَةٍ د্বারা عَلَى مَا مَرَّ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা : কেউ চামড়া বিক্রোতা থেকে এই শর্তে চামড়া ক্রয় করল যে, বিক্রোতা চামড়া দ্বারা জুতা তৈরি করে দিবে অথবা জুতার মধ্যে চামড়ার ফিতা লাগিয়ে দিবে। এ বিক্রয়টি কিয়াস অনুসারে ফাসিদ। ইমাম কুদুরী (র.) কিয়াসানুযায়ী এটা ফাসিদই বলেছেন। কিন্তু হিদায়ার লেখকের বক্তব্য ভিন্ন। তিনি বলেন, ইমাম কুদুরী (র.) -এর বর্ণিত মাসআলাটি কিয়াসানুযায়ী বলা হয়েছে। এর ফাসিদ হওয়ার কারণ এই যে, এটা এমন শর্ত যা চুক্তির দাবির পরিপন্থি। আর এতে এক পক্ষের স্বার্থও বিদ্যমান রয়েছে। নিয়মানুযায়ী এমন শর্তের উপস্থিতি চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়, তাই এ চুক্তি ফাসিদ হওয়া উচিত। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতও তাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মাঝে এমন বিক্রয় প্রচলিত থাকার কারণে ইস্তিহসান হিসেবে এটাকে বৈধ বলা হয়েছে। যেমন রঙকারিগরকে কাপড় রাঙানোর উদ্দেশ্যে ভাড়া নেওয়া যুক্তি মতে অবৈধ। কেননা, ইজারা বলা হয় সুবিধা বিক্রিকে। অথচ এখানে মূল বস্তু তথা রঙই বিক্রি করা হচ্ছে, তাই এটা অবৈধ হবে। যেমন দুধপানের উদ্দেশ্যে গাভী ভাড়া নেওয়া অবৈধ হয়ে থাকে। কিন্তু রঙ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রংকারকে ভাড়া নেওয়া ইস্তিহসান হিসেবে বৈধ। তাই আমাদের আলোচ্য জুতা তৈরি করার শর্তে চামড়া বিক্রিও বৈধ হবে। এর আরেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ফরমায়েশী বিক্রয়। এর ব্যাখ্যা এই যে, টাকা দিয়ে জুতা ইত্যাদি বানানোর অর্ডার দেওয়া। যেমন কেউ মুচিকে বলল, আমি তোমাকে দু'শ টাকা দিচ্ছি, তুমি আমার পায়ের অমুক মডেলে এক জোড়া জুতা বানিয়ে দাও। এ জাতীয় বিক্রি বৈধ। যদিও এ জাতীয় বিক্রি কিয়াসের খেলাফ বা যুক্তি বিরুদ্ধ। কিন্তু সমাজে এ ধরনের বিক্রির বহুল প্রচলন রয়েছে। তাই প্রচলনের কারণে যুক্তি বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এটা ইস্তিহসান হিসেবে বৈধ। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাটি বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, পূর্বের আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, সামাজিক রেওয়াজ ও প্রচলন কিয়াসের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এ কারণে এ মাসআলাটির ব্যাপক প্রচলনের উপর ভিত্তি করে বৈধতার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

قَالَ : وَالْبَيْعُ إِلَى التَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَغْرِ بِ  
الْمُتَبَايَعَانِ ذَلِكَ فَاسِدٌ لِحَهَالَةِ الْأَجَلِ، وَهِيَ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي الْبَيْعِ  
لِابْتِنَائِهَا عَلَى الْمُمَاكَسَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَا يَعْرِفَانِهِ، لِيَكُونَهُ مَعْلُومًا عِنْدَهُمَا، أَوْ كَانَ  
التَّاجِيلُ إِلَى فِطْرِ النَّصَارَى بَعْدَمَا شَرَعُوا فِي صَوْمِهِمْ، لِأَنَّ مَدَّةَ صَوْمِهِمْ بِالْأَيَّامِ  
مَعْلُومَةٌ، فَلَا جَهَالََةَ فِيهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নব দিবস মেলা, খ্রিষ্টানদের উপবাস ও ইহুদিদের উপবাস ভঙ্গের তারিখে মূল্য  
পরিশোধ করার শর্তে বিক্রি করা ফাসিদ। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা এগুলোর তারিখ না জানে। কেননা, [এখানে] সময়  
অজ্ঞাত। আর অনির্দিষ্ট মেয়াদে বিক্রয়চুক্তি বিবাদ সৃষ্টি করে। কেননা, বিবাদের উৎস হলো কষাকষি-তিক্ততা [আর  
বিক্রয়ের মধ্যে সেটা রয়েছে]। তবে যখন উভয়ে এগুলোর তারিখ জানবে [তখন বিবাদ হবে না] কেননা, তখন  
উভয়ের কাছে মেয়াদ জ্ঞাত থাকবে। এমনভাবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় তাদের উপবাস শুরু করার পর যদি তাদের উপবাস  
ভঙ্গের তারিখ নির্ধারণ করা হয় [তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে]। কেননা, তাদের উপবাসের দিনগুলো জ্ঞাত। ফলে তাতে  
কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالْبَيْعُ إِلَى التَّيْرُوزِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট মেয়াদে লেনদেন করলে তা ফাসিদ হওয়ার  
মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

تَيْرُوزُ শব্দটি نوروز [ফারসি] -এর আরবিরূপ। এর অর্থ নব দিবস। বসন্তকালের প্রথমদিন। এ দিন সম্পর্কে হয়রত ওমর  
(রা.) বলেন, نوروز، كُلُّ يَوْمٍ لَنَا আমাদের প্রতিটি দিনই নওরোজ। পারস্যের কাফির সম্প্রদায় এদিনে উৎসব পালন করত।  
বসন্তকালের প্রথমদিনটিকে তারা نوروز বলত।

مِهْرَجَانُ শব্দটি مهرگان [ফারসি] -এর আরবিরূপ, শরৎকালের প্রথম দিনকে مِهْرَجَانُ নামে অবহিত করা হতো, এদিনে  
তারা মেলা-প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসব করত।

صَوْمِ النَّصَارَى খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উপবাস শুরু হতো বসন্ত কালের প্রথম দিন থেকে টানা পঞ্চাশ দিন তারা উপবাস ব্রত পালন  
করে।

قَوْلُهُ فِطْرِ الْيَهُودِ : ইহুদি সম্প্রদায় ও খ্রিষ্টানদের মতো পঞ্চাশদিন উপবাস ব্রত পালন করে। তাদের সেই উপবাসপর্ব শুরু হয়  
রমযানের পহেলা তারিখ থেকে। আমাদের ঈদের দিনও তারা উপবাস ভাঙ্গে না। পঞ্চাশদিন পুরা করে তারা উপবাস ভাঙ্গে।

উল্লেখ্য যে, নওরোজ, মেহেরগান ও খ্রিষ্টানদের উপবাস ইত্যাদি দিবসগুলো তারা গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির সাহায্যে নির্ধারণ করে।  
এর সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ তাদেরও পূর্ব থেকে জানা থাকে না। আধুনিক যুগে হয়তো এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ তারা  
নির্ধারণ করে থাকবে। ইহুদি সম্প্রদায়ের উপবাস শুরু হওয়ার পর মাসের [উনত্রিশ বা ত্রিশ] এর কারণে তাদের উপবাস ভঙ্গের  
তারিখও রদবদল হতো।



সূরতে মাসআলা : কেউ কোনো পণ্য খরিদ করে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য নওরোজ বা মেহেরগানের দিন নির্ধারণ করল, অথবা সে বিক্রেতাকে বলল, যেদিন খ্রিষ্টান সম্প্রদায় উপবাস শুরু করবে অথবা ইহুদি সম্প্রদায় যেদিন উপবাস ভাঙ্গবে সেদিন তথা তাদের ঈদের দিন মূল্য পরিশোধ করব, উপরিউক্ত সব অবস্থাতে শর্তগুলোর কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে উক্ত দিবসগুলোর তারিখ না জানে। যদি তারা দিবসগুলোর সুনির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। আমাদের বাংলাদেশী সমাজে এর উদাহরণ এই যে, ক্রেতা কোনো দ্রব্য কিনে বিক্রেতাকে বলল, বিজয় দিবসে টাকা শোধ করবে। অথচ ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউই জানে না বিজয় দিবস কবে? ফাসিদ ও অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার দিবসগুলোর তারিখ না জানার কারণে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মেয়াদী বিক্রয়ে মেয়াদ অজ্ঞাত হলে টাল বাহানা হবে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হবে। আর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিক্রয়চুক্তির যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা বিবাদ সৃষ্টি করে তা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। এ কারণে উল্লিখিত শর্তের উপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার দিবসগুলোর তারিখ জানা থাকলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। কারণ তখন তো মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

লেখক বলেন, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উপবাস শুরুর পর যদি মূল্য পরিশোধের দিন ধার্য করা হয় উপবাস ভাঙ্গার দিন, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। কেননা এ অবস্থায় যেহেতু তাদের উপবাসের দিন জানা আছে অর্থাৎ পঞ্চাশ দিন কিংবা পঞ্চাশ দিন তাই পরিশোধের দিন নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে যে, তাদের উপবাস শুরুর পর যেদিন বিক্রয় হলো সেদিনটি তো নির্দিষ্ট। সেদিনের পূর্বে কয়টি উপবাস দিন গেল সেটা গণনা ফেললে বের হয়ে যাবে উপবাস সমাপ্ত হওয়ার কয়দিন বাকি আছে। উদাহরণ স্বরূপ দশদিন যাওয়ার পর চুক্তি হলে আরও থাকবে চল্লিশ/ পয়তাল্লিশ দিন। তখন তার মূল্য পরিশোধের মেয়াদ হবে একচল্লিশতম দিন/ ছেচল্লিশতম দিন।

মোটকথা, এ অবস্থায় উপবাস ভাঙ্গার দিন সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى قُدُومِ الْحَاجِّ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْحَصَادِ وَالذِّبَاسِ وَالْقَطَانِ وَالْجِرَازِ، لِأَنَّهَا تَتَقَدَّمُ وَتَتَأَخَّرُ، وَلَوْ كَفَلَ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ، لِأَنَّ الْجَهَالََةَ الْيَسِيرَةَ مُتَحَمِّلَةٌ فِي الْكَفَالَةِ، وَهَذِهِ الْجَهَالََةُ يَسِيرَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ (رض) فِيهَا، وَلَا تَنْهَ مَعْلُومُ الْأَصْلِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالََةَ فِي أَصْلِ الدِّينِ، بِأَن تَكْفُلَ بِمَا ذَابَ عَلَى قُلَانٍ، فَفِي الْوَصْفِ أَوَّلِي، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهَا فِي أَصْلِ الثَّمَنِ، فَكَذَا فِي وَصْفِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مُطْلَقًا، ثُمَّ أَجَلَ الثَّمَنَ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ حَيْثُ جَازَ، لِأَنَّ هَذَا تَأْخِيرٌ فِي الدِّينِ، وَهَذِهِ الْجَهَالََةُ فِيهِ مُتَحَمِّلَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ، وَلَا كَذَلِكَ إِشْتِرَاطُهُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ .

অনুবাদ : ইমাম কদুরী (র.) বলেন, হাজীগণের [হজ থেকে] প্রত্যাবর্তনের সময় মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বিক্রয় বৈধ হবে না। এমনিভাবে ফসল তোলা, ফসল মাড়ানি, আস্তুর তোলা ও পশম কাটার সময় মূল্য আদায় করার শর্তে বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, এ মৌসুমগুলো অগ্রবর্তী ও বিলম্বিত হয়। যদি এ সময় পর্যন্ত কেউ জামিন হয় তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা, জামানতের মধ্যে সামান্য অস্পষ্টতাতে সমস্যা নেই। এই অস্পষ্টতা সামান্য যার প্রতিকার করা সম্ভব। এর প্রমাণ এই যে, সাহাবীগণের এ জাতীয় অস্পষ্ট সময়ের বৈধতার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে [কারও মতে এটা বৈধ, কারও মতে অবৈধ]। তাছাড়া [সময়ের সামান্য হেরফের হলেও] মূল বিষয়টি জ্ঞাত। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, জামানতের ক্ষেত্রে ঋণের মূল পরিমাণের অজ্ঞতা পর্যন্ত সহনীয়। যেমন বলা হয় যে, অমুকের উপর যে পরিমাণ ঋণ রয়েছে সে তার জামিন। সুতরাং গুণগত অজ্ঞতা তো আরো উত্তমভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে বেচাকেনার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে অজ্ঞতা গ্রহণীয় হয় না। সুতরাং তার গুণগত বিষয়েও তদ্রূপ হবে। তবে এরও ব্যতিক্রম হলো যখন কেউ নিঃশর্তভাবে বিক্রয় করে তারপর মূল্য পরিশোধের জন্য এ সময়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করে। তখন তা বৈধ হবে। কেননা এটা তো ঋণ আদায়ের জন্য সময় নেওয়া হলো। ঋণের ক্ষেত্রে জামানতের মতো [সামান্য] এ জাতীয় অজ্ঞতা সহনীয়। মূল চুক্তির মধ্যে এ জাতীয় অজ্ঞাত সময়ের শর্তারোপ করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বিক্রয়চুক্তি অবৈধ শর্তের কারণে বাতিল হয়ে যায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَرَأَهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى قُدُومِ الْحَجِّ : উপরিউক্ত ইবারতে মূল্য পরিশোধের অজ্ঞাত সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রথম মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্য একজনের কাছ থেকে পণ্য বিক্রয় করল একশ টাকায়। ক. ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমি এই শর্তে ক্রয় করছি যে, মূল্য শোধ করব হাজী সাহেবান হজ থেকে ফিরে আসলে। অথবা খ. ফসল কাটার মৌসুমে কিংবা গ. ফসল মাড়ানির সময়ে [মূল্য পরিশোধ করব] অথবা ঘ. আস্তুর তোলার সময়ে অথবা ঙ. পশুর লোম ও পশম কাটার

মৌসুমে মূল্য পরিশোধ করব। উপরিউক্ত পাঁচটি অবস্থাতেই বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হবে। অবৈধতার কারণ উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করা। কেননা এগুলোর সুনির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। রোদ-বৃষ্টি, খরা-বন্যা ও অন্যান্য কারণে কখনো এগুলোর মৌসুম অগ্রবর্তী হয়, আবার মৌসুম কখনো পিছিয়ে যায়। যেহেতু এগুলোর মৌসুম সুনির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত নেই, তাই মূল্য পরিশোধের সময় অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। আর সময় বা মেয়াদ অস্পষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়, তাই এখানেও বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

**দ্বিতীয় মাসআলা :** যদি কেউ কারো ঋণ পরিশোধের জন্য উপরিউক্ত সময়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করে জামিন হয় তাহলে জামিন হওয়া বৈধ হবে। যেমন কেউ বলল, আমি তোমার ঋণের জামিন হলাম। আর আমি হাজী সাহেবান আগমনের সময় কিংবা ফসল ঘরে তোলার সময় উক্ত ঋণ শোধ করব, তাহলে তার উক্ত জামানত বা জামিনদারী বৈধ। কারণ জামানতের ক্ষেত্রে সামান্য অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা দোষের কিছু নয় এবং এতটুকু অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য। তবে বেশি রকমের অজ্ঞতা হলে জামানতও গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরোক্ত সময়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করার দ্বারা যতটুকু অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয় তা নিতান্তই সামান্য। এর প্রতিকার সম্ভব এবং তা আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে।

এগুলোর অজ্ঞতা যে সামান্য ও সহনীয় এর প্রমাণ এই যে, এ ব্যাপারে সাহাবীগণের মতপার্থক্য রয়েছে। সাহাবীদের একদল মনে করেন এতটুকু অজ্ঞতার পরও বিক্রয় বৈধ হবে। অন্য দল মনে করেন এতটুকু অজ্ঞতার কারণে বিক্রয় অবৈধ হবে। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) মনে করেন, এতটুকু অজ্ঞতা বিক্রয়চুক্তির জন্য প্রতিবন্ধক নয় এবং এতটুকু অজ্ঞতার পরও বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর এ জন্যই তিনি **بَيْعٌ إِلَى الْعَطَاءِ** [এর আলোচনা গত হয়েছে]-কে বৈধ মনে করেন। **عَطَاءٌ** দ্বারা উদ্দেশ্য রপ্তানি কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক ভাতা। এ ভাতা প্রতি বছর নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেত, তবে সময়ের হেরফের হতো। যেমনটা হাজীদের আগমন, ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি, আঙ্গুর তোলা ও পশুর লোম ও পশম কাটা প্রতিবছর নিশ্চিতভাবে হয়েই থাকে। তবে সময় আগ-পিছ হয়। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) **بَيْعٌ إِلَى الْعَطَاءِ** কে বৈধ মনে করতেন না। অর্থাৎ তার মতে সামান্য অজ্ঞতাও বিক্রয়চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এর কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। মোটকথা, এসব অজ্ঞতার দ্বারা বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হবে, না বৈধ হবে, এ নিয়ে সাহাবীগণের মতপার্থক্য দ্বারা এটুকু প্রমাণিত হয় যে, এ অজ্ঞতা সামান্য ও সাধারণ পর্যায়ে। সামান্য না হলে বৈধতার পক্ষে কেউই অভিমত ব্যক্ত করতেন না। সুতরাং যখন সাহাবীগণের মত পার্থক্য দ্বারা বিষয়টি হালকা ও সাধারণ হয়ে গেল তখন সংশ্লিষ্ট অজ্ঞতাকে সামান্য বলে অভিহিত করাই সমীচীন। কেউ কেউ অবশ্য সামান্য ও বড় অজ্ঞতার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন যে, ক. সামান্য অজ্ঞতা হলো এমন বিষয়ে যার বাস্তবতা নিশ্চিত, কিন্তু সন্দেহ শুধুমাত্র অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে। খ. বড় ও মারাত্মক অজ্ঞতা হলো এমন বিষয়, যার বাস্তবতা ও সংঘটিত হওয়া অনিশ্চিত এবং এর সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বিদ্যমান।

লেখক উপরোক্ত বিষয়গুলোর অজ্ঞতা সামান্য হওয়ার দ্বিতীয় দলিল দিচ্ছেন এই বলে যে, এ সব বিষয়ের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ বছরের মধ্যে এ কাজগুলো যে সংঘটিত হবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হাজীগণ নিশ্চিতভাবে বছরের মধ্যেই আসবেন। ফসল কাটা, ফসল পাড়া, ফসল মাড়ান ও পশুদের শরীর থেকে লোম ও পশম কাটাও বছরের মধ্যেই হবে নিশ্চিতভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মূলকাজের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ কেবল সময় নির্ধারণে, সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, মূল কাজ সন্দেহমুক্ত, সন্দেহ হচ্ছে গুণসংক্রান্ত তথা মেয়াদ সংক্রান্ত। অতএব এ অজ্ঞতা সাধারণ অজ্ঞতাই বিবেচিত হবে।

কাফালা শব্দের অর্থ জামিন হওয়া, দায়িত্ব নেওয়া ও জিম্মাদার হওয়া ইত্যাদি। কাফালাই সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে কাফালাই তথা জামিন হওয়ার প্রসঙ্গটি এভাবে এসেছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারো ঋণ ইত্যাদির জামিন হয় আর সেই ঋণ শোধ করার মেয়াদ নির্ধারিত করে ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি, হাজীদের আগমনের সময় ও ফসল পাড়ার মৌসুম ফাসিদকে, তাহলে তার জামিন হওয়া বৈধ হবে। কারণ, জামানতের ক্ষেত্রে সামান্য অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য ও সহনীয়। সুতরাং বিক্রয়চুক্তির সাথে জামানতের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। লেখক এই পার্থক্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে জামানতের প্রসঙ্গটি এখানে টেনে এনেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন বাস্তবিকভাবে আসতে পারে যে, জামানতের মধ্যে সামান্য অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য ও সহনীয় কেন ?

এর প্রথম উত্তর তো এই যে, জামানত হলো একটা বৈশ্বাকার্যক্রম ও একজনের অনুগ্রহণ প্রদর্শন। আর এ জাতীয় বৈশ্বাকার্যক্রমে উদারতা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। তাই এতে সাধারণ অজ্ঞতা এমন দৃশ্যণীয় নয়, যার দ্বারা জামানতই ভুল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত জামানত প্রাথমিক অবস্থায় মানুত সদৃশ। মানুতের মধ্যে অপরিহার্য নয় এমন কাজকে নিজের উপর অপরিহার্য করা হয়। (رَبِّكَ سَائِلٌ بِكَرٍّ رَاجٍ) একইভাবে জামানতের মধ্যে জামিনদারের উপর যে ঋণ আবশ্যক নয় তা তার জামিন হওয়ার কারণে তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। এটা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায়। কিন্তু জামানত চূড়ান্ত বিচারে বিক্রয় সদৃশ। অর্থাৎ বিক্রয়ের মতো বিনিময়চুক্তি। কেননা, জামিনদার পাওনাদারকে তার পাওনা ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার পর যার পক্ষে জামিন হয়েছিল তার থেকে সেই পরিমাণ পাওনা আদায় করে। সুতরাং পরিণাম বিচারে এটা বিনিময় চুক্তি হলো। নিয়মানুযায়ী মানুতের মধ্যে সাধারণ অজ্ঞতা ও বড় অজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণযোগ্য। উপরোক্ত মেয়াদগুলো উল্লেখ করলেও মানুত হবে, আবার কোনো মেয়াদ উল্লেখ না করলেও মানুত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিক্রয়চুক্তিতে সাধারণ ও বড় কোনো ধরনের অজ্ঞতাই গ্রহণযোগ্য নয়। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কাফালাহ বা জামানত মানুত ও বিক্রয় উভয়ের সাথে [প্রাথমিক ও চূড়ান্ত বিচারে] সামঞ্জস্য রাখে। উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, জামানত সামান্য অজ্ঞতা ধারণ করে [যেমন মানুত অজ্ঞতা ধারণ করে] এবং বেশি রকমের অজ্ঞতা ধারণ করে না [যেমন বিক্রয় অজ্ঞতা ধারণ করে না] এককথায় বলা যায়, উভয়ের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, সামান্য অজ্ঞতার ক্ষেত্রে মানুতের সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা হয়েছে। আর চরম অজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা হয়েছে।

লেখক দাবি করেন জামানতের মধ্যে ঋণের মূল পরিমাণ অজ্ঞাত থাকলেও জামানত শুদ্ধ হয়। যেমন, এভাবে কেউ জামিন হলো যে, অমুকের যত ঋণ আছে সবই প্রদানের আমি জামিন হলাম। তিনি বলতে চান যে, জামানতের মধ্যে যেহেতু মৌলিক বিষয়ের অজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য সেহেতু গুণসংক্রান্ত অজ্ঞতা তো আরো উত্তম ও নিশ্চিতভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং আলোচ্য মেয়াদগুলোতে সুনিশ্চিতভাবেই কাফালত তথা জামানত গ্রহণযোগ্য হবে।

কিন্তু বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। বিক্রয়চুক্তিতে যদি মূল্য অজ্ঞাত থাকে তাহলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয় না। সুতরাং গুণসংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থাৎ মূল্য আদায়ের মেয়াদের অজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ গুণ মূল্যের অনুবর্তী হয়, মূল্যের ক্ষেত্রে যা ঘটে অনুবর্তীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় না। যদি তা হয় তাহলে মূল্যের সাথে অনুবর্তীর বিরোধিতার ক্ষেত্রে তৈরি হয়। অনুবর্তী তার মূল্যের বিরোধী হতে পারে না। তাই বিক্রয়ে মেয়াদগত অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখানে একটি আপত্তি হতে পারে যে, মূল হচ্ছে শক্তিশালী, আর গুণ হচ্ছে দুর্বল, তাই মূল্যের অজ্ঞতা অগ্রাহ্য হলে যে গুণের অজ্ঞতা অগ্রাহ্য হবে এমন নয়।

এর উত্তর এই যে, মূল এবং অনুবর্তী [গুণ]-এর মাঝে যদি ইল্লাত এক থাকে তাহলে তাদের হকুমও এক হবে। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় মূল্যের অজ্ঞতা অগ্রাহ্য হওয়ার ইল্লাত হলো বিবাদের আশঙ্কা। অর্থাৎ বিবাদের আশঙ্কার কারণে অজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সেই ইল্লাত তো গুণ তথা মেয়াদের অজ্ঞতার মধ্যেও বিদ্যমান। সুতরাং মেয়াদের অজ্ঞতাও অগ্রাহ্য হবে। কারণ, ইল্লাতের ঐক্য হকুমের ঐক্যকে আবশ্যক করে।

لَوْ بَخِلَ بِخَلٍّ مَّا إِذَا بَاعَ مُطْلَقًا الْخ: লেখক এখানে একটি ব্যতিক্রমি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। যেমন কেউ নিঃশর্তভাবে কোনো কিছু বিক্রি করল। অর্থাৎ মূল্য পরিশোধের জন্য কোনো মেয়াদের উল্লেখ করল না। চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর বিক্র্যে মূল্য পরিশোধের জন্য উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের [ফসল কাটা, হাজীদের আগমন, মাদানি ইত্যাদি] যে কোনো একটিকে মেয়াদ নির্ধারণ করল তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এমন করা অবশ্যই বৈধ। কেননা, মূল্য এখন ক্রেতার জন্য অন্যান্য ঋণের মতো একটা ঋণ। আর ঋণ আদায়ের জন্য অজ্ঞাত মেয়াদ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই [যেমন ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে]। হ্যাঁ, তবে যদি এ শর্তটি মূল চুক্তির মধ্যে করা হতো তাহলে চুক্তি অবৈধ হতো। এখানে তো মূল চুক্তি সম্পন্ন করার পর মেয়াদ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা মূল্য পরিশোধের জন্য অজ্ঞাত মেয়াদ যদি বিক্রয়চুক্তির মধ্যে নির্ধারণ করা হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি তা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর করা হয় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

وَلَوْ بَاعَ إِلَى هَذِهِ الْأَجَالِ، ثُمَّ تَرَاضِيَ بِاسْقَاطِ الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ فِي الْحَصَادِ  
وَالدِّيَّاسِ وَقَبْلَ قُدُومِ الْحَاجِّ جَارِ الْبَيْعِ أَيْضًا، وَقَالَ زُفَرُ (رحا) : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ وَقَعَ  
فَإِسْدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا، وَصَارَ كَاسْقَاطِ الْأَجَلِ فِي النِّكَاحِ إِلَى أَجَلٍ، وَلَنَا أَنَّ الْفَسَادَ  
لِلْمُنَازَعَةِ، وَقَدْ ارْتَفَعَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ، وَهَذِهِ الْجِهَالَةُ فِي شَرْطِ زَانِدٍ، لَا فِي صُلْبِ  
الْعَقْدِ، فَيُمْكِنُ اسْقَاطُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الذَّرْهَمَ بِالذَّرْهَمَيْنِ، ثُمَّ اسْقَطَا الذَّرْهَمَ  
الزَّائِدَ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ، وَهُوَ  
عَقْدٌ غَيْرُ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : "ثُمَّ تَرَاضِيَ" خَرَجَ وَفَاقًا، لِأَنَّ مَنْ لَهُ  
الْأَجَلُ يَسْتَيِدُّ بِاسْقَاطِهِ، لِأَنَّهُ خَالِصٌ حَقُّهُ .

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত সময়গুলোকে [মূল্য পরিশোধের] মেয়াদ নির্ধারণ করে বিক্রয় করে, তারপর লোকজন ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি শুরু করার পূর্বেই এবং হাজীদের আগমনের পূর্বেই তারা [ক্রেতা-বিক্রেতা] উভয়েই যদি মেয়াদ রহিত করতে সম্মত হয় তাহলেও বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, বৈধ হবে না। কেননা, এ বিক্রয় ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়েছে, তাই তা বৈধরূপে রূপান্তরিত হবে না। এবং এটা যেন সাময়িক বিবাহের সময়কে রহিত করে দেওয়ার মতো। আমাদের দলিল এই যে, [বিক্রয়ে অনির্দিষ্ট মেয়াদের] অবৈধতা ছিল বিবাদাশঙ্কার কারণে, অথচ সেই বিবাদ স্থিত হওয়ার আগেই অপসৃত হয়ে গেছে। তা ছাড়া এই অজ্ঞতা মূল চুক্তিতে তো নয়; বরং অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে। সুতরাং এটাকে পরিহার করা সম্ভব। এর ব্যতিক্রম হলো যদি কেউ এক দিরহামকে দু'দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল। তারপর অতিরিক্ত দিরহামকে বাদ দিল [তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না]। কেননা, এখানে ফাসাদ মূল চুক্তিতেই। এবং সাময়িক বিবাহ এর থেকে ভিন্ন। কারণ, সাময়িক বিবাহ হচ্ছে মুতা। মুতা চুক্তি আর বিবাহ চুক্তি এক নয়, [লেখক বলেন] মূল কিতাবে ইমাম কুদুরীর বাক্য **ثُمَّ تَرَاضِيَ** প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। কেননা, যার অনুকূলে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় তা বাতিল করার অধিকারও একমাত্র তাঁর। কেননা, এটা তার ব্যক্তিগত অধিকার।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : **قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إِلَى هَذِهِ** উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাটি এর পূর্বের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, যদি কেউ হাজীদের আগমনের সময়, ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি, ফল পাড়া, ও পণ্ডর পশম কাটার মৌসুম ইত্যাদিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে কোনো কিছু কিনে তাহলে তার বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই ফাসিদ চুক্তির পর মেয়াদ আসার আগেই যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মেয়াদ প্রত্যাহার করার ব্যাপারে সম্মত ও একমত হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তি বৈধ ও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয়টি বৈধ হবে না; বরং পূর্বাবস্থায় ফাসিদ রূপে বহাল থাকবে। তার দলিল এই যে, যে চুক্তি একবার অবৈধ বিবেচিত হয় বা ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়, তা আর কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়টি যেহেতু ফাসিদ শর্তের কারণে অবৈধ হয়েছিল তাই এটা আবার বৈধ রূপান্তরিত হবে না। যদিও অবৈধ শর্তটিকে প্রত্যাহার করা হয়। যেমন [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও] যদি কেউ স্বল্প সময়ের জন্য

বিবাহ করে, অতঃপর সময়কে প্রত্যাহার করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সেই বিবাহ বৈধরূপ লাভ করে না। এমনিভাবে যদি সাক্ষীবিহীন বিবাহ করে পরে সাক্ষী করা হয় তাহলেও বিবাহ বৈধ হয় না। কেননা বিবাহটি ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়েছিল। তাই বৈধরূপ লাভ করে না। তদ্রূপ কোনো ব্যক্তি এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করল। এ জাতীয় বিক্রয় সর্বসমভাবে অবৈধ। তারপর অতিরিক্ত দিরহামটি বাদ দিয়ে বিক্রয়কে বৈধ করার চেষ্টা করা হলেও বিক্রয়টি পুনরায় বৈধ হবে না। এমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায় মেয়াদ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে যখন বিক্রয় অবৈধ ও ফাসিদ হয়েছে তা আবার অজ্ঞাত মেয়াদের বাদ দিলেও তা শুদ্ধতায় রূপান্তরিত হবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে, ইমাম যুফার (র.) তার বক্তব্যকে আরো তিনটি মাসআলার সাহায্যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সুদৃঢ় করেছে।

আমাদের দলিল হলো, মেয়াদ ও সময় অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় অবৈধ হয়, আর অজ্ঞাত-অনির্দিষ্ট মেয়াদের কারণেই ক্রেতা ও বিক্রেতার বিবাদ ও ঝগড়া সৃষ্টি হয়। আসলে বিক্রয় অবৈধ হওয়ার মূল কারণ হলো বিবাদের আশঙ্কা। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা অজ্ঞাত মেয়াদটি যখন প্রত্যাহার করবে, তখন বিক্রয় অবৈধ ও ফাসিদকারী বিষয়টি অপসৃত হয়ে যাবে। অথচ ফাসিদকারী বিষয়টি স্থিত হতে পারেনি। অর্থাৎ ফাসাদ স্থিত হওয়ার আগেই রহিত হয়ে গেছে। ফাসাদকারী দূর হওয়াতে বিক্রয় অবৈধ থাকার কোনো মানে হয় না। তাই বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে আরোপিত প্রশ্নটি ছিল যখন চুক্তিতে প্রাথমিক অবস্থায় অজ্ঞাতা ও অবৈধতা স্থান করে নিল তখন পরবর্তীতে তাকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টার ঘারা কোনো উপকার হবে না। যেমন অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে তা হয় না, যেমন : কেউ যদি এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করে তাহলে বিক্রয়টি ফাসিদ হয়ে যায়। পরে অতিরিক্ত দিরহাম বাদ দিলেও চুক্তি বৈধতা পায় না, এ জাতীয় কমপক্ষে আরো দুটি উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এ দিরহামের বিক্রয়ে যেমন পরবর্তী কোনো প্রচেষ্টা বিক্রয়টির বৈধতা প্রদান করতে পারে না, তেমনি আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি অবৈধ হওয়ার পরে তা বৈধ হবে না।

এর জবাব হলো, বিক্রয়চুক্তিতে মেয়াদ অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় অজ্ঞাতার অবস্থান থাকে অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে। মূল বিক্রয় তথা পণ্য ও মূল্যে কোনো সমস্যা নেই। অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে অজ্ঞাতা ও ফাসাদের অবস্থানের কারণে তা দূরীভূত করা সম্ভব এবং তা ফলদায়কও বটে। পক্ষান্তরে এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রির মধ্যে যে ফাসাদ রয়েছে, তা মূল বিক্রয় তথা বিনিময়যোগ্য দুটি বস্তুর একটির মধ্যে রয়েছে। আর এ কারণে তা দূরীভূত করা সম্ভব নয়।

ইমাম যুফার (র.)-এর দ্বিতীয় কিয়াস ছিল মেয়াদী বিবাহ বা মুতা [বিবাহের] উপর। এর উত্তরে লেখক বলেন, বিক্রয়ের মধ্যে কোনো ফাসাদ ও অবৈধতা স্থিত হওয়ার আগে বিদূরীত হলে বিক্রয় শুদ্ধ ও বৈধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এক ধরনের চুক্তি আমূল্যে পরিবর্তন হয়ে আরেকটি চুক্তি হতে পারে না কিছুতেই।

নির্দিষ্ট মেয়াদের বিবাহ কে মুতা বলা হয়। মুতা কোনো শরিয়ত অনুমোদিত চুক্তি নয়। শরিয়তে তাকে বিবাহ বলে স্বীকৃতি দেয় না, বরং একে ভিন্ন নামে [মুতা বলে] অবহিত করা হয়। সুতরাং মুতা পরিবর্তিত হয়ে বিবাহ হতে পারে না। পক্ষান্তরে অংশটি মেয়াদ যা অবৈধ হওয়ার কারণ ছিল তা বাতিল করার পূর্বে চুক্তিটি বিক্রয়চুক্তি ছিল, এবং অংশটি মেয়াদ দূর করার পরও সেটা বিক্রয়চুক্তি থাকে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্বে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ ছিল এখন সেটা বৈধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং মেয়াদ অজ্ঞাতার বিক্রয়কে সাময়িক বিবাহের সাথে কিয়াস করা মুক্তিযুক্ত নয়। ইমাম যুফার (র.) কিয়াস করেছিলেন সাক্ষী ব্যতীত সংঘটিত বিবাহের উপর যে, সেটা ফাসিদ হওয়ার পর সাক্ষী উপস্থিত করা হলেও যেমন বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তদ্রূপ এখানেও ফাসিদ হওয়ার পর পুনরায় বিক্রয় বৈধ হবে না, অথচ সাক্ষীবিহীন বিবাহের মতো ফাসাদ মূল চুক্তির মধ্যে নয়। তার এ কিয়াসের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ মাসআলায় বিবাহ শুদ্ধ ও বৈধ না হওয়ার কারণ হলো বিবাহের শর্তের অনুপস্থিতি, বিবাহের শর্ত হচ্ছে সাক্ষী রাখা। শর্তের অনুপস্থিতির কারণে যে ফাসাদ হয় তা শক্তিশালী হয়। এটা মূল চুক্তির ফাসাদের পর্যায়ে, তা দূর করা সম্ভবও হয় না এবং ফলদায়কও হয় না। যেমন কেউ অজু ছাড়াই সালাত শুরু করল, তারপর সে অজু করে নিল এতে তার অজুবিহীন আদায় করা সালাত শুদ্ধ ও বৈধ হবে না। কেননা, তার সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত না পাওয়া যাওয়ায় তা ফাসিদ হয়েছে, তাই এটা বৈধ হবে না।

লেখক বলেন, ইমাম কুদুরী (র.)-এর ইবারত : **لَمْ تَرَاصًا بِاسْتِطَاعَةِ الْأَجَلِ** : প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, শর্তরূপে বলা হয়নি, অর্থাৎ অজ্ঞাত মেয়াদ প্রত্যাহার করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মত হওয়া শর্ত নয়। প্রকৃত পক্ষে যার অনুকূলে মেয়াদ নেওয়া হয়েছে সে একাই তা রহিত করতে পারে। কেননা, এ তার একান্ত ও নিজস্ব অধিকার। এতে অন্যপক্ষের মতামতের কোনোই প্রয়োজন নেই।

قَالَ : وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ شَاؤَ ذَكِيَّةً وَمَيْتَةً بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رح)، إِنْ سُمِّيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمَنَّا جَازَ فِي الْعَبْدِ وَالشَّاءِ الذَّكِيَّةُ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدٍ غَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحَصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ زُفَرٌ (رح) : فَسَدَ فِيهِمَا ، وَمَتَرُوكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا كَالْمَيْتَةِ، وَالْمَكَاتِبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبَّرِ، لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالْفَضْلِ الْأَوَّلِ، إِذَا مَحَلَّتْهُ الْبَيْعُ مُنْتَفِيَةً بِالإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّ، وَلَهُمَا أَنَّ الْفَسَادَ يَقْدِرُ الْمُفْسِدُ، فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْغَيْرِ، كَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَِّّةِ وَأَخْتِهِ فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَسْمِ تَمَنَّا كُلِّ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَإِلَى حَنِيفَةَ (رح) وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَضْلَيْنِ أَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ أَصْلًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَالْبَيْعُ صَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَكَانَ الْقَبُولُ فِي الْحُرِّ شَرْطًا لِلْبَيْعِ فِي الْعَبْدِ، وَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে একত্রে অথবা জবাইকৃত বকরি ও মৃত বকরিকে একত্রে বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রয় উভয়ের ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি প্রত্যেকটির জন্য পৃথক মূল্য উল্লেখ করে, তাহলে দাস ও জবাইকৃত বকরির মধ্যে বিক্রয় বৈধ হবে। আর যদি দাস ও মুদাব্বারকে একত্রে অথবা নিজ ক্রীতদাস ও অন্যের ক্রীতদাস একত্রে বিক্রি করে, তাহলে আমাদের তিন ইমামের মতে দাসের মধ্যে আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় বৈধ হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়ের মধ্যেই বিক্রয় ফাসিদ হবে। যে পশুর জবাইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা মৃত পশুর ন্যায়। মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদ মুদাব্বারের বিধানভুক্ত। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো প্রথম মাসআলার উপর কিয়াস। কেননা, বিক্রয়ের সম্পর্ক সমগ্র পণ্যের সাথে করার কারণে, তাতে বিক্রয়ের যোগ্যতা রহিত হয়ে গেছে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, ফাসাদকারীর পরিমাণানুযায়ী ফাসাদ নিষীত হয়। সুতরাং ফাসাদ দাসের প্রতি সম্প্রসারিত হবে না। যেমন- কেউ কোনো অপরিচিতা নারী ও তার বোনকে একত্রে বিবাহ করল [তাহলে অপরিচিতার ক্ষেত্রে বিবাহ বৈধ এবং বোনের ক্ষেত্রে অবৈধ]। এর ব্যতিক্রম হবে যদি প্রত্যেকটির মূল্য উল্লেখ না করে। কেননা, মূল্য তখন অজ্ঞাত। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আর এটা ই দু মাসআলার মাঝে বিভাজন রেখা- স্বাধীন ব্যক্তি কোনোভাবেই বিক্রয়চুক্তির আওতায় আসতে পারে না। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তি মাল নয়, আর বিক্রয় হলো একটি মাত্র চুক্তি। সুতরাং তখন দাসের বিক্রি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হবে স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয়কে কবুল করা। আর এটা তো একটি ফাসিদ শর্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا فَتَنَّا بِالْأَمْثَلِ وَالْأَشَدِّ قَوْلَهُ نَالَ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

**প্রথম মাসআলা :** কেউ স্বাধীন ব্যক্তি এবং দাস একত্রে বিক্রি করল অথবা জবাইকৃত বকরি এবং মৃত বকরি একত্রে বিক্রি করল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উভয় বিক্রি বাতিল হবে। প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে বর্ণনা করুক অথবা নাই করুক। উভয় অবস্থায় বিক্রি বাতিল। ইমাম মালিক (র.)-এর মতও তাই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উক্তি এমনই। আর ইমাম আহমদ (র.) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি বিক্রিতা তার বিক্রীত দুটি পণ্যের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করে। যেমন- এভাবে বলে, দাসের মূল্য পাঁচশত, আর স্বাধীন ব্যক্তির মূল্য পাঁচশত। একত্রে এক হাজার। তদ্রূপ যদি বলে জবাইকৃত বকরি ও মৃত বকরি একত্রে পাঁচশত টাকা। প্রত্যেকটির মূল্য আড়াইশ করে, তাহলে তার বিক্রয় প্রথম মাসআলায় ক্রীতদাসের মধ্যে, আর দ্বিতীয় মাসআলায় জবাইকৃত বকরির মধ্যে বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত বকরির মধ্যে বৈধ হবে না। কারণ, এগুলো মালই নয়। আর যদি প্রত্যেকটির মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ না করে; বরং একত্রে মূল্য উল্লেখ করে, যেমন বলল, স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম, তাহলে উভয়ের বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। এক কথায় সাহেবাইন মূল্য আলাদা করে বর্ণনা করার সুরতে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। আর আলাদা মূল্য বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর সাথে একমত পোষণ করেন।

**দ্বিতীয় মাসআলা :** কেউ দাস ও মুদাক্বার একত্রে বিক্রি করল কিংবা নিজের দাস অন্যের দাস একত্রে বিক্রি করল, উভয় অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন সকলের মতেই মালিকানাধীন দাসটির মধ্যে তার মূল্য অনুপাতে বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। তবে মুদাক্বার ও অন্যের দাসের ক্ষেত্রে বিক্রয় বৈধ হবে না। লেখক বলেন, যে জন্তুর জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা মৃত জন্তুর সমতুল্য। সুতরাং আল্লাহর নামে জবাইকৃত জন্তু এবং আল্লাহর নামে জবাইকৃত নয় এমন দুই জন্তু একত্রে যদি বিক্রি করে, তাহলে বিক্রয় বাতিল সাব্যস্ত হবে। যেমন- মৃত জন্তুর সাথে একত্রে বিক্রি করলে বাতিল হয়।

ভাষ্যগ্রন্থ ইনয়াতে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রশ্ন উল্লেখ করে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি এমন জন্তু খাওয়ার উপযুক্ত কিনা? এটি একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা। হানাফী মাযহাবে এমন জন্তু খাওয়ার অযোগ্য। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মতে তা খাওয়ার যোগ্য। ইমামগণের মতবিরোধের কারণে মাসআলাটির অবৈধতার মাঝে হালকা হয়ে গেছে। তাই এর হুকুম মুদাক্বারের ন্যায় হওয়া উচিত। গোলামের সাথে মুদাক্বার বিক্রি করলে গোলামের বিক্রয় যেমন বৈধ হয়, তেমনি বিতঙ্কভাবে জবাইকৃত জন্তুর সাথে আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া জবাইকৃত জন্তুর বিক্রি বৈধ হওয়া উচিত। প্রশ্নটির উত্তর হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম ছাড়া জবাইকৃত জন্তুটির খাওয়ার বিষয় মূলত মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা নয়; বরং এরূপ জন্তুর হালাল হওয়ার অভিমত পোষণ করা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের লঙ্ঘন।

আয়াতটি এই- **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ** অর্থাৎ 'তোমরা যাতে [ইচ্ছাকৃতভাবে] আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা খেয়ো না।' -সূরা আনআম।

তাই যারা এ অভিমত পোষণ করে তাদের মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই যদি বিচারক ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়া জন্তুর হালাল হওয়ার রায় দেন সে রায় কার্যকর হবে না। সুতরাং এটা মুদাক্বারের সমতুল্য হবে না; বরং এটা মৃত জন্তুর সমতুল্য।

লেখক বলেন, মুকাভাব ও উম্মে ওলাদ মুদাক্বারের ন্যায়। সুতরাং মুকাভাব ও উম্মে ওলাদকে যদি দাসের সাথে একত্রে বিক্রি করা হয়, তাহলে দাসের বিক্রি তার আনুগাতিক মূল্যে বৈধ হবে। কিন্তু মুকাভাব ও উম্মে ওলাদের বিক্রি সহীহ হবে না।



ইমাম যুফার (র.) বলেন, মুদাব্বার ও দাস এবং নিজ দাস ও অন্যের দাস একত্রে বিক্রি করা বৈধ নয়। উভয়ের ক্ষেত্রে বিক্রি ফাসিদ।

**ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল :** ইমাম যুফার (র.) দ্বিতীয় মাসআলাকে প্রথম মাসআলার উপর কিয়াস করেন। তিনি বলেন, প্রথম মাসআলায় স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের সাথে মিলানোর কারণে যেমন উভয়ের বিক্রয় ফাসিদ হয়েছে, তেমনি মুদাব্বারকে দাসের সাথে একত্রিত করার কারণে উভয়ের বিক্রি ফাসিদ হবে। উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য হলো, স্বাধীন ব্যক্তি যেমন বিক্রয়ের পাত্র নয়, তেমনি মুদাব্বার এবং অন্যের গোলামও বিক্রয়ের পাত্র নয়। সুতরাং বিক্রয়ের পাত্র না হওয়ার কারণে যদি প্রথম মাসআলায় সম্পূর্ণ বিক্রয় ফাসিদ হয়ে থাকে, তাহলে এখানেও তাই হবে। কেননা, ইল্লত এক হলে হুকুমও এক হয়। তিনি আরো বলেন, এখানে বিক্রয়ের নিসবত করা হয়েছে উভয়ের দিকে। উভয়ে মিলে একটা সত্তা হয়েছে। যে সত্তার পুরোটা মাল নয়: বরং একাংশ মাল। যেহেতু বিক্রির সম্পর্ক সমগ্রের সাথে, আর সমগ্র বা উভয়ের সম্মিলিত অংশ মাল নয়, তাই বিক্রি বৈধ হবে না।

**সাহেবাইন (র.)-এর দলিল :** ফাসাদ সৃষ্টিকারীর পরিমাণানুযায়ী ফাসাদ সংঘটিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেখানে ফাসাদ সৃষ্টিকারী থাকবে সেখানেই ফাসাদ বিস্তৃত হবে। যেখানে ফাসাদ সৃষ্টিকারী নেই সেখানে ফাসাদও ছড়াবে না। স্বাধীন ও মৃতের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টিকারী রয়েছে। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত আদৌ মাল নয়। আর মাল না হওয়ার কারণে বিক্রয়ের পাত্রও নয়। কারণ, বিক্রয়ের পাত্র বা বিক্রয়যোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো মাল হওয়া। যেহেতু ফাসাদ শুধুমাত্র স্বাধীন ও মৃতের মধ্যেই রয়েছে তাই এ দুয়ের মধ্যেই কেবল বিক্রয় ফাসিদ হবে, গোলাম ও জবাইকৃত বকরির মাঝে উক্ত ফাসাদ সম্প্রসারিত হবে না। তাই একত্রে বিক্রি করা অবস্থায় দাস ও মুদাব্বারের মধ্যে শুধুমাত্র মুদাব্বারের বিক্রয় ফাসাদ হয়। দাসের মধ্যে ফাসাদ বিস্তৃত হয় না। তাঁরা এর সমর্থনে একটি মাসআলা পেশ করেন যে, যদি কেউ কোনো অপরিচিতা নারী এবং নিজ বোনকে একত্রে বিবাহ করে, তাহলে বোনের বিবাহ ফাসিদ হয়, কিন্তু অপরিচিতা নারীর সাথে তার বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। এ মাসআলাতে বোনের বিবাহের ফাসাদ অপরিচিতা নারীর প্রতি বিস্তৃত হয়নি, আমাদের আলোচ্য মাসআলাটিও ঠিক তাই। তবে যদি কেউ স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে একত্রে বিক্রি করে এবং প্রত্যেকের মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ না করে, তাহলে বিক্রয় উভয়ের ক্ষেত্রে ফাসিদ হবে। কেননা, এ অবস্থায় দাসের মূল্য অজ্ঞাত। আর মূল্যের অজ্ঞতা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। তাই এখানে দাসের ক্ষেত্রেও বিক্রয় ফাসিদ হবে। পক্ষান্তরে যখন উভয়ের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন মূল্য সংক্রান্ত অজ্ঞতা থাকবে না বিধায় বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে।

**ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিলটি** প্রথম মাসআলা ও দ্বিতীয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশক। আর তা হলো, স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত জন্তু কোনোক্রমেই মাল নয়। তাই এরা বিক্রয়ের পাত্র হতে পারে না। কেননা, মাল নয় এমন বস্তু বিক্রয়চুক্তির অধীন হয় না। স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের বিক্রি এক চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে। এমনভাবে মৃত বকরি ও জবাইকৃত বকরির বিক্রি একই চুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। একই চুক্তির মাধ্যমেই যে হয়েছে এর দলিল হলো, ক্রেতা যদি শুধুমাত্র ক্রীতদাস ও জবাইকৃত জন্তুর মধ্যে বিক্রয় কবুল করে, আর স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত জন্তুর মধ্যে বিক্রয় কবুল না করতে চায়, তাহলে তা পারবে না; বরং ক্রেতা রাজি হলে উভয়ের মধ্যে রাজি হতে হবে, আর যদি বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করে তাহলে উভয়ের ব্যাপারে বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, মৃত জন্তু ও জবাইকৃত জন্তুর বিক্রয় এক চুক্তির অধীন, আর ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত জন্তু মাল না হওয়ার কারণে বিক্রয়ে বস্তু নয়। সুতরাং একই চুক্তির মধ্যে দাস [বিক্রয়যোগ্য] এবং স্বাধীন ব্যক্তি [অবিক্রয়যোগ্য] একই সাথে জমা হয়েছে, ফলে ব্যাপারটা এমন হলো যে, ক্রেতা যেন দাসের মধ্যে বিক্রয় গ্রহণ করার জন্য বিক্রয়যোগ্য নয় অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয় কবুল করার শর্ত করল। যেন সে বলল, দাস নিতে হলে তোমাকে স্বাধীন ব্যক্তিটিও নিতে হবে। আর এ শর্তটি একটি অন্যান্য ও ফাসিদ

শর্ত। ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। এ কারণে দাসের মধ্যেও বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিলের ব্যাপারে দুটি আপত্তি করা হয়—

**প্রথম আপত্তি :** যদি স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের পৃথকভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তো একটি চুক্তি হয় না; বরং দুটো পৃথক ও আলাদা চুক্তি হয়। আর যদি পৃথক চুক্তি হয়, তাহলে দাসের মধ্যে বিক্রয় গ্রহণযোগ্যতার জন্য স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করতে হবে এমন কোনো শর্ত করা হলো না। কেননা, তখনই এক্সপ শর্তারোপ করা হয়েছে, যখন একটি মাত্র চুক্তি হয়। যখন দুটি ভিন্ন চুক্তি হলো তখন একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক রইল না।

**দ্বিতীয় আপত্তি :** কোনো শর্ত ফাসিদ হওয়ার জন্য এটাও একটা শর্ত যে, এতে ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো এক পক্ষের স্বার্থ থাকতে হবে। অথবা ন্যূনতম বিক্রীত-বস্তুর স্বার্থ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য উল্লিখিত শর্ত তথা স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করার শর্তে কোনো এক পক্ষের স্বার্থ নেই। এমনকি এতে বিক্রীত ব্যক্তিরও কোনো উপকারিতা নেই। যেহেতু এতে কারো স্বার্থ নেই, তাই এটা ফাসিদ শর্ত সাব্যস্ত হবে না।

**প্রথম আপত্তির উত্তর :** স্বাধীন ও দাস উভয়ের মূল্য পৃথকভাবে করা সত্ত্বেও চুক্তি একটিই হয়েছে। কেননা, এখানে “বিক্রয়” ও “ক্রয়” কোনোটিই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়নি। যে পর্যন্ত “বিক্রয়” ও “ক্রয়” বাচক শব্দ একাধিকবার উল্লিখিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় একটিই হবে— একাধিক হবে না।

**দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর :** স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করার শর্তের মধ্যে বিক্রেতার সুবিধা রয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতার লাভ এভাবে যে, স্বাধীন ও ক্রীতদাস একসাথে এক হাজার টাকার বিক্রি করা হচ্ছে। স্বাধীন ব্যক্তি মাল নয় সুতরাং তার অনুকূলে মূল্যও আসবে না। ক্রীতদাসের একক মূল্যও এক হাজার হবে না। বিষয়টি যেন এমন হলো যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলছে, আমি এই দাস পাঁচশত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছি এই শর্তে যে, তুমি আরও পাঁচশ টাকা আমাদের অতিরিক্ত প্রদান করবে। এমতাবস্থায় বিক্রেতা বিনিময় ছাড়াই পাঁচশ টাকা লাভ করল, আর এটাই হলো সুদ। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে একটি ফাসিদ শর্ত। বিক্রয়ে ফাসিদ শর্তের উপস্থিতির কারণে বিক্রয়টি বাতিল সাব্যস্ত হবে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দাস ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একটি চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করার কারণে সেটা প্রাথমিক স্তরেই আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় হলো। অর্থাৎ গুরুতে মূল্য উভয়ের জন্য ভাগ করতে হবে। আর প্রাথমিক স্তরে বা গুরুতে আনুপাতিক মূল্যে বিক্রি করা ফাসিদ ও অবৈধ।

بِخِلَافِ النِّكَاحِ، لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدَةِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فِي هَؤُلَاءِ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ دَخَلُوا تَحْتَ الْعَقْدِ لِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ فِي عَبْدٍ غَيْرِ بِإِجَارَتِهِ، وَفِي الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْمُدَبَّرِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَكَذَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ ابْنِ حَنِيْفَةَ وَإِبْنِ يُوْسُفَ (رح) إِلَّا أَنَّ الْمَالِكَ يَسْتَحْقَقُ الْمَيْبَعِ وَهَؤُلَاءِ يَسْتَحْقَقُهُمْ أَنْفُسُهُمْ رَدُّوا الْبَيْعَ، فَكَانَ هَذَا إِشَارَةً إِلَى الْبَقَاءِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ شَرْطًا لِلْقَبُولِ فِي غَيْرِ الْمَيْبَعِ، وَلَا بَيْعًا بِالْحَصَةِ ابْتِدَاءً، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ.

অনুবাদ : বিবাহের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, বিবাহ ফাসিদ শর্তের কারণে বাতিল হয় না। পক্ষান্তরে অন্যের দাস, মুদাক্কার, মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি মূলতবি থাকে। আর এগুলো মাল হওয়ার যোগ্যতা থাকার কারণে বিক্রয়চুক্তির আওতাভুক্ত হয়। আর এ কারণেই অন্যের দাসের ক্ষেত্রে তার অনুমতি সাপেক্ষে বিক্রয় কার্যকর হয়। মুকাতাবের ক্ষেত্রে বিত্বদ্বতার মতানুযায়ী তার সম্মতিক্রমে বিক্রয় কার্যকর হয়। মুদাক্কারের ক্ষেত্রে বিচারকের রায়ে বিক্রয় শুদ্ধ হয়। এমনভাবেই ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রেও বিক্রয় কার্যকর হয়। তবে বিক্রীত দাসের উপর মালিকের অধিকার থাকার কারণে এবং মুদাক্কার সহ অন্যদের নিজ সত্তার উপর অধিকার বলে তারা বিক্রয়চুক্তিকে নাকচ করে দেয়। তাদের এ বিক্রয় প্রত্যাখ্যান বিক্রয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। যেমন- কেউ দুটি গোলাম খরিদ করল, আর এদের একটি দখলে নেওয়ার পূর্বেই মরে গেল। আর এটা বিক্রীত-পণ্য নয় এমন কিছুতে বিক্রয় কবুল করার শর্ত হলো না এবং প্রথম থেকেই আনুপাতিক হারের বিক্রয় হলো না। আর এ কারণে প্রত্যেকটির মূল্য উল্লেখ করা শর্ত নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ (র.)-এর দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সাহেবাইন (র.) এটাকে বিবাহের উপর কিয়াস করেছিলেন। উত্তরে লেখক বলেন, বিবাহের উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়। কারণ, বিবাহে ফাসিদ শর্তারোপ করলেও বিবাহ ফাসিদ হয় না; বরং শর্তই বাতিল হয়ে যায়। বিক্রয়ের ব্যাপার তার থেকে ভিন্ন। কারণ, বিক্রয়ে ফাসিদ শর্ত করা হলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং কিয়াস শুদ্ধ হয়নি। কারণ, কিয়াস করার অন্যতম শর্ত হলো مَفْنَسٌ وَمَفْنَسٌ عَلَيْهِ উভয়ের মান এক হতে হবে।

দ্বিতীয় মাসআলায় বলা হয়েছে- মুদাক্কার, উম্মে ওয়ালাদ ও অন্যের ক্রীতদাস যুক্ত করে বিক্রি করা হলে দাসের ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হবে, আর এগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয় স্থগিত থাকবে।

আর দ্বিতীয়ত এগুলোসহ বিক্রি করা হলে এগুলো বিক্রয়ভুক্ত হবে। কারণ, এগুলোর মধ্যে মাল হওয়ার গুণ বিদ্যমান রয়েছে। মাল হওয়ার বিষয়টি দুটি বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয়- ১. দাসত্বের বিদ্যমানতা, ২. মূল্যমান থাকা। মুদাক্কার, মুকাতাব, উম্মে ওয়ালাদ ও অন্যের দাসের মধ্যে দাসত্ব ও মূল্যমান উভয়ই রয়েছে। যেহেতু উভয় বিষয় এদের মধ্যে বিদ্যমান, তখন এদের মধ্যে মাল হওয়ার গুণও বিদ্যমান। মাল হওয়ার গুণ থাকার কারণে এগুলো বিক্রয়ের পাত্র হবে। তবে এগুলোর বিক্রি পূর্বে যেমন বলা হয়েছে স্থগিত ও মূলতবি থাকবে এবং বিক্রয়ের হুকুম তথা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এদের মধ্যে মুদাক্কারের বিক্রি বিচারকের রায়ে উপর মূলতবি থাকবে। মুকাতাবের বিক্রি তার অনুমতির উপর নির্ভরশীল। উম্মে ওয়ালাদের বিক্রি শায়খাইনের মতানুযায়ী বিচারকের রায় পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত এবং অন্যের দাসের বিক্রয় তার মালিকের সম্মতির উপর মূলতবি থাকবে। এ কারণেই মুদাক্কারের বিক্রয় বিচারকের রায়ে কার্যকর হয়ে যায়, মুকাতাবের বিক্রয় তার অনুমতিক্রমে শুদ্ধ হয়ে

যায় এবং শায়খাইনের মতানুযায়ী উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় বিচারকের রায়ে কার্যকর হয়ে যায়। এমনভাবে অন্যের দাসের বিক্রয় তার মালিকের অনুমতিক্রমে শুদ্ধ হয়ে যায়।

উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিচারকের রায়েও উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় কার্যকর হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝেও মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন- হযরত ওমর (রা.) এ বিক্রয় কোনোক্রমেই বৈধ মনে করতেন না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (র.) বৈধ মনে করতেন। অধিক সংখ্যক সাহাবী হযরত ওমর (রা.)-এর মত অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে তাবেয়ীদের যুগে হযরত ওমর (রা.)-এর মতের উপর ইজমা হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মনে করেন, তাবেয়ীদের ইজমা সাহাবীদের মতবিরোধকে অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং বিচারকের ফয়সালা এখন ইজমার বিপক্ষে যাবে, তাই বিচারকের রায় কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.) মনে করেন, তাবেয়ীদের ইজমা এতটুকু শক্তি শক্তিশালী নয় যে, তার দ্বারা সাহাবীগণের কারো মতকে অগ্রাহ্য করা যাবে, তাই তাদের মতবিরোধ এখনও গ্রহণযোগ্য। আর মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাতে বিচারকের রায়ই সর্বশেষ কথা। তাই তারা বলেন, যদি বিচারক উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয়ের অনুকূলে মত দেন, তাহলে তাই গ্রহণযোগ্য। তাদের এ মতপার্থক্য মূলত মূলনীতি সংক্রান্ত।

এখানে হিদায়া প্রণেতার ইবারতের উপর একটি আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, অধ্যায়ের শুরুভাগে তিনি বললেন, **بَيْعُ الْوَلَدِ** অর্থ এখানে বললেন **وَالْوَلَدُ الْمَرْكُوبُ** অর্থ এখানে বললেন **وَالْوَلَدُ الْمَرْكُوبُ** দু-স্থানে তার ইবারত দু-রকম হয়ে গেল। এর উত্তরে বলা হয় যে, এদের বিক্রয় তখনই বাতিল হবে যখন মুকাভাব সম্মতি না দেবে। অত্রপ উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারের বিক্রয়ের অনুকূলে বিচারক রায় না দেবেন। তবে বিচারকের রায় ও মুকাভাবের সম্মতি ও অসম্মতির পূর্বে বিক্রয় মওকুফ থাকবে।

**قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ السَّائِلَ بِاسْتِغْنَائِهِ** : এ বাক্যটি দ্বারা হিদায়া প্রণেতা একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। আপত্তিটি হলো, যখন মুকাভাব, মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও অন্যের দাস বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো মাল হওয়ার গুণের কারণে, তখন তো এদের বিক্রয় ফাসিদ না হওয়া সমীচীন ছিল, কিন্তু তা না হয়ে মওকুফ হলো কেন? এর উত্তর হলো, এগুলো বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও তা ছিল অন্যের মতামত বা রায়ের উপর নির্ভরশীল। যাদের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা তাদের ক্ষমতা বলে বিক্রয়কে বহাল যেমন রাখতে পারে, তেমনি তারা বিক্রয়কে বাতিলও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের ক্ষমতা বলে বিক্রয়কে বাতিল করেছে, তাই বিক্রয় ফাসিদ হয়েছে। অন্যদের ক্ষমতার বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো, অন্যের দাসের বেলায় দাসের উপর মালিকের অধিকার রয়েছে। আর মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও মুকাভাবের নিজেদের স্বীয় সত্তার উপর অধিকার রয়েছে। তারা প্রত্যেকে আপন অধিকার বলে বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাদের বিক্রয় প্রত্যাখ্যান এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে, তাদের মধ্যে বিক্রয় সংঘটিত ছিল। ছিল বলেই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। যখন তাদের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যাপারটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো, তখন এটাও প্রমাণিত হলো যে, তারা বিক্রয়ের পাত্র বটে। আর যে দাসের সাথে তাদের যুক্ত করে বিক্রি করা হয়েছিল তাহা নিঃসন্দেহে বিক্রয়ের পাত্র। সুতরাং উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কারণে বিক্রয়দ্রব্যের মধ্যে বিক্রয় কবুল করার জন্য বিক্রয়দ্রব্য নয় এমন জিনিসের বিক্রয় কবুল করার শর্ত করা হয়নি; বরং বিক্রয় নয় এমন কিছুই এখানে নেই। সুতরাং যখন এমন শর্ত করা হয়নি তখন দাসের মধ্যে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। অর্থ প্রতিপক্ষ বিক্রয় অবৈধ হওয়ার মূল কারণ এটাকে বর্ণনা করেছিল।

অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল ছিল প্রাথমিক অবস্থায় মূল্য ভাগ করা আবশ্যিক হয়। এর উত্তর হলো, এখানে প্রাথমিক অবস্থায় মূল্য ভাগ করা আবশ্যিক নয়। কারণ, যখন মুদাব্বার ও অন্যান্য বিক্রয়ের অধীন হয়ে গেল, তখন চুক্তির শুরুতেই মূল্য ভাগ করা হয়নি; বরং এটা হবে তখন, যখন বিক্রয়ের পর কজা করার সময় হবে। আর একে প্রাথমিক অবস্থায় আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় বলা না; বরং পরিগণমাণত আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিক্রয় অবৈধ নয়। আর এখানে দ্বিতীয় প্রকারের বিক্রয় **بَيْعٌ بِالنِّعْمَةِ** [আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয়] হয়েছে। তাই উপরের সবগুলো অবস্থাতেই ক্রীতদাসের বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। এ কারণেই ক্রীতদাস ও মুদাব্বারের আলাদা মূল্য উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এর উদাহরণ এরূপ যে, কেউ দুটি ক্রীতদাস বিক্রি করল, তারপর কেতা তার আয়ণ্ডে নেওয়ার আগেই একটি মরে গেল, তাহলে অপর দাসের বিক্রয় তার মূল্য অনুপাতে বৈধ হয়ে যাবে। কেননা, এতে বিক্রয়ের পাত্র নয় এমন দ্রব্যের কবুল করার কোনো অবৈধ শর্তও নেই। আবার এটা **بَيْعٌ بِالنِّعْمَةِ** ও নয়। আর এ দুটো বিষয় বিক্রয় ফাসিদ করে দেয়। মোটকথা, স্বাধীন ও ক্রীতদাস একত্রে বিক্রি করতে বিক্রয়ের পাত্র নয় এমন জিনিসের ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করা আবশ্যিক হয় এবং এতে প্রাথমিক অবস্থায় **بَيْعٌ بِالنِّعْمَةِ** আবশ্যিক হয়, তাই এ অবস্থায় ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে বিক্রি বাতিল হবে যখন। পক্ষান্তরে মুদাব্বারকে ক্রীতদাসের সাথে যুক্ত করে একত্রে বিক্রি করলে **بَيْعٌ بِالنِّعْمَةِ** আবশ্যিক হয় না, তাই এ অবস্থায় ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হয়ে যায়।

## فَضْلٌ فِي أَحْكَامِهِ

وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرَى الْمَبِيعَ فِي الْمَبِيعِ الْفَائِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ، وَفِي الْعَقْدِ عَوَضًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ، مَلَكَ الْمَبِيعَ وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح): لَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ قَبِضَهُ، لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ، فَلَا يَنْأَلُ بِهِ نِعْمَةَ الْمِلْكِ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ نَسْخٌ لِلْمَشْرُوعَةِ لِلتَّضَادِّ، وَلِهَذَا لَا يُفِيدُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ بِالْمَبِيعَةِ أَوْ بَاعَ الْخَمْرَ بِالْدَّرَاهِمِ، وَلَسْنَا أَنْ رُكِّنَ الْمَبِيعَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ، فَوَجِبَ الْقَوْلُ بِإِنْعِقَادِهِ، وَلَا خَفَاءَ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ، وَرُكْنُهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَفِيهِ الْكَلَامُ، وَالنَّهْيُ يَقْرُرُ الْمَشْرُوعَةَ عِنْدَنَا، لِإِقْتِضَائِهِ التَّصَوُّرَ، فَنَفْسُ الْمَبِيعِ مَشْرُوعٌ، وَبِهِ تَنَالُ نِعْمَةُ الْمِلْكِ، وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ مَا يُجَاوِرُهُ، كَمَا فِي الْمَبِيعِ وَقْتَ الْبَيْعِ.

### অনুচ্ছেদ : ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম

অনুবাদ : যদি ক্রেতা ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার সম্মতিতে বিক্রীত-পণ্য কজা করে। আর বিক্রয়চুক্তিতে এমন দুটি বিনিময়-দ্রব্য থাকে, যার প্রতিটি মালকপে বিবেচিত, তাহলে সে বিক্রীত-পণ্যটির মালিক হয়ে যাবে এবং তার উপর পণ্যের বাজারমূল্য [পরিশোধ করা] আবশ্যিক হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হবে না; যদিও সে পণ্যটি কজা করে। কেননা, এটা নিষিদ্ধ বিক্রি, তাই এর দ্বারা মালিকানার নিয়ামত লাভ করা যেতে পারে না। তাছাড়া এজন্য যে, এর নিষিদ্ধতা শরিয়তের অনুমোদনকে রহিতকারী। কেননা, নিষেধাজ্ঞা ও অনুমোদনের মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান। আর এজন্যই তো দখলের পূর্বে তা মালিকানা সাব্যস্ত করে না। ফলে এটা মৃতের বিনিময়ে বিক্রি করার মতো হলো, অথবা মদকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করার মতো হলো। আমাদের দলিল হলো: বিক্রয়ের রুকন [তথ্য প্রস্তাব ও গ্রহণ] তার যথাযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং তাকে যোগ্য স্থানেই প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা আবশ্যিক। আর [বিক্রেতার বিক্রয় সম্পাদনের] যোগ্যতা ও বিক্রয়পাত্র হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। বিক্রয়ের রুকন হলো মালের দ্বারা মালের বিনিময় করা। আর এটিই হলো মতপার্থক্যের বিষয়। আমাদের মতে নিষেধাজ্ঞা কোনো বিষয়ের শরিয়তসম্মত হওয়ার বিষয়টি সুসাব্যস্ত করে। কেননা, এ নিষেধাজ্ঞা নিষেধকৃত কাজটির সম্ভাব্যতাকে দাবি করে। সুতরাং মূল বিক্রয়কর্ম শরিয়তসম্মত। আর তা [বিক্রয়কর্ম] দ্বারাই মালিকানা লাভের নিয়ামত অর্জিত হয়। নিষিদ্ধ তো ঐ বিষয়, যা বিক্রয়চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। যেমন-জুমার নামাজের আজানের সময় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَحْكَامُ الْفَاسِدِ: ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের বিস্তারিত আলোচনার পর লেখক এ অনুচ্ছেদে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের أَحْكَامُ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। أَحْكَامُ শব্দটি حُكْمُ -এর বহুবচন। কোনো বিষয়ের ফলাফলকে حُكْمُ [হুকুম] বলা হয়। ফলাফল যেহেতু কর্মের পরে হয়, সেহেতু ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনার পর লেখক এর হুকুম বর্ণনা করেছেন। বিক্রয়ের

হুকুম হলো মালিকানা লাভ হওয়া। ফাসিদ বিক্রির দ্বারা মালিকানা লাভ হবে কিনা এ অনুচ্ছেদের তারই বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হানাকী মাযহাবে ফাসিদ ও বাতিল-বিক্রয়ের পৃথক দুটি প্রকার। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ফাসিদ ও বাতিল একই জিনিস। এ দুয়ের মাঝে তাঁর মতে কোনো পার্থক্য নেই।

فَوْنُهُ وَإِذَا قَصَّ الْمُشْتَرِي الْخُفَا: যে মাসআলাটির কথা প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ে যদি ক্রেতা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অনুমতি নিয়ে বিক্রয়পণ্যটি কজা করে, আর উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের উভয় বিনিময়-দ্রব্য শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল হয়, তাহলে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যাবে এবং তার উপর পণ্যের বাজারমূল্য (فَيْسَتْ) পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। তাদের উভয়ের মাঝে ধার্যকৃত (ثَمَنٌ) মূল্য প্রদান আবশ্যক হবে না। উল্লেখ্য যে, উভয় বিনিময়-দ্রব্য মাল না হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে এবং এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। যেমন মৃত লাশ কিংবা রক্তের বিনিময়ে কোনো পণ্য বিক্রি করা। বিক্রয়চুক্তি বাতিল হলে এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। কজা করার পূর্বে কিংবা পরে- কোনো অবস্থাতেই নয়।

প্রকাশ থাকে যে, মালিকানা লাভের বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন বিক্রয়ে خَبَارٌ শর্ত থাকে। যদি 'বিয়ারে শর্ত' থাকে, তাহলে কজা করলেও এর দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা, শুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়েই 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। ইবারতে বলা হয়েছে যে, ক্রেতার উপর বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক বা ওয়াজিব। এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বিক্রীত-পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে যায়। আর যদি পণ্যটি হাতে থাকে, তখন তার উপর ওয়াজিব পণ্যটি ফেরত দানের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা।

সারকথা হলো, আমাদের মতে ফাসিদ বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য কজা করলে এর দ্বারা মালিকানা লাভ হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ফাসিদ বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য দখলে নিলেও এর দ্বারা মালিকানা লাভ হবে না। ইমাম মালিক এবং আহমদ (র.)-এর মতও একপই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দাঁলিল : ফাসিদ বিক্রয় একটি হারাম পদ্ধতি। অন্যদিকে মালিকানা লাভ করা একটা নিয়ামত। হারাম কাজ কোনো নিয়ামত লাভের মাধ্যম বা সর্বব হতে পারে না। سَبَبٌ শব্দের অর্থ কার্যকারণ বা হেতু। সর্বব পাওয়া গেলে তার মুসাক্কাব পাওয়া যাবে। সেই সাথে সর্বব ও মুসাক্কাব উভয়ের মাঝে সম্পর্ক অবশ্যই থাকতে হবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফাসিদ বিক্রয় বা হারাম কাজটি হলো সর্বব। আর মুসাক্কাব বা ফলাফল হলো মালিকানার নিয়ামত লাভ। অথচ এ দুয়ের মাঝে কোনোই সম্পর্ক নেই। এ কারণে ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানার নিয়ামত লাভ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, জাহিলিয়া যুগে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলাম সেগুলোর অবৈধতা ঘোষণা করে। শরিয়ত প্রবর্তকের নিষেধবাণী এর বৈধতাকে রহিত করে দিয়েছে। রহিত হওয়ার কারণ হলো, নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতা এ দুয়ের মাঝে বৈপরীতা বিদ্যমান। কেননা, নিষেধাজ্ঞার রহিত হলে এটার নিকৃষ্টতা প্রমাণিত করা। পক্ষান্তরে বৈধতা বিষয়টির সৌন্দর্য ও উত্তম হওয়া প্রমাণ করে। উত্তম ও নিকৃষ্ট এ দুয়ের মাঝে খোলাখুলি বৈপরীতা রয়েছে। ফলে এগুলোকে যা টেনে আনে তথা নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতার মাঝেও বৈপরীতা রয়েছে। যখন উভয়ের মাঝে বৈপরীতা প্রমাণিত হয়ে গেল তখন এগুলো একই সময়ে একত্রিত হওয়ার অসম্ভাবতাও প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং কোনো বিষয় একই সাথে বৈধ ও নিষিদ্ধ হতে পারবে না। সুতরাং যখন কোনো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আসল তার সাথে সাথে সে বিষয়ের বৈধতা রহিত হয়ে গেল।

অতএব ফাসিদ বিক্রয়ের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। এজন্যই তো ফাসিদ বিক্রয় কজার পূর্বে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে না। কেননা, ফাসিদ বিক্রয় যদি শরিয়ত সমর্থিত হতো, তাহলে কজার পূর্বেই এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতো। কজার আগে মালিকানা অর্জিত না হওয়াটাই ফাসিদ বিক্রয়ের বৈধতা রহিত হওয়ার দলিল।

যে বিষয়ের অনুমোদন রহিত হয়ে যায় তা কোনো শরিয়তের হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে পারে না। আর এ কারণে ফাসিদ বিক্রয় দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। ফলে এটা এমন হয়ে গেল যে, কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্য মৃত লাশের বিনিময়ে বিক্রি করল, অথবা সে মদকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করল। এ জাতীয় বিক্রয়ের ক্রেতা যদি পণ্য কজা করে, তবু আহনাফের মতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে না। সুতরাং যেভাবে এসব স্থানে বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কারণে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হবে না, তেমনি আলোচ্য ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রীত-পণ্য কজা করলেও এর মালিক হবে না।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) بَاعَ بِالنَّيْتَرِ كَذَا বলে ফাসিদ বিক্রয়কে বাতিল বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, তাঁর মতে ফাসিদ ও বাতিলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যা আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি।

আমাদের দলিল হলো, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় তথা যে ক্রয়-বিক্রয়ে **مُبَادَّةُ الْمَالِ بِالسَّالِ بِالْأَرْضِ** [উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান] পাওয়া গেছে, কিন্তু বিক্রয়চুক্তিটি কোনো অবৈধ শর্তের কারণে ফাসিদ হয়েছে বিক্রয়ের রুকন তথা ইজাব ও কবুল এমন ব্যক্তিদ্বয় থেকে সংঘটিত হয়েছে, যারা এ কাজের যোগ্য [অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন] এবং বিক্রয়ের রুকন এমন পাঠে সম্পূর্ণ করা হয়েছে, যা প্রকৃতই বিক্রয়দ্রব্য ও বিক্রয়যোগ্য মাল। সুতরাং যখন বিক্রয়ের রুকন যোগ্য লোক থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং বিক্রয়ের পণ্য ও মাল হিসাবে গণ্য, তখন তো বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। যখন বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে তখন তার হুকুম ও পাওয়া যাওয়া আবশ্যিক। আর বিক্রয়ের হুকুম হলো পণ্যের মধ্যে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

লেখক বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই, তেমনি বিক্রয়ের পাত্র তথা বিক্রয়পণ্য মাল হওয়ার ব্যাপারেও কোনো অস্পষ্টতা নেই। সব যোগ্যতা পাওয়া যাওয়ার পর যথানিয়মে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পরে সম্মতিক্রমে তারা মাল বিনিময় করেছেন। উল্লেখ্য যে, বিক্রয়ের রুকন হচ্ছে **مُبَادَّةُ الْمَالِ بِالسَّالِ بِالْأَرْضِ** [উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মাল বিনিময় করা]। আর বিনিময় সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুল দ্বারা। সুতরাং পরস্পর বিনিময়ের অর্থই হচ্ছে ইজাব ও কবুল করা। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারে বিক্রয়ের রুকন হলো ইজাব ও কবুল। অতএব ইজাব-কবুল হওয়ার পর বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা থাকতে পারে না।

উপরউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ফাসিদ বিক্রয়ের মধ্যে উভয় বিনিময় মাল হয়ে থাকে। যদি কোনো একটি মাল না হয়, তাহলে বিক্রয়ের রুকন পাওয়া যাবে না বা মালের বিনিময়ে মাল হবে না। এর ফলশ্রুতিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন- মদের বিনিময়ে কোনো দ্রব্য কেনা হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়। আর বিক্রয়চুক্তি বাতিল হলে এর দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। সারকথা, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ে 'মালের বিনিময়ে মাল' বিদ্যমান, বিক্রয়ের রুকন ইজাব ও কবুলযোগ্য লোক থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং বিক্রয়ের পাত্রও যথার্থ। সুতরাং ফাসিদ বিক্রয় সত্তাগতভাবে শুদ্ধ ও শরিয়তসম্মত। আর শরিয়তসম্মত যে কোনো বিক্রয়ের দ্বারা মালিকানা লাভ হবেই।

এখানে একটি আপত্তি হয় যে, ফাসিদ বিক্রয়ের ব্যাপারে যেহেতু শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই এটা কোনোভাবেই শরিয়তসম্মত হতে পারে না, আর শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ কোনো চুক্তি দ্বারা মালিকানা কিভাবে লাভ হবে ?

এর জবাবে লেখক বলেন, **وَالْتَنَهَى بَعْرُ الْمَشْرُوعَةِ** অর্থাৎ আমাদের মতে **يُحَى** [নিষেধাজ্ঞা] দু প্রকার :

১. **الْأَفْعَالُ السَّرْعِيَّةُ** শরিয়ত অনুমোদিত কাজে নিষেধবাণী। এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞা মূলত এমন কাজের ব্যাপারে হয়, যে কাজ শরিয়তে বৈধ, তবে এতে পারিপার্শ্বিক কারণে অবৈধতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে কাজটিতে পারিপার্শ্বিক কারণে নিষেধাজ্ঞা আসে তা আপন সত্তাগতভাবে বৈধ। তার সত্তাতে কোনো অবৈধতা নেই। তবে তার কোনো গুণ কিংবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবৈধতা বিদ্যমান। আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা গুণটির কারণেই সেটা অবৈধ। বিষয়টিকে আরও এতে প্রকাশ করা যায় যে, **حَسَنٌ لِّدَانِهِ وَكَبِيرٌ لِّغَيْرِهِ**। যেমন- জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরুহ। এ মাসআলাতে ক্রয়-বিক্রয় যদিও সত্তাগতভাবে সহীহ, কিন্তু আজানের সময়ে হওয়ার কারণে এটি মাকরুহ হয়ে গেছে।

২. **الْأَفْعَالُ الْعَبِيَّةُ** : এরূপ কাজকে **جَبَّةٌ** বলা হয়, যার অস্তিত্ব শরিয়ত প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। এর পরিচয় শরিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন ব্যাভিচার, মদ পান, মিথ্যা ইত্যাদি। এ জাতীয় কাজ শরিয়ত আগমনের অনেক আগ থেকেই মানুষের জানা রয়েছে এবং শরিয়তের আগমনের কারণে এগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ ধরনের কাজ সত্তাগতভাবে অবৈধ এবং মূল কাজটাই খারাপ ও নিকৃষ্ট।

আমাদের আলোচ্য মাসআলায় **نَهَى** [নিষেধবাণী] হলো প্রথম প্রকারের, যা নিষেধকৃত কাজের অস্তিত্বকে দাবি করে। এ কারণে উক্ত নিষেধাজ্ঞা কাজের বৈধতা ও শরিয়ত অনুমোদিত হওয়াকে রহিত করে না; বরং বৈধতাকে নিশ্চিত ও পাকাপোক্ত করে। তাই এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, কাজটি বৈধ, তবে শর্ত ফাসিদ ও অবৈধ। সুতরাং ফাসিদ বিক্রয়ের অবস্থায় বিক্রয়চুক্তিটি বৈধ হবে এবং শর্তটি ফাসিদ হবে। আর মালিকানার নিয়ামত লাভ করার জন্য বিক্রয়ের সত্তাগত বৈধতাই যথেষ্ট। অতএব বিক্রয়ের সত্তার কারণে মালিকানা অর্জিত হবে। আর যখন মূল বিক্রয়ের কারণে মালিকানা লাভ হলো এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের পরিবর্তে মালিকানা লাভ হলো না [যেমনটা ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন] তখন আর কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

وَلَا تَأْتِيكَ إِلَّا يَتَبَيَّنُ الْمَلِكُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَيْلًا يُؤَدَّى إِلَى تَقْرِيرِ الْفَسَادِ الْمَجَارِي، إِذْ هُوَ وَاجِبُ الرَّفْعِ بِالِاسْتِرْدَادِ فَيُالِامِتِنَاعَ عَنِ الْمَطَالَبَةِ أَوَّلَى، وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ ضَعُفَ لِمَكَانِ افْتِرَائِهِ بِالْقَبْضِ، فَيُسْتَرْطُ اعْتِصَادُهُ بِالْقَبْضِ فِي إِفَادَةِ الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الْهَبَةِ، وَالْمَيْتَةِ لَيْسَتْ بِمَالٍ، فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ، وَلَوْ كَانَ الْخَمْرُ مُثْمَنًا فَقَدْ خَرَجَتْهُ وَشَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ الْوَاجِبَ هُوَ الْقِيَمَةُ، وَهِيَ تَصْلُحُ ثَمَنًا لَا مُثْمَنًا.

অনুবাদ : আর কজার পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না এজন্য যে, যেন তা সংশ্লিষ্ট ফাসাদকে স্থিতির দিকে না নিয়ে যায় ! কেননা, বিক্রীত-দ্রব্য ফেরত আনার মাধ্যমে উক্ত ফাসাদ বিদূরিত করা ওয়াজিব। সুতরাং ক্রেতার [বিক্রীত-দ্রব্য কজা করার] তাগাদা করা থেকে বিরত থাকা উত্তম। তা ছাড়া নিকট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে মালিকানার সববও দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যে কজা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করার শর্ত করা হয়; হেবার অনুরূপ। মৃত লাশ তো মাল নয়। সুতরাং এতে বিক্রয়ের রুকন অনুপস্থিত। আর মদ যদি বিক্রয়পণ্য হয়, তাহলে তো এর প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। তাছাড়া আরেকটি বিষয় হলো, মদের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তো বাজারমূল্য আবশ্যক হয়। আর বাজারমূল্য তো ধার্যকৃত মূল্যের স্থলবর্তী হয়- বিক্রয়পণ্যের স্থলবর্তী হয় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَأْتِيكَ إِلَّا يَتَبَيَّنُ الْمَلِكُ قَبْلَ النِّجَ: লেখক উপরিউক্ত ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) ফাসিদ বিক্রয়ের কজা পরবর্তী অবস্থাকে কজা পূর্ববর্তী অবস্থার উপর কিয়াস করেছিলেন। তিনি বলেন, কজা পূর্ববর্তী অবস্থায় যেমন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনি কজা পরবর্তী অবস্থায় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এর উত্তরে লেখক বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উক্ত কিয়াস সঠিক নয়। কেননা, ফাসিদ বিক্রয়ে যদি কজা করার পূর্বেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে যাবে। তদ্রূপ বিক্রেতার উপর বিক্রয়পণ্য অর্পণ করা আবশ্যক হবে। আর ক্রেতার মূল্য প্রদান করা ও বিক্রেতার বিক্রয়পণ্য প্রদান করার দ্বারা বিক্রয়ের সাথে যুক্ত হওয়া ফাসাদ ও অবৈধতা সুদূর করা হবে। আর যে কোনো ধরনের ফাসাদকে সুদূর করা নাজায়েজ। অথচ শরিয়তে ফাসাদকে দূর করার নির্দেশ দিয়েছে। তা এভাবে যে, ক্রেতা যদি বিক্রয়পণ্য কজা করে, তাহলে তার উপর বিক্রয়পণ্য ফেরত দিয়ে ফাসাদ দূর করা ওয়াজিব। যা দূর করা ওয়াজিব, তা সুদূর করা অবশ্যই অবৈধ ও নাজায়েজ। সুতরাং যখন ক্রেতার উপর দখলকৃত বিক্রয়পণ্যকে ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, তখন ক্রেতার পক্ষে বিক্রয়পণ্যকে অর্পণ করার দাবি থেকে বিরত থেকে ফাসাদকে দূর করা আরো স্বাভাবিকভাবে ওয়াজিব হবে। কেননা, ক্রেতার পক্ষে বিক্রয়পণ্য অর্পণ করার দাবি থেকে বিরত থাকা বিক্রয়পণ্য কজা করার পর তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে সহজ। মোটকথা, বিক্রয়ের মধ্যে সেই ফাসাদকে দূর করা আবশ্যক, সেই ফাসাদকে শক্তিশালী ও সুদূর করা অবৈধ ও নাজায়েজ। ফাসাদ সুদূর হয় কজার পূর্বে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা। আর এজন্যই আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে কজার পূর্বে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাছাড়া আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যদি কজার পূর্বেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে বিক্রয়পণ্য ও মূল্য প্রদান করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হবে। ফলে একই কাজে আদেশ ও নিষেধ তথা পরস্পর বিরোধী বিধান আসতে হয় যা অসম্ভব।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, কজা করার পর যদি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেও তো এ মালিকানা ফাসাদ ও অবৈধতাকে সুদূর করছে। অতএব কজা করার পরও ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এর উত্তরে লেখক বলেন, কজার পর ক্রেতার জন্য মালিকানা এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ক্রেতা যখন দ্রব্যটি কজা করল, তখন দ্রব্যটি ক্রেতার দায়ে চলে গেল অর্থাৎ দ্রব্যটি যদি ক্রেতার অধিকারের থাকা অবস্থায় বিক্রীত হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং যখন বিক্রয়পণ্য ক্রেতার দায়ে চলে গেল এবং বিক্রেতা বিক্রয়পণ্যের পরিবর্তে মূল্যের মালিক হয়ে গেল, এমতাবস্থায় যদি বিক্রয়পণ্যের মালিকানা বিক্রেতা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ক্রেতার মালিকানায় না যায়,



তাহলে উভয় বিনিময় তথা পণ্য ও মূল্য একপক্ষ অর্থাৎ বিক্রেতার মালিকানায থাকছে, আর অন্যপক্ষ তথা ক্রেতার মালিকানায কোনো বিনিময়ই থাকছে না। আর ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, একপক্ষের মালিকানায উভয় বিনিময় একত্রিত হওয়া আরও আরও এজন্যই বলা হয়েছে যে, কজা করার পর বিক্রয়পণ্যের মালিকানা ক্রেতার পক্ষে চলে আসবে। পক্ষান্তরে কজা করার পূর্বে উভয় পণ্যের মালিকানা যেহেতু এক ব্যক্তির মালিকানাধীন হয় না, তাই কজা করার পূর্বে বিক্রয়পণ্যের মালিকানা ক্রেতার জন্য হবে না। তাছাড়া ফাসিদ বিক্রয়ে কজার পূর্বে মালিকানা লাভ না হওয়া এবং কজার পর মালিকানা লাভ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হলো, মালিকানা লাভের সবব তথা ফাসিদ বিক্রয় ফাসিদ শর্তের কারণে দুর্বল। আর দুর্বল বস্তুর মধ্যে তার হুকুম যুক্ত হয় না যে পর্যন্ত না এর সাথে কোনো শক্তিশালী বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে শক্তিশালী বিষয়টি হলো কজা। এজন্য যদি ফাসিদ বিক্রয়ে কজা পাওয়া যায়, তাহলে ফাসিদ বিক্রয়ে এর হুকুম আবশ্যিক হবে অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হয়ে যাবে; আর যদি কজা না পাওয়া যায়, তাহলে ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো, যদি মালিকানা কজার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়ের সত্তার সাথে ফাসাদ সম্পৃক্ত হবে, আর বিক্রয় অনুমোদন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। ফলে ফাসাদ সম্পৃক্ত হবে আল্লাহ তা'আলা তথা শরিয়ত প্রবর্তকের সাথে। পক্ষান্তরে কজার পরে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে এর সম্পর্ক হবে কজার সাথে। আর কজা কজাকৃত বস্তুর মধ্য দায়কে ওয়াজব করে। এমতাবস্থায় ফাসাদের সম্পর্ক হবে মানুষের সাথে।

তৃতীয় জবাব হলো, যদি ফাসিদ বিক্রয়ে মালিকানা কজা করার আগে ও পরে উভয় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এটা সহীহ বিক্রয়চুক্তির মতো হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কজা করার পরও এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে এটা বাতিল বিক্রয়চুক্তির মতো হয়ে যাবে। উভয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে আমরা ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কজার পর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিধানকে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করি।

قَوْلُهُ يَسْتَرْكَوُ الْبَيْتَ: অর্থাৎ লেখক বলেন, ফাসিদ বিক্রয়ের বিষয়াদি হেবার মতো। হেবার মধ্যে গ্রহীতা দান করা বস্তু কজা করার পর সে তার মালিক হয় এবং এর দ্বারা হেবা পূর্ণতা লাভ করে। কজা করার পূর্বে হেবা পূর্ণতা পায় না এবং গ্রহীতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

قَوْلُهُ وَالْمَنْعَةُ لَيْسَتْ بِإِلَاحٍ: এ বাক্য দ্বারা লেখক ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) ফাসিদ বিক্রয়কে মৃত জন্তু বিক্রি করা তথা বাতিল বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেন। উত্তরের সারকথা হলো, মৃত লাশ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তো লাশ মাল নয়। ফলে বিক্রয়ের রুকন তথা الْمَالُ بِالْمَالِ [মালের বিনিময়ে মাল]-ই অনুপস্থিত। বিক্রয়ের রুকন অনুপস্থিত হওয়ার কারণে বিক্রয় সংঘটিত হবে না। বিক্রয় সংঘটিত না হলে এর দ্বারা মালিকানা লাভ হবে না, দখল করার আগে বা পরে কোনো অবস্থাতেই নয়। পক্ষান্তরে যদি ফাসিদ বিক্রয় সংঘটিত হয়, তবে ফাসিদ ও অবৈধ শর্তের কারণে এতে ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং দুটি বিক্রয় ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার কারণে একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা সই'উন নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْخُسْرُ الْخ: এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারকথা হলো, যদি বিক্রয়চুক্তির মধ্যে মদ বিক্রয়পণ্য হয়, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণনানুসারে তাহলে এর বিধান কি হবে সে সম্পর্কে আমরা ফাসিদ বিক্রয় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের শুরুভাগে আলোচনা করেছি যে, বিক্রয়পণ্যই বিক্রয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ফলে এ অবস্থায় মদই হবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য এবং সম্মানের যোগ্য; অথচ শরিয়ত একে অসম্মান করার নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং মদকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা বাতিল বলে গণ্য হবে। আমাদের মাযহাবে ফাসিদ ও বাতিল বিক্রয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য বিধায় ফাসিদ বিক্রয়কে বাতিল বিক্রয়ের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। তাছাড়া মদকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা ফাসিদ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি মদের বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হবে। মদ প্রদান করা আবশ্যিক হবে না। কেননা, কোনো মুসলমানের পক্ষে মদ অর্পণ করা বা তা গ্রহণ করা কোনোটা ই বৈধ নয়। আর এটা সর্বস্বীকৃত বিধান যে, বাজারমূল্য বিক্রয়ের মধ্যে মূল্যরূপ বিবেচিত হয়- বিক্রয়পণ্যরূপে বিবেচিত হয় না। সুতরাং আমরা যদি দিরহামের বিনিময়ে মদ বিক্রয়চুক্তিকে সংঘটিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করি, তাহলে মদের বাজারমূল্য বিক্রয়পণ্য হবে। ফলে মদের বাজারমূল্য, যা বিক্রেতার উপর আবশ্যিক হয়েছে তা বিক্রয়পণ্য হচ্ছে। অথচ শরিয়ত বাজারমূল্যকে মূল্যরূপে উপস্থাপন করেছে- বিক্রীত-পণ্য রূপে নয়। উপরিউক্ত সুরতটিতে শরিয়তের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। অথচ শরিয়তের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা কিংবা রদবদল করা অবৈধ ও আমাদের এখতিয়ার বহির্ভূত। এ কারণে দিরহামের বিনিময়ে মদের বিক্রি অবৈধ ও বাতিল হবে। ফাসিদ বিক্রয়ের সাথে বাতিল বিক্রয়ের ভিন্নতা ও বৈপক্ষীতা থাকার কারণে একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা যেহেতু বৈধ নয়, তাই ফাসিদ বিক্রয়সমূহকে দিরহামের বিনিময়ে মদ বিক্রয় উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

ثُمَّ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، إِلَّا أَنَّهُ يَكْتَفِي بِهِ دَلَالَةٌ، كَمَا  
 إِذَا قَبَضَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ إِسْتِحْسَانًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ تَسْلِيَطٌ مِنْهُ  
 عَلَى الْقَبْضِ فَإِذَا قَبَضَهُ بِحَضْرَتِهِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ بِحُكْمِ التَّسْلِيَطِ  
 السَّابِقِ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْهَبَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ يَصَحُّ إِسْتِحْسَانًا، وَشَرَطُهُ أَنْ  
 يَكُونَ فِي الْعَقْدِ عَوَضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ، لِيَتَحَقَّقَ رُكْنُ الْبَيْعِ، هُوَ مُبَادَلَةٌ  
 الْمَالِ بِالْمَالِ، فَيَخْرُجُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَبْتَدِئَةِ وَالْدَّمُ وَالْحَرُّ وَالرَّيْنُ وَالْبَيْعُ مَعَ نَفِي  
 الثَّمَنِ، وَقَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ، "فِي ذَوَاتِ الْقِيمِ" فَأَمَّا فِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ يَلْزَمُهُ  
 الْمَثَلُ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِنَفْسِهِ بِالْقَبْضِ، فَشَابَهُ الْغَضَبُ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمِثْلَ صُورَةٌ  
 وَمَعْنَى أَعْدَلَ مِنَ الْمِثْلِ مَعْنَى .

অনুবাদ : অতঃপর ইমাম কুদূরী (র.) বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রয়পণ্য কজা করার শর্তারোপ করেছেন। আর এটা ই জাহের রেওয়ায়েতের ভাষ্য। তবে পরোক্ষ অনুমতিকে যথেষ্ট মনে করা হবে ইসতিহসানের বিবেচনায়। যেমন- কেউ যদি চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার বৈঠকে বিক্রেতার উপস্থিতিতে কজা করল। আর এটাই সঠিক অভিমত। কেননা, বিক্রয়ের অর্থ হলো বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে কজা করার ক্ষমতা প্রদান। সুতরাং যখন ক্রেতা বিক্রেতার উপস্থিতিতে মজলিস বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই কজা করবে এবং বিক্রেতা তাকে বাধা না দেবে, তখনই কজা পূর্ব প্রদত্ত ক্ষমতার ফল রূপে সম্পন্ন হবে। এমনভাবে হেবার ক্ষেত্রে চুক্তি অনুষ্ঠানের মজলিসে কজা গ্রহণ ইস্তিহসানের ভিত্তিতে শুদ্ধ হবে। এছাড়া তিনি চুক্তির উভয় বিনিময়ের প্রত্যেকটি মাল হওয়ার শর্ত করেছেন, যাতে বিক্রয়ের রুকন বিদ্যমান থাকে। আর তা হচ্ছে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা। এরই ভিত্তিতে মৃত, রক্ত, স্বাধীন ব্যক্তি, বাতাসের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং মূল্য ছাড়া [কোনো দ্রব্য] বিক্রি করার বিধান বের করা হয়। ইমাম কুদূরী (র.)-এর বাজার মূল্য সাবাত্ত হওয়ার বক্তব্যটি হলো মূল্যনির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে, পক্ষান্তরে সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর সদৃশ বস্তু প্রদান করা আবশ্যিক হবে। কেননা, [ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] কজা গ্রহণের কারণে বিক্রীত-দ্রব্যটি স্বয়ং দায়যুক্ত হয়। সুতরাং তা আশ্বাসকৃত মালের মতো হলো। আর এ বিধান এজন্য যে, দৃশ্যত ও গুণগত সাদৃশ্য শুধু গুণগত সাদৃশ্য থেকে অধিক ন্যায্যপূর্ণ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُذْلُ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর মূল পাঠের বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) মূল ইবারতে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কজা করার কথা বলেছেন। তাঁর এ মতটি জাহের রেওয়ায়েতেও রয়েছে। তবে এখানে অনুমতির ব্যাপারটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে মতে বিক্রেতার প্রত্যক্ষ অনুমতি

যেমন কার্যকর হবে, তেমনি বিক্রতার মৌন অনুমতি এবং অবগতির পর নিষেধ না করাও এতে शामिल থাকবে। অর্থাৎ বিক্রতার পরোক্ষ অনুমতির দ্বারাও যদি কজা করা হয়, তাহলে সে কজা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করবে। পরোক্ষ ও মৌন অনুমতির সম্ভব হলো, যে বৈঠকে চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রেতা বৈঠক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে যদি বিক্রয়পণ্যটি বিক্রতার উপস্থিতিতে গ্রহণ করে তার আয়ত্তে নিয়ে নেয়, আর বিক্রতা এ ব্যাপারে কোনো বাধা প্রদান না করে, তাহলে তার এ কজাটি ইস্তিহসানের ভিত্তিতে বৈধ হয়ে যাবে। আর এটাই হচ্ছে বিগুদ্ব ও সহীহ মত।

এ ব্যাপারে ইয়াহ গ্রন্থের লেখকের একটি দুর্বল মত রয়েছে যে, এরূপ কজা করা হলে যথেষ্ট হবে না; বরং বিক্রতার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে কজা করা হলে তা যেন অনুমতি ছাড়াই কজা করা হলো। অনুমতি ছাড়া কজা দ্বারা যেমন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনি এ ধরনের কজা দ্বারাও মালিকানা লাভ হবে না।

সহীহ মতটির স্বপক্ষে দলিল হলো, বিক্রতার পক্ষ থেকে বিক্রয় সম্পন্ন করার অর্থই হলো ক্রেতাকে বিক্রয়পণ্য কজা করার ক্ষমতা প্রদান করা। সুতরাং ক্রেতা যদি চুক্তি অনুষ্ঠানের বৈঠকে বিক্রতার উপস্থিতিতে কজা করে আর বিক্রতা এ ব্যাপারে কোনো বাধা না দেয়, তাহলে এ কজা বিক্রতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলেই হলো। আর যে কজা বিক্রতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে করা হয় তার দ্বারা অবশ্যই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এ কজা দ্বারা ক্রেতার মালিকানা লাভ হবে। বিক্রতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে পরোক্ষ অনুমতিই যথেষ্ট হবে। এখানে قَبْلَ الْإِثْرَانِ এ কয়েদটি দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতার কজা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিক্রতার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অনুমতি লাগবে; বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পরোক্ষ অনুমতি যথেষ্ট হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ফাসিদ বিক্রয় অন্যান্য বিক্রয়ের তুলনায় দুর্বল, আর তাই শুধুমাত্র বিক্রয় দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না; বরং কজা করার প্রয়োজন হয়। আর এ দুর্বলতার কারণে এ বিক্রয় দ্বারা কজা করার ক্ষমতা লাভ করা যাবে না। অথচ ক্ষমতা লাভ করাটাই হচ্ছে সহীহ রেওয়াজের মূল কারণ। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ফাসিদ বিক্রয়ের দুর্বলতা তো তখনই হবে যখন এতে কজা থাকবে না। অর্থাৎ কজাবিহীন বিক্রয়ে দুর্বলতা রয়েছে। অথচ আমাদের আলোচনা চলছে কজা সহ বিক্রয় সম্পর্কে।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْمَهْرِ الْخ: লেখক বলেন, আলোচ্য কজাটির অনুরূপ বিধান রয়েছে হেবার মধ্যে। হেবার কজার ব্যাখ্যা হলো, যদি গ্রহীতা হেবাকৃত দ্রব্যটি দাতার উপস্থিতিতে হেবা করার মজলিসে কজা করে এবং তা আয়ত্তে নিয়ে নেয়, তাহলে কজা শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং গ্রহীতার হেবাকৃত দ্রব্যে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। হেবা করার জন্য মজলিসের শর্ত এজন্যই করা হয়েছে যে, হেবার মধ্যে কজা হচ্ছে রুকন এবং গ্রহীতার মালিকানা প্রমাণ হওয়ার ক্ষেত্রে কজা হচ্ছে “কবুল” এর স্থলবর্তী। চুক্তির মধ্যে যেমন মজলিসেই কবুল করা শর্ত, তেমনি কজা করার ক্ষমতা প্রদানও মজলিসেই অপর্ণ করতে হবে।

ইমাম কদুরী (র.) মালিকানা লাভের আরেকটি শর্ত করেছেন। শর্তটি হলো, ফাসিদ চুক্তির উভয় বিনিময় মাল হতে হবে। হিদায়া প্রণেতা ইমাম কদুরী (র.)-এর উক্ত শর্তারোপের কারণ সম্পর্কে বলেন, এ শর্তারোপ করা হয়েছে বিক্রয়ের রুকন পাওয়া যাওয়ার জন্য। বিক্রয়ের রুকন হলো مَبَادِئُ الْمَالَ بِالْمَتْرَاجِ অর্থাৎ ‘ক্রেতা ও বিক্রতা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা।’ সুতরাং যে অবস্থাপ্রকোপে বিক্রয়পণ্য অথবা মূল্য মূল্য লাশ, মদ, রক্ত, স্বাধীন ব্যক্তি ইত্যাদি হয়, সে সব বিক্রি যে কোনো একটি বিনিময় মাল না হওয়ার কারণে বাতিল হবে। আর যদি কেউ মূল্য বাদ দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে এক বর্ণনানুযায়ী এ ধরনের বিক্রিও বাতিল হবে। কেননা, মূল্য ছাড়া বিক্রয়ে ‘মালের বিনিময়ে মাল’ এ বিষয়টি অনুপস্থিত। বিক্রয়ের রুকন অনুপস্থিত হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তি তো অসংঘটিত হয়ে গেল এবং বাতিল বলে গণ্য হলো।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মূল্যবিহীন বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, বিক্রয়ে মূল্যকে বাদ দেওয়া বৈধ নয়; কারণ, বিক্রয় বলা হয় এমন চুক্তিকে, যাতে উভয় বিনিময় বিদ্যমান থাকে এবং উভয়টা মাল হয়। যে চুক্তিতে দুই বিনিময় না থাকে, তাকে হেবা কিংবা সদকা বলা যেতে পারে। সুতরাং যখন মূল্যকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই, তখন এটা যেন এমন হয়ে গেল যে, ক্রেতা মূল্যকে উল্লেখ না করে চূপ রয়েছে। আর নিয়মানুযায়ী কেউ যদি বেচাকেনা করে এবং তাতে মূল্য উল্লেখ না করে, তাহলে এ বিক্রয় ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়। আর ফাসিদ বিক্রয়ে কজা দ্বারা ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, নিঃশর্ত চুক্তি বিক্রয়চুক্তির বিনিময় দাবি করে। সুতরাং যখন ক্রেতা মূল্য উল্লেখ না করে চূপ বইল, তখন সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হলো বাজারমূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। সুতরাং এখানে বিক্রোতা যেন ক্রেতার কাছে বাক্যমূল্যে বিক্রয় করল। আর কোনো বস্তু বাজারমূল্যে বিক্রি করা ফাসিদ। অতএব এখানে বিক্রি ফাসিদ হবে।

ইমাম কুদুরী (র.)-এর বাক্য **لَمْ يَنْتَهِ**-এর ব্যাখ্যা হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য কজা করার পর যদি সেই পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার জন্য কজার দিনের পণ্যের বাজারমূল্য পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে। যদি কজা করার পর পণ্যের বাজারমূল্য বেড়ে যায় এরপর ক্রেতার হাতে তা বিনষ্ট হয়, তবু তার কজার দিনের বাজারমূল্য দিতে হবে। এর বেশি দিতে হবে না। লেখক বলেন, **لَمْ يَنْتَهِ**-এর হুকুম মূল্যনির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- প্রাণী, পণন করে বিক্রি করা হয় এমন তারতম্যপূর্ণ বস্তুসমূহ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি বিক্রীত-পণ্যের নজির আছে এমন সাদৃশ্য-নির্ভর বস্তুসমূহ হয়, যেমন- পাঠে দ্বারা মাপা যায়, ওজন করা যায় এমন বস্তু হয় এবং তা ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার উপর এর অনুরূপ বস্তু বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু প্রদান করা আবশ্যিক হবে। কেননা, ক্রেতার কজা করার কারণে বিক্রয়পণ্যটি আপনাপনি দায়যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ বাবদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তুর সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু প্রদান করা আবশ্যিক হবে। যেমন- আত্মসাতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি আত্মসাৎকৃত বস্তুটি আত্মসাৎকারীর হাতে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তা সাদৃশ্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে আত্মসাৎকারীর উপর তার অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যিক হবে। আর যদি তা মূল্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। এ দু ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে একই ধরনের ক্ষতিপূরণ আবশ্যিক না হয়ে সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে অনুরূপ বস্তু প্রদান কেন আবশ্যিক হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন, কোনো বস্তুর সাদৃশ্য দু ধরনের হতে পারে-

১. বাহ্যিক সাদৃশ্য বা আকৃতিগত সাদৃশ্য।

২. মূলগত সাদৃশ্য।

কোনো বস্তুর সাদৃশ্য যদি অপর বস্তুর সাথে বাহ্যিক এবং মূলগত সাদৃশ্য হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে সর্বোত্তম সাদৃশ্য। আর যদি শুধু মূলগত সাদৃশ্য হয়, তাহলে সেটা প্রথম প্রকারের থেকে দুর্বল সাদৃশ্য। আমাদের আলোচ্য সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে যোহেতু উভয় প্রকারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাই এমন বস্তু বিনষ্ট হলে তার অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যিক হবে। কেননা, এটা শুধুমাত্র মূলগত পার্থক্যের চেয়ে উত্তম। আর এজন্যই দু প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে দু ধরনের ক্ষতিপূরণ আবশ্যিক হয়।

قَالَ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَايِدِينَ فَسْعُهُ رَفْعًا لِلْفَسَادِ، هَذَا قَبْلَ الْقَبْضِ طَاهِرٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفْذَحْكُمْ، فَيَكُونُ الْفَسْحُ إِمْتِنَاعًا مِنْهُ، وَكَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ، إِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، لِقُوَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائِدٍ فَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ ذَلِكَ دُونَ مَنْ عَلَيْهِ، لِقُوَّةِ الْعَقْدِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُرَاضَةُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الشَّرْطُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যেকেরই ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ফাসিদ বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করার অর্থিত্যার রয়েছে। কজার পূর্বে তো এটা সুস্পষ্ট। কেননা, ফাসিদ বিক্রয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে না। সুতরাং প্রত্যাহার করার অর্থই হবে মালিকানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। তদ্রূপ কজা করার পরেও যখন ফাসাদ মূল বিক্রয়চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর যদি ফাসিদ অতিরিক্ত শর্তের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে কেবল তার রহিত করার অধিকার রয়েছে, যার বিপক্ষে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার জন্য নয়। কেননা, এক্ষেত্রে আকদ-চুক্তিটি শক্তিশালী। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, যার পক্ষে শর্তারোপ করা হয়েছে, তার সম্মতি কার্যকর হলো না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَايِدِينَ الْح: উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ফাসিদ বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতঃপূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ফাসিদ বিক্রয় প্রত্যাহার করা ওয়াজিব। কিন্তু সে প্রত্যাহার বা রহিত করার অধিকার কার? এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন, কজা করার পূর্বে বিধান হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ফাসিদ বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। কজা করার পূর্বে ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার মালিকানায় আসে না। সুতরাং কজা করার আগে প্রত্যাহার করার অর্থ হচ্ছে, মালিকানা বদলকে বাধা দেওয়ার বা মালিক হতে বাধা দেওয়ার অধিকার বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের রয়েছে। অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্যের মালিক হওয়ায় বাধা দিতে পারে, তেমনি ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। যেহেতু উভয়ের মালিক হওয়া থেকে বিরত থাকার অধিকার রয়েছে, তাই যে কেউ তার অধিকার প্রয়োগ করে বিক্রয়চুক্তি রহিত করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, ইবারতের শব্দ رَفْعًا لِلْفَسَادِ -এর মধ্যে (بِالْإِزَاءِ) হচ্ছে শুদ্ধ, رَفْعًا অর্থ উত্তোলন। কেননা, رَفْعٌ অর্থ হচ্ছে কোনো সংঘটিত কাজকে রহিত করা, বাধা দেওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে رَفْعٌ -এর অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বাধা দেওয়া। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ফাসাদ সংঘটিত হয়ে গেছে, তাই এখানে رَفْعٌ শব্দটি অধিকতর উপযুক্ত। কজা করার পর প্রত্যাহার করার অধিকার কি উভয়ের, নাকি একজনের? এ ব্যাপারে লেখক বলেন, কজা করার পর দু' অবস্থা হতে পারে—

১. ফাসাদের সম্পর্ক মূল চুক্তির মাঝে হবে অথবা

২. ফাসাদের সম্পর্ক হবে অতিরিক্ত শর্তের সাথে। অর্থাৎ অতিরিক্ত শর্তটি ফাসিদ হলে তবে মূল চুক্তিতে কোনো ফাসাদ হয় না

প্রথম প্রকার তথা মূল চুক্তিতে ফাসাদের ব্যাখ্যা হলো, দুই বিনিময়ের কোনো একটি বিনিময় ফাসাদ হবে : যথা— এক দিরহামকে দু দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা, অথবা বস্তকে মদের বিনিময়ে বিক্রি করা ইত্যাদি। এ অবস্থায় ফাসাদ মূল চুক্তির মধ্যে হওয়ার কারণে ফাসাদ অনেক শক্তিশালী, আর ফাসাদ দূর করা শরিয়তের বিধান। আর উক্ত বিধানের কারণেই চুক্তিটি কার্যকর হয়নি। নিয়মানুযায়ী যে কোনো অকার্যকর বিক্রয় রহিত করার অধিকার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের রয়েছে। সে মতে ফাসাদ মূল চুক্তিতে হওয়ার কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের রহিত করার অধিকার রয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে-ই বিক্রয় রহিত করুক সে অপরের সামনে তথা অপরকে জানিয়ে বিক্রয় রহিত করবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত হলো, বিক্রয় প্রত্যাহার করার জন্য অপরজনকে জানানো আবশ্যিক নয়; বরং জানিয়ে ও না জানিয়ে উভয় অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রয় প্রত্যাহার করা শরিয়তের বিধান। শরিয়তের বিধান কারো উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতির তোয়াক্কা করে না। এ কারণে বিক্রয় প্রত্যাহার প্রতিপক্ষের অনুমতি বা অবগতির উপর নির্ভরশীল নয়।

তারফাইন (র.)-এর দলিল হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে ফাসাদ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে রহিত করা নিঃসন্দেহে শরিয়তের বিধান। কিন্তু রহিত করার দ্বারা প্রতিপক্ষের উপর অভিযোগে উত্থাপিত হচ্ছে। কেননা, মানুষ তখনই বিক্রয় রহিত করে যখন মনে করে বিক্রয়চুক্তিতে তার স্বার্থহানি ঘটেছে। সুতরাং সে যেন বিক্রয় রহিত করার দ্বারা তার প্রতিপক্ষের প্রতি তার ক্ষতি করার অভিযোগ করছে। আর অভিযোগ তোলায় ক্ষেত্রে নীতি হলো যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে! এজন্যই বিক্রয় রহিতকারী তার সাথির উপস্থিতিতে বিক্রয় রহিত করবে, তার অনুপস্থিতিতে রহিত করার ব্যাপারে শরিয়তের অনুমোদন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যদি ফাসাদ অতিরিক্ত শর্তের ক্ষেত্রে হয় এবং ক্রেতা যদি কজা করে ফেলে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে কেবল সেই প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। যেমন- ক্রেতা এ শর্তে জামা খরিদ করল যে, বিক্রেতা তাকে একটি রুমাল হাদিয়া দেবে কিংবা বিক্রেতা তাকে কিছু টাকা ঋণ দেবে, তাহলে এখানে শুধুমাত্র ক্রেতারই বিক্রয় রহিত করার অধিকার থাকবে বিক্রেতার কোনো অধিকার থাকবে না।

এ ব্যাপারে শায়খাইন (র.)-এর অভিমত হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। লেখক এখানে শুধুমাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটিকে উল্লেখ করেছেন- মতবিরোধের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর মতের পক্ষে এভাবে দলিল বর্ণনা করেন যে, যখন অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে ফাসাদ হয় তখন চুক্তি শক্তিশালী হয়, কিন্তু ফাসাদ শক্তিশালী হয় না। আর এজন্যই শুধুমাত্র যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারবে। উভয়ে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপর আপত্তি হলো, যদি বলেন চুক্তি শক্তিশালী হয়, তাহলে তো কারোই রহিত করার এখতিয়ার থাকার কথা নয়। এর উত্তর হলো, যার অনুকূলে শর্ত সে তো শর্ত ব্যতীত চুক্তি করতে সম্মত ছিল না, তাই তাকে বিক্রয় প্রত্যাহার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, ফাসাদ দূর করা শরিয়তের বিধান, এ কারণে চুক্তির কার্যকারিতা বহাল নেই। আর যে চুক্তি অকার্যকর তাকে উভয় পক্ষ রহিত করতে পারে। এ কারণে উল্লিখিত শেষ অবস্থাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই চুক্তি রহিত করতে পারবে।

স্বর্তব্য যে, আলোচ্য মতবিরোধ তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ক্রেতার হাতে বিক্রীত-পণ্য স্বঅবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আর যদি কজাকৃত পণ্যটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন- বিক্রীত-পণ্যটির সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ হয় অথবা কোনো কিছু হানি ঘটে এমতাবস্থায় ভিন্ন হুকুম হবে, যা সবিস্তারে সামনে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

قَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرَى تَعَذُّ بِبَيْعِهِ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ، فَمَلَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَسَقَطَ حَقُّ  
الْإِسْتِرْدَادِ لِتَعَلُّقِي حَقِّ الْعَبْدِ بِالثَّانِي، وَنَقُضَ الْأَوَّلُ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَحَقِّ الْعَبْدِ مُقَدِّمٌ  
لِحَاجَتِهِ، وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَفِيهِ، وَالثَّانِي مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَ وَفِيهِ،  
فَلَا بُعَايَرُ مَجْرَدُ الْوَصْفِ، وَلِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، بِخِلَافِ تَصَرُّفِ  
الْمُشْتَرَى فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُّ الْعَبْدِ، وَتَسْتَوِيَانِ فِي  
الْمَشْرُوعِيَّةِ، وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنَ الشَّيْفِيعِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রেতা যদি তা [অর্থাৎ ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে কজাকৃত পণ্যটি] বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রি কার্যকর হবে। কেননা, সে পণ্যটির মালিক হয়েছে, অতএব সে পণ্যটির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিক্রির মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির হক সংশ্লিষ্ট হওয়াতে প্রথম বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। প্রথম বিক্রি বাতিল করা ছিল শরিয়তের হক, আর মানুষের হক [শরিয়তের হকের চেয়ে] অগ্রগণ্য। কেননা, মানুষ মুখাপেক্ষী। তাছাড়া প্রথম বিক্রয়টি মূলগতভাবে শরিয়তসম্মত, গুণগতভাবে নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিক্রয়টি মূলগত ও গুণগত উভয়ভাবেই শরিয়তসম্মত, তাই এর সাথে শুধু গুণগত অবৈধতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারে না। আর এজন্য যে, দ্বিতীয় বিক্রয়টি [প্রথম] বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েই করা হয়েছে। তবে 'শুফআর' অধিকার সংশ্লিষ্ট বাড়িতে ক্রেতার ব্যবহারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে উভয়টি বান্দার হক, আর উভয়টি শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার ব্যাপারে সমান। আর ক্রেতার হস্তক্ষেপ শুফআর হকদারের পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে করা হয়নি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرَى الخ : উপরিউক্ত ইবারতে ফাসিদ বিক্রয়ের দ্বারা অর্জিত পণ্যের বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, ফাসিদ বিক্রয়ের ক্রেতা যদি বিক্রীত-পণ্যটি কজা করে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার বিক্রি কার্যকর হবে। কারণ, ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে পণ্যটি কজা করার মাধ্যমে পণ্যটির মালিক হয়েছিল। মালিকানাধীন পণ্যে মালিকের যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। যে কারণে আলোচ্য ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার মালিক। এখন সে পণ্যটিকে বিক্রি করতে পারে, দান করতে পারে, হেবা করতে পারে ইত্যাদি। সুতরাং পণ্য বিক্রয়ে সে তার প্রাপ্ত বৈধ এখতিয়ারের ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করেছে, তাই তার বিক্রয় কার্যকর হবে বৈধ।

তবে পণ্যটি যদি খাদদ্রব্য হয়, তাহলে ক্রেতার জন্য তা ভক্ষণ করা জায়েজ নয়। যদি তার কোনো দাসী হয়, তাহলে ক্রেতার জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। দাসীর সাথে সঙ্গম করার ব্যাপারে শামসুল আইন্বা হালওয়ানীর অভিমত হলো, সঙ্গম করা হারাম নয়, তবে মাকরুহ। উল্লেখ্য যে, ক্রেতা দ্বিতীয় বিক্রয়ে বিক্রেতা হচ্ছে, সে মতে দুটি চুক্তির মধ্যে দু'জন বিক্রেতা। এজন্য ফাসিদ বিক্রয়ের বিক্রেতা হলো প্রথম বিক্রেতা, আর [দ্বিতীয় বৈধ] বিক্রয়ের বিক্রেতা হলো দ্বিতীয় বিক্রেতা।

قَوْلُهُ سَقَطَ حَقُّ الْإِسْتِرْدَادِ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম হলো বিক্রয় প্রত্যাহার করে কজাকৃত মাল ফেরত দেওয়া আবশ্যিক। সে মতে দ্বিতীয় বিক্রয় কার্যকর না হওয়ায় বাধ্যনীয়। কিন্তু এখানে তা করা হলো না কেন ?

এর উত্তরে লেখক বলেন, যখন ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যটি বিক্রয় করে ফেলে, তখন প্রথম বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্যটি নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়। এখন প্রথম বিক্রেতা দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল করে বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত নিতে পারবে না; বরং ক্রেতা [দ্বিতীয় বিক্রেতা]-এর উপর বিক্রীত-পণ্যের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে— যদি তা মূল্যনির্ভর বস্তু হয়। আর যদি তা সাদৃশ্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে এর অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যিক হবে। দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য পণ্যটি ব্যবহার করা বৈধ এবং শরিয়তসম্মত হবে। কেননা, দ্বিতীয় ক্রেতা একটি বৈধ বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে এর মালিক হয়েছে এবং পণ্যটির ব্যবহারও শরিয়ত অনুমোদিত অর্থাৎ পণ্যটি ব্যবহার করা হালাল, তবে প্রথম ক্রেতার জন্য পণ্যটি ব্যবহার করা হালাল ও বৈধ ছিল না। কেননা, প্রথম ক্রেতা একটি ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে এর মালিক হয়েছিল। তবে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, ক্রেতার বিক্রয়ের পর [প্রথম] বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হবে কেন?

এর উত্তর হলো, দ্বিতীয় বিক্রয়ের দ্বারা দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়েছে। সুতরাং তা মানুষের বা বান্দার হক। আর ফাসাদদের কারণে প্রথম বিক্রয়টি রহিত করা শরিয়তের হক। এখানে বান্দা ও শরিয়তের হকের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বান্দার হকের দাবি হলো দ্বিতীয় বিক্রয় কার্যকর হোক। আর শরিয়তের হকের দাবি হলো দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল হওয়া। আর বান্দা ও শরিয়তের হক যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে বান্দার হককে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কারণ, শরিয়তদাতা [আল্লাহ] অমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে বান্দা মুখাপেক্ষী। মুখাপেক্ষীর অধিকার অধিক বাস্তবায়নযোগ্য। এ কারণে আলোচ্য অংশে ক্রেতার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং প্রথম বিক্রেতার পণ্য ফেরত দানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল করা হবে না। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় দলিল হলো, প্রথম বিক্রয় সত্তাগতভাবে বৈধ, কিন্তু গুণগতভাবে অবৈধ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিক্রয় সত্তা ও গুণগত উভয়ভাবে বৈধ। এক কথায় প্রথম বিক্রি ফাসিদ, আর দ্বিতীয় বিক্রি শুদ্ধ ও বৈধ। ফাসিদ ও বৈধ একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। এ কারণে প্রথম ফাসিদ বিক্রির কারণে দ্বিতীয় বৈধ বিক্রিটি বাতিল হবে না। যখন দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে, তখন পণ্যটি প্রথম বিক্রেতার ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না।

দ্বিতীয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার তৃতীয় দলিল হলো, দ্বিতীয় বিক্রির অধিকার প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতা লাভ করেছে। কেননা, ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রীত-পণ্যটি কজা করেছিল। সুতরাং প্রথম বিক্রেতা যদি বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত নেয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিল করা হয়। আর নিজের দ্বারা কৃত বিক্রয় রহিত করা বাতিল। আর এ কারণে প্রথম বিক্রেতা তার বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত নিতে পারবে না।

عَوَّلَهُ يَخْلُفُ نَصْرَبُ الْمُسْتَرْزِي الْخ একটি বাস্তব দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, কোনো ব্যক্তি এমন একটি বাড়ি ক্রয় করল যার শুফআর দাবিদার রয়েছে এবং উক্ত দাবিদার বাড়িটি দাবিও করেছে। কিন্তু ক্রেতা বাড়িটি ক্রয় করে অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দিল। এমনাবস্থায় শরিয়তের বিধান হলো, ক্রেতার মাধ্যমে সম্পাদিত দ্বিতীয় বিক্রয়টি রহিত করে শুফআর দাবিদারকে তার অধিকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ এখানেও দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এ মাসআলাটি আমাদের বর্ণিত মাসআলার বিপরীত হলো।

এর উত্তর হলো, এখানে দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার ও শুফআর দাবিদারের অধিকার উভয়ই সমান। কারণ, দুটোই বান্দার হক। এজন্য দুটির কোনোটি অপরটির উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে না। বরং এ দুটোর মধ্যে শুফআর হক অধিক শক্তিশালী ও অগ্রগামী ছিল বিধায় সেটা অগ্রগণ্য হবে। অর্থাৎ প্রথম বিক্রয়টি সংঘটিত হওয়া মাত্রই শুফআর দাবিদারের অধিকার তার সাথে যুক্ত থাকে। ফলে এর পরবর্তী ক্রেতার যাবতীয় হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি গ্রাহ্য হবে না। আর তার সবগুলি হস্তক্ষেপের পিছনে কোনো ভিত থাকবে না। আর ভিত্তিহীন কাজ ভঙ্গ করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর এজন্যই ক্রেতার করা হস্তক্ষেপগুলো বাতিল করে শফীর অধিকার দেওয়া হবে। তাছাড়া শফীর হস্তক্ষেপ ও ক্রেতার হস্তক্ষেপ যেহেতু শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার ব্যাপারে একই পর্যায়ের বলে বিবেচিত, তাই শফীর অধিকার প্রদান করা হবে, ক্রেতার বিক্রয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না।

তাছাড়া এখানে বিষয়টি প্রথম বিক্রেতার বিষয়ের অনুরূপ নয়। কারণ, সেখানে প্রথম বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রেতা হস্তক্ষেপ করেছিল, আর এখানে ক্রেতা শফীর পক্ষ থেকে কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়নি, তাই ক্রেতার কৃতচুক্তি বাতিল করে শফীর অধিকার প্রদান করা হবে। আর এভাবে শুফআর অধিকার সংশ্লিষ্ট বাড়ির বিষয়টি আলোচ্য মাসআলার ব্যতিক্রম সাব্যস্ত হলো।



قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَقَبْضَهُ وَأَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ هَبَهُ وَسَلَّمَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَعَلَيْهِ الْقِيَمَةُ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ، فَيَنْفَدُ تَصَرُّفَاتُهُ، وَإِلَّا غَنَاتِي قَدْ هَلَكَ، فَتَلَزُمُ الْقِيَمَةُ، وَبِالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ انْقِطَاعُ الْإِسْتِرْدَادِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ نَظِيرُ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُمَا لَازِمَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَعُودُ حَقُّ الْإِسْتِرْدَادِ بِعَجْزِ الْمُكَاتِبِ، وَفِيكَ الرَّهْنُ لِرُزَالِ الْمَانِعِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، لِأَنَّهَا تَفْسَحُ بِالْأَعْدَارِ، وَرَفَعَ الْفَسَادِ عُدْرًا، وَلِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَكُونُ الرَّدُّ امْتِنَاعًا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি মদ কিংবা শূকরের বিনিময়ে দাস কিনে, অতঃপর তা কজা করে তাকে আজাদ করে বা বিক্রি করে বা দান করত তা অর্পণ করে দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে। আর ক্রেতার উপর দাসের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা, আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, সে [ক্রেতা] কজা করার দ্বারা বস্তুটির মালিক হয়ে গেছে। ফলে তার সব হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। আজাদ করার দ্বারা দাসত্ব নিঃশেষ হয়েছে, তাই তার উপর দাসের বাজারমূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। আর বিক্রি ও হেবা [দান] করার দ্বারা পূর্ব বর্ণনানুযায়ী ফেরত নেওয়ার অধিকার খতম হয়ে গেছে। মুকাতাবের চুক্তি ও বন্ধকীচুক্তি বিক্রয়ের মতো। কেননা, এ দুটি চুক্তি আবশ্যিক পর্যায়ের। তবে পার্থক্য এটুকু যে, এ দুয়ের মধ্যে ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রত্যাবর্তিত হয় মুকাতাব অক্ষম হলে এবং বন্ধক ছাড়ানো হলে। কেননা, এ দু' অবস্থায় প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়ে যায়। আর এটা [অর্থাৎ ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হওয়ার বিষয়টি] ইজারা-চুক্তির ব্যতিক্রম। কেননা, তা বিভিন্ন ওজরবশত রহিত হয়ে যায়। ফাসাদ অপসারণ করাও একটি ওজর। তাছাড়া এটা [ইজারা-চুক্তি] পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে সংঘটিত হয়। সুতরাং এতে ফেরত প্রদান করার অর্থ হবে চুক্তি বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا بِخَمْرٍ الخ : মাসআলা : কেউ যদি ফাসিদ ক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কোনো দাস খরিদ করে : যেমন- সে মদের কিংবা শূকরের বিনিময়ে কোনো দাস খরিদ করল, অতঃপর তা বিক্রি করার অনুমতিক্রমে কজা করে আজাদ করে দিল বা বিক্রি করে দিল অথবা কাউকে দান করত অর্পণ করে দিল, তাহলে ক্রেতার কৃত এ কাজগুলো বৈধ বলে গণ্য হবে এবং ক্রেতার উপর উক্ত দাসের বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে। এর দলিল ইতিপূর্বে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে ক্রেতা যদি বিক্রিভোগের অনুমতিক্রমে পণ্য কজা করে, তাহলে সে পণ্যটির মালিক হয়ে যায়। যেহেতু ক্রেতা কজা করার দ্বারা পণ্যটির মালিক হয়েছে, তাই এতে তার সব ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে মতে তার উপরিউক্ত হস্তক্ষেপগুলো কার্যকর হবে। ক্রেতার উপর বাজারমূল্য ওয়াজিব হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-পণ্য সত্তাগতভাবে দায়যুক্ত হয়। সত্তাগতভাবে দায়যুক্ত হওয়ার অর্থ হলো তা বিনষ্ট হলে যদি পণ্যটি সাদৃশ্যান্বিত বস্তু হয়, তাহলে এতে অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যিক, আর যদি তা মূল্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে এতে বাজারমূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হয়। আলাদা মাসআলাতে বিক্রীত-পণ্য হলো ক্রীতদাস। ক্রীতদাস হলো মূল্যনির্ভর বস্তু-সাদৃশ্যান্বিত নয়। তাই ক্রেতার উপর দাসের বাজারমূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

এ মাসআলায় বিক্রিভোগের বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার কিভাবে রহিত হলো এ সম্পর্কে লেখক বলেন, [মূল পাঠে বর্ণিত ক্রেতার হস্তক্ষেপ হচ্ছে তিন ধরনের যথা- আজাদ করা, বিক্রি করা ও দান করা। প্রথমত] আজাদ করার দ্বারা দাসের মাল

হওয়ার বিষয়টি নিঃশেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্রেতা যখন গোলাম খরিদ করে কজা করে তারপর সেটাকে আজাদ করে দেয়, তখন তার দাসত্ব রহিত হয়ে যায়। আর দাসত্বের কারণেই সেটা বিক্রয়যোগ্য ছিল। যখন দাসত্ব রহিত হলো, তখন সেটা বিক্রয়যোগ্য রইল না এবং তার দাসত্ব বিনষ্ট হয়ে গেল। দায়যুক্ত দ্রব্য বিনষ্ট হলে এতে বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হয় সুতরাং এখানে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এর উদাহরণ হলো ছিনতাইকৃত গোলাম। ছিনতাইকৃত গোলাম যদি ছিনতাইকারীর হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে গোলামের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হয়।

আর দ্বিতীয় হস্তক্ষেপ হচ্ছে দাসটিকে বিক্রি করে দেওয়া বা দান করে দেওয়া। যদি ক্রেতা দাসটি বিক্রি করে দেয় কিংবা দান করে তা গ্রহীতার হাতে অর্পণ করে দেয়, তাহলে এ দু'অবস্থায়ও দ্বিতীয় বিক্রি রহিত করত বিক্রীত-পণ্য প্রথম বিক্রোক্ত ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, প্রথম ক্রেতা যখন পণ্যটি বিক্রয় করে ফেলেছে, তখন এর সাথে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার যুক্ত হয়ে গেছে আর হেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার অধিকার যুক্ত হয়েছে।

আর ইংপূর্বে বলা হয়েছে, বান্দার হক শরিয়তের হকের তুলনায় অগ্রগণ্য। এখানে শরিয়তের হক হচ্ছে দ্বিতীয় বিক্রয়টি প্রত্যাহার করত বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত দেওয়া। সুতরাং এখানে দ্বিতীয় ক্রেতা ও গ্রহীতার হক রক্ষায় দ্বিতীয় বিক্রয়টি বাতিল করত বিক্রোক্তার কাছে বিক্রীত-পণ্য ফেরত প্রদান করা হবে না।

মোটকথা, উপরিউক্ত দুটি সুরতসহ তিনটি সুরতেই বিক্রোক্তার বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে গেছে।

লেখক আরো বলেন, মুকাতাবের কিতাবাত-চুক্তি এবং বন্ধক [রেহেন]-চুক্তি বিক্রয়চুক্তির পর্যায়ে। এর ব্যাখ্যা হলো, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রির মাধ্যমে কোনো দাস ক্রয় করে, আর বিক্রোক্তার অনুমতিক্রমে সেটাকে কজা করত তাকে মুকাতাব বানিয়ে দেয় কিংবা কারো কাছে [রেহেন] বন্ধক রাখে, তাহলে এটা বিক্রয়ের মতো গণ্য হবে, অর্থাৎ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম বিক্রোক্তার ফেরত আনার অধিকার রহিত হয় তেমনি কিতাবাত-চুক্তি ও বন্ধক রাখলে প্রথম বিক্রোক্তার ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

এ দুটি চুক্তি বিক্রয়ের মতো হওয়ার যুক্তি হলো, বিক্রয়চুক্তি যেমন একটি আবশ্যিক চুক্তি, তেমনি এ দুটোও আবশ্যিক চুক্তি। এমনকি বন্ধকগ্রহীতা যখন বন্ধক দেওয়া বস্তুটি কজা করে ফেলে, তখন বন্ধক-চুক্তিটি বন্ধকদাতার জন্য আবশ্যিক হয়ে যাবে। এমনভাবে কিতাবাত চুক্তি মনিবের জন্য আবশ্যিক হয়ে যায়। কিতাবাত-চুক্তিতে মুকাতাবের হক তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়, আর বন্ধকের মধ্যে বন্ধকগ্রহীতার হক সম্পৃক্ত হয়। মুকাতাব ও বন্ধকগ্রহীতার হক সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ফাসিদ বিক্রয় রহিত করে বিক্রীত-পণ্যটি বিক্রোক্তার কাছে ফেরত দেওয়া হবে না। অবশ্য বন্ধক ও কিতাবাত-চুক্তির দু'অবস্থায় বিক্রোক্তার পণ্য তার কাছে ফেরত যেতে পারে। অবস্থা দুটো হলো, মুকাতাব যদি কিতাবাত-চুক্তি মোতাবেক বিনিময় প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, আর বন্ধকদাতা যখন বন্ধকের পরিবর্তে নেওয়া টাকা পরিশোধ করে, তখন বিক্রোক্তার পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার ফিরে আসে। কেননা, ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধক ছিল অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যের সাথে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকারের সংশ্লিষ্টতা তা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং যখন প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়েছে, এখন বিক্রোক্তা ফাসিদ বিক্রয়কে রহিত করে বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার পুনরায় লাভ করবে।

লেখক বলেন, ইজারা-চুক্তিটি এর ব্যতিক্রম। ইজারা-চুক্তি বিক্রয়, হেবা ও আজাদ করার মতো নয়। কেননা, ইজারা-চুক্তি দ্বারা বিক্রোক্তার ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তিরোহিত হবে না; বরং বিক্রোক্তা ফাসিদ বিক্রয়কে রহিত করে বিক্রীত-পণ্যটি, যা ইজারা দেওয়া হয়েছে তা ক্রেতা থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। কেননা, ইজারা বিভিন্ন ওজরের কারণে রহিত হয়ে যায়। ফাসাদ দূর করা তো একটি বড় ওজর। সুতরাং ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ইজারাকে প্রত্যাহার করা হবে। যখন ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ইজারা রহিত হয়ে গেল, তখন বিক্রোক্তার বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার ফিরে আসল। দ্বিতীয় দলিল হলো, ইজারা-চুক্তির ক্ষেত্রে হলো বস্তু থেকে মুনাফা ও সুবিধা ভোগ। স্বয়ং বস্তুটি ইজারা-চুক্তির ক্ষেত্রে নয়। আর মুনাফা ও সুবিধা পর্যায়ক্রমে অস্তিত্বশীল হয়। একবারে বা একই সাথে পুরো লাভ পাওয়া যায় না। সুতরাং যখন ইজারা-চুক্তিকে নিঃশেষ করার ইচ্ছা করা হয়, তখন এটা সেসব সুবিধা ও মুনাফা থেকে বিরত থাকা হয় যা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি। সুতরাং এখানে চুক্তিটি নাকচ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না, বরং বলা হবে চুক্তি নবায়ন করা হচ্ছে না। আর ইজারার মাধ্যমে কাউকে কোনো কিছু প্রদান করা থেকে বিরত থাকার অধিকার ইজারাদাতার অবশ্যই আছে। আর এ কারণে উল্লিখিত অবস্থায় ইজারা-চুক্তি রহিত করে বিক্রীত-পণ্যকে বিক্রোক্তার হাতে ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হবে।

قَالَ : وَلَيْسَ لِلْبَّائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَيْبَعِ حَتَّى يَرُدَّ الثَّمَنَ ، لِأَنَّ الْمَيْبَعِ مُقَابِلُ بِهِ ، فَيَصِيرُ مَخْبُوسًا بِهِ كَالرَّهْنِ ، وَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ فَلَمْ يَشْتَرِ أَحَدٌ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفَى الثَّمَنَ ، لِأَنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَكَذَا عَلَى وَرَثَتِهِ وَغُرَمَائِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، كَالرَّاهِنِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الثَّمَنِ قَائِمَةً يَأْخُذُهَا بِعَيْنِهَا ، لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، لِأَنَّهُ يَمَنْزِلُهُ الْغَضَبُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً أَخَذَ مِثْلَهَا لِمَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফাসিদ বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য ফেরত দেওয়ার পূর্বে বিক্রীত-পণ্য গ্রহণ করা বিক্র্তার জন্য বৈধ নয়। কেননা, বিক্রীত-পণ্য মূল্যের বিনিময়। যা মূল্যের বিপরীতে আবদ্ধ থাকবে। যেমন-বন্ধকের ক্ষেত্রে [বন্ধকী বস্তু টাকার বিনিময়ে আবদ্ধ থাকে]। যদি বিক্র্তা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পণ্যের মূল্য আদায় করার আগ পর্যন্ত ক্র্তাই পণ্যের বড় হকদার। কেননা, সে বিক্র্তার জীবদ্দশায় ক্র্তাকে বিক্র্তার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুতরাং বিক্র্তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী ও পাওনাদারদের উপর ক্র্তার অগ্রাধিকার বহাল থাকবে। যেমন- বন্ধকদাতার অগ্রাধিকার থাকে। [বিক্র্তার মৃত্যুর পর লক্ষণীয় হলো,] যদি মূল্যরূপে পরিশোধকৃত দিরহামগুলো হুবহু বিদ্যমান থাকে, তাহলে ক্র্তা উক্ত দিরহামগুলোই নিয়ে নেবে। কেননা, বিশুদ্ধতম মতানুসারে ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সুনির্দিষ্ট হয়। কেননা, এটা জবরদখলের পর্যায়ভুক্ত। আর যদি দিরহামগুলো বহাল না থাকে, তাহলে তার সমপরিমাণ দিরহাম নেবে, আমাদের পূর্ববর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَيْسَ لِلْبَّائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ফাসিদ বিক্রয়ে যদি ক্র্তা ও বিক্র্তা তাদের মূল্য ও পণ্য বিনিময় করে ফেলে, তাহলে বিক্রয় প্রত্যাহারের সময়ে বিক্র্তা মূল্যরূপে যা গ্রহণ করেছে তা প্রথমে ক্র্তার হাতে ফিরিয়ে দেবে, তারপরে ক্র্তা থেকে তার পণ্য গ্রহণ করবে। এখানে লক্ষণীয় হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ক্র্তার পক্ষ থেকে আদায়কৃত বস্তুকে ধার্যমূল্য (ثَمَنٌ) বলেছেন। অথচ কারো কারো মতে শব্দটি হবে বাজারমূল্য (وَفَيْسٌ)। কারণ, ফাসিদ বিক্রয়ে ধার্যমূল্য আবশ্যিক নয়; বরং বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হয়। তবে ফাতহুল কাদীরের লেখক কারো কারো এ ব্যাখ্যাকে মানতে রাজি নন। কেননা, ফাসিদ বিক্রয়ে বাজারমূল্য তখনই আবশ্যিক হয় যখন পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তো পণ্যটি বিদ্যমান। সুতরাং তাদের মধ্যে পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে ধার্যমূল্যই প্রদান করা হবে। এজন্যই তো ইমাম মুহাম্মদ (র.) ثَمَنٌ [বাজারমূল্য] শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বর্ণিত আলোচ্য মাসআলায় পণ্য বিদ্যমান রয়েছে, তাই এখানে বাজারমূল্য শব্দ ব্যবহার না করে ধার্যমূল্য ব্যবহার করা অনুচিত হয়নি। তবে এখানে যদি ইবারত এভাবে বলা হয় যে, “বিক্র্তা তার পণ্য ফেরত নিতে পারবে না, যে পর্যন্ত না বিক্র্তা তার পণ্যের বিনিময়রূপে যা গ্রহণ করেছে তার ফেরত না দেয়।” তখন বিষয়টি ব্যাপক হয়ে যাবে। এতে মুদ্রা ও সাধারণ পণ্য উভয়ই শামিল থাকবে। তদ্রূপ এতে ধার্যমূল্য ও বাজারমূল্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হবে।

মোটকথা, ফাসিদ বিক্রি প্রত্যাহারের সময় বিক্রেতা পণ্যের বিনিময়ে যা গ্রহণ করেছিল তা ফেরত দেবে, তারপর তার পণ্যটি ক্রেতা থেকে নেবে কেননা, পণ্যটি সেই বস্তুর বিনিময়, যা ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রদান করেছে। আর তারই পরিবর্তে পণ্যটি ক্রেতার কাছে আবদ্ধ থাকবে। সুতরাং যতক্ষণ বিক্রেতার পণ্যের বিনিময়টি ফেরত না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা পণ্যটি নিয়ে নেওয়ার অধিকার লাভ করবে না। যেমন- বন্ধকী-পণ্য ঋণের পরিবর্তে আবদ্ধ থাকে। যখন ঋণশোধ করা হয়, তখনই কেবল বন্ধকী-পণ্যটি ছাড়িয়ে নিতে পারে। এখানে একই ব্যাপার। অর্থাৎ যতক্ষণ পণ্যের বিনিময় ফেরত না দেবে বিক্রেতা বিক্রীত-পণ্য লাভ করার অধিকার পাবে না।

লেখক বলেন, যদি বিক্রেতা মারা যায়, তাহলে ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের অধিক হকদার সাব্যস্ত হবে যতদিন তার প্রদত্ত মূল্য উসূল না করে। কেননা, বিক্রেতার জীবদ্দশায়ও ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্য উসূল করে না নেওয়া পর্যন্ত বিক্রয়পণ্যের অধিক হকদার ছিল সুতরাং বিক্রেতার মৃত্যুর পরও বিক্রেতার উত্তরাধিকারীগণ পাওনাদার থেকে মূল্য আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত বিক্রয়পণ্যের ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব বহাল থাকবে। যেমন- যদি বন্ধকদাতা মারা যায় আর তার উত্তরাধিকারী ও পাওনাদার থেকে থাকে, তাহলে পণ্যের ব্যাপারে বন্ধকগ্রহীতার অগ্রাধিকার বহাল থাকে যে পর্যন্ত না সে তার ঋণের টাকা সম্পূর্ণরূপে উসূল করে নেয়। বন্ধকগ্রহীতা তার পাওনা আদায় করার পর অন্য হকদার তাদের হক আদায় করবে।

লেখক এরপর প্রাসঙ্গিকক্রমে বলেন, যদি বিক্রেতার কাছে ক্রেতা প্রদত্ত বিক্রীত-পণ্যের মূল্য দিরহাম বা দিনার বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিক্রেতাকে সেই দিরহাম বা দিনারই ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে। এর বিকল্প দিরহাম প্রদান করা যথেষ্ট হবে না। হ্যাঁ যদি ক্রেতা প্রদত্ত দিরহামগুলো খরচ কিংবা অন্য কোনোভাবে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে এর বিকল্প প্রদান করাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রথমাবস্থায় হুবহু দিরহাম প্রদানের কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে মুদ্রা যদিও চিহ্নিত করার দ্বারা চিহ্নিত হয় না; কিন্তু ফাসিদ বিক্রয়ে চিহ্নিত করার দ্বারা চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ, ফাসিদ বিক্রয় জবরদখলের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যটির উপর ক্রেতার দখলকে জবরদখল গণ্য করা হয়। তদ্রূপ মূল্যের উপর বিক্রেতার দখলকে জবরদখলের অনুরূপ মনে করা হয়। যেহেতু জবরদখলের বেলায় জবরদখলকারীর উপর হুবহু পণ্য ফেরত দেওয়া আবশ্যিক এবং জবরদখলকৃত পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে তার অনুরূপ বস্তু দেওয়া ওয়াজিব হয়, সেহেতু মূল্যের দিরহাম- দিনার, টাকা ইত্যাদি মুদ্রা যদি বিক্রেতার কাছে থাকে, তাহলে সেগুলো প্রদান করা আবশ্যিক। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার সমপরিমাণ মুদ্রা প্রদান করা জরুরি।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا بَيْعًا فَاِسْدًا فَبِنَاهَا الْمُشْتَرَى فَعَلَيْهِ فِيمَتَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، رَوَاهُ يَعْقُوبُ عَنْهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الرَّوَايَةِ، وَقَالَ : يَنْقُصُ الْبِنَاءُ وَتَرَدُّ الدَّارُ، وَالْغَرَسُ عَلَى هَذَا الْاِخْتِلَافِ، لَهُمَا أَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ أَضْعَفُ مِنْ حَقِّ الْبَايِعِ، حَتَّى يَحْتَاجَ فِيهِ إِلَى الْقَضَاءِ، وَبَطْلُ بِالسَّخِيرِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْبَايِعِ، ثُمَّ أَضْعَفُ الْحَقَّيْنِ لَا يَبْطُلُ بِالْبِنَاءِ، فَاقْوَاهُمَا أَوْلَى، وَلَهُ أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرَسَ مِمَّا يَفْصِدُ بِهِ الدَّوَامُ، وَقَدْ حَصَلَ بِتَسْلِيْطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَايِعِ، فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ كَالْبَيْعِ، بِخِلَافِ حَقِّ الشَّفِيعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَوْجَدْ مِنْهُ التَّسْلِيْطُ، وَلِهَذَا لَا يَبْطُلُ بِهِ عَنِ الْمُشْتَرَى وَسَبْعِهِ، فَكَذَا بِبِنَائِهِ، وَشَكَّ يَعْقُوبُ فِي حِفْظِهِ الرَّوَايَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)، وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ عَلَى الْاِخْتِلَافِ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ، مَبْنَى عَلَى انْقِطَاعِ حَقِّ الْبَايِعِ بِالْبِنَاءِ وَثُبُوتِهِ عَلَى الْاِخْتِلَافِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে বাড়ি বিক্রি করে, অতঃপর ক্রেতা তাকে কোনো কোঠা নির্মাণ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার উপর উক্ত বাড়ির বাজার-মূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হবে। এ মতটি ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেন। এরপর অবশ্য বর্ণনাটির ব্যাপারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাহেবাইন (র.) বলেন, হৈরিকৃত কোঠা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং বাড়ি ফেরত দেওয়া হবে। রোপণকৃত গাছের ব্যাপারে একই মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের [সাহেবাইনের] দলিল হলো, শুফআর দাবিদারের হক বিক্রেতার হকের চেয়ে দুর্বল। এজন্য শুফআর অধিকারের ক্ষেত্রে আদালতের ফয়সালার প্রয়োজন হয় এবং তা বিলম্বের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। বিক্রেতার হক এর ব্যতিক্রম। দুই হকের দুর্বলতম হক যেহেতু কোঠা নির্মাণ করার কারণে বাতিল হয় না, কাজেই সবল হকটি তো বাতিল না হওয়া আরও স্বাভাবিক। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল হচ্ছে- কোনো ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণ এমন কাজ, যার দ্বারা স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এটা বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হবে, যেমন বিক্রির বেলায় হয়। শুফআর দাবিদারের হক এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি পাওয়া যায়নি। আর এজন্যই তা [শুফআর দাবিদারের হক] ক্রেতার বিক্রয় ও দানের দ্বারা বাতিল হয় না। তদ্রূপ তার নির্মাণের দ্বারাও। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে রেওয়ায়েতটি সংরক্ষণ করার ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) মতপার্থক্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে শুফআ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কারণ, শুফআর হক স্যাবস্ত হওয়ার ভিত্তি হলো নির্মাণের দ্বারা বিক্রেতার হক বাতিল হওয়ার উপর। আবার শুফআর হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْبَيْعُ وَنَبَّاحُ دَارِ الْبَيْعِ فَدَا الْخ: উল্লিখিত ইবারতে ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত জমিনে স্থায়ীভাবে কোনো কিছু নির্মাণ ইত্যাদি করলে জমিন বিক্রেতার জমিন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে, নাকি তা রহিত হয়ে যাবে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি প্রাচীর ইত্যাদির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ করা একটি বাড়ির জমিন ক্রয় করল ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে। এরপর ক্রেতা জমিনে কিছু ঘর তৈরি করল। অথবা জমিনটিতে বৃক্ষ রোপণ করল। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ঘর নির্মাণ কিংবা বৃক্ষ রোপণের দ্বারা বিক্রেতার [ফাসিদ বিক্রয়ের কারণে] বিক্রীত জমিন ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর ক্রেতার উপর উক্ত জমিনের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) মনে করেন বিক্রেতার জমিন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত হবে না; বরং ক্রেতার নির্মিত ইমারত ভেঙ্গে ও বৃক্ষের মূলোৎপাটন করে জমিন ফেরত দিতে হবে।

লেখক বলেন: মাসআলাটি রেওয়াজতের সিলসিলা এই : عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে, আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) মাসআলাটি বর্ণনা করার পর এ বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে শুনেছেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। উপরিউক্ত বর্ণনাটি যে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মায়হাব এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ তাঁর মতে ক্রেতা জমিনে কোনো কিছু নির্মাণ করার পর বিক্রেতার সেই জমিন ফেরত চাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে- যদি কোনো জমিন কেউ ক্রয় করার পর তাতে কোনো কিছু নির্মাণ করে কিংবা বৃক্ষ রোপণ করে, তারপর তার কোনো প্রতিবেশী উক্ত জমিনের শুফআ দাবি করে তাহলে শুফআর দাবিদার ব্যক্তিকে জমিন খালি করে ফেরত দিতে হবে! শুফআর দাবিদারের হক বিক্রেতার হকের চেয়ে দুর্বল। যেহেতু নির্মাণের কারণে শফী'-এর ফেরত চাওয়ার ও নেওয়ার অধিকার রহিত হয় না, সুতরাং বিক্রেতার ফেরত চাওয়ার ও নেওয়ার অধিকার কি করে রহিত হবে?

শফী'র হক দুর্বল হওয়ার প্রমাণ হলো, শফী'র হক আদায়ের জন্য হয় বিচারকের রায় পেতে হয়, নয়তো ক্রেতার সন্তুষ্টির প্রয়োজন হয়। এমনিভাবে শফী' যদি তার হক দাবি করার ব্যাপারে সামান্য বিলম্ব করে তাহলে তার হক বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া শফী' যদি মারা যায় তাহলে তার হক তার ওয়ারিশানের মাঝে স্থানান্তরিত হয় না। পক্ষান্তরে ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেওয়ার ও চাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আদায়ে বিচারকের রায়ের অপেক্ষা কিংবা ক্রেতার সন্তুষ্টি কোনোটারই প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ বিক্রীত পণ্যের ফেরত নেওয়ার অধিকার তলব করতে যদি বিলম্বও করে তবু তার সে তলব করার অধিকার রহিত হবে না। তাছাড়া বিক্রেতা যদি মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ তার উক্ত তলব করার হক লাভ করবে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শুফআর হক বিক্রয়ের হকের চেয়ে দুর্বল! সুতরাং এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ক্রেতার ইমারত নির্মাণ এবং বৃক্ষরোপণের দ্বারা যেহেতু শুফআর হক বাতিল হয় না, সুতরাং বিক্রেতার হক ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণের দ্বারা কিছুতেই বাতিল হবে না। এটাই যুক্তিযুক্ত দাবি।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ ক্রেতা দীর্ঘস্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এটা কেউ ভেঙ্গে ফেলার কিংবা উপড়ে ফেলার জন্য করে না। তাছাড়া বৃক্ষরোপণ ও ইমারত নির্মাণের কাজটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে হয়েছে। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমেই জমিন কজা করেছিল। আর নিয়মানুযায়ী বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ক্রেতা যে সব হস্তক্ষেপ করে তার কারণে বিক্রেতার পণ্য ইত্যাদি ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়। যেমন ক্রেতা যদি পণ্যটি অন্যের কাছে বিক্রি করে ফেলে তাহলে বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়। একরূপভাবে ক্রেতার ক্রয়কৃত জমিনের মধ্যে ইমারত নির্মাণ এবং বৃক্ষ রোপণের দ্বারা বিক্রেতার জমিন ফেরত চাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

তবে ক্রেতার ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণের দ্বারা শফীর হক বাতিল হবে না। যদিও শফীর হক বিক্রেতার হকের চেয়ে দুর্বল। এর কারণ হলো- শফীর পক্ষ থেকে ক্রেতা কোনো ক্ষমতা লাভ করে ঘর নির্মাণ করেনি। যেহেতু শফীর পক্ষ থেকে ক্রেতা কোনো ক্ষমতা-অনুমতি লাভ করেনি তাই ক্রেতার ক্রয়কৃত জমিনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার দ্বারা শফীর অধিকার বিনষ্ট হবে না। শফীর হক বাতিল না হওয়ার কারণে ক্রেতার নির্মিত ইমারত ও রোপিত বৃক্ষ অপসারণ করে শফীকে তার হক প্রদান করা হবে। যেহেতু ক্রেতার হস্তক্ষেপের দ্বারা শফীর হক বাতিল হয় না, তাই যদি ক্রেতা জমিন কারো কাছে বিক্রি করে দেয় কিংবা কাউকে দান করে সোপদ করে দেয়, তবুও শফীর হক বাতিল হবে না। বরং ক্রেতা দান করে থাকলে দানকৃত জমিনটি গ্রহীতার হাত থেকে গ্রহণ করত শফীর হাতে ফিরিয়ে দিবে। তদ্রূপ যদি বিক্রি করে থাকে তাহলে বিক্রীত জমিনটি দ্বিতীয় ক্রেতার হাত থেকে গ্রহণ করে শফীকে ফিরিয়ে দিবে। মোটকথা, যেমনিভাবে দান ও বিক্রি করার দ্বারা শফীর অধিকার বাতিল হয় না, তেমনি ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণের দ্বারা শফীর হক বাতিল হবে না।

লেখক মূল পাঠে বর্ণিত ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সন্দেহের ব্যাপারটিকে জোড়ালো করার জন্য আবার বলছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন যে, অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বক্তব্য- “ক্রেতার ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণের দ্বারা বিক্রেতার ফেরত চাওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং ক্রেতার উপর বিক্রীত জমিনের বাজারমূল্য প্রদান আবশ্যক হয়” তিনি শুনেছেন কিনা এ ব্যাপারেও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কাছে এটা বর্ণনা করেছেন কিনা তা এ ব্যাপারে তার সন্দেহ রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব যে এটা ইহ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মাযহাব এই যে, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো জমিন খরিদ করে এতে ইমারত নির্মাণ করে কিংবা এতে বৃক্ষরোপণ করে তাহলে বিক্রেতার জমিন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুশ শুফআতে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে এমন মাসআলাতে মতবিরোধ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণিত মাসআলাটির মতবিরোধের উৎস হলো এ মাসআলা। শুফআহ অধ্যায়ে বর্ণিত মাসআলাটি এরকম : “যদি কোনো ব্যক্তি ফাসিদ বিক্রির মাধ্যমে জামিন ক্রয় করে এতে কোনো ভবন নির্মাণ করে কিংবা বৃক্ষরোপণ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এতে শফীর শুফআর হক অবশ্যই প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ শফীর এই অধিকার রয়েছে যে, বিচারকের রায়ের মাধ্যমে উক্ত জামিন আদায় করবে, আর এ অবস্থায় ক্রেতার উপর আবশ্যক হলো, সে উক্ত জমিন তার ভবন ভেঙ্গে ও বৃক্ষ উৎপাটন করে শফীর হাতে অর্পণ করতে হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ অবস্থায় শফী তার শুফআর অধিকার লাভ করবে না। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর এই মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো এই যে, ক্রেতা কর্তৃক ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত জমিনে ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ করার দ্বারা বিক্রেতার জমিন ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শফীর শুফআর হক এমতাবস্থায় নিশ্চিত বহাল থাকবে, কিন্তু বিক্রেতার বিক্রীত পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না। কেননা বিক্রেতার ফেরত নেওয়ার অধিকার ও শফীর শুফআর অধিকার- এ দু'য়ের মাঝে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে। বিক্রেতার হক প্রত্যখ্যাত হওয়ার কারণে ক্রেতার উপর জমিনের বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে- ধার্যমূল্য নয়। কারণ, ফাসিদ বিক্রয়ের অবস্থায় ক্রেতার উপর বাজারমূল্য আবশ্যক হয়, ধার্যমূল্য নয়। মোটকথা, উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটা ই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো ক্রেতা যদি জমিনে ইমারত নির্মাণ কিংবা বৃক্ষরোপণ করে তাহলে বিক্রেতার জমিন ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর ক্রেতার উপর জমিনের বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে উপরিউক্ত অবস্থায় যেহেতু শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয় না। তাই বিক্রেতার হক বাতিল হবে না। বিক্রেতার ফিরিয়ে নেওয়া অধিকার বাতিল না হওয়ার কারণে ক্রেতার উপর ইমারত ভেঙ্গে ও বৃক্ষের মূলোৎপাটন করে জমিন ফেরত দেওয়া আবশ্যক।

قَالَ: وَمِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْعًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَا فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فِيهَا تَصَدَّقَ  
بِالرَّيْحِ، وَيَطِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رِبَحَ فِي الثَّمَنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجَارِيَةَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ،  
فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهَا، فَيَتِمَّ كُنُ الْخُبِّ فِي الرِّيحِ، وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنَائِيرُ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِي  
الْعُقُودِ، فَلَمْ يَتَعَلَّقِ الْعَقْدَ الثَّانِي بِعَيْنِهَا، فَلَمْ يَتِمَّ كُنُ الْخُبِّ، فَلَا يَجِبُ  
التَّصَدَّقُ، وَهَذَا فِي الْخُبِّ الَّذِي سَبَبُهُ فُسَادُ الْمِلْكِ أَمَّا الْخُبُّ لِعَدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَ  
أَبَى حَنِيفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ يَشْمَلُ التَّوَعَيْنَ، لِيَتَعَلَّقِ الْعَقْدُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ حَقِيقَةً  
وَفِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ شُبْهَةً مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ سَلَامَةُ الْمَبِيعِ أَوْ تَقْدِيرُ الثَّمَنِ،  
وَعِنْدَ فَسَادِ الْمِلْكِ يَنْقَلِبُ الْحَقِيقَةُ شُبْهَةً، وَالشُّبْهَةُ تَنْزِلُ إِلَى شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ،  
وَالشُّبْهَةُ هِيَ الْمَعْتَبَرَةُ دُونَ النَّازِلِ عَنْهَا.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসী ক্রয় করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে [নিজ নিজ প্রাপ্য তথা পণ্য ও মূল্য] কজা করে অতঃপর সে দাসীটি বিক্রি করে এবং এতে মুনাফা লাভ করে তাহলে মুনাফা সদকা করে দিবে। পক্ষান্তরে প্রথম বিক্রেতার [দাসীর] মূল্যতে যে মুনাফা হয় তা বিক্রেতার জন্য বৈধ হবে। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, বিক্রয় চুক্তির দ্বারা দাসী নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাই চুক্তির সম্পর্ক তার সাথেই হবে। ফলে মুনাফার মধ্যে অবৈধতা স্থির হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দিরহাম, দিনার [ও টাকা] চুক্তিগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট হয় না। আর তাই দ্বিতীয় চুক্তি সরাসরি মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। সুতরাং অবৈধতা স্থির হতে পারেনি। তাই মুনাফা সদকা করা ওয়াজিব নয়। এ বিধান সেসব অবৈধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার সবব বা মূল কারণ হলো মালিকানার ফাসাদ। আর যে অবৈধতা মালিকানা না থাকার কারণে হয় তা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, যে বস্তু নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় তার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয় প্রকৃত অবৈধতার ভিত্তিতে, আর যা নির্দিষ্ট হয় না [যথা দিরহাম মুদ্রা ইত্যাদি] তার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয় সন্দেহপূর্ণ অবৈধতার ভিত্তিতে; এভাবে যে, এর সাথে বিক্রীত পণ্য সংরক্ষিত থাকার বিষয় জড়িত থাকে কিংবা এর দ্বারা মূল্য নিরূপিত হয়। মালিকানা ফাসিদ হয়ে গেলে প্রকৃত অবৈধতার ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রবলিত হয়। আর অবৈধতার সন্দেহ পর্যায়ে নেমে আসে। অথচ অবৈধতার সন্দেহ তো গ্রহণযোগ্য, এর নিম্নস্তরের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ - قَوْلُهُ قَالَ: وَمِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً الخ: ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল-জামিউস সাগীর কিতাবে উপরিউক্ত মাসআলাটি আলোচনা করেন। মূল মাসআলা আলোচনার পূর্বে আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, সব মাল [নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে] দু' প্রকার-



১. যেসব মাল চুক্তিতে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, যেমন— স্বর্ণ, রূপা, তদীয় মুদ্রা ও যে কোনো মুদ্রা।
২. যেসব মাল নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন উপরিউক্ত স্বর্ণ, রূপা ও মুদ্রা ছাড়া সব কিছু।

আমাদের এটাও জানা দরকার যে, অবৈধতা দু' প্রকার—

১. মালিকানা ফাসিদ হওয়ার কারণে যে অবৈধতা হয়,
২. মালিকানা না থাকার যে অবৈধতা হয়।

প্রথম প্রকারের ফাসাদ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হয় এমন বস্তুর মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয় প্রকার ফাসাদ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয় প্রকারের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ইবারতের মাসআলার প্রকৃতি এই যে, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রির মাধ্যমে এক ক্রীতদাসী ক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে দাসী ও তার মূল্য কজা করে। অর্থাৎ ক্রেতা দাসীটি বিক্রেতা থেকে বুঝে নিজের দখলে নিয়ে যায়, আর বিক্রেতা তার মূল্য ক্রেতা থেকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসে। এরপর যদি ক্রেতা উক্ত দাসী বিক্রয় করে কিছু মুনাফা অর্জন করে তাহলে তার জন্য উক্ত মুনাফা সদকা করে দেওয়া আবশ্যিক, পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি দাসীর মূল্য দ্বারা কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তার দ্বারা ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে তাহলে তার উক্ত মুনাফা তার জন্য হালাল ও বৈধ হবে এবং তা সদকা করা আবশ্যিক হবে না।

উল্লিখিত দু'টি অবস্থায় যে পার্থক্য রয়েছে সে পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে বলেন, দাসী এমন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যেহেতু দাসী সুনির্দিষ্ট তাই দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটির সম্পর্ক হবে দাসীর সত্তার সাথে। দাসীটি ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ করার কারণে ক্রেতার মালিকানা ফাসিদ ছিল। ফলে ক্রেতা উক্ত দাসী বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা ফাসিদ মালিকানার মাধ্যমে অর্জন করেছে। আর যে মুনাফা ফাসিদ মালিকানা থেকে অর্জিত হয় তাতে হারাম ও অবৈধতা স্থিত হয়ে যায়। আর যে বস্তুর মাঝে অবৈধতা ও হারাম পাওয়া যায় সে বস্তু সদকা করা আবশ্যিক হয় এবং তা ব্যবহার করা বা তার দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হওয়া যায় না। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা দাসী বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা ক্রেতার জন্য বৈধ হবে না এবং মুনাফা সদকা করে দেওয়া ক্রেতার উপর আবশ্যিক হবে। পক্ষান্তরে দিরহাম, দিনার, টাকা ও অন্যান্য মুদ্রা আমাদের মতে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। [অবশ্য ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)

—এর মতে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।] বিক্রেতা ক্রেতার থেকে দাসীর মূল্য বাবদ যে মুদ্রা লাভ করেছে তা যেহেতু নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না সেহেতু দ্বিতীয় বিক্রয়ের সম্পর্ক উক্ত মুদ্রার সত্তার সাথে হবে না। অর্থাৎ বিক্রেতা যদি উক্ত মুদ্রা দ্বারা কোনো দ্রব্য খরিদ করে যা সে ক্রেতার থেকে দাসীর মূল্য বাবদ লাভ করেছিল তাহলে তার এই [দ্বিতীয়] ক্রয় মুদ্রাগুলোর সত্তার সাথে সম্পর্কিত হবে না। কারণ, মুদ্রা নির্ধারিত করলেও নির্ধারিত হয় না। সুতরাং ক্রেতার থেকে অর্জিত মুদ্রা দ্বারাই যে উক্ত খরিদ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অতএব যখন দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক মুদ্রাগুলোর সাথে সত্তাগতভাবে হয় না, তখন এই বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তাতে হারাম ও অবৈধতা স্থিত হবে না। যখন এই মুনাফাতে হারাম ও অবৈধতা স্থিত হয়নি তাই তার এ মুনাফা তার জন্য বৈধ হবে এবং মুনাফা সদকা করা আবশ্যিক হবে না।

লেখক বলেন, উক্ত বিধান অর্থাৎ مَا لَا يَتَمَيَّنُّ وَ مَا يَتَمَيَّنُّ -এর সাথে যে পার্থক্য তার সব বা হেতু হচ্ছে ফাসিদ মালিকানা অর্থাৎ যদি ফাসিদ মালিকানার কারণে “নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তু” এর মধ্যে অবৈধতা ও হারাম সৃষ্টি হয় তাহলে তা উপার্জনকারীর জন্য হালাল নয়, বরং তা সদকা করে দেওয়া আবশ্যিক। আর যদি ফাসিদ মালিকানার কারণে “নির্দিষ্ট করা যায় না এমন বস্তু” এর মাঝে অবৈধতা ও হারাম সৃষ্টি হয় তাহলে তা উপার্জনকারীর জন্য বৈধ হবে এবং তা সদকা করে দেওয়া আবশ্যিক নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা উপরে করা হয়েছে।

কিন্তু যদি মুনাফার মধ্যে অবৈধতা আসে মালিকানা না থাকার কারণে যেমন কেউ একটি দাসী অপহরণ করে নিয়ে আসল, তারপর তা বিক্রি করে প্রকৃত মালিকের ক্ষতিপূরণ আদায় করল। ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর দেখা গেল অপহরণকারীর কিছু মুনাফা [অতিরিক্ত] হয়েছে, অথবা কেউ অন্যের কাছ থেকে স্বর্ণ বা রূপা ছিনতাই করে, তার বিনিময়ে কোনো দ্রব্য ক্রয় করতঃ তা বিক্রি করে মালিকের ক্ষতিপূরণ শোধ করল, কিন্তু তারপরেও তার কাছে কিছু মুনাফা রয়ে গেল, এমতাবস্থায় ইমাম আবু

হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উভয়ের মতে নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তু এবং নির্দিষ্ট করা যায় না এমন বস্তু উভয়ের দ্বারা অর্জিত মুনাফাই সদকা করতে হবে এবং উপার্জনকারীর জন্য তা বৈধ হবে না। কেননা, মালিকানাহীনতার অবস্থায় যে ফাসাদ সৃষ্টি হয় তা উভয়কে প্রভাবান্বিত করে এবং উভয়ের মুনাফা অবৈধ হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, মালিকানাহীনতার মুনাফা [উদাহরণস্বরূপ] অপহরণকারীর জন্য হালাল ও বৈধ। তার মতে অপহরণকারী যখন ক্ষতিপূরণ মালিককে প্রদান করল তখন সে পণ্যটির মালিক হয়ে গেল। অতএব সে তার মালিকানাধীন দ্রব্য দ্বারা মুনাফা অর্জন করল, আর মালিকানাধীন দ্রব্যের মুনাফা মালিকের জন্য নিঃসন্দেহে বৈধ, কাজেই তা সদকা করা আবশ্যিক নয়।

তারফাইন (র.) তাদের মতের পক্ষে দলিল পেশ করেন এই বলে যে, “নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তু” এর ক্ষেত্রে চুক্তি প্রকৃতভাবে সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ যখন দাসীটি অপহরণ করে বিক্রি করা হয়, তখন বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক এর সাথে হবে সরাসরি। কেননা, বিক্রোতার জন্য এই দাসী স্থলে অন্য দাসী অর্পণ করা বৈধ নয়। এই দাসীটিই ক্রোতার হাতে সোপর্দ করতে হবে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তি প্রকৃতই দাসীর সাথে সম্পূর্ণ হয়েছে তাই এতে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা প্রকৃত অবৈধতা ও হারাম মিশ্রিত হবে। যেহেতু প্রকৃত অবৈধতা হালাল নয় তাই অবৈধ মুনাফাকে সদকা করে দিতে হবে। আর যে সব দ্রব্য নির্দিষ্ট করা যায় না-তার সাথে বিক্রয়চুক্তির সম্পর্ক হয়ে থাকে সন্দেহ যুক্ত। অর্থাৎ যখন ছিনতাইকারী মুদ্রা ছিনতাই করে অতঃপর উক্ত মুদ্রা দ্বারা কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে তার এই ক্রয়চুক্তির সাথে মুদ্রার সম্পর্ক হবে সন্দেহের সাথে। কেননা ছিনতাইকৃত মুদ্রার দ্বারা যখন কোনো দ্রব্য কেনা হয় তাতে দুটি অবস্থা হতে পারে—

১. হয়তো সেই দিরহামগুলোর প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছে।

২. অথবা ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়নি। অথবা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু ইশারাকৃত মুদ্রাগুলো থেকে আদায় না করে অন্য মুদ্রা আদায় করা হয়েছে।

প্রথম অবস্থায় ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে বিক্রীত-পণ্য সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। কেননা যখন ছিনতাইকৃত মুদ্রাগুলো মূল্যরূপে নির্ধারিত হলো তখন এর জন্যই ছিনতাইকারীর উদ্দেশ্যে বিক্রীত-পণ্য সংরক্ষিত থাকবে। এভাবে যখন ছিনতাইকৃত মুদ্রা বিক্রীত পণ্য সংরক্ষিত থাকার সব বা মূল হেতু বলে গণ্য হয়, তখন মুদ্রার সাথে যদিও প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণ হবে না [কেননা মুদ্রা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না] কিন্তু যেহেতু মুদ্রা বিক্রীত পণ্য সংরক্ষিত থাকার মাধ্যম হয়, তাই এর সাথে চুক্তির সম্পর্ক হবে ওবহা বা সন্দেহের ভিত্তিতে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে মূল্য নির্ধারণ এর বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে। অর্থাৎ যদিও ছিনতাইকৃত মুদ্রা মূল্যরূপে আদায় করা হয় তবুও এগুলোর সাহায্যে মূল্য কত হবে তা নির্ধারিত করা হয়। কেননা মূল্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও গুণাগুণ বর্ণনা করা আবশ্যিক। আর এসবই ছিনতাইকৃত মুদ্রার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে চুক্তির সম্পর্ক প্রকৃতভাবে না হলেও সন্দেহপূর্ণভাবে অবশ্যই হয়। সারকথা এই দাঁড়াল যে, ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক সন্দেহপূর্ণভাবে অবশ্যই রয়েছে। যেহেতু চুক্তির সাথে এর সম্পর্ক হয়, সন্দেহপূর্ণ, সেইহেতু উক্ত চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাতে সন্দেহপূর্ণভাবে অবৈধতাও আসবে। যেহেতু প্রকৃত অবৈধতা ও সন্দেহপূর্ণ অবৈধতা উভয়ই হারাম, তাই উভয় মুনাফাকে সদকা করা আবশ্যিক হবে। এ দু'য়ের অবৈধতার প্রমাণ হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ এর বাণী **أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الرِّبَا وَالرِّبَا وَهُوَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ** অর্থাৎ রাসূল ﷺ সুদ ও সন্দেহপূর্ণ সুদের কারবার নিষিদ্ধ করেছেন।

পক্ষান্তরে মালিকানা ফাসিদ হওয়ার অবস্থায় মুনাফা যেহেতু অন্যের মাল থেকে অর্জিত হয় না; বরং নিজের মাল থেকে হয় [যদিও সে মালিকানা ফাসিদ], তাই মালিকানা ফাসিদ হলে প্রকৃত অবৈধতা পরিবর্তন হয়ে সন্দেহপূর্ণ অবৈধতায় পরিণত হয়, আর সন্দেহপূর্ণ ফাসাদ পরিবর্তন হয়ে দ্বিগুণ সন্দেহে পরিণত হয়। ফলে ফাসিদ মালিকানার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তুতে সন্দেহপূর্ণ অবৈধতা হয়, আর যা নির্দিষ্ট করা যায় না তাতে দ্বিগুণ সন্দেহ পূর্ণ অবৈধতা যুক্ত হয়। শরিয়তে যেহেতু একটি সন্দেহ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য, দ্বিগুণ সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়, তাই ফাসিদ মালিকানার ক্ষেত্রে **مَا يَتَعَيَّنُ** -এর মাঝে যে মুনাফা হয় তা সদকা করতে হবে। কারণ, এটা এক সন্দেহযুক্ত অবৈধতা। আর **مَا لَا يَتَعَيَّنُ** -এর দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হয় তা সদকা করা আবশ্যিক নয়, কারণ এটি দ্বিগুণ সন্দেহযুক্ত হয়েছে [যার কারণে শরিয়তে কোনো দ্রব্য হারাম হয় না]।

قَالَ : وَكَذَا إِذَا ادَّعَى عَلَى أَخْرَمًا لَفَقْضِهِ إِيَّاهُ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ  
وَقَدْ رِيعَ الْمُدَّعَى فِي الدَّرَاهِمِ يَطْنِبُ لَهُ الرِّيحُ لِأَنَّ الْخُبْنَ لِفَسَادِ الْمِلِكِ هَهُنَا، لِأَنَّ  
الدِّينَ وَجِبَ بِالتَّسْمِيَةِ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ بِالتَّصَادُقِ، وَيَذُلُّ الْمُسْتَحَقُّ مَمْلُوكٌ فَلَا يَفْعَلُ  
فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এমনভাবে যখন কেউ অপরের বিরুদ্ধে মাল পাওয়ার দাবি করে, অতঃপর বিবাদী দাবিদারের (দাবিকৃত) মাল পরিশোধ করে। তারপর তারা উভয়ে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে যে, বিবাদীর উপর কোনো মাল পাওনা ছিল না। আর ইতোমধ্যে মালের দাবিদার মুদাগুলোর দ্বারা মুনাফা অর্জন করে নেয়, তাহলে তার জন্য এ মুনাফা বৈধ বিবেচিত হবে। কেননা, এখানে ফাসাদ ছিল ফাসিদ মালিকানার জন্যে। কারণ একজন দাবিদারের পাওনা দাবি করার কারণে ঋণ ওয়াজিব হয়েছে। তারপর পরস্পর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সেই ঋণের হকদার সাব্যস্ত হয়েছে। আর হকদার স্বীকৃত ঋণের বদলে প্রদত্ত মাল মালিকানাধীন হয়ে থাকে। অতএব অপরিব্রতা এই প্রদেয় মুদাগুলো, যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না- এর মাঝে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذَا إِذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ الْخ : উপরিউক্ত ইবারতে আল-জামিউস সাগীর থেকে চয়নকৃত পূর্ববর্তী মাসআলায় সংশ্লিষ্ট আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরতে মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কাছে পাওনা দাবি করল যে, তোমার কাছে আমি এতটাকা [দশ হাজার টাকা] পাব, সুতরাং তুমি উক্ত টাকা শোধ কর। সেমতে যার কাছে দাবি করা হয়েছে সে উক্ত দাবিকৃত [দশ হাজার] টাকা শোধ করল। সে টাকা দাবিদারের কাছে দীর্ঘদিন ছিল। দাবিদার উক্ত টাকার মাধ্যমে কিছু মুনাফাও অর্জন করল। এরপর একসময় তারা উভয়ে এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে যে, মূলত দাবিদার কোনো টাকাই পেত না। এমতাবস্থায় উক্ত টাকা থেকে অর্জিত মুনাফার কি হুকুম? এর উত্তর হলো মুনাফা দাবিদারের জন্য বৈধ সাব্যস্ত হবে।

এর কারণ এই যে, এখানে মুনাফাতে যে অপরিব্রতা ও ফাসাদ এসেছে তা ফাসিদ মালিকানার কারণে। ফাসিদ মালিকানার কারণ হলো, দাবিদার যখন দশ হাজার টাকার পাওনা দাবি করল আর প্রতিপক্ষ তা স্বীকার করে নিল তখন দশ হাজার টাকা ঋণ সাব্যস্ত হয়ে গেল। শরিয়তের পরিভাষায় ঋণ (دَيْنٌ) বলা হয় وَجِبَ فِي الدَّيْنِ -কে। এরপর যখন স্বীকৃত ঋণের বদলে দাবিদারকে দশ হাজার টাকা প্রদান করা হলো এবং দাবিদার তা কজা করল তখন এই দশ হাজার টাকা ঋণের বদল সাব্যস্ত হলো, স্বয়ং ঋণ নয়। কারণ ঋণ কোনো মালই নয়, বরং ঋণ তো হলো একটি হক, যে হকটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে আপত্তিত হয়। এরপর যখন দাবিদার ও বিবাদী এ ব্যাপারে ঐকমত্য হলো যে, মূলত দাবিদার কিছুই পেত না, তখন উক্ত ঋণের হকদার সাব্যস্ত হলো। অর্থাৎ ঋণ এমন হয়ে গেল যে, একজন হকদার রয়েছে, যে তার হক দাবি করছে। ঋণের হকদার বের হওয়ার কারণে এর বদলে দাবিদারের মালিকানা ফাসিদ হয়ে গেল। আর এজন্য দাবিদারকে উক্ত ঋণের বদল তথা দশ হাজার ফেরত প্রদান করা আবশ্যিক হয়ে যাবে।

এর উদাহরণ এক্ষণে যে, কেউ একটি দাসী ক্রয় করল দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। অতঃপর উক্ত দাসীর একজন হকদার বের হলো। এমতাবস্থায় দশ হাজার টাকা [যা ক্রেতা থেকে লাভ করেছিল] বিক্রেতার মালিকানাধীন হবে। তবে তা ক্রেতাকে ফেরত

দিতে হবে হকদার বের হওয়ার কারণে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় দশ হাজার টাকা [ঋণের বদলে প্রদত্ত] এর হকদার বের হওয়ার পর তা দাবিদারের মালিকানাধীন বাটে, তবে তা ফাসিদ মালিকানার ভিত্তিতে। আর মালিকানা ফাসিদ হলে এর থেকে যে মুনাফা অর্জিত হয় তাতে অপবিত্রতা থাকে। সুতরাং দাবিদার দশহাজার টাকা থেকে যে মুনাফা লাভ করেছে তাতে অপবিত্রতা রয়েছে। এখানে সে অপবিত্রতা পাওয়া গেছে মুদ্রার মধ্যে, যা নির্ধারণ করলেও নির্ধারণ হয় না। ফলে উক্ত অপবিত্রতা মুদ্রার মধ্যে কার্যকর হবে না। কেননা [পূর্বে বলা হয়েছে] যে, অপবিত্রতা ফাসিদ মালিকানার কারণে হয়ে থাকে তা নির্ধারণ করা যায় না এমন বস্তুর মাঝে কার্যকর হয় না। যেহেতু এখানে অপবিত্রতা কার্যকর নয় তাই দাবিদারের জন্য উক্ত মুনাফা বৈধ এবং তা সদকা করা ওয়াজিব নয়।

উল্লেখ্য যে, এখানে দাবি করা হয়েছে যে, যার মাঝে হকদার পাওয়া গিয়েছে তার বদল মালিকানাধীন বিবেচিত হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে— কেউ একটি দাস ক্রয় করল দাসীর বিনিময়ে কিংবা কাপড়ের বিনিময়ে। অতএব ক্রেতা দাসটিকে আজাদ করে দিল। এরপর দেখা গেল যে, দাসীটির অথবা কাপড়ের একজন হকদার বের হয়েছে, এতদসত্ত্বেও ক্রেতার দাস আজাদ করা শুদ্ধ হবে। এখানে দাসী কিংবা কাপড়ের বদল হচ্ছে দাস, যদি দাসের মালিকানা নিশ্চিত না হতো তাহলে ক্রেতার আজাদ করা বৈধ হতো না। কেননা, অন্যের মালিকানাধীন দাস আজাদ করা যায় না। মোটকথা, উক্ত উদাহরণে দাস হচ্ছে হকদার পাওয়া যাওয়া দাসীর বদল। আর তার মালিকানা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে কারো মনে এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে যে, **بَدَلُ الْمُسْتَعْرِ**-এর মধ্যে মালিকানা ফাসিদ কেন?

এর উত্তর হলো, যখন ঋণের বদলের মধ্যে হকদার পাওয়া গেল তখন তা ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হয়। অথচ বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রি বাতিল হয় না। ফলে এতে মালিকানাহীনতার একটি সন্দেহ এসে যায়। মালিকানাধীন মুদ্রার মাঝে যে মুনাফা হয় তাতে অপবিত্রতার সন্দেহ এসে যায়। আলোচ্য মাসআলায় উসূলকৃত মুদ্রার মাঝে মালিকানাহীনতার সন্দেহ বিদ্যমান। আর মুদ্রার মাঝে যে অপবিত্রতা তা [অনির্ধারিত হওয়ার কারণে] সন্দেহযুক্ত। সুতরাং এখানে সন্দেহ হলো দু'টো। এক মালিকানাহীনতার, দ্বিতীয় হলো মুদ্রাজনিত কারণে, দুই সন্দেহ শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য উক্ত মুনাফা দাবিদারের জন্য বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, এ মাসআলার বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন দাবিদার তার ধারণা মতে মালিকানার পরিবর্তে দিরহাম বা দিনার ইত্যাদি গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে ঋণ দাবি করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহলে সে সেই মুদ্রাগুলোর মালিক হবে না। কেননা, তার মালিকানা থাকার বিষয়টি এখানে নিশ্চিত। মালিকানা না থাকলে মুনাফা গ্রহণও বৈধ হবে না।

## فَصْلٌ فِيْمَا يَكْرَهُ

قَالَ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ وَلَا يَزِيدَ الشِّرَاءَ لِيُرَغِّبَ غَيْرَهُ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَنَاجَشُوا، قَالَ : وَعَنِ السُّومِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَسْتَأْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا نَفَى ذَلِكَ إِنْ حَاشَا وَاضْرَارًا، وَهَذَا إِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى مَبْلَغٍ ثَمَنٍ فِي الْمُسَاوَمَةِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخِرِ فَهُوَ بَيْنَعٌ مَنْ يَزِيدُ، وَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا نَذَرْتَهُ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مُحْتَمَلُ النَّهْيِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا .

### অনুচ্ছেদ : মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয়

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নাজাশ থেকে নিষেধ করেছেন। নাজাশ হলো ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে মূল্য বাড়িয়ে বলা। মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা মূল্য বাড়িয়ে ধোকা দিও না। তিনি বলেন, এবং [রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন] দরের উপর দর করাকে। রাসূল ﷺ বলেন, কেউ যেন তার [মুসলমান] ভাইয়ের দাম বলার উপর দাম না করে, আর তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তাছাড়া এটা অন্যের মনোকষ্টেরও ক্ষতির কারণ। অবশ্য এই মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা দরদামের ক্ষেত্রে মূল্যের নির্ধারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। আর যদি একজন অপরজনের [প্রস্তাবের] প্রতি ঝুঁকে না যায় তাহলে তো সেটা নিলাম বিক্রি [অর্থাৎ সর্বোচ্চ দাতার কাছে বিক্রি করা]। আর এ জাতীয় বিক্রয়ে কোনো সমস্যা নেই যা আমরা পরে আলোচনা করব। আর আমরা হাদীসের যে নিষিদ্ধতার ক্ষেত্র উল্লেখ করলাম, বিবাহের প্রস্তাবের নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রও সেটাই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصْلٌ فِيْمَا يَكْرَهُ : এ অনুচ্ছেদে এমন ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকরুহ। মাকরুহ বিক্রয় ফাসিদ বিক্রয়ের চেয়ে নিম্নস্তরের। তবে এটি ফাসিদের একটি শাখা। এজন্য ফাসিদের পরিচ্ছেদে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ফাসিদের পরপরেই এর আলোচনা আনা হয়েছে।

স্বর্তব্য যে, মাকরুহ বিক্রয়ের স্তর শরিয়তের বিধানের বিবেচনায় সবসময় ফাসিদ বিক্রয়ের চেয়ে নিম্নস্তরের নয়। কারণ মাকরুহ এর অর্থ এখানে মাকরুহে তাহরীমী। ফাসিদ বিক্রয়গুলোর বিধানও তাই। সুতরাং মাকরুহ বিক্রয় ফাসিদ না হওয়ার বিবেচনায় ফাসিদের চেয়ে নিম্নস্তরের। ফিকহশাফের মূলনীতি সফলিত গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে যে, যদি অবৈধতা পারিপার্শ্বিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে এটা মাকরুহ। আর যে অবৈধতা সংশ্লিষ্ট গুণের কারণে হয়ে থাকে সেটা ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্গত। এ বক্তব্য দ্বারাও ফাসিদ ও মাকরুহ বিক্রয়ের পার্থক্য ও পরস্পর সম্পর্ক অনুমিত হয়। উল্লেখ্য যে, মাকরুহ দু'ধরনের, মাকরুহে তাহরীমি ও মাকরুহে তানযিহী।

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَكُلُّهُ قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: উপরিউক্ত ইবারতে শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নাজাজ সংশ্লিষ্ট বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেছেন। نَجَسٌ শব্দের অর্থ হলো, বিক্রয়পণ্যের প্রশংসার মাধ্যমে বিক্রেতার অনুকূলে অবস্থান নেওয়া। অথবা বিক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম বাড়িয়ে বিক্রেতার দালালি করা। ইবারতে লেখক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি দু'টি হাদীস, আর ইমাম কুদুরী আরো দু'টি হাদীস পেশ করেছেন। নাজাজ বা উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ক্রেতাকে প্রভাবিত করে দাম বাড়ানো শরিয়তে নিষিদ্ধ। কারণ প্রভারণা একটি মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ। নিকৃষ্ট কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে বিক্রয়চুক্তিটি মাকরুহ হয়। তাছাড়া হাদীসের নিষেধের ক্ষেত্র হলো যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, এমনি মুহূর্তে মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে একজন মুসলমানকে প্রভাবিত করা অন্যায্য ও জুলুম। আর জুলুম করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। উক্ত গর্হিত কাজ বিক্রয়চুক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে বিক্রয়টি মাকরুহ হয়।

তবে যদি মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের দাম বাড়ানো বৈধ। কেননা, এতে একজন মুসলমানের পক্ষে উকালতি করার মাধ্যমে তার উপকার করা হচ্ছে, কিন্তু অন্যের ক্ষতি করা হচ্ছে না। কেননা, এখানে ক্রেতার তখনো বাজার মূল্যে দু'বাটি ক্রয় করার অধিকার রয়েছে।

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَسِ -এর হাদীস-  
অর্থঃ রাসূল ﷺ ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দাম বাড়ানোকে নিষিদ্ধ করেছেন। সনদসহ হাদীসটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।  
رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّجَسِ .

হাদীসটি নিম্নসঙ্গেই গ্রহণযোগ্য ও সমালোচনার উর্ধ্বে। নিষিদ্ধতা প্রমাণে লেখক আরেকটি হাদীস পেশ করেন,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْبُوبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنَاجَسُوا عَنْ بَيْعٍ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

এ হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে, আমাদের আলোচ্য শব্দটি হাদীসটিতে বিদ্যমান। যার অর্থ হলো

তোমরা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পরস্পরকে প্রভাবিত করো না।

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ عَلَى سَوْمٍ غَيْرِهِ -এর পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীসটি এই-  
অর্থঃ রাসূল ﷺ এক ব্যক্তির দরদামের উপর অযাচিতভাবে অপরের দরদাম করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসটির বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে নিম্নোক্ত শব্দে রয়েছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

অর্থঃ রাসূল ﷺ এক মুসলমান তাইয়ের দরদামের উপর অন্য মুসলমানকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন। একই প্রসঙ্গে লেখক দ্বিতীয় হাদীস পেশ করেছেন-  
لَا يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ -  
লেখক উদ্ধৃত এই হাদীসটি ও ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَلْقَى الرَّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

হাদীসের শেষাংশে রয়েছে- **أَنْ يَسْتَأْمَرَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ**

এই হাদীসটি কিতাবুল আসরে এভাবে রয়েছে-

رَوَى مُحَمَّدٌ (رح) قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَأْمَرَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ .

হাদীসের **أَنْ يَسْتَأْمَرَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ** ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি দ্রব্য একটি মূল্যে বিক্রয় করার ব্যাপারে একমত হলো, অর্থাৎ বিক্রেতা বিক্রয় করার আর ক্রেতা ক্রয় করার ব্যাপারে সম্মত হলো। এরপর এক ব্যক্তি এসে ক্রেতাকে বলল, আমি এই দ্রব্যটি এর চেয়ে কম মূল্যে তোমার কাছে বিক্রয় করব অথবা সে বিক্রেতাকে বলল, আমি এই দ্রব্যটি এর চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয় করব। প্রথম অবস্থায় বিক্রেতার আর দ্বিতীয় অবস্থায় ক্রেতার ক্ষতি হচ্ছে। মোটকথা, এক ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দানের দ্বারা ক্রেতা অথবা বিক্রেতা যে কোনো একজনের ক্ষতি হচ্ছে এবং তাদের মনে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, আমরা পূর্বে বলেছি যে, কারো মনে কষ্ট দেওয়া কিংবা আর্থিক ক্ষতি করা গর্হিত কাজ। কিন্তু যেহেতু কাজটি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং সংশ্লিষ্ট কাজ; তাই এ বিক্রয় মাকরুহ হবে।

লেখক বলেন, **إِنَّمَا لَمْ يَرْكَنْ إِلَى** অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসগুলোর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র হলো তখন, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং পরস্পর বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় কেউ যদি এসে নতুন প্রস্তাব করে তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। অন্যথায় যদি একে অনের প্রতি ঝুঁকে না যায় অর্থাৎ সম্মতি প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত না করে তাহলে এটা নিষিদ্ধ নয়। বরং এটা নিলাম বিক্রির মতো হয়ে যাবে, যাতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ ধরনের বিক্রির নজির রাসূলের জীবনেও পাওয়া যায়। যেমন হযরত আনাস (র.)-এর হাদীস-

عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ بَاعَ قَدْحًا وَجَلَسَا يَبِيعُ مَنْ يَزِيدُ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ একটি পেয়ালা এবং একটি চটের বস্তা নিলামে বিক্রি করেন। এবং যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ দাম বলে তাকে উক্ত পণ্যদ্বয় প্রদান করেন।

আর বিবাহের প্রস্তাব সংক্রান্তও হাদীস **(لَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ)**-এর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র তাই। অর্থাৎ একজন প্রস্তাব দেওয়ার পর অপরজন সম্মত হয়ে গেলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। আর যদি কোনো পক্ষ প্রস্তাবে সাড়া না দেয়, বরং প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রস্তাব দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। সারকথা হলো, অন্যের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে এমতাবস্থায় দরদাম করা ও বিবাহের পয়গাম দেওয়া মাকরুহ।

قَالَ : وَعَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ يَصْرُ بِأَهْلِ الْبَلَدِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَصْرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا إِذَا لَبَسَ السَّعْفَ عَلَى الْوَارِدِينَ، فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْغُرُورِ وَالصَّرَرِ. قَالَ : وَعَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، فَقَدْ قَالَ لَا يَبِيعُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي، وَهَذَا إِذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدَةِ فِي قَحْطٍ وَعَوَزٍ، وَهُوَ يَبِيعُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ طَمَعًا فِي الثَّمَنِ الْغَالِي، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِهِمْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ لِإِنْعِدَامِ الصَّرَرِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন শহর [হাট-বাজার] এর বাইরে গিয়ে শহরের দিকে আগত পণ্য অগ্রসর হয়ে কিনতে। এ নির্দেশ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন এর ফলে শহরবাসীদের ক্ষতি হয়। এর দ্বারা যদি শহরবাসীর ক্ষতি না হয় তাহলে এমন করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যখন আগত ব্যাপারীদের কাছে প্রকৃত বাজার মূল্য অজ্ঞাত রাখা হয়। এমন করা হলে মাকরুহ হবে। কেননা, এতে ধোকা ও ক্ষতি রয়েছে। তিনি বলেন, আর রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন, গ্রাম্য লোকের কাছে [বেছে বেছে] শহরের বিক্রি করাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন, শহুরে লোকেরা যেন [বেছে বেছে] গ্রাম্য লোকের কাছে বিক্রি না করে [অথবা বলেছেন, শহুরে লোকেরা যেন গ্রাম্য ব্যক্তিদের হয়ে বিক্রি না করে] এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন শহরবাসীরা অভাব-অনটনে ও মুখাপেক্ষী থাকে। অথচ শহুরে বিক্রেতা উচ্চমূল্য পাওয়ার লোভে গ্রাম্য লোকের কাছে বিক্রি করে। [এটা অবৈধ] কেননা, এতে শহরবাসীদের ক্ষতি করা হয়। আর যদি এমন না হয় তাহলে ক্ষতি না থাকার কারণে কোনো অসুবিধা নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে-

১. শহরবাসীরা খাদ্যাভাবে রয়েছে। এমতাবস্থায় শহরের কতিপয় [অসাধু] ব্যবসায়ী গ্রাম থেকে খাদ্য-শস্য নিয়ে আগত ব্যবসায়ীদের থেকে মালামাল শহরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ক্রয় করে নেওয়া, যাতে পরবর্তীতে শহরের ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামতো দামে সেগুলো বিক্রি করতে পারে।
২. শহরে খাদ্যাভাব নেই। এমতাবস্থায় কতিপয় ব্যবসায়ী শহরের বাইরে গিয়ে গ্রামের পাইকারদের থেকে যাবতীয় খাদ্যশস্য কিনে নেওয়া।
৩. গ্রাম্য পাইকারদের থেকে কম মূল্যে মাল ক্রয় করা এবং প্রকৃত মূল্য তাদের অবগত না করানো। অথচ গ্রামের ব্যবসায়ীরা শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।
৪. গ্রাম্য পাইকারদের থেকে মালামাল কম মূল্যে খরিদ করা, কিন্তু তারা শহরের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবহিত।

উল্লিখিত চার সুরতের মধ্য হতে প্রথম ও তৃতীয় সুরতে বেচা-কেনা মাকরুহ। প্রথম অবস্থায় যেহেতু শহরের লোকজন খাদ্যাভাবে ভুগছে। ব্যবসায়ীদের এ পদক্ষেপের কারণে তাদের দুর্দশা আরো ঘনীভূত হয়েছে। কাউকে সমস্যায় ফেলা গর্হিত কাজ। তবে এই গর্হিত কাজটি বিক্রয় চুক্তির মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সংশ্লিষ্ট হয়েছে। উক্ত গর্হিত কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে



চুক্তি মাকরুহ। তৃতীয় অবস্থায় যেহেতু আগত পাইকারদের কাছে প্রকৃত মূল্য গোপন করে তাদের প্রতারণিত করা হয়, আর প্রতারণিত করাও গরিব কাজ, তাই উক্ত প্রতারণার কারণে বিক্রয়চুক্তি মাকরুহ হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় ও ৪র্থ অবস্থায় কোনো সমস্যা না থাকার কারণে মাকরুহ ব্যতিরেকে বৈধ হবে।

মাকরুহ বিক্রয়চুক্তির আরেকটি প্রকার হলো : **بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ** এ জাতীয় বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কারণ হলো রাসূল ﷺ এর নিষেধাজ্ঞা। ইত:পূর্বে এ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যেমন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَكْفُرُوا الرُّكْبَانَ لِيبَيْعَ وَلَا يَبَيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا يَبَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ .

হাদীসের **بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ** এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

প্রথম ব্যাখ্যা : **لِبَادٍ** এর **مِنْ** এখানে **لَمْ** এর অর্থে, এ অবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে, কোনো শহরে ব্যবসায়ীর কাছে পণ্য রয়েছে। উক্ত পণ্য শহরে কোনো ক্রেতার কাছে বিক্রি না করে গ্রাম্য লোক দেখে দেখে বিক্রয় করছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রি করা। কারণ শহরে লোকেরা বর্তমান বাজার সম্পর্কে অবগত। তাদের কাছে বেশি মূল্য আদায় করা যাবে না। তাছাড়া তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ বিধায় তাদের ঠকানো যাবে না। পক্ষান্তরে গ্রামের লোকেরা হয় সাদাসিধে, বাজার মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তাই তাদের সহজেই খপ্পরে ফেলা যাবে। এ সূরতে শহরদের অবস্থা আবার দু'ধরনের হতে পারে।

১. শহরে লোকেরা খাদ্যাভাবে ভুগছে এবং তাদের মাঝে অর্থকষ্ট রয়েছে। ফলে তাদের এ ছলচাতুরীর কারণে শহরবাসী দুর্ভোগে পড়বে।

২. শহরবাসী স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে এবং খাদ্য সংকটে ভুগছে না।

প্রথমাবস্থায় বিক্রয় মাকরুহ, আর দ্বিতীয় অবস্থায় বিক্রয় মাকরুহ নয়।

**بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ** এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : **لِلْبَادِ** স্বীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গ্রাম্য ব্যক্তির জন্য বা স্বার্থে। পুরো বাক্যের অর্থ এরূপ যে, শহরে ব্যবসায়ী গ্রাম্য ব্যবসায়ীর উকিল হয়ে কোনো কিছু বিক্রি করা। এর সূরত এই যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি খাদ্যশস্য নিয়ে শহরের বাজারে আসল। বাজারের প্রবেশ মুখে শহরে এক ব্যবসায়ী তাকে বলল, তুমি তো শহরে লোকের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত নও, তাদের কাছে বিক্রয়ে তুমি সুবিধে করতে পারবে না। তুমি বরং আমার কাছে তোমার পণ্যগুলো দিয়ে দাও, আর আমি তোমার হয়ে তা বিক্রি করে দেই। এখানেও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যদি এ প্রক্রিয়ায় শহরবাসীর ঠেকে এবং তাদের দুর্দশা বাড়়ে তাহলে তা মাকরুহ হবে, আর যদি শুধুমাত্র গ্রাম্যব্যক্তিকে প্রকৃত মূল্য প্রদান উদ্দেশ্য হয় এবং শহরবাসীরা এর দ্বারা না ঠেকে তাহলে এটা মাকরুহ হবে না। বরং অপর একজন ব্যক্তিকে উপকার করা হলো। আর যদি গ্রাম্য ব্যক্তি বিক্রি করার দ্বারা তার ঠকা না হয় এবং শহরবাসীরা কিছুটা কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারে, তাহলে তা করতে দেওয়া উচিত। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন—

تَوَعَّلُوا النَّاسَ بِرَزْوِ اللَّهِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .  
তোমরা লোকদের তাদের মতো ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা কতকের মাধ্যমে কতকের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এ হাদীসের মতলব এই যে, প্রত্যেককে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দাও।

قَالَ: وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَذُرُوا النَّبِيْعَ، ثُمَّ فِيْهِ إِخْلَالٌ بِرَاجِبِ السَّنِي عَلَى بَعْضِ رُجُوْهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَذَانَ الْمُعْتَبَرَ فِيْهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَا يَفْسُدُ بِهِ النَّبِيْعُ، لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي مَعْنَى خَارِجٍ زَائِدٍ، لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَا فِي شَرَائِطِ الصَّحَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এবং [রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন] জুমার আযানের সময় বেচা-বিক্রি করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন জুমার দিন জুমার নামাজের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের প্রতি দাবিত হও। এবং তোমরা বেচা-কেনা বন্ধ কর। তাছাড়া এতে ক্ষেত্র বিশেষে জুমার নামাজে গমন করার ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন ঘটে। এখানে কোন আযান বিবেচ্য তা আমরা কিতাবুস সালাতের [জুমার অধ্যায়ে] বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, এ সব বিক্রি আমাদের বর্ণিত উল্লিখিত কারণে মাকরুহ। তবে এগুলো দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হবে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে ফাসাদ বহির্গত ও অতিরিক্ত কারণে। ফাসাদ মূল চুক্তিতে নয় এবং বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যেও নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ: وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ الخ: মাকরুহ ক্রয়-বিক্রয়ের আরেকটি সূরত হচ্ছে জুমার আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে— تَزِدُ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ— অর্থাৎ যখন জুমার নামাজের আযান হয়ে যায় তখন জুমার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট গমন কর এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। আযাতে মোট দু'টি নির্দেশ রয়েছে—

১. বেচা-কেনা বন্ধ করা।

২. জুমার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও জুমায় গমন করা।

সুতরাং কেউ যদি আযানের পর বসে কিংবা দাঁড়িয়ে বেচা-কেনা করে তাহলে সে দু'টি নির্দেশ লঙ্ঘন করল। প্রথমত বেচা-কেনা বন্ধ করল না। তারপর জুমায় গমন করার নির্দেশ বেচা-কেনা করার মাধ্যমে অমান্য করল। ওয়াজিব নির্দেশ লঙ্ঘন করা কিংবা তাতে বিঘ্ন ঘটানো গর্হিত কাজ। উক্ত গর্হিত কাজ বেচা-কেনার সাথে যুক্ত হওয়াতে বিক্রয় চুক্তি মাকরুহ হবে। অবশ্য কেউ যদি জুমার নামাজে গমনরত অবস্থায় বেচা-কেনা করে তাহলে তা মাকরুহ হবে না। কারণ, এ বেচা-কেনার দ্বারা তার জুমাতে শরিক হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। আযাতের মর্মার্থও এটাই যে, যেন জুমার আযানের পর জুমার সমানার্থে পুরো সময়টুকু সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। এখন প্রশ্ন হলো জুমার নামাজে দু'টি আযান দেওয়া হয়, এখানে কোন আযান উদ্দেশ্য। এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন, সালাত পূর্বে জুমার অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, প্রথম আযানই উদ্দেশ্য। তবে প্রথম আযানটি অবশ্যই সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে যাওয়ার পর হতে হবে।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত অনুযায়ী মনে হয় যে, জুমার আযানের সময় বেচা-কেনা করার ব্যাপারে [যেমন আমরা তরজমা করেছি] রাসূল ﷺ এর নিষেধবাণী রয়েছে। কিন্তু লেখক রাসূল ﷺ -এর কোনো হাদীস এখানে উল্লেখ করেননি। তাহলে রাসূল ﷺ -এর নিষেধবাণী কি করে হলো, এর উত্তর হচ্ছে আযাতে বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তা রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকেও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর সে দৃষ্টি ভঙ্গিতেই এখানে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন বলা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অনুচ্ছেদের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত বেচা-কেনার কথা উল্লেখ করা হলো (سَوْمٌ عَلَى سَوْمٍ نَجَشٌ) সবই মাকরুহ। তবে মাকরুহ হওয়ার কারণে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। কেননা, ফাসাদগুলো বহির্গত ও অতিরিক্ত বিষয়, যা বিক্রয়চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। মূল চুক্তির মধ্যে কিংবা বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে কোনো ফাসাদ নেই। বিক্রয় বহির্ভূত ফাসাদের কারণে বিক্রয় মাকরুহ হয়, ফাসিদ হয় না। আর এ কারণে উপরোক্ত সব অবস্থায় বিক্রয় ফাসিদ হবে না।

হাদীসের অর্থ : এক আনসারী দরিদ্র ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই। সে বলল, হ্যাঁ আছে। একটি চট, যার একাংশ আমার বিছিয়ে শয়ন করি, আর বাকি অংশ গায়ে দিই। আরেকটি পেয়লা আছে, যার সাহায্যে পানি পান করি। তিনি বললেন, উভয়টি আমার কাছে নিয়ে আস। অন্তঃপর সে উভয়টি রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসল। রাসূল ﷺ চট ও পেয়লা হাতে নিয়ে বললেন, কে এই দু'টি জিনিস কিনবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামে এ দু'টি কিনব। তিনি বললেন, কে বেশি মূল্য প্রদান করবে। এ কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বললেন, [প্রথমে কোনো সাড়া আসল না] অবশেষে এক ব্যক্তি বলল, আমি দু'দিরহামে তা ক্রয় করব। তিনি তাকে এ দু'টি দিয়ে দিলেন এবং তার থেকে দু'দিরহাম গ্রহণ করলেন। অন্তঃপর তা আনসারীকে দিলেন এবং বললেন, এক দিরহামে খাদ্য

ক্রয় কর ও তা পরিবারের লোকদের দাও, আর অন্য দিরহাম দ্বারা একটি কুঠার ক্রয় কর এবং তা আমার কাছে নিয়ে আস। সে কুঠার নিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে আসল। রাসূল ﷺ সেটাতে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তাকে বললেন, যাও, [এর সাহায্যে] কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি কর। আর আমি যাতে তোমাকে আগামী পনের দিন না দেখি। [কথামতো] সে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে লাগল এবং তা বিক্রি করতে লাগল। এরপর একদিন আসল। ততদিনে সে দশ দিরহাম উপার্জন করে ফেলেছে। আর তার কিছু দিয়ে কাপড় ক্রয় করেছে, বাকিটা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করেছে। রাসূল ﷺ তাকে [দেখে] বললেন, এ অবস্থা তোমার জন্য অনেক উত্তম। কিয়ামতের দিন চেহারায ভিক্ষার অবমাননাকর চিহ্ন নিয়ে উদ্ভিত হওয়ার চেয়ে। [তিনি আরো বললেন] সুওয়াল করা কেবল তিন ব্যক্তির জন্য বৈধ—

১. সীমাহীন দরিদ্র, যে মাটিতে গড়াগড়ি খায়

২. ভয়ানক ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি

৩. রক্তপণ আদায়ে দায়গ্রস্ত ব্যক্তি, যার রক্তপণ প্রদানের মতো কোনো অর্থ নেই।

এ তিনজন প্রার্থীর জন্য সুওয়াল করা বৈধ। —[আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নিলাম বিক্রি বৈধ। যদি তা বৈধ না হতো তাহলে স্বয়ং রাসূল ﷺ এটা করতেন না। দ্বিতীয় দলিল এই যে, নিলাম তোলা হয় দরিদ্রের স্বার্থে, দরিদ্রেরা এ ধরনের বিক্রির মাধ্যমে ভীষণ উপকৃত হয়। বর্তমানেও দরিদ্রের প্রয়োজনে এটা করা প্রয়োজন বিধায় এটা বৈধ হবে। কারণ, শরিয়ত মানুষের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না।

نَوْحٍ مِنْهُ : قَالَ : وَمَنْ مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ أَحَدَهُمَا ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْآخِرِ  
لَمْ يَفْرُقْ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدَهُمَا كَبِيرًا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ  
فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ، وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ (رض) غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ صَغِيرَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟  
فَقَالَ : بَعَثَ أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ (ع) : أَذْرِكَ أَذْرِكَ ، وَتَرَوْنِي أَزْدَدُ أَزْدَدُ ، وَإِنَّ الصَّغِيرَ يَسْتَأْنِسُ  
بِالصَّغِيرِ وَيَالِ الْكَبِيرِ ، وَالْكَبِيرُ يَتَعَاهَدُهُ ، فَكَانَ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمَا قَطْعُ الْإِسْتِئْنَسِ  
وَالْمَنْعُ مِنَ التَّعَاهُدِ ، وَفِيهِ تَرَكُ الرَّحْمَةِ عَلَى الصَّغَارِ ، وَقَدْ أُوْعِدَ عَلَيْهِ .

অনুবাদ : মাকরুহ বিক্রয়ের একটি প্রকার : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এমন দু'জন ক্রীতদাসের মালিক হলে যারা পরস্পর মাহরাম [নিকটাত্মীয়], তাহলে তাদের দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। এমনভাবে যদি দু'জনের একজন বড় হয়। এ ব্যাপারে দলিল এই যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মা এবং তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে আল্লাহ তার এবং তার প্রিয়জনদের মাঝে কিয়ামতের দিন বিচ্ছেদ ঘটাবেন। [হাদীসে বর্ণিত আছে যে,] মহানবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি অল্পবয়স্ক সহোদর ক্রীতদাস দান করেন। তারপর একদা জিজ্ঞাসা করেন, গোলাম দু'টির কি অবস্থা? তিনি বললেন, তাদের একটিকে বিক্রি করে দিয়েছি, তিনি ﷺ বললেন, ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন। বর্ণনান্তরে ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। তাছাড়া এ কারণেও যে, বাচ্চার অন্য বাচ্চার এবং তার চেয়ে বড় ছেলে মেয়ের সান্নিধ্যে স্বস্তি লাভ করে। এবং বড়জন তাকে আগলে রাখে। ফলে একজনকে বিক্রি করলে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে বাধা সৃষ্টি হয়, আর এতে ছোটদের প্রতি নির্দয়তা হয়। অথচ এরূপ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْ أَبِي أُبَيٍّ الْآنصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ . وَفِي رَوَايَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ .  
উপরিউক্ত ইবারতে বিশেষ প্রকারের মাকরুহ বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে-  
মাসআলা : কেউ যদি এমন দু'টি নাবালগ বালকের মালিক হয় যারা পরস্পর সহোদর অথবা তাদের একজন প্রাপ্তবয়স্ক এমতাবস্থায় মালিকের জন্য তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ হবে না, মাকরুহ হবে।  
বিচ্ছেদ কয়েকভাবে হতে পারে, যেমন একজনকে বিক্রি করে দেওয়া, দান করে দেওয়া, অথবা অসিয়ত করে দেওয়া ইত্যাদি।  
অর্থাৎ এদের বিক্রি বা দান যদিও বৈধ, কিন্তু বিচ্ছিন্ন করার কারণে মাকরুহ হবে এবং ওনাহের কাজ সাবাস্ত হবে। অবশ্য দু'জনকে একত্রে বিক্রি করাতে কোনো দোষ নেই। এমনভাবে যদি উভয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে একজনকে বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে মূল দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস-

عَنْ أَبِي أُبَيٍّ الْآنصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ . وَفِي رَوَايَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ .

অর্থ: হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কেউ কোনো মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনদের মাঝে/তার ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا سَدٍّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَنَظَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ بَاءَ ابْنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْعَنُ إِنِّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ يَسْمُنُ قَالَ فَمَنْ بَنَى عَيْسَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ارْكَبْ أَنْتِ بِفَيْسَكَ فَإِنْتِ بِهِ .

অর্থ : আবু আসাদ (রা.) বাহরাইনের বন্দীদের নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হলেন, রাসূল ﷺ তাদের মাঝে এক মহিলাকে ক্রন্দনরত দেখে বললেন, তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, তিনি আমার ছেলে বেচে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ আবু আসাদকে বললেন, তুমি কি তার ছেলে বেচে দিয়েছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কাদের কাছে। তিনি বললেন, আবুস গোয়ে। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আস।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন, وَلَدَعَا وَفِي رَوَايَةٍ بَيْنَ الْأَجْعِ وَأَخِيمِ অর্থ : যে ব্যক্তি মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় সে অভিশপ্ত। বর্ণনান্তরে যে ভাই ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, মা ও সন্তান এবং ভাই ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'আলার অভিশাপের উপযুক্ত পর্যন্ত হয়ে যায়। যেহেতু এটা বিক্রয়ের মূল চুক্তির মধ্যে বিদ্যমান নয়, বরং বিক্রয়চুক্তির বহির্গত বিষয়, যা তার সাথে যুক্ত হয়েছে তাই এ বিক্রয় মাকরুহ হবে। কিভাবে উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদীসটি এই :

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْحُجَّاجِ بْنِ أَرْطَاءَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ تَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَاخْتَرْتَهُ فَقَالَ رَدُّهُ رَدُّهُ وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَمْرَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَيْسَعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ يَتِيمَتَيْنِ فَتَرْتَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَدْرَكْتَهُمَا فَارْتَعَنْتَهُمَا وَلَا تَيْغَمُهَا إِلَّا جَيْعًا .

উভয় হাদীসের মোটামুটি অর্থ এরূপ যে, রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি নাবালক সহোদর গোলাম দান করলেন। তারপর তাদের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, হযরত আলী (রা.) তাদের একটিকে বিক্রি করে দিয়েছেন। অথবা তিনি হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি গোলাম বিক্রি করে দিতে বললেন হযরত আলী (রা.) আলাদাভাবে দু'স্থানে দু'টি বিক্রি করেন। এরপর রাসূল ﷺ যখন এ সম্পর্কে অবগত হন তখন বিক্রয় প্রত্যাহার করে দু'টি গোলামকে একত্রিত করতে বলেন। আর বলেন, যদি বিক্রি করতে হয় তাহলে যেন একত্রে একস্থানেই বিক্রি করা হয়। এ হাদীস দু'টিও ছোট দু'ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অবৈধতা প্রমাণ করে। যেহেতু তাদের মাঝে উক্ত বিচ্ছিন্নতা বিক্রয়ের মাধ্যমেই হচ্ছে তাই বিক্রয় মাকরুহ হবে।

এ ব্যাপারে যুক্তি এই যে, এক শিশু/বালক অন্য শিশু/বালকের সান্নিধ্য উপভোগ করে, এমনভাবে ছোট বাচ্চা তার নিকটাত্মীয় প্রাপ্তবয়স্কের সান্নিধ্যের মাধ্যমে মনে শিশু অনুভব করে। এমনভাবেই দুই বালকের একজনকে যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের মানসিক প্রশান্তি দূরীভূত হবে এবং একাকিত্বের যন্ত্রণায় পিষ্ট হবে। এমনভাবে ছোট ও বড় এদের দু'জনের একজনকে যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তাহলে তারা তাদের মাঝে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ থেকে এবং বড়জনের দেখাশুনা ও অভিভাবকত্ব থেকেও বঞ্চিত হবে। তাছাড়া এর দ্বারা ছোটদের প্রতি বিশেষ স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের যে নির্দেশ হাদীস শরীফে রয়েছে তারও লঙ্ঘন হবে। হাদীস—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অর্থ : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। এ হাদীসে ছোটদের প্রতি দয়ালুতা প্রদর্শনের ব্যাপারে বিশেষ সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর সর্তকবাণী নাজায়েজ বিষয়ে আসে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, নাবালক দুই বাচ্চার মাঝে বিচ্ছেদ দয়ালুতাব্যবসায় সবব, তা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ ও অবৈধ।

ऐस. आम्बराकुल ह्येनाया (५म) २० (क)

মালিক তার মালিকানাধীন দ্রব্যে সব ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে, সে ছোট নাবালক শিশুকে একত্রিত রাখতে পারে অথবা তার ইচ্ছামতো সে তাদের বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে পারে। যেমন বয়স্ক দু'জন ক্রীতদাসের ব্যাপারে তার ইচ্ছাভিন্ন রয়েছে। আলোচনার দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, হাদীস দু'টি কিয়াসের বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে। আর যে বিধান কিয়াসের বিপরীতে প্রবর্তিত হয় তা হাদীসে উল্লিখিত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে প্রথম হাদীসের ক্ষেত্র হচ্ছে মা ও তার সন্তান, আর দ্বিতীয় হাদীসে ক্ষেত্র হচ্ছে দুই সহোদর ভাই। অর্থাৎ উভয় হাদীস বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মালিকের অধীনে আসা দু'জনের ছোট কিংবা একজন ছোট অপরজন বড়। এর মধ্যে যদি আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্কের চিরস্থায়ী অবৈধতা থাকে তাহলে তাদের মাঝে বিক্রি, দান ইত্যাদির মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো অবৈধ।

পক্ষান্তরে যদি তাদের মাঝে উভয় দিক সম্বলিত সম্পর্ক না পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা অবৈধ হবে না। লেখক বলেন, দুইজন ছোট বালক/বালিকা কিংবা একজন ছোট অপর বড়, এদের বিচ্ছিন্ন করা তখনই হারাম হবে, যখন উভয়ে একই মালিকের মালিকানাধীন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি একজন এক মালিকের অধীন, অন্যজন ভিন্ন মালিকের অধীন হয় তাহলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করাতে শরিয়তের কোনো বাধা নেই। কেননা, এখানে তো প্রকৃতার্থে বিচ্ছিন্ন করার অর্থটি অবিসম্মান।

عَنْهُ وَلَوْ كَانَ التَّفَرُّقُ بَيْنَ مَسْخَرٍ الْخ. এ ইবারত দ্বারা লেখক উল্লিখিত মাসআলার কিছু ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার বিষয় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মাসআলাতে তাদের বিচ্ছিন্ন করা জায়েজ। এখানে সেই মাসআলাগুলো উল্লেখ করেন। লেখক বলেন, যদি দু'জনের মধ্য হতে কোনো একজনের হকদার বের হয় তাহলে উক্ত আবশ্যকীয় হক তার পাওনাদারের কাছে সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ। যেমন—

১. কোনো মালিকের অধীনে দু'জন নাবালক বাচ্চা রয়েছে। তাদের পরস্পরের মাঝে আত্মীয়তা ও বিবাহ হারাম হওয়ার মতো সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু তাদের একজন অন্য কাউকে হত্যা করল কিংবা কারো মাল বিনষ্ট করল। উদাহরণ স্বরূপ কোনো মুনিবের দু'টি ক্রীতদাস রয়েছে— রাশেদ ও খালেদ। যারা পরস্পর সহোদর। তাদের মধ্যে রাশেদ বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক আর খালেদ অপ্রাপ্তবয়স্ক— নাবালেগ। মুনিব বড়জনকে বাহিরে প্রেরণ করেন বিভিন্ন কাজে। একসময় বড় জন কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করে ফেলল, অথবা কারো অঙ্গ হানি ঘটাল। অতঃপর বিচারক তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ রক্তপণ আরোপ করলেন। এমতাবস্থায় মালিক তাকে প্রদানের মাধ্যমে রক্তপণ আদায় করতে পারে।
২. অথবা প্রাপ্তবয়স্ক দাসটিকে মালিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করলেন, অতঃপর সে ব্যবসা করতে গিয়ে তার মূল্য পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হয়ে গেল। কিংবা অল্প বয়স্ক ক্রীতদাসটি কারো মাল এই পরিমাণ মালামাল নষ্ট করল, যা তার মূল্যের সমপরিমাণ। এমতাবস্থায় মুনিব ক্রীতদাস প্রদানের মাধ্যমে ঋণশোধ করতে পারে কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।
৩. অথবা কেউ দু'জন নাবালেগ সহোদর ভাই ক্রয় করল, এরপর লক্ষ্য করল যে, একজনের মধ্যে মারাত্মক পর্যায়ে ক্রটি রয়েছে। এমতাবস্থায় ক্রটিজনিত কারণে একজনকে ফিরিয়ে দেওয়া বৈধ। উল্লিখিত তিনটি মাসআলায় যদিও দু'ভাইকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা অবৈধ নয়। কেননা এই বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা মুনিবের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে নিজে যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তা থেকে নিজেকে বাঁচানো, এখানে মুনিবের উদ্দেশ্য দাসকে বিপদে আপতিত করা নয়। আর শরিয়তে প্রত্যেকেরই ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। সে মতে গোলামের সৃষ্ট ক্ষতি থেকে মুনিবের আত্মরক্ষার অধিকার তো অবশ্যই আছে। আর এ কারণে এই বিচ্ছেদের দ্বারা কোনো গুনাহ বা ক্ষতি হবে না।



قَالَ : فَإِنَّ فَرَقَ كُرْهَ لَهُ ذَلِكَ، وَجَازَ النِّعْدَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي قَرَابَةِ  
الْوِلَادَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهَا، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِمَا رَوَيْنَا، فَإِنَّ الْأَمْرَ  
بِالْإِذْرَاقِ وَالرَّدِّ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَلَهُمَا أَنْ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي  
مَحَلِّهِ، وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ لِمَعْنَى مُجَاوِرٍ، فَشَابَهُ كَرَاهَةُ الْإِسْتِيسَامِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সে বিচ্ছিন্ন করে তাহলে তা তার জন্য মাকরুহ হবে, তবে চুক্তি বৈধ হয়ে  
যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, জন্মসূত্রের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বৈধ হবে না তবে অন্য সূত্রের  
আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বৈধ হবে। তাঁর থেকে এও বর্ণিত আছে যে, সব অবস্থাতেই অবৈধ হবে। দলিল হলো আমাদের  
বর্ণিত হাদীস। কেননা, ফিরিয়ে আনার নির্দেশ কেবল ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তাঁদের ইমাম আবু  
হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রয়ের রূকন যথোপযুক্ত ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং বিক্রয়ের  
পাত্রের তা সম্পৃক্ত হয়েছে। আর মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি তো পারিপার্শ্বিক কারণে হয়েছে, ফলে এটা একজনের মূল্য  
প্রস্তাবের পর আরেকজন মূল্য প্রস্তাব করার মতো মাকরুহ হলো।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنَّ فَرَقَ كُرْهَ لَهُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে পূর্বোক্ত মাসআলার সংশ্লিষ্ট অংশ আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে বলা  
হয়েছিল যে, দুই নাবালক সহোদর একত্রে কারো মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় মালিকের জন্য একজনকে অন্যজন থেকে  
পৃথক করা মাকরুহ। সেই পৃথকীকরণ যদি বিক্রির মাধ্যমে হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তি মাকরুহ সাব্যস্ত হবে। এখানে বলা হচ্ছে  
যে, কেউ যদি বিক্রির মাধ্যমে তাদের পৃথক করে ফেলে তাহলে কি হবে। ইমাম কুদূরী (র.) কোনো মতপার্থক্য উল্লেখ করা  
ছাড়াই বলেছেন যে, এ পৃথকীকরণ কর্তার জন্য মাকরুহ হবে। তবে কৃত বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ ও বৈধ হয়ে যাবে। এ পৃথককরণ  
কাজটি সকলের ঐকমত্যে মাকরুহ। তবে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ না অবৈধ এ ব্যাপারে আল্লামা বুরহানউদ্দিন আবু হাসান আলী  
[হেদায়ার লেখক] হানানী মাযহাবের প্রধান তিন ইমামের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিক্রয়চুক্তি ইমাম  
আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) [তারফাইন]-এর মতে বৈধ। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও বটে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি দুই গোলামের মধ্যে জন্ম সূত্রের আত্মীয়তা থাকে, [যেমন, মা  
ও সন্তান, পিতা ও তার সন্তান] তাহলে যে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে তাদের পৃথক করা হবে সেই বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে না।  
ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিতض্কতার অভিমত এটাই। আর যদি দু'জনের মাঝে জন্মসূত্রের আত্মীয়তা ছাড়া অন্য কোনো  
আত্মীয়তা থাকে [যেমন দু'ভাই] তাহলে তাদের পৃথক করার বিক্রয় চুক্তি বৈধ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে এই  
মতও বর্ণিত আছে যে, দুই ক্রীতদাসের মধ্যে [তারা উভয়ে ছোট কিংবা একজন ছোট] জন্মসূত্রের আত্মীয়তা ও অন্য আত্মীয়তা  
যাই থাকুক সর্বাবস্থায় পৃথক করার বিক্রি এবং অন্যান্য চুক্তি অবৈধ হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম যুফার ও হাসান  
ইবনে যিয়াদ (র.)-এর অভিমতও তাই।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) দলিল হযরত আলী (রা.) -এর হাদীস, যাতে রাসূল ﷺ হযরত আলীকে একরূপ পৃথক করার নির্দেশ দেন  $\text{أَدْرَأَكَ}$  অথবা  $\text{أَدْرَأَكَ}$  উল্লেখ্য যে, বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করা এবং ফিরিয়ে আনার নির্দেশ শুধুমাত্র ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়। মাকরুহ বিক্রয়ে বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ দেওয়া হয় না। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিক্রয়চুক্তি বৈধ নয়; বরং ফাসিদ ও অবৈধ।

ভারফাইন (র.)-এর দলিল হলো, উল্লিখিত বিক্রয়ে তার রুকুন তথা ইজাব ও কবুল যোগ্য ব্যক্তি [জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক] থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা বিক্রয়ের পাত্র তথা মালিকানাধীন মালের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। সুতরাং যখন ক্রেতা-বিক্রেতা বিক্রয় চুক্তি করার যোগ্য ব্যক্তি এবং বিক্রয় পাত্রেরও যোগ্যতা রয়েছে তখন বিক্রয়ের শুদ্ধতা ও বৈধতার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। বেশি থেকে বেশি এতটুকু বলা যায় যে, কারাহাত পরিপার্শ্বিক কারণে এসেছে; এখানে পরিপার্শ্বিক কারণটি হচ্ছে ছোট বালক কিংবা শিশুর মনে বিষণ্ণতা সৃষ্টি করা এবং তাদের প্রতি দয়াহীনতা প্রদর্শন করা। আর এতটুকু কারাহাতের সর্বশিষ্টতার কারণে বিক্রয়চুক্তি নষ্ট হয়ে যায় না। এমন পারিপার্শ্বিক অবৈধতার উদাহরণ অনেক রয়েছে। যেমন একজন দরদাম করার পর এবং কথা পাকাপাকি হওয়ার পর আরেকজনের মূল্য প্রস্তাব করা। এখানে যেমন পার্শ্বকারণে মাকরুহ হয়, তেমনি বালক/ শিশু দু'টির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর দ্বারা নির্দয়তা প্রদর্শনের কারণে বিক্রয় মাকরুহ হবে।

ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশের ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে,  $\text{أَدْرَأَكَ}$  ও  $\text{أَدْرَأَكَ}$  দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছওয়াবের আশায় একালা (إِثْلًا) করা অথবা বিক্রীত ভাইয়ের জন্য তার কাছে থাকা অবিক্রীত ভাইটিকে একই ব্যক্তি এর কাছে বিক্রি করে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, দু'জনকে পৃথক না করার নির্দেশ তাদের সাবালক হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ ব্যাপারে উবাদা ইবনু হুযাইফের হাদীস সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَ الْإِمِّ وَلَدِيمَا فَيَفْزِلَ إِلَى مَتَى فَقَالَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ الْغُلَامُ وَتَحِيضُ الْجَارِيَةُ.

অর্থ রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা মা ও তার সন্তানকে পৃথক কর না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কত কাল? তিনি বলেন, ছেলে সাবালক এবং মেয়ের ঋতুবতী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম শাফিঈ (র.) -এর মতটিও একরূপ। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত হলো বোধ জাগ্রত হওয়ার পূর্ব তথা সাত/ আট বছর বয়স পর্যন্ত বা বলা যায় দাঁত পড়ার বয়স পর্যন্ত। এ ব্যাপারে মাশায়েখগণের বক্তব্য হলো, যখন বালকরা প্রাপ্ত বয়স্কের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং নিজেরা বিচ্ছিন্ন হতে রাজি থাকে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে। কেননা, এ বয়সে তারা নিজের ভালমন্দ বুঝতে সক্ষম।

وَأَنَّ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ (ع) قَرَّرَ بَيْنَ مَارِيَّةَ وَسَيْرِينَ وَكَانَا أُمَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ .

অনুবাদ : আর যদি তারা উভয়ে সাবালক হয় তাহলে তাদেরকে পৃথক করাতে দোষ নেই। তাছাড়া সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মারিয়া ও সীরীনকে আলাদা করেছিলেন। অথচ তারা দুই সহোদরা দাসী ছিলেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্ববর্তী মাসআলার শেষাংশ বর্ণনা করা হচ্ছে।

মাসআলা : যদি এক মালিকের অধীন দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক থাকে, যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক চিরস্থায়ীভাবে হারাম। এদের দু'জনকে বিক্রি, দান ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথক করে দেওয়া মাকরুহ নয়। এটা কারাহাত ছাড়া এমনিতেই বৈধ। কারণ, হাদীসের নিষিদ্ধতা যে বিষয়ে এসেছে এ মাসআলা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস দু'জন নাবালক সম্পর্কিত আর অন্য হাদীসটি মা ও ছেলের ব্যাপারে অর্থাৎ একজন বড় ও অন্যজন ছোট, এ বিষয়ে বর্ণিত। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, হাদীস দু'টি কিয়ামের বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে। আর যে কোনো যুক্তি বহির্ভূত নস বর্ণিত অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেটা স্থানান্তরিত হয় না। সে মতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বর্ণিত হাদীস দু'টির হুকুম স্থানান্তরিত হবে না। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক দু'জনের মধ্যে পৃথকীকরণে কোনো দোষ নেই।

তাছাড়া দু'জন ছোট দাস/দাসী অথবা একজন ছোট অপরজন বড়- এমন দু'জনকে পৃথক করার কারণে দয়াহীনতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের যে প্রশ্রুতি আগে দেখা দিয়েছিল, সেটা এখানে দেখা দিচ্ছে না। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় পৃথক করলে নাবালেগের প্রতি যে স্নেহ-মমতার বিশেষ নির্দেশ রয়েছে তা লঙ্ঘন হয় এবং বড়জন ছোটকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাতেও বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় স্নেহ-মমতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার বিষয়টি পাওয়া যায় না। আর তাই দু'জনই বড় বয়স্ক হলে তাদেরকে পৃথক করা অবৈধ হবে না।

আরেকটি দলিল হলো, আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিস হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতা'আহ [রাসূল ﷺ-এর দূত]-এর মাধ্যমে দু'জন দাসী রাসূল ﷺ-এর কাছে হাদিয়াক্রমে প্রেরণ করেন। যাদের এজনের নাম মারিয়া, অন্যজনের নাম সীরীন, তারা পরস্পর সহোদরা ছিলেন, প্রথমোক্তজনকে রাসূল ﷺ নিজ ঘরে রেখে দেন, যার গর্ভে রাসূল ﷺ-এর পুত্র সন্তান হযরত ইব্রাহীমের জন্ম হয়। আর দ্বিতীয়জনকে রাসূল ﷺ কবি হাসান ইবনে সাবিতের হাতে দানরূপে অর্পণ করেন। এ ঘটনায় দেখা যায়, রাসূল ﷺ দু'জন সহোদরা দাসীকে তার মালিকানায় আসার পর পৃথক করে দেন তাদের পরস্পর সহোদরা হওয়া সত্ত্বেও। রাসূল ﷺ কর্তৃক এই পৃথকীকরণ এটাই প্রমাণ করে যে, প্রাপ্তবয়স্ক দু'জন নিকটাত্মীয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ।



সম্পর্ক এই যে, মাকরুহ ও ফাসিদ বিক্রি সহ যাবতীয় বিক্রয়চুক্তি দ্বারা চুক্তি করার নিয়ম-পদ্ধতি জানা গেছে, এরপর ইকালাহ দ্বারা সংঘটিত চুক্তি রহিত করার নিয়ম জানা যাবে।

الخ : قَوْلُهُ الْإِقَالَةُ جَانِزَةٌ فِي الْبَيْعِ الخ : প্রথমে ইকালাহ এর সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম কুদুরী বলেন, বিক্রয়ের মধ্যে ধার্য প্রথম মূল্যের (الْأَوَّلُ) অনুরূপ বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার করা হচ্ছে ইকালাহ।

অতঃপর ইকালাহ-এর বৈধতার দলিল পেশ করেন রাসূল ﷺ -এর হাদীস দ্বারা। হাদীসটি সনদসহ উদ্ধৃত করা হলো-

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْأَعْمَشِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بِعَيْنِهِ أَقَالَ اللَّهُ عَتْرَابَهُ زَادَ ابْنُ مَاجَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

উল্লেখ্য যে, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ ছাড়া ইবনে হিব্বান ও হাকেম (র.)ও হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তাদের কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেন। হাদীসটির সনদ সহীহ এবং এর বর্ণনাকারীগণ উচ্চমানের। شَرَفُ শব্দটি আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ-এর বর্ণনায় না থাকলেও সেটা বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে। হাদীসের অর্থ রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি [বিক্রয় চুক্তি করে] অন্ততও ব্যক্তির সাথে কৃত চুক্তি প্রত্যাহার করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিচ্যুতিগুলো বিদূরিত করবেন।

ইকালাহ করার সুরত : কোনো ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কোনো কিছু ক্রয় করে কিংবা বিক্রি করার পর মনে করল যে, তার সেই দ্রব্যটি প্রয়োজন নেই, অথবা তার বিক্রীত দ্রব্যটি অতীব প্রয়োজন, অতঃপর তার অন্য পক্ষকে বলল, ভাই আমি আপনার পণ্যটি ফেরত দিচ্ছি, আপনি আমার প্রদত্ত মূল্য ফেরত দিন। ক্রেতার কথা মতো বিক্রেতা যদি প্রথম মূল্য অথবা তার অনুরূপ মূল্য বিনিময় রূপে প্রদান করলে সেটাই ইকালাহ হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে রাসূল ﷺ ইকালাহকারীর জন্য ছওয়্যাবের ঘোষণা করেছেন অথবা ছওয়্যাব লাভ করার জন্য দোয়া করেছেন। ছওয়্যাব বা ছওয়্যাবের দোয়া শরিয়ত অনুমোদিত কাজেই হতে পারে। শরিয়ত অনুমোদন করে না এমন কাজে ছওয়্যাব কিছুতেই আশা করা যায় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, ইকালাহ বা বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার একটি বৈধ ও পুণ্যের কাজ।

ষৌক্তিক দলিল : ইকালাহ হচ্ছে চুক্তি প্রত্যাহার করা, চুক্তি করা ক্রেতা ও বিক্রেতার একটি অধিকার। কেননা তাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে সেটা সংঘটিত হয়। যেহেতু চুক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকার এবং তা উভয়ের সম্মতিক্রমে সংঘটিত হয় সেহেতু বিশেষ প্রয়োজনে এটাকে প্রত্যাহার করাটাও তাদেরই অধিকার। মোটকথা, উভয় পক্ষের যেমন চুক্তি করার অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদের রহিত করারও অধিকার রয়েছে।

فَإِنْ شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَرَدُّ مِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَالْأَصْلُ أَنْ  
 الْإِفَالَةَ فَسَخَّ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ  
 جَعْلُهُ فَسْخًا فَيَبْطُلُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا)، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحا) هُوَ بَيْعٌ  
 إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ جَعْلُهُ بَيْعًا فَيُجْعَلُ فَسْخًا، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ فَيَبْطُلُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ  
 (رحا) هُوَ فَسْخٌ إِلَّا إِذَا تَعَدَّرَ جَعْلُهُ فَسْخًا فَيُجْعَلُ بَيْعًا، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ فَيَبْطُلُ،  
 لِمُحَمَّدٍ (رحا) أَنَّ اللَّفْظَ لِلْفَسْخِ وَالرَّفْعِ، وَمِنْهُ يُقَالُ أَقْلَنِي عَشْرَتِي فَيُوقَرُ عَلَيْهِ  
 قَضِيَّتُهُ، وَإِذَا تَعَدَّرَ يُحْمَلُ عَلَى مُحْتَمَلِهِ، وَهُوَ الْبَيْعُ، إِلَّا تَرَى أَنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ  
 الثَّلَاثِ، وَلَا يَبْنِي يُوسُفَ (رحا) أَنَّهُ مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضَى، وَهَذَا هُوَ حَدُّ  
 الْبَيْعِ، وَلِهَذَا يَبْطُلُ بِهَلَاكِ السِّلْعَةِ، وَرَدُّ بِالْعَيْبِ، وَتَثَبُّتُ بِهِ الشُّفْعَةُ، وَهَذِهِ  
 أَحْكَامُ الْبَيْعِ.

অনুবাদ : যদি কেউ [ইকালার মধ্যে] প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি অথবা কমের শর্তারোপ করে, তাহলে শর্ত বাতিল হবে এবং সে [বিক্রেতা] প্রথম মূল্যের সমপরিমাণ প্রত্যাপণ করবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি [ইকালাহ] ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে রহিতকরণ চুক্তি, আর তারা ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রে এটা একটা নতুন বিক্রয়চুক্তি। তবে [কোনো কারণে] যদি এটাকে রহিতকরণ চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয়চুক্তি, তবে যদি [কোনো কারণে] এটাকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত হবে। ইয়া যদি [কোনো কারণে] বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না হয়, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। যদি এ প্রত্যাহার-চুক্তিকে প্রত্যাহার-চুক্তি বলা অসম্ভব হয়ে যায়, তাহলে এটাকে বিক্রয়চুক্তি বলা হবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ইকালাহ শব্দটি অভিধানে প্রত্যাহার ও রহিত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর থেকেই [দোয়াতে] বলা হয় (أَقْلَنِي عَشْرَتِي) 'হে আল্লাহ! আমার বিচ্ছাড়গুলো দূর কর [ক্ষমা কর]'। সুতরাং শব্দটির 'অর্থ-চাহিদা' পরিপূর্ণ আদায় করতে হবে। তবে যখন এ অর্থ গ্রহণ সম্ভবপর না হয়, তখন তার সম্ভাব্য অর্থের উপর তাকে ব্যবহার করা হবে, আর তা হলো বিক্রয়। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, এটা তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এটা [ইকালাহ] পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা। আর এটাই তো বিক্রয়ের সংজ্ঞা। এ কারণেই পণ্য বিনষ্ট হলে এটা বাতিল হয়ে যায় এবং ক্রটিজনিত কারণে ফেরত দেওয়া হয়। আর এর দ্বারা গুফআহ অধিকার সাব্যস্ত হয়। এগুলো তো বেচা-কেনার বিধিবিধান।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ الشَّرْطُ الْمَنْعَ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইকালাহ হচ্ছে প্রথম মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য দ্বারা বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা। ব্যতিক্রম শর্তের ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসজালা : কেউ যদি প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি অথবা কম মূল্য পরিশোধের শর্তে ইকালাহ করে, তাহলে তার ইকালাহ-এর কি দৃকুম হবে? ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এরূপ শর্ত করা হলে শর্তটি বাতিল হবে, তবে ইকালাহ সংঘটিত হয়ে যাবে এবং বিক্রোতা ক্রেতা থেকে যে ধার্যকৃত মূল্য তথা ثَمَنٌ আদায় করেছিল তা ফেরত দেওয়া তার উপর আবশ্যক হবে। উদাহরণস্বরূপ যাদের এক হাজার টাকায় একটি কাপড় বিক্রি করেছিল, আর রাশেদ তা ক্রয় করেছিল। এরপর যাদের এক হাজার টাকা এবং রাশেদ কাপড় কড়া করে নিয়েছে। এখন যদি কোনো একজন ইকালাহ করতে চায়, তাহলে যাদেরকে পূর্ণমূল্য এক হাজার টাকা এবং রাশেদকে বিক্রীত কাপড় ফেরত দিতে হবে। এখন যদি এক হাজারের থেকে দু-শ টাকা বেশি নেওয়ার কিংবা দু-শ টাকা কম দেওয়ার শর্ত করে, তাহলে এরূপ শর্ত আরোপ করা শুদ্ধ হবে না এবং শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। বিক্রোতা যাদের উপর এক হাজার টাকা প্রত্যর্পণ করা আবশ্যক হবে।

এরপর হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইকালাহ-এর স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনার অবতারণা করেন। ইকালাহ-এর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের হানাফী মাযহাবের প্রধান তিন ইমামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা ও বিক্রোতার ক্ষেত্রে ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। তবে ক্রেতা ও বিক্রোতা ছাড়া অন্য যে কোনো লোকের কাছে এটা একটা নতুন বিক্রয়চুক্তি। ক্রেতা ও বিক্রোতার ক্ষেত্রে এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি হওয়ার প্রথম দলিল—

ক. বিক্রোতার উপর শুধুমাত্র প্রথম মূল্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। প্রথম মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি যে কোনো শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রোতা উভয়ের ক্ষেত্রে এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না হয়ে নতুন বিক্রয় বিবেচিত হতো, তাহলে তারা যে মূল্য নির্ধারণ করত তাই সেটা প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি কিংবা কম, সেটা প্রদান করা আবশ্যক হতো। প্রথম মূল্য প্রদান আবশ্যক হতো না। কেননা, বিক্রয়চুক্তির মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রোতা আলোচনা করে যা নির্ধারণ করে, তাই অপরজনকে বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ করতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো মূল্য পরিশোধ আবশ্যক হয় না। যেহেতু ইকালাহর মধ্যে প্রথম মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়— ক্রেতা-বিক্রোতার পরবর্তীতে নির্ধারণ করা মূল্য প্রদান আবশ্যক হয় না, তাই বুঝা গেল যে, ইকালাহ হলো বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, নতুন বিক্রয়চুক্তি নয়।

খ. তাছাড়া ইকালাহ ফাসিদ শর্তারোপ করার দ্বারা বাতিল হয় না। যদি ইকালাহ নতুন বিক্রয়চুক্তি হতো, তাহলে ফাসিদ শর্তের দ্বারা বাতিল হয়ে যেত। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। যেহেতু ইকালাহ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না সেহেতু ইকালাহ ক্রেতা-বিক্রোতার ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় নয়; বরং ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি।

গ. ইকালাহ যে ক্রেতা ও বিক্রোতার ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি নয় এর তৃতীয় দিক হলো, ইকালাহ করার পর বিক্রোতা যদি ক্রেতা থেকে পণ্যটি কড়া নাও করে তবু যদি উক্ত পণ্যটি ক্রেতার কাছে আবার বিক্রি করে দেয়, তাহলে উক্ত বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। এর দ্বারাও বুঝা গেল যে, ইকালাহ ক্রেতা ও বিক্রোতার ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। কেননা, ইকালাহ যদি নতুন বিক্রয় সাব্যস্ত হতো, তাহলে বিক্রয়পণ্য কড়া করার পূর্বেই তা বিক্রি করা হতো। অথচ বিক্রীত-পণ্য কড়া করার পূর্বে ক্রেতার জ্ঞান তা বিক্রয় করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। আর ইকালাহ করার পর বিক্রীত-পণ্যটি আয়ত্তে নেওয়া ব্যতিরেকে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রি জায়েজ হবে না। কারণ, ক্রেতা ও বিক্রোতা ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রে ইকালাহ হলো নতুন বিক্রয়, আর বিক্রয়ের মধ্যে যেমন আয়ত্তে নেওয়া ছাড়া বিক্রি নাজায়েজ তেমন বিক্রোতা [যে

ইকালার মধ্যে ক্রেতা ছিল। এর পক্ষে বিক্রীত-পণ্য কজা করা ছাড়া বিক্রয় বৈধ হবে না। উপরিউক্ত তিনটি দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইকালাহ ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি।

ইকালাহ যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় এর প্রমাণ নিম্নোক্ত উদাহরণে লক্ষণীয়— এক ব্যক্তি একটি জায়গা/প্লট খরিদ করল, বিক্রেতার জমিনের পার্শ্ববর্তী জমিনদার তার শুফআর দাবি করল না, বরং সে তার হক পরিভাগ করল, অতঃপর ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করার ফলে স্থানটি পুনরায় বিক্রেতার অধীনে চলে আসল। এখন সেই শফী যদি তার শুফআর দাবি করতে চায়, তাহলে সে সেটা করতে পারে। কেননা, শফীর ক্ষেত্রে সেটা নতুন বিক্রি, অর্থাৎ যেন ক্রেতা বিক্রেতার কাছে সেই স্থানটি বিক্রয় করেছে যে স্থানটি সে বিক্রেতা থেকে খরিদ করেছিল। যেহেতু বিক্রয়ের দ্বারা শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয়, তাই এখানে ইকালাহ [যা তৃতীয় পক্ষের জন্য বিক্রি]-এর দ্বারা শফীর হক প্রমাণিত হবে। আর তাই শফী শুফআর হক চাইতে পারবে। মোটকথা হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইকালাহ ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। আর অন্য সবার ক্ষেত্রে এটা নতুন বিক্রয়চুক্তি।

কিন্তু যদি কোনো কারণে ইকালাহকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি দাসী বিক্রয় করেছে এবং ক্রেতা দাসীটি কজা করেছে, অতঃপর ক্রেতার হাতে যাওয়ার পর দাসীটি একটি সন্তান জন্ম দিল। এখন ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করার মনস্থ করল, কিন্তু তাদের জন্য ইকালাহ করা বৈধ হবে না! কেননা, ইকালাহ ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। বিক্রীত-পণ্যের মধ্যে এমন বৃদ্ধি পাওয়া যা পণ্য থেকে পৃথক— এমন বৃদ্ধি বিক্রয় প্রত্যাহারকে বাধা প্রদান করে। সুতরাং দাসীর সন্তানটি দাসীকে ফেরত দানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বিবেচিত হবে। যেহেতু বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী বিক্রয়চুক্তিটি বহাল থাকবে।

২. ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয়চুক্তি। তবে যদি কোনো কারণে এটাকে বিক্রয়চুক্তি না বলা যায়, তাহলে তাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলা হবে। আর যদি প্রত্যাহার চুক্তি না বলা যায়, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন— এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি দাস ক্রয় করে সেটাকে কজা করল, তারপর কোনো কারণবশত তারা ইকালাহ করল, তাহলে এটা বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত হবে। যেন ক্রেতা যে দাসটি বিক্রেতা থেকে খরিদ করেছিল সেটাই আবার বিক্রেতার কাছে বিক্রি করেছে। তবে যদি ক্রেতা পণ্যটি বুঝে নেওয়ার পূর্বে বিক্রি করে দেয়, তাহলে সেটাকে বিক্রয় বলা যাবে না। কারণ, বিক্রীত-পণ্য কজা করার আগে সেটাকে বিক্রি করা অবৈধ।

আর যদি কেউ এক হাজার টাকায় একটি ক্রীতদাস ক্রয় করে তারপর গোলামটিকে কজা করার পূর্বেই দশমণ গমের বিনিময়ে ইকালাহ করলে সেটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, ক্রেতা কজা করা ছাড়াই গোলামটির ব্যাপারে ইকালাহ করেছেন। তদ্রূপ এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তিও সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, ইকালাহ বলা হয় প্রথম মূল্যের সমপরিমাণ প্রদানের মাধ্যমে [প্রথম] বিক্রয় প্রত্যাহার করা। এখানে ইকালাহর মধ্যে উভয়ে দশমণ গমকে মূল্য নির্ধারণ করেছে; কিন্তু তাদের নির্ধারণকৃত এ মূল্য প্রথম বিক্রেতার মূল্য থেকে ভিন্ন ধরনের। আর প্রথম মূল্যের বিপরীত দ্রব্য দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার করা যায় না। সুতরাং যখন বিক্রয় এবং বিক্রয় প্রত্যাহার কোনোটিই বলা যাচ্ছে না, তখন ইকালাহই বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, যখন ইকালাহ বাতিল হয়ে গেল, তখন প্রথম বিক্রয়চুক্তিটি বহাল থাকবে।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার। তবে যদি কোনো কারণে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে এটাকে বিক্রয়চুক্তি বিবেচনা করা হবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন— এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করেছে, তারপর দাসীটি কজা করে তার আয়ত্তে আনল। তারপর আবার এক হাজার টাকার বিনিময়ে ইকালাহ করল, তাহলে এটা বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে। আর যদি ইকালাহ করার পূর্বে দাসীটি সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে এটাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত করা যাবে না। তখন এটাকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা হবে এবং বলা হবে ক্রেতা দাসী ও তার সন্তান এক হাজার টাকায় বিক্রি করেছে।



আর যদি কেউ এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করে সেটাকে কজা না করেই দশ মন গমের বিনিময়ে ইকালাহ করে, তাহলে তার এ ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তিও হবে না এবং নতুন বিক্রয়ও হবে না। বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি হবে না তার কারণ হলো, বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা হয় প্রথম মূল্যের বিনিময়ে। প্রথম মূল্যের বিপরীত ধরনের বস্তুর বিনিময়ে নয়। অথচ এখানে প্রথম মূল্যের বিপরীত ধরনের বস্তু দ্বারা ইকালাহ করা হচ্ছে। অতএব, এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি হবে না। এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত না করার কারণ হলো, কজা করার পূর্বে পণ্য বিক্রি করা অবৈধ, আর এখানে দাসী [বিক্রীত-পণ্য] কজার পূর্বেই ইকালাহ [বিক্রি] করা হচ্ছে। মোটকথা, যখন বিক্রয় প্রত্যাহার বা বিক্রয় কোনোটা ই সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, তখন এটা বাতিল হয়ে যাবে। আর ইকালাহ বাতিল হওয়ার অর্থই হচ্ছে প্রথম বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকা।

নিম্নে ইমামদের মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করা হচ্ছে—

**ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল :** ইকালাহ (إِقَالَة) -এর আভিধানিক অর্থ— বিক্রয় প্রত্যাহার করা, ঝঁহিত করা ও দূর করা। যেমন—দোয়ার মধ্যে বলা হয় **أَبْلَيْتُنِي عَرَّتِي** 'আমার বিচ্যুতিগুলো দূর করে দাও, আমাকে ক্ষমা করে দাও।' ফিকহশাফের মূলনীতি অনুযায়ী কোনো শব্দকে হাকীকী [প্রকৃত] অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হলে মাজাহী [রূপক] অর্থে গ্রহণ করা হয় না। আর **إِقَالَة** শব্দটিকে প্রকৃতার্থে গ্রহণ করতঃ বলা হয়েছে যে, ইকালাহ অর্থ বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা। তবে যখন প্রকৃত অর্থ 'প্রত্যাহার করা' গ্রহণ করা সম্ভব না হবে, তখন তার রূপক অর্থ বা সম্ভাব্য অন্য অর্থ তথা বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা হবে। সম্ভাব্য অর্থ যে 'বিক্রয়' তার প্রমাণ হলো, এটা ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া অন্য সবার কাছে বিক্রয়চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তির অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হলে এটাকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা হবে।

**ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল :** পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে দুজনের মালামাল বিনিময় হচ্ছে ইকালাহ। কারণ, ইকালার মধ্যে ক্রেতা পণ্য ও বিক্রেতা মূল্য প্রদান করে থাকে। আর এটাই তো বিক্রয়ের সংজ্ঞা। সুতরাং অর্থের বিচারে ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয়চুক্তি। তাছাড়া ইকালার মধ্যে বিক্রয়ের বিধানাবলি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন— যদি ক্রেতার হাতে বিক্রীত-পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যায়, যেমন বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রীত-পণ্য অর্পণ করার আগেই যদি পণ্যটি বিক্রেতার হাতে থাকাকালে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। এমনভাবে ক্রেতা কজা করার পর যদি কোনো দোষ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে ইকালাহ করার পর [প্রথম] বিক্রেতা দোষের কারণে পণ্যটি ক্রেতার কাছে ফেরত দিতে পারবে, যেমন বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা দোষের কারণে পণ্যটি বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে। অদ্রুপ বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর যেমন শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয় তেমনি ইকালাহ করার দ্বারা শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয়। মোটকথা, যখন ইকালাহ শব্দটির মধ্যে বিক্রয়ের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান এবং বিক্রয়ের বিধিবিধান ইকালাহের জন্য প্রমাণিত হয়, তখন ইকালাহ করার অর্থ আসলে বিক্রি করা। আর এজন্যই ইকালাহকে বিক্রয়চুক্তি বলা হয়েছে। তবে যখন ইকালাহকে বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার কথাকে অনর্থক হওয়া থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ইকালাহকে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করার অর্থ গ্রহণ করা হবে।

وَلَا يَحْتَمِلُ حَنِيفَةً (رح) أَنَّ اللَّفْظَ يُنْبِئُ عَنِ الْفَسْخِ وَالرَّفْعِ كَمَا قُلْنَا، وَالْأَصْلُ اِغْمَاضُ  
الْأَلْفَاظِ فِي مُفْتَضَّلَاتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَا يَحْتَمِلُ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ لِيُخْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ  
تَعَدُّهِ، لِأَنَّهُ ضِدُّهُ، وَاللَّفْظُ لَا يَحْتَمِلُ ضِدَّهُ، فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ، وَكَوْنُهُ بَيِّنًا فِي حَقِّ  
الثَّالِثِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ، لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُ حُكْمِ الْبَيْعِ، وَهُوَ الْمِلْكُ، لَا مُفْتَضَّلَ  
الصِّيغَةِ، إِذَا لَا وَلَايَةٌ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, [ইকালাহ] শব্দটিতে প্রত্যাহার ও রহিত করার অর্থ রয়েছে যেমনটা আমরা বললাম। আর মূলনীতি হলো, শব্দকে তার প্রকৃত চাহিদানুযায়ী প্রয়োগ করা। প্রাথমিক অবস্থায় ইকালাহ শব্দের মধ্যে বিক্রয়চুক্তির অর্থের সম্ভাবনা নেই যে, প্রত্যাহার করার অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হলে সে অর্থ নেওয়া যাবে। কেননা, প্রত্যাহার বিক্রয়চুক্তির বিপরীত। কখনো শব্দ তার বিপরীত অর্থ ধারণ করে না, ফলে ইকালাহ বাতিল হওয়াটাই নির্ধারিত হয়ে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়া তো অনিবার্য বিষয়। কেননা, এর দ্বারা বিক্রয়চুক্তির অনুরূপ হুকুম প্রমাণিত হয়। আর তা হলো মালিকানা। এটা শব্দের চাহিদা বা অর্থ নয়। কেননা, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের অন্য কারো উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَمِلُ حَنِيفَةً (رح) أَنَّ اللَّفْظَ الخ :

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : قَالَ : শব্দের অর্থ-বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা, রহিত করা ও দূর করা। [যেমনটা ইতঃপূর্বে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।] আর ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী শব্দকে তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করা হবে, প্রকৃত অর্থে ব্যবহার অসম্ভব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর তা অসম্ভব হয়ে গেলে রূপক ও অন্যান্য সম্ভাব্য অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে [যদি সেটা সম্ভব হয়]। এ মূলনীতি অনুসারে ইকালাহ শব্দটির অর্থ হবে- বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা এবং রহিত করা। তবে যখন এ অর্থ [রহিত করা] গ্রহণ অসম্ভব হয়ে যাবে, তখনও বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, ইকালার মধ্যে বিক্রয়ের সূচনা করার অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ, ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয়চুক্তির বিপরীতার্থক। কেননা, ইকালাহ করা হয় মালিকানা দূর করার জন্য, আর বিক্রয় করা হয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যেহেতু বিক্রয়ের অর্থ ইকালার অর্থের বিপরীত, তাই ইকালাহ দ্বারা বিক্রয় উদ্দেশ্য করা যাবে না। কারণ, কোনো শব্দ তার বিপরীতার্থ ধারণ করে না : সুতরাং যেহেতু ইকালাহ বিক্রয়ের অর্থ ধারণ করে না সেহেতু ইকালাহ শব্দ দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার করার অর্থ গ্রহণ সম্ভব না হলে বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। যখন বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ অসম্ভব তখন প্রত্যাহার করার অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হলে ইকালাহ বাতিল হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না।

الثَّالِثُ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা-বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় পক্ষের কাছে ইকালাহ হচ্ছে নতুন বিক্রয়। যদি ইকালার মধ্যে বিক্রয়ের অর্থ নাই থাকে, তাহলে তৃতীয় পক্ষের কাছে এটা বিক্রয় কি করে সাব্যস্ত হবে? [যেমন শব্দটির কাছে এটা বিক্রয়।]

উত্তর : তৃতীয় পক্ষের কাছে এটা অনিবার্যভাবে বিক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে। এটা শব্দের সম্ভাব্য অর্থ হিসেবে হয়নি। এর ব্যাখ্যা হলো, বিক্রতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানা প্রমাণ করা অর্থাৎ বিক্রীত পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং মূল্যের উপর বিক্রতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিক্রয়চুক্তি করা হয়। তবে মালিকানা বিক্রয়ের দ্বারা দূর হওয়া অনিবার্য বিষয়। অর্থাৎ যখন পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন পণ্য থেকে বিক্রতার মালিকানা খতম হবে। এমনভাবে যখন পণ্যের মূল্যের উপর বিক্রতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আবশ্যিকভাবে ক্রেতার মালিকানা দূরীভূত হবে।

মোটকথা, বিক্রয়ের উদ্দেশ্য মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, আর এতে মালিকানা দূর হওয়া আবশ্যিক বিষয়। পক্ষান্তরে ইকালাহ -এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানা দূর করা ও বাতিল করা। অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্য হতে ক্রেতার মালিকানা এবং পণ্যের মূল্য হতে বিক্রতার মালিকানা দূর করা। আর এজন্যই ইকালাহকে শরিয়ত অনুমোদন করেছে। তবে অনিবার্যভাবে ইকালার মধ্যে মালিকানা নতুন করে প্রতিষ্ঠিতও হয়।

এর ব্যাখ্যা হলো, যখন ইকালার সাহায্যে বিক্রীত-পণ্য থেকে ক্রেতার মালিকানা দূর হবে, তখন অনিবার্যভাবে বিক্রীত-দ্রব্যের মালিকানা নতুনভাবে বিক্রতার জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তদ্রূপ যখন বিক্রয়মূল্য থেকে বিক্রতার মালিকানা দূর হবে, তখন আবশ্যিকভাবে এতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সারকথা, ইকালার মাধ্যমে বিক্রীত-পণ্যে বিক্রতার মালিকানা এবং পণ্যের মূল্যে ক্রেতার মালিকানা অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইকালার চাহিদা ও দাবি মতে মালিকানা দূরীভূত হওয়ার বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রতার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা, ইকালাহ চুক্তিকারী ক্রেতা-বিক্রেতাদ্বয়ের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। যখন ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে ইকালার দাবির অনুসরণ করা হয়েছে, তখন তৃতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে ইকালার অনিবার্য ফলাফলটি অর্থাৎ মালিকানা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকটি লক্ষ্য করা হয়েছে। কেননা, চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের ভিন্ন ব্যক্তিদের উপর চুক্তি প্রত্যাহার করার বিষয়টি আরোপ করার অধিকার নেই। আর এটা জানা কথা যে, মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিক্রয়চুক্তির হুকুম। সুতরাং চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এটা অনিবার্যভাবে বিক্রয়চুক্তি হবে।

অতএব, যেহেতু চুক্তির পক্ষদ্বয় কর্তৃক অন্যের উপর বিক্রীত-পণ্যটি প্রত্যাহার করার বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়ার কর্তৃত্ব নেই, কারণ, অন্যদের ক্ষেত্রে 'বিক্রয় প্রত্যাহার' ক্ষতিকর- তাই অন্যদের ক্ষেত্রে এটা নতুন বিক্রয় হবে, যা অন্য [শক্ষী]-এর জন্য সুখবর হবে। যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, অন্যদের ক্ষেত্রে বিক্রয় হওয়াটা অনিবার্য বিষয়, তাই এটা দ্বারা আপত্তি করা সমীচীন হবে না এবং প্রশংসার একথা বলাও ঠিক হবে না যে, যেহেতু তৃতীয় পক্ষের কাছে এটা বিক্রয়চুক্তি, সুতরাং ইকালাহ শব্দের মধ্যে বিক্রয়ের অর্থ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, "ইকালাহ শব্দের চাহিদা হচ্ছে বিক্রয়" প্রতিপক্ষের এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, ইকালাহ শব্দের চাহিদা হচ্ছে বিক্রয় প্রত্যাহার। আর এটা সর্বসম্মত বিষয়। এখন যদি প্রতিপক্ষের আলিমগণ বলেন, এতে বিক্রয়ের অর্থ বিদ্যমান কিংবা এর চাহিদা হচ্ছে বিক্রয়, তাহলে হাকীকত [বিক্রয় প্রত্যাহার] এবং মাজায় [বিক্রয়] একত্রিত হওয়া আবশ্যিক হবে। আর শব্দের মধ্যে যুগপৎভাবে হাকীকত ও মাজায় একত্রিত হতে পারে না।

সারকথা হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে ইকালাহ চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের কাছে বিক্রয় প্রত্যাহার অন্যদের কাছে নতুন বিক্রয়। বিক্রয় প্রত্যাহার সাব্যস্ত না করা গেলে ইকালাহ বাতিল।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয়চুক্তি। যদি কোনো কারণবশত এটাকে বিক্রয়চুক্তি বলা সম্ভব না হয়- তাহলে যদি বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলা সম্ভব হয়, তবে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে ইকালাহ বাতিল।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। যদি কোনো কারণবশত ফসখ না হয়, তাহলে [সম্ভব হলে] নতুন বিক্রয়চুক্তি। আর তাও বলা সম্ভব না হলে ইকালাহ বাতিল।

إِذَا بَيَّتَ هَذَا نَقُولُ إِذَا شَرَطَ الْكَثْرَ فَلِإِقَالَةٍ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، لِيَتَعَدَّى الْفَسْحُ عَلَى الزِّيَادَةِ، إِذَا رَفَعَ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مُحَالًا، فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَنْطَلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ يُمَكِّنُ اثْبَاتَهَا فِي الْعَقْدِ، فَيَحَقِّقُ الرِّبَا، أَمَّا لَا يُمَكِّنُ اثْبَاتَهَا فِي الرَّفْعِ، وَكَذَا إِذَا شَرَطَ الْأَقْلَ لِمَا يَبْتَائُهُ، إِلَّا أَنْ يَخْدُثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ، فَحِينَئِذٍ جَازَتْ الْإِقَالَةُ بِالْأَقْلِ، لِأَنَّ الْحَطَّ يُجْعَلُ بِإِزَاءِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ، وَعِنْدَهُمَا فِي شَرْطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْعًا، لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحا)، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحا) جَعَلَهُ بَيْعًا مُمَكِّنًا، فَإِذَا زَادَ كَانَ قَاصِدًا بِهَذَا الْبَيْعِ، وَكَذَا فِي شَرْطِ الْأَقْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحا)، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحا) هُوَ فَسْحٌ بِالْثَمَنِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ سَكُوتٌ عَنِ بَعْضِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنِ الْكُلِّ وَقَالَ يَكُونُ فَسْحًا، فَهَذَا أَوَّلِي، بِخِلَافِ مَا إِذَا زَادَ، وَإِذَا دَخَلَ عَيْبٌ فَهُوَ فَسْحٌ بِالْأَقْلِ لِمَا يَبْتَائُهُ.

অনুবাদ : যখন এটা [উপরিউক্ত মূলনীতি] সাব্যস্ত হলো, তখন আমরা বলব, যদি কেউ [প্রথম মূল্যের চেয়ে] বেশির শর্ত করে, তাহলে ইকালাহ প্রথম মূল্যের উপরই সংঘটিত হবে। কেননা, অতিরিক্ত মূল্যের উপর পূর্ববর্তী বিক্রয়কে প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। কারণ, যা সাব্যস্তই ছিল না তা রহিত করা অসম্ভব। সুতরাং [অতিরিক্ত মূল্যের] শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। [ইকালাহ বাতিল হবে না।] কেননা, ইকালাহ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না। বিক্রয়চুক্তির বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা, বিক্রয়চুক্তির মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা সম্ভব। ফলে সুদের উপস্থিতি ঘটবে। কিন্তু অতিরিক্ত মূল্য বিক্রয় প্রত্যাহারে যোগ করা সম্ভব নয়। এমনভাবে যদি [প্রথম মূল্যের চেয়ে] কম মূল্যের শর্তারোপ করে [তাহলে প্রথম মূল্যের উপর ইকালাহ হবে]। এর দলিল তাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। তবে যদি বিক্রীত-পণ্যের মাঝে কোনো দোষ জন্মায়, তখন কম মূল্যে বিক্রয় প্রত্যাহার বৈধ হয়ে যায়। কেননা, হ্রাসকৃত অংশ দোষের কারণে যে ঘাটতি হয়েছে তার বিপরীতে বিবেচনা করা হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে অতিরিক্ত মূল্যের শর্তারোপের ক্ষেত্রে [ইকালাহটি] বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মূলত ইকালাহ হলো বিক্রয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটাকে বিক্রয় বিবেচনা করা সম্ভব। সুতরাং যখন সে মূল্য বাড়াল তখন এর দ্বারা সে বিক্রয়েরই ইচ্ছা করল। তদ্রূপ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে কম মূল্যের শর্ত করা অবস্থায় একই কথা প্রযোজ্য। কেননা, তাঁর মতে বিক্রয় হলো ইকালার মূলার্থ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এমতাবস্থায় ইকালাহ প্রথম মূল্য দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি গণ্য হবে। কেননা, এতে প্রথম মূল্যের কিয়দংশের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। যদি কেউ সম্পূর্ণ মূল্যের ব্যাপারে নীরব থাকে এবং বিক্রয় প্রত্যাহার করে তবু বিক্রয় প্রত্যাহার হয়ে যাবে, তাহলে কিয়দংশ অনুল্লেখ থাকলে এটা আরো উত্তমভাবেই বিক্রয় প্রত্যাহার বলে বিবেচিত হবে। তবে প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যের শর্তারোপ করার বিষয়টি ভিন্ন। আর যদি [ক্রেতা দখল করার

পর। বিক্রীত-পণ্যের মাঝে কোনো দোষ দেখা দেয়, তাহলে প্রত্যাহার-চুক্তি [প্রথম মূল্যের চেয়ে] হ্রাসকৃত মূল্যের উপর হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا نَبَتْ هَذَا نَفَرًا: উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ইকালার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইমামগণের যে মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন সেই মতবিরোধের ফলাফল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন।

লেখক বলেন, যখন এ মূলনীতি স্থির হলো যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, আর যদি এটাকে প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। সে মতে আমাদের বক্তব্য হলো, যদি ইকালার মধ্যে প্রথম মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য প্রদানের শর্ত করা হয়— উদাহরণস্বরূপ প্রথম বিক্রয়ে মূল্য সাব্যস্ত হয়েছিল এক হাজার টাকা। বর্তমানে ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করছে পনের শত টাকায়। অর্থাৎ তাদের দুজনের একজন শর্তারোপ করল প্রথম মূল্যের চেয়ে পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত তাকে দিতে হবে আর অপরজন তা মেনে নিল। এমতাবস্থায় এক হাজার টাকার উপর ইকালাহ হয়ে যাবে। বাকি পাঁচশত টাকার উল্লেখ অর্থহীন সাব্যস্ত হবে।

এর দলিল হলো, প্রথম মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। কারণ, বিক্রয় প্রত্যাহার বলা হয় প্রথম বিক্রয় যেভাবে সংঘটিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই সেটাকে প্রত্যাহার করা, প্রথম মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য বিক্রয় প্রত্যাহারের দাবি করলে সেটা বিক্রয় প্রত্যাহার হবে না। কেননা, এতে করে এমন বিষয় প্রত্যাহার করা আবশ্যক হয় যা মূল্য ছিলই না। আমাদের আলোচ্য উদাহরণে পনের শত টাকার উপর যদি প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে পাঁচশত টাকা প্রত্যাহার বা রহিত করা হচ্ছে অথচ এই পাঁচশত টাকা প্রথম বিক্রয়ে অব্যয়মান। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, যা মূল্য ছিল না তা প্রত্যাহার অসম্ভব। আর এজন্যই প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি শর্ত করা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। তবে এমন একটি বাতিল শর্তের কারণে ইকালাহ অবশ্য বাতিল হবে না। কারণ, ইকালাহ বা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি ফাসিদ শর্তারোপ করার কারণে বাতিল হয় না। এখন প্রশ্ন হলো যে, ইকালাহ ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তির মতো কেন বাতিল হয় না?

এর উত্তর হলো, অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত অনেকটা সুদের মতো। কেননা, এ অতিরিক্ত মূল্যের কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে কোনো একজনের বিনিময়হীন লাভ হচ্ছে। আর বিনিময়হীন অতিরিক্ত মুনাফা হচ্ছে সুদ। সুতরাং অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত সুদের মতো হলো। আর ইকালাহ অর্থগতভাবে বিক্রয়ের অনুরূপ। সুতরাং ইকালাহ-এর মধ্যে ফাসিদ শর্ত “সন্দেহের মাঝে সন্দেহ”—এর পর্যায়ভুক্ত। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, সুদ হওয়ার সন্দেহ শরিয়তের মধ্যে ধর্তব্য, তবে এর চেয়ে নিম্নস্তর তথা সন্দেহের মাঝে সন্দেহ ধর্তব্য নয়। আর এজন্য উক্ত শর্ত করা সত্ত্বেও ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে প্রত্যাহার-চুক্তির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে।

বিক্রয়চুক্তি এর ব্যতিক্রম। কারণ, প্রত্যাহার-চুক্তিতে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা অসম্ভব। কিন্তু বিক্রয়ের মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা অসম্ভব নয়। উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি একটি দিরহামকে দু-দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল, তাহলে অতিরিক্ত দিরহামের কারণে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এখানে এটা বলা যাবে না যে, এক দিরহামকে এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে, আর অতিরিক্ত দিরহামটি বাতিল। কারণ, বিক্রয়ের মধ্যে অতিরিক্ত দিরহাম যোগ করা সম্ভব। যখন অতিরিক্ত দিরহাম যোগ করা সম্ভব, তখন সুদ নিশ্চিত হয়ে গেল। আর এটা স্বীকৃত মাসআলা যে, সুদের উপস্থিতির কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এজন্যই এখানে অতিরিক্ত দিরহামটি মুক্ত করার কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইকালাহ-এর মাঝে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইকালাহ হচ্ছে প্রত্যাহার-চুক্তি বা যা বিদ্যমান তাকে রহিত করা ও দূর করা। আর যে অতিরিক্ত মূল্য বিক্রয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না তা রহিত করা তো অসম্ভব। আর এজন্যই ইকালার মাঝে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে, তবে ইকালাহ বাতিল হবে না।

মাসআলা: যদি কেউ ইকালার মধ্যে পূর্ব বিক্রয়ে ধার্য মূল্যের চেয়ে কমের শর্ত করে, উদাহরণস্বরূপ প্রথম মূল্য ছিল এক হাজার টাকা— ইকালাহ করার সময় বিক্রেতা বলল, আটশ টাকা দেব। এমতাবস্থায় প্রথম মূল্যের উপরই ইকালাহ হয়ে যাবে, আর শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, যে বিষয় প্রথম বিক্রয়ে [প্রথম মূল্যের টাকায়] ছিল না তা দূর করা অসম্ভব। আলোচ্য মাসআলায় প্রথম বিক্রয় এক হাজার টাকায় সম্পাদিত হয়েছিল, এতে হ্রাসকৃত মূল্য তথা আটশ টাকা ছিল না। আর তাই ইকালাহ-এর মাধ্যমে এটাকে দূর করা অসম্ভব। অসম্ভব শর্তের কারণে শর্তটি বাতিল তবে ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

লেখক বলেন, বিক্রয়ের পর বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় যদি এতে কোনো দ্রুতি পরিলক্ষিত হয়, যা বিক্রেতার কাছে থাকাকালীন সময়ে ছিল না এমতাবস্থায় প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ইকলাহ করা বৈধ। কেননা, ইকলাহ-এর মধ্যে প্রথম মূল্য থেকে যতটুকু হ্রাস করা হবে উদাহরণস্বরূপ দু-শ টাকা, এই হ্রাসকৃত দু-শ টাকা বিক্রীত-পণ্যের সে অংশের বিপরীতে হবে যে অংশটি দোষ দেখা দেওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দোষের কারণে যতটা ক্ষতি হয়েছে তার বিপরীতে বিক্রোতা দু-শ টাকা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। আর এতে কোনো দোষ নেই, এটা শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মাযহাবের সারকথা হলো, যদি কেউ এক হাজার টাকায় একটি দাস ক্রয় করে, তারপর এক হাজার টাকায় ইকলাহ করে, তাহলে ইকলাহ সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি পনের শত টাকায় ইকলাহ করে, তাহলে এক হাজার টাকার উপরই ইকলাহ হবে, অতিরিক্ত পাঁচশ টাকার শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি আটশ টাকার উপর ইকলাহ করে এবং বিক্রীত-পণ্য কোনো দোষ না দেখা দেয়, তাহলে এক হাজার টাকার উপর ইকলাহ হবে। তবে যদি হ্রাস করার শর্ত করা হয় তা অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু যদি বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পর এতে কোনো দোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে হ্রাসকৃত মূল্যের উপর ইকলাহ হওয়াতে কোনো দোষ নেই, অর্থাৎ যদি আটশ টাকার উপর ইকলাহ করতে চায়, তাহলে ইকলাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত মাসআলায় অর্থাৎ কোনো বস্তু বিক্রয় হয়েছে এক হাজার টাকায়, কিন্তু ইকলার সময় পনের শত টাকার প্রস্তাব করা হলে সাহেবানই (র.)-এর মতে এ ইকলাহ বিক্রয়চুক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং পনের শত টাকার উপরই দ্বিতীয় চুক্তিটি সম্পাদিত হবে। চুক্তিটি সম্পর্কে বলা হবে যে, ক্রেতা এক হাজার টাকায় গোলামটি ক্রয় করতঃ বিক্রোতার কাছে পরে পনের শত টাকা বিক্রি করেছে।

তাদের দলিল : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকলার মূল অর্থ হলো বিক্রয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইকলাহকে যদিও মৌলিকভাবে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলেন, কিন্তু যেহেতু অতিরিক্ত মূল্যের অবস্থায় প্রত্যাহার অসম্ভব এবং ইকলাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব, তাই এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে ইকলাহ হচ্ছে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, তবে যদি এটাকে বিক্রয় প্রত্যাহারচুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব হলে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হবে। আলোচ্য মাসআলায় প্রথম মূল্যের চেয়ে ইকলার মধ্যে অতিরিক্ত পাঁচশ টাকার শর্ত করার কারণে এটাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলা অসম্ভব হয়ে গেছে। তাই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয় ক্রেতা ও বিক্রোতার কথোপকথন হওয়া থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ইকলাহকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা হবে। তাঁর মতে ইকলার সম্ভাব্য এবং রূপক অর্থ হলো বিক্রয়। আর নিয়মানুযায়ী কোনো শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা অসম্ভব হলে তার রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। সে মতে এখানে ইকলাহকে বিক্রয়ের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এ ইকলাহ সম্পর্কে বলা হবে যে, এখানে ক্রেতা-বিক্রোতার কথোপকথন বিক্রয় প্রত্যাহার সম্পর্কে নয়; বরং নতুন বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও বিক্রয় প্রত্যাহার নয়।

আর যদি প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের শর্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বিক্রোতা বলল, আমি এক হাজার টাকার পরিবর্তে তোমাকে আটশ টাকা প্রদান করব, আর ক্রেতা সেটাই মেনে নেয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এ ইকলাহটিও বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কারণ, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকলাহ মানেই বিক্রয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এমতাবস্থায় প্রথম মূল্যের উপরই বিক্রয় প্রত্যাহার হবে এবং বিক্রোতাকে প্রথম ধার্যকৃত এক হাজার টাকার প্রদান করতে হবে। শর্তকৃত মূল্য হ্রাস করার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যখন বিক্রোতা শর্ত করল যে, আমি আটশ টাকা ফেরত দেব তখন যেন সে দু-শ টাকা অনুপ্লেথ করল এবং দু-শ টাকার ব্যাপারে নীরব রইল। নিয়মানুযায়ী কেউ পুরো মূল্য উল্লেখ করা থেকে বিবর্ত থেকে ইকলাহ করলে ইকলাহ সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং মূল মূল্যের কিয়দংশের ব্যাপারে চুপ থাকলে আরো উত্তমভাবে ইকলাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।

মোটকথা, প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ইকলাহ করলে যেহেতু বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব, তাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় ইকলাহ বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে প্রথম মূল্যের বেশি মূল্যে যেহেতু বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, তাই তখন ইকলাহ ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

লেখক বলেন, যদি ক্রেতার দখলে আসার পর বিক্রীত-পণ্যের মধ্যে দ্রুতি সৃষ্টি হয়, তাহলে প্রথম মূল্যের চেয়ে কমের উপরই বিক্রয় প্রত্যাহার হবে এবং শর্তকৃত আটশ টাকার বিক্রোতার উপর ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। বিক্রোতার পূর্ণ মূল্য ওখা এক হাজার টাকা প্রদান করতে হবে না। এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

وَلَوْ أَقَالَ يَغْيِرُ جِنْسَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَهُوَ فَسَخٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)،  
وَبُجْعَلُ التَّسْمِيَةِ لَغَوًّا، وَعِنْدَهُمَا بَيْعٌ لِمَا بَيْنَا، وَلَوْ وَلَدَتْ الْمَيْبَعَةُ وَلَدًا لَمْ  
تَقَايَلَا فَلَا إِقَالَهَ بَاطِلٌ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْوَلَدَ مَانِعٌ مِنَ الْفَسَخِ، وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ بَيْعًا،  
وَالْإِقَالَهَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ فَسَخٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح)، وَكَذَا  
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) فِي الْمَنْقُولِ لَتَعَذُّرِ الْبَيْعِ، وَفِي الْعَقَارِ يَكُونُ بَيْعًا عِنْدَهُ  
لَا مَكَانَ الْبَيْعِ، فَإِنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُ.

অনুবাদ : আর যদি প্রথম মূল্যের ভিন্নশ্রেণীভুক্ত কোনো বস্তুর মাধ্যমে ইকালাহ করে, তাহলে প্রথম মূল্যের দ্বারা ই  
বিক্রয় প্রত্যাহার বিবেচিত হবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে। আর ভিন্নশ্রেণীর মূল্যের উল্লেখটি অর্থহীন সাব্যস্ত  
করা হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা বিক্রয়চুক্তি হবে। এর দলিল আমরা বর্ণনা করেছি। আর যদি বিক্রীত দাসী  
সন্তান প্রসব করে তারপর উভয় পক্ষ ইকালাহ করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইকালাহ বাতিল  
হবে। কেননা, সন্তানের জন্ম বিক্রয় প্রত্যাহারের জন্য প্রতিবন্ধক। সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ ইকালাহ বিক্রয়  
বলে বিবেচিত হবে। স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার মালের ক্ষেত্রে কজার পূর্বে কৃত ইকালাহ ইমাম আবু হানীফা ও  
ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে। অস্থাবর মালের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ  
(র.)-এর মতও তাই। কেননা, এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা অসম্ভব। আর ভূমির ক্ষেত্রে ইকালাহ তাঁর ইমাম আবু  
ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তি বলে গণ্য। কেননা, এটিকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব। কেননা, ইমাম আবু  
ইউসুফ (র.)-এর মতে কজা করার পূর্বে ভূমি বিক্রি করা বৈধ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَالَ يَغْيِرُ جِنْسَ الثَّمَنِ: উপরিউক্ত ইবারতে বিক্রয় প্রত্যাহার সংক্রান্ত [তিন ইমামের মতানুযায়ী] কতিপয় মাসআলা  
আলোচনা করা হয়েছে—

প্রথম মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম মূল্যের ভিন্ন শ্রেণীর কোনো জিনিসের বিনিময়ে ইকালাহ করে, উদাহরণস্বরূপ  
প্রথম মূল্য ছিল দিরহাম বা টাকা, ইকালাহ করা হলো দিনার অথবা চাল দ্বারা। এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে  
তার উক্ত ইকালাহ প্রথম মূল্য তথা দিরহাম কিংবা টাকার দ্বারা ই হবে। আর পরে ইকালার সময় যে মূল্য তথা দিনার কিংবা  
চাল উল্লেখ করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং বিক্রেতার উপর পূর্ব পরিশোধিত মূল্য দিরহাম বা টাকা প্রদান করা  
আবশ্যক হবে। দিনার বা চাল প্রদান করা আবশ্যক হবে না। আর তার উক্ত ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে।

সাহেবাইন (র.)-এর মত এ ব্যাপারে ভিন্ন। তাঁরা বলেন, প্রথমোক্ত মূল্য ছাড়া অন্য যে কোনো মূল্যের উপর ইকালাহ করা  
হলে সেটা বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। তাদের কৃত এ ইকালাহ সম্পর্কে বলা হবে যে, ক্রেতা যে পণ্য দিরহাম বা টাকার বিনিময়ে  
বিক্রেতা থেকে ক্রয় করেছিল তাই আবার বিক্রেতার কাছে দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। তাঁদের উভয়ের দলিল পূর্বেই  
অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালার মূল অর্থই হলো বিক্রয়চুক্তি। তবে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত না  
করা গেলে সেটা বিক্রয় প্রত্যাহার বিবেচিত হয়। সেমতে এটা বিক্রয়চুক্তি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা যদিও  
ইস. যান্নাফুল ফেনায়া (৫ম) ২২ (ক)

বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় পূর্ব পরিশোধিত মূল্যের থেকে ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য দ্বারা ইকালাহ করার কারণে সেটাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, তাই এটা বিক্রয়চুক্তি বিবেচিত হবে।

**দ্বিতীয় মাসআলা :** হিদায়া প্রণেতা বলেন, যদি বিক্রীত দাসী ক্রেতার হাতে যাওয়ার পর বাচ্চা প্রসব করে, এরপর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে ইকালাহ করে, তাহলে উক্ত ইকালাহ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর মতে ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহারকে বলা হয়। আলোচ্য মাসআলায় কজা করার পর যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে সন্তান জন্মানোর মাধ্যমে, সেটা বিক্রীত দাসী থেকে পৃথক, আর নিয়মানুযায়ী বিক্রীত-পণ্য থেকে পৃথক যে কোনো বৃদ্ধি বিক্রয় প্রত্যাহারের জন্য প্রতিবন্ধক। যেহেতু সন্তান মা থেকে পৃথক, সুতরাং সন্তানসহ মাকে বিক্রয় প্রত্যাহারের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা অসম্ভব। আর এ কারণে ইকালাহ বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে এবং প্রথম বিক্রয়টি বহাল থাকবে, তবে যদি বিক্রীত দাসীটি ক্রেতার আয়ত্তে আসার পূর্বে সন্তান প্রসব করে থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইকালাহ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, পৃথকভাবে বৃদ্ধি যদি কজার পূর্বে ঘটে থাকে, তাহলে তা বিক্রয় প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

আর যদি বিক্রীত-পণ্যের মাঝে এমন প্রবৃদ্ধি ঘটে যা বস্তু থেকে ভিন্ন নয়; বরং সন্তান সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন দাসী বিক্রয় করার পর মোটা হয়ে গেল বা সুন্দরী হয়ে গেল, তাহলে তার এ বৃদ্ধি কজার পরে হোক কিংবা আগে হোক তা বিক্রয় প্রত্যাহারের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতা কজা করার পর যদি বিক্রীত দাসীটি সন্তান প্রসব করে তারপর তারা ইকালাহ করলে উক্ত ইকালাহ বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তো এ কারণে যে, ইকালার মূল অর্থ তো বিক্রয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এখানে যেহেতু বিক্রীত-পণ্যের প্রবৃদ্ধি পৃথক জিনিস, তাই এখানে বিক্রি প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, তাই ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, এখানে ইকালাহকে বিক্রয়ের অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতিও এটাই যে, ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার গণ্য হবে। যদি বিক্রয় প্রত্যাহারের অর্থ গ্রহণ পদ্ধতি না হয়, তাহলে [সম্ভব হলে] বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা হবে।

**তৃতীয় মাসআলা :** **الْإِنَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ** থেকে শুরু হয়েছে। মাসআলাটির আলোচনার পূর্বে আমরা দুটি মূলনীতি উল্লেখ করতে চাই—

১. অস্থাবর সব বস্তু কজা করার পূর্বে বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে অবৈধ।

২. স্থাবর সম্পত্তি কজা করার পূর্বে বিক্রি করা শায়খাইনের মতে জায়েজ, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অবৈধ।

**মাসআলা :** যদি কেউ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পদ কজা করার পূর্বেই ইকালাহ করতে চায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ ইকালাহটি বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ, তাঁদের মতে ইকালার মূল অর্থ হচ্ছে বিক্রি প্রত্যাহার করা। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রীত সম্পদ অস্থাবর হলে ইকালাহ 'বিক্রয় প্রত্যাহার' বিবেচিত হবে। কেননা, তাঁর মতে ইকালার মূল অর্থ যদিও বিক্রয়, কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা অস্থাবর সম্পদকে কজা করার পূর্বেই ইকালাহ করে ফেলেছে। আর অস্থাবর মালামাল কজা করার পূর্বেই বিক্রি করা জায়েজ নয়। এ কারণে এখানে ইকালাহকে বিক্রি সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত না করা গেলে বিক্রয় প্রত্যাহার সাব্যস্ত করা হয়। এখানেও তাই ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর যদি বিক্রীত বস্তু স্থাবর হয় যেমন— জমিন, বড় গাছ ইত্যাদি তাহলে তাদের ইকালাহ বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কেননা, স্থাবর সম্পত্তির ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থাবর সম্পদ কজা করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েজ। অতএব এখানে কজা করার পূর্বে স্থাবর সম্পত্তির ইকালাহ করার কারণে ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

**মাসআলা :** যদি কেউ **بَيْعَ صَرْفٍ** [মুদা লেনদেন] করার পর সেটার ইকালাহ করতে চায়, তাহলে উভয় লেন-দেন মজালিসের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তো বটেই— অন্য ইমামদ্বয়ের মতেও।



قَالَ : وَهَلَكَ الثَّمَنُ لَا يَمْنَعُ صَحَّةَ الْإِقَالَةِ ، وَهَلَكَ الْمَبِيعُ يَمْنَعُ عَنْهَا ، لِأَنَّ رَفْعَ  
الْبَيْعِ يَسْتَدْعِي قِيَامَهُ ، وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمَبِيعِ دُونَ الثَّمَنِ فَإِنَّ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ  
جَارَتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي لِقِيَامِ الْبَيْعِ فِيهِ ، وَإِنْ تَقَايَصًا تَجَوَّزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلَكَ  
أَحَدِهِمَا ، وَلَا تَبْطُلُ بِهَلَكَ أَحَدِهِمَا ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ ، فَكَانَ الْبَيْعُ بَاقِيًا  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, [প্রথম বিক্রয়ের] মূল্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ইকালাহ সহীহ হওয়াকে বাধ্যমান্ত করে না, তবে বিক্রীত-পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ইকালাহকে বাধ্যমান্ত করে। কেননা, বিক্রয়চুক্তির প্রত্যাহার বিক্রয়ের বিদ্যমানতা দাবি করে। আর তা বিক্রীত-পণ্যের দ্বারা বিদ্যমান থাকে— মূল্যের অস্তিত্ব দ্বারা নয়। যদি বিক্রীত-পণ্যের কিছু অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্টাংশে ইকালাহ বৈধ হবে। কারণ, অবশিষ্টাংশে বিক্রয় বিদ্যমান আছে। যদি পরস্পর পণ্য আদান-প্রদানের বিক্রয় করে, তাহলে একটি বিনিময় বিনষ্ট হওয়ার পরও ইকালাহ বৈধ হবে এবং একটি বিনষ্ট হওয়ার কারণে ইকালাহ বাতিল হবে না। কেননা, দুটি বস্তুর প্রত্যেকটিইতো বিক্রীত-পণ্য। সুতরাং বিক্রয় তখন বহাল থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সঠিক বিষয় সম্পর্কে অধিক অবগত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَهَلَكَ الثَّمَنُ لَا يَمْنَعُ الْخ : উপরিউক্ত ইবারতে ইকালাহ পরিচ্ছেদের সর্বশেষ মাসআলাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : যদি বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে প্রদত্ত মূল্য [যে কোনো ধরনের মুদ্রা] বিক্রেতার কাছে বিনষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বিক্রেতার হাতছাড়া হয়ে যায়, তারপর তারা দু-জনে ইকালাহ করতে চায়, তাহলে তাদের ইকালাহ শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রীত-পণ্য বিনষ্ট কিংবা হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে ইকালাহ তথা বিক্রয় প্রত্যাহার শুদ্ধ হবে না। মোটকথা, মূল্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়া ইকালার বৈধতাকে বাধ্যমান্ত করে না। তবে বিক্রীত-পণ্য বিনষ্ট হওয়া বিক্রয় প্রত্যাহারকে বাধ্যমান্ত করে। আমরা প্রথমে দু-মাসআলার পার্থক্য বর্ণনা করছি, তারপর দলিল বর্ণনা করব।

পার্থক্য এই যে, বিক্রীত-পণ্য প্রকৃতভাবে এবং বিধানগতভাবে মাল। কেননা, এটা একটা সুনির্দিষ্ট বস্তু, আর মূল্য মুদ্রা জাতীয় হলে তা প্রকৃতভাবে ও বিধানগতভাবে দায়ন তথা পরিশোধযোগ্য বস্তু। এ হুকুম তখনই, যখন নগদ মূল্যের প্রতি ইশারা না করা হয়। আর যদি নগদ মূল্যের প্রতি ইশারা করা হয়, তখন এটা বিধানগতভাবে মাল, যদিও প্রকৃত অর্থে মাল নয়। আর এজন্যই তো দ্বিতীয় পক্ষ কবুল না করা সত্ত্বেও বারাতাত শুদ্ধ হয়ে যায়। [কারণ, এটা প্রকৃতভাবে মাল নয়] অথচ অন্যের কবুল না পাওয়া গেলে আইন [নির্দিষ্ট বস্তু]-এর দান শুদ্ধ হয় না।

কারণ, দায়ন নির্দিষ্ট বস্তু [আইন] থেকে দুর্বল। আর এজন্যই যে ব্যক্তি শপথ করল যে, তার কাছে মাল নেই, অথচ অনেক পাওনা রয়েছে— তার শপথভঙ্গ হবে না। মোটকথা, উপরের আলোচনা ও উদাহরণ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূল্য [দায়ন] এবং বিক্রীত-পণ্য উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

বিক্রীত-পণ্য বিনষ্ট হলে ইকালাহ বাধ্যমান্ত হয়, কিন্তু মূল্য বিনষ্ট হলে ইকালাহ করাতে কোনো সমস্যা হয় না। এর দলিল হলো, ইকালাহ বলা হয় বিক্রয়চুক্তিকে প্রত্যাহার করা এবং দূর করাকে। আর অস্তিত্বহীন কোনো কিছুকে দূর করা অসম্ভব। আর

বিক্রয়চুক্তি বিক্রীত-পণ্যের সাহায্যে বিদ্যমান থাকে, মূল্যের সাথে বিদ্যমান থাকে না। কারণ, বিক্রয়চুক্তির মধ্যেই বিক্রীত-পণ্য আসল, আর মূল্য হচ্ছে গুণ বা ওয়াসফ। আর এজন্যই যদি মূল্য বিদ্যমান না থাকে কিংবা উল্লেখ নাও করে, তবু বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং বিক্রয় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে বিক্রীত-পণ্য অবিদ্যমান থাকলে বিক্রয়চুক্তি থাকে না। বিক্রয় না থাকলে সেটাকে প্রত্যাহার করাও সম্ভব হবে না। যদি বিক্রয়ে মূল্য না থাকে এবং বিক্রীত-পণ্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিক্রয় বিদ্যমান থাকে। বিক্রয় বিদ্যমান থাকলে সেটাকে প্রত্যাহার করাও সম্ভব। মোটকথা, উপরিউক্ত দলিলের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো যে, মূল্য অবিদ্যমান থাকলে বিক্রয় প্রত্যাহার জায়েজ হবে, কিন্তু পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে না।

মাসআলা : যদি বিক্রীত-পণ্যের একাংশ বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্টাংশের মাঝে ইকালাহ করা শুদ্ধ হবে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রয়ের পণ্য ছিল দশ মন গম, যা দ্বিতীয় পক্ষ বিশ টাকা হারে ক্রয় করেছিল। এরপর ক্রেতা দু-মন খরচ করে ফেলল। তারপর বিক্রেতার প্রস্তাবে উভয়ে আটমনের মাঝে ইকালাহ করার মনস্থ করলে তাদের ইকালাহ শুদ্ধ হবে। কেননা, এক্ষেত্রে আটমনের মাঝে বিক্রয় এখনো বিদ্যমান। বিক্রয় বিদ্যমান থাকতে ইকালাহ করা সম্ভব। এমতাবস্থায় ক্রেতা আটমন গম ফেরত দেবে আর বিক্রেতা মূল্য বাবদ একশত ষাট টাকা ফেরত দিলে ইকালাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

আর যদি বিক্রয়টি **بَيْعٌ مَفَاضَةً** হয়ে থাকে। অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ দশ মন চাল বারো মন গমের বিনিময়ে বিক্রি করা হলো, তারপর দশ মন চাল কিংবা বারো মন গম বিনষ্ট হয়ে গেল, তারপর যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করার ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, “পণ্যের বিনিময়ে পণ্য” এ জাতীয় বিক্রয়ে উভয় বিনিময় বিক্রীত-পণ্য হয়ে থাকে, আবার উভয় বিনিময় মূল্য হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় যে পণ্যটি বিনষ্ট হয়েছে সেটাকে মূল্য নির্ধারণ করা হবে, আর যেটা বিদ্যমান আছে সেটাকে পণ্য ধরা হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিক্রীত-পণ্য বিদ্যমান থাকলে বিক্রয়চুক্তি বিদ্যমান থাকে। বিক্রয় বিদ্যমান থাকলে ইকালাহ করা শুদ্ধ ও বৈধ হয়। আর এ কারণেই আলোচ্য মাসআলায় ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি উভয় বিনিময় বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় নিঃশেষ হয়ে যাবে, ফলে ইকালাহ করার সুযোগ থাকবে না। তদ্রূপ যদি একটি পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর ইকালাহ করে তারপর পরস্পর হস্তান্তরের পূর্বেই আরেকটি পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলেও ইকালাহ বাতিল হবে।

## بَابُ الْمَرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

قَالَ : الْمَرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَه بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ، وَالتَّوْلِيَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَه بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ، وَالْبَيْعَانِ جَائِزَانِ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَايِطِ الْجَوَازِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى هَذَا التَّنَوُّعِ مِنَ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْغَيْبَ الَّذِي لَا يَهْتَدِي فِي التِّجَارَةِ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَتَعْتَمِدَ فِعْلَ الذِّكْرِ الْمُهْتَدِي، وَيَطِيبَ نَفْسَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ فَرَجَحَ الْقَوْلَ بِجَوَازِهِمَا، وَلِهَذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْأَمَانَةِ وَالْإِحْتِرَازِ عَنِ الْخِيَانَةِ وَعَنْ شُبُهَتَيْهَا، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ الْهَجْرَةَ ابْتِاعَ أَبُو بَكْرٍ (رض) بَعِيرَيْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْنِي أَحَدَهُمَا، فَقَالَ هُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا بِغَيْرِ ثَمَنِ فَلَا .

### পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিক্রয়

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের উপর হস্তান্তর করা। তাওলিয়া বলা হয়, প্রথম চুক্তির মাধ্যমে মালিকানায় অর্জিত বস্তুকে প্রথম মূল্যে বিনা লাভে হস্তান্তর করা। এ দুটি বিক্রয়ই জায়েজ হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাওয়ার কারণে বৈধ। এ জাতীয় বিক্রয়ের প্রয়োজনও রয়েছে। কেননা, বেচা-কেনা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয় এমন নির্বোধ ব্যক্তি বুদ্ধিমান চৌকস ব্যক্তির কাজের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন বোধ করে। আর বিক্রেতা যে মূল্যে খরিদ করেছে সে মূল্যে অথবা কিছু মুনাফা নিয়ে বিক্রয় করে নিজে সাধুনা লাভ করে। আর তাই উভয় প্রকারের বিক্রয় বৈধ হওয়ার দাবি রাখে। এ কারণেই দু বিক্রয়ের ভিত্তি হচ্ছে আমানতের উপর এবং খিয়ানত ও তার সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকার উপর। বিতুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ যখন হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) দুটি উট কিনলেন। মহানবী ﷺ তাকে বললেন, একটি উট আমাকে কেনা দামে [তাওলিয়া রূপে] দিয়ে দাও। তিনি বললেন, আপনি বিনামূল্যে তা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিনামূল্যে হলে নেব না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : ইতঃপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিক্রয়পণ্যের [مَبِيعٌ -এর] ভিত্তিতে নানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করা হয়েছে। চলমান পরিচ্ছেদে বিক্রয় মূল্যের [ثَمَنٌ -এর] সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করা হবে। আমরা দেখি অনেকে তাদের পণ্য জমিনে কিংবা কারখানায় উৎপাদন করে সেটাকে বাজারজাত করেন, সেটার মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে মালিক তার খরচ, বাজারে এর চাহিদা, তার মুনাফা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখেন, যেহেতু এ মালিক

পণ্যটি কারো কাছ থেকে ক্রয় করেনি তাই তার পূর্ব মূল্য বিবেচনা করার প্রশ্ন এখানে নেই। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী এমন রয়েছেন, যারা অন্যদের থেকে পণ্য কিনে সেটাকে বাজারজাত করেন অনেকে আবার পাইকারি খরিদ করে খুচরা বিক্রি করেন। অনেকে একস্থান থেকে পণ্য কিনে অন্যস্থানে, অন্যদেশে বিক্রি করেন। দ্বিতীয় প্রকারের বিক্রেতাদের পণ্য বিক্রয়ের সময় প্রথম মূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় থাকতে হয়। প্রথম মূল্যের বিবেচনায় বিক্রয় চার প্রকার—

১. **بَيْعُ مَرَابَحَةٍ** - প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে সেটাকে প্রথম মূল্যের উপর অতিরিক্ত মুনাফাসহ বিক্রি করা।
২. **بَيْعُ تَوْبَةِ** - প্রথম মূল্যের সমমূল্যে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত বস্তু বিক্রি করা।
৩. **بَيْعُ وَشْبَعَةٍ** - প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত বস্তুকে প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা।
৪. প্রথম মূল্যের উল্লেখ না করে দরদাম করে কোনো দ্রব্য বিক্রি করা।

উল্লেখ্য যে, মানুষ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কারবার করলেও কখনো পরিস্থিতির কারণে তাদের ক্রয়মূল্যের সমমূল্যে এমনকি কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি একটি দ্রব্য দশ টাকায় কিনেছেন বারো টাকায় বিক্রির জন্য। কিন্তু আপনার কেনার পর দাম পড়ে যাওয়ার কারণে সেটাকে দশ টাকায় বিক্রি করতে হতে পারে। আবার অনেক সময় আট টাকায়ও বিক্রি করতে হতে পারে। আর তাই তাওলিয়া ও ওযিয়া বিক্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। মোটকথা, এ চার প্রকার বিক্রয়মূল্যের সাথে সম্পর্কিত।

পূর্বাপরের পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে যেসব ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন এর সবই বিক্রয়পণ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আলোচ্য পরিচ্ছেদ **(بَابُ الْمَرَابَعَةِ وَالتَّوْبَةِ)** থেকে শুরু করে পরবর্তী পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদগুলো **(الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَالْبَيْعُ بِالتَّحْسِيَةِ)** বিক্রয়মূল্যের সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, বিক্রয়গুলোতে বিক্রয়পণ্য প্রধান ও আসল, তাই এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা প্রথমে আনা হয়েছে। আর বিক্রয়মূল্য অপ্রধান হওয়ার কারণে এর সাথে সম্পৃক্ত আলোচনা পরে আনা হয়েছে। তা ছাড়া এ পরিচ্ছেদে আলোচিত চারটি বিক্রয় শরিয়ত অনুমোদিত, আর এর পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত বিক্রয় অবৈধ ও নাজাজেজ, তাই এ পরিচ্ছেদের আলোচনা আগে আনা হয়েছে।

**قَوْلُهُ قَالَ : الْمَرَابَعَةُ نَقَلَ مَا مَلَكَكَ الْخ** : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিক্রয়ের সংজ্ঞা প্রদান করতঃ সেগুলোর বৈধতার দলিল দেওয়া হয়েছে।

**نَقَلَ مَا مَلَكَكَ بِالتَّعْقِدِ الْأَوَّلِ بِالتَّحْسِينِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ** -এর সংজ্ঞা :

অর্থঃ 'ক্রেতা প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে মালের মালিক হয়েছে তা প্রথম মূল্যের কিছু অতিরিক্ত লাভসহ বিক্রি করা।' যেমন—কোনো ব্যক্তি একটি দাসী দু-হাজার টাকার বিনিময়ে খরিদ করল। অন্য এক ব্যক্তি দাসীটি তার কাছ থেকে ক্রয় করতে চাইলে সে বলল, কিছু লাভ দিলে আমি বিক্রি করে দেব। তখন দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার কথায় বিশ্বাস করে দু-হাজার টাকার সাথে একশত টাকা অতিরিক্ত প্রদান করে দাসীটি নিয়ে নিল, তাহলে এটা মুরাবাহা বিক্রয় হলো।

**بَيْعُ تَوْبَةِ** -এর সংজ্ঞা : ইমাম কুদুরী (র.) -এর ভাষায় **تَوْبَةِ** বলা হয়—

**نَقَلَ مَا مَلَكَكَ بِالتَّعْقِدِ الْأَوَّلِ بِالتَّحْسِينِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ** .

অর্থঃ 'প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে মালের মালিকানা লাভ হয়েছে, সে মাল প্রথম মূল্যেই বিনা লাতে বিক্রি করে দেওয়া।' যেমন—এক হাজার টাকায় একটি ঘোড়া ক্রয় করে এক হাজার টাকায় সেটা বিক্রি করা। আদামা ইবনুল হুমায় মুরাবাহার সংজ্ঞার উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলোর জবাব দিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্ন : যদি কেউ দিরহামের বিনিময়ে দিনার ক্রয় করে, তারপর উক্ত দিনারকে মুরাবাহার মাধ্যমে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা তার জন্য বৈধ হবে না। অথচ এর মধ্যে মুরাবাহার সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তর : সংজ্ঞায় বর্ণিত প্রথম চুক্তি দ্বারা যে মালের মালিকানা অর্জিত হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন বস্তু, যা সুনির্দিষ্ট বা যাকে নির্দিষ্ট করা হয় এমনভাবে যাতে বিক্রীত-পণ্য চিহ্নিত হয়ে যায়। অথচ আপত্তি করা হয়েছে যে মাসআলার দ্বারা তাতে মুদ্রা বিনিময় করা হয়েছে। যেহেতু দিনার বা মুদ্রা নির্দিষ্ট করা যায় না, তাই এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : অপহরণ করা হয়েছে এমন গোলাম যদি অপহরণকারীর কাছ থেকে পলায়ন করে, অতঃপর বিচারক অপহরণকারীর উপর গোলামের বাজারমূল্য প্রদান আবশ্যিক করে এবং অপহরণকারী তা পরিশোধ করে দেয়, তারপর সেই পালিয়ে যাওয়া দাসটি ফিরে আসে, তাহলে অপহরণকারী দাসটিকে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবেন। এ মাসআলায় প্রথম কোনো বিক্রয়চুক্তি না হওয়া এবং প্রথম মূল্য না থাকা সত্ত্বেও মুরাবাহা বিক্রি বৈধ করা হয়েছে। অথচ مُرَابَعَةٌ -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মাল প্রথম মূল্যের সাথে কিছু লাভসহ বিক্রি করা। এমনভাবে কেউ যদি দান, উত্তরাধিকার ও অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো কিছুর মালিকানা লাভ করে তারপর তার মূল্য নির্ধারণ করে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করে, তাহলে তা জায়েজ হবে- অথচ এগুলোর মধ্যেও তো কিভাবে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুপস্থিত?

উত্তর : অপহরণ আর্থিক লেন-দেনের অন্তর্ভুক্ত। এতে যেহেতু বিচারক কর্তৃক বাজারমূল্য অপহরণকারীর উপর আরোপ করা হয়, তাই এটা ধার্যমূল্যের মতোই। অথবা বলা যায় অপহরণে প্রাথমিক অবস্থায় এটা চুক্তি না হলেও পরবর্তীতে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে এটা চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। আর সংজ্ঞায় বর্ণিত চুক্তি দ্বারা প্রাথমিক অবস্থার চুক্তি এবং পরবর্তী অবস্থার চুক্তি উভয়ই शामिल হবে। দান, উত্তরাধিকার ও অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে যে আপত্তি করা হয়েছে এর জবাব কিভাবে পরবর্তী ব্যান করা হবে। এর একটা জবাব হলো, সংজ্ঞায় বর্ণিত مَسْن [ধার্যমূল্য] দ্বারা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে মুরাবাহার মধ্যে প্রথম মূল্যের দ্বারা দ্বিতীয় চুক্তি করা হয় বলে مَسْن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ যে কোনো মাধ্যমে অর্জিত বস্তুকে তার প্রকৃত মূল্যের সাথে অতিরিক্ত লাভে বিক্রি করা। এ অর্থ করা হলে দান ইত্যাদির মাধ্যমে আরোপিত প্রশ্নটি থাকবে না।

লেখক বলেন, উভয় প্রকার [মুরাবাহা ও তাওলিয়া] বিক্রি বৈধ। কারণ, বিক্রয় বৈধতার জন্য যে সব শর্তাবলি প্রয়োজন হয় সবই এতে বিদ্যমান। যেমন- বিক্রয়পণ্য নির্দিষ্ট, মূল্য জানা আছে, কোনো ফাসিদ শর্ত নেই ইত্যাদি। তাছাড়া লোকজন এ ধরনের বিক্রয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ হতে আজ অবধি অভ্যস্ত। লোকজনের অভ্যস্ত হওয়া একটা দলিল। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলামান যাকে উত্তম মনে করে স্বেচ্ছায় হাতে তা উত্তম। বৈধতার দ্বিতীয় দলিল হলো, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন তীব্রভাবে বিদ্যমান। কেননা, অনেক নির্বোধ, বেচা-কেনা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বেচা-কেনা সম্পর্কে জানা শোনা আছে এমন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদের দ্বারস্থ হতে হয়। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে তাওলিয়া কিংবা মুরাবাহার ভিত্তিতে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে আর নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, অভিজ্ঞ লোকটি যে দামে দ্রব্যটি কিনেছে আমি তা সেই মূল্যেই কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশি মূল্যে খরিদ করলাম তাই আমার ঠকা হয়নি এবং আমি ক্রয়ে প্রভাবিত হয়নি। মোটকথা, যেহেতু এ জাতীয় বিক্রয়ে বৈধতার শর্তাবলি বিদ্যমান, লোকজন এতে অভ্যস্ত এবং প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে, তাই এর বৈধতার ব্যাপার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلِهَذَا كَانَ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمَانَةِ الخ : লেখক বলেন, যেহেতু সাধারণ লোকজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের উপর ভরসা করে, তাই মুরাবাহা ও তাওলিয়ার ভিত্তি হচ্ছে আমানতদারী ও ষিয়ানত না করার উপর। অর্থাৎ যে মুরাবাহা কিংবা তাওলিয়ার ভিত্তিতে বিক্রয় করবে সে বিশ্বস্ত হতে হবে এবং সে ষিয়ানত কিংবা ষিয়ানতের সদৃশ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে।

তাওলিয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে লেখক হাদীসের দলিল পেশ করেন। হাদীস-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ الْهَجْرَةَ ابْتِاعَ أَبُو بَكْرٍ بِعِشْرَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَرَبَّنَا أَخَذَكُمَا فَقَالَ مَوْلَاكَ بِمِغِيرٍ شُونَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَا بِمِغِيرٍ كُنْ قَلَا .

হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর বর্ণিত এ হাদীসটি গরীব। আব্বাসা যায়লায়ী (র.) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, লেখকের বর্ণিত হাদীসটি আমি কোথাও পাইনি।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি দুর্বল হলেও তাওলিয়া প্রমাণের জন্য সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন—

أَخْرَجَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
التَّوَلَّيْتُ وَالْإِنَاءَةَ وَالشِّرْكََةَ سَوَاءً .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাওলিয়া, ইকালাহ ও শিরকাত একই পর্যায়ে, অর্থাৎ জায়েজ। হাদীসটি মুরসাল বটে। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের মুরসাল হাদীসশাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য দলিল।

দ্বিতীয় দলিল হলো—

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رِيْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا مُسْتَفِضًّا بِالْمَدِينَةِ قَالَ مَنِ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى  
يَفِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ أَوْ يَبْرُكَبَهُ أَوْ يَفِئِلَهُ .

এ হাদীস দ্বারাও তাওলিয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

লেখক হযরত আবু বকর (রা.) -এর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

হাদীসে নিম্নোক্ত কথাগুলো রয়েছে—

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُذْ بِأَيِّ أَنْتَ وَأَمْسِي إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ فَقَالَ بِالنَّعْمَيْنِ قَالَ ﷺ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالنَّعْمَيْنِ .  
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ اشْتَرَاهَا

তাবাকাত্তে ইবনে সা'দ গ্রন্থে রয়েছে— بِشِمَانِيَّةٍ دَرَاهِمٍ مِنْ نَعَمِ بَنِي قَسِيْرٍ فَأَخَذَ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ الْفَصْرَاءُ .

উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.) -এর সাথে যে তাওলিয়া করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

সুতরাং হিদায়া গ্রন্থকার (র.) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার অর্থ ও মতলব প্রমাণিত, যদিও হাদীসটি শাদ্বিকভাবে গরীব।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বহুবার বলেছেন, আবু বকরের মাল দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি, তিনি আরও বলেছেন যে, যাদের মালামাল দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি তাদের সকলের বদলা দিয়েছি, তবে আবু বকর (রা.) -এর অনুগ্রহ এখনও পরিশোধ করতে সক্ষম হইনি। হাদীস দুটি দ্বারা এটা মনে হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর (রা.) থেকে দিরহামের মূল্যে উটটি কেন কিনতে চাইলেন? এর উত্তর হলো, হিজরত একটি বিশেষ ইবাদত ও আদ্বাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল। ইবাদতের মধ্যে শরিক নেওয়া অনুচিত। যেমন— আমরা দেখতে পাই অজু ইত্যাদির মধ্যে অন্যের সাহায্য নেওয়া মাকরুহ। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনামূল্যে উট গ্রহণ করে উপকৃত হতে চাননি।

قَالَ : وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَالْتَوَلِّيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْعَوَضُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ لَوْ مَلَكَهُ مَلَكَهُ بِالْقِيَمَةِ ، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مُرَابَحَةً مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْبَدَلُ وَقَدْ بَاعَهُ بِرَبْحٍ دَرَاهِمَ أَوْ بَشَى مِنَ الْمَكِينِلِ مُؤَخَّرٍ جَارٍ ، لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا التَزَمَ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِرَبْحٍ دَهْ يَزَادُهُ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيَبْعُضُ قِيَمَتِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, সাদৃশ্য আছে এমন বিনিময় মূল্য ছাড়া মুরাবাহা ও তাওলিয়া করা বৈধ নয়। কেননা, যদি এর কোনো সদৃশবস্তু না থাকে, তাহলে যদি [মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মাধ্যমে কেউ কোনো জিনিসের] মালিক হতে চায় তবে সে বাজারমূল্যে মালিক হবে। অথচ বাজারমূল্য অজ্ঞাত। যদি ক্রেতা প্রথম চুক্তি দ্বারা মালিক হয়েছিল এমন বস্তুকে মুরাবাহার ভিত্তিতে এমন লোকের কাছে বিক্রি করে যে সেই বিনিময়মূল্যের মালিক, এমতাবস্থায় যদি সে বস্তুটি এক দিরহাম অথবা পাত্র দিয়ে মাপা যায় এমন নির্দিষ্ট বস্তুর মুনাফাতে বিক্রি করে, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা, সে [দ্বিতীয় ক্রেতা] তার উপর [মূল্যরূপে] যা প্রদান করা আবশ্যিক তা দিতে সক্ষম। আর যদি দশে কিনে এগারতে বিক্রি করে, তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ, যেহেতু বিনিময়মূল্য সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তাই সে মূল মূল্য এবং এর অংশবিশেষকে বাজারমূল্যের মাধ্যমে [যেন] বিক্রি করল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْغ : إِنْهُ : قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ الْخ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে প্রচলিত দ্রব্যাদি দু'ধরনের—

১. ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ অর্থাৎ এমন দ্রব্যাদি যার সাদৃশ্য আছে, যেমন পাত্র দিয়ে কিংবা ওজন দিয়ে পরিমাপ করা যায় যে সব বস্তু যেমন— গম, যব, স্বর্ণ ইত্যাদি।
২. ذَوَاتِ الْغَيْبِ এমন বস্তুসমূহ যার সাদৃশ্য নেই; বরং বাজারমূল্য দ্বারা এর সাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়। যেমন— কাপড়, জুতু—ক্রীতদাস ইত্যাদি।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুরাবাহা ও তাওলিয়া তখনই জায়েজ হবে, যখন এর মূল্য ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ থেকে হবে। যদি মুরাবাহা ও তাওলিয়ার প্রথম মূল্য ذَوَاتِ الْغَيْبِ জাতীয় বস্তু হয়, তাহলে মুরাবাহা ও তাওলিয়া করা বৈধ হবে না। মাসআলার দলিল ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, তাওলিয়া ও মুরাবাহার ভিত্তি খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার উপর। মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মূল্য যদি ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ হয়, তাহলে খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে দূরে থাকা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ দশ হাজার টাকায় একটি দাস ক্রয় করে অন্যের কাছে দশ হাজার টাকায় এগার হাজার টাকায় বিক্রি করে তাওলিয়া বা মুরাবাহার ভিত্তিতে, তাহলে এতে খিয়ানত বা খিয়ানতের সন্দেহ থাকতে পারে না। আর খিয়ানত বা এর সন্দেহ না থাকার কারণ হলো, এর মূল্য টাকা বা মুদ্রা, যা ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ-এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যদি মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মূল্য ذَوَاتِ الْغَيْبِ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে এতে যদিও খিয়ানত হবে না, কিন্তু খিয়ানতের সন্দেহ ঠিকই থেকে যাবে। উদাহরণস্বরূপ যেমন— একটি দাস দুটি ঘোড়ার বিনিময়ে ক্রয় করল। তারপর সেই দাসটিকে মুরাবাহা কিংবা তাওলিয়ার ভিত্তিতে বিক্রি করল। এখন দ্বিতীয় ক্রেতা ঘোড়ার মূল্য অনুমান করে পরিশোধ করবে, কারণ সে ঘোড়া দুটিকে মূল্যরূপে দিতে পারবে না। এমনকি সে ঘোড়া দুটির অনুরূপ ঘোড়াও দিতে পারবে না। সরাসরি ঘোড়া দুটি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঘোড়া দুটির মালিক সে নয়। বর্তমান মালিক হচ্ছে প্রথম বিক্রেতা। ঘোড়ার অনুরূপ বা সদৃশ কোনো কিছু দেওয়াও সম্ভব নয়, কারণ ঘোড়া হচ্ছে ذَوَاتِ الْغَيْبِ-এর অন্তর্গত। এমতাবস্থায় ঘোড়ার বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। অথচ ঘোড়ার প্রকৃত মূল্য জানা নেই। কেননা, যখন কোনো দ্রব্যের বাজারমূল্য ধরা হয় তখন অনুমান করে মূল্য ধরা হয়। সুনিশ্চিতভাবে মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কিছু করা হলে এতে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। শতভাগ ভুলমুক্ত হওয়া যায় না। এর ফলে

বাদিও **ذَوَاتُ النِّسَمِ** -এর মধ্যে ষিয়ানত হয়েছে প্রকাশ্যভাবে বলা যায় না, কিন্তু প্রয়োক্তভাবে এতে ষিয়ানতের সন্দেহ ঠিকই রয়ে যায়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুরাব্বাহা ও তাওলিয়াতে ষিয়ানত ও ষিয়ানতের সন্দেহ কোনোটাই না থাকতে হবে যেহেতু মুরাব্বাহা ও তাওলিয়ার মূল্য **ذَوَاتُ النِّسَمِ** থেকে হলে ষিয়ানতের সন্দেহ থাকে, তাই মূল্য **ذَوَاتُ النِّসَمِ** জাতীয় দ্রব্য না হওয়া আবশ্যক। একন্যই ইমাম কুদুরী (র.) বলেছেন, মূল্য **ذَوَاتُ الْأَنْشَالِ** জাতীয় না হলে মুরাব্বাহা ও তাওলিয়া শুদ্ধ হবেনা : **قَوْلُهُ لَوْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ الْخ** : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ বাক্য দ্বারা মুরাব্বাহা ও তাওলিয়ার মূল্য **ذَوَاتُ الْأَنْشَالِ** থেকে না হলে কি সমস্যা হবে তা বর্ণনা করেছেন। যা একটু আগে আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। এরপর ইমাম কুদুরী (র.) মূল্য **ذَوَاتُ الْأَنْشَالِ** না হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো অবস্থায় যে মুরাব্বাহা/তাওলিয়া শুদ্ধ হয় তার বর্ণনা দেন। সেই সূরত হলো, এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাস কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করল। তারপর কাপড়টি বিক্রেতার থেকে অন্য এক ব্যক্তি কোনোভাবে পেয়ে গেল এমতাবস্থায় ক্রীতদাসের ক্রেতা যদি বর্তমান কাপড়ের মালিকের কাছে ক্রীতদাসটি মুরাব্বাহা কিংবা তাওলিয়ার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে।

মুরাবাহার সুরত এমন হবে যে, গোলামটি উক্ত কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করবে সেই সাথে নির্দিষ্ট লাভ নেবে। আর যদি শুধুমাত্র কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে- মুনাফা গ্রহণ না করে, তাহলে তাওলিয়া হবে। মোটকথা, যার কাছে তাওলিয়া/মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চায় তার কাছে প্রথম মূল্য বিদ্যমান থাকলে মূল্য **ذَوَاتُ الْغَيْبِ** জাতীয় হলেও মুরাবাহা/তাওলিয়া বৈধ। কেননা, এখানে দ্বিতীয় ক্রেতা সেই মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম, যা সে নিজের উপর আবশ্যক করেছে। অর্থাৎ প্রথম বিক্রয়ে ক্রীতদাসের যে মূল্য [কাপড়] ছিল তা দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা [দ্বিতীয় বিক্রেতা]-কে দিতে সক্ষম। প্রথম মূল্য প্রদান করা হবে বিয়ানত/বিয়ানতের সন্দেহ কোনোটাই হবে না। আর এজন্যই প্রথম মূল্য **ذَوَاتُ الْغَيْبِ** হওয়া সত্ত্বেও তাওলিয়া/মুরাবাহা বিক্রয় বৈধ।

এ মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলাটির সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্বের মাসআলাটিতে  
 প্রথম মূল্য **رَوَاتُ الْفَيْمِ** জাতীয় ছিল, এ মাসআলাতেও প্রথম মূল্য **رَوَاتُ الْفَيْمِ** -এর অন্তর্গত। পূর্বের মাসআলায় প্রথম  
 মূল্যের উপর অতিরিক্ত লাভ নির্দিষ্ট ও প্রথম মূল্য থেকে ভিন্ন ছিল কিন্তু এখানে তা নয়।

মাসজালার স্বরূপ : এক ব্যক্তি ক্রীতদাস বিশেষ কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করল। এরপর বিক্রেতার হাত থেকে কাপড়টি [প্রথম মূল্য] তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। তারপর প্রথম ক্রেতা ক্রীতদাসটিকে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করল। লাভ নির্ধারণ করল দশে এগারকে অথবা শতকরা ১০% -কে। দশে এগার বা শতকরা ১০% -এর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম মূল্য যদি দশ দিরহাম হয় তাহলে মুনাফা এক দিরহাম, যদি প্রথম মূল্য বিশ দিরহাম হয় তাহলে মুনাফা দুই দিরহাম, প্রথম মূল্য ত্রিশ দিরহাম হলে মুনাফা তিন দিরহাম। এভাবে প্রথম মূল্য একশত দিরহাম হলে মুনাফা দশ দিরহাম। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এ প্রক্রিয়ায় মুনাফাফ শর্ত করা হলে মুরাবাহা বিক্রয় মাজারেজ হবে।

নাভ্যোজ্জের দলিল হলো, দশে এগার অথবা ১০% মুনাফার অর্থ হচ্ছে মুনাফা প্রথম মূল্যের শ্রেণীগত হতে হবে। কারণ, মুনাফা এখানে প্রথম মূল্যের দশের এক  $\frac{১}{১০}$ । কোনো বস্তুর  $\frac{১}{১০}$  দশভাগের একভাগ সেই বস্তু থেকেই হবে। আলোচ্য মাসআলায় প্রথম মূল্য ذَوَاتُ الْبَيْعِ জাতীয়, ذَوَاتُ الْأَمْتَالِ জাতীয় নয়। এখন প্রথম মূল্যের দশ ভাগের একভাগ  $\frac{১}{১০}$  বের করতে হলে কাপড়ের বাজারমূল্য বের করতে হবে। অথচ কাপড়ের বাজারমূল্য অজ্ঞাত। এখন বাজারমূল্য অনুমানের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে। অনুমানের ভিত্তিতে বাজারমূল্য নির্ণয় করা হলে এতে খিয়ানত না হলেও খিয়ানতের সন্দেহ অবশ্যই হয়। অথচ ইতঃপূর্বে মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানত এবং খিয়ানতের সন্দেহ কোনোটাই না থাকতে হবে। আর খিয়ানত/খিয়ানতের সন্দেহ থাকলে মুরাবাহা ও তাওলিয়া অবৈধ। সে মতে এখানে খিয়ানতের সন্দেহ থাকার কারণে মুরাবাহা বিক্রি অবৈধ।

উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় মুনাফা যেহেতু প্রথম মূল্য তথা (ذَوَاتُ الْقَيْمِ) -এর বাজারমূল্য থেকে ধরা হচ্ছে, তাই লেখক বলেছেন- **بَاعَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِغَضِّ قَيْمِهِ**

আল্লামা ইবনুল হুযায়ম (র.) ভাষ্যগ্রহণে কাত্তুল কাদীর-এ লিখেন যে, মুরাব্বাহর মধ্যে মূল্যরূপে যা সাব্যস্ত হয় বা ধার্য হয়, তাই **رَأْسُ الْمَالِ** বা প্রথম মূল্য। ক্রেতা মূল্যরূপে এর পরিবর্তে যা প্রদান করেছে তা বিবেচ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথম মূল্য ধার্য হলো দশ দিরহাম। ক্রেতা দশ দিরহাম না দিয়ে এর পরিবর্তে এক দিনার অথবা এমন এক বস্ত্র দিল যার মূল্য দশ দিরহাম, অথবা দশ দিরহামের কম/ বেশি দিল, তাহলে প্রথম মূল্য বা **رَأْسُ الْمَالِ** হবে দশ দিরহাম- এক দিনার কিংবা কাপড় নয়।



وَيَجُوزُ أَنْ يُضَيَّفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالطَّرَازِ وَالصَّنْبِغِ وَالْفَتْلِ وَأَجْرَةُ حَمَلِ  
الطَّعَامِ، لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِالْحَقِّ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِرَأْسِ الْمَالِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ وَلَئِنْ كُنَّ  
مَا يَزِيدُ فِي الْمَيْبِغِ أَوْ فِي قِيَمَتِهِ يَلْحَقُ بِهِ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَمَا عَدَدْنَاهُ بِهِذِهِ  
الْصِّفَةِ، لِأَنَّ الصَّنْبِغَ وَأَخْوَاتِهِ يَزِيدُ فِي الْعَيْنِ، وَالْحَمْلُ يَزِيدُ فِي الْقِيَمَةِ، إِذَا الْقِيَمَةُ  
تَخْتَلَفُ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَى بَكْذَا، وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ بِكْذَا كَيْلًا  
يَكُونُ كَاذِبًا، وَسَوْقُ الْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْحَمْلِ، بِخِلَافِ أَجْرَةِ الرَّاعِي وَكَرَاءِ بَيْتِ  
الْحِفْظِ، لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي الْعَيْنِ وَالْمَعْنَى، وَبِخِلَافِ أَجْرَةِ التَّغْلِيمِ، لِأَنَّ ثُبُوتَ الزِّيَادَةِ  
لِمَعْنَى فِيهِ، وَهُوَ حَدَاقَتُهُ.

অনুবাদ : মূল মূল্যের সাথে ধোবী, নকশাকারী, রঙ ও ঝালর লাগানোর মজুরি (পারিশ্রমিক), আর খাবার বহনের মজুরি যোগ করা জায়েজ। কেননা, মূল মূল্যের সাথে এসব মজুরি যোগ করা ব্যবসায়ীদের রীতিতে প্রচলিত। তাছাড়া এ কারণে যে, যা বিক্রীত দ্রব্যের অথবা তার মূল্যের মাঝে বৃদ্ধি ঘটায় তা মূল্যের সাথে যুক্ত হয়। এটাই নীতি। আর আমরা যা উল্লেখ করলাম এগুলো এই গুণসম্পন্ন। কেননা, রঙ এবং এ জাতীয় বিষয়গুলো [বিক্রীত পণ্যের] মূল সত্তাতে বৃদ্ধি ঘটায় আর পরিবহন মূল্য বৃদ্ধি করে। কেননা, স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে : আর সে বলবে, আমার এত পড়ুতা পড়েছে। সে একথা বলবে না যে, আমি এত দ্বারা খরিদ করেছি। যাতে সে মিথ্যাবাদী না হয়। বকরির পাল হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া [-এর খরচ] পণ্য বহন করার [খরচের] সমতুল্য। তবে রাখালের মজুরি এবং পণ্য সংরক্ষণের গুদামের খরচ এর থেকে ভিন্ন। কেননা, এগুলো না পণ্যের সত্তার মাঝে বৃদ্ধি ঘটায়, না মূল্য বৃদ্ধি করে। আর গোলামের প্রশিক্ষণের মজুরিও এর ব্যতিক্রম। কেননা, তার মূল্য বৃদ্ধি পায় তারই অভ্যন্তরীণ গুণের কারণে। সে গুণটি হলো দক্ষতা ও পারদর্শিতা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُضَيَّفَ إِلَى رَأْسِ الْخ : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা ও তাওলিয়া চুক্তি করার পূর্বে প্রথম চুক্তির পর বিক্রয়পণ্যের স্বার্থে যেসব খরচ করা হয় তা প্রথম মূল্যের সাথে যোগ করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।  
الْقَصَّارِ - শব্দের অর্থ - ধোবি, রজক। أَجْرَةُ الْقَصَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য ধোবির মজুরি অথবা ধোলাই খরচ।  
الطَّرَازِ - নকশা ও কালাকাজকারী, বুটিক ও এমব্রয়ডারি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। الصَّنْبِغُ - রঙ করা, ডায়িং করা ইত্যাদি। الْفَتْلُ - রশি ইত্যাদি পেঁচানো, পাড়/ঝালর তৈরি করা। حَمْلُ الطَّعَامِ - খাদ্য জাতীয় বস্তু একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহন করা।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুরাবাহা ও তাওলিয়া রূপে কোনো দ্রব্য বিক্রি করার সময় দ্রব্যের প্রথম মূল্যের সাথে ধোবির মজুরি বা ধোলাই খরচ যোগ করা বৈধ। যেমন- কোনো ব্যক্তি দশ পিস শাড়ি কিনল এক হাজার টাকায়, তারপর ধোলাই খরচ হলো

বিশ টাকা। এমতাবস্থায় ক্রেতা প্রতি পিস শাড়ি একশত দুই টাকা মূল্য ধরে কিছু মুনাফা নিয়ে মুরাবাহা হিসেবে অথবা মুনাফা ছাড়া তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করতে পারে। এমনিভাবে কাপড়ে কারুকাজ করে, নকশা করে অথবা এমব্রয়ডারি করে তার মজুরি মূল মূল্যের সাথে যোগ করা যেতে পারে।

অদ্রুপ কেউ যদি সাদা কাপড় খরিদ করে লাল/কালো ইত্যাদি রঙ করে, তাহলে তার জন্য উক্ত রঙের দাম ও মজুরি যোগ করত মুরাবাহা ও তাওলিয়াকারে বিক্রি করা বৈধ।

অদ্রুপ কাপড়ে ঝালর/ পাড় ও বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত লেস লাগিয়ে তার মজুরি মূল মূল্যের সাথে যোগ করে মুরাবাহা/ তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করা জায়েজ।

উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি একটি শাড়ি অথবা চাদর একশত টাকায় কিনে বিশ টাকার ঝালর লাগাল, তারপর উক্ত চাদর/ শাড়ির মূল্য একশত বিশ টাকা ধরে এর উপর কিছু মুনাফা নিয়ে মুরাবাহা হিসেবে অথবা মুনাফা ছাড়া একশত বিশ টাকাতেই তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করতে পারে।

অদ্রুপ কোনো ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য/ শয্যা ইত্যাদি ক্রয় করে বিক্রির জন্য ভিন্নস্থানে নিয়ে গেল। স্থানান্তর করতে তার যে পরিবহন খরচ ইত্যাদি হয়েছে মূল মূল্যের সাথে যোগ করে তার উপর মুরাবাহা/ তাওলিয়াকারে বিক্রি করতে পারবে। যেমন- এক ব্যক্তি একশত টাকায় গাজীপুর থেকে দশটি কাঠাল ক্রয় করে বেচার জন্য ঢাকায় নিয়ে গেল। পরিবহন বাবদ তার খরচ হলো দশ টাকা। এখন সে প্রতি কাঠাল মূল মূল্য ১০+১ [পরিবহন খরচ] = ১১/= মোটমূল্য ধরে এর উপর কিছু মুনাফা গ্রহণ করে মুরাবাহা হিসেবে অথবা মুনাফা ছাড়া এগার টাকাতেই তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করতে পারে। এরূপ অতিরিক্ত খরচ/ মজুরি যোগ করে বিক্রি জায়েজ।

**প্রথম দলিল :** ব্যবসায়ীরা তাদের সাধারণ নীতি অনুসারে এসব খরচকে মূল মূল্যের সাথে যোগ করেন এবং এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয়পণ্যের দাম ধরেন। সাধারণ রেওয়াজ-রীতি শরিয়তের একটি দলিল। শরিয়তের পরিভাষায় একে تَعَامُلُ النَّاسِ ও عُرَى বলা হয়। সুতরাং عُرَى অনুসারে এসব খরচ / মজুরিকে মূল মূল্যের সাথে যোগ করা হবে।

**দ্বিতীয় দলিল :** ফিকহশাস্ত্রের একটি মূলনীতি হলো, ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে বস্তু মূল পণ্যের মাঝে সত্তাগতভাবে অথবা মূল্যের দিক থেকে বৃদ্ধি ঘটায় সেই বস্তুকে মূল মূল্যের সাথে সংযুক্ত করা বৈধ। আলোচ্য মাসআলায় যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হলো- এর সবই হয়তো পণ্যের মাঝে বৃদ্ধি ঘটাবে কিংবা মূল্যের ক্ষেত্রে দর বৃদ্ধি করছে। যেমন- রঙ করা, কারুকাজ, নকশা-ডিজাইন ও ঝালর কাপড়ের সত্যকে বৃদ্ধি করছে। কাপড় ধোলাই করা ও আয়রণ করার দ্বারা এর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, অদ্রুপ খাদ্যদ্রব্য, শয্যা ইত্যাদি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়ার দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, স্থানের পরিবর্তনে পণ্যের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়।

উদাহরণস্বরূপ ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেশী মুরগির ডিমের হালি ৮/১০ টাকা, কিন্তু ঢাকাতে সেই একই ডিমের হালি ১৫/১৬ টাকা। লেখকের দলিল “স্থানের পরিবর্তনের কারণে মূল্যের পরিবর্তন হয়” অর্থাৎ মূল্য বাড়ে, এ কথার উপর আশরাফুল হিদায়ার লেখক আপত্তি তুলে বলেন, কখনো তো স্থান পরিবর্তন করার কারণে দাম কমে, অর্থাৎ এক জায়গার উপাদিত পণ্য সেখানে যে দাম রয়েছে অন্যত্র এর চেয়ে কম দাম হতে পারে। সুতরাং অন্যত্র পণ্য বহন করে নেওয়ার দ্বারা দাম তো কমও হতে পারে। অতএব এটা দলিল হিসেবে তেমন যুতসই নয়।

এর জবাবে বলা যায় যে, মানুষ মালামাল স্থানান্তর করে কম মূল্য পাওয়ার আশায় নয়; বরং বেশি মূল্য পাওয়ার আশায় এবং স্থানান্তরের দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যদি কেউ মূল্য কম পায়, তাহলে বলতে হবে সে পরিস্থিতির শিকার কিংবা সে পলিসিগত ভুল করেছে। মূল্য বেশি না পেলে কোনো নির্বোধ ব্যবসায়ীও জেনেওনে এক জায়গা থেকে অন্যত্র মাল স্থানান্তর করবে না। সুতরাং এ মূলনীতিই ঠিক যে, ব্যবসায়ীদের মাল স্থানান্তরের দ্বারা এবং পরিবহন খরচ যুক্ত হওয়ার দ্বারা পণ্যের মূল্য বাড়ে। যে ক্ষেত্রে বাড়ে না, সেটা হচ্ছে নিছক দুর্ঘটনা। আর দুর্ঘটনা এবং বিপরীত পরিস্থিতির কারণে মূলনীতির পরিবর্তন হয় না এবং সেই মূলনীতি দলিলের অযোগ্যও হয় না।

قَوْلُهُ وَتَقُولُ قَامَ عَلَيَّ يَكْنَى الخ : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বের মাসআলার উপসংহার টানা হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, মূল মূল্যের সাথে ধোলাই খরচ, কারুকাঙ্ককারীর মজুরি ইত্যাদি যুক্ত করা জায়েজ। এখানে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যবসায়ী উপরিউক্ত বিষয়গুলো মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করবে সে তার ক্রেতাকে প্রথম মূল্য বলার সময় বলবে, আমার এত পড়তা পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ সে কাপড় কিনেছিল ত্রিশ টাকায়, রঙ খরচ হয়েছে পাঁচ টাকা : ৩০ + ৫ = ৩৫ টাকা। সে তার ক্রেতাকে বলবে, কাপড়টিতে আমার ৩৫ টাকা পড়তা পড়েছে। তাহলে একথাটি সত্য হলো। কারণ, প্রকৃতই ৩৫ টাকা পড়তা পড়েছে, সে একথা বলবে না যে, আমি পঁয়ত্রিশ টাকায় কাপড় খরিদ করেছি। কারণ, এটা মিথ্যা হবে। কেননা, সে আদৌ পঁয়ত্রিশ টাকায় কাপড় কিনেনি। আর মিথ্যা বলা হারাম।

মাবসূত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের একটি ভিন্ন মাসআলা বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য একশত টাকায় খরিদ করল, তারপর সে দ্রব্যটির গায়ে মূল্য লিখল একশত বিশ টাকা, অতঃপর সে গায়ের দামের উপর মুরাবাহা বিক্রি করল। উদাহরণস্বরূপ প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতাকে বলল, কাপড়ের গায়ে যে দাম লেখা আছে তার উপর দশ টাকা লাভে [১২০ + ১০] = ১৩০ টাকায় বিক্রি করব। এ ধরনের বিক্রি জায়েজ, তবে এ অবস্থায় বিক্রেতা একথা বলবে না যে, আমার পড়তা পড়েছে একশত ত্রিশ টাকা বা আমি একশত বিশ টাকায় খরিদ করেছি। কারণ, উভয় কথাই মিথ্যা।

মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকার, দান-সদকা ও অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো পণ্যের মালিক হয়, তারপর এর মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত মূল্যের উপর মুরাবাহা বিক্রি করতে চাইলে তা সে করতে পারে। আর এটা মুরাবাহার একটি বৈধ পদ্ধতি বলে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَسَوَوْكَ الْغَنِيمَ سَبْرَئِيلَ الْحَسَلِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বকরি, গরু, ভেড়া ইত্যাদি স্থানান্তরে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি খাদ্য বহন করার মতো, অর্থাৎ খাদ্য বহন করে অন্যস্থানে নিয়ে বিক্রির সময় মূল মূল্যের সাথে যেমনিভাবে বহন খরচ যোগ করা যায়, তেমনি করে গরু একস্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার পথে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া বাবদ যে খরচ হয় তা মূল মূল্যের সাথে যোগ করে তার উপর মুনাফা নিয়ে মুরাবাহা রূপে বিক্রি করা যায়।

তবে পশু চরানো বাবদ রাখালের মজুরি এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নেওয়া মালামাল রাখবার গুদামঘরের ভাড়া মূল মূল্যের সাথে যোগ করা যাবে না। কেননা, রাখালের মজুরি ও গুদাম ঘরের ভাড়া পণ্যের সন্তাপ্ত বা গুণগত পরিবর্তন সাধন করে না।

قَوْلُهُ وَيَخْلِبُ أَجْرَ التَّغْلِيمِ الخ : লেখক বলেন, দাস/দাসীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষাদানের মজুরি রাখালের মজুরির মতো। অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মজুরি মূল মূল্যের সাথে যোগ করা যায় না। কেননা, শিক্ষাদানের কারণে যে দাস/দাসীর মূল্য বৃদ্ধি পায় তাতো দাস/দাসীর মাঝে বিদ্যমান দক্ষতা ও পারদর্শিতার গুণের কারণে। শুধু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কারণে এখানে মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। তাই শিক্ষা দানের খরচ মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করা হবে না। মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই মাঝে যেহেতু শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা নেই, এজন্য তাদের মাঝে শিক্ষা কোনো কাজে আসে না।

বর্তমান যুগে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সমধিক। শিক্ষাহীন মূর্খ মানুষ ও শিক্ষিত মানুষের মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। প্রশিক্ষণহীন একজন শ্রমিক প্রশিক্ষণহীন শ্রমিক থেকে তিনগুণ বেশি কাজ করে। তাছাড়া আমরা বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে রয়েছি। কারও যত মেধা ও দক্ষতা থাকুক না কেন প্রশিক্ষণ না থাকলে সে কোনো যন্ত্র চালাতে পারবে না। এসব বিবেচনা করে বর্তমান যুগে প্রশিক্ষণ খরচ মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করাই অধিক সমীচীন। তাছাড়া ফাভাওয়ার গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো সমাজে এরূপ প্রশিক্ষণের খরচ যোগ করার রীতি থাকে, তাহলে এতে প্রশিক্ষণ খরচ যোগ করতে কোনো সমস্যা নেই। আজকাল তো পশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হচ্ছে। যেমন- কুকুরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসামী ধরা, বোমার অনুসন্ধান চালান এবং দাস্তা নিয়ন্ত্রণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজ্ঞাম দেওয়া হচ্ছে। তাই কেউ পশুদের ক্রয় করার পর যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে মুরাবাহা বা ভাওলিয়ারূপে বিক্রি করতে চায়, তাহলে এতে প্রশিক্ষণ খরচ যোগ করা যাওয়ার কথা।

فَإِنْ أَطْلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ ابْنِ حَنِبَةَ رَحِمَهُ  
 اللَّهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَإِنْ أَطْلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ  
 اسْقَطَهَا مِنَ الثَّمَنِ، وَقَالَ أَبُو يُونُسَ (رح) يَحْطُ فِيهِمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يُخَيَّرُ  
 فِيهِمَا، لِمُحَمَّدٍ (رح) إِنْ الْإِعْتِبَارَ لِلتَّسْمِيَةِ لِكُونِهِ مَعْلُومًا، وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُرَابَحَةُ  
 تَرْوِجُ وَتَرْغِيبٌ، فَيَكُونُ وَصْفًا مَرْغُوبًا فِيهِ كَوْصِفِ السَّلَامَةِ، فَيَتَخَيَّرُ بَقَرَاتِهِ،  
 وَلَا يَلِيَّ يُونُسَ (رح) أَنْ الْأَصْلَ فِيهِ كَوْنُهُ تَوْلِيَةً وَمُرَابَحَةً، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ وَلَيْتَكَ  
 بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ يَغْتِكَ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا .

অনুবাদ : যদি ক্রেতা মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিক্রেতার কোনো খিয়ানতের ব্যাপারে অবগত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার ইচ্ছাধিকার [ইখতিয়ার] থাকবে। যদি সে ইচ্ছা করে পুরো মূল্য দিয়ে পণ্য নিবে। আর যদি চায় তা ছেড়ে দিবে। আর যদি সে তাওলিয়ার ক্ষেত্রে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে খিয়ানত পরিমাণ অর্থ মূল্য থেকে কেটে রাখবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত এই যে, মুরাবাহা ও তাওলিয়া উভয় ক্ষেত্রে মূল্য কম দিবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয়ের [মুরাবাহা ও তাওলিয়া] মাঝে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে— সেই মূল্যই গ্রহণযোগ্য যা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তা নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত। আর মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উল্লেখ সে তো মাল চালু করা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এটা হচ্ছে একটি কাক্ষিতগুণ। যেমন ক্রটিমুক্ত হওয়া একটি গুণ। সুতরাং গুণটির অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতা ইখতিয়ার লাভ করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো— এ জাতীয় বিক্রয়ে তাওলিয়া ও মুরাবাহা হওয়াটাই মূল। আর এজন্যই “আমি প্রথম মূল্যে তাওলিয়া করলাম” কিংবা “প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহা [কিছু মুনাফা নিয়ে] বিক্রয় করলাম” বলার দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়, যখন প্রথম মূল্য জ্ঞাত থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُتْمُهُ فَإِنْ أَطْلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ ابْنِ حَنِبَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা ও তাওলিয়া সম্পাদিত হওয়ার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে তাতে খিয়ানত হয়েছে বলে যদি কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহলে এর সমাধান কি হবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি একটি বস্তু মুরাবাহারূপে অন্যের কাছে বিক্রয় করল। উদাহরণস্বরূপ একটি গরু এই বলে বিক্রয় করল যে, গরুটি আমি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করেছি, এখন আমি পাঁচ হাজারের উপর এক হাজার টাকা মুনাফাতে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করছি। ক্রেতা বিক্রেতার উক্ত কথার উপর গরুটি ক্রয় করল। কিন্তু পরবর্তীতে সে জানতে পারল যে, বিক্রেতা গরুটি চার হাজার টাকায় ক্রয় করেছিল এবং আমার সাথে এক হাজার টাকা বাড়িয়ে বলে এক হাজার টাকা খিয়ানত করেছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, খিয়ানতের ব্যাপারটি কিভাবে জানা গেল বা প্রমাণিত হলো। এর জবাব হচ্ছে— খিয়ানত কয়েকভাবে প্রমাণিত হতে পারে—

১. বিক্রোতা বিক্রয়ের পর স্বেচ্ছায় স্বীকার করল যে, “আমি আসলে গরুটি চার হাজার টাকায় ক্রয় করেছিলাম”।
  ২. ক্রোতা বিক্রোতাকে চার হাজার টাকায় কিনতে দেখেছে এমন দর্শকদের থেকে জানতে পারল যে, বিক্রোতা গরুটি চার হাজার টাকায় কিনেছে। এরপর সে তাদের সাক্ষীরূপে পেশ করে বিষয়টি প্রমাণিত করল।
  ৩. ক্রোতা কোনো মাধ্যমে জানতে পারল যে, বিক্রোতা খিয়ানত করেছে। তারপর সে দাবি করল যে, বিক্রোতা খিয়ানত করেছে, কিন্তু ক্রোতা তার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ [সাক্ষী] পেশ করতে ব্যর্থ হলো। তারপর বিক্রোতাকে বলা হলো, আপনি শপথ করে বলুন যে, আপনি খিয়ানত করেননি। কিন্তু বিক্রোতা শপথ করে বলল না। তখনও খিয়ানত প্রমাণিত হয়ে যাবে।
- মোটকথা, এই তিন পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে খিয়ানত প্রমাণিত হতে পারে। যদি খিয়ানত প্রমাণিত হয় তাহলে কি বিধান হবে, এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী মাযহাবের প্রধান তিন ইমাম তিনটি পৃথক মত পোষণ করেন।

**ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত :** খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হওয়া বিক্রয়টি যদি মুরাবাহা হয় তাহলে ক্রোতার নিম্নের দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—

১. বিক্রয় পণ্যের মুনাফাসহ যে মূল্য চাওয়া হয়েছে তা দিয়ে পণ্য নিবে।
২. বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দিবে। উদাহরণস্বরূপ ছয় হাজার দিয়ে গরু নিবে অথবা গরু নিবেই না।

আর খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হওয়া বিক্রয়টি যদি তাওলিয়া হয় এবং খিয়ানত প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বিক্রোতা তার দাবি অভিমতে পাঁচ হাজার টাকায় গরু কিনে পাঁচ হাজারেই বিক্রি করেছে। অতঃপর প্রমাণিত হয় যে, বিক্রোতা আসলে চার হাজার টাকায় গরু কিনেছিল এবং এখানে বিক্রোতা এক হাজার টাকা খিয়ানত করেছে। এ মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে যদি ক্রোতা মূল্য পরিশোধ না করে থাকে তাহলে এক হাজার টাকা মূল্য কম দিবে। [৫০০০-১০০০ = ৪০০০] চার হাজার টাকা প্রদান করবে। আর যদি পুরোমূল্য [পাঁচ হাজার] পরিশোধ করে থাকে তাহলে বিক্রোতা থেকে এক হাজার টাকা ফেরত দিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

**ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত :** মুরাবাহা ও তাওলিয়া উভয় বিক্রির মধ্যে খিয়ানত প্রমাণিত হয়, তাহলে খিয়ানত পরিমাণ অংশ মূল্য পরিশোধ না করে থাকলে কম দিবে। পরিশোধ করে ফেললে ফেরত নিয়ে নিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এমনও একটি অভিমত রয়েছে। এবং বলা হয়ে থাকে এটাই তার সর্বশেষ অভিমত। ইমাম আহমদ ও ইবনে আবু লায়লার অভিমতও তাই।

**ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত :** মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উভয়টির মধ্যে যদি খিয়ানত সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে ক্রোতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। হয়তো উল্লিখিত পুরো মূল্য দিয়ে পণ্য গ্রহণ করবে অথবা বিক্রয় বাতিল করে দিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এরূপ একটি অভিমত রয়েছে।

**ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল :** তিনি বলেন, চুক্তির মধ্যে যে মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই গ্রহণযোগ্য এবং মূল বিষয়। উল্লিখিত মূল্যটি জ্ঞাত। আর মূল্য জ্ঞাত হওয়া বিক্রয়ের জন্য আবশ্যিক। যেহেতু মূল্য জ্ঞাত হওয়া যায় উল্লেখ করার দ্বারা তাই উল্লিখিত মূল্যই গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য। অতএব দ্বিতীয় চুক্তিটি ঐ মূল্যের সাথে সম্পূর্ণ হবে যা উল্লেখ করার দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে যে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য হলো— মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উল্লেখ অগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে করা হয়। সুতরাং এগুলো বিশেষ গুণ বিবেচিত হবে। যেমন বিক্রয় পণ্য ক্রেতামুখ হওয়া একটা গুণবিশেষ। ক্রেতামুখ হওয়া একটি অগ্রহ সৃষ্টিকারী গুণ। এ জাতীয় গুণ বিক্রয় পণ্যের মধ্যে না পাওয়া গেলে ক্রোতার ইচ্ছাধিকার প্রমাণিত হয়, সে ইচ্ছা করলে বিক্রয় বহাল রাখতে পারে, আবার বিক্রয় চুক্তি বাতিলও করতে পারে। কিন্তু সেই কাক্ষিক্ত গুণটি না পেলে মূল্য থেকে কোনো অংশ এর পরিবর্তে কাটা হবে না। ক্রোতা পুরো মূল্য প্রদান করে পণ্যটি গ্রহণ করতে হবে। এটি **خيار مبيع**-এর মতো **خيار عيب**-এর মধ্যে ক্রোতার এ ধরনের ইখতিয়ার অর্জিত হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি দোষমুক্তরূপে কোনো পণ্য ক্রয় করে, তারপর তাতে দোষ পায় তাহলে তার এই ইখতিয়ার অর্জিত হয় যে, সে ইচ্ছা করলে পণ্যটি নির্ধারিত পুরো মূল্য প্রদান করে গ্রহণ করবে অথবা

পণ্যটি নিবে না। মোটকথা, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ক্রেতা তাওলিয়া/মুরাবাহার মধ্যে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হলে তার পুরো মূল্য দিয়ে নেওয়ার কিংবা না নেওয়ার ইখতিয়ার অর্জিত হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল : মুরাবাহা ও তাওলিয়া উল্লেখ করে বিক্রয় করা হলে এতে তাওলিয়া বা মুরাবাহারূপে বিক্রয় সংঘটিত হয়। এখানে মূল্য উল্লেখ করার বিষয়টি মুখ্য বা ধর্তব্য নয়। যেহেতু এই চুক্তি তাওলিয়া/মুরাবাহা চুক্তি, তাই  $الْبَيْعُ بِالْمَقْنَنِ الْأَوَّلِ$ -এর দ্বারা তাওলিয়া ও  $الْبَيْعُ مَرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ$  বলার দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে; যদি মূল্য জানা থাকে। সুতরাং মূল্য সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আবশ্যকভাবে দ্বিতীয় চুক্তি প্রথম চুক্তির উপর নির্ভরশীল হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় চুক্তিটির ভিত্তি হবে প্রথম চুক্তি। মূল্যের বর্ধিতাংশ বা খিয়ানতকৃত অংশ যেহেতু প্রথম চুক্তির মাঝে অবিন্যাস্য তাই দ্বিতীয় চুক্তির মাঝে এটাকে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তিটিকে সংঘটিত করার জন্য প্রথম চুক্তির বর্ধিত মূল্যকে কর্তন করা আবশ্যিক। তবে কর্তন করার ক্ষেত্রে তাওলিয়া ও মুরাবাহার মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য থেকে কাটা যাবে। যেমন প্রথম চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল চার হাজারের উপর। কিন্তু বিক্রোতা দাবি করে পাঁচ হাজার; পরবর্তীতে যখন খিয়ানত সম্পর্কে জানা যাবে তখন উক্ত এক হাজার টাকা মূল মূল্য পাঁচ হাজার থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। এবং ক্রেতা-বিক্রেতাকে চার হাজার টাকা অর্পণ করবে। যদি ক্রেতা পাঁচ হাজার টাকা অর্পণ করে থাকে তাহলে বিক্রোতা থেকে এক হাজার ফেরত নিবে।

পক্ষান্তরে মুরাবাহার মধ্যে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হলে খিয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য এবং লভ্যাংশ উভয় থেকে কাটা যাবে। উদাহরণস্বরূপ মুরাবাহা চুক্তির মাঝে খিয়ানত হয়েছে এক হাজার টাকা। চার হাজার টাকার গুরু পাঁচ হাজার বলে বিক্রি করেছে। এবং পাঁচ হাজারের উপর লাভ নিয়েছে এক হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি হাজারে লাভ নিয়েছে ২০০ দশত টাকা।  $200 \times 5 = 1000$ । সুতরাং এখন খিয়ানতকৃত অংশ এক হাজার কাটা হবে মূল মূল্য  $4000 - 1000 = 3000$  থেকে। আর লভ্যাংশ থেকে পাঁচ ভাগের একভাগ কমাতে  $3000 - \frac{1}{5} = 2400$ । এখন দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতাকে প্রদান করবে মূল মূল্যরূপে চার হাজার আর লভ্যাংশরূপে আটশত টাকা। সর্বমোট  $8000 + 400 = 8400$  চার হাজার আটশত টাকা।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবু হানীফা (র.) খিয়ানতের ক্ষেত্রে তাওলিয়া ও মুরাবাহা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন। অথচ ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (র.) উভয়টির ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি অবলম্বন করেছেন। তাওলিয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বক্তব্য অনেকটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতো। তাওলিয়ার মূল্য হচ্ছে প্রথম চুক্তির মূল্য। সুতরাং যদি খিয়ানতকৃত [বর্ধিত] অংশ হ্রাস না করা হয় তাহলে এ চুক্তি তাওলিয়া হবে না। কেননা, তাওলিয়া চুক্তি প্রথম মূল্যের বিনিময়ে হয়ে থাকে। অথচ এখানে তাওলিয়া চুক্তি প্রথম মূল্যের উপর হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম চুক্তি হয়েছিল চার হাজারের উপর অথচ এখানে তাওলিয়া চুক্তি করা হচ্ছে পাঁচ হাজারের উপর। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তি থেকে যদি এক হাজার টাকা না কমানো হয় তাহলে এই চুক্তি প্রথম চুক্তির বিনিময়ের উপর হলো না। যখন এই চুক্তি প্রথম চুক্তির বিনিময়ে না হওয়া সাব্যস্ত হলো তখন এটাকে তাওলিয়া চুক্তি নামকরণ করা সম্ভব নয়; বরং এটা মুরাবাহা চুক্তিতে পরিণত হবে। একটি চুক্তিকে অন্য চুক্তিতে রূপান্তরিত করা বেধ নয়। অতএব চুক্তিটিকে তাওলিয়ারূপে বহাল রাখার জন্য বর্ধিত মূল্য বা খিয়ানতকৃত অংশ কর্তন করতে হবে, এছাড়া ভিন্ন কোনো পন্থা এখানে নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, মুরাবাহা বিক্রয়ের বিষয়টি সে রকম নয়। মুরাবাহা বিক্রয়ের মধ্যে যদি খিয়ানত প্রমাণিত হয় আর তা বাতিল না করা হয় তাহলেও সেটি মুরাবাহা চুক্তি বলেই গণ্য হবে। তবে পার্থক্য এটুকু যে, খিয়ানতের সময় লাভ বেশি হবে, আর খিয়ানত না থাকলে লাভ কম হবে। দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার কথায় আশ্বস্ত হয়ে মনে করেছিল যে, সে লাভ নিচ্ছে এক হাজার টাকা বা তাকে এক হাজার টাকা লাভ দিতে হচ্ছে, কিন্তু খিয়ানত প্রকাশের পর দেখা গেল বিক্রোতা বলে কয়েক এক হাজার এবং প্রতারণার মাধ্যমে এক হাজার, মোট দুই হাজার টাকা লাভ নিচ্ছে।

ক্রেতা যেহেতু এক হাজার টাকা অতিরিক্ত লাভের ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছে তাই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। কেননা, এক্রপ বিক্রয়ে সে সম্মত ছিল না। যেহেতু এক্রপ বিক্রয়ে সে সম্মত নয় তাই এই বিক্রয় রাখার রাখা/না রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (র.) মতে মুরাবাহার মধ্যে খিয়ানত হলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার বলবৎ হবে। ইচ্ছা করলে বিক্রোতার দাবিকৃত মূল্যে ক্রয় করবে, অন্যথা বিক্রয় বাতিল করবে।

فَلَابِدٌ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَ ذَلِكَ بِالنَّحْطِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْطُ فِي التَّوْلِيَةِ قَدْرَ الْخِيَانَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِي الْمُرَابَحَةِ مِنْهُ وَمِنَ الرِّبْحِ، وَ لَا يَبْنَى حَنِيفَةً (رحا) أَنَّهُ لَوْلَمْ يُحْطُ فِي التَّوْلِيَةِ لَا تَبْقَى تَوْلِيَةٌ، لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، فَتَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ، فَتَعَيَّنَ الْحَطُّ، وَفِي الْمُرَابَحَةِ لَوْلَمْ يُحْطُ تَبْقَى مُرَابَحَةٌ، وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ الرِّبْحُ فَلَا يَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ، فَمَا كُنَّ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ، فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مَا يَنْفَعُ الْفَسْخَ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ، لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يَقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ كَخِيَارِ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّهُ مَطَالَبَةٌ بِتَسْلِيمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يَقَابِلُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ.

অনুবাদ : সুতরাং প্রথম চুক্তির উপর দ্বিতীয় চুক্তির নির্ভরতা আবশ্যিক। আর তা [বর্ধিত অংশ] বাদ দেওয়ার দ্বারা সম্ভব। তবে তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানতকৃত অংশ বাদ দিবে মূল মূল্য থেকে, আর মুরাবাহার মধ্যে মূল মূল্য ও লভ্যাংশ থেকে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো- যদি তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানতকৃত অংশ বাদ না দেওয়া হয় তাহলে তাওলিয়া থাকবে না। কেননা, এতে [বর্ধিতাংশ বাদ না দেওয়াতে] প্রথম মূল্যে বর্ধিত হয়ে যায়। তখন চুক্তিটি বদলে যাবে। তাই বাদ দেওয়াই একমাত্র উপায়। পক্ষান্তরে মুরাবাহাতে বর্ধিতাংশ বাদ না দেওয়া হলেও মুরাবাহা বহাল থাকে। যদিও মুনাফাতে কমবেশি হয়, কিন্তু চুক্তি পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং ক্রেতার ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি এখানে সম্ভব। আর যদি পণ্য ফেরত দেওয়ার পূর্বে সেটি হালাক হয়ে যায় অথবা এতে এমন ক্রটি দেখা দেয় যা প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে জাহের বর্ণনানুসারে পুরো মূল্য প্রদান করা আবশ্যিক। কেননা, এটা তো একটি নিছক ইখতিয়ার, যার বিনিময়ে মূল্য আসে না। যেমন দেখার ইচ্ছাধিকার ও শর্তারোপের ইচ্ছাধিকার অর্জিত হয়। তবে দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে বাদপড়া/ ক্ষয়কৃত অংশ অর্পণের দাবি রয়েছে। সুতরাং তা প্রদানে অপারগ হলে সেই পরিমাণ মূল্য কাটা যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ الْخ : হিদায়ার লেখক আশ্শাম বুরহান উদ্দিন বলেন, খিয়ানত প্রমাণিত হয়েছে এমন মুরাবাহার মধ্যে ক্রেতা ইচ্ছাধিকার পাওয়ার পর তা প্রয়োগ করার পূর্বেই যদি পণ্যটি হালাক হয়ে যায় কিংবা এতে এমন ক্রটি সৃষ্টি হয় যার কারণে পণ্যটি ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, এমনভাবেই ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে খিয়ানত কৃত অংশ মূল মূল্য এবং লভ্যাংশ থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। আর ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পূর্ণ মূল্য [বিক্রেতার দাবি অনুসারে] প্রদান করা আবশ্যিক হবে।

মাসআলাটির উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি চার হাজার টাকায় একটি গরু ক্রয় করে ক্রেতাকে বলল, আমি পাঁচ হাজার টাকায় উক্ত গরুটি ক্রয় করেছি। [অর্থাৎ সে দাম বলার সময় এক হাজার টাকা খিয়ানত করল] এখন আমি গরুটি এক হাজার টাকা

লাভে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করবে। এ কথার উপর ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা জানতে পারল যে, বিক্রেতা তার সাথে এক হাজার টাকার ষিয়ানত করেছে এবং ষিয়ানতটি যে কোনোভাবে প্রমাণিতও হলো। কিন্তু ষিয়ানত প্রমাণিত হওয়ার পর ক্রেতার কাছে গরুটি মারা গেল। অথবা ক্রেতার হাতছাড়া হয়ে গেল কিংবা গরুটির মধ্যে এমন দোষ ধরা পড়ল [যেমন- একটি পা ভেঙে গেল] যার কারণে ফেরত প্রদান করা অসম্ভব হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে ষিয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য ও লভ্যাংশ থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মূল মূল্য [পাঁচ হাজার] থেকে এক হাজার কমিয়ে [চার হাজার] দেওয়া হবে এবং এর লভ্যাংশ দূশ টাকা পুরো লভ্যাংশ থেকে কেটে দেওয়া হবে। সুতরাং দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা [বিক্রেতা] কে চার হাজার আটশ টাকা প্রদান করবে।

পঞ্চান্তরে ইমাম আজম (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে পুরো মূল্যে ছয় হাজার টাকা প্রদান করা দ্বিতীয় ক্রেতার উপর আবশ্যিক হবে। তারফান্নি তথা ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, ষিয়ানত প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের মতে পণ্য ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার ছিল, এই ইখতিয়ারের বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ ছিল না। অতঃপর যখন পণ্যের মধ্যে দোষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল তখন তার হাসিলকৃত ইখতিয়ারও বাতিল হয়ে গেল। আর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, উক্ত স্বাধীনতার বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ নেই, তাই মূল্যের কিয়দংশ কমানোরও সুযোগ নেই। আর এজন্য পুরো মূল্য প্রদান করা আবশ্যিক হবে। অর্থাৎ দোষ সৃষ্টি হওয়ার পর মূল চুক্তিতে ছয় হাজারের উপর কথা হলে ছয় হাজার টাকাই প্রদান করতে হবে। **خِيَارُ رُؤْيَةٍ وَ خِيَارُ شَرْطٍ**-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ইচ্ছাধিকারদ্বয়ের বিনিময়ে যেমন মূল্যের কোনো অংশ থাকে না, তদ্রূপভাবে আমাদের আলোচ্য ইচ্ছাধিকারের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ থাকবে না।

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি **خِيَارُ شَرْطٍ**-এর উপর কোনো দ্রব্য ক্রয় করে কিংবা না দেখে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে [যার দ্বারা **خِيَارُ رُؤْيَةٍ** লাভ হয়] তারপর দ্রব্যটি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার উপর পুরো মূল্য প্রদান করা আবশ্যিক। উক্ত ইচ্ছাধিকারদ্বয়ের কারণে মূল্য কম দেওয়ার কোনো সুযোগ সে লাভ করবে না। এরূপভাবে আলোচ্য মাসআলাতে ইচ্ছাধিকার থাকা অবস্থায় ক্রেতার হাতে পণ্য হালাক হয়ে যাওয়ার কারণে পুরোমূল্যই দিতে হবে। ইচ্ছাধিকার লাভ করার কারণে মূল্যের কোনো অংশ কমানো হবে না।

**خِيَارُ عَيْبٍ**-এর বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন। দোষ জনিত কারণে ক্রেতার যে অধিকার হাসিল হয়। তারপর পণ্য ফেরত দেওয়ার পূর্বে যদি পণ্য হালাক হয়ে যায় তাহলেও ক্রেতার পূর্ণমূল্য প্রদান করতে হবে না। তখন ক্রেতার বিপরীতে মূল্যের একটা অংশ অবশ্যই থাকবে এবং সেটা ক্রেতার দায়িত্ব থেকে বাদ পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ একটি পণ্যের মূল্য ধার্য হয়েছিল পাঁচশত টাকা। তারপর পণ্যটির মধ্যে একটি দোষ পরিলক্ষিত হলো, যার কারণে তার দাম এখন চারশত টাকা। এমতাবস্থায় পণ্য হালাক হলো। তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যের মূল্য বাবদ চারশত টাকা দিবে, পাঁচশত টাকা নয়। কেননা, দোষের কারণে পণ্যের একটা অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে অংশ বিনষ্ট হয়েছে তার মূল্যও মূল মূল্য থেকে বাদ পড়বে। মাসআলার সুরত এই যে, ক্রেতা বিক্রেতার কাছে যে অংশটি বিনষ্ট হয়েছে সে অংশটি চাইবে, অথচ বিক্রেতা সেটা দিতে অক্ষম, অন্যদিকে ক্রেতা পণ্যটি হালাক হয়ে যাওয়ার কারণে ফেরত দিতেও অক্ষম। এমতাবস্থায় মূল্যের ঐ অংশ যা পণ্যের বিনষ্ট/খোয়া যাওয়া অংশের বিপরীতে রয়েছে তা বিক্রেতার পাওনা রইল না। তাই ক্রেতা একশত টাকা পরিমাণ কম করে অবশিষ্ট মূল্য [চারশত টাকা] প্রদান করবে।

**نَادِرُ الرِّوَابَاتِ**-এর প্রতি ইঙ্গিত লেখক **رَوَابَاتِ ظَاهِرَةِ** বলার দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর **الرِّوَابَاتِ**-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সেই রিওয়ায়েতের সারমর্ম হচ্ছে- দোষ প্রকাশ পাওয়ার পর পণ্য হালাক হয়ে গেলে বাজার মূল্যের উপর বিক্রয় প্রত্যাহার/রহিত হবে, যদি বাজারমূল্য ধার্যমূল্যের থেকে কম থাকে, যাতে যথাসম্ভব ক্রেতার ক্ষতি দূর করা যায়।



قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَبَاعَهُ بِرِنَجٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً طَرَحَ عَنْهُ كُلَّ رِنَجٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَقَرَّقَ الثَّمَنُ لَمْ يَبِيعْهُ مُرَابَحَةً، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا : يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَخِيرِ، صَوْرَتُهُ إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ، وَبَاعَهُ بِخَمْسَةِ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةٍ، وَيَقُولُ قَامَ عَلَى بِخَمْسَةٍ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً أَصْلًا، وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْعَشْرَةِ فِي الْفَضْلَيْنِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ কাপড় ক্রয় করে [প্রথম মূল্যের উপর] লাভে বিক্রয় করে। তারপর আবার কাপড়টি ক্রয় করে। এমতাবস্থায় যদি সে [পুনরায়] মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায় তাহলে ইতিপূর্বে [দ্বিতীয় ক্রয়ের পূর্বে] যা মুনাফা হয়েছিল তা দ্বিতীয় ক্রয়মূল্য থেকে বাদ দিবে। তবে যদি পূর্বের মুনাফা দ্বিতীয় মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, সে দ্বিতীয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে। মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, এক ব্যক্তি দশ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে পনের দিরহামে [মুরাবাহা হিসেবে] বিক্রি করল। তারপর আবার কাপড়টি দশ দিরহামে কিনে নিল। এখন সে কাপড়টির পাঁচ দিরহাম মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করবে। এবং বলবে আমার পাঁচ দিরহাম পড়তায় পড়েছে। আর যদি সে দশ দিরহামে কাপড় ক্রয় করে বিশ দিরহামে বিক্রি করে মুরাবাহা হিসেবে, তারপর আবার দশ দিরহামে কাপড় কিনে নেয় তাহলে সে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় দশ দিরহাম উভয় মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহা হিসেবে] বিক্রি করবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ : قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ তাঁর আল-জামিউস সাগীরে উল্লেখ করেছেন। মাসআলাটি মত বিরোধপূর্ণ। মাসআলাটি এই : এক ব্যক্তি একটি কাপড় ক্রয় করে সেটাকে লাভে বিক্রি করল। তারপর সে দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে পুনরায় ক্রয় করে নিল। দ্বিতীয় ক্রয়ের, যদি দ্বিতীয় ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায় তাহলে কি হুকুম? ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো প্রথম বিক্রয়ে যে মুনাফা হয়েছিল তা দ্বিতীয় মূল্য থেকে কমিয়ে দিতে হবে। যদি প্রথম বিক্রয়ের মুনাফা এই পরিমাণ হয় যে, দ্বিতীয় মূল্যকে ধরে ফেলেছে তাহলে মুরাবাহা হিসেবে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর সঙ্গে ইমাম আহমদ (র.) একমত্যা পোষণ করেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত হলো, দ্বিতীয় মূল্য বা সর্বশেষ মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রয় করতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমতও তাই।

মাসআলার উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি দশ টাকার বিনিময়ে একটি কাপড় কিনল, তারপর সে কাপড়টি অন্য ব্যক্তির কাছে দশ টাকার উপর পাঁচ টাকা মুনাফা নিয়ে পনের টাকায় বিক্রি করল। বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করল আর ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করে নিল। তারপর পুনরায় প্রথম ক্রেতা [বিক্রেতা] দ্বিতীয় ক্রেতার থেকে দশ টাকায় কাপড়টি কিনে নিল। এখন যদি পুনরায় মুরাবাহার ভিত্তিতে পণ্যটি বিক্রয় করতে চায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম বিক্রয়ের মুনাফা পাঁচ টাকা দ্বিতীয় ক্রয়মূল্য থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে  $[১০ - ৫ = ৫]$  এবং এখন মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চাইলে পাঁচ টাকার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করবে। আর বিক্রি করার সময় সে বলবে এই কাপড়টি কিনতে পাঁচ টাকা পড়েছে এবং এই পরিমাণ মুনাফা  $[২ টাকা + ৫ টাকা] [৫ + ৭]$  নিয়ে আমি [সাত টাকায়] বিক্রি করব। তবে বিক্রেতা একথা বলবে না যে, আমি পাঁচ টাকায় ক্রয় করেছি। কেননা এটা তো মিথ্যা বলা হবে।

মাসআলার দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো, এক ব্যক্তি একশত টাকায় একটি কাপড় ক্রয় করে দুইশত টাকায় [একশত টাকা মুনাফা নিয়ে] বিক্রি করল। তারপর আবার কাপড়টি একশত টাকায় ক্রয় করে নিল। এরপর যদি উক্ত ব্যক্তি কাপড়টি মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে চায় তাহলে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। বরং উক্ত ব্যক্তি এ টাকাকে **مُسَاوَمَةٌ** [দামদরের ভিত্তিতে] বিক্রি করবে। কেননা, যদি প্রথম বিক্রয়ের মুনাফা দ্বিতীয় মূল্য থেকে কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোনো মূল্যই থাকে না।  $[১০০ - ১০০ = ০]$ । পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় [মুনাফা দ্বিতীয় মূল্যের সমান হোক কিংবা কম হোক] দ্বিতীয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ।

لَهُمَا أَنْ الْعَقْدَ الثَّانِيَّ عَقْدٌ مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ الْأَحْكَامِ عَنِ الْأَوَّلِ، فَيَجُوزُ بِنَاءُ  
الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِ، كَمَا إِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ وَلَابِئِي حَنِيفَةً (رح) أَنْ شُبِّهَتْ حُصُولُ الرِّبْحِ  
بِالْعَقْدِ الثَّانِي ثَابِتَةً، لِأَنَّهُ يَتَأَكَّدُ بِهِ بَعْدَ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السَّقُوطِ بِالظُّهْرِ  
عَلَى عَيْبٍ، وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيقَةِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ اخْتِبَاطًا، وَلِهَذَا لَمْ تَجْزِ  
الْمُرَابَحَةُ فِيمَا أُخِذَ بِالصَّلَاحِ لِشُبْهَةِ الْحَطِيطَةِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى خَمْسَةً وَتَوْبًا  
بِعَشْرَةٍ، فَيُطْرَحُ خَمْسَةٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ، لِأَنَّ التَّأَكُّدَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ.

অনুবাদ : তাঁদের দলিল হলো, দ্বিতীয় চুক্তিটি একটি নতুন চুক্তি এবং প্রথম চুক্তির বিধি বিধান থেকে সম্পর্কহীন একটি চুক্তি। সুতরাং এর উপর মুরাবাহা চুক্তির ভিত্তি রাখা সম্ভব। যেমন যদি তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা মুনাফা অর্জনের সন্দেহ সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, [প্রথম বিক্রয়ের দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হয়েছিল] তা দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা পাকাপোক্ত হয়েছে। অথচ [বিক্রীত পণ্য] ক্রটি পরিলক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে উক্ত মুনাফা হাত ছাড়া হওয়ার প্রাপ্তে এসে গিয়েছিল। মুরাবাহা চুক্তির মধ্যে সর্বকর্তামূলকভাবে মুনাফার সন্দেহকে প্রকৃত সন্দেহের স্থানে রাখা হয়েছে, আর এজন্যই তো আপোষের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তাতে ভিত্তি রেখে মুরাবাহা চুক্তি করা যায় না। কেননা, এতে মূল্য কম ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এটা যেন এমন হলো যে, সে পাঁচ দিরহামের একটি কাপড় দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল। অতঃপর পাঁচ দিরহাম কমিয়ে দেওয়া হলো। তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে হওয়ার বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা, এখানে মুনাফার নিশ্চয়তা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে হাসিল হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَوَلَّى لَهُمَا أَنْ الْعَقْدَ الْخ: সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তির বিধানাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন ও একটি স্বতন্ত্র চুক্তি। যেহেতু দ্বিতীয় ক্রয় চুক্তিটি প্রথম বিক্রয় চুক্তির বিধি-বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চুক্তি, তাই দ্বিতীয় চুক্তির উপর মুরাবাহা চুক্তির ভিত্তি রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। দ্বিতীয় চুক্তির সাথে প্রথম চুক্তির যে কোনো সম্পর্ক নেই, তার উদাহরণ যেমন- প্রথম চুক্তির মধ্যে خَبَارٌ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে সেই خَبَارٌ থাকবে না। এমনভাবে দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে خَبَارٌ থাকলে সেই প্রথম চুক্তির মধ্যে স্থানান্তরিত হবে না। সুতরাং প্রথম চুক্তি মুরাবাহা ছিল কিংবা ওযীয়াহ ছিল তাতে কিছু আসে যায় না। এ জন্যই তো যদি মূলে পণ্যটি দানের মাধ্যমে পেয়ে থাকে কিংবা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে লাভ করে থাকে তারপর সেটাকে বিক্রি করে, তারপর আবার ক্রয় করে তবু তার জন্য ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ। এখানেও পূর্বে একধরনের চুক্তি হয়েছিল তার প্রতি লক্ষ্য করা হচ্ছে না। যদি পূর্বের পণ্যপ্রাপ্তির মাধ্যমকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হতো তাহলে তো মুরাবাহা চুক্তি বৈধ হতো না। পূর্বের চুক্তিসমূহ ধর্তব্যের মধ্যে না আনার কারণ এই যে, দ্বিতীয় ক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রেতার প্রথম মালিকানা থেকে ভিন্ন একটি নতুন মালিকানা এসেছে। কেননা, মালিকানার সবব ভিন্ন হওয়া আর ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের মালিক হওয়া একই। এমনভাবে যদি তৃতীয় ব্যক্তি মাঝে আসে তাহলেও দ্বিতীয় ক্রয়ের মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ। তৃতীয় ব্যক্তি মাঝে আসার ব্যাখ্যা এই যে, রাশেদ একটি কাপড় একশত টাকায় খরিদ করে মুরাবাহার ভিত্তিতে দু'শ টাকায় সেটা নাস্টমের কাছে বিক্রি করল। তারপর নাস্টম দু'শ টাকায় খালেদের কাছে কাপড়টি বিক্রি করল। এরপর প্রথম বিক্রেতা রাশেদ পুনরায় খালেদের কাছ থেকে কাপড়টি ক্রয় করে একশত টাকায়। এখন রাশেদ যদি অন্য

ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয় ক্রয়ের মূল্য একশত টাকাকে মূল্য ধরে এর উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] বিক্রি করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে এই প্রক্রিয়ায় মুরাবাহা বিক্রি বৈধ। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা গ্রহণ করে বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একটি স্বতন্ত্র চুক্তি।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল : যে মুনাফা প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল তা দ্বিতীয় চুক্তির মাঝেও বিদ্যমান। কেননা, দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে প্রথম চুক্তির মুনাফাটি নিশ্চিত ও স্থিতিশীল হয়েছে। দ্বিতীয় চুক্তি করার আগ পর্যন্ত মুনাফা অর্জনের বিষয়টি সুনিশ্চিত ছিল না। সেই মুনাফা না থাকারও একটি সম্ভাবনা ছিল।

এর ব্যাখ্যা এই যে, এক ব্যক্তি দশ টাকা লাভে একটি কাপড় বিক্রি করল। কাপড়টির ক্রয় মূল্য ছিল একশত টাকা। সে বিক্রয় করল একশত দশ টাকায়। তারপর আবার যার কাছে বিক্রি করেছিল তার থেকে একশত টাকায় ক্রয় করে নিল, পুনরায় একশত টাকায় ক্রয় করার কারণে তার দশ টাকা মুনাফা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলো। কেননা, যদি দ্বিতীয় ক্রয় না করত, আর ইতিমধ্যে কাপড়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিত, তাহলে ক্রেতা কাপড় ফেরত দিয়ে তার প্রদত্ত একশত দশ টাকা ফেরত নিয়ে নিত তাহলে তো বিক্রেতার মুনাফা থাকত না।

মোটকথা, যেহেতু দ্বিতীয় [ক্রয়] চুক্তি দ্বারা প্রথম চুক্তির লাভটি নিশ্চিত হয়েছে তাই দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারাও সন্দেহপূর্ণভাবে লাভ প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা সন্দেহপূর্ণভাবে মুনাফা দশ টাকা অর্জিত হয়েছে তাই যেন দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা [প্রথম বিক্রেতা] দশ টাকার বিনিময়ে একটি কাপড় ও পাঁচ টাকা ক্রয় করল। সুতরাং ক্রয়কৃত পাঁচ টাকা মূল্যরূপে প্রদত্ত দশ টাকার অর্ধেকের তথা পাঁচ টাকার বিনিময়ে হবে এবং পাঁচের সাথে পাঁচ কাটাকাটি হয়ে যাবে। আর ক্রয়কৃত কাপড়টির মূল্য পড়বে মাত্র পাঁচ টাকা। যেহেতু কাপড়ের মূল্য পাঁচ টাকা পড়েছে তাই এই পাঁচ টাকা মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিবে, যাতে খিয়ানতের সন্দেহ থেকে বাঁচা যায়। আর এটা আমরা পূর্বে বলেছি যে, মুরাবাহার ক্ষেত্রে খিয়ানতের সন্দেহ প্রকৃত খিয়ানতের মতো। তাই খিয়ানতের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক হবে যেমন খিয়ানতের থেকে বাঁচা জরুরি।

قَوْلُهُ وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيقَةِ فِي بَيْعِ الْمَرَابَعَةِ : এইমাত্র যা বলা হলো- খিয়ানতের সন্দেহ প্রকৃত হাকীকতের মতো। তাই তা থেকেও বাঁচতে হবে, সে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে লেখকের এই ইবারত দ্বারা। লেখক তার এই বক্তব্যকে প্রমাণের জন্য আরেকটি মাসআলাকে উপস্থাপন করেছেন। মাসআলাটি এই যে, আপোষরফার মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তার [আপোষ রফার মূল্যের] উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি তথা مَرَابَعَةٌ করা বৈধ নয়।

আপোষ ও সমঝোতার মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর দাবি করল যে, আমি তার কাছে এক হাজার টাকা পাব। অতঃপর সে ঋণগ্রহীতার সাথে এক খান কাপড়/ একজন গোলাম [এক হাজার টাকার পরিবর্তে] প্রদান করবে এই শর্তে সন্ধি বা আপোষ করল। এখন ঋণদাতা কাপড়/ গোলামের মূল্য এক হাজার ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] বিক্রি করতে পারবে না। কারণ আপোষ ও সমঝোতা সাধারণত উদারতা ও হ্রাসমূল্যের উপর হয়ে থাকে। অর্থাৎ সন্ধির ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পাওয়া যায়। প্রকৃতভাবে হ্রাসমূল্য প্রমাণিত হলে মুরাবাহা চুক্তি করা বৈধ হয় না। সুতরাং হ্রাস মূল্যের সম্ভাবনা থাকা অবস্থায়ও এর উপর মুরাবাহা চুক্তি বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ يَخْلِفُ مَا إِذَا تَخَلَّلَ تَأْيِيدُ الْح : এ বাক্য দ্বারা লেখক ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উপর আরোপিত সাহেবাইন (র.)-এর আপত্তির উত্তর দিচ্ছেন। সাহেবাইন (র.)-এর একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে যদি ক্রেতা পণ্যটি পুনরায় গ্রহণ করে তাহলে তো তার দ্বিতীয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] বিক্রি করা সবার ঐকমত্যে বৈধ। তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যম হওয়ার অর্থ হচ্ছে ক্রেতা যার কাছে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করেছে সে যদি অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা তার কাছে থেকে পুনরায় ফিরে নেয় তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা যাবে। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলাতেও দ্বিতীয় চুক্তির উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ হবে। আপত্তির উত্তরে লেখক বলেন, তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্তী হওয়ার বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কারণ, তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যম হওয়ার অবস্থায় মুনাফা নিশ্চিত হয় তৃতীয় ব্যক্তির খরিদ করার কারণে। দ্বিতীয় চুক্তির কারণে তার মুনাফা নিশ্চিত হয়নি। অর্থাৎ তার মুনাফা নিশ্চিত হওয়ার পিছনে দ্বিতীয় চুক্তির কোনো দখল নেই। আর তাই খিয়ানতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। যেহেতু খিয়ানতের কোনো সম্ভাবনা নেই তাই দ্বিতীয় চুক্তির মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা অবৈধ নয়।

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَادُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ ذَنْبٌ مُخِيطٌ بِرَقَبَتِهِ ، فَبَاعَهُ مِنَ الْمَوْلَى بِخَمْسَةِ عَشَرَ ، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشْرَةٍ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ مِنَ الْعَبْدِ ، لِأَنَّ فِي هَذَا الْعَقْدِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ لِجَوَازِهِ مَعَ الْمُنَافَى ، فَاعْتَبِرْ عَدَمًا فِي حُكْمِ الْمُرَابَحَةِ ، وَيَقَى الْإِعْتِبَارُ لِلْأَوَّلِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَاهُ لِلْمَوْلَى بِعَشْرَةٍ فِي الْفَضْلِ الْأَوَّلِ ، وَكَأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِلْمَوْلَى فِي الْفَضْلِ الثَّانِي ، فَيُعْتَبَرُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত দাস যদি দশ টাকায় একটি কাপড় খরিদ করে এমতাবস্থায় যে, তার কাঁধে তার মূল্য সমপরিমাণ ঋণ রয়েছে, অতঃপর সে তার মনিবের কাছে কাপড়টি পনের টাকায় বিক্রি করে দেয় তাহলে মনিব উক্ত কাপড় দশ টাকা মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে। তদুপ মনিব যদি কাপড় কিনে [ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত] দাসের কাছে বিক্রি করে [পনের টাকায় তাহলে দাস দশ টাকার উপর মুনাফা নিয়ে কাপড়টি অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে।] কেননা [দাস ও তার মনিবের মাঝে সম্পাদিত] এই চুক্তিটতে অবৈধতার বৈধ না হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। কারণ, বৈধতার বিপরীত বিষয় থাকা সত্ত্বেও চুক্তিটিকে জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তিটিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন বিবেচনা করা হবে। আর প্রথম চুক্তিটিকে গ্রহণ করা হবে। অতএব প্রথম অবস্থায় যেন ক্রীতদাস তার মনিবের জন্য দশ টাকায় কাপড় ক্রয় করল এবং দ্বিতীয় অবস্থায় যেন সে মনিবের জন্য বিক্রি করল। অতএব প্রথম মূল্যটিই [উভয় অবস্থায়] বিবেচ্য হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ : قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْخ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল-জামিউস সাগীরে বর্ণনা করেছেন। মাসআলাটির স্বরূপ : এক ব্যক্তি তার গোলামকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছে। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামটি দশ দিরহাম দ্বারা একটি কাপড় ক্রয় করল। কাপড় ক্রয়ের সময় গোলাম ঋণে জর্জরিত ছিল। আর তার ঋণের পরিমাণ এত যে, গোলামের মূল্যকে তা ধরে ফেলেছে। অর্থাৎ গোলামের মূল্য এবং ঋণ সমান সমান।

নিহায়া এত্বে বর্ণিত আছে যে, মূল্য পরিমাণ ঋণ থাকার শর্ত করা হয়েছে, নতুবা যদি গোলামের সেই পরিমাণ ঋণ না থাকে তাহলে মনিবের কাছে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। কেননা, এ জাতীয় বিক্রি নতুন কোনো কিছু আবশ্যক করে না, যা বিক্রয়ের পূর্বে ছিল না।

মোটকথা, ঋণগ্রস্ত অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি দশ দিরহামে কাপড় ক্রয় করে তারপর সেটা মনিবের কাছে পনের দিরহামে বিক্রি করে তাহলে মনিবের জন্য দশ দিরহামের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ। পনের দিরহামের উপর নয়। তদুপ যদি মনিব একটি কাপড় দশ দিরহামে ক্রয় করে উপরিউক্ত গোলামের কাছে পনের দিরহামে বিক্রি করে তাহলে গোলাম দশ দিরহাম মূল মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু তার কেনা মূল্য পনের দিরহামের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে না। উভয় মাসআলার দলিল হচ্ছে— উভয় অবস্থায় বিক্রয় শুদ্ধ না হওয়ার একটি সন্দেহ রয়েছে, যদিও প্রকৃতার্থে বিক্রয়টি বৈধ।

নাজায়েকের সন্দেহের কারণ হচ্ছে— বিক্রয়টি বৈধ করা হয়েছে তার বিপরীত বিষয়ের সাথে সহাবস্থান করা সত্ত্বেও। বিপরীত বিষয় হলো গোলাম তার মুনিবের মালিকানাধীন। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত পাওনাদারগণ তাদের পাওনা বাবদ গোলাম না নিবে ততক্ষণ এটি মুনিবের মালিকানাধীন। তাছাড়া মুনিব পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করে ফেলেলেও সে মুনিবের মালিকানাধীন গণ্য হবে। যেহেতু অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামটি মুনিবের মালিকানাধীন আছে, তাই এই বিক্রিটি এমন হলো যে, কোনো ব্যক্তি তার নিজের কাছেই যেন নিজে কিছু বিক্রি করেছে। অথবা মুনিব তার মালিকানাধীন বস্তু পুনরায় খরিদ করেছে। আর বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। এতো গেল অবৈধ হওয়ার সন্দেহ।

কিন্তু প্রকৃতার্থে বৈধ হওয়ার দলিল হলো, যখন গোলাম তার মূল্য পরিমাণ ঋণে জর্জরিত তখন গোলাম তো পাওনাদারদের অধিকারে চলে গেছে। ফলে মুনিবেরও অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের মধ্যে মালিকানার সম্পর্ক রইল না; বরং গোলাম অপরিচিত ব্যক্তির পর্যায়ে হয়ে গেল। অপরিচিত দুই ব্যক্তির মাঝে বেচা-কেনা যেমন বৈধ তেমনি উপরিউক্ত মুনিব ও তার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের মাঝে বিক্রি বৈধ হবে। সুতরাং গোলাম ও তার মুনিবের মাঝে বৈধ পন্থায় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

মোটকথা, মুনিব ও ঋণে জর্জরিত গোলামের মাঝে যদিও প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় বৈধ তবু এতে অবৈধ হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুরাবাহা বিক্রির মাঝে সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি এজন্য মুনিব ও তার গোলামের মাঝে অনুষ্ঠিত ক্রয়-বিক্রয়কে অস্তিত্বহীন গণ্য করা হয়েছে এবং প্রথম বিক্রয়টিকেই বিবেচনায় রাখা হয়েছে; সুতরাং এটা যেন এমন হলো যে, [প্রথম অবস্থায়] গোলাম তার মুনিবের জন্য দশ দিরহামের কাপড়টি ক্রয় করল এবং [দ্বিতীয় অবস্থায়] গোলাম কাপড়টি যেন তার মুনিবের জন্য বিক্রি করল। যেহেতু এ দ্বিতীয় বিক্রয়টি অগ্রহণযোগ্য এবং প্রথম বিক্রয়টি ধর্তব্য, তাই মুনাফা নেওয়ার ভিত্তি প্রথম চুক্তির মূল্যই হবে এবং দ্বিতীয় বিক্রয়ের উল্লিখিত মূল্য মুরাবাহার ভিত্তি হতে পারবে না।

আমাদের আলোচ্য প্রথম চুক্তির মধ্যে মূল্য দশ দিরহাম [আর দ্বিতীয় চুক্তির মূল্য পনের দিরহাম] তাই দশ দিরহামই হবে মুরাবাহা/মুনাফা নেওয়ার ভিত্তি।

মুরাবাহা চুক্তি হলো সম্পূর্ণরূপে আমানতদারীর একটি চুক্তি। এতে বিক্রেতার উপর ক্রেতার অগাধ বিশ্বাস থাকে যে, বিক্রেতা কোনো ধরনের ছল-ছাত্তুরী, প্রতারণা ও ধোঁকা দিবে না। তাই শরিয়ত এ বিক্রয়টিকে খিয়ানত এবং খিয়ানতের সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখার আদেশ জারি করেছে। খিয়ানতের সন্দেহ হতে পারে এমন সম্ভাবনাকেও এতে মেনে নেওয়া হয়নি। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ও মোকাতাব এবং তাদের মুনিবের মাঝে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এ সন্দেহ থাকা অমূলক নয় যে, মুনিব তার গোলাম থেকে বেশি দামে কিনেছে কিংবা বেশি দামে বিক্রি করেছে। আর এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার পিতা/মাতা/পুত্র থেকে কোনো কিছু ক্রয় করে কিংবা এরা তার কাছে কোনো কিছু বিক্রয় করে তাহলে তাদের কেউই ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে না। তবে যদি বিক্রেতার পড়তা মূল্যে বিক্রয় করে তাহলে তা বৈধ। কারণ, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য ধরা/ছাড়তে শিথিলতা পাওয়া যায়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের জন্য কিছু উদারতা প্রদর্শন করবে। তবে উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.) হিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মালিকানা ভিন্ন এবং হকও পৃথক, তাই তাদের ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

قَالَ : وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ بِالنِّصْفِ ، فَاشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ ، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابِحَةً يَأْتِنِي عَشْرٌ وَنِصْفٌ ، لِأَن هَذَا الْبَيْعَ لِأَن قُضِيَ بِجَوَازِهِ عِنْدَنَا عِنْدَ عَدَمِ الرِّبْحِ خِلَافًا لِرُفْرِ (رح) أَنَّهُ اشْتَرَى مَالَهُ بِمَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِسْتِفَادَةٍ وَلَا يَتَصَرَّفُ ، وَهُوَ مَقْصُودٌ ، وَالْإِنْعِقَادُ يَتَّبِعُ الْفَائِدَةَ ، فَوَيْهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ وَكَيْلٌ عَنْهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهِ ، فَاعْتَبِرَ الْبَيْعُ الثَّانِي عَدَمًا فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামেউস সগীর গ্রন্থে বলেন, যদি মুযারিবের কাছে দশ দিরহাম সমান সমান মুনাফার ভিত্তিতে থাকে, অতঃপর দশ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে সে রাব্বুল মাল [বিনিয়োগ কারী] এর কাছে পনের দিরহামে বিক্রি করে তাহলে সে সাড়ে বার দিরহাম মূল্য ধরে তার উপর মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করবে। কেননা, এ বিক্রয়ে মুনাফা অবদ্যমান থাকাকালে আমাদের মতে ইমাম যুফার (র.) -এর বিরোধিতা সত্ত্বেও- যদিও বৈধ, তবু এতে বিনিয়োগকারী নিজ মালকে নিজ মালের বিনিময়ে খরিদ করছে। কেননা, বিনিয়োগকারী উক্ত ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবহারের অধিকার অর্জন করছে। আর এটাই [ক্রয়ের দ্বারা] উদ্দেশ্য। চুক্তি সম্পাদন ফায়েরদার অনুবতী হয়। তবে এতে অবৈধতার সন্দেহ বিদ্যমান। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুযারিব মূলধনদাতার পক্ষে এক ধরনের উকিল। সুতরাং অর্ধেক মুনাফার ক্ষেত্রে বিক্রয়টিকে অস্তিত্বহীন ধরা হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِالنِّصْفِ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে অন্যের মূলধন নিয়ে নিজে পরিশ্রম করে বাবসা করে। وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ قَالَ : হলে অর্থ বিনিয়োগকারী বা মূলধনদাতা। মুযারিব ও মূলধনদাতা এভাবে হুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, আমাদের শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করে যা লাভ আসবে তা আমরা সমান সমান হারে বন্টন করে নিব/ কম-বেশ করে নিব। বলা বাহুল্য যে, তাদের পরস্পর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে এবং একে অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। তাদের মাঝে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয় দুই অপরিচিত ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের মতো হবে না। এ বিষয়টি মনে রাখার পর ইবারতের মাসআলার আলোচনায় আসা যাক।

আমাদের আলোচ্য মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, এক ব্যক্তি [খালেদ] অন্য ব্যক্তি [রাশেদ] কে মুযারাবার ভিত্তিতে দশ দিরহাম দিল। এই শর্তে যে, লাভ দুজনের মাঝে সমান হারে বন্টন হবে। অতঃপর রাশেদ দশ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে মূলধনদাতার কাছে পনের দিরহামে সেটা বিক্রি করে দিল। মূলধনদাতা যদি উক্ত কাপড়টি মুযারাবার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চায় তাহলে সে তার ক্রয়মূল্য [পনের দিরহামের পরিবর্তে] সাড়ে বার দিরহাম ধরে তার উপর মুনাফা নিবে। অবশ্য মূলধনদাতা কাপড় বিক্রয়ের সময় তার ক্রেতাকে বলবে এটা সাড়ে বার দিরহামে আমার পড়তা পড়েছে এবং এত দিরহাম লাভে সেটা বিক্রি করব। কারণ, মুরাবাহা বিক্রির মধ্যে শিয়ানত ও শিয়ানতের সন্দেহ উভয় থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক।

পুঁজি বিনিয়োগকারী কাপড়টি যদি পনের দিরহাম মূল্য ধরে তার উপর লাভ নেয় তাহলে তাতে শিয়ানত, সন্দেহ পাওয়া যায়। শিয়ানতের সন্দেহ পাওয়া যাওয়ার ব্যাখ্যার পূর্বে মুযারিব ও মূলধনদাতার পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা জেনে নেওয়া আবশ্যিক।

উল্লেখ্য যে, মুযারাবার মাল ক্রয়-বিক্রয়ে যদি মুনাফা থাকে তাহলে উক্ত মাল মুযারিব পুঁজি বিনিয়োগকারীর কাছে, আর পুঁজি বিনিয়োগকারী মুযারিবের কাছে বিক্রি করতে পারে। এ মাসআলায় সব ইমাম একমত। পক্ষান্তরে যদি মাল ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো মুনাফা না থাকে তাহলে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো বিক্রয় বৈধ। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অবৈধ।

**ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল :** مَبَادِلُهُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالسَّالِحِ - কে বিক্রয় বলা হয়। বিক্রয়ের এ সংজ্ঞা তখনই পাওয়া যাবে যখন দু'জন ব্যক্তি পরস্পরের মালের বিনিময় করে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি নিজ মাল নিজ মালের বিনিময়ে বদল করে তখন সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটাকে বিক্রয় বলা যাবে না। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় নিজ মাল নিজ মালের বিনিময়ে গ্রহণ করা হচ্ছে। কারণ, যখন মুযারিব দশ দিরহামে কাপড় ক্রয় করে পুঁজি বিনিয়োগকারীর কাছে তা বিক্রি করছে তখন তো পুঁজি বিনিয়োগকারী নিজের মালের বিনিময়ে নিজের মাল খরিদ করছে। কেননা যে কাপড়টি খরিদ করছে তা যেমন তার মাল, তেমনি কাপড়ের বিনিময়ে যে দিরহাম প্রদান করছে তাও তারই মাল। সুতরাং এখানে মুযারিব ও পুঁজি বিনিয়োগকারীর মধ্যে মূলত কোনো বিক্রয় সংঘটিত হয়নি।

**ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল :** তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সাধারণভাবে কোনো উপকার লাভ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। উপকার পাওয়া গেলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ সাব্যস্ত হবে। আলোচ্য বিক্রয়ে এমনই ফায়দা বিদ্যমান। তা এভাবে যে, পুঁজি বিনিয়োগকারী যখন তার মালামাল মুযারিবের হাতে তুলে দিল, তখন থেকে সে উক্ত মালা হস্তক্ষেপ করার অধিকার হারাল। অতঃপর যখন সে পুনরায় ক্রয়ের মাধ্যমে মাল হস্তগত করল তার হস্তক্ষেপের অধিকার ফিরে আসল। এজন্যই তো যদি মূলধনদাতার দাসী মুযারাবার মালা পরিণত হয় তাহলে তার জন্য উক্ত দাসী ব্যবহার করার অধিকার আর থাকে না। পক্ষান্তরে মুযারিব বিনিয়োগকারী মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। এমন কি তাতে মূলধনদাতা বাধা দেওয়ার ও অধিকার রাখে না। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূলধনদাতা বিক্রয়ের দ্বারা হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করে, আর বিক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য তো হস্তক্ষেপের অধিকার। যেহেতু এ বিক্রয় এমন গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাকে শামিল করে তাই এ বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হবে। বিক্রয় বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে, তাই এ বিক্রয়ে নাজায়েজের সন্দেহ বিদ্যমান। এ ছাড়া আরেকটি কারণে নাজায়েজের সন্দেহ আছে, তা এই যে, মুযারাবা চুক্তির মাঝে মুযারিব পুঁজি বিনিয়োগকারীর পক্ষে এক প্রকার উকিল তথা ভারপ্রাপ্ত সহকারী হয়। মুযারিব তার জন্য যেমন কাজ করে তেমনি পুঁজি বিনিয়োগকারীর জন্য কাজ করে। আর এজন্যেই মুনাফা উভয়ের মাঝে বন্টিত হয়। তবে অন্য উকিলের মতো পুরোপুরি উকিল নয়, কারণ অন্য উকিল তো কেবল তার মক্কেলের জন্য কাজ করে এবং মুনাফা কেবল মক্কেলেই লাভ করে। যেহেতু মুযারিব এক প্রকার উকিল তাই তার মক্কেলের সাথে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ না হওয়াই উচিত। তবে পুরোপুরি উকিল না হওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়।

মোটকথা, মুযারিব ও মূলধনদাতার মাঝে যদিও বিক্রয় জায়েজ তবু এতে নাজায়েজের সন্দেহ বিদ্যমান। আর উক্ত সন্দেহের কারণে দ্বিতীয় বিক্রয় তথা মূলধনদাতা কাপড়টি যখন পনের দিরহামে ক্রয় করল তার মূল মুনাফার পাঁচ দিরহামের অর্ধেক তথা আড়াই দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয় অসংঘটিত বিবেচিত হবে। কেননা, এই আড়াই দিরহাম মূলধনদাতার পাওনা। খিয়ানতের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে উক্ত আড়াই দিরহাম মূল্য কমিয়ে দিবে। অবশিষ্ট সাড়ে বার দিরহাম তথা মূলধন দশ দিরহাম ও মুযারিবের মুনাফা আড়াই দিরহামে যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই তাই মূলধনদাতা সাড়ে বার দিরহামের উপর মুনাফা নিয়ে মুযারাবার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। তবে বিক্রির সময় সে এ কথা বলবে না যে, আমি সাড়ে বার দিরহামে ক্রয় করছি। কেননা, এটা মিথ্যা। সে বলবে, আমার সাড়ে বার দিরহাম পড়তায় পড়েছে।

**মাসআলা :** যদি মুযারিব ও মূলধনদাতা কোনো পণ্য ক্রয় করে, অতঃপর তারা উভয়ে সেটাকে ভাগ করে নেয় তারপর তাদের যে কেউ মূল্যের অংশের ভিত্তিতে তার অংশ মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায় তাহলে তা তখনই বৈধ হবে যখন তারা পণ্যটি সমান ভাগে ভাগ করে এবং উভয় অংশ সম্পূর্ণ সমান ভাগে বন্টিত হয়। যদি সে পণ্যটি সমান ভাগে ভাগ না করা যায় তাহলে নিজ অংশ মুযাবাহারূপে বিক্রি করা যাবে না।



قَالَ : وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَاعْوَرَّتْ أَوْ وَطِيهَا وَهِيَ تَيْبٌ يَبِيعُهَا مُرَاحَةً وَلَا يَبِيعَنَّ،  
لَأَنَّهُ لَمْ يَحْتَبَسْ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَقَابِلُهُ الثَّمَنُ، لِأَنَّ الْأَوْصَافَ تَابِعَةٌ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ،  
لِهَذَا لَوْ فَاتَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يَنْسَقُطُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ  
لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَنْقُضْهَا الْوَطْءُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح)  
فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ كَمَا إِذَا اخْتَبَسَ بِفِعْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُ  
السَّافِي عِي (رح) .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি দাসী ক্রয় করে, অতঃপর দাসীটি কানা হয়ে যায় কিংবা দাসীটি অকুমারী অবস্থায় তার সাথে সহবাস করে তাহলে এ দোষ বর্ণনা না করেই সে মুরাবাহা হিসেবে তা বিক্রি করতে পারবে। কেননা, ক্রেতার কাছে এমন কিছু রয়ে যায়নি যার বিনিময়ে মূল্য আসতে পারে। কারণ, গুণাবলি হলো বস্তুর অনুবর্তী বিষয়। এগুলোর বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয় না। এজন্যই যদি বস্তু অর্পণ করার পূর্বেই গুণাবলি তিরোহিত হয় তাহলে মূল্যের কোনো অংশ কাটা যায় না। এমনভাবে সঙ্গম সুবিধার বিপরীতেও মূল্য আসে না। মাসআলাটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন সহবাস মহিলার কোনো ক্রটি না ঘটায়। প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বর্ণিত একটি অভিমত হলো বর্ণনা না করে বিক্রি করবে না। যেমন ক্রেতার কোনো কাজের দ্বারা যদি কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম শাফি'রী (র.)-এর অভিমতও তাই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً الْغ : উপরিউক্ত ইবারতের মূল মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সূরতে মাসআলা : কেউ একটি দাসী ক্রয় করল, তারপর ঘটনাচক্রে দাসীটির একচোখ নষ্ট হয়ে গেল কিংবা চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল অথবা কেউ অকুমারী একটি দাসী ক্রয় করল, তারপর সে দাসীর সাথে সঙ্গম করল এবং সঙ্গমে দাসীটি ক্রটিযুক্ত হলো না। উল্লেখ্য যে, অকুমারী দাসীর সাথে সঙ্গম করলে তার মাঝে কোনো নতুন ক্রটি জন্মায় না। অবশ্য কুমারীর সাথে সঙ্গম করা হলে সেটা ক্রটি যুক্ত হয়ে যায়। উভয় অবস্থায় ক্রেতা দাসীটি প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা দিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা না করে বিক্রি করতে পারবে। অর্থাৎ এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, দাসীটি পূর্বে ক্রটিযুক্ত অবস্থায় আমি কিনেছিলাম, তারপর ক্রটিযুক্ত হয়েছে ইত্যাদি। তদ্রূপ ক্রেতা কোনো কাপড় অথবা শাদদ্রব্য ক্রয় করল, তারপর তাতে ক্রটি দেখা গেল- তাহলেও সে কোনো কিছু বর্ণনা না করে প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে।

মাসআলার দলিল : ক্রেতার কাছে পণ্যের/দাসীর কোনো অংশ রয়ে যায়নি কিংবা ক্রেতার তার কর্মের দ্বারা কোনো অংশ রেখে দেয়নি যার পরিবর্তে মূল্যের একটা অংশ প্রদান করতে হবে। বাকি রইল পণ্য/দাসী ক্রটিযুক্ত হওয়া তো একটি আকর্ষণীয় গুণ। গুণ সত্তার অনুবর্তী বিষয়। সত্তার বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয়, কিন্তু গুণের বিপরীতে মূল্য আসে না। আলোচ্য মাসআলায় দাসী যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে, তাই গুণের অনুপস্থিতির কারণে মূল্যের কোনো অংশ বাদ যাবে না। যেহেতু মূল্যের কোনো অংশ কাটা যাচ্ছে না তাই ক্রেতা পুরো মূল্যের উপর মুরাবাহা চুক্তি করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে লেখক অন্য একটি মাসআলা দ্বারা বিষয়টি সমর্থনপুষ্ট করেন। মাসআলাটি এই : যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পর বিক্রেতা পণ্য ক্রেতায় হাতে অর্পণ করার পূর্বে পণ্যের কোনো গুণ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার মূল্যের কোনো অংশ কমানো হয় না। এরপর লেখক বলেন, সজ্জমের সুবিধা ভোগ যেহেতু কোনো মাল নয়, তাই এর বিনিময়ে কোনো মূল্য আবশ্যক হবে না। সুতরাং ক্রেতা যদি অকুমারী দাসীর সাথে সজ্জম করে এবং সজ্জম করার দ্বারা দাসীর মধ্যে দোষ সৃষ্টি না হয় তাহলে ক্রেতা দাসীটিকে পূর্ণ মূল্যের উপর মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে পারে। এবং দাসী সম্পর্কে এ কথা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই যে, দাসীর সাথে ক্রয়ের পর আমি সজ্জম করেছি। পক্ষান্তরে যদি সজ্জমের দ্বারা দাসী ক্রটিপূর্ণ হয়ে যায়- যেমন দাসী আগে কুমারী ছিল, পরে সজ্জমের ফলে তার কুমারিত্ব চলে গেছে, এমতাবস্থায় দাসী সঙ্কল্পে বর্ণনা না করে প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ হবে না। কেননা কুমারিত্বের পর্দা দূর করার কারণে ক্রেতা যেন দাসীর একটা অংশ নিজের কাছে রেখে দিল। আর এটা স্বাভাবিক কথা যে, পণ্যের একাংশ ক্রেতার কাছে রেখে দিলে তার পরিবর্তে মূল্যের একাংশ অবশ্যই কমানো হবে। মূল্যের একাংশ কমানোর অর্থই হলো পূর্ণ মূল্যের উপর মুরাবাহা চুক্তি করার সুযোগ না থাকা। সুতরাং মূল্যের একাংশ কমে যাওয়ার কারণে পূর্ণ মূল্যের উপর বর্ণনা করা ব্যতীত মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ হবে না।

لَوْهُ وَعَنْ أَيْسَى يُوسُفُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْح: লেখক এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর একটি মত উল্লেখ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, যদি দাসী কেনার পর সেটা কোনো কারণে কানা হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা এর পূর্বাপরের অবস্থা বর্ণনা না করে প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহা চুক্তি করতে পারবে না। ক্রেতা বলবে, আমি দাসীটিকে ক্রটিমুক্ত ক্রয় করেছিলাম, তারপর আমার কাছে আসার পর এর একচোখ দৃষ্টিহীন হয়েছে। এরপর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এ মাসআলাটিকে আরেকটি ঐকমত্যের মাসআলা দ্বারা শক্তিশালী করেন। আর তা এই যে, ক্রেতা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা তার কোনো কাজের দ্বারা দাসীর কোনো অংশ নষ্ট করে দেয় তাহলে তা বর্ণনা করা সকলের মতেই আবশ্যক। এ মাসআলাটির আলোচনা সামনের ইবারতে আসছে।

অতএব উক্ত মাসআলাতেও দাসীর ক্রটি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া ক্রেতার জন্য আবশ্যক হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সাথে ইমাম শাফি'য়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.) ঐকমত্য পোষণ করেন। ইমাম শাফি'য়ী (র.) অবশ্য নীতিগত কারণেই একমত পোষণ করেন। কারণ, তাঁর মতে গুণের বিপরীতে মূল্যের অংশ থাকে। সুতরাং গুণের অনুপস্থিতিতে মূল্য কমানো হবে। চাই সে গুণ প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হোক কিংবা ক্রেতার কর্মের দ্বারা নষ্ট হোক।

আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এজন্য বর্ণনা করা জরুরি যে, যদি দ্বিতীয় ক্রেতা অবগত হয় যে, প্রথম ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যটিকে ক্রটিমুক্ত অবস্থায় খরিদ করেছিল এবং উল্লিখিত মূল্যেই ক্রয় করেছিল তাহলে প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা প্রথম ক্রেতার জন্য বৈধ নয়। অতএব এখানেও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করার জন্য উক্ত বিষয় বর্ণনা করা জরুরি।

فَمَا إِذَا فَعَّاهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فَكَّاهَا أَجْنَبِيٌّ فَخَذَّ أَرْشَهَا لَمْ يَبْغِهَا مُرَابَحَةً حَتَّى  
يُبَيِّنَ، لِأَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِإِتْلَافٍ، فَيَقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا وَطَّيَهَا وَهَى  
بِكُرٍّ، لِأَنَّ الْعُذْرَةَ جُزْءٌ مِنَ الْعَيْنِ يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ، وَقَدْ حَبَسَهَا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا  
فَأَصَابَهُ فَرْضٌ فَإِذَا أَوْ حَرَّقَ نَارٍ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، وَلَوْ تَكَسَّرَ يَنْشُرُهُ  
وَوَطَّيَهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ، وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : তবে যদি ক্রেতা স্বয়ং দাসীর চোখ ফুঁড়ে দেয় অথবা অন্য ব্যক্তি তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তারপর সে জরিমানা আদায় করে তাহলে বর্ণনা করার পূর্বে মুরাবাহা রূপে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, নষ্ট করার কারণে গুণ উদ্ভিষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং এর বিপরীতে মূল্য আসবে। তদ্রূপ যদি কুমারী দাসীর সাথে সঙ্গম করে। কেননা, কুমারিত্ব মূল্যের অংশ, যার বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয়। আর ক্রেতা এ অংশটি রুখে দিয়েছে। যদি কেউ কাপড় খরিদ করে অতঃপর তা ইউরুরে কর্তন কিংবা আগুনের পোড়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কোনো বর্ণনা ছাড়াই প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহারূপে বিক্রি করতে পারবে, আর যদি সেটা খুলতে কিংবা ভাঁজ করতে গিয়ে ফেটে বা ছিড়ে যায় তাহলে বর্ণনা না করে বিক্রি করতে পারবে না- মাসআলার কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَا إِذَا فَعَّاهَا بِنَفْسِهِ الخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করছেন। এতে বলা হয়েছে যে, ক্রয়কৃত পণ্যের মাঝে যদি ক্রেতার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে এটা বর্ণনা করার পূর্বে প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে পারবে না।

প্রথম মাসআলা : যদি ক্রেতা দাসীর চোখ ফুঁড়ে দেয়/উপড়ে ফেলে অথবা কোনো তৃতীয় ব্যক্তি দাসীর চোখ ফুঁড়ে দেয় তারপর ক্রেতা উক্ত দোষী ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে তাহলে উক্ত দাসীকে মুরাবাহারূপে [প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে] বিক্রি করার জন্য শর্ত হলো- এ কথা বলে দেওয়া যে, আমি দাসীটি ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় খরিদ করেছিলাম, তারপর সেটাকে কানা করে দিয়েছি ইত্যাদি। এর দলিল হচ্ছে- চোখ নষ্ট করে দেওয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তির যা গুণ ছিল তা মূলে এবং উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। আর যেসব গুণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেগুলোর বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয়। ফলে মাসআলা এমন হয়ে গেল যেন, ক্রেতা দাসীর চোখ ফুঁড়ে দাসীর একটি অঙ্গ বিশেষ নিজের কাছে রেখে দিল। যদি দাসীর চোখ তৃতীয় পক্ষের কেউ ফুঁড়ে থাকে এবং এরপর ক্রেতা তার জরিমানা উসুল করে থাকে তাহলে যেন সে দাসীর একাংশ নিজের কাছে রেখে দিল। কারণ, কোনো জিনিসের বদল রাখা সেই বস্তু রাখারই নামান্তর। সুতরাং যদি ক্রেতা দাসীর চোখ কানা করে দেয় কিংবা দাসীর চোখ তৃতীয় কোনো ব্যক্তি কানা করে দেয় তাহলে উক্ত ঘটনা বর্ণনা না করে দাসীর প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে দাসীকে বিক্রি করতে পারবে না।

দ্বিতীয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি কুমারী দাসী ক্রয় করে এবং তার সাথে সঙ্গম করে তার কুমারিত্ব নষ্ট করে তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে তা বর্ণনা না করে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ দাসীর [নারী] কুমারিত্বের পর্দা এমন একটি দেহাংশ, যার পরিবর্তে মূল্য আবশ্যক হয়ে থাকে। অথচ ক্রেতা দাসীর কুমারিত্ব নষ্ট করার দ্বারা তার সেই

অংশকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, তাই মুরাবাহারূপে বিক্রি করার সময় একথা বলে দেওয়া আবশ্যিক যে, আমি দাসীটি কুমারী অবস্থায় এত টাকায় ক্রয় করেছিলাম, পরে আমার দ্বারা তার কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, কারও চোখ যদি এমনতেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর বর্ণনা করার আবশ্যিকতা নেই।

**তৃতীয় মাসআলা :** যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় কিনে ঘরে রাখে, অতঃপর কাপড়টি ইঁদুরে কাঁটে কিংবা এর একাংশ আগুনে জ্বলে যায় তাহলে মুরাবাহারূপে বিক্রি করার জন্য ইঁদুর কাটার কিংবা আগুনে জ্বলার কথা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কাপড় ক্রটিমুক্ত থাকা হচ্ছে একটি গুণ। এর বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ বিনিময় রূপে আসে না। তাই এর বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

**চতুর্থ মাসআলা :** পক্ষান্তরে [৪র্থ মাসআলা] যদি কাপড় খোলার কিংবা ভাঁজ করার সময় কাপড় ফেটে যায়/ ভেঙ্গে যায়- উল্লেখ্য যে, মসলিন, রেশম ও সিল্ক ইত্যাদি জাতীয় কাপড়ের ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, অসতর্কভাবে খোলার সময় কিংবা ভাঁজ করার সময় এসব কাপড় ফেটে যায়। মোটকথা, যদি এভাবে ফেটে কিংবা ভেঙ্গে যায়- তাহলে মুরাবাহা বিক্রির সময় এর বর্ণনা প্রদান করা আবশ্যিক। এর দলিল ইতিপূর্বে এমনই এক মাসআলায় বলা হয়েছে যে, পণ্যের গুণাবলির বিপরীতে মূল্য আবশ্যিক হয় না। তবে যদি গুণাবলি মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর বিপরীতে মূল্য আসে। আলোচ্য মাসআলাতে ক্রেতার খোলা এবং ভাঁজ করার কারণে কাপড়ের ক্রটিহীন হওয়ার গুণটি নষ্ট হয়ে গেছে। আর নষ্ট করার কারণে কাপড়ের ক্রটিমুক্ত হওয়ার গুণটি উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। যেহেতু নিখুঁত হওয়ার গুণটি উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে তাই এর বিপরীতে মূল্য আবশ্যিক হবে। আর এজন্য ক্রেতার পক্ষে উক্ত ক্রটিমুক্ত হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা ছাড়া মুরাবাহারূপে বিক্রি করা বৈধ হবে না।

وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَّاهُ

১. গুণের বিনিময়ে কোনো মূল্য আসে না
২. গুণ উদ্দেশ্য হলে তার বিনিময়ে মূল্য আসে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى غُلَامًا بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ نَسِئْتُهُ فَبَاعَهُ بِرِنْعٍ مِائَةٍ وَلَمْ يُسَيِّنْ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ ، لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شُبْهًا بِالْمِصْنَعِ ، أَلَا بَرَى أَنَّهُ يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِ الْأَجَلِ ، وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا وَبَاعَ أَحَدَهُمَا مَرَابَحَةً يَثْمِنُهَا ، وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمَرَابَحَةِ يُزِجِبُ السَّلَامَةَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْخِيَانَةِ ، فَإِذَا ظَهَرَتْ يُخَيَّرُ ، كَمَا فِي الْعَيْبِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে দাস ক্রয় করে একশত দিরহাম মুনাফা নিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা না করে বিক্রি করে দেয়, তাহলে [দ্বিতীয়] ক্রেতা যখন [বাকিতে ক্রয় করার বিষয়টি] জানতে পারবে তখন তার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। যদি সে ইচ্ছা করে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে অথবা যদি ইচ্ছা করে বিক্রয় গ্রহণ করতে পারে। কেননা, মেয়াদের সাথে বিক্রয় পণ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, মেয়াদের কারণে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। আর মুরাবাহার মধ্যে সন্দেহকে প্রকৃত অবস্থার সাথে যুক্ত করা হয়ে থাকে। ফলে এটা এমন হলো যে, এক ব্যক্তি দু'টি বস্তু ক্রয় করেছে, তারপর দুটোর একটাকে উভয়ের মূল্যে মুরাবাহারূপে বিক্রি করল। মুরাবাহা চুক্তি করার জন্য অগ্রসর হওয়া এ জাতীয় খিয়ানত থেকে মুক্ত হওয়াকে আবশ্যিক করে। সুতরাং যখন খিয়ানত পরিলক্ষিত হবে ক্রেতাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে, যেমন দোষ পাওয়া গেলে ইচ্ছাধিকার লাভ হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى غُلَامًا بِأَلْفٍ : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা চুক্তি সংক্রান্ত আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থের একটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এক ব্যক্তি বাকিতে একটি গোলাম এক হাজার টাকায় ক্রয় করল। তারপর গোলামটিকে একশত টাকা লাভে নগদে বিক্রি করে দিল। সে এখানে মুরাবাহা হিসেবে প্রথম মূল্যের উপর একশত টাকা মুনাফা নিল। কিন্তু তার ক্রেতাকে একথা জানাল না যে, সে গোলামটি বাকিতে কিনেছিল।

উল্লেখ্য যে, বাকি ও নগদ ক্রয় সমমানের নয়, সাধারণভাবে মানুষ নগদ বিক্রয়ের চেয়ে বাকি বিক্রয়ে লাভ বেশি করে। কারণ, নগদ বিক্রয়ে বিক্রেতার পুঁজি সাথে উঠে আসে। পক্ষান্তরে বাকি বিক্রয়ে তার পুঁজি ক্রেতার হাতে অনেক দিন পড়ে থাকে। দেখা যায় যে, যদি কোনো বিক্রেতা বাকিতে একটি পণ্য এক হাজার টাকায় বিক্রি করে তাহলে নগদে সেই একই পণ্য আটশত টাকায় বিক্রি করে। নগদ ও বাকির এই পার্থক্যের কারণে দ্বিতীয় ক্রেতা “প্রথম মূল্য বাকি ছিল” একথা না জানার কারণে এক ধরনের ধোকা ও প্রতারণার শিকার হলো, তাই ক্রেতা বিষয়টি জানার পর ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। সে মুরাবাহা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে অথবা এগার শত টাকায় বিক্রয় বহাল রাখতে পারে। ইমাম শাঈখী ও আহমদ (র.) একই মত পোষণ করেন।

উপরে বর্ণিত প্রতারণার শিকার হওয়ার বিষয়টি ছাড়া লেখক আরেকটি দলিল পেশ করেন। সেই দলিলের সারকথা হলো, বিক্রয়ের মূল্য পরিশোধের মেয়াদ বিক্রীত পণ্যের অনুরূপ একটি বিষয়। পণ্যের জন্য মানুষ যেমন মূল্য প্রদান করে, তেমনি

মেয়াদের কারণে মূল্য প্রদান করে অর্থাৎ মূল্য বাড়িয়ে দেয়। যেমন কোনো একটি পণ্য নগদ পাঁচশত টাকায় ক্রয় করা যায় সেই পণ্যটি বাকিতে কিনতে গেলে ছয়শত টাকা প্রদান করতে হয়। সুতরাং এতে দেখা যাচ্ছে মেয়াদের কারণে পণ্যটির মূল্য একশত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব মেয়াদের আলাদা একটি মূল্য থাকা প্রমাণিত হলো, যখন মেয়াদের স্বতন্ত্র মূল্য প্রমাণিত হলো তখন মেয়াদ পণ্যের অনুরূপ বিষয়ে পরিণত হলো। মুরাবাহা চুক্তিতে সন্দেহপূর্ণ বিষয়কে প্রকৃত বিষয়ের স্থানে রাখা হয়। এখানে মেয়াদ সন্দেহযুক্ত পণ্যে পরিণত হয়েছে, এজন্য এটাকে প্রকৃত পণ্য হিসেবে ধরা হবে। লেখক বলেন, যেন বিক্রয়টি এমন হলো যে, প্রথম ক্রেতা এক হাজার টাকার বিনিময়ে দু'টি জিনিস ক্রয় করল। একটি হলো ক্রীতদাস অন্যটি হলো মেয়াদ। তারপর দু'টির একটি অর্থাৎ শুধু ক্রীতদাস বিক্রি করে দিল দু'টির দামে [এক হাজার টাকায়], সেই সাথে একশত টাকা মুনাফাও গ্রহণ করল। যেহেতু প্রথম ক্রেতা দু'টি জিনিস কিনেছিল, আর বিক্রি করেছে দু'টির একটি, দু'টির দামে, তাই সে দ্বিতীয় ক্রেতার সাথে খিয়ানত করল। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুরাবাহা চুক্তির মাঝে খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ উভয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। এ মাসআলাতে মুরাবাহা চুক্তির দাবি হচ্ছে, এ জাতীয় খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা। কিন্তু প্রথম ক্রেতা যখন গোলামকে মুরাবাহারূপে বিক্রি করল, অথচ মেয়াদ সম্পর্কে কিছুই বলল না, তারপর ক্রেতা পরে যখন জানতে পারল যে, বিক্রেতা বাকিতে ক্রয় করেছে তখন সে তার এ বিক্রয় রাখা না রাখার ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। সে ইচ্ছা করলে এগার শত টাকার বিনিময়ে গোলাম কিনে নিতে পারে কিংবা বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে।

এটা **خيار عيب**-এর মতো। ক্রয়কৃত পণ্যে দোষ পরিলক্ষিত হলে যেমন ক্রেতা ইখতিয়ার লাভ করে তেমনি আলোচ্য মাসআলায় খিয়ানত প্রকাশ পেলে ইচ্ছাধিকার লাভ হবে।

وَأِنْ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِآلِفٍ وَإِمَائِهِ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ قَالَ :  
فَإِنْ كَانَ وَلَاهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَبَيِّنْ رَدَّهُ إِنْ شَاءَ ، لِأَنَّ الْخِيَانَةَ فِي التَّوَلِيَةِ مِثْلُهَا فِي  
الْمُرَابَحَةِ ، لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِآلِفٍ خَالَةً  
لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحا) أَنَّهُ يَرُدُّ الْقِيَمَةَ ، وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ ، وَهُوَ نَظِيرُ  
مَا إِذَا اسْتَوْفَى الزُّبُونُ مَكَانَ الْحِيَادِ ، وَعَلِمَ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ ، وَسَيَأْتِيكَ مِنْ بَعْدِ إِنْ  
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقِيلَ يُقَوِّمُ بِثَمَنِ حَالٍ وَيَثْمَنِ مُوَجَّلٍ ، فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا  
وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ ، وَلَكِنَّهُ مِنْجَمٌ مُعْتَادٌ قِيلَ لِأَبَدٍ مِنْ بَيَانِهِ ،  
لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ ، وَقِيلَ يَبْنَعُهُ وَلَا يُبَيِّنُهُ ، لِأَنَّ الثَّمَنَ حَالٌ .

অনুবাদ : যদি ক্রেতা পণ্যটি বিনষ্ট করে ফেলে, তারপর খিয়ানত সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তার এগারশত দিরহাম প্রদান করা আবশ্যিক হবে। কেননা, মেয়াদের পরিবর্তে কোনো মূল্য আবশ্যিক হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি সে দাসটিকে তাওলিয়ারূপে বিক্রি করে, অথচ মেয়াদের কথা বর্ণনা করেনি তাহলে ইচ্ছা করলে বিক্রয় প্রত্যাহ্বান করতে পারে। কেননা, তাওলিয়ার খিয়ানত মুরাবাহার খিয়ানতের মতো। কারণ, এতেও ভিত্তি রাখা হয়েছে প্রথম মূল্যের উপর। যদি ক্রয়কৃত পণ্য বিনষ্ট করে ফেলে, তারপর সে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে তাকে এক হাজার টাকা প্রদান করতে হবে। এর দলিল আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা বাজার মূল্য প্রদান করে তার প্রদত্ত পূর্ণ ধার্যমূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। এটা এ মাসআলার অনুরূপ যে, এক ব্যক্তি [ঋণ বাবদ] উত্তম মুদ্রার পরিবর্তে অচল মুদ্রা গ্রহণ করল এবং মুদ্রা খরচ করার পর বিষয়টি জানতে পারল। ইনশাআল্লাহ তোমার সামনে এ মাসআলাটি আসবে। কেউ কেউ বলেন, পণ্যটির নগদ ও বাকি উভয় মূল্য নির্ধারণ করবে। এরপর এ দু'মূল্যের মাঝে যত টাকার পার্থক্য সেটা ফেরত নিবে। আর যদি মেয়াদ শর্তকৃত না হয়, বরং প্রচলন মুতাবিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হয় তাহলে কারও কারও মতে এটা বর্ণনা করা আবশ্যিক। অন্যরা বলেন, বর্ণনা না করেই বিক্রি করে ফেলবে। কেননা মূল্য তো নগদে প্রদান করা হচ্ছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ : ইবারতের প্রথম মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি এক হাজার টাকায় একটি ক্রীতদাস বাকিতে ক্রয় করে অন্য ব্যক্তির কাছে এগারশত টাকায় মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করল, অথচ বিক্রেতা ক্রেতাকে একথা জানাল না যে, সে বাকিতে এক হাজারের বিনিময়ে দাসটি ক্রয় করেছিল, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামটি হালাক করে দিল। হালাক করা কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন সে বিক্রয় করে ফেলল,

অথবা আজাদ করে দিল কিংবা হত্যা করল ইত্যাদি। হালাক করার পর দ্বিতীয় ক্রেতা জানতে পারল যে, প্রথম ক্রেতা দাসটি বাকিতে কিনেছিল। অথচ তার কাছে বিক্রয় করেছে নগদে এবং বাকি মূল্যের উপর লাভ নিয়ে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতাকে এগারো শত টাকায় গোলাম নিতে হবে। কেননা, প্রকৃত পক্ষে মেয়াদের বিপরীতে মূল্য আসে না। মেয়াদের বিপরীতে টাকা আবশ্যক হয় সন্দেহের ভিত্তিতে। এখানে খিয়ানতের একটি সন্দেহ অবশ্যই থেকে যাচ্ছে, আর এই সন্দেহের কারণে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। সেই ইচ্ছাধিকার বলে ক্রেতা ইচ্ছা করলে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে। তবে বিক্রয় প্রত্যাহার করার জন্য শর্ত হচ্ছে বিক্রীত পণ্য অবশ্যই বর্তমান থাকতে হবে। যদি কোনো কারণে বিক্রীত পণ্য না থাকে তাহলে মুরাবাহা বিক্রি প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং তখন মেয়াদের কারণে মূল্যের কোনো অংশ বাতিল করতে পারবে না। বরং পূর্ণমূল্য প্রদান করতে হবে। মোটকথা, পণ্য বিনষ্ট/হাতছাড়া হয়ে গেলে ধার্যকৃত মূল্যের উপর ক্রেতাকে পণ্য নিতে হবে।

এতো গেল মুরাবাহা চুক্তির মাঝে যদি কোনো খিয়ানত পাওয়া যায় সে সংক্রান্ত আলোচনা। আর যদি তাওলিয়া চুক্তির মাঝে খিয়ানত পাওয়া যায় তাহলে কি হুকুম? এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি বাকিতে গোলাম কিনে সেই মূল্যে নগদে বিক্রি করে আর ক্রেতাকে এ সম্পর্কে কিছুই না জানায়, তারপর ক্রেতা জানতে পারে যে, বিক্রোতা পণ্যটি বাকিতে কিনেছিল, তাহলে [দ্বিতীয়] ক্রেতা এই অধিকার লাভ করবে যে, ইচ্ছা করলে সে তাওলিয়া বিক্রয়টি প্রত্যাহার করতে পারে এবং তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিয়ে নিতে পারে। ক্রেতার এই অধিকার লাভ করার কারণ হচ্ছে মুরাবাহা চুক্তির মতো তাওলিয়া চুক্তিতেও খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা, তাওলিয়া চুক্তির মূল/ভিত্তি হচ্ছে প্রথম মূল্য। এর কমও নয় আবার বেশিও নয়। এখানে মূল্য হচ্ছে এক হাজার, তার চেয়ে কম/বেশি নয়। তাই এক হাজার থেকে কমমানো সম্ভব নয়। তবে প্রথম ক্রেতা যেহেতু পণ্য/গোলাম বাকিতে কিনেছিল তাই সে নগদের চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করেছিল। আর এটা দ্বিতীয় ক্রেতা জানতে পারেনি। যদি জানত হয়তো বা পণ্য/গোলামটি প্রথম মূল্যের উপর খরিদ করত না, তাই যখন সে জানতে পারল প্রথম ক্রেতা বাকিতে খরিদ করেছে তখন তার পণ্য রাখা/না রাখার ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। এ সবই পণ্য হালাক হওয়ার পূর্বের কথা।

পক্ষান্তরে যদি পণ্য / গোলাম দ্বিতীয় ক্রেতার হাতছাড়া হয়ে যায়, তারপর সে জানতে পারে যে, প্রথম ক্রেতা পণ্যটি বাকিতে খরিদ করেছিল, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উল্লিখিত মূল্যেই পণ্য/দাসটি ক্রয় করা আবশ্যক হবে। বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার লাভ হবে না। কারণ, বিক্রয় প্রত্যাহার [বিক্রীত পণ্য/দাস হাতছাড়া হওয়ার কারণে] অসম্ভব। তাছাড়া [দ্বিতীয় দলিল এই যে,] ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মেয়াদের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে কোনো মূল্য আবশ্যক হয় না। তাই পুরো মূল্য প্রদান করতে হবে। মূল্য থেকে কোনো অংশ কমমানো হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে একটি অভিমত বর্ণিত আছে যে, বিক্রীত-পণ্য হালাক হওয়ার পর ক্রেতা যদি খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে সে বিক্রীত পণ্যের বাজারমূল্য ফেরত দিবে এবং এর ধার্যকৃত মূল্য (ثمن) বিক্রোতা থেকে ফেরত নিবে। আর এ বিধান তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সে এটা করতে পারে। কারণ সাধারণত ক্রয়মূল্য বাজার মূল্য থেকে বেশি হয়ে থাকে। ক্রয়মূল্য ফেরত নেওয়ার দ্বারা তার সামান্য মুনাফা হবে। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন বাজার মূল্য ক্রয় মূল্য থেকে বেশি অথবা ক্রয়মূল্যও বাজারমূল্য সমান সমান। এ অবস্থায় বাজার মূল্য প্রদান করার অর্থ হচ্ছে এই যে, পণ্যটিকেই ফেরত দেওয়া। কারণ, যে কোনো বস্তুর বাজারমূল্য-তেন সেই বস্তু। অথবা বলা যায় যে কোনো বস্তুর বাজারমূল্য প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু বস্তু হালাক হয়ে গেছে তাই বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর বাজারমূল্য ফেরত দিবে এবং প্রদানকৃত ক্রয় মূল্য ফেরত নিবে।

এ মাসআলার নজির এই যে, এক ব্যক্তি [খালেদ] রাশেদের কাছে দশ দিরহাম ঋণ হিসেবে পায়। ঋণদাতা সচল দিরহাম প্রদান করেছিল। পরে ঋণদাতা রাশেদের কাছ থেকে সচল দিরহামের পরিবর্তে খাদমুত্ত দিরহাম আদায় করে নিল এবং তা খরচ করে ফেলল। অতঃপর সে জানতে পারল যে, সে খাদমুত্ত দিরহাম আদায় করেছিল। এমতাবস্থায় ঋণদাতা খাদমুত্ত দিরহাম প্রদান করবে এবং তার প্রদত্ত উত্তম দিরহাম ফিরিয়ে নিবে। লেখক বলেন, এ মাসআলা সামনে [কিতাবুস সারফ-এর পূর্বে مَسَائِلُ مُفْتَرَاة -এর মধ্যে] আসবে।



قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقْرَمُ يَمْنَنُ حَالٍ وَيَمْنَنُ مُؤَجَّلٍ الْخ : লেখক কতিপয় আলেমের অভিমত উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে এ ইবারতটুকু এনেছেন. قِيلَ -এর প্রবক্তা হচ্ছেন ফকীহ আবু জা'ফর আল হিনদাওয়ানী। তিনি বলেন, এ মাসআলায় নগদ মূল্যও বাকি মূল্যের মাঝে তুলনা করে দেখবে কত দিরহাম/টাকার পার্থক্য। এ দু'য়ের মাঝে যে পরিমাণ টাকার পার্থক্য সেটুকু দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা থেকে ফেরত নিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম ক্রেতা দশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাকিতে একটি দাস ক্রয় করল। অথচ দাসটির নগদ মূল্য বাজারে আছে আট হাজার টাকা। দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা থেকে দশ হাজার টাকার উপর তাওলিয়া করে দাসটি কিনে নেওয়ার পরে জানতে পারল যে, প্রথম ক্রেতা বাকিতে [দশ হাজার টাকায়] ক্রীতদাসটি কিনেছিল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা থেকে দু'হাজার টাকা ফেরত নিবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ফকীহ আবু জা'ফর (র.)-এর এ মতটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতা থেকে মেয়াদের শর্ত গোলামটি কিনে থাকে।

পক্ষান্তরে যদি সমাজের প্রচলন এমন থাকে যে, দশ হাজার টাকায় মেয়াদের কোনো শর্ত ছাড়াই গোলাম ক্রয় করা সম্ভবও লোকেরা [এ জাতীয় ক্রয়ে] মূল্য কিস্তিতে আদায় করে তাহলে ক্রেতা যখন এ গোলামটিকে মুরাবাহা কিংবা তাওলিয়ারূপে নগদে বিক্রি করতে ইচ্ছা করবে তখন তার ক্রেতাকে তার কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার ঘটনা বলে নিবে। আর বলে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব। কারণ, শরিয়তের একটি নিয়ম এই যে, اَلْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ অর্থাৎ যে বিষয় সমাজে প্রচলিত তা শর্ত করার মতোই। সুতরাং যেন কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্ত করা হয়েছে। আর নিয়মানুযায়ী শর্তকৃত বিষয় বর্ণনা করা আবশ্যিক। তবে কতিপয় লোক বলেছেন, এভাবে বর্ণনা করা আবশ্যিক নয়। কারণ চুক্তির মধ্যে যেহেতু মেয়াদের উল্লেখ নেই তাই প্রথম চুক্তির মূল্যও নগদে পরিশোধ করা হবে এটাই স্বাভাবিক। যখন প্রথম চুক্তি নগদে সম্পন্ন হয়েছে তখন নগদে বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই।

বাকি রইল কিস্তিতে পরিশোধ সেতো পারস্পরিক সমঝোতা ও প্রচলন অনুসারে হয়েছে। দ্বিতীয় বিক্রির ক্ষেত্রেও প্রচলন হিসেবে এর প্রয়োগ সম্ভব।

قَالَ : وَمَنْ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَحْرِى بِكَيْفَ قَامَ عَلَيْهِ  
فَالْبَيْعُ فَايِدٌ لِّجَهَالَةِ الثَّمَنِ، فَإِنْ أَعْلَمَهُ الْبَايِعُ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ  
أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، لِأَنَّ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقَرَّرْ، فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِي الْمَجْلِسِ جُمِلَ  
كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، وَصَارَ كَتَاخِيرِ الْقَبُولِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْإِفْتِرَاقِ قَدْ تَقَرَّرَ فَلَا  
يُقْبَلُ الْإِصْلَاحُ وَنَظِيرُهُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِرَقْمِهِ إِذَا أَعْلَمَ فِي الْمَجْلِسِ يُتَخَيَّرُ لِأَنَّ الرِّضَاءَ لَمْ  
يَتِمَّ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فَيُتَخَيَّرُ كَمَا فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ কোনো দ্রব্য কারো কাছে “তার যা পড়তায় পড়েছে” এর বিনিময়ে তাওলিয়ারূপে বিক্রয় করে। আর ক্রেতা-বিক্রেতার কত পড়তায় পড়েছে তা না জানে, তাহলে মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। যদি বিক্রেতা [চুক্তি অনুষ্ঠানের] মজলিসে তা জানিয়ে দেয় তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। যদি সে চায় তাহলে তা রাখবে নতুবা সে বিক্রয় বাদ দিবে। কেননা, ফাসাদ তখনও স্থিত হয়নি। সুতরাং যখন মজলিসে এ ব্যাপারে জানা গেল তখন সেটা চুক্তি শুরুতে জানার মতোই হলো এবং মজলিসের শেষাংশে সম্মতি প্রদানের মতোই হলো। পক্ষান্তরে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ফাসাদ স্থিত হয়ে গেছে। সুতরাং [তখন] সংশোধনের সুযোগ নেই। এর দৃষ্টান্ত হলো, গায়ের দামে পণ্য বিক্রি [বৈধ], যদি মজলিসে গায়ের দাম জানা সম্ভব হয়, আর ক্রেতার ইচ্ছাধিকার এ কারণে লাভ হবে যে, মূল্য জানার পূর্বে তার সম্মতি পরিপূর্ণ ছিল না। সুতরাং [না দেখা বস্তু] দেখার পর ইচ্ছাধিকার লাভ করার ন্যায় এখানেও ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাটির মূল ইবারত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর আল জামিউস সাগীর থেকে চয়ন করা হয়েছে। মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, কোনো ব্যক্তি একটি দ্রব্য ক্রয় করে সেটাকে অন্য এক ব্যক্তির কাছে এই বলে তাওলিয়ারূপে বিক্রি করল যে, এই দ্রব্যটি আমার যা পড়তায় পড়েছে সেই মূল্যে আমি বিক্রি করলাম। অথচ বিক্রেতার কত পড়তায় পড়েছে তা ক্রেতার জানা নেই তাহলে ক্রেতার কাছে মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, সর্বসম্মত নিয়মানুযায়ী মূল্য অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। সেই নিয়মানুযায়ী আলোচ্য বিক্রয়টিও ফাসিদ হয়ে যাবে।

তবে আলোচ্য মাসআলাটিও সহীহ হয়ে যেতে পারে, যদি বিক্রেতা তার কত পড়তায় পড়েছে একথাটি মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্রেতাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু প্রথমে মূল্য অজ্ঞাত থাকার পর মজলিস শুরু হওয়ার পূর্বে ক্রেতা মূল্যের পরিমাণ জানতে পারলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। সে ইচ্ছা করলে উক্ত পণ্য নিতে পারে আবার নাও নিতে পারে। এ অবস্থায় বিক্রি বৈধ হওয়ার দলিল এই যে, বিক্রয়ের মজলিস পরিবর্তন না হওয়ার কারণে ফাসাদ এখন সুদৃঢ় হয়নি। মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ জানা আর মজলিসের প্রথমভাগে জানা একই কথা। কারণ মজলিসের পুরো সময় একটি সময় হিসেবে ধর্তব্য বা বলা যায় মজলিসের পুরো সময় একত্রে একটি ইউনিট। এর শুরু, মধ্য এবং শেষভাগ সব একই হুকুম

রাখে। সুতরাং মজলিস এর প্রথমভাগে মূল্যের পরিমাণ জানলে যেমন বিক্রয় বৈধ হয় তেমনি বিক্রয়ের মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ জানলেও বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ প্রকাশ করার উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি বিক্রয় চুক্তির উদ্দেশ্যে بَعْتُ বলল, প্রতি উত্তরে ক্রেতা মজলিসের শেষভাগে বলল اشترتُ তাহলে এর মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এ মাসআলা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মজলিসের শেষাংশ পর্যন্ত বিক্রয় কবুল করার সুযোগ আছে। যেহেতু মজলিসের শেষাংশ পর্যন্ত কবুল করার সুযোগ আছে তেমনি মূল্যের পরিমাণ জানার সুযোগ মজলিসের শেষাংশ পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। হাঁ, তবে মজলিস শেষ হওয়ার পর মূল্য সম্পর্কে অবগত হলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। কেননা, মজলিস শেষ হওয়ার দ্বারা ফাসাদ সুদূত হয়ে গেছে। যে ফাসাদ সুদূত হয়ে যায় তাকে কোনোভাবে সংশোধন করা যায় না। অতএব বিক্রয়ের মজলিস পরিবর্তন হওয়ার পর মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হলে বিক্রয় বৈধ হবে না।

লেখক এ মাসআলার স্বপক্ষে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আর তা এই যে, এক ব্যক্তি গায়ের দামে একটি কাপড় বিক্রি করল। অর্থাৎ বিক্রেতা বলল, কাপড়ের গায়ে যে দাম লেখা আছে সেই মূল্যে আমি কাপড়টি বিক্রি করলাম। তাহলে ক্রেতার কাছে কাপড়ের দাম অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয়টি ফাসিদ হবে। কারণ মূল্য অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় ফাসিদ হয়। তবে যদি বিক্রেতা মজলিসের মধ্যে ক্রেতাকে কাপড়ের গায়ের দাম জানিয়ে দেয় তাহলে বিক্রয় সম্পন্ন ও বৈধ হয়ে যাবে। তবে ক্রেতা ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। কেননা মূল্য জানার পূর্বে তার সন্তুষ্টি অপরিপূর্ণ ছিল। ক্রেতার অসন্তুষ্টি অবস্থায় বিক্রয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ক্রেতা পণ্য নেওয়ার/ না নেওয়ার ইচ্ছাধিকার থাকে। এ কারণে ক্রেতা এ বিক্রয় মূল্য জানার পর ইখতিয়ার লাভ করবে। লেখক বলেন, এই ইখতিয়ার অনেকটা خِيَارُ رُؤْيَةٍ -এর মতো, خِيَارُ رُؤْيَةٍ -এর মধ্যে ক্রেতার অদেখা বস্তু কেনার পর যেমন দেখার পর ইখতিয়ার লাভ হয় তেমনি আলোচ্য মাসআলা তথা بَيْعٌ بِالرَّقْمِ -এর মধ্যেও ইখতিয়ার অর্জিত হবে।

এখানে একটি আপত্তি হতে পারে যে, আলোচ্য মাসআলাতে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার না পাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। কারণ ইতিপূর্বে দলিল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মজলিসের শেষভাগে যা হয় তা প্রথমে হওয়ার মতোই। যদি তাই হয় তাহলে মজলিসের প্রথমে মূল্য জানলে তো কোনো ইখতিয়ার লাভ হয় না তাহলে শেষে জানলে ইখতিয়ার কেন হবে? এর উত্তর এই যে, মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ জানার পর কোনো সম্মতি পাওয়া যায়নি যেমন মজলিসের শুরুতে সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। তাই ইখতিয়ার প্রদানের মাধ্যমে তার সম্মতি জানার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

فَصَلِّ : وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا يَنْقُلُ وَيَحْوِلُ لَمْ يَجْزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَبْقِضَهُ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَبْقِضْ، وَلَئِنْ فُيُوهَ غَرَّرَ أَنْفُسَاجَ الْعَقْدِ عَلَى إِعْجَابِ الْهَلَائِ.

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ. যদি কোনো ব্যক্তি অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য কোনো বস্তু ক্রয় করে তাহলে সেটাকে কজা [আয়ত্ত] করার পূর্বে বিক্রি করা তার জন্য বৈধ নয়। কেননা, রাসূল ﷺ কজার বাইরের বস্তু বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এ কারণেও বৈধ নয় যে [এতে বস্তু হালাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় চুক্তিটি বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصَلِّ : প্রথমত অবগত হওয়া আবশ্যক যে, এ অনুচ্ছেদের মাসআলাগুলো মুরাবাহা ও তাওলিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার আলোচনায় এ বিষয়গুলো আনার যুক্তি কোথায়? এর উত্তরে ভাষ্যগ্রন্থ “ইনায়া” তে বলা হয়েছে যে, মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মধ্যে যেমন সাধারণ বিক্রির চেয়ে অতিরিক্ত শর্ত বিদ্যমান থাকে, তেমনি এ মাসআলাগুলোতেও অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে।

বর্ণিত মাসআলাটি এই যে, যদি কেউ অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য কোনো বস্তু ক্রয় করে তাহলে তা কজা করার পূর্বে অন্যত্র বিক্রি করা বৈধ নয়। লেখক বিক্রি করার উল্লেখ করেছেন যাতে মাসআলাটি হানাফী মাযহাবের ইমামগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয়। কারণ বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য লেনদেন যেমন হেবা সদকা ইত্যাদির ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। এখন মাসআলাটির শিরোনাম এই যে, কজা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়, অবশ্য ইমাম মালিক (র.)-এর এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, খাদা জাতীয় দ্রব্য ব্যতীত আর সবই কজা করার পূর্বে বিক্রি করা যায়। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর এবং ইবনে ওমর (র.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীস-  
 إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَبْقِضَهُ.

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস-

رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَفِي لَفْظٍ حَتَّى يَبْقِضَهُ.

হাদীস দুটির বক্তব্য সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে খাদা দ্রব্য কজা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়। হাদীসের মধ্যে খাদা দ্রব্যকে খাস করা হয়েছে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাব প্রমাণিত হয়।

আমাদের দলিল এই যে, হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীসের শেষাংশে তার ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য। তিনি বলেন - وَلَقِبُ -  
 أَوْثَاقُ - আমি [ইবনে আক্বাস] মনে করি অন্যান্য সব বস্তু খাদাদ্রব্যের মতো। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর এই বক্তব্য সীহাহ সিত্তার ছয়টি কিতাবেই সহীহ সনদে বিদ্যমান। নিয়মানুযায়ী কোনো হাদীসের রাবীরা মাযহাব যদি হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে সেই হাদীস দলিলযোগ্য থাকে না। অতএব হাদীসের طَعَامٌ [খাদাদ্রব্য] সম্পর্কে বলা হবে যে, শব্দটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, তাখসীসের উদ্দেশ্যে শব্দটি আনা হয়নি।

এছাড়া হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অপর একটি হাদীস আমাদের দলিল। প্রথম হাদীস-

أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصَمَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ابْتِئَاعَ هَذِهِ الْبُيُوتِ وَأَرِيسُهَا وَمَا يَحْرُمُ قَالَ لَا تَبِيعُهُنَّ مِثْنًا حَتَّى تَقْبِضَهُ .

অর্থ- হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.) বলেন, আমি [রাসূল কে] বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি বিভিন্ন কেনা-বেচা করি, এগুলোর কোনটি আমার জন্য বৈধ, আর কোনোটি অবৈধ। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কোনো কিছু কজা না করে বিক্রি করো না।

এ হাদীসে সব জিনিসকে কজা করার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

অপর হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتِئَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِقَبْنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي فِيهِ رِبْعًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِزُرْعِي فَأَلْتَفْتُ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ كَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِيعَهُ حَيْثُ ابْتِئَعْتَهُ حَتَّى تَحْوِزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعُ حَيْثُ تَبْتِئَاعُ حَتَّى يَحْوِزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رَحَالِهِمْ .

অর্থ- হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি একদা বাজারে কিছু তেল কিনলাম। যখন আমি বিক্রয় সম্পন্ন করলাম আমার সাথে এক লোক সাক্ষাত করে ভাল মুনামা দিয়ে আমার তেল নিতে চাইল। তার কথায় যখন আমি রাজি হলাম এবং তেল তাকে প্রদান করার ইচ্ছা করলাম। ঠিক তখন পিছন থেকে এক ব্যক্তি আমার বাহুকে ধরে ফেলল। আমি তাকিয়ে দেখি, লোকটি যায়েদ ইবনে সাবিত। তিনি বললেন, যেখানে ক্রয় করেছে সেখানেই বিক্রি কর না, তোমার ঘরে নেওয়ার পূর্বে। কেননা, রাসূল ﷺ ক্রয়ের স্থানে পণ্য বিক্রয় করাকে নিষিদ্ধ করেছেন যে পর্যন্ত না পণ্যকে ব্যবসায়ীরা তাদের সংরক্ষণের স্থানে না পৌছায়।

এ হাদীসটি দ্বারা দুটি নিয়ম প্রমাণিত হয়-

১. যে কোনো দ্রব্য ক্রয়ের পর কজা না করে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২. দ্রব্যটি স্থানান্তরযোগ্য হলে সংরক্ষিত স্থানে এটাকে সংরক্ষণ ও কজা করে রাখতে হবে।

মোটকথা, উভয় হাদীস দ্বারা কজা করার পূর্বে বিক্রয় করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। যৌক্তিক দলিল এই যে, ক্রয়কৃত পণ্য কজা করার পূর্বে বিক্রি করা হলে চুক্তি বাতিল হওয়ার ধোকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এর ব্যাখ্যা এই যে, রাশেদ একটি গোলাম ক্রয় করল, তারপর গোলাম কজা করার পূর্বে সেটা খালেদের কাছে বিক্রি করে দিল। পরে দেখা গেল যে, গোলামটি প্রথম বিক্রোতা থেকে কজা করার পূর্বে প্রথম বিক্রোতার হাতেই হালাক হয়ে গেছে। ফলে [খালেদ ও রাশেদের মাঝে সংঘটিত] দ্বিতীয় বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, প্রথম বিক্রোতা ও রাশেদের মাঝে সংঘটিত বিক্রয় পণ্য হালাক হয়ে যাওয়ার কারণে প্রথম বিক্রি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় বিক্রয়টি প্রত্যর্থাৎ বলে সাব্যস্ত হলো। যেহেতু দ্বিতীয় বিক্রয়ের মাঝে প্রত্যর্থাৎ সন্ধান সৃষ্টি হয়েছে কজা না করার কারণে, তাই কজা করার পূর্বে কোনো কিছু বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যর্থাৎমূলক যে কোনো লেন-দেন নিষিদ্ধ।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رح)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يَجُوزُ رُجُوعًا إِلَى إِبْطَالِ الْحَدِيثِ وَاعْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ، وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ، وَلَهُمَا أَنْ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَلَا غَرَرٌ فِيهِ، لِأَنَّ الْهَلَكَ فِي الْعِقَارِ نَادِرٌ، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ، وَالْغَرَرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَرَرُ انْفِسَاحِ الْعَقْدِ، وَالْحَدِيثُ مَغْلُوبٌ بِهِ عَمَلًا بِدَلَالَةِ الْجَوَازِ، وَالْإِجَارَةُ قِيلَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَلَوْ سُلِمَ فَالْمَعْفُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ، وَهَلَكَهَا غَيْرُ نَادِرٍ -

অনুবাদ : আর ইমাম আবু হানীফা (র.) ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে কজা করার পূর্বে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হাদীসটিকে নিঃশর্ত ধরে এবং অস্থাবর সম্পদের উপর কিয়াস করে বলেন, বৈধ হবে না। আর এটা ইজারাচুক্তির মতো হলো। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রয়চুক্তির রুকন যোগ্য ব্যক্তির থেকে প্রকাশ পেয়েছে, আর তা যথাপাঠে প্রয়োগ হয়েছে। আর এতে [চুক্তি বাতিল হওয়ার] কোনো ঝুঁকি নেই। কেননা, স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা বিরল। অস্থাবর সম্পত্তি এমন নয়। আর [হাদীসে] যে ঝুঁকি নিষিদ্ধ হয়েছে তা হলো চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি। [চুক্তির বৈধতার] দলিলসমূহের উপর আমল করার ভিত্তিতে হাদীসটি চুক্তি বাতিল হওয়ার ঝুঁকি থাকার কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ইজারা কারও কারও মতে এরূপই বিরোধপূর্ণ। আর যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, ইজারা একমতের মাসআলা, তবে [এর জবাব হলো,] ইজারায় চুক্তিকৃত বিষয় হলো সুবিধাভোগ। আর তা বিনষ্ট হওয়া বিরল নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُفِيَ الْعِئَارِ الْخ: উপরিউক্ত ইবারতে স্থাবর সম্পদ কজা করার পূর্বে বিক্রি করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধসহ আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো, স্থাবর ও অস্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি কজা না করেই বিক্রি করা যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো, স্থাবর সম্পত্তিও অন্যান্য সম্পদের মতো কজা না করে বিক্রি করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল—

- ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হাদীসের শব্দ মূলতাক এবং শর্তহীন। যেমন— হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে— لَا يَجُوزُ شَيْئًا حَتَّى تَقْبَضَ [যে কোনো জিনিস] কথাটি মূলতাক। এর মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সবই शामिल। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তিকে হাদীসের মূলতাক বক্তব্য থেকে পৃথক করা অনুচিত।
- ইমাম মুহাম্মদ (র.) অস্থাবর সম্পদের উপর স্থাবর সম্পত্তিকে কিয়াস করেন। অস্থাবর সম্পদ যেমন কজা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়, তেমনি স্থাবর সম্পত্তি কজা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ, বিক্রি অবৈধ হওয়ার ইল্লাত উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। লেখক বলেন, স্থাবর সম্পত্তির বিক্রি ইজারা প্রদানের মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি কজা করার পূর্বে যেমন ইজারা দেওয়া যায় না, তেমনি তা কজা করার পূর্বে বিক্রি করা যায় না। তাছাড়া মালিকানা লাভের সবব এখানে বিক্রয়। বিক্রয় পরিপূর্ণ হয় কজা দ্বারা। অতএব মালিকানা পরিপূর্ণ হবে কজা দ্বারা। মালিকানার পূর্ণতা বিক্রয়ের জন্য আবশ্যক। অতএব বিক্রয়ের পূর্বে কজা করা জরুরি।

শায়খাইনের দলিল-

১. শায়খাইনের প্রথম দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস-**نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّلْعِ حَتَّى يَحْزَمَ التَّجَارَ** -এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ কজা করার পূর্বে বিক্রি করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, স্থানান্তরযোগ্য মালামাল কজা করার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ- যে কোনো সম্পদ কজা করার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ নয়।

২. **أَنْ رُكِّنَ السَّبْعَ صَدْرَ مَنْ أَمْلَأَ بَيْتَ مَحْلَبٍ** - লেখক বলেন, শায়খাইন (র.)-এর আকলী বা যৌক্তিক দলিল হলো, বিক্রয়ের রুকন তথা ইজাব কবুল প্রকাশ পেয়েছে বিক্রয় করার যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে এবং তা প্রয়োগ হয়েছে যথাস্থানে। অর্থাৎ যেহেতু ইজাবকারী ও কবুলকারী যোগ্য ব্যক্তি এবং পণ্য বিক্রয়েরও উপযুক্ত, সুতরাং বিক্রয় সংঘটনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। বাকি রইল পণ্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে দ্বিতীয় ক্রেতার প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনা- এতো দূর হলো না। এ ব্যাপারে শায়খাইন (র.)-এর জবাব হলো, এ সম্ভাবনা স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে খুবই কম। কারণ, স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিরল হওয়ার কারণে প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনাও বিরল। আর দলিলের ক্ষেত্রে বিরল বিষয়কে বিবেচনায় রাখা হয় না। অতএব স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতারণিত হওয়ার বিষয় প্রায় না থাকার কারণে স্থাবর সম্পত্তি কজা করার পূর্বে বিক্রি করতে কোনো সমস্যা নেই।

কতিপয় মাশায়েখ বলেন, যেসব স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে বিনষ্ট হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে যেমন নদী কিংবা সাগরের কাছের জমি- সেগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত মত নয়। এগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত অস্থাবর সম্পদের মতোই। ইমাম মাহবুবী (র.) এ মতই বর্ণনা করেছেন এবং 'ইখতিয়ার' গ্রন্থেও একদম বর্ণনা রয়েছে।- [ফাতহুল কাদীর]

**قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ السَّنْهُي عَنْهُ غَرَرُ نَيْسَاغِ الْخ** : লেখক এ বাক্যটি দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি আরোপিত হয়েছিল শায়খাইনের মায়হাবের উপর। প্রশ্নটি হলো, কজার পূর্বে অস্থানান্তরযোগ্য ও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলে তাতেও প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা এভাবে যে, কোনো তৃতীয় ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকার দাবি করে যদি সম্পত্তি নিয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতার ক্রয়কৃত জমিন তার অধীন থাকবে না। আর তখন [দ্বিতীয়] ক্রেতা প্রতারণিত হবে। এর উত্তর হলো, হাদীসের মধ্যে যে প্রতারণার নিষেধ করা হয়েছে সেটা প্রথম চুক্তি বাতিল হওয়া সংক্রান্ত আশঙ্কা। যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি, জমিজমা কজা করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাই এগুলোর মধ্যে প্রথম চুক্তি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন কেউ কেউ করে থাকেন। প্রশ্নটি হলো, একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বস্তু জিম্মায় আসেনি তার দ্বারা মুনাফা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। জমিন বা স্থাবর সম্পত্তি কজা না করে যদি মুনাফায় বিক্রি করা হয়, তাহলে তো হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।

দ্বিতীয়ত অপর একটি হাদীসে এসেছে যে, **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ** অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কজা না করে কোনো দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।' এ দুটি হাদীস দ্বারা কজার পূর্বে যে কোনো জিনিস বিক্রি করা এবং এর দ্বারা মুনাফা নেওয়ার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় শায়খাইন (র.) কিভাবে হাদীসদ্বয়ের বিপরীত অবস্থান নিলেন? এর উত্তর হলো, কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উন্মত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্থানান্তরযোগ্য এবং অস্থানান্তরযোগ্য উভয় প্রকার পণ্য কজার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- **أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও বৈধ করেছেন। হাদীস-

**يَا مَعْزَرَ التَّجَارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِنَّمْ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَتَوَارَا بَيْنَكُمْ بِالسَّادِقِ**

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! শয়তানও পাপ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় আগমন করে, সুতরাং তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে দান-সদকা কর, যাতে কৃত পাপ মোচন হয়ে যায়।' এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি লোকজন বোচা-কেনা করে আসছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগে সংঘটিত সে সব বোচা-কেনা করার ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেননি; বরং বোচা-কেনাকে সমর্থন করেছেন। আর রাসূলের পর অদ্যাবধি এর প্রচলন রয়েছে। অতএব এর উপর উম্মতের ইজমা হয়েছে। উপরিউক্ত তিন দলিলের আলোকে বলা যায় যে, স্থানান্তরযোগ্য কিংবা অস্থানান্তরযোগ্য উভয় প্রকারের পণ্য কজা করার পূর্বে ও পরে বিক্রি করা বৈধ।

কিন্তু আয়াতের অপরাংশ حَرَّمَ الرِّبَا-এর দ্বারা বিশেষ কয়েক প্রকার [যেমন- জিনস ও পরিমাণ এক হওয়ার পর কমবেশি বিক্রয় করা ইত্যাদি] নিষেধ করা হয়েছে। ফলে আয়াতের বিক্রয়ের হুকুম ও হাদীসসমূহ الْبَعْضُ مِنْهُ الْبَعْضُ হয়ে গেছে।

উসুল ফিকহের নিয়মানুযায়ী الْبَعْضُ مِنْهُ الْبَعْضُ কে-خَرِ وَاجِدْ দ্বারা বাস করা যায়। সে নিয়মানুসারে نَهَى عَنْ-ইয়াসের নিয়মানুসারে الْبَعْضُ مِنْهُ الْبَعْضُ কে-نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَبْيَضْ وَرَبْعَ مَا لَمْ يَبْشُرْ বিধান হচ্ছে কজা করার পূর্বে কোনো দ্রব্য বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে শেষোক্ত হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসটি সেসব বস্তু সম্পর্কে প্রযোজ্য, যেগুলো সহজে বিনষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে প্রথম চুক্তি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় ক্রোতা প্রতারিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রতারণা করা শরিয়তে নিষিদ্ধ। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস, نَهَى عَنْ بَيْعِ الْفَرْقِ আর এ প্রতারণার সম্ভাবনা বেশি হচ্ছে স্থানান্তরযোগ্য ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। আর এজন্যই স্থানান্তরযোগ্য মালামাল কজা করার পূর্বে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। যেহেতু স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে প্রতারিত হওয়ার এরূপ সম্ভাবনা নেই, তাই স্থাবর সম্পত্তি কজা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ হবে।

تَوَلَّى وَالْإِجَارَةُ وَيُتَلَّ عَلَى هَذَا الْخَلَابِ: লেখক এখান থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি কiyাসের জবাব দিচ্ছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কiyাস করেছিলেন বিক্রয়কে ইজারার উপর। অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি কজা করার পূর্বে যেমন ইজারা দেওয়া যায় না, তেমনি স্থাবর সম্পত্তি কজা করার পূর্বে বিক্রি করা যাবে না। তাঁর কiyাসের জবাব দু-ভাবে প্রদান করা হয়েছে। প্রথমোক্ত বলা হয়েছে যে, 'ইজারা' কোনো সর্বসম্মত মাসআলা নয়, যার দ্বারা স্বীয় বক্তব্যের শক্তি যোগানো যাবে; বরং এতে বিক্রয়ের অনুরূপ মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি জায়গা/ বাড়ি খরিদ করে কজা করার পূর্বেই তাড়া দিতে চায়, তাহলে সেখানেও শায়খাইনের মতে তা বৈধ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা অবৈধ।

কিন্তু উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, "ফাতওয়া জাহিরিয়াহ" গ্রন্থে সহীহভাবে বর্ণিত আছে যে, কজার পূর্বে ইজারা প্রদান করা সকলের ঐকমত্যে অবৈধ, এতে কারো দ্বিমত নেই। [ইজারার] সুবিধাভোগ স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্যের মতো। স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্য যেমনটা কজার পূর্বে বিক্রি করা বা ইজারা দেওয়া যায় না, সুবিধাভোগও ঠিকই তাই। আল-কাফী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এ মাসআলার উপরই ফতোয়া।

দ্বিতীয় জবাব লেখক এভাবে প্রদান করছেন যে, اَرْثَاً وَلَوْ سَلِمَ অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, ইজারার মাসআলাটি ঐকমত্যের [আসলেও তাই- ইতঃপূর্বে আমরা যা আলোচনা করলাম] তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কiyাসের জবাব এই হবে যে, ইজারা হচ্ছে সুবিধাভোগের মালিক হওয়া। অর্থাৎ ইজারার মধ্যে চুক্তিকৃত বিষয়টি হচ্ছে 'সুবিধাভোগ'। আর সুবিধাভোগ বিনষ্ট বা হালকা হওয়া বিরল নয়; বরং এটা অস্থাবর সম্পত্তির মতো। অস্থাবর সম্পত্তি যেমন দ্রুত হালকা হয় তেমনি সুবিধাভোগ দ্রুত হালকা হয়। তাই এটার উপর স্থাবর সম্পত্তির কiyাস করা সঠিক নয়। কারণ, স্থাবর সম্পত্তি সহজে বিনাশ হয় না।



قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى مَكَابِلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاسْتَأْهَلَهُ أَوْ أَتْرَفَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مَكَابِلَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَحْزُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يُعْبِدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، لِأَنَّ النَّيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَذَلِكَ لِلْبَائِعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ، فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ مُجَازَفَةً، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ পাত্রের সাহায্যে পরিমাপিত বস্তু পাত্র দিয়ে পরিমাপ করে অথবা ওজনে [বাটখারা ইত্যাদি]-এর মাধ্যমে পরিমাপিত বস্তু ওজন করে ক্রয় করে, তারপর নিজে পুনরায় পাত্র অথবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য সে দ্রব্যকে পুনরায় পাত্রের মাধ্যমে কিংবা ওজনের মাধ্যমে পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রি করা অথবা তা খাওয়া বেধ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য জাতীয় দ্রব্য বিক্রোতার পরিমাপ এবং ক্রেতার পরিমাপ-দু-বার পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রি করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া যা শর্ত করা হয়েছে তার থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অতিরিক্ত অংশটুকু বিক্রোতার হক। আর অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম হওয়ার কারণে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে অনুমানের ভিত্তিতে যা বিক্রি করেছে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা, এর অতিরিক্ত অংশ [যদি হয়ে থাকে] ক্রেতার হক।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرَى مَكَابِلَةً : যেসব দ্রব্যাদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয় সেগুলোকে কَبِلٌ বলা হয়। আরার কিছু কিছু দ্রব্য বাটখারা ইত্যাদি দ্বারা ওজন দিয়ে বিক্রি করা হয় সেগুলোকে وَزْنٌ বলা হয়। আর যেসব দ্রব্যাদি গণনা করে বিক্রি করা হয় সেগুলোকে বলা হয় عَدَدٌ।

আলোচ্য মাসআলাটির স্বরূপ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু যেমন- গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে খরিদ করে। যেমন- ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমি এ গমগুলো একশত দিরহামের বিনিময়ে কিনতে প্রস্তুত আছি এই শর্তে যে, এগুলো আমি মেপে বুঝে নেব।

অথবা যদি কোনো ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু যথা- স্বর্ণ, রূপা ইত্যাদি ওজন করে নেওয়ার শর্তে ক্রয় করে। যেমন- ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল, আমি দশ হাজার টাকার বিনিময়ে এই স্বর্ণ ক্রয় করছি এই শর্তে যে, আমি এটা ওজন করে বুঝে নেব। মোটকথা, ক্রেতা পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য অনুমান করে ক্রয় না করে; বরং পাত্র দ্বারা মেপে কিংবা ওজন করার শর্তে এবং নিজে সেটা মেপে বুঝে নিল এবং পণ্য নিজে কজা করল অর্থাৎ নিজ আসনে নিয়ে নিল।

উল্লেখ্য যে, মাসআলাটিতে ক্রয় সূত্রে মালিক হয়েছে একথাটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আলোচ্য মাসআলার মধ্যে “ক্রয়” কথাটি শর্তরূপে আনা হয়েছে। কেননা, যদি কেউ ক্রয় ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যেমন- দান, অসিয়ত ও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মালিক হয়, তাহলে উক্ত মালিকের জন্য কজা করার পূর্বে এবং মাপা ও ওজন করার পূর্বে সেই দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করা বেধ। মোটকথা, উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত মালে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না যে পর্যন্ত না সে পুনরায় সেই মাল পাত্র দ্বারা কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করে নেয়। সুতরাং দ্বিতীয় ক্রেতা নিজে মেপে নেওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে বা খেতে পারবে না। সারকথা হচ্ছে, প্রথম ক্রেতা যেমন নিজে প্রথমে মেপে নিয়েছে তদ্রূপ দ্বিতীয় ক্রেতাকেও নিজ উদ্যোগে মেপে নিতে হবে। অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)। মাসআলাটির দলিল হলো হাদীসে রাসূল ﷺ।

হাদীসটি এই- **رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَلْعَقَ نَهْلَهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْعَلَ فِيهِ صَاعَانِ صَاعَ الْبَانِعِ وَصَاعَ الْمُنْتَرِي**

হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তবে হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে **صَاعَانِ**-এর স্থলে **صَاعَ الْبَانِعِ** বর্ণনা রয়েছে। ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাছাড়া হাদীসটি হযরত আবু জুহায়ের ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও রেওয়ায়েত করেন। মুহাম্মিদ বাযযার হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। সেই রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত অংশ এটুকু রয়েছে- **وَعَلَيْهِ النَّصَانُ** হাদীসের অর্থ- রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত না তাতে দুটি পরিমাপ হয়। বিক্রেতার একটি পরিমাপ, আর ক্রেতার একটি পরিমাপ। হাদীসে উল্লিখিত **بَانِع** শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রথম ক্রেতা, আর **مُنْتَرِي** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় ক্রেতা। **صَاعَ الْبَانِعِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিক্রেতা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য যে পরিমাপ করে। আর **صَاعَ الْمُنْتَرِي** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রয়ের পূর্বে নিজের জন্য যে পরিমাপ করে। দ্বিতীয় ক্রেতা যখন নিজে পরিমাপ করে নেয়, তখন তার জন্য অন্যের কাছে বিক্রি করা বৈধ হয়ে যায় এবং তখন সে ইচ্ছা করলে খাদ্যদ্রব্য খেতেও পারে। হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, একটি বিক্রয়ের জন্য দু-বার পরিমাপ করা দরকার। একবার বিক্রেতা মেপে দেবে, আরেকবার ক্রেতা মেপে নেবে। কেননা, এ ব্যাপারে সকল ফুকাহায়ে কেয়াম একমত যে, একটি বিক্রয়ে দু-বার পরিমাপ করা জরুরি নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ক্রেতার পরিমাপ করা হলো পরিপূর্ণভাবে কজা করা। আর পরিপূর্ণ কজা করা ক্রেতার জন্য আবশ্যিক। ক্রেতার পরিমাপ করার দ্বারা পরিপূর্ণ কজা এভাবে হয় যে, ক্রেতা যখন মেপে নেয় তখন তার হক বিক্রেতার হক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। কেননা, হতে পারে দ্রব্য যে পরিমাণ শর্ত করা হয়েছিল তার চেয়ে কম হয়েছে, তাহলে তা তার হক বিক্রেতার কাছে রয়ে গেল। আর যদি বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতার হক তার কাছে চলে আসল। ক্রেতার হক বিক্রেতার কাছে থাকা কিংবা এর উল্টো হওয়া কোনোটা ই উচিত নয়। আর তাই ক্রেতার পরিমাপ করা জরুরি, যাতে অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা থেকে বাঁচা যায়। কারণ, অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

উপরিউক্ত দলিলের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা অর্থাৎ বিক্রেতার পরিমাপের উপর পূর্ণ ভরসা না করে মালে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে নিজে পুনরায় পরিমাপ করে নেবে। তবে যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু অথবা ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু অনুমান করে ক্রয় করে, তাহলে উক্ত বস্তুর মাঝে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো পরিমাপ করা আবশ্যিক নয়; বরং সে পরিমাপ করা ছাড়াই যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে। কেননা, এখানে বিক্রীত-পণ্য হচ্ছে ইশারাকৃত খাদ্যদ্রব্য। এ কারণে ক্রেতার মালিকানার সাথে বিক্রেতার মালিকানা মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। উল্লেখ্য যে, অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি সূরত হতে পারে-

১. কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র অনুমান করে এক সূপ গম ক্রয় করল, তারপর অনুমান করে সেটা বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় প্রথম ক্রেতার পরিমাপ করা যেমন জরুরি নয়, তেমনি দ্বিতীয় ক্রেতার পরিমাপ করাও জরুরি নয়। কেননা, এ অবস্থায় গমের সূপে কি পরিমাণ গম আছে তা নির্ধারণ করা আবশ্যিক নয়; বরং সূপের মধ্যে যতটুকু গম আছে সবটাই বিক্রীত-পণ্য।
২. কোনো ব্যক্তি ওজন করে কিংবা পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে কিছু গম ক্রয় করল, তারপর সে গম বিক্রি করল। ক্রেতা উক্ত গম মেপে কজা করল। তারপর ক্রেতা অনুমান করে বিক্রি করল। যেমন- ক্রেতা বলল, এসব গম আমি একশত টাকায় বিক্রি করলাম। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা এ গমগুলো যা উদাহরণস্বরূপ দশ মন ভেবে বিক্রি করা হচ্ছে, সেগুলো যদি পরিমাণে দশ মনের বেশিও হয়, তবু দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা বৈধ হবে। কারণ, এখানে দশ মন হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে না; বরং এখানে সূপীকৃত গম বিক্রি করা হচ্ছে। চাই সেটা দশ মন অথবা তার চেয়ে বেশি-কম যাই হোক না কেন। মোটকথা, উল্লিখিত দু-অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা তার ক্রয়কৃত পণ্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো পরিমাপ করার যথাপেক্ষী নয়। যেসব দ্রব্য গণনা করে বিক্রি করা হয়, এবং গণিত দ্রব্যগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলোও পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের হুকুমে হবে। অর্থাৎ এসব দ্রব্য কেউ গণনা করে বিক্রি করলে দ্বিতীয় ক্রেতা উক্ত দ্রব্যগুলোতে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে অবশ্যই পুনরায় গণনা করে নেবে। কেননা, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মধ্যে যে কারণে ইচ্ছাতের ভিত্তি হতে দ্বিতীয়বার গণনা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে সেই একই ইচ্ছাত গণনানির্ভর বস্তুসমূহের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। সেই ইচ্ছাত হলো, সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং একজনের মালিকানার সাথে অন্যের মালিকানা মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা দূর করা। কেননা, গোনা দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত অংশ বিক্রেতার মালিকানাধীন। তবে এ ব্যাপারে সাহেবাইয়ে (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের মতে পুনরায় গণনা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ।

وَيُخْلَفُ مَا إِذَا بَاعَ الثَّوْبَ مُدَارَعَةً، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ، إِذَا الذَّرْعُ وَصَفٌ فِي الثَّوْبِ،  
 بِخِلَافِ الْقَدْرِ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِكَيْلِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ  
 لَيْسَ صَاعُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَهُوَ الشَّرْطُ، وَلَا بِكَيْلِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ  
 الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْكَيْلَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ، لِأَنَّهُ بِهِ يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا، وَلَا تَسْلِيمَ  
 إِلَّا بِحَضْرَتِهِ، وَلَوْ كَالَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي فَقَدْ قِيلَ لَا يُكْتَفَى بِهِ  
 لِبَظَاهِرِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ إِغْتَبَرَ صَاعَيْنِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ صَارَ  
 مَعْلُومًا بِكَيْلٍ وَاحِدٍ، وَتَحَقَّقَ مَعْنَى التَّسْلِيمِ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ إِجْمَاعُ  
 الصَّفَقَتَيْنِ عَلَى مَا نُبِئَ فِي بَابِ السَّلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَوْ اشْتَرَى الْمَعْدُودَ  
 عَدًّا فَهُوَ كَالْمَذْرُوعِ فِيمَا يُرَوَّى عَنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ الرِّبَا، وَكَالْمَوْزُونِ فِيمَا  
 يُرَوَّى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رحم)، لِأَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوطِ .

অনুবাদ : এরূপভাবে যদি কাপড় গজ হিসেবে বিক্রি করে তার হুকুমও ব্যতিক্রম। কেননা, এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত অংশও তার [ক্রেতার] হক। কেননা, কাপড় পরিমাপের ক্ষেত্রে যিরা' [গজ] হচ্ছে একটি গুণবিশেষ। পাত্র ও ওজনের পরিমাপ এর ব্যতিক্রম [এগুলো সত্তাগত বিষয়]। বিক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতার পাত্র পরিমাপের কোনো গুরুত্ব নেই, যদিও সেটা ক্রেতার উপস্থিতিতে হয়ে থাকে। কেননা, সেটা প্রকৃত বিক্রোতা ও ক্রেতার পরিমাপ নয়। [তারা তখনো ক্রেতা-বিক্রেতা হয়নি] অথচ এটাই শর্ত। তদ্রূপ ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বিক্রেতার বিক্রয় পরবর্তী পাত্র পরিমাপও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, পাত্র পরিমাপ করা পণ্য অর্পণ করার অংশবিশেষ। কেননা, এর দ্বারা পণ্যটি পরিজ্ঞাত হয়। আর ক্রেতার উপস্থিতি ছাড়া পণ্য অর্পণ সম্ভব নয়। যদি বিক্রেতা বিক্রয়ের পর ক্রেতার উপস্থিতিতে পাত্র দ্বারা মেপে দেয়, তাহলে কারো কারো মতে হাদীসের জাহেরী অর্থানুযায়ী এটা যথেষ্ট হবে না। কেননা, হাদীসে দু-বার পরিমাপ করার কথা বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতে এতটুকুতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, পণ্য একটি পরিমাপ দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়ে গেছে এবং অর্পণ করার অর্থও পাওয়া গেছে। আর বর্ণিত হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে দুই চুক্তির একত্রিকরণ, যা আমরা 'বায় সলম'-এর অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। আর যদি গণনা করে বিক্রি করা হয় এমন দ্রব্যাদি গণে ক্রয় করে, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা গজ দ্বারা পরিমাপ করা বস্তুর মতো। কেননা, এসব বস্তু সুদের তলিকাভুক্ত মাল নয়। অথবা এটা ওজনকৃত বস্তুর মতো ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত মতানুসারে। কেননা, শর্তকৃত বস্তুর চেয়ে অতিরিক্ত জিনিস তার জন্য বৈধ নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَخْلَفُ مَا إِذَا بَاعَ الْكُتُبَ النِّجَ: লেখক বলেন, কাপড় যদি গজ হিসেবে ক্রয় করে, তাহলে তার জন্য হস্তক্ষেপ করার পূর্বে পুনরায় গজ দিয়ে পরিমাপ করা আবশ্যিক নয়। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, হানারী মাযহাবের ইমামগণের মতে إِذْرَاعُ গজ বা কাপড়ের পরিমাপ হলো وَصْفُ বা কাপড়ে জন্য গুণবিশেষ। এর বিপরীতে মূল্য আসে না। এজন্য যদি পরবর্তী মাপে গজ বেশিও হয়, তাহলে তা বিক্রতার হবে না; বরং ক্রেতার হবে। আর তা ক্রেতার জন্য অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হয় না। অথচ এ কারণে দ্বিতীয় পরিমাপ আবশ্যিক ছিল।

পক্ষান্তরে যদি পরবর্তী মাপে গজ কম হয়, তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। যখন দ্বিতীয় ক্রেতা না মেপেই বিক্রি করে দিল, তখন সে তার ইচ্ছাধিকারকে নিজ হাতে বাতিল করল। আর ক্রেতার তা করার অধিকার অবশ্যই আছে। মোটকথা, কাপড় পরিমাপক-গজ ইত্যাদি হচ্ছে وَصْفُ, যা মূল্যের অনুবর্তী বিষয়। তাই এর কমবেশি ক্রেতার হক। পক্ষান্তরে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যাদির মধ্যে كَيْلُ ও وَزْنُ হচ্ছে আসল, যার বিপরীতে মূল্য আবশ্যিক হয়। এজন্য পণ্যের মধ্যে যদি শর্তকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে তা ক্রেতার প্রাপ্য হবে না; বরং অতিরিক্ত অংশ বিক্রতার অধিকারভুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। এজন্য এ অবস্থায় যদি ক্রেতাকে তার ক্রয়কৃত মালের মধ্যে পরিমাপ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। অথচ অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা শরিয়তের সৃষ্টিতে হারাম। এজন্য وَزْنُ ও كَيْلُ পণ্যের মধ্যে প্রথমে পরিমাপ করা আবশ্যিক।

তবে উল্লিখিত কাপড়ের মাসআলার ব্যতিক্রম তখন হবে, যখন কেউ কাপড়ের থান এ শর্তে বিক্রি করে যে, প্রতি গজ [উদাহরণস্বরূপ] দশ টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেক গজের পৃথকভাবে মূল্য নির্ধারণ করে এবং বলে- এখানে দশ গজ রয়েছে, যার মূল্য হচ্ছে একশত টাকা। এ অবস্থায় ক্রেতার জন্য উক্ত কাপড় পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ, প্রত্যেক গজের স্বতন্ত্রভাবে মূল্য উল্লেখ করার কারণে গজ আসলে পরিণত হয়েছে, অনুবর্তী রয়ে যায়নি। এতদসংক্রান্ত আলোচনা كِتَابُ الْبَيْعِ -এর প্রথম দিকে করা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবে আসে যে, যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপ কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ হিসেবে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে, তারপর সেটাকে পুনরায় না মেপে বিক্রি করে দেয় কিংবা খেয়ে ফেলে, তাহলে কি হুকুম? এর উত্তরে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে সেটা জায়েজ হবে না। কেননা, দ্বিতীয় বিক্রতার মালিকানার সাথে প্রথম বিক্রতার মালিকানা মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বিক্রয়টি ফাসিদ বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দ্বিতীয় বিক্রয়কে ফাসিদ বলা হয়েছে।

আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে এটাও বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কোনো 'পাত্র দ্বারা পরিমাপিত' মাল পাত্র দ্বারা পরিমাপ না করে কজা করল, তারপর সেটাকে খেয়ে ফেলল, তাহলে তাকে একথা বলা হবে না যে, সে হারাম ভক্ষণ করেছে। কেননা, সেতো নিজ মাল খেয়েছে। তবে সে শরিয়তের নির্দেশ [পরিমাপ করা] অমান্য করার কারণে গুনাহগার অবশ্যই হবে। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিক্রয়টি ফাসিদ হলেও তার দ্বারা মালিক হওয়া দ্রব্য খাওয়া হারাম নয়, তবে শরিয়তের নির্দেশ অমান্য করার কারণে ভিন্ন গুনাহ অবশ্যই হবে।

قَوْلُهُ وَلَا مَعْتَبَرَ بِكَيْلِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْبَيْعِ النِّجَ: লেখক বলেন, দ্বিতীয় বিক্রয়ের পূর্বে যদি বিক্রতা [নিজের জন্য] দ্বিতীয় ক্রেতার সামনে পণ্য পরিমাপ করে, তাহলে উক্ত পরিমাপ দ্বিতীয় ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা, এখানে হাদীসে বর্ণিত বিক্রতার পরিমাপ ও ক্রেতার পরিমাপ পাওয়া যায়নি। হাদীসে বলা হয়েছে- نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَنْتَرَى نَيْبُ -আলোচ্য মাসআলায় বিক্রতার উল্লিখিত পরিমাপ বিক্রতা হিসেবে পরিমাপ কিংবা ক্রেতা হিসেবে পরিমাপ হয়নি। কারণ, প্রকৃত অর্থে বিক্রতা ও ক্রেতা বিবেচিত হয় বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর; বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার আগে নয়। এখানে তো বিক্রয় সংঘটিত হয়নি- তার আগেই পরিমাপ করা হয়েছে। যেহেতু বিক্রয় সংঘটিত

হয়নি, তাই তারা মূলত ক্রেতা-বিক্রেতা-ই হয়নি। অতএব তাদের পরিমাপ ক্রেতার পরিমাপ ও বিক্রেতার পরিমাপ সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং এ পরিমাপ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিমাপই গ্রহণযোগ্য।

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَقْدَرٌ مِّمَّا يَبِيعُونَ وَلَا يَكْتَسِبُونَ : লেখক বলেন, দ্বিতীয় বিক্রয়ের পর ক্রেতার অনুপস্থিতিতে যদি পণ্য পরিমাপ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বিক্রয়ের পরবর্তী পরিমাপ করা হয় ক্রেতার হাতে পণ্য অর্পণ করার উদ্দেশ্যে। যেহেতু ক্রেতা অনুপস্থিত, তাই তার কাছে অর্পণ করা সম্ভব নয়। অথচ এ পরিমাপ করার নির্দেশ শরিয়ত এজন্যই দিয়েছে যে, বিক্রেতা যেন নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য অর্পণ করতে পারে। লেখক বলেন, যদি কেউ বিক্রয়ের পর ক্রেতার উপস্থিতিতে একবার পরিমাপ করে, তাহলে তার একবারের পরিমাপ কতিপয় আলিমের মতে যথেষ্ট হবে না; বরং ক্রেতার পরিমাপ করে নিতে হবে। কেননা, হাদীসের জাহেরী অর্থ (حَتَّى يَجْزِيَ فَيْمَ صَاعَانِ) দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, একবার বিক্রেতা পরিমাপ করবে, তারপর ক্রেতা পরিমাপ করবে। তবে লেখক বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো, উল্লিখিত অবস্থায় একবার পরিমাপ করার দ্বারা যথেষ্ট হবে। কেননা, একবার পরিমাপ করার দ্বারা বিক্রীত-পণ্য পরিজ্ঞাত হয়ে যায় এবং পণ্য অর্পণ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিক্রীত-পণ্য নির্ধারিত পরিমাণ হতে বৃদ্ধির দ্বারা অন্যের মালে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও রহিত হয়ে যায়। যেহেতু দু-বার পরিমাপ করার নির্দেশ উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কারণে দেওয়া হয়েছিল, আর আলোচ্য মাসআলায় উপরিউক্ত বিষয়গুলো আসছে না, তাই দু-বার পরিমাপ করার প্রয়োজন নেই। তবে হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র কি হবে? এর উত্তর হলো, যখন দুটি চুক্তি একত্রিত হবে, যেমন—“বায় সলম” অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মুসলাম ইলাহিহি [সালামের বিক্রেতা] এক ব্যক্তি থেকে রাক্বস সালামের জন্য গম খরিদ করল। তারপর রাক্বস সালামকে তা কজা করার নির্দেশ দিল এ অবস্থায় দু-বার পরিমাপ করা আবশ্যিক। এক পরিমাপ হচ্ছে মুসলাম ইলাহিহির আর অন্য পরিমাপ হচ্ছে রাক্বস সালামের, অর্থাৎ রাক্বস সালাম প্রথমে মুসলাম ইলাহিহির জন্য পরিমাপ করবে, তারপর নিজের জন্য পরিমাপ করবে।

তবে যদি ক্রেতার অনুপস্থিতিতে পরিমাপ করে, তাহলে একবার পরিমাপ করা যথেষ্ট হবে না। কারণ, পরিমাপ করার দ্বারা অর্পণ করার পরিস্থিতি ক্রেতার অনুপস্থিতির কারণে সম্ভব নয়। আর তখনই ক্রেতার মালের সাথে বিক্রেতার মালের মিশ্রিত থাকার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَقْدَرٌ مِّمَّا يَبِيعُونَ : লেখক বলেন, যদি কেউ গণনা-নির্ভর কোনো বস্তু গণনা করে ক্রয় করে, যেমন—কেউ বলল, আমি একশত ডিম তিনশত টাকায় খরিদ করছি।

লেখক বলেন, উক্ত مَعْدُود দ্রব্যাদি সাহেবাইন (র.)-এর মতে مَزْرُوع-এর মতো, অর্থাৎ কাপড়ের ক্ষেত্রে গজ কমবেশি হলে যে হুকুম হয় এখানেও গণনায় কমবেশি হলে একই হুকুম হবে। অর্থাৎ যদি কেউ উদাহরণস্বরূপ ডিম গণনা করার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে উক্ত ডিমে হস্তক্ষেপ করার জন্য ক্রেতার পুনরায় গণনা করা আবশ্যিক নয়। ক্রেতা এক্ষেত্রে পুনরায় গণনা না করে যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে—এতে কোনো সমস্যা নেই।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, مَزْرُوع দ্রব্যাদির মতো এগুলোও সুদের তালিকাভুক্ত মাল নয়। এজন্যই তাঁদের মতে এক ডিম দু ডিমের পরিবর্তে বিক্রি করা বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে গণনা-নির্ভর বস্তুসমূহ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মতো, [যা ইতিপূর্বে আমরা বলেছি]। পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যাদিতে যেমন নির্ধারিত শর্তকৃত পরিমাণের বেশি বিক্রেতার হক এবং তা ক্রেতার জন্য বৈধ নয়— ঠিক তদ্রূপ গণনা-নির্ভর দ্রব্যাদিও শর্তকৃত পরিমাণের বেশিটুকু ক্রেতার হক নয়; বরং বিক্রেতার হক। এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি তিনশত টাকার বিনিময়ে একশত ডিম কিনল, গণনা করার পর দেখা গেল ডিম একশ-এর চেয়ে বেশি, এমতাবস্থায় বেশি ডিমগুলো বিক্রেতার হক বলে সাব্যস্ত হবে এবং এগুলো ফেরত দিতে হবে। আর যেহেতু গণনা-নির্ভর দ্রব্যাদি ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর হুকুম রাখে, তাই এগুলো বিক্রির পূর্বে গণনা করতে হবে। গণনা না করে বিক্রি কোনোভাবে বৈধ হবে না। আর যদি বিক্রয়ের পর অর্পণ করার পূর্বে পরিমাণের চেয়ে ডিম বেশি পায়, তাহলে বিক্রেতা তা ক্রেতার হাতে অর্পণ করবে না। আর যদি পরিমাণে কম পায়, তাহলে ক্রেতা বাকিটুকু বিক্রেতা থেকে ফেরত নেবে।

قَالَ : وَالتَّصَرُّتُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ لِقِيَامِ الْمُطْلِقِ وَهُوَ الْيَدْلُكَ وَلَيْسَ فِيهِ غَرَرُ الْإِنْفِسَاحِ بِالْهَلَاكِ لِعَدَمِ تَعَبُّنِهَا بِالتَّغْيِينِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, কজা করার পূর্বে মূল্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা বৈধ। কেননা, হস্তক্ষেপ করার অনুমতি প্রদানকারী তথা মালিকানা এখানে বিদ্যমান এবং এতে মূল্য বিনষ্ট হয়ে বিক্রয় বাতিল হওয়ার মতো প্রতারণাও নেই। কারণ, মূল্য নির্ধারিত করলে নির্ধারিত হয় না। কিন্তু বিক্রয়পণ্য এর বিপরীত। [এটা নির্ধারিত হয়েছে থাকে।]

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদরী (র.) বলেন, কোনো দ্রব্য বিক্রয়ের পর তার মূল্য কজা করার পূর্বে বিক্রোতা যদি মূল্যের মধ্যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায়, যেমন- সে তা বিক্রি করল, দান করল অথবা অসিয়ত করল ইত্যাদি, তাহলে তা করা বৈধ। চাই সে মূল্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না এ জাতীয় হোক [যেমন- স্বর্ণ, রূপা, মুদ্রা ইত্যাদি] কিংবা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এ জাতীয় হোক [যেমন- চাল, গম, কাপড় ইত্যাদি]। তবে বায় সরফ ও বায় সলমের মূল্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এর উদাহরণ হলো, খালেদ একটি গরু দশ হাজার টাকার বিনিময়ে অথবা বিশ মন চালের বিনিময়ে বিক্রি করল, তারপর গরু সে ক্ষেত্রের হাতে অর্পণ করে দিল, কিন্তু মূল্য বাবদ দশ হাজার টাকা কিংবা বিশ মন চাল কজা করার পূর্বেই যদি তা কারো কাছে বিক্রি করে কিংবা দান করে অথবা এতে অন্য কোনো হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

তার এরূপ হস্তক্ষেপ করার দলিল হচ্ছে তার নিরঙ্কুশ মালিকানা। উল্লেখ্য যে, বিক্রয়পণ্য কজা করার পূর্বে তাতে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হওয়া যদিও মুক্তি অনুযায়ী উচিত, কিন্তু ভিন্ন একটি কারণে শরিয়ত তার অনুমোদন দেয়নি। আর তা হচ্ছে উদ্ভূত কারণে পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয় বাতিল হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আর এতে পরবর্তীতে যার সাথে চুক্তি করেছে সে প্রতারণিত হয়। কিন্তু মূল্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। কারণ, মূল্য যদি মুদ্রা জাতীয় হয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার অনুরূপ মুদ্রা প্রদান করা আবশ্যিক হবে। আর যদি তা নির্ধারিত পণ্য হয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই পণ্যের পরিবর্তে কীমত [বাজারমূল্য] প্রদান করা আবশ্যিক হয়। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই বিক্রয় রহিত হয় না এবং অন্য কেউ এতে প্রতারণিত হয় না।

মোটকথা, যেহেতু মূল্যের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি প্রদানকারী নিরঙ্কুশ মালিকানা বিদ্যমান ও হস্তক্ষেপে বাধাপ্রদানকারী বাতিল হওয়ার ধোঁকাও নেই, তখন বিক্রোতার মূল্যে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ঋণ মূল্যের মতো, যেমন- মোহর, ভাড়া, ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা ইত্যাদির মধ্যেও কজা করার পূর্বে হস্তক্ষেপ করা বৈধ। এসব বৈধ হওয়ার দলিল ইতিপূর্বে মূল্যের ক্ষেত্রে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই।

তাছাড়া হাদীসের মাধ্যমে উক্ত মাসআলার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীস-

وَهُوَ مَا فِي سُنَنِ الْأَرْبَعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَسْبِعُ الْإِبِلَ بِالسَّوْفِ فَابْعُ بِالْأَنْزِيرِ وَأَخَذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخَذُ الدَّنَانِيرَ فَأَبْنْتُ الْكَيْمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حَبْرَتُهُ فَأَخَذْتُ

يُسَوِّمُهُمْ نَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ فَإِنَّ هَذَا بَيْعُ الشَّمْسِ الَّذِي فِي  
الذِّمَّةِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالتَّقْدِيرِ الْمُغَالِيفِ لَهُ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম- দিনারে বিক্রি করতাম আর তদস্থলে  
দিরহাম নিতাম, কখনও দিরহামে বিক্রি করতাম আর তদস্থলে দিনার নিতাম। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমতাবস্থায়  
আসলাম যে, তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। আমি তাঁর কাপড় ধরে তাঁকে আমার উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা  
করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে যদি একটির পরিবর্তে অন্য একটি গ্রহণ কর, তাহলে সেটা  
বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কেননা, এটা তো মালিকানাধীন মূল্য কজার পূর্বে ভিন্ন মূল্য (ثَمَنٌ) দ্বারা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মূল্য (ثَمَنٌ) কজা করার পূর্বে তাতে تَصَرُّفٌ করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ  
আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর এরূপ হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেছেন।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মাঝে مَرْفُوعٌ ও مَوْقُوفٌ হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ  
হাদীসটি মারফু'রূপে, আবার কেউ মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। আব্বাসী ইবনুল হুমাম (র.) উভয় বর্ণনার বিরোধ নিরসন  
করতে গিয়ে বলেন, মারফু'রূপে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, হাদীস মারফু' ও মাওকুফ হওয়ার  
ব্যাপারে تَعَارُضٌ [অসঙ্গতি] হলে মারফু' হাদীসই গ্রহণযোগ্য। কেননা, এটা زِيَادَةٌ বা অতিরিক্ত। আর হাদীসশাস্ত্রের নীতি হচ্ছে  
زِيَادَةُ الشَّفَةِ مَقْبُولَةٌ [নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য]। তাছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর মতো একনিষ্ঠ  
রাসূলের সুন্নতের অনুসারীর ক্ষেত্রে এ কথা অকল্পনীয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত উক্ত ঝুঁকিপূর্ণ  
মাসআলা না জেনে আমল করবেন।

قَالَ : وَجُوزُ لِلْمُسْتَرَى أَنْ يَزِيدَ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، وَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ لِلْمُسْتَرَى فِي الْمَبْنِيِّ، وَجُوزُ أَنْ يَحْطَّ عَنِ الثَّمَنِ، وَيَتَعَلَّقَ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، فَالزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُكْرٍ وَالشَّافِعِيِّ (رحا) لَا يَصَحَّاحُ عَلَى إغْتِبَارِ الْإِلْتِحَاقِ، بَلْ عَلَى إغْتِبَارِ إِنْتِدَاءِ الصَّلَةِ، لِهَذَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَضْعِيفُ الزِّيَادَةِ ثَمَنًا، لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِلْكُهُ عَوْضٌ مِلْكِهِ، فَلَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَكَذَلِكَ الْحَطُّ، لِأَنَّ كُلَّ الثَّمَنِ صَارَ مُقَابِلًا بِكُلِّ الْمَبْنِيِّ، فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ فَصَارَ بَرًّا مُبْتَدَأً، وَلَنَا أَنَّهُمَا بِالْحَطِّ وَالزِّيَادَةِ يُغَيِّرَانِ الْعَقْدَ مِنْ وَصْفٍ مَشْرُوعٍ إِلَى وَصْفٍ مَشْرُوعٍ وَهُوَ كَوْنُهُ رَابِعًا أَوْ خَاصِرًا أَوْ عَدَلًا، وَلَهُمَا وَلَايَةُ الرُّفْعِ فَأَوَّلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا وَلَايَةُ التَّغْيِيرِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, বিক্রেতার জন্য বিক্রয়ের পর মূল্য বৃদ্ধি করে দেওয়া ক্রেতার পক্ষে বৈধ এবং বিক্রেতা ক্রেতার উদ্দেশ্যে বিক্রয়পণ্য বাড়িয়ে দেওয়া বৈধ। অদ্রপ মূল্য কমিয়ে দেওয়াও জায়েজ। সম্পূর্ণ পরিমাণের সাথে উভয়ের। হক যুক্ত হবে। আমাদের মতে বৃদ্ধি এবং ঘাটতি উভয়টি মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট করা হিসেবে উক্ত কমবেশি করা বৈধ নয়; বরং স্বতন্ত্র দানরূপে বিবেচনা করলে বৈধ হবে। তাঁদের দলিল হলো, [পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা] অতিরিক্ত অংশকে মূল্য হিসেবে গুণকরণ সম্ভব নয়। কেননা, তাহলে ক্রেতার মালিকানা তার মালিকানার বিনিময় সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। হ্রাস করার ক্ষেত্রটিও অনুরূপ। কেননা, পুরো মূল্য পুরো পণ্যের বিনিময় সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব মূল্যের কিয়দংশকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এটা একটা নতুন দান বিবেচিত হবে। আমাদের দলিল হলো, তারা [বিক্রেতা ও ক্রেতা] হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে চুক্তিকে একটি শরিয়তসম্মত অবস্থা থেকে অন্য শরিয়তসম্মত অবস্থাতে রূপান্তর করছে। সে অবস্থা হচ্ছে লাভজনক হওয়া অথবা লোকসানপূর্ণ হওয়া কিংবা ইনসাফপূর্ণ হওয়া। আর তাদের বিক্রয় রহিত করার ক্ষমতা রয়েছে সুতরাং তাদের চুক্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা অবশ্যই থাকবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَجُوزُ لِلْمُسْتَرَى أَنْ يَزِيدَ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ : উপরিউক্ত দীর্ঘ ইবারতে লেখক একটি মূল্যের উপর ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর উক্ত মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর পণ্যের মধ্যে বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করেছেন। উক্ত মাসআলা সংক্রান্ত মূল ইবারত ইমাম কুদুরী (র.)-এর আল-মুখতাসারুল কুদুরী গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

মাসআলার স্বরূপ : যদি ক্রেতা [ক্রয়ের পর] বিক্রেতার অনুকূলে মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহলে তা করা বৈধ। উদাহরণস্বরূপ—

১. এক ব্যক্তি দশ মন চাল পাঁচ হাজার টাকায় খরিদ করল, তারপর সে [পণ্য দেখে খুশি হয়ে] বিক্রেতাকে আরও একশত টাকা বাড়িয়ে দিল, তাহলে এটা বৈধ।



২. তদ্রূপ বিক্রেতা যদি পাঁচ মনের সাথে আরও দশ সের বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তা বৈধ।

৩. এমনভাবে বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে আপনি একশত টাকা কম দিতে পারেন, তাহলেও তা বৈধ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিক্রয়-পরবর্তী হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে ক্রেতা-বিক্রেতা হক কিভাবে যুক্ত হবে? এর উত্তর হচ্ছে, হ্রাস-বৃদ্ধি ও আসল অবস্থা এ সেরের সাথেই উভয়ের হক যুক্ত হবে, অর্থাৎ যদি মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে বিক্রেতা মূল্যই বিক্রেতার হক। অতএব যদি বিক্রেতা মূল মূল্য ও বর্ধিত মূল্যের আগ পর্যন্ত বিক্রীত-পণ্য তার কাছে অটকে রাখতে চায়, তাহলে তার তা করার অধিকার রয়েছে। তদ্রূপ ক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত মূল মূল্য ও বর্ধিত মূল্য পরিশোধ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার ক্রয়কৃত পণ্য চেয়ে নেওয়ার অধিকার লাভ করবে না। আর যদি বিক্রেতা বিক্রীত-পণ্য বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয়, তাহলে ক্রেতা বর্ধিত পণ্য না পাওয়ার আগ পর্যন্ত মূল্য আটকে রাখতে পারে। যদি বিক্রেতা মূল্য কমিয়ে দেয়, তাহলে ক্রেতা অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করার পর পুরো ক্রয়কৃত পণ্য পাওয়ার অধিকার লাভ করবে—এর পূর্বে নয়।

তাদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হলো, যদি পণ্যের কোনো مُسَوَّر [দাবিদার] পাওয়া যায়—যে বলে পণ্যটি বিক্রেতার নয়—আমার, অতঃপর তার সে দাবি প্রমাণিত হয়। তারপর ক্রেতা পণ্য ফেরত দেওয়ার পর ক্রেতা যদি বর্ধিত মূল্য দিয়ে থাকে, তাহলে বিক্রেতা থেকে বর্ধিত মূল্যই [মূল মূল্যসহ] ফেরত নেবে। আর যদি মূল্য হ্রাস করা হয়ে থাকে, তাহলে সে হ্রাসকৃত তথা অবশিষ্ট মূল্যই ফেরত নেবে।

আমাদের মায়হাব : বিক্রয়ের পর মূল্য বৃদ্ধি করা কিংবা হ্রাস করা উভয় মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, পরবর্তীতে করা হ্রাস-বৃদ্ধি মূল চুক্তির মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির মতোই। অর্থাৎ যেন ক্রেতা-বিক্রেতা মূল চুক্তির মধ্যেই হ্রাস বৃদ্ধি করল।

ইমাম মুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : বিক্রয় পরবর্তী মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন ও স্বতন্ত্র দান বিবেচিত হবে। তাঁদের মতে এটা বিক্রয়চুক্তির পর বিক্রয়চুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অনুগ্রহ ও আন্তরিকতার নির্দশন। মূল্য বৃদ্ধি করার অবস্থায় এটা ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে দান করা হলো, দান শুদ্ধ হওয়ার জন্য যেহেতু কজা করা শর্ত, তাই এখানে কজা করতে হবে। আর বিক্রয়পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার অবস্থায় বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে দান করা হলো কিংবা উপহার দেওয়া হলো, তদ্রূপ আর যেসব অবস্থায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয় এর কোনোটিই মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবেন না; বরং সব অবস্থাতে এটা একটি স্বতন্ত্র দানরূপেই বিবেচিত হবে—মূল চুক্তির সাথে কিছুতেই যুক্ত হবেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মুফার (র.)-এর দলিল : তাঁরা বলেন, প্রথমে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে যখন বিক্রয়পণ্য ক্রেতার অধিকারে চলে গেল, তখন ক্রেতা তার মালিক হয়ে গেল। তারপর ক্রেতা যদি অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করে এবং সেটাকে প্রথম চুক্তির সাথে যুক্ত করতে চায়, তাহলে তার বর্ধিত মূল্য সেই পণ্যের বিনিময়ে হবে যেই পণ্যের সে মালিক হয়েছে। আর বর্ধিত মূল্যরূপে যা দিচ্ছে সেটাও তার মালিকানা। অতএব সে তার মালিকানাধীন বস্তু অপর মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময়ে প্রদান করল, অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে একই ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তু অন্য মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময়ে হওয়া বৈধ নয়। এর উদাহরণ হলো, খালেদ রাশেদ থেকে একটি গরু পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে খরিদ করল। ফলে গরুটি পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে খালেদের মালিকানায় পরিণত হলো। এখন যদি খালেদ একশত টাকা অতিরিক্ত রাশেদকে দেয় এবং সেটাকে মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে খালেদ তার মালিকানাধীন বস্তু [টাকা] তারই আরেক মালিকানাধীন বস্তু [সদ্য ক্রয়কৃত গরু]-এর বিনিময়ে প্রদান করল। অথচ এমন হওয়া অর্থাৎ একই ব্যক্তির একটি মালিকানাধীন বস্তু অন্য মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময়ে হওয়া বৈধ নয়। আর এজন্য বর্ধিত মূল্য মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় সূরত অর্থাৎ যদি বিক্রেতা চুক্তির পরে পণ্য বাড়িয়ে দেয়, তাহলেও বিক্রেতার মালিকানা বস্তু [অতিরিক্ত পণ্য] তারই অন্য মালিকানা বস্তু [সদ্য মালিক হওয়া বিক্রয়মূল্য]-এর বিনিময়ে হচ্ছে। আর এক ব্যক্তির একটি মালিকানাধীন বস্তু অন্য বস্তুর বিনিময়ে হওয়া যে অবৈধ ইতঃপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

আর তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ যদি বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত মূল্য ক্রেতার জন্য কমিয়ে দেয়, তাহলেও তা বৈধ হবে না। কারণ, ইতঃপূর্বে সমগ্র মূল্যকে সমগ্র পণ্যের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন—উপরিউক্ত উদাহরণে গরুর মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা। এখন যদি একশত টাকা মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয় এবং উক্ত হ্রাসকৃত মূল্য মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে পণ্যের একাংশ মূল্যবিহীন অবস্থায় বিরাজ করবে অর্থাৎ যেটুকু মূল্য কমানো হলো এর বিপরীতে পণ্যের যে অংশ

ছিল তা এখন মূল্যহীন হয়ে গেল। আর পুরো বিক্রয়পণ্যের একাংশ মূল্যবাহীন থাকা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কারণ পণ্যের কোনো অংশই মূল্যবাহীন থাকে না। সুতরাং যেহেতু বিক্রয়সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্যের একাংশ কমানোর দ্বারা অবৈধতার মুখোমুখি হতে হয়, তাই মূল্যের একাংশ কমানো এবং তা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা বৈধ হবে না।

যদি কেউ বলে, মূল্যহ্রাস করার পর অবশিষ্ট যে মূল্য রয়েছে যদি সেটাকে পুরো পণ্যের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তো উপরিউক্ত সমস্যা উপস্থাপিত হবে না। এর উত্তর হচ্ছে, মূল্যহ্রাস করার পর অবশিষ্ট মূল্য [উদাহরণস্বরূপ ৪৯০০ টাকা] কে পুরো পণ্য [গরু] এর বিনিময় সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। কারণ, এখানে এমন কোনো নতুন চুক্তি পাওয়া যায়নি যার মাধ্যমে ৪৯০০ -কে গরুর মূল্য সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং প্রথম চুক্তিতে উল্লিখিত পাঁচ হাজার গরুর মূল্য বিবেচিত হবে। উপরিউক্ত দলিল-প্রমাণ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অতিরিক্ত মূল্য বা হ্রাসকৃত মূল্য কোনোটাকেই মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং পরবর্তীতে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করা কিংবা পরবর্তীতে মূল্যহ্রাস করা অথবা বিক্রয়পণ্য বাড়িয়ে দেওয়া সবই স্বতন্ত্র দান এবং নতুনভাবে করা অনুমহ বিবেচিত হবে। হানাফী মাযহাবের অন্যান্য [প্রধান] ইমামগণ তাদের মাযহাবের সপক্ষে দলিল প্রদান করেন যা লেখক এভাবে বর্ণনা করেন—

وَلَا أَتَاهُمَا يَنْعَطُ وَالرَّيَادُ بَعْرُكَانِ الْعَدَّةِ الْخِ  
আমাদের দলিল : বিক্রয়চুক্তি সাধারণভাবে তিন ধরনের হয়ে থাকে—

১. رَابِعٌ - লাভজনক, ২. خَاسِرٌ - লোকসানপূর্ণ ও ৩. عَاوِلٌ - ইনসাফপূর্ণ।

এ তিন প্রকার বিক্রি বৈধ ও শরিয়তসম্মত। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজনের কারো যখন বিক্রয়চুক্তি দ্বারা ক্ষতি না হয় এবং বাজার অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন বিক্রয়টিকে عَاوِلٌ বা ইনসাফপূর্ণ বলা হয়। আর যদি বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কোনো একজন [ক্রেতা/বিক্রেতা]—এর ক্ষতি বা লোকসান হয়, তাহলে তাকে خَاسِرٌ বলা হয়। অর্থাৎ যার লোকসান হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করে বিক্রয়টিকে خَاسِرٌ বলা হয়, আর যার লাভ হয় তার প্রতি লক্ষ্য করে বিক্রয়টিকে رَابِعٌ বলা হয়। একই বিক্রি একজনের জন্য লাভজনক এবং অন্যজনের জন্য তা লোকসানপূর্ণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে বিক্রেতার জন্য সেটি লাভজনক বিক্রয়ে রূপান্তরিত হয়। আর যদি পূর্বে বিক্রয়টি বিক্রেতার জন্য লোকসানপূর্ণ থাকে, তাহলে মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা বিক্রয়টি লাভজনক পরিণত হয়, পক্ষান্তরে যদি একটি লাভজনক বিক্রয়ের মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে [বিক্রেতার জন্য] সেটি ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ে পরিণত হয় আর একই অবস্থায় একটি ইনসাফপূর্ণ বিক্রয় লোকসানপূর্ণ বিক্রয়ে রূপান্তরিত হয়। [অথচ এটাই ক্রেতার জন্য লাভজনক চুক্তি সাব্যস্ত হয়।] অনুরূপভাবে যদি বিক্রয়চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, তাহলে ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রয়টি লোকসানপূর্ণ অবস্থা থেকে ইনসাফপূর্ণ অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। অদ্রুপ ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়টি লাভজনক বিক্রয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সারকথা হলো, যদি বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে মূল্যের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করে কিংবা পণ্য বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে এর বিক্রয় একটি বৈধ অবস্থা থেকে অন্য বৈধ অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। যেমন— তারা লাভজনক বিক্রয়কে, ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ে রূপান্তরিত করে কিংবা লোকসানপূর্ণ বিক্রয়কে লাভজনক/ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ে রূপান্তরিত করে। আর ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্মতিভাবে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে, তাদের সেই অধিকার রয়েছে। যাদের বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে তাদের বিক্রয়ের গুণগত অবস্থা পরিবর্তন করার অধিকার উত্তম রূপে থাকবে বৈকি। কারণ, কোনো বিষয়ের গুণগত পরিবর্তন সত্ত্বেও পরিবর্তন থেকে সহজ। ক্রেতা-বিক্রেতার সত্ত্বেও পরিবর্তনের অধিকার যেহেতু রয়েছে, অতএব তাদের গুণগত পরিবর্তন করার অধিকার অবশ্যই থাকবে।

মূল্যহ্রাস করা যে বৈধ তার সমর্থন মোহরের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। মোহরের পরিমাণ হ্রাস করার বৈধতা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, আদ্বাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيقَيْنِ

অর্থাৎ মোহর নির্ধারণ করার পর তামরা হ্রাস-বৃদ্ধি করার ব্যাপারে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে যা করতে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। [২৪. সূরা নিসা] এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা বৈধ। যেহেতু হ্রাস-বৃদ্ধি বৈধতা পেল, তাহলে অবশ্যই তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা যে পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তিত অবস্থার সাথেই চুক্তি সম্পাদন হয়েছে বলা হবে। কারণ, পরিবর্তন হচ্ছে গুণগত বিষয়। আর গুণ কোনো সত্তাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

وَصَارَ كَمَا إِذَا اسْقَطَ الْخِيَارَ أَوْ شَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، ثُمَّ إِذَا صَحَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ،  
لِأَنَّ وَصْفَ الشَّيْءِ يَقُومُ بِهِ لَا يَنْفَسِهِ، بِخِلَافِ حَطِّ الْكُلِّ، لِأَنَّهُ تَبْدِيلٌ لِأَصْلِهِ، لَا تَغْيِيرٌ  
لِيَوْصِفِهِ، فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ، وَعَلَى إغْتِبَارِ الْإِلْتِحَاقِ لَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَوَضًا عَنْ مِلْكِهِ،  
وَيُظْهَرُ حُكْمُ الْإِلْتِحَاقِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ، حَتَّى يَجُوزَ عَلَى الْكُلِّ فِي الزِّيَادَةِ  
وَبَيَّانٌ عَلَى الْبَاقِي فِي الْحَطِّ، وَفِي الشُّفْعَةِ، حَتَّى يَأْخُذَ بِمَا بَقِيَ فِي الْحَطِّ، وَإِنَّمَا  
كَانَ لِلشُّفْعِ أَنْ يَأْخُذَ بِذَوْنِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ إِنْطَالِ حَقِّهِ الثَّابِتِ فَلَا يَمْلِكُ كَانِهِ،  
ثُمَّ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَيْبَعِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّ الْمَيْبَعِ كَمْ يَبْنَى عَلَى  
حَالِهِ يَصِحُّ الْإِغْتِيَاظُ عَنْهُ، وَالشَّيْءُ يَثْبُتُ ثُمَّ يَسْتَنْدُ، بِخِلَافِ الْحَطِّ، لِأَنَّهُ بِحَالٍ يُمْكِنُ  
إِخْرَاجُ الْبَدْلِ عَمَّا يُقَابِلُهُ، فَلْيَلْتَحِقْ بِأَصْلِ الْعَقْدِ اسْتِنَادًا .

অনুবাদ : তাই এটি এমন হলো যেমন তারা চুক্তির পর ইচ্ছাধিকার বাতিল করল কিংবা ইচ্ছাধিকারের শর্ত যুক্ত করল। যেহেতু এরূপ করা বৈধ, অতএব তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। কেননা, কোনো জিনিসের গুণ তার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে, স্বয়ং অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। পুরো মূল্যকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এতে তো মূল চুক্তিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে, তার গুণবিশেষকে নয়। সুতরাং তা চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে না। মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করার দিক থেকে বর্ধিত অংশ নিজ মালিকানার বিনিময় হচ্ছে না। পরবর্তী হ্রাস-বৃদ্ধির হুকুম তাওলিয়া ও মুরাবাহার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। আর তাই বর্ধিত করা অবস্থায় পুরো মূল্যের উপর মুরাবাহা ও তাওলিয়া করা বৈধ হবে। আর হ্রাস করা অবস্থায় অবশিষ্ট মূল্যের উপর মুরাবাহা ও তাওলিয়া চুক্তি করবে। শুফআর ক্ষেত্রেও তাই। হ্রাস করার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত অবশিষ্ট মূল্যে শুফআ দাবি করতে পারে। আর [মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে] শুফআর দাবিদার অতিরিক্ত মূল্য ছাড়াই শুফআ গ্রহণ করতে পারে। কেননা, বর্ধিত মূল্যের ক্ষেত্রে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল করা আবশ্যিক হয়। অথচ বিক্রেতা ও ক্রেতার তা বাতিল করার ক্ষমতা নেই। অতঃপর [মাসআলা হলো,] জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর তার মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ নয়। কেননা, বিক্রয়পণ্য তো এমন অবস্থাতে নেই যার বিনিময় সাব্যস্ত হতে পারে। অথচ [নিয়ম হলো,] কোনো বিষয় প্রথমে সাব্যস্ত হয়, তারপর সেটা অন্য কিছু সাথে সম্পৃক্ত হয়। তবে হ্রাস করার অবস্থা তার বিপরীত। কেননা, সেটা এমন অবস্থাতে রয়েছে যে, তার বদল সরিয়ে দেওয়া যায়। অতএব তা মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যুক্ত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا اسْقَطَ الْخِيَارَ : এ ইবারত দ্বারা লেখক আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতামতের পক্ষে একটি সমর্থন পেশ করেছেন। লেখক বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে যদি ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজনের অথবা উভয়ের ইচ্ছাধিকার (خِيَارُ سَط) থাকে, তারপর তারা সেই ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে অথবা বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর নতুনভাবে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় অকার্যকর চুক্তি কার্যকর করে আর দ্বিতীয় অবস্থায় কার্যকর বিক্রয়টিকে অনিশ্চিত করে দেয়, তাহলে সবার মতে এটা করা বৈধ হবে। যেভাবে উক্ত পরিবর্তন শরিয়ত বৈধ মনে করে, উদ্রূপ আলোচ্য মাসআলার বিক্রয়ের রূপান্তর বৈধ হবে। কেননা, [পূর্বে যা বলা হয়েছে] মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করা মূল্যের একটি গুণ (وَصِف), আর

কোনো বিষয়ের গুণ সে বিষয়ের অন্তরে টিকে থাকে, স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে তা টিকে থাকতে পারে না। এজন্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি মূল্যের সাথে অবস্থান করবে, বস্তু বা পৃথকভাবে টিকে থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ يَخْلُو حِطَّ الْكُلِّ الْخ: লেখক এ ইবারতের মাধ্যমে আমাদের মাঝহাবের উপর আরোপিত একটি আপত্তির জবাব দিচ্ছেন। আপত্তিটি হচ্ছে, যদি আংশিক মূল্য প্রত্যাহার করা বৈধ হয়, তাহলে তো এর উপর ক্রিয়াস করে পুরো মূল্য বাদ দেওয়া বৈধ হবে। এর উত্তরে লেখক كُلِّ [সমগ্র] এবং بَعْضٍ [আংশিক] মূল্যের হ্রাস করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিতের মাধ্যমে উত্তর দিচ্ছেন। তিনি বলেন, يَخْلُو حِطَّ الْكُلِّ, সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা বৈধ নয়। কেননা, সমগ্র মূল্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়— গুণগত পরিবর্তন হয় না। সমগ্র মূল্য বাদ দিলে ত্রয়কৃত চুক্তিটি বদলে যায়। কারণ, সমগ্র মূল্য বাদ দিলে মূল্য না থাকতে বিরুদ্ধটি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, মূল্যবিশীন বিরুদ্ধতাই হতে পারে না। অথচ এটা চুক্তি বাতিল হওয়া। তাদের উদ্দেশ্য নয়। অথবা এটা বিরক্তো কর্তৃক ক্রেতাকে উপদৌকন প্রদান বা দান সাব্যস্ত হবে। এটাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তারা তো পরস্পরে ব্যবহার উদ্দেশ্যে লেনদেন করেছিল। সুতরাং সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা বা মাফ করা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার সারকথা হলো, সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা অবস্থায় যেহেতু চুক্তির গুণগত নয় বরং মূলগত পরিবর্তন হয়ে যায়, বিনিময় চুক্তির পরিবর্তে দানে পরিণত হয়, তাই এটাকে মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা যায় না। কেননা, তখন তো চুক্তিই বহাল থাকে না। চুক্তি থাকলে তো তার সাথে অন্য কিছু যুক্ত করা যেত। এজন্য সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি মূল্যের একাংশ হ্রাস করা হয় তাহলে চুক্তি বহাল থাকে, শুধুমাত্র চুক্তির গুণগত পরিবর্তন হয়, তাই তখন হ্রাসকৃত মূল্যকে মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা যাবে।

قَوْلُهُ وَعَلَىٰ إغْنِيَارِ الْإِغْنِيَاءِ الْخ: এ ইবারতের মাধ্যমে লেখক ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর পক্ষ থেকে ইমাম মুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। তাঁরা বলেছিলেন, মূল্য বৃদ্ধি করা অবস্থায় ক্রেতার মালিকানা বস্তু ক্রেতার মালিকানা বস্তুর বিনিময় হয়ে যায়। এর জবাবে লেখক বলেন, বর্ধিত মূল্যকে যখন মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখন তা ক্রেতার মালিকানা বস্তুর বিনিময় হয় না। কেননা, যখন পরে মূল্য বৃদ্ধি করা হলো এবং তা চুক্তির সাথে যুক্ত করা হলো তখন এটা যেন প্রথম চুক্তির মাঝে বিদ্যমান ছিল এমন হয়ে গেল।

উদাহরণস্বরূপ একটি টেবিল কেনা হলো পাঁচশত টাকার বিনিময়ে, তারপর ক্রেতা পাঁচশত টাকার সাথে আরো পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি করে দিল। এখন যখন পঞ্চাশ টাকা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা হলো তো এটা এমন হলো যে, যেন প্রথম চুক্তি পাঁচশত পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়েছিল। যেহেতু প্রথম চুক্তিটি পাঁচশত পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে হয়েছে ধরা হলো, তাই বর্ধিত মূল্য ক্রেতার মালিকানার বিনিময়ে হলো না, বরং বর্ধিত মূল্য মূল মূল্যের ন্যায় বিরক্তোতার মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময়ে হলো। যেমন—আলোচ্য উদাহরণে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা [ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু] টেবিল [বিরক্তোতার মালিকানাধীন বস্তু] -এর বিনিময় সাব্যস্ত হবে।

এরপর লেখক আলোচ্য মাসআলার ফলাফল প্রকাশিত হয় এমন কয়েকটি মাসআলার ব্যাপারে আলোকপাত করেন। সুতরাং লেখক বলেন, বর্ধিত ও হ্রাসকৃত মূল্য মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার বিধান মুরাবাহা ও তাওলিয়া চুক্তির মাঝে প্রকাশিত হবে। যেমন—মূল্য বৃদ্ধি করার অবস্থায় মুরাবাহা ও তাওলিয়ার প্রথম মূল্য ধরা হবে মূল মূল্য এবং বর্ধিত মূল্য উভয়কে। যেমন—এক ব্যক্তি একটি টেবিল ত্রয় করল পাঁচশত টাকায়, তারপর সে বিরক্তোতাকে মূল্য বাবদ আরো অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা প্রদান করল। এরপর যদি ক্রেতা টেবিলটি মুরাবাহা/ তাওলিয়ারূপে বিক্রি করতে চায়, তাহলে টেবিলের মূল্য ধরবে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা। তাওলিয়া হলে সে টেবিলটি পাঁচশত পঞ্চাশ টাকাতেই বিক্রি করবে। আর যদি মুরাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায়, তাহলে পাঁচশত পঞ্চাশের উপর মুরাফা নেবে।

আর মূল্য হ্রাস করা অবস্থায় হ্রাসকৃত মূল্যের উপর সে মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিরুদ্ধতাই করবে। যেমন—কোনো ব্যক্তি পাঁচশত টাকায় একটি টেবিল ত্রয় করল, তারপর বিরক্তো টেবিলটির মূল্য পঞ্চাশ টাকা কম নিল, অর্থাৎ সাড়ে চারশত টাকা নিল।

তারপর ক্রেতা যদি টেবিলটি মুরাবাহা/ তাওলিয়ারূপে বিক্রি করতে চায়, তাহলে সে সাড়ে চারশত টাকা প্রথম মূল্য ধরে বিক্রি করবে লেখক বলেন, পরবর্তী মূল্য ও হ্রাস-বৃদ্ধির ধ্বংস গুণআর ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হবে। যদি ত্রয়ের পর মূল্য হ্রাস করা হয়, তাহলে শফী হ্রাসকৃত মূল্যেই জমিন নেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—এক ব্যক্তি তিন লক্ষ টাকায় তিন কাঠা জমিন ত্রয় করল, এরপর বিরক্তো ক্রেতাকে পঁচিশ হাজার টাকা ছাড় দিল অর্থাৎ বিরক্তো জমিন বাবদ দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা নিল। তারপর পার্শ্ববর্তী জমিদার গুফআ দাবি করে জমিন নিতে চাইল, তাহলে সে অবশিষ্ট মূল্য তথা দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার বিনিময়েই জমিন নেবে।

عَنْ قَوْلِهِ رَبَّنَا كَانَ لِفَتْحِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ يَمْدَدُ الرَّبُّ دَوْلَ الْخ: এ ইবারতের মাধ্যমে লেখক মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মাসআলা যে গুফআর মাসআলা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম তা উল্লেখ করেছেন। ব্যতিক্রমটা এখানে যে, যদি বিক্রয়ের পর ক্রেতা জমিন বানদ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করে, তাহলে শাফী' জমিন নিলে সেই বর্ধিত মূল্য প্রদান করতে বাধ্য নয়; বরং শাফী' নির্ধারিত মূল্যেই জমিন নিতে পারবে। উদাহরণরূপ কেউ তিন লক্ষ টাকায় জমিন কেনার পর বিক্র্যেতে পঁচিশ হাজার টাকা বেশি দিল। এখন উক্ত জমিনে যদি কেউ গুফআ দাবি করে নিতে চায়, তাহলে সে তিন লক্ষ টাকাতেই নেবে। বর্ধিত মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা তাকে প্রদান করতে হবে না। কারণ, শাফী'র হক [প্রাপ্ত অধিকার] প্রথম চুক্তির সাথেই যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন- তিন লক্ষ টাকায় প্রথম চুক্তি যখন হলো শাফী'র অধিকার উক্ত তিন লাখ টাকার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। এরপর বর্ধিত মূল্য প্রদান করা হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা। এখন যদি উক্ত পঁচিশ হাজার টাকা শাফী'র উপর আরোপ করা হয়, তাহলে তার প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল করা আবশ্যিক হয়। তাছাড়া এর দ্বারা শাফী' আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে অন্যের অধিকার বাতিল করার কোনোই অধিকার নেই এজন্য আলোচ্য মাসআলায় বর্ধিত মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে যদিও মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, কিন্তু শাফী'-এর ক্ষেত্রে তা হবে না। কেননা, বর্ধিত মূল্য যুক্ত করলে শাফী' ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

عَنْ قَوْلِهِ رَبَّنَا كَانَ لِفَتْحِهِ لَا تَصِحُّ بَعْدَ هَذَا الْمَوْجِبِ الْخ: লেখক বলেন, উপরিউক্ত বিধান বিক্রয়পণ্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। যদি বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জাহের রেওয়াজে মতে মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না। উল্লেখ্য যে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার দুই অবস্থা-

১. প্রকৃতভাবে বিনষ্ট হওয়া। যেমন- মৃত্যুবরণ করা অথবা পণ্য ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাওয়া।

২. হুকুমের দিক থেকে বিনষ্ট হওয়া। যেমন- গোলামকে ক্রেতা আজাদ করে দিল/মুদাক্বার বানিয়ে দিল/মোকাভাব বানিয়ে দিল ইত্যাদি। কিংবা পণ্য বিনষ্ট হলো বিক্রয়/দান/ভাড়া প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে। উভয় বিনষ্টের অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না। কারণ, বৃদ্ধি যার উপর করবে সেই ক্ষেত্রেই তো এখন নেই। যেমন- মোহরের মধ্যে বৃদ্ধি করার জন্য শর্ত হলো বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকা। যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় অথবা স্ত্রী মারা যায়, তাহলে মোহরের পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় না।

তবে যদি বকরি ক্রয় করে আর সেই বকরিকে জবাই করে ফেলে তারপর ক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহলে তা বৈধ। এমনভাবে যদি কেউ পণ্য ক্রয় করে ভাড়া দিয়ে দেয় কিংবা বন্ধক রাখে, তাহলেও তাতে বৃদ্ধি করা বৈধ। তদ্রূপ কেউ যদি কাপড় সেলাই করে/লোহা কিনে তা তরবারি বানিয়ে ফেলে/ক্রয়কৃত গোলামের হাত কেটে ফেলে উক্ত সব অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ। এরপর লেখক বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য বৃদ্ধি করার যে অবৈধতার কারণ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে,

لَا يَصِحُّ لَمْ يَبْقَ عَلَى خَالِوٍ يَصِحُّ الْغِيَابُ عَنْهُ অর্থাৎ 'কেননা, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর বিক্রয় এমন অবস্থাতে থাকে না যে, তার বিনিময় গ্রহণ করা যেতে পারে।' কারণ, বিদ্যমান-স্বমূর্তিতে অবস্থানকারী দ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা যায়। অস্তিত্বহীন বা অবর্তমান দ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা যায় না। এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি হলো, প্রথমে কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করেছে তারপর তার দিকে অন্য কিছুকে সম্পর্কিত করা হয়। আলোচ্য মাসআলায় পণ্য নেই এজন্য মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না, যেহেতু মূল্য বৃদ্ধিই বৈধ নয় তাই মূল্য বৃদ্ধি করে সেটাকে মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা যাবে না।

عَنْ قَوْلِهِ رَبَّنَا كَانَ لِفَتْحِهِ لَا يَصِحُّ بَعْدَ هَذَا الْمَوْجِبِ الْخ: লেখক বলেন, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য হ্রাস করা বৈধ এবং তা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা যায়। কেননা, মূল্য হ্রাস করার অর্থ হচ্ছে মূল্য বাদ দেওয়া। আর কোনো কিছু বাদ দেওয়ার জন্য তার বিনিময়ের উপস্থিতি আবশ্যিক নয়। কারণ, হ্রাসকরণ তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়ে থাকে। আর কার্যকর হওয়ায় তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, মূল্য হ্রাসের সূরতে অবশ্য মূল্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। আর মূল্য সবসময় বহাল থাকে তাই হ্রাসকরণ শুদ্ধ হবে। যেমন- এর নজির দেখতে পাই পণ্যের মাঝে দোষ পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ক্রয়কৃত পণ্যে দোষ থাকার কথা যদি ক্রেতা জানতে পারে আর ততদিনে পণ্য বিনষ্ট হয়ে থাকে, তবু পণ্যের দোষের কারণে মূল্য হ্রাস করা যায়। এ ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধিত থাকলে ক্রেতা মূল্যের দোষজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। সারকথা হচ্ছে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর এ মাসআলাতে দোষের কারণে মূল্য হ্রাস করা যেহেতু বৈধ হচ্ছে, সুতরাং আমাদের মাসআলাতেও তা করা বৈধ হবে।

প্রকাশ থাকে যে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য বৃদ্ধি করা অবৈধ হওয়ার বিষয়টি জাহের রেওয়াজে দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে এ ব্যাপারে নাওয়াদির রেওয়াজে ইমাম হাসান ইবনে হিয়াদ (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য হ্রাস করা যেমন বৈধ, তেমনি মূল্য বৃদ্ধি করাও বৈধ।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ بِشْمَنْ حَالٍ ثُمَّ أَجَلَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا صَارَ مُؤَجَّلًا ، لِأَنَّ الشَّمْنَ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ تَيْسِيرًا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ بِمِلْكِكَ إِبْرَاءٌ مُطْلَقًا فَكَيْدًا مُؤَكَّدًا ، وَلَوْ أَجَلَهُ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ إِنْ كَانَتْ الْجَهَالَةُ مُتَفَاعِشَةً كَهَبُوبِ الرِّيحِ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ وَالِدِّيَّاسِ يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যদি কেউ নগদ মূল্যে কোনো কিছু বিক্রয় করে, তারপর সে [মূল্য পরিশোধের জন্য] নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে, তাহলে তা মেয়াদিতে পরিণত হবে। কেননা, ধার্য মূল্য (شَمْنٌ) তার প্রাপ্য অধিকার, সুতরাং দেনাদারের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে সেটাকে বিলম্বিত করার এখতিয়ার তার রয়েছে। এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, বিক্রেতা দেনাদারকে তার দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে, অনুরূপভাবে সে পাওনাকে মেয়াদিও করতে পারবে। আর যদি সে অনির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে এবং সেই অনির্দিষ্টতা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকে যেমন [বলা হয়—] মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত, তাহলে অবৈধ হবে। আর যদি মেয়াদ সামান্য অজ্ঞাত হয় যেমন— ফসল কাটার সময় ও ফসল মাড়ানোর সময়, তাহলে বৈধ হবে। কেননা, এ অজ্ঞাত তো কারো জামিন হওয়ার মতো, ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ بِشْمَنْ حَالٍ ثُمَّ أَجَلَهُ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক বিক্রয়চুক্তিকে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত করা সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করেছেন।

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি নগদানভাবে কোনো কিছু বিক্রি করল। অর্থাৎ নগদ চুক্তি করল, তারপর ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময় দিল, যেমন বলল, রবিউল আউয়ালের পঁচিশ তারিখের ভিতর তুমি মূল্য পরিশোধ করবে। তাহলে উক্ত মেয়াদ দেওয়া অর্থাৎ নগদান চুক্তিটিকে বাকি চুক্তিতে রূপান্তরিত করা বৈধ। ইমাম মালিক (র.)-ও এরূপ মত প্রকাশ করেন।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করা হলেও মূল্য বাকিতে রূপান্তরিত হবে না; বরং চুক্তিটি পূর্বাবস্থায় তথা নগদানরূপে বহাল থাকবে। তাঁদের মতে মেয়াদ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ মূল্য দাবি করতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ক্রয়মূল্য ক্রেতার দায়িত্বে ঋণ গণ্য হয়। ঋণকে قَرْضٌ [ধার]-এর উপর কিয়াস করা হয়েছে। ধার যেমনভাবে মেয়াদি করলেও মেয়াদি হয় না, তদ্রূপ ক্রয়মূল্য ক্রেতা মেয়াদি করলেও মেয়াদি হবে না। করজদার যে কোনো মুহুর্তে তার ঋণগ্রহীতার কাছে পাওনা চাইতে পারবে।

আহনাফের দলিল সম্পর্কে লেখক বলেন, ক্রয়মূল্য হচ্ছে বিক্রেতার প্রাপ্য হক বা অধিকার। প্রত্যেক হকদার যেমন তার অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে তদ্রূপ বিক্রেতাও তার হকের ব্যাপারে এ ক্ষমতা অবশ্যই রাখে যে, সে তার অধিকার বিলম্বিত করে ক্রেতাকে কিছুটা সুবিধা দান করবে। যেমন এখানে মূল্য পরিশোধের সময় একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করার মাধ্যমে সুযোগ দান করেছে।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় দলিল হলো, ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, সেই মেয়াদ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতার কাছে মূল্য চাওয়া থেকে ক্রেতাকে পরিত্রাণ দেওয়া। এখন সেই মেয়াদ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তার কাছে কোনো কিছু চাওয়া হবে না। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য থেকে রেহাই দিতে পারে, তাহলে তো তার এ অধিকার নিশ্চয়ই আছে যে, সে ক্রেতাকে পাওনার তাগিদ করা থেকে মুক্ত রাখবে। অর্থাৎ যেহেতু বিক্রেতা ক্রেতাকে শরিয়তসম্মতভাবে মূল্য থেকে রেহাই দিতে পারবে, অতএব তাকে মূল্য পরিশোধের তাগিদ করা থেকে স্বাভাবিকভাবেই রেহাই দিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ أَجَّلَهُ إِلَى أَجَلٍ مَّجْهُولٍ الْخ : এরপর লেখক বলেন, যদি মূল্য পরিশোধের জন্য কোনো অনির্ধারিত সময় দেয়, তাহলে আবার দু সূরত—

১. অনির্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অর্থাৎ এতে অজ্ঞতার মাত্রা খুবই বেশি। যেমন বলল, মূল্য পরিশোধের সময় হচ্ছে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সময় অথবা বৃষ্টি বর্ষণের সময়।
২. অনির্দিষ্টতার মাত্রা কম, যেমন কেউ বলল, ফসল কাটার সময়/ফসল মাড়ানির সময় ইত্যাদি। লেখক বলেন, অজ্ঞতা যদি সামান্য তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের হয়, তাহলেও মেয়াদি করা বৈধ। তবে যদি অজ্ঞতার মাত্রা বেশি হয় তথা প্রথম পর্যায়ের হয়, তাহলে অবৈধ হবে।

প্রথম সূরতে বিক্রেতা যে কোনো সময় মূল্য পরিশোধের দাবি করতে পারে, আর দ্বিতীয় সূরতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের দাবি করতে পারবে না। এর দলিল সম্পর্কে লেখক বলেন, لَا يَمْنُوزُهُ الْكَفَالَةُ অর্থাৎ বিক্রয়ের পর মূল্য মেয়াদি করা কাফালাহ [জামিন হওয়া]-এর পর্যায়ভুক্ত। কাফালাহ সম্পর্কে ফাসিদ বিক্রয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কাফালাহ-এর মধ্যে সামান্য অজ্ঞতা স্কতিকর নয়, তদ্রূপ এখানেও সামান্য অজ্ঞতা স্কতির কারণ নয়। কাফালাহ মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতা দ্বারা যেরূপ বাতিল হয়ে যায়, তেমনি মূল্য পরিশোধের মেয়াদ খুব বেশি অজ্ঞাত থাকলে মেয়াদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি কেউ বিক্রয়চুক্তির মধ্যে মেয়াদের শর্তারোপ করে, তাহলে সেই মেয়াদ স্বল্প অজ্ঞাত হোক কিংবা বেশি অজ্ঞাত হোক বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَلُهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا لِمَا ذَكَرْنَا ، إِلَّا الْقَرْضَ فَإِنْ تَأَجَّلَ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَصَلَةٌ فِي الْإِبْتِدَاءِ حَتَّى يَصِحَّ بِلَفْظَةِ الْإِعَارَةِ وَلَا يَمْلِكُ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْوَصِيِّ وَالصَّبِيِّ ، وَمُعَاوَضَةٌ فِي الْإِنْتِهَاءِ فَعَلَى إِعْتِبَارِ الْإِبْتِدَاءِ لَا يَلْزَمُ التَّاجِلُ فِيهِ ، كَمَا فِي الْإِعَارَةِ إِذْ لَا جَبْرَ فِي التَّبَرُّعِ ، وَعَلَى إِعْتِبَارِ الْإِنْتِهَاءِ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ يَصْنُرُ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ تَسْيِينَةً ، وَهُوَ رِبَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْضَى أَنْ يُفْرِضَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَنَا إِلَى سَنَةٍ ، حَيْثُ يَلْزَمُ الْوَرْتَةُ مِنْ تُلْهِمُ أَنْ يُفْرِضُوهُ وَلَا يَطَالِبُوهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ ، لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى فَيَلْزَمُ حَقًّا لِلْمَوْصِي .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, প্রত্যেক নগদ পাওনাকে প্রাপক যদি মেয়াদি করে দেয়, তাহলে তা মেয়াদি হয়ে যাবে। এর দলিল হিতঃপূর্বে বর্ণনা করেছে। তবে ঋণ [ধার] এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে মেয়াদি করা বৈধ নয়। এর কারণ হলো, এটা সূচনালগ্নে আরিয়াত ও দান- এজন্যই তো আরিয়াত (الْإِعَارَةُ) শব্দ দ্বারা এটা সংঘটিত হয়ে যায়। যে দান করার অধিকার রাখে না সে ঋণ দান করতে পারে না। যেমন- অছি [উইলকারী] ও শিশু। আর ঋণ পরিণামে বিনিময়-চুক্তি। প্রথমাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে এতে মেয়াদ প্রদান সম্ভব নয় যেমন আরিয়াতের মাঝে। কারণ, দানের ক্ষেত্রে জবরদস্তি হয় না। আর পরিণাম বিচারেও তা বৈধ নয়। কারণ, এটা দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ এটা রিবা [সুদযুক্ত বিক্রয়]। এর ব্যতিক্রম হলো, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে অসিয়ত করে গেল যে, অমুক ব্যক্তিকে তার মাল থেকে এক হাজার দিরহাম এক বছরের জন্য ধার দেবে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের উপর তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ধার দেওয়া আবশ্যক হবে এবং তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তার কাছে ধার [ফেরত] চাইবে না। কেননা, এটা দানের অসিয়ত, যা দাস-দাসীর খিদমত ও বাড়িতে বসবাস করার অসিয়তের মতো। সুতরাং এটা অসিয়তকারীর হক হিসেবে অবশ্যপালনীয় হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا الْخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ধার প্রদানের পর সেটাকে মেয়াদি করা যাবে কিনা ? এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথমেই আমাদের دَيْنٌ وَ قَرْضٌ -এর মাঝে কি পার্থক্য তা জেনে নেওয়া উচিত : دَيْنٌ -এর সংজ্ঞা হলো، وَجَبَ فِي الدَّيْنِ مَا أَرْبَاهُ কারো জিম্মায় যে আর্থিক দায় রয়েছে তাকেই দায়ন বলা হয়। চাই সে দায় কোনো চুক্তির কারণে হোক কিংবা কারো কোনো জিনিস বিনষ্ট করার দ্বারা হোক।

আর قَرْضٌ বলা হয় দ্রব্য বা অর্থকে যা মানুষ তার নিজ মাল-সম্পদ থেকে অন্যের উপকারের জন্য প্রদান করে। তবে কর্ত্ত গ্রহণকারীর জিম্মায় যা থাকে তাকে দায়ন বলা হয়। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কর্ত্ত ছাড়া অন্য যত প্রকার ঋণ রয়েছে তা যদি নগদ প্রাপ্য হয়, তাহলে ঋণদাতা ইচ্ছা করলে সেটাকে মেয়াদি করতে পারে। এর দলিল হিতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, দায়ন-ঋণ হচ্ছে প্রাপকের হক। আর প্রত্যেক হকদার তার হকের মধ্যে যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে। হকদার তার প্রাপ্য হক ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিতে পারে। সুতরাং ঋণগ্রহীতার উপকারার্থে সে তার নগদ প্রাপ্যকে বাকিতে ও মেয়াদে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ সে তার নগদ পাওনাকে বাকিতে রূপান্তর করতে পারে, সে অধিকার তার রয়েছে।

তবে قَرْضٌ [ধার]-এর ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম। যদি ধারের ক্ষেত্রে কেউ তার পাওনাকে মেয়াদি করতে চায়, তাহলে তা ঠিক হবে না এবং উক্ত মেয়াদ গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং কর্ত্তদাতা তৎক্ষণাৎ তার ঋণ উসুলের দাবি করতে পারবে। যদি কেউ কর্ত্ত দেওয়ার সময় নির্ধারণ করে, তাহলে তার কর্ত্ত দান শুদ্ধ হবে, কিন্তু মেয়াদ বাতিল হয়ে যাবে।



ইমাম মালিক (র.)-এর মতে মোয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ হবে, কারণ গ্রহীতার জিম্মায় যখন চলে এসেছে তখন তা অন্যান্য ঋণের মতোই হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যান্য ঋণ যেমন মোয়াদ করা যায় এটাও করা যাবে। যদি কর্তৃদাতা মৃত্যুবরণ করে তারপর উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক মোয়াদ করে, তাহলে কাশীখানের সুস্পষ্ট বর্ণনামুযায়ী মোয়াদ শুদ্ধ হবে না যেমন কর্তৃদাতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সহীহ মতানুযায়ী কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার পূর্বের ও পরের কোনো অবস্থাতেই মোয়াদ নির্ধারণ করা জায়েজ নেই।

মোয়াদ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কর্তৃক বিনষ্ট হওয়া বা না হওয়া উভয়ই বরাবর। লেখক কর্তৃকের মধ্যে মোয়াদ নির্ধারণ নাজায়েজ হওয়ার দলিল প্রদান করেন এভাবে, **وَلَيْتَهُ إِعَارَةً وَكَيْفَ فِي الْإِنِّدَاءِ** অর্থাৎ 'কর্তৃক সূচনাতে আরিয়ত ও দান।' এটা আরিয়ত- এর দলিল হলো, ঋণ-কর্তৃদাতা ব্যক্তি যদি **أَقْرَضَكَ**-এর স্থলে **أَعْرَضَكَ** বলে, তাহলে তার কর্তৃদান শুদ্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যে বা যারা দান করতে পারে না তাদের জন্য কর্তৃক দেওয়াও বৈধ নয়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হলো যে, কর্তৃক সূচনালগ্নে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু সেই সাথে পরিণামে কর্তৃক হচ্ছে লেন-দেন বা বিনিময়। অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় [কর্তৃক হচ্ছে] দান ও পরিণামে লেনদেন। কেননা, মানুষ কাউকে এজন্য ধার দেয় না যে, ধারগ্রহীতা পরে উক্ত ধার দেওয়া বস্তুটি কিংবা তার বদল অবশ্যই ফেরত দেবে। এজন্য কর্তৃক গ্রহণকারীর উপর সেই বস্তু প্রদান করা আবশ্যক নয় যা কর্তৃদাতার থেকে গ্রহণ করেছিল: বরং তার উপর আবশ্যক হচ্ছে সেই কর্তৃকের বদল প্রদান করা, যেহেতু কর্তৃকের বদল প্রদান করা আবশ্যক সেহেতু এটা নিঃসন্দেহে একটা লেন-দেন চুক্তি।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কর্তৃকের মধ্যে ফিকহবিদগণ উভয় অবস্থার প্রতি বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিয়েছেন। সে মতে লেখক বলেন, যেহেতু সূচনাতে এটা দান, অতএব এতে কোনো মোয়াদ নির্ধারণ করা যাবে না। মোয়াদ নির্ধারণ করলেও এর কোনো গুরুত্ব থাকবে না এবং তা কার্যকর হবে না। কর্তৃক-এর উদাহরণ হচ্ছে আরিয়ত অর্থাৎ আরিয়ত যেমনটা মোয়াদ করতে চাইলে মোয়াদি করা যায় না তদ্রূপ কর্তৃক মোয়াদি করতে চাইলে মোয়াদি করা যাবে না। কর্তৃক ও আরিয়ত দেওয়ার পর যদি মোয়াদের আলোচনা করে তারপরও উভয় পাওনাদার তৎক্ষণাৎ তাদের পাওয়া চেয়ে নিতে পারবে। কারণ, আরিয়ত প্রদান হচ্ছে এক ধরনের দান, আর দানের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যদি মোয়াদ এতে নির্ধারিত হয়ে যায়, তাহলে এটা ধারদাতার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ ধারদাতা তার পাওনা নির্দিষ্ট মোয়াদের পূর্বে চাইতে পারবে না। আর এটা স্পষ্টত চাপ সৃষ্টি করা। মোটামুটি, ধার বা কর্তৃক প্রদান যেহেতু এক ধরনের দান সেহেতু এটাকে মোয়াদ দ্বারা নির্ধারণ করা বৈধ হবে না। যেমন- আরিয়ত প্রদানের পর মোয়াদ দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের দলিল- **مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ** অর্থাৎ 'উত্তম ও দানশীলদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' যদি মোয়াদ দ্বারা চাপ সৃষ্টি করা হয়, তাহলে তা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলো। সুতরাং আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, মোয়াদ আরোপের মাধ্যমে কর্তৃক চাওয়ার অধিকার বিলম্বিত করা যাবে না। লেখক তার দাবি প্রমাণে দ্বিতীয় দলিল দেন এভাবে যে, **وَعَلَىٰ إِبْتِغَارِ الْإِنْتِهَاءِ لَا يَصِحُّ** অর্থাৎ 'কর্তৃকের পরিণাম বিচারেও মোয়াদ নির্ধারণ করা নাজায়েজ।' কেননা, মোয়াদ নির্ধারণের পর লেন পরিণাম বিচারে কর্তৃক **بِمَا لَدَيْهِمْ تَمْتَنُّ** অর্থাৎ 'বাকিতে মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করা আবশ্যক হবে।' যা শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। কারণ, এতে সুদ পাওয়া যায়।

তবে এখানে স্মরণীয় যে, কর্তৃক পরিণতি বিচারে একটি মুদ্রা বিনিময়ের লেনদেন বিবেচিত হয় আর তা এখানে উপস্থিত লেন-দেন হিসেবে হয়নি; বরং বাকিতে হয়েছে এজন্য এটাও সুদের কারণে অবৈধ হওয়াই সমীচীন ছিল, কিন্তু ইসলামি শরিয়তে কর্তৃক প্রদান পুণ্যের কাজ ও রাসুলের সুন্নত এবং এর শুদ্ধতা উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। উপরিউক্ত কারণে আমরা কর্তৃকের প্রাসঙ্গিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখি কর্তৃক তাকে বৈধ সাব্যস্ত করছি এবং এর মধ্যে মোয়াদ সাব্যস্ত করাকে অবৈধ করছি।

**وَمِمَّا يَخْلُفُ مَا إِذَا رَأَىٰ أَن يَتَّبِعُ الْخ** উক্ত ইবারতের মাধ্যমে লেখক একটি বাতিক্রমি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। মাসআলাটি হলো, এক ব্যক্তি মৃত্যুযোগ্য আক্রান্ত হওয়ার পর এ অসিয়ত করল যে, আমার সম্পদ থেকে দশ

হাজার টাকা এক বছরের মোয়াদে খালিদকে প্রদান করবে, তাহলে এ কর্তৃক প্রদান শুদ্ধ হবে এবং এর মোয়াদও আবশ্যক হবে এবং উক্ত ব্যক্তির মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কর্তৃক প্রদান করা হবে এবং এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সেই কর্তৃক পরিশোধের দাবিও করতে পারবে না। এ মাসআলা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কর্তৃকে মোয়াদ দ্বারা নির্ধারণ করা যায় এবং মোয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সেই কর্তৃক চাওয়া যায় না। বাতিক্রমি মাসআলাটির কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, এটা তো একটা অনুগ্রহ সংক্রান্ত অসিয়ত। অসিয়ত ও সাধারণ অবস্থার মাঝে অনেক তফাৎ অসিয়তের এমন অনেক কিছুই বৈধ, যা সাধারণ অবস্থায় বৈধ নয়। যেমন- কর্তৃকের অসিয়ত করলে এতে মোয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ অথচ সাধারণ কর্তৃকের মধ্যে মোয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ নয়।

তদ্রূপ কেউ যদি অসিয়ত করে অমুক আমার ঘরে এক বছর থাকবে কিংবা আমার গোলামের এক বছর বিদমত পাঠাবে, তাহলে উক্ত অসিয়ত কার্যকর হয়ে যায়। অথচ কেউ যদি তার ঘর অথবা গোলাম এক বছরের জন্য আরিয়ত [ধার] দেয়, তাহলে তা বৈধ নয়। এর কারণ হচ্ছে, অসিয়তের মধ্যে উদারতা বিদ্যমান। এতটা উদারতা অন্য কোথাও নেই। এমনই আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, যেমন কেউ তার বাগানের ফলওলো অসিয়ত করে গেল, তাহলে ফল না থাকা সত্ত্বেও অসিয়ত কার্যকর হবে। অসিয়তের ক্ষেত্রে এসব বৈধ হওয়ার কারণ হচ্ছে, অসিয়তকারীর উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানির দ্বার খুলে দেওয়া, যাতে অসিয়তকারী মৃত্যুর পর পুণ্য লাভে সক্ষম হয়। সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

## بَابُ الرِّبَا

قَالَ : الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكْنِيٍّ أَوْ مَوْزُونٍ إِذَا بِنِعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاعِلًا فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ أَوْ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ، قَالَ (رض) : وَيَقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ أَشْمَلُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا يَمِثِلُ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبَا، وَعَدَّ الْأَشْيَاءَ السِّتَّةَ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْتَّمَرُ وَالْمِلْحُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ، وَرَوَى بِرَوَائَتَيْنِ بِالرَّفْعِ "مِثْلُ"، وَبِالتَّصْبِ "مِثْلًا"، وَمَعْنَى الْأَوَّلِ بِنِعَ التَّمَرِ وَمَعْنَى الثَّانِي بِنِعْمَا التَّمَرِ -

### পরিচ্ছেদ : 'রিবা' বা সুদ

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, পাত্র-পরিমাপিত ও ওজন-পরিমাপিত যে কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'রিবা' হারাম হবে যখন উক্ত দ্রব্য সমশ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা হয়। সুতরাং আমাদের নিকট 'রিবা' হওয়ার কারণ বা 'ইল্লাত' হলো, [উভয় দ্রব্য] পাত্র-পরিমাপিত হওয়া এবং [উভয় দ্রব্য] একই শ্রেণী (جنس)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিংবা উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। গ্রন্থকার (র.) বলেন, [সংক্ষেপে] এভাবে বলা যেতে পারে যে, ['রিবা' হারাম হওয়ার কারণ বা 'ইল্লাত' হলো, উভয় দ্রব্যের] পরিমাপের মাধ্যম এবং শ্রেণী এক হওয়া। আর এভাবে বলাই অধিকতর সর্বস্বীকৃত। 'রিবা'-এর বিধানের ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো, প্রসিদ্ধ হাদীস। আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর এই বাণী- "গমের বিনিময়ে গম [বিক্রয়] সমানের বিনিময়ে সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে আদান-প্রদান হতে হবে। আর অতিরিক্ত অংশ 'রিবা' হবে।" নবী করীম ﷺ [পূর্ণ হাদীসটিতে] ছয়টি দ্রব্য যথা- গম, যব, খেজুর, লবণ, সোনা, ও রূপাকে একই ধারায় উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি [شکل] দ্রব্যের বর্ণিত হয়েছে, ১. رَنْعٌ বা পেশযুক্ত হয়ে। ২. نَصَبٌ বা তথা যবরযুক্ত হয়ে। প্রথম রেওয়য়াত অনুযায়ী অর্থ হলো, খেজুর বিক্রয় হতে হবে সমান সমান পরিমাণের ভিত্তিতে। আর দ্বিতীয় রেওয়য়াত অনুযায়ী অর্থ হলো, তোমরা খেজুর বিক্রয় কর সমান সমান পরিমাণের ভিত্তিতে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : 'রিবা'-এর আভিধানিক অর্থ : رِبَا -এর আভিধানিক অর্থ হলো، الرِّبَاةُ وَالْإِزْفَاعُ - বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া, উচ্চ হওয়া। যেমন বলা হয়- هَذَا يَرْبُو عَلَى ذَلِكَ "এটা ওটার চেয়ে বেশি বা অতিরিক্ত"। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন- وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لَيْسَ بِرَبِّكُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ "তোমরা মানুষের সম্পদের মাঝে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে রিবা প্রদান করে থাক তা আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃদ্ধি পায় না।" এজন্যই উচ্চ

জায়গাকে رَوْءٍ বলা হয়। কেননা, তা অন্যান্য স্থান থেকে উঁচু বা উচ্চতার দিক থেকে অতিরিক্ত। উল্লেখ্য, رَوْءٍ শব্দটি কখনো অতিরিক্ত বস্তুটির (نَفْسُ الرَّائِدِ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী-لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاْ। আবার কখনও মাসদার অর্থাৎ বৃদ্ধি করা বা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী-وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاْ। 'রিবা'-এর পারিভাষিক অর্থ هو الفضلُ الخالي عن العوضِ المشروط لِأَحَدِ الْمُتَعَايِدِينَ فِي مَعَاوَضَةٍ مَالٍ। 'রিবা' বলে, যা চুক্তিকারীদের কোনো এক পক্ষের জন্য শর্ত করা হয়েছে এবং সে অংশের বিনিময়ে অপর পক্ষ থেকে কিছুই দেওয়া হয় না।" এখানে অতিরিক্ত অংশ বলতে দৃশ্যত অতিরিক্ত এবং বিধানগত (حُكْمًا) অতিরিক্ত উভয়টাই উদ্দেশ্য, সুতরাং এক পরিমাণের দ্রব্য একটা নগদ আর একটা বাকি হলে তাও বিধানগতভাবে অতিরিক্ত হয়ে 'রিবা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

দূরে মুখতার এচ্ছে সংজ্ঞাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنِ عَوْضٍ بِمِقْيَارٍ شَرْعِيٍّ مَشْرُوطٍ لِأَحَدِ الْمُتَعَايِدِينَ فِي الْمَعَاوَضَةِ.

'রিবা'-এর বিধান : 'রিবা' সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে 'রিবা' হারাম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاْ। আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন আর 'রিবা' হারাম করে দিয়েছেন।" অন্য এক আয়াতে বলেছেন-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاْ। "হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রিবা' [সুদ] ভক্ষণ কর না।"

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে 'রিবা' গ্রহণকারীদের পাঁচটি পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

1. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاْ لَا يَزِيدُهم إِلَّا كَيْدًا। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-অপ্রকৃতিস্থ ও অনুভূতিহারা হওয়া। "যারা 'রিবা' [সুদ] ভক্ষণ করে তারা [কিয়ামতের দিবসে] কেবল ঐ ব্যক্তির মতো হয়েই উঠবে যাকে শয়তান অপ্রকৃতিস্থ বা অনুভূতিহারা করে ফেলেছে।"
2. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاْ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-"আল্লাহ 'রিবা'কে নিশ্চিহ্ন করে দেন [অর্থাৎ তার বরকত ও কল্যাণ দূর করে দেন।]"
3. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا بِعَرْبٍ مِنْ-। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-"আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।" যদি তোমরা 'রিবা' পরিহার না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।"
4. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-"যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে যা 'রিবা' [সুদ] পাওনা হিসেবে বাকি রয়েছে তা পরিত্যাগ কর।" অর্থাৎ 'রিবা' হারাম করার পরও যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না করো, তাহলে [প্রকৃত] মু'মিন নও।
5. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا-। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-"চিরদিন জাহান্নামে থাকা।" "যারা পুনরায় 'রিবা'-এর দিকে ফিরে যাবে তারা জাহান্নামবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন [কিংবা দীর্ঘ দিন] থাকবে।" এছাড়া হাদীসে নবী করীম ﷺ যারা 'রিবা' [সুদ] গ্রহণ করে কিংবা প্রদান করে বা 'রিবা'-এর চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করে অথবা 'রিবা'-এর চুক্তির সাক্ষী থাকে তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে-لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ الرِّبَاِ وَمَوْكِلَهُ وَشَاعِدَيْهِ وَكَائِبَهُ। "নবী করীম ﷺ 'রিবা' ভক্ষণকারী, তা প্রদানকারী, তার সাক্ষীদ্বয় এবং তা লিপিবদ্ধকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।"

পূর্ব পরিচ্ছেদের সাথে এ পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক :

'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের সাথে পূর্বের পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়ের শুরু হতে 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত পরিচ্ছেদগুলোতে মুসান্নিফ (র.) সে সকল ক্রয়-বিক্রয়ের [সহীহ ও ফাসিদ সুরত সহকারে] আলোচনা করেছেন যা فُضِّلَ اللَّهُ مِنْ أَفْزَرٍ وَأَبْخَرًا। "অতঃপর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর।" আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ পরিচ্ছেদে ঐ সকল ক্রয়-বিক্রয়ের

আলোচনা শুরু করছেন যা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে নিষেধ করা হয়েছে—“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا” হু মিনগণ! তোমরা ‘রিবা’ ভক্ষণ কর না।” আর নিষেধ সাধারণত আদেশের পরে হয়ে থাকে, তাই ‘রিবা’-র আলোচনা পরে করেছেন।

এছাড়া ‘রিবা’-এর পরিচ্ছেদের পূর্বের পরিচ্ছেদ ‘মুরাবাহা’ বিষয়ক (بَابُ الْمُرَابَحَةِ) -এর সাথে বিশেষ ধারাবাহিকতার সম্পর্ক হলো, ‘রিবা’ এবং ‘মুরাবাহা’-এর উভয়ের মাঝে এক পক্ষে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ‘মুরাবাহা’-এর মাঝে যে অতিরিক্ত হয়ে থাকে তা হচ্ছে হালাল, আর ‘রিবা’-এর মাঝে যে অতিরিক্ত হয়ে থাকে তা হয় হারাম। তাই মুরাবাহার মাসআলাসমূহ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তারপর ‘রিবা’-এর আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, সকল বস্তুর ক্ষেত্রে হালাল হওয়া-ই হলো তার মূল অবস্থা, তাই হালালের মাসআলাগুলো আগে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ: أَيُّوَا مَحْرَمٌ يَنْ كَيْلِ الْخ: ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল দ্রব্য পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং যে সকল দ্রব্য ওজন মেপে পরিমাপ করা হয় এ দু ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উভয় দিকে একই শ্রেণীর দ্রব্য হয় যেমন [ধানের বিনিময়ে ধান কিংবা গমের বিনিময়ে গম] আর তা কমবেশি করে বিক্রয় করা হয়, তাহলে ‘রিবা’ [যার সংজ্ঞা ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে] হারাম হবে। সারকথা হলো, ‘রিবা’ হারাম হওয়ার জন্য দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে—

১. উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন হতে হবে, যা পাত্র দ্বারা মেপে পরিমাপ করা হয় অথবা ওজন মেপে পরিমাপ করা হয়।

২. উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْسٌ) এক হতে হবে।

قَوْلُهُ فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ الْخ: সুতরাং আমাদের নিকট তথা হানাফীগণের নিকট ‘রিবা’ হারাম হওয়ার ‘ইল্লাত’ হলো, উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত হওয়া এবং তাদের শ্রেণী এক হওয়া কিংবা উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং তাদের শ্রেণী (جِنْسٌ) এক হওয়া। অর্থাৎ ‘রিবা’ হারাম হওয়ার ‘ইল্লাত’ হলো দুটি গুণের সমষ্টি। সুতরাং যদি উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত না হয় কিংবা উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত না হয় যেমন তেলের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করল তাহলে ‘রিবা’ [এক পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া] হারাম হবে না। কেননা, তেল হলো পাত্র-পরিমাপিত আর স্বর্ণ হলো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। তদ্রূপ যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْسٌ) এক না হয়, তাহলেও ‘রিবা’ হারাম হবে না। যেমন— গমের বিনিময়ে যব বিক্রয় করল।

উল্লেখ্য, উক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) نَالِعِلَّةٌ বা বলে نَالِعِلَّةٌ বলেছেন [অর্থাৎ শুরুতে ۱ এনেছেন যার অর্থ ‘সুতরাং’] এর কারণ হলো, কোনো বিধান যদি اِسْمٌ مُنْتَقِ বা গুণবাচক শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় তাহলে তা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, উক্ত اِسْمٌ مُنْتَقِ -এর اِسْمٌ مُنْتَقِ বা তার মূল গুণটিই হলো এই বিধানের ‘ইল্লাত’ (عِلَّةٌ) বা কারণ। সুতরাং পূর্বের ইবারতে যখন ‘রিবা’ হারাম হওয়ার বিধানটি ‘একই শ্রেণীভুক্ত পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত’ দ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে তখন তা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বিধানটির ইল্লাত (عِلَّةٌ) বা কারণ হলো, পাত্র-পরিমাপিত হওয়া কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং তার সাথে শ্রেণী এক হওয়া। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই মুসান্নিফ (র.) نَالِعِلَّةٌ বলেছেন: —[ফাতহুল কাদীর]

الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ وَالْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ وَمَا أَمْلُ قَوْلُهُ وَيَقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَمَا أَمْلُ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, ‘রিবা’-এর ‘ইল্লাত’ مَعَ الْجِنْسِ وَالْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ “একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া।” এভাবে বললে বাক্যটি সংক্ষেপেও হয় এবং তা এক কথায় পূর্বের বাক্যের উভয় অংশকে শামল করে। কেননা, পূর্বের বাক্যে দুটি অংশ ছিল—

১. পাত্র-পরিমাপিত হওয়া এবং শ্রেণী এক হওয়া।

২. অথবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং শ্রেণী এক হওয়া। আর পরবর্তী বাক্যে একটি অংশ, কিন্তু তা উভয়টিকে শামল করেছে।

তবে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, যদিও পরবর্তী বাক্যটি (الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ) সংক্ষেপে ও পূর্বের বাক্যের উভয়টিকে শামল করে, কিন্তু তা এমন সুরত্বকেও শামল করে যা ‘রিবা’ হারাম হওয়ার আওতাভুক্ত নয়, আর তা হলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য এবং গজ-পরিমাপিত দ্রব্য। কেননা, الْقَدْرُ বা পরিমাপ মাধ্যম বা পরিমাপ পদ্ধতি এক হওয়া বলতে এ দুটিও শামল হয়ে যায়। অথচ গণনা-প্রচলিত দ্রব্য এবং গজ-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ‘রিবা’ হারাম নয়। —[ফাতহুল কাদীর]

॥

وَالْحُكْمُ مَعْلُومٌ بِاجْتِمَاعِ الْقَائِسِينَ، لِكِنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  
(رح) الطُّعْمُ فِي الْمَطْعَمَاتِ، وَالثَّمَنِيَّةُ فِي الْأَثْمَانِ، وَالْجِنْسِيَّةُ شَرْطٌ، وَالْمَسَاوَاةُ  
مُخْلَصٌ، وَالْأَصْلُ هُوَ الْحَرْمَةُ عِنْدَهُ، لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى شَرْطَيْنِ : التَّقَابُضُ وَالْمِثَالِيَّةُ،  
وَكُلُّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِالْعِزَّةِ وَالْخَطَرِ كَاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ فِي التَّكَاثُفِ، فَيَعْلَلُ بِعِلَّةٍ  
تُنَاسِبُ إِظْهَارَ الْخَطَرِ وَالْعِزَّةِ، وَهُوَ الطُّعْمُ لِبَقَاءِ الْإِنْسَانِ بِهِ، وَالثَّمَنِيَّةُ لِبَقَاءِ  
الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْمَصَالِحِ بِهَا، وَلَا أَثَرٌ لِلْجِنْسِيَّةِ فِي ذَلِكَ، فَجَعَلْنَاهُ شَرْطًا،  
وَالْحُكْمُ قَدْ يَدُورُ مَعَ الشَّرْطِ -

অনুবাদ : সকল কiyাসকারী [মুজতাহিদ]-গণের নিকট উক্ত হাদীসের বিধান [তথা 'রিবা' হারাম হওয়া] 'ইল্লাত'-নির্ভর। তবে আমাদের নিকট কারণ বা 'ইল্লাত' তা-ই, যা আমরা [একটু পূর্বে] উল্লেখ করেছি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'ইল্লাত' হলো, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে খাদ্যযোগ্যতা, আর মূলদ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্যযোগ্যতা। আর উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হওয়া 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য শর্ত স্বরূপ। আর হারাম হওয়া থেকে রক্ষাকারী হলো উভয় দ্রব্য সমান সমান হওয়া। তাঁর মতে ['রিবা'-এর মালের মধ্যে] মূল অবস্থা হলো হারাম হওয়া। কেননা, নবী করীম ﷺ দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন, উভয় পক্ষের নগদ হস্তগত করা, আর উভয় পক্ষে সমান সমান হওয়া। আর [দুটি শর্তের] প্রত্যেকটিই দ্রব্যগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন- বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী শর্ত হওয়া [স্ত্রীর সম্মুখ-অঙ্গের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করে]। সুতরাং 'রিবা'-এর বিধানের ক্ষেত্রে এমন 'ইল্লাত' নির্ধারণ করতে হবে, যা গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের উপযোগী হয়। সুতরাং তা হলো খাদ্যযোগ্যতা, কেননা খাদ্যের মাধ্যমেই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা হয়। আর [মূলদ্রব্যের ক্ষেত্রে সে 'ইল্লাত' হলো,] মূল্যযোগ্যতা। কেননা, মূল্যযোগ্যতার মাধ্যমেই মাল সম্পদরূপে টিকে থাকে, আর সেই সম্পদের উপরই মানুষের যাবতীয় বৈষয়িক কল্যাণ নির্ভর করে। পক্ষান্তরে গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো প্রভাব নেই। তাই আমরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে ['রিবা' হারাম হওয়ার জন্য] শর্তরূপে গ্রহণ করেছি। আর বিধান কোনো কোনো ক্ষেত্রে শর্তের সাথেই আবর্তনশীল হয় [অর্থাৎ শর্ত বিদ্যমান থাকলে বিধান সাব্যস্ত হয়, আর শর্ত বিদ্যমান না থাকলে বিধান সাব্যস্ত হয় না]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ فَوَلَّاهُ وَالْحُكْمُ مَعْلُومٌ بِاجْتِمَاعِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে সকল মুজতাহিদ 'কiyাস'-এর ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত করেন তাদের সকলের একমতভাৱে উক্ত হাদীসের বিধান তথা 'রিবা' হারাম হওয়ার বিধানটি مَعْلُوم বা 'ইল্লাতযুক্ত'। অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যগুলোতে যে কারণে 'রিবা' হারাম হয়েছে তা নির্ধারণ করে অন্যান্য দ্রব্যের মাঝেও সে কারণ পাওয়া গেলে 'রিবা' হারাম হওয়ার বিধান সাব্যস্ত করা যাবে। পক্ষান্তরে যারা 'কiyাস'-এর ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না তথা আহলে জাহের এবং ওসমান বাস্তী (র.)-এর মতে 'রিবা' হারাম হওয়ার বিধান কেবল হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে- অন্যান্য দ্রব্যে 'রিবা' হারাম হবে না।

প্রসিদ্ধ চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-সহ সকল মুজতাহিদ ইমামগণের মতে বিধানটি 'ইল্লাতমুক্ত'। তবে 'ইল্লাত' কি তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

আমরা হানীফীগণের মতে এক্ষেত্রে 'ইল্লাত' হলো তা-ই, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ উভয় দ্রব্য একই শ্রেণী (جنس) -এর হওয়া এবং উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্য ছাড়াও যেখানে এ 'ইল্লাত' বিদ্যমান থাকবে সেখানে 'রিবা' হারাম হবে। যেমন- লোহার বিনিময়ে লোহা বিক্রয় করল, তাহলে এক পক্ষে বেশি হলে তা 'রিবা' হয়ে হারাম হবে। কেননা, তা একই শ্রেণীর দ্রব্য এবং উভয় দিকের দ্রব্যই ওজন-পরিমাপিত। **قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحم) الْطَّمْعُ فِي الْمَطْعَمَاتِ الخ**: আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত দ্রব্যগুলোতে 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য ছয়টি দ্রব্যের মধ্য থেকে চারটি তথা খাদদ্রব্য গম, যব, জেবুজ, ও লবণের ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) হলো, খাদ্যযোগ্য হওয়া। আর অপর দুটি তথা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' হলো, মুদ্রা হওয়া। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এমন সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'রিবা' হারাম হবে, যার মাঝে খাদ্যযোগ্যতা কিংবা মুদ্রাযোগ্যতা বিদ্যমান আছে। আর একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়া 'ইল্লাত' নয়, তবে এটি 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য শর্ত।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'রিবা'-এর দ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো, হারাম হওয়া। সুতরাং হারাম হওয়া থেকে রক্ষাকারী শর্ত যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া না যাবে ততক্ষণ তা মূল অবস্থা তথা হারাম হওয়ার উপরই থাকবে। আর হারাম হওয়া থেকে রক্ষাকারী হলো উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাঁর মতে এক মুঠো গমের বিনিময়ে দুই মুঠো গম বিক্রয় করা 'রিবা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। কিন্তু আমাদের মতে তা হারাম নয়। কেননা, তা শরয়ী পরিমাপের আওতায় পড়ে না।

**قَوْلُهُ لَئِنْ نَصَّ عَلَى شَرْطَيْنِ التَّقَابُصِ وَالسَّائِلِ الخ**: খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়া 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) হওয়ার স্বপক্ষে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, 'রিবা' সংক্রান্ত পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি শর্তের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। একটি হলো, উভয় দ্রব্য চুক্তিকারীদ্বয়ের নগদ (মজলিসেই) হস্তগত করা, এটি **يَكْبِدُ** "হাতে হাতে" শব্দ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আর অপরটি হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য পরিমাণে সমান সমান হওয়া [এটি **مِثْلًا بِمِثْلٍ** "সমান সমান করে" শব্দ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।] আর উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এরূপ দুটি শর্ত আরোপ করা এ কথা প্রকাশ করে যে, দ্রব্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। কেননা গুরুত্বহীন দ্রব্য হলে এরূপ শর্ত আরোপ করা হতো না। যেমন- বিবাহের ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে শর্ত করা হয়েছে যে, বিবাহের আকদের সময় সাক্ষী থাকতে হবে অন্যথা বিবাহ হবে না। বিবাহের ক্ষেত্রে এ শর্ত স্ত্রীর সজ্জা-অঙ্গের গুরুত্ব প্রকাশ করে। সুতরাং 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে উক্ত শর্তদ্বয় যখন দ্রব্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া প্রকাশ করে তখন বিধানের ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' এমন বিষয়কে নির্ধারণ করা আবশ্যিক, যার কারণে দ্রব্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আর তা খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়ার মধ্যে বিদ্যমান আছে। কেননা, খাদ্যের মাধ্যমেই মানুষ জীবন ধারণ করে, খাদ্য না পেলে মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। অতএব তা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এরূপভাবে মুদ্রা হওয়ার মাধ্যমে বস্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়। কেননা, মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং তার চাহিদা মিটানোর জন্য যে সকল বস্তু প্রয়োজন তা সে মুদ্রার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। কাজেই তা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সুতরাং খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়া 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য 'ইল্লাত' হবে। পক্ষান্তরে কোনো বস্তু গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে **جَنَسٌ** বা একই শ্রেণীর হওয়ার কোনো ভূমিকা নেই। এরূপভাবে **نَدْر** বা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়ারও এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। কাজেই তা 'ইল্লাত' বা কারণ হতে পারে না। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য একই শ্রেণী হওয়াকে ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই আমরা একই শ্রেণীর হওয়াকে 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং 'ইল্লাত' বিদ্যমান হওয়ার পর যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে 'রিবা' হারাম হবে, অন্যথা হারাম হবে না। কেননা, বিধান কখনও শর্তের সাথেই আবর্তিত হয় অর্থাৎ 'ইল্লাত' পাওয়ার পরও শর্ত পাওয়া না গেলে বিধান সাব্যস্ত হয় না, আর পাওয়া গেলে সাব্যস্ত হয়। যেমন- **رَجْم** বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা বিধানটির 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) হলো ব্যাচিয়ার করা, আর তার শর্ত হলো, বিবাহিত হওয়া। সুতরাং ব্যাচিয়ার করা সত্ত্বেও বিবাহিত না হলে তার উপর **رَجْم**-এর বিধান কার্যকর হয় না।

وَلَنَا أَنَّهُ أَوْجَبَ الْمُمَاطَلَةَ شَرْطًا فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ يَسْرُوقُهُ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى  
الْبَيْعِ، إِذْ هُوَ يُنْبِئُ عَنِ التَّقَابِلِ، وَ ذَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ، أَوْ صِيَانَةِ لَأَمْوَالِ النَّاسِ عَنِ التَّوَلَّى،  
أَوْ تَنْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ بِاتِّصَالِ التَّسْلِيمِ بِهِ، ثُمَّ يُلْزَمُ عِنْدَ قُوَّتِهِ حُرْمَةُ الرِّبَا، وَالْمُمَاطَلَةُ بَيْنَ  
الشَّيْئَيْنِ بِإِعْتِبَارِ الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، وَالْمِغْيَارُ يُسَوَّى الذَّاتِ، وَالْجَنَسِيَّةُ تُسَوَّى الْمَعْنَى،  
فَيَظْهَرُ الْفَضْلُ عَلَى ذَلِكَ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُسْتَحَقُّ لِأَحَدٍ  
الْمُتَعَاذِرِينَ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِي عَنْ عِوَضٍ شَرْطٍ فِيهِ.

**অনুবাদ :** আর আমাদের দলিল হচ্ছে— উক্ত হাদীসে [উল্লিখিত দ্রব্যগুলো] ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমান হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। আর এটা ই হাদীসটির বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য। [সমান হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে।] যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়িত হয়। কেননা, ক্রয়-বিক্রয় (الْبَيْعُ) পরস্পরে বিনিময় করার অর্থ বহন করে। আর এ অর্থ উভয় দিকে সমান হওয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। অথবা যাতে মানুষের সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। অথবা যাতে উভয় পক্ষের দ্রব্যের সাথে [নগদ] হস্তান্তর যুক্ত হয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ফায়দা বা উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সম্ভব হয়। [অর্থাৎ হাদীসে উভয় পক্ষের সমতা রক্ষা করার জন্য উভয় দ্রব্য নগদ আদান-প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমতা পূর্ণভাবে অর্জিত হয়। কেননা, এক পক্ষের দ্রব্য যদি বাকি হয় আর অন্য পক্ষের দ্রব্য নগদ হয়, তাহলে পূর্ণ সমতা হলো না। আর এজন্য এ সমতার শর্ত করা হয়েছে, যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায়। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে তা কাজে লাগানো। আর এটা দ্রব্যটি হস্তগত করার উপর নির্ভর করে। কাজেই ক্রয়-বিক্রয়ের এ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে অর্জন করার জন্যই হাদীসে উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।] আর উক্ত [সমতার] শর্ত না পাওয়া গেলে [হাদীসের ভাষা অনুযায়ী] অনিবার্যভাবে ‘রিবা’ হারাম হবে। আর দুটি বস্তুর মাঝে সমতা সাব্যস্ত হয় দৃশ্যগত দিক থেকে এবং গুণগত দিক থেকে। আর পরিমাপ দুটি দ্রব্যের মাঝে সত্তাগত দিক থেকে সমতা দান করে এবং একই শ্রেণী বওয়া দুটি দ্রব্যের মাঝে গুণগত দিক থেকে সমতা দান করে। সমতা নির্ণয়ের এ দু ভিত্তিতেই এক পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া প্রকাশ পাবে এবং তখন ‘রিবা’ সাব্যস্ত হবে। কেননা, ‘রিবা’ [সুদ] বজা হয় এমন বিনিময়বিহীন অতিরিক্ত অংশকে, যা বিনিময়চুক্তিতে শর্তের ভিত্তিতে চুক্তিকারীদের একজন প্রাপ্ত হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الحُجَّةُ أَنَّ أَوْجَبَ الْمُمَاطَلَةَ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের নিকট ‘রিবা’ হারাম হওয়ার ‘ইদ্বাত’ যে “উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হওয়া এবং উভয় দ্রব্য পরিমাপের মাধ্যম এক হওয়া তথা পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া” এর স্বপক্ষে দলিল হলো, উপরিউক্ত হাদীসে উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান করে বিক্রয় করা শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ-এর উক্ত হাদীস বলার মূল উদ্দেশ্যও তাই। তিনটি কারণে সমান সমান করে বিক্রয় করাকে শর্ত করা হয়েছে—



১. بَيْع বা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়িত করার জন্য। কেননা, সমান সমান করে বিক্রয় করলেই ক্রয়-বিক্রয়ের সঠিক অর্থ বাস্তবায়িত হয়। কেননা, بَيْع-এর অর্থ হলো، مَبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ "পরস্পরে সম্পদের পরিবর্তে সম্পদ বিনিময় করা।" সুতরাং যদি একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও এক পক্ষে দ্রব্য বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত দ্রব্যটুকুর বিনিময়ে অপর পক্ষ থেকে সম্পদ বিনিময় করা হলো না। ফলে ক্রয়-বিক্রয় (الْبَيْع)-এর প্রকৃত অর্থ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলো না।

২. যানুঘের সম্পদ গচ্ছা যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। কেননা, যদি এক পক্ষে দ্রব্য বেশি হয় আর তার বিপরীতে অপর পক্ষ থেকে দ্রব্য না থাকে, তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু তার মালিকের গচ্ছা গেল বা নষ্ট হলো। কেননা, সে অংশটুকুর বিনিময়ে সে কিছুই পেল না।

৩. মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত তৃতীয় কারণটি ভাষ্যকারগণ দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

ক. ক্রয়-বিক্রয়ের ফায়দা বা উদ্দেশ্য হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের প্রত্যেকের অপর দ্রব্য মালিকানা অর্জিত হওয়া এবং তা হস্তগত করার পর তা কাজে লাগানোর অধিকার অর্জিত হওয়া। আর এই ফায়দা উভয় পক্ষে পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করার জন্যই শরিয়ত উভয় দ্রব্যে সমতা রক্ষা করার শর্ত আরোপ করেছে। কেননা, যদি এক পক্ষে কম হয়, তাহলে তা হস্তগতকারীর ক্ষেত্রে ফায়দা কম বা অপূর্ণ হবে।

খ. উক্ত হাদীসে যে উভয় দ্রব্য সমান সমান করার শর্ত করা হয়েছে তা পূর্ণ হয় উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করার মাধ্যমে। কেননা, বাকির তুলনায় নগদ হস্তগত করা অধিক লাভের বিষয়। তাই উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করা শর্ত করা হয়েছে, যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের যে ফায়দা-অর্থাতঃ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং তাতে যথেষ্টা হস্তক্ষেপ করার অধিকার অর্জিত হওয়া- তা পূর্ণরূপে অর্জিত হয়।

সুতরাং যেহেতু উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উভয় দিকে সমতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে সেহেতু এক দিকে যদি অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা 'রিবা' হবে। নবী করীম ﷺ ও তা قُرْ وَأَلْفَضْلُ رِبَا বাক্যে 'রিবা' বলে উল্লেখ করেছেন।

قُرْ وَأَلْفَضْلُ رِبَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِإِغْيَارِ الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى الْخ: এখানে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিলের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেছেন। উপরে এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, উভয় দ্রব্যে সমতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে। আর দুটি দ্রব্যের মাঝে সমতা হয় দুই দিক থেকে—

ক. সুরত বা বাহ্যিক দিক থেকে।

খ. مَعْنَى বা আভ্যন্তরীণ দিক থেকে। আর সুরত বা বাহ্যিক দিক থেকে সমতা নির্ধারণ হয় قُرْ বা পরিমাপের মাধ্যমে। আর مَعْنَى বা আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সমতা নির্ধারিত হয় جَنْبَيْهِ বা দুটি দ্রব্য একই শ্রেণীর হওয়ার মাধ্যমে। কেননা- আভ্যন্তরীণ বিষয়ের পার্থক্যের কারণেই শ্রেণী ভিন্ন ধরা হয়ে থাকে। [যেমন— একটি সত্যিকার কলা আরেকটি মাটির তৈরি কলা। দুটি একই রকম দেখালেও আভ্যন্তরীণ কারণে উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন।] অতএব যদি এক 'পাতা' গমের বিনিময়ে এক 'পাতা' গম বিক্রয় করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বাহ্যিক দিক থেকে এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সমতা বিদ্যমান হবে।

মোটকথা, উক্ত হাদীসে উভয় দিকে সমতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে। আর সমতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা হলো দুটি বিষয়ের, ১. قُرْ বা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া। ২. جَنْبَيْهِ বা একই শ্রেণীর হওয়া। তাই এ দুটিকেই 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইদ্রাত' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। একই শ্রেণীর দ্রব্য না হলে 'রিবা' সাব্যস্ত হয় না। কারণ হলো, 'রিবা' হলো এক পক্ষে অতিরিক্ত অংশের নাম। সুতরাং যদি দুই দিকে দুই শ্রেণীর দ্রব্য হয়, তাহলে এক দিকের কতটুকু দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দিকের কতটুকু দ্রব্য সমান ধরা হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা, আভ্যন্তরীণ দিক থেকে উভয় দ্রব্য তারতম্যপূর্ণ।

সুতরাং যখন শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ এক হওয়ার মাধ্যমে সমতা সাব্যস্ত হবে তখন অতিরিক্ত হওয়াও এরই মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে। ফলে তখন 'রিবা' সাব্যস্ত হবে। অর্থাতঃ শ্রেণী ও পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া সত্ত্বেও যদি এক পক্ষে অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা 'রিবা' হবে। কেননা, 'রিবা' বলা হয় এমন অতিরিক্ত অংশকে যা বিনিময়চুক্তির ক্ষেত্রে শর্তের জিহাতে এক পক্ষ লাভ করে, অথচ তার বিনিময় অপর পক্ষে কিছুই নেই।

وَلَا يُغْتَبَرُ النُّوصَفُ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ تَفَاوُتًا عَرَفًا، أَوْ لِأَنَّ فِي إَعْيَابِهِ سَدَّ بَابِ  
الْيَسَاعَاتِ، أَوْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَبَدَهَا وَرَدِيَّتَهَا سَوَاءً، وَالطُّعْمُ وَالشَّمْنَةُ مِنْ  
أَعْظَمِ وَجْهِ الْمَنَافِعِ، وَالسَّيْبِلُ فِي مِثْلِهَا إِطْلَاقُ بَابِنُجِ الْوُجُوهِ لِشِدَّةِ الْإِحْتِيَاجِ  
إِلَيْهَا دُونَ التَّضْيِيقِ فِيهِ، فَلَا مُغْتَبَرَ بِمَا ذَكَرَهُ.

অনুবাদ : গুণ তথা দ্রব্য ভালো-মন্দ হওয়া [সমতা হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে] ধর্তব্য নয়। কেননা, লোক-প্রচলনে এটাকে তারতম্য বলে গণ্য করা হয় না। অথবা এজন্য যে, এটাকে ধর্তব্য বলে গণ্য করা হলে ক্রয়-বিক্রয়ের পথই বন্ধ হয়ে যাবে। অথবা নবী করীম ﷺ-এর এ বাণীর কারণে—“جَبَدَهَا وَرَدِيَّتَهَا سَوَاءً” “তার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমান।” পক্ষান্তরে খাদ্যাযোগ্যতা এবং মূল্যযোগ্যতা হচ্ছে দ্রব্য থেকে উপকৃত হওয়ার অন্যতম প্রধান দিক। আর এগুলোর প্রতি মানুষের প্রয়োজন তীব্র হওয়ার কারণে এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উদারতা দেখানো; সংকীর্ণ করে দেওয়া নয়। [অথচ হাদীসে শর্ত আরোপের মাধ্যমে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।] কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.) যা উল্লেখ করেছেন তা বিবেচ্য নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُغْتَبَرُ النُّوصَفُ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, যখন হাদীসে সমতার রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে তখন দ্রব্যের গুণাগুণের বিষয়টি সমতার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় না কেন? অর্থাৎ সমতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উভয় দ্রব্য একই মানের তথা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট মানের হওয়া শর্ত হয় না কেন? বরং এক কেজি নিকৃষ্ট গমের বিনিময়ে এক কেজি উৎকৃষ্ট গমের মাঝে [‘রিবা’-এর ক্ষেত্রে] সমতা রয়েছে বলে ধরা হয়।

মুসান্নিফ (র.) এর জবাবে বলেন— দ্রব্যের গুণাগুণের তারতম্যের বিষয়টি ধর্তব্য হয় না এর কারণ তিনটি—

১. লোক-প্রচলনে গুণাগুণের তারতম্য ধর্তব্য হয় না, তাই শরিয়তেও এটি ধর্তব্য হবে না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন— رُبِّيَّةٌ مُنْظَرٌ অর্থাৎ মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত এ কারণটি যথার্থ হয়নি। কেননা, লোক-প্রচলনে গুণাগুণের তারতম্য সামান্য হলে তা ধর্তব্য হয় না, কিন্তু অধিক হলে তা ধর্তব্য হয়। তাই মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত দ্বিতীয় কারণটিই হলো যথার্থ কারণ।
২. গুণাগুণের তারতম্য যদি ধর্তব্য হয়, তাহলে এ সকল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসে তো উক্ত দ্রব্যগুলোর ক্ষেত্রে সমতাকে শর্ত করা হয়েছে। অতএব যদি উভয় দিকের দ্রব্যের মাঝে গুণাগুণের তারতম্যের কারণে তাতে সমতা ধরা না হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, সম্পূর্ণরূপে গুণাগুণের দিক থেকে উভয় দিকের দ্রব্য এক হওয়া প্রায় অসম্ভব। আর যদি এক হয়েও যায় তখন তা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা বা বিক্রেতার কোনো স্বার্থকতা অর্জিত হয় না। সুতরাং এ সকল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ শরিয়ত তা ক্রয়-বিক্রয়ের পথ খোলা রেখেছে। অতএব বুঝা গেল গুণাগুণের তারতম্য সমতার ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

৩. অথবা, নবী করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণীর কারণে গুণাগুণের তারতম্য ধর্তব্য নয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন- جَدَمًا وَ رَدِيهَا سَوَاءٌ "এ সকল দ্রব্যের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়টাই সমান।" তবে হাদীসটি সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, এর সনদ আমি খুঁজে পাইনি। তদ্রূপ আল্লামা আইনী (র.)-ও বলেছেন, হাদীসটি غَرِيبٌ। তবে হাদীসটির মর্মার্থ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু সাযীদ খুদরী (র.)-এর جَنِيْبٌ [উৎকৃষ্ট খেজুর] -এর বিনিময়ে جَمْعٌ [নিকৃষ্ট খেজুর] বিক্রয় সংক্রান্ত একটি হাদীস থেকে উদ্ধার হয়। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন, এছাড়া এর উপর ইজমাও রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالطَّعْمُ وَالشَّمِيَّةُ مِنْ أَعْظَمِ وَجْهِ الْمَنَافِعِ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) যে খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রা হওয়াকে 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' নির্ধারণ করেছেন তা সঠিক না হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়া 'রিবা'-এর 'ইল্লাত' হতে পারে না। কেননা, সম্পদ দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মিটানোর অন্যতম দিক হচ্ছে তা খাদ্য হওয়া বা মুদ্রা হওয়া। কাজেই এরূপ দ্রব্যের প্রতি মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। আর যে সকল বস্তুর প্রতি মানুষের প্রয়োজন তীব্র সে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে তা ব্যাপক করে দেওয়া; তা সংকীর্ণ করে দেওয়া নয়। এ কারণেই তো পানি ও বাতাসকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। অথচ হাদীসে উল্লিখিত দ্রব্যগুলোর ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করে তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই বুখা গেল এ সকল দ্রব্যে 'রিবা' হারাম হওয়ার কারণ- খাদ্য হওয়া এবং মুদ্রা হওয়া নয়। অন্যথায় এ 'ইল্লাত' আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতির বিপরীত দাবি করে (يُوجِبُ فَسَادَ الْوَضْعِ)। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) যে যুক্তি উল্লেখ করেছেন তা ধর্তব্য হবে না।

إِذَا كُنْتَ هَذَا فَتَقُولُ إِذَا بَيْعَ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ بِجَنْسِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ حَازَ الْبَيْعُ فِيهِ  
لَوْجُودٍ شَرْطِ الْجَوَازِ، وَهُوَ الْمُمَاطَلَةُ فِي الْيَعْيَارِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا يُرَوَى مَكَانَ قَوْلِهِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ، كَيْلًا يَكِيلُ وَفِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ، وَإِنْ تَفَاضَلَ لَمْ يَعْزُ  
لِتَحَقُّقِ الرِّبَا، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَبِيدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لِأَهْدَارِ  
التَّفَاوُتِ فِي الْوَصْفِ.

অনুবাদ : যখন উল্লিখিত বিষয়গুলো সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলব যে, যদি পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য একরূপ একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে সমান সমান করে বিক্রয় করে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, জায়েজ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান পাওয়া যাচ্ছে। সে শর্ত হচ্ছে পরিমাপের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া। তুমি কি ভেবে দেখছ না? [যে, এ কারণেই তো] কোনো কোনো বর্ণনায় مِثْلًا بِمِثْلٍ -এর পরিবর্তে وَزَنًا بِوَزْنٍ [এক 'পাত্র'-এর বিনিময়ে এক 'পাত্র'] রয়েছে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে وَزَنًا بِوَزْنٍ [সমপরিমাণ ওজনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ওজনের দ্রব্য]। আর যদি এক পক্ষের দ্রব্য অপর পক্ষের দ্রব্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, তখন 'রিবা' সাব্যস্ত হচ্ছে। যে সকল দ্রব্য 'রিবা' সাব্যস্ত হয় সে সকল দ্রব্য থেকে উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য নিকৃষ্ট মানের দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ হবে না, যদি তা সমান সমান করে বিক্রয় করা না হয়। কেননা, গুণাগুণের তারতম্য ধর্তব্য নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا كُنْتَ هَذَا فَتَقُولُ: মুসল্লিফ (র.) বলেন, যখন আমাদের পূর্বের দলিল দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো উভয় দ্রব্যের পরিমাণ মাধ্যম এবং শ্রেণী এক হওয়া, তখন -এর উপর ভিত্তি করে মাসআলা হলো, যদি কেউ পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে। যেমন- গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় করল অথবা যদি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে। যেমন- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করল সে ক্ষেত্রে যদি সমান সমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করে, তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, একরূপ একই শ্রেণীর দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য যা শর্ত তা বিদ্যমান আছে। আর সে শর্ত হলো, পরিমাপের ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। কেননা, নবী করীম مِثْلًا بِمِثْلٍ বলেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পরিমাপের দিক থেকে সমান সমান করে বিক্রয় করা। এ কারণেই উক্ত হাদীসটির কোনো কোনো রেওয়ায়েতে وَزَنًا بِوَزْنٍ -এর স্থলে 'নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ওজনের ভিত্তিতে' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, হাদীসে উল্লিখিত مِثْلًا بِمِثْلٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পরিমাপের ক্ষেত্রে সমান সমান করে বিক্রয় করা। অতএব আলোচ্য সূরতে যখন এ শর্ত বিদ্যমান রয়েছে তখন ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَاضَلَ لَمْ يَعْزُ لِتَحَقُّقِ الرِّبَا: আর যদি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে পরিমাপের দিক থেকে কমবেশি করে, তাহলে জায়েজ হবে না। অতিরিক্ত অংশ 'রিবা' [সুদ] হওয়ার কারণে তা হারাম হবে।

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَبِيدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা' -এর ক্ষেত্রে গুণাগুণের দিক থেকে উভয় দিকের দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য থাকলে তা ধর্তব্য হবে না। কাজেই একই শ্রেণীর দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি এক দিকের দ্রব্য উৎকৃষ্ট মানের হয় আর অপর দিকের দ্রব্য নিকৃষ্ট মানের হয় তবু কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না; বরং পরিমাপের দিক থেকে সমতা রক্ষা করা আবশ্যিক হবে।

অর্থ—এক মুঠো। আর কারো কারো মতে দু হাতে যতটুকু শষ্য ধারণ করা যায় ততটুকু পরিমাণকে **حَنَفَةً** বলা হয়। কেউ যদি দু মুঠো খাদ্যাশ্ব্যের বিনিময়ে এক মুঠো খাদ্যাশ্ব্য বিক্রয় করে কিংবা দুটি আপেলের বিনিময়ে একটি আপেল বিক্রয় করে, এরূপভাবে দুটি ডিমের বিনিময়ে একটি ডিম বিক্রয় করে, তাহলে আমাদের মতে তা জায়েজ হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। তাঁর মতে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মতে ‘রিবা’ বা সুদ হারাম হওয়ার ‘ইন্দ্ৰাভ’ বা কারণ হলো, **الْكُفْمُ** “খাদ্যাযোগ্যতা” বা **الْمُطَابَقَةُ** “মুলাযোগ্যতা”। আর উক্ত দ্রব্যসম্মে অর্থাৎ খাদ্যাশ্ব্য ও আপেলের মাঝে “খাদ্যাযোগ্যতা” বিদ্যমান। আর তাঁর মতে ‘রিবা’-এর দ্রব্যসম্মূহের ক্ষেত্রে আসল অবস্থা হলো হারাম হওয়া। আর ‘রিবা’ থেকে রক্ষাকারী হলো, উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সমতা সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হবে। আর আলোচ্য সূরতে যেহেতু সমতা সাব্যস্ত হচ্ছে না তাই তা হারাম হবে।

আর আমাদের মতে জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্যের মাঝে সমতা নির্ধারণ করা হয় পরিমাপের মাধ্যমে : আর পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' [প্রায় পৌনে দু' সের]-এর কম পরিমাণ দ্রব্যের জন্য শরিয়তে কোনো পরিমাপ মাধ্যম নেই : কাজেই অর্ধ সা'-এর কম দ্রব্য শরিয়তে পরিমাপের আওতাভুক্ত নয়। আর আপেল ডিম বা আখরোই ইত্যাদি দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য নয়, তাই তা-ও শরয়ী পরিমাপ তথা পাত্র বা ওজন-এর আওতাভুক্ত নয় : আর শরয়ী পরিমাপের আওতাভুক্ত না হলে অতিরিক্ত হওয়াও সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হয় পরিমাপের মাধ্যমে : আর যখন অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হবে না তখন 'রিবা' বা সুদও সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তা জায়েজ হবে। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) আলাচ্য মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, শরিয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে [যেমন- কাফফারাসমুহ, সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি] অর্ধ সা'-এর কম নির্ধারণ না করায় এটা আবশ্যক নয় যে, এর কম পরিমাণের ক্ষেত্রে কমবেশি হওয়া স্পষ্ট হওয়া সম্ভবে তা ধর্তব্য হবে না। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুয়াত্তা (الْمُعْتَلَى) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন- رَوَى الْمُعْتَلَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ الثَّمَرَةَ بِالتَّمَرَتَيْنِ وَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ حَرَّمَ فِي الْكَفِيرِ فَأَلْقِلْ مِنْهُ حَرَامٌ- "ইমাম মুহাম্মদ (র.) দুটি খেজুরের বিনিময়ে একটি খেজুর বিক্রয় অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন- যে সকল দ্রব্য বেশি হলে 'রিবা' [সুদ] হারাম হয় তা কম হলেও তাতে 'রিবা' বা সুদ হারাম হবে।"

মোটকথা, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) মতুন-এর রেওয়ায়েতের বিপরীতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং দলিলের দিক থেকে সঠিক মনে করেছেন।

[ফাতহুল কাদীর, ফতোয়ায়ে শামী-মাকতাবায়ে যাকারিয়া, খণ্ড-৭, পৃ. ৪০৯।]

الْمُعْتَلَى (র.) বলেন, যেহেতু এক বা দু' মুঠো শস্য শরয়ী পরিমাপের আওতাভুক্ত নয়, এ কারণেই কেউ যদি কারো এক মুঠো বা দু' মুঠো খাদ্যশস্য নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তার জরিমানা মূল্যের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়; এরূপ এক বা দু' মুঠো খাদ্যশস্য দ্বারা নয়। অথচ পাত্র-পরিমাপিত ও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য জরিমানা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বিধান হলো, তদ্রূপ সমপরিমাণ দ্রব্য দ্বারা তা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এক/ দু' মুঠো শস্য পরিমাপের আওতাভুক্ত নয়।

الْمُعْتَلَى (র.) বলেন, পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' [পৌনে দু' কেজির] চেয়ে যদি কম দ্রব্য হয়, তাহলে তা বিধানগত দিক থেকে এক মুঠোর মতোই। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে 'রিবা' [সুদ] হারাম হবে না। কেননা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্থ ছা' -এর কম পরিমাণকে শরিয়ত কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণ হিসেবে নির্ধারণ করেনি। সুতরাং অর্ধ সা'-ই হবে শরিয়তে সর্বনিম্ন পরিমাপ।

তবে যদি কোনো এক দিকে অর্ধ সা' বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে 'রিবা' বা সুদ হারাম হবে। সুতরাং এক মুঠো শস্যের বিনিময়ে যদি একই শ্রেণীর শস্য অর্ধ সা' বা তার চেয়ে বেশি বিক্রয় করে, তাহলে তা হারাম হবে।

الْمُعْتَلَى (র.) বলেন, وَلَوْ تَبَايَعَا مَكِيلًا أَوْ مَرُوزًا غَيْرَ مَطْعُومِ الْخ: খাদ্যবস্তু ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্য যদি ওজন-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত হয় এবং তা একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা আমাদের মতে জায়েজ হবে না। সে ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেমন- এক 'কফীয' চুনের বিনিময়ে দু' 'কফীয' চুন বিক্রয় করল বা এক মণ লোহার বিনিময়ে দুই মণ লোহা বিক্রয় করল, তবে তা আমাদের মতে জায়েজ হবে না। কারণ, 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' এখানে বিদ্যমান আছে। আর তা হলো উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়া এবং উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া অর্থাৎ পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া। সুতরাং 'ইল্লাত' যখন বিদ্যমান রয়েছে তখন কমবেশি করা 'রিবা' বা সুদ হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, তাঁর মতে 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো, খাদ্যযোগ্যতা কিংবা মুদাযোগ্যতা। আর এই 'ইল্লাত' উক্ত দ্রব্য [চুন, লোহা]-এর মাঝে বিদ্যমান নেই। কাজেই কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে না।

قَالَ : وَإِذَا عَدِمَ الْوُضْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُونُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلِ وَالنِّسَاءُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الْمَحْرَمَةِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ، وَإِذَا وَجَدَا حُرْمَ التَّفَاضُلِ وَالنِّسَاءُ لَوْجُودِ الْعِلَّةِ، وَإِذَا وَجَدَا أَحَدَهُمَا وَعَدِمَ الْآخَرَ حَلَّ التَّفَاضُلِ وَحُرْمَ النَّسَاءِ، مِثْلُ أَنْ يَسْطِمَ هَرَوِيًّا فِي هَرَوِيٍّ أَوْ حِنْطَةً فِي شَعِيرٍ فَحُرْمَةُ رِبَا الْفَضْلِ بِالْوُضْفَيْنِ وَحُرْمَةُ النَّسَاءِ بِأَحَدِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যদি উক্ত দুটি গুণ তথা উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং তার সাথে যুক্ত গুণ [অর্থাৎ পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া] এর উভয়টি অবিদ্যমান থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা এবং বাকি বিক্রয় করা উভয়টিই জায়েজ হবে। কেননা, 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' বিদ্যমান নেই। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েজ হওয়াই হলো মূল অবস্থা। আর যদি উক্ত উভয় গুণ [অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া] বিদ্যমান থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা এবং বাকি বিক্রয় করা উভয়টিই হারাম হবে। কেননা, 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' বিদ্যমান আছে। আর যদি উক্ত দুটি গুণ [অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া]-এর মধ্য থেকে যে কোনো একটি গুণ বিদ্যমান থাকে আর অপরটি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা হালাল হবে, কিন্তু বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে। যেমন- 'বায় সলম' [যা বাকি হয়ে থাকে]-এর ভিত্তিতে একটি হারাবী কাপড়ের বিনিময়ে একটি হারাবী কাপড় বিক্রয় করল কিংবা 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে গমের বিনিময়ে যব বিক্রয় করল। সারকথা, ['ইল্লাত'-এর] উভয় গুণ থাকার দ্বারা কোনো পক্ষে বেশি হওয়া হারাম হয়, আর যে কোনো একটি গুণ বিদ্যমান থাকার দ্বারা বাকি বিক্রয় করা হারাম হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا عَدِمَ الْوُضْفَانِ الْغ : পূর্বে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যে, আমাদের মতে 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো দুটি বিষয়-

১. উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়া।
২. উভয় দ্রব্যের পরিমাপ মাধ্যম (قَدْر) এক হওয়া অর্থাৎ উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত হওয়া কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হওয়া। [পূর্ণরূপে 'রিবা' ভুক্ত মাল সাব্যস্ত হয় যদি উল্লিখিত উভয় গুণ অর্থাৎ "উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া" বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যদি একটি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা এক দিক থেকে 'রিবা' ভুক্ত মাল বলে সাব্যস্ত হবে।]

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি দুটি 'ইল্লাত' (عِلَّت) -এর কোনোটিই বিদ্যমান না থাকে অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণীও এক না হয় এবং উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যমও এক না হয়, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে এবং বাকি বিক্রয় করাও জায়েজ হবে। যেমন- দিরহামের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা কিংবা কাপড়ের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা। এ ক্ষেত্রে কমবেশি ও বাকি উভয়টিই জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عِلَّت) বিদ্যমান নেই। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো জায়েজ হওয়া। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" "আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করে দিয়েছেন।" সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عِلَّت) বা কারণ উপস্থিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল বা বৈধ থাকবে।

عَلَّتْ) -এর উভয় গুণ থাকে অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হয় এবং তাদের পরিমাপ-মাধ্যমও এক হয়। (অর্থাৎ উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হয়) তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করাও হারাম হবে এবং বাকি বিক্রয় করাও হারাম হবে। কারণ, 'রিবা' বা [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عَلَّتْ) বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কোনো এক পক্ষে অতিরিক্ত হলে তা হারাম হবে। আর সমান সমান হলেও বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার কারণ হলো, বাকির তুলনায় নগদ দ্রব্যের মূল্যমান বেশি হয়ে থাকে ফলে উভয় দিকে সমতা বজায় রইল না। সুতরাং 'রিবা' বা [সুদ] এর আওতাভুক্ত হবে।

عَلَّتْ) -এর উভয় গুণের কোনো একটি বিদ্যমান থাকে আর অপরটি না থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, কিন্তু বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে। সুতরাং যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হয় কিন্তু পরিমাপ এক না হয় যেমন 'হারাবী' কাপড়ের বিনিময়ে 'হারাবী' কাপড় বিক্রয়। এক্ষেত্রে উভয়ের শ্রেণী এক কিন্তু পরিমাপ-মাধ্যম (قَدْر) এক নয়। কেননা, পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পরিমাপ-মাধ্যম বা قَدْر এক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পাত্র-পরিমাপিত হওয়া কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া। সুতরাং উভয় দ্রব্য গজ পরিমাপিত বা গণনা-নির্ভর হলে তা 'রিবা'র 'ইল্লাত' (عَلَّتْ) -এর আওতাভুক্ত হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কিন্তু বাকি বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। অতএব 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে কেউ যদি 'হারাবী' কাপড়ের বিনিময়ে 'হারাবী' কাপড় বিক্রয় করে, তবে তা জায়েজ হবে না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে যব ক্রয়ের জন্য গম দানদরূপে (অগ্রিম) প্রদান করে তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা, এটা বাকি বিক্রয়। এ ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ মাধ্যম এক। কেননা, যব এবং গম পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য। কিন্তু উভয়ের শ্রেণী এক নয়, যব এক শ্রেণীর দ্রব্য আর গম আরেক শ্রেণীর দ্রব্য। সুতরাং 'রিবা' বা [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عَلَّتْ) -এর এক গুণ বিদ্যমান। অতএব কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, কিন্তু বাকি বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

عَلَّتْ) -এর উভয় গুণ তথা শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম (قَدْر) এক হওয়া বিদ্যমান থাকলে। আর বাকি বিক্রয় হারাম হয় যদি 'ইল্লাত' (عَلَّتْ) -এর উভয় গুণের একটি বিদ্যমান থাকে আর অপরটি বিদ্যমান না থাকে।



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَلْجِنْسُ بِاِنْفِرَادِهِ لَا يَحْرِمُ التَّسَاءُلَ، لِأَنَّ بِالتَّقْدِيَةِ وَعَمِيهَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا شُبْهَةُ الْفَضْلِ وَحَقِيقَةُ الْفَضْلِ غَيْرُ مَا نَعِ فِيهِ، حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالْأُنْثَيْنِ فَالْشُّبْهَةُ أَوْلَى، وَلَكِنَّا أَنَّهُ مَالُ الرِّبَا وَمِنْ وَجْهِ نَظَرًا إِلَى الْقَدْرِ أَوْ الْجِنْسِ، وَالتَّقْدِيَةُ أَوْجَبَتْ فَضْلًا فِي الْمَالِيَّةِ، فَتَحَقَّقَ شُبْهَةُ الرِّبَا، وَهِيَ مَانِعَةٌ كَالْحَقِيقَةِ.

অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার দ্বারা বাকি বিক্রয় করা হারাম হয় না কেননা, একদিকে দ্রব্যটি নগদ হওয়া এবং অপরদিকে দ্রব্যটি বাকি হওয়া—এটা কেবল [পরোক্ষগত] অতিরিক্ততার সন্দেহ সাব্যস্ত করে [প্রকৃত অতিরিক্ততা সাব্যস্ত করে না]। আর [শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার সূরতে] এক পক্ষে প্রকৃত অতিরিক্ত হলে তা-ও [বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য] প্রতিবন্ধক হয় না। সূতরাং অতিরিক্ততার সন্দেহ তে আরো যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রতিবন্ধক হবে না। আর আমাদের দলিল হলো, [উক্ত সূরতে উভয় পক্ষের] দ্রব্য একদিক থেকে 'রিবা'ভুক্ত মাল, এ বিবেচনায় যে, উভয়ের শ্রেণী এক কিংবা উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম এক। আর নগদ লাভ করা মূল্যের দিক থেকে অতিরিক্ততা সাব্যস্ত করে। সূতরাং তাতে 'রিবা'-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হলো। আর প্রকৃত 'রিবা' [অতিরিক্ততা] ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। তদ্রূপ 'রিবা'-এর [অতিরিক্ততার] সন্দেহও ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَلْجِنْسُ بِاِنْفِرَادِهِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উভয় দ্রব্যের মাঝে যদি খাদ্যযোগ্যতা বা মুদ্রাযোগ্যতা [যা তাঁর মতে 'রিবা' বা সুদ হারাম হওয়ার 'ইল্লাত'] বিদ্যমান না থাকে, তাহলে শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম হবে না [এবং কমবেশি করে বিক্রয় করাও হারাম হবে না]।

উল্লেখ্য, আদ্যুমা আইনী (র.) এবং হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ আল-ইনায়াহ-এর গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিमत উল্লেখ করতে গিয়ে শুধু جِنْس 'শ্রেণী এক হওয়া'-এর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অথচ نَدْر বা পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার বিষয়েও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিमत একই রূপ। অর্থাৎ শুধু উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম হবে না। যেমনিভাবে শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম হয় না। অথচ মুসান্নিফ (র.) শুধু শ্রেণী এক হওয়ার ক্ষেত্রে কথ্য উল্লেখ করেছেন।

তবে এর জবাব এই হতে পারে যে, মুসান্নিফ (র.) পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার সূরতের কথা উল্লেখ করেননি তার কারণ হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার সূরতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বাকি বিক্রয় করা হারাম হয়। কেননা, তাঁর মতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য তদ্রূপ যবের বিনিময়ে গম বাকি বিক্রয় করা জায়েজ নয়। যদিও এ ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) বা কারণ ভিন্ন। তা হলো 'বায় সরফ' [মুদ্রাদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়] এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যিক। পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া এর কারণ নয়।

قَوْلُهُ لَأَنَّ بِالتَّقْدِيَةِ وَعَمِيهَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا شُبْهَةُ الْفَضْلِ : শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম না হওয়ার স্বপক্ষে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এক পক্ষের দ্রব্য নগদ হওয়া এবং আরেক পক্ষের দ্রব্য

বাকি হওয়ার দ্বারা কেবল এক দিকে অতিরিক্ত হওয়ার সন্দেহ সাব্যস্ত হয় যেহেতু নগদ দ্রব্যটি মূল্যমানের দিক থেকে বাকি দ্রব্যের চেয়ে অধিক বেশিষ্টপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত বা দৃশ্যত অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হয় না। অতএব শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার সুরতে সকলের একমত্যে তখন নগদ কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ, যেমন একটি কাপড়ের বিনিময়ে দুটি কাপড় কিংবা একটি গোলামের বিনিময়ে দুটি গোলাম নগদ বিক্রয় করা সকলের একমত্যে জায়েজ। অথচ এ ক্ষেত্রে এক পক্ষ প্রকৃত বা দৃশ্যত অতিরিক্ত রয়েছে। সুতরাং বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধু মূল্যমানের দিক থেকে অতিরিক্ততার সন্দেহের কারণে হারাম না হওয়ার বিষয়টি তো আরো মুক্তিসঙ্গত হবে। কেননা, সেখানে প্রকৃত অতিরিক্ততা হচ্ছে না; বরং অতিরিক্ততার সন্দেহ থাকছে। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) শুধু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে আকলী দলিল উল্লেখ করেছেন, নকলী দলিল উল্লেখ করেননি। তাঁর স্বপক্ষে নকলী দলিলও রয়েছে—

১. আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম, বায়হাকী ও দারাকুতনীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ جَيْشًا فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ .

‘হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছিলেন তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন [বাকিতে] দুটি উটের বিনিময়ে একটি উট নগদ ক্রয় করি।’ এ হাদীস দ্বারা একই শ্রেণীর পণ্ড বাকি বিক্রয় করার বৈধতা সুস্পষ্ট।

২. হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে— (رض) أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا بِأَرْبَعَةِ إِلَى أَجَلٍ . “তিনি চারটি বাকি উটের বিনিময়ে একটি নগদ উট বিক্রয় করেছেন।” হাদীসটি মুসনাদে শাফেয়ী ও বায়হাকীতে সহীহ সনদে [মাওক্ফ রূপে] বর্ণিত হয়েছে।

৩. এরূপভাবে হযরত আলী (রা.) থেকে বায়হাকী শরীফে مُؤْتَرُونَ সনদে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا يَقَالُ لَهُ عَصْفِيئًا بِبَعِيرَيْنِ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ

মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত মাসআলায় আমাদের দলিল হলো, যখন উভয় দ্রব্যের শুধু শ্রেণী (جنس) এক হয়: পরিমাপ মাধ্যম এক না হয় কিংবা শুধু পরিমাপ মাধ্যম এক হয় কিন্তু শ্রেণী (جنس) এক না হয় তখন তা এক দিক থেকে ‘রিবা’-এর মাল বলে গণ্য হবে। যেহেতু ‘রিবা’-এর মাল হওয়ার জন্য যে দুটি গুণ তথা শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া আবশ্যক তার একটি বিদ্যমান রয়েছে। আর এক পক্ষের দ্রব্য বাকি হলে আরেক পক্ষের দ্রব্য নগদ হলে নগদ দ্রব্যে মূল্যমানের দিক থেকে অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই নগদ দ্রব্য বাকির তুলনায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে এক দিকে ‘রিবা’ বা অতিরিক্ততার সন্দেহ বিদ্যমান হলো। আর ‘রিবা’ [সুদ] -এর ক্ষেত্রে যেমনিভাবে প্রকৃত অতিরিক্ততা ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে তেমনি অতিরিক্ততার সন্দেহও ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে। এ কারণেই ‘রিবা’র [সুদের] আওতাভুক্ত মালের ক্ষেত্রে সকলের একমত্যে অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নয়, যদিও উভয় দিকে সমান সমান হওয়ার ধারণা করে বিক্রয় করে থাকে। কেননা, অতিরিক্ততার সন্দেহ বিদ্যমান। আর আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ‘ইল্লাত’-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান রয়েছে তাই তা حَبْطُ الْعَكْمِ الْمَحْمُومِ গণ্য হবে। সুতরাং حَبْطُ الْعَكْمِ বা ‘ইল্লাত’-এর সন্দেহ الْحَكْمُ অর্থাৎ বিধানের সন্দেহ তথা অতিরিক্ততার সন্দেহকে সাব্যস্ত করবে। ফলে তা হারাম হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত দলিলটি সম্ভবত যথার্থ নয়। কেননা, দলিলটির সারকথা হচ্ছে حَبْطُ الْعَكْمِ বিধানের ক্ষেত্রে حَبْطُ الْعَكْمِ -এর মতোই। অর্থাৎ প্রকৃতভাবে অতিরিক্ত হলে যেকুর হারাম হবে তদ্রূপ অতিরিক্ততার সন্দেহ হলে তা-ও হারাম হবে। এ কথার দাবি অনুযায়ী আলোচ্য মাসআলায় ‘ইল্লাত’-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান হলে বাকি বিক্রয় যেকুর হারাম হয়, তদ্রূপ কমবেশি করে বিক্রয় করাও হারাম হওয়ার কথা। অথচ এ সুরতে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

আর যদি এ কথা বলা হয় যে, যেহেতু 'ইল্লাত'-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান থাকার কারণে এটি **الْحَبْلَةُ** হয়েছে, তাই এটি কেবল **الرِّبَا** **شُبْهَةٌ** তথা বাকি বিক্রয়কেই হারাম করবে, **الرِّبَا** **حَقِيقَةٌ** তথা প্রকৃত অতিরিক্ততাকে হারাম করবে না। তথা কারণ, এখানে **الْمِثْلَةُ** **حَقِيقَةٌ** অর্থাৎ প্রকৃত 'ইল্লাত' বিদ্যমান নেই। তাহলে বিষয় আরো অরোহণগম্য হবে। কেননা, বিষয়টি বরং বিপরীত হওয়ার কথা। অর্থাৎ এরূপ হওয়ার কথা ছিল যে, **الْمِثْلَةُ** **شُبْهَةٌ** প্রকৃত অতিরিক্ততা বা **حَقِيقَةٌ** **الرِّبَا** কে হারাম করবে, কিন্তু **الرِّبَا** **شُبْهَةٌ** তথা বাকি বিক্রয়কে হারাম করবে না। কেননা, প্রকৃত অতিরিক্ততা হারাম করার জন্য যা 'ইল্লাত' (**عِلَّتٌ**) হবে অতিরিক্ততার সন্দেহ তথা **الرِّبَا** **شُبْهَةٌ** কে হারাম করার জন্য তার চেয়ে অসম্পূর্ণ বিষয় 'ইল্লাত' হতে পারে না।

দলিলটির যে দুর্বলতার কথা উপরে উল্লেখ করা হলো তার প্রতি আত্মা ইবনে হুমাম (র.)ও ইঙ্গিত করেছেন। এজন্যই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রে আসল দলিল হলো—

১. পূর্ববর্ণিত হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীস যার শেষাংশে নবী করীম **ﷺ** বলেছেন—**بَارِدًا اخْتَلَفْتُ هَذِهِ**—**الْأَصْنَافَ فَيَسْمِعُونَ كَيْفَ شِئْنُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا بَدَأَ بِسَيْدٍ** "যদি এ সকল দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হয় তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় কর, তবে হাতে হাতে [নগদ] হতে হবে।" [হাদীসটি বুখারী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।] এ হাদীসে উভয় দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তা বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার দলিল।

২. আবু দাউদ শরীফে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম **ﷺ** বলেছেন—**وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبَرِّ بِالسَّعِيرِ أَكْثَرُهَا بَدَأَ بِسَيْدٍ وَأَمَّا النَّسِئَةُ فَلَا** "যবের বিনিময়ে গম বিক্রয়ে যদি যব বেশি হয় তবে হাতে হাতে হলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বাকি বিক্রয় করা যাবে না।"

৩. আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে—

**عَنْ سَمُرَةَ (رَضِيَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِيرَانِ بِالْحَبِيرَانِ نَسِئَةً.**

"নবী করীম **ﷺ** প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"

উল্লিখিত হাদীসসমূহে 'রিবা' বা সুদ-এর 'ইল্লাত'-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নবী করীম **ﷺ** বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দুটি গুণের একটি তথা শ্রেণী এক হওয়া বা পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ।

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর স্বপক্ষে পূর্বে যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের পক্ষ হতে তার জবাব হলো—

১. এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের উল্লিখিত তিনটি হাদীস এবং তাঁর উল্লেখকৃত হাদীসের মাঝে **تَعَارُضٌ** [পরস্পর বিরোধ] পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই এর মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে এভাবে যে, তাঁর স্বপক্ষে উল্লিখিত হাদীসগুলো 'রিবা' বা সুদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা সম্পর্কিত।

২. অথবা, যদি **تَرَجُّعٌ** বা অগ্রাধিকার দেওয়ার পথ অবলম্বন করা হয়, তাহলে আমাদের স্বপক্ষের হাদীসগুলো অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, তা **مُعَرَّرٌ** বা হারাম হওয়া প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে তাঁর স্বপক্ষের হাদীসগুলো **مُبِينٌ** বা বৈধ হওয়া প্রমাণ করে। আর এরূপ হলে যা হারাম হওয়া প্রমাণ করে তা অগ্রাধিকার পায়।

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ التَّقْوَدَ فِي الرَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ يَجُوزُ، وَإِنْ جَمَعَهُمَا الْوَزْنُ، لَأَنَّهُمَا لَا يَتَفَقَّانِ فِي صِفَةِ الْوَزْنِ، فَإِنَّ الرَّعْفَرَانَ يُوزَنُّ بِالْأَمْنَاءِ، وَهُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ تَعْيِينِ بِالتَّعْيِينِ، وَالتَّقْوَدُ يُوزَنُّ بِالسَّنَجَاتِ، وَهُوَ تَمَنُّ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَلِزِيَادَةِ بِالتَّقْوَدِ مُوَازَنَةً وَقَبْضَهَا صَحَّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْوَزْنِ، وَفِي الرَّعْفَرَانِ وَأَشْبَاهِهِ لَا يَجُوزُ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِيهِ صُورَةٌ وَمَعْنَى وَحْكُمًا لَمْ يَجْمَعَهُمَا الْقَدَرُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، فَتَنْزِيلُ الشَّبْهَةِ فِيهِ إِلَى شَبْهَةِ الشَّبْهَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ.

অনুবাদ : তবে কেউ যদি জাফরান বা এ জাতীয় দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [যা বাকি হয়ে থাকে] ক্রয়ের জন্য মুদ্রাদ্রব্য নগদ প্রদান করে, তাহলে [বাকি হওয়া সত্ত্বেও] তা জায়েজ হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত। কারণ, এ দুই দ্রব্য [জাফরান ও মুদ্রাদ্রব্য] পরিমাণের ধরনের দিক থেকে এক নয়। কেননা, জাফরান ওজন করা হয় গ্রাম বা তোলা হিসেবে এবং জাফরান হলো মূল্যায়িত দ্রব্য বা বিক্রয়দ্রব্য যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মূলদ্রব্য [দিরহাম-দীনার] পরিমাপ করা হয় তুলাদও দ্বারা এবং তা হলো স্বয়ং মূল্য, যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। [তাছাড়া বিধানের দিক থেকে পার্থক্য হলো,] যদি কেউ ওজনের ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময়ে জাফরান বিক্রয় করে এবং উভয়ে অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে নেয়, তাহলে মুদ্রা হস্তগতকারী তা পরিমাপ করে দেখার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করতে পরবে [অর্থাৎ তা খরচ করতে বা কাজে লাগাতে পারবে]। পক্ষান্তরে জাফরান বা তদ্রূপ দ্রব্য হস্তগতকারী [ক্রতা] তা পরিমাপ করে দেখার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করতে পারবে না [অর্থাৎ তা খরচ করতে বা কাজে লাগাতে পারবে না]। সুতরাং যখন উক্ত দ্রব্যদ্বয় [জাফরান ও মুদ্রাদ্রব্য]-এর পরিমাপের ক্ষেত্রে দৃশ্যগত দিক থেকে, বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এবং বিধানগত দিক থেকে উভয় দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান, তখন পূর্বরূপে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম (الْقَدْرُ) এক হলো না। ফলে 'ইল্লাত'-এর একটি দিক বিদ্যমান থাকার কারণে, তাতে যে 'রিবা'-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হয়েছিল তা [আরো এক স্তর নেমে] সন্দেহের সন্দেহ বলে সাব্যস্ত হবে। আর [হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে 'রিবা'-এর সন্দেহ ধর্তব্য হয়, কিন্তু] সন্দেহের সন্দেহ ধর্তব্য হয় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا أَسْلَمَ التَّقْوَدَ فِي الرَّعْفَرَانِ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বে বলা হয়েছে যে, যদি 'ইল্লাত'-এর দুটি গুণের একটি গুণ বিদ্যমান থাকে আর অপরটি বিদ্যমান না থাকে অর্থাৎ যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جنس) এক হয় কিংবা উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম (قَدْرُ) এক হয়, তাহলে বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে। সুতরাং এ নীতি অনুসারে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জাফরান বা যে কোনো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য যেমন-লোহা, পিতল, তুলা ইত্যাদি 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা [যা বাকি হয়ে থাকে] হারাম হওয়ার কথা, কেননা স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য আর জাফরান, লোহা, পিতল বা তুলা ইত্যাদিও হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক, অতএব তা 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [বাকিতে] বিক্রয় করা হারাম হবে। অথচ তা সকলের একমতে জায়েজ।

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাবে যা উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হলো, স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা এবং উক্ত দ্রব্যগুলো যদিও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য, কিন্তু তাদের পরিমাপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, জাফরান পরিমাপ করা হয় 'মন' হিসেবে [এখানে মন বলতে সেকালের মন যা একটি ক্ষুদ্র পরিমাপ, বর্তমানে বলা যেতে পারে তোলা বা গ্রাম

হিসেবে; পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা মাপা হয় 'মিছকাল' [একটি পরিমাপের নাম] বা পরিমাপের জন্য নির্ধারিত দিরহাম দ্বারা। সুতরাং পরিমাপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা এবং জাফরান ও অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর এটা হলো এতসেদ মাঝে বাহ্যিক পার্থক্য। এছাড়াও আরো দুটি পার্থক্য রয়েছে। একটি হলো, আভান্তরীণ বা গুণগত দিক থেকে আর দ্বিতীয়টি হলো, বিধানগত দিক থেকে।

আভান্তরীণ বা গুণগত দিক থেকে পার্থক্য হলো, জাফরান বা অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হচ্ছে বিক্রয়দ্রব্য এবং তা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা হচ্ছে মুদ্রাদ্রব্য এবং তা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট বলে গণ্য হয় না। কারণ উভয়ের মাঝে আভান্তরীণ বা গুণগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।

আর পরিমাপের ক্ষেত্রে বিধানগত দিক থেকে পার্থক্য হলো, কেউ যদি স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা ওজনের ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে তা দ্বারা জাফরান বা অন্য কোনো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য ক্রয় করে, যেমন ক্রেতা বলল, আমি দুই কেজি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বিশ তোলা জাফরান ক্রয় করলাম, তাহলে এক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি ক্রেতা জাফরান বিক্রেতার অনুপস্থিতিতে দুই কেজি রৌপ্যমুদ্রা মেপে রাখে অতঃপর তা বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে, তবে বিক্রেতা তা পুনরায় না মেপেই খরচ করতে পারবে বা যে কোনো কাজে লাগাতে পারবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি জাফরান ক্রেতার অনুপস্থিতিতে মেপে রাখে অতঃপর তা ক্রেতার হাতে হস্তান্তর করে, তাহলে ক্রেতা তা পুনরায় না মাপার পূর্বে খরচ করতে পারবে না বা তা কোনো কাজে লাগাতে পারবে না। কাজেই স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা এবং অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যের মাঝে বিধানগত দিক থেকেও পার্থক্য হলো।

قَوْلُهُ فَإِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ صَوْرَةٌ وَمَعْنَى وَحُكْمُ الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু "স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা" এবং "অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য" এ উভয়ের মাঝে পরিমাপের ক্ষেত্রে তিন দিক থেকে তথা বাহ্যিক, আভান্তরীণ বা গুণগত এবং বিধানগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে সেহেতু একথা বলা যেতে পারে যে, উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম (قَدْر) পূর্ণরূপে এক হয়নি, যদিও উভয় ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। ফলে উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার ক্ষেত্রে "সন্দেহ" (شُبْهَةٌ) সৃষ্টি হয়েছে: যখন এতটুকু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে তখন আমরা বলব, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম বা শ্রেণী এক হওয়ার সুরতে বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার কারণ হলো, বাকি বিক্রয় করলে তাতে প্রকৃত 'রিবা' [অতিরিক্ততা] সাব্যস্ত হয় না; বরং 'রিবা' বা অতিরিক্ততার "সন্দেহ" (شُبْهَةٌ) সাব্যস্ত হয়। আর সেই "সন্দেহ" (شُبْহَةٌ)-এর কারণে তা বাকি বিক্রয় হারাম। কিন্তু আলাদা সুভতে যেহেতু উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার ক্ষেত্রেও "সন্দেহ" (شُبْهَةٌ) সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু 'রিবা' বা অতিরিক্ততার সন্দেহ আরেক স্তর নিম্নে নেমে "সন্দেহের সন্দেহ" বলে গণ্য হবে। আর 'রিবা' বা সুদ-এর ক্ষেত্রে "সন্দেহ" (شُبْهَةٌ) ধর্তব্য হয়, কিন্তু "সন্দেহের সন্দেহ" ধর্তব্য হয় না। সুতরাং স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা জাফরান বা অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [যা বাকি হয়ে থাকে] ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আদ্বামা ইবনে হুতাম (র.) লিখেছেন যে, উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জাফরান বা অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [বাকিতে] বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার যে দলিল বা কারণ উল্লেখ করেছেন তা দুর্বল। কারণ, উল্লিখিত পার্থক্য তিনটির মধ্য থেকে দ্বিতীয়টি তথা "নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট গণ্য হওয়া না হওয়া"-এর বিষয়টির সাথে পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আর প্রথম পার্থক্যটি তথা উভয় দ্রব্যের পরিমাপ পদ্ধতির যে পার্থক্যের কথা উল্লিখ করা হয়েছে তাও যথার্থ নয়, কেননা যে বাটখারা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা মাপা হয় তা দ্বারা জাফরান, মেশক বা এ জাতীয় দ্রব্যও মাপা হয়। আর তৃতীয় পার্থক্যটি তথা বিধানগত পার্থক্যটির কারণে এ কথা বলা যথার্থ হবে না যে, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা আর জাফরান বা এ জাতীয় দ্রব্যের মূল পরিমাপ-মাধ্যম-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং এক্ষেত্রে সঠিক দলিল হিসেবে এটাই বলা হবে যে, উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جنس) এক হলে বাকি বিক্রয় হারাম হবে পূর্বে উল্লেখকৃত হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীসের কারণে। হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীসের শেখাংশে নবী করীম ﷺ বলেছেন- بِإِذْنِ اللَّهِ الْاِسْتِئْذَانُ فَيَبْعُوهُ كَيْفَ يَشْتُمُونَ بَعْدَ اَنْ يَكُونُوا بِهَا بِعْدٍ - যদি এ সকল দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হয় তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় কর, তবে হাতে হাতে [নগদ] হতে হবে।

আর পরিমাপ মাধ্যম এক হলে বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও তার সাথে مُلْحَقٌ বা যুক্ত হবে। আর পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময় অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার বিষয়টি 'ইজমা' (إِجْمَاعٌ)-এর কারণে مُلْحَقٌ বা যুক্তিমূলক বলে গণ্য হবে। আর এই বাস্তবিক হওয়ার কারণ এই যে, এটা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বায় সলম'-এর পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, সাধারণত 'বায় সলম' -এর ভিত্তিতে দ্রব্যের ক্রয় স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়েই হয়ে থাকে।

قَالَ : وَكُلُّ شَيْءٍ نَصْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ كَيْلًا فَهُوَ  
مَكْبُولٌ أَبَدًا وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْكَيْلَ فِيهِ، مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْمِلْحِ، وَكُلُّ شَيْءٍ  
نَصْرَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ وَزَنًا فَهُوَ مُوزُونٌ أَبَدًا، وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيهِ، مِثْلُ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِأَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنَ الْعُرْفِ، وَالْأَقْوَى لَا يَتَرَكَ بِالْأَدْنَى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে কমবেশি করে বিক্রয় হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে; যদিও জনগণ তাতে পাত্র-পরিমাপ পরিত্যাগ করে। যেমন- গম, যব, খেজুর এবং লবণ। আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে তিনি ওজনের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বকালের জন্যই ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যদিও জনগণ তাতে ওজনের ভিত্তিতে পরিমাপ করা পরিত্যাগ করে। যেমন- স্বর্ণ ও রৌপ্য। কেননা, শরিয়তের স্পষ্ট বাণী লোক-প্রচলনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, আর অধিকতর শক্তিশালী বিষয়কে তার চেয়ে দুর্বল বিষয়ের কারণে পরিত্যাগ করা যায় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ نَصْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : এখানে বলা হয়েছে যে, মাসআলা হলো, যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন সে সকল দ্রব্য সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যেমন- গম, যব, খেজুর এবং লবণ। এ চারটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে। কেননা, এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লিখিত হাদীসে এ চারটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে كَيْلًا بِكَيْلٍ এক 'কাইল' [পাত্র]-এর বিনিময়ে এক 'কাইল' উল্লেখ করেছেন। এগুলোর ক্ষেত্রে যদি পরবর্তী যুগে সমাজে পাত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করার প্রচলন না ও থাকে তবু এগুলো পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলেই গণ্য হবে। সুতরাং এগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [যদি একই শ্রেণীর দ্রব্য হয়, তবে] পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে উভয় দিক সমান সমান করা আবশ্যিক হবে। ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করা যথেষ্ট হবে না।

আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ ওজনের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বকালের জন্যই ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যেমন- স্বর্ণ ও রৌপ্য এ দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসে وَزَنًا بِوَزْنٍ "নির্দিষ্ট ওজন পরিমাপের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ" উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জনসমাজে যদি এগুলো ওজনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন না ও থাকে তবু এগুলো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। অভাব [একই শ্রেণীর হলে] পাত্র দ্বারা মেপে উভয় দিক সমান সমান করা যথেষ্ট হবে না; বরং ওজনের দিক থেকে সমান সমান করা আবশ্যিক হবে।

মাসআলাটি উপরে যেভাবে উল্লেখ করা হলো অর্থাৎ "যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন" সে সকল দ্রব্য সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে এটাই এ মাসআলার সঠিক ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়, যে সে সকল দ্রব্য নবী করীম ﷺ -এর যুগে পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য ছিল তা সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত থাকবে; বরং যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ কমবেশি করে বিক্রয় করা

নিষেধ করেছেন “পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে” সে সকল দ্রব্য সর্বকালের জন্য পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হবে। ‘মতন’-এর ইবারত থেকে এ মমটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহ যেমন ফতোওয়ায়ে শামী ও অন্যান্য গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) মাসআলাটি যে দলিল বর্ণনা করেছেন তাও এর প্রমাণ বহন করে। কিন্তু হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ আল্লামা আইনী (র.)-এর আল-বিনায়াহ-তে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

وَخَاصُّهُ أَنْ مَا كَانَ مَكِينًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغَيَّرُ أَبَدًا عَنْ ذَلِكَ .

যে সকল দ্রব্য নবী করীম ﷺ-এর যুগে পাত্র-পরিমাপিত হিসেবে প্রচলিত ছিল তা সর্বদাই পাত্র-পরিমাপিত বলে গণ্য হবে, কখনও তা পরিবর্তন হবে না। “হিদায়ার উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ হেদায়েতুল হেদায়ে-য়ও এ ব্যাখ্যাটিই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি সঠিক বলে মনে হয় না। وَاللَّهُ أَعْلَمُ।

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন যে, নবী করীম ﷺ যা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো نَصُّ বা “শরিয়তের স্পষ্ট বাণী” আর জনগণ যা প্রচলন করে তা হলো عُرف ‘লোক-প্রচলন’। আর عُرف তথা “শরিয়তের স্পষ্ট বাণী” عُرف [জন-প্রচলন]-এর তুলনায় শক্তিশালী দলিল। আর শক্তিশালী দলিল দুর্বল দলিলের কারণে পরিহার করা যায় না। সুতরাং নবী করীম ﷺ যা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা লোক-প্রচলনের কারণে পরিবর্তিত হবে না।

عُرف “লোক-প্রচলন”-এর তুলনায় نَصُّ বা “শরিয়তের স্পষ্ট বাণী” শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো-

১. “লোক-প্রচলন” নাজায়েজ বা অন্যায় বিষয়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন- আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর যুগে ঈদের রাতে কবরস্থানে মোমবাতি ও চেরাগ নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে نَصُّ তথা “শরিয়তের স্পষ্ট বাণী” প্রমাণিত হওয়ার পর তা অন্যায়মূলক বা নাজায়েজমূলক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
২. শরিয়তে “লোক-প্রচলন” শুধু তাদের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গণ্য হয়, যাদের সমাজে তা প্রচলিত হয়েছে এবং তা গ্রহণ করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে نَصُّ তথা “শরিয়তের স্পষ্ট বাণী” সকলের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গণ্য এবং প্রযোজ্য। সুতরাং তা অধিক শক্তিশালী।
৩. “লোক-প্রচলন” শরিয়তে দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে نَصُّ তথা “শরিয়তের স্পষ্ট বাণী”-এর কারণে। সুতরাং যখন نَصُّ তথা “শরিয়তের স্পষ্ট বাণী” বিদ্যমান থাকবে, তখন “লোক-প্রচলন” ধর্তব্য হবে না বা দলিল হিসেবে গণ্য হবে না।

وَمَا لَمْ يَنْصَحْ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ، لِأَنَّهَا دَالَةٌ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ يَغْتَبِرُ الْعُرْفَ عَلَى خِلَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى ذَلِكَ لِمَكَانِ الْعَادَةِ، فَكَانَتْ هِيَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهَا، وَقَدْ تَبَدَّلَتْ، فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ الْحِنِطَةَ بِجِنْسِهَا مُتَسَاوِيًا وَزَنًّا أَوْ الذَّهَبَ بِجِنْسِهِ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا، وَإِنْ تَعَارَفُوا ذَلِكَ لَتَوْهُمْ الْفَضْلَ عَلَى مَا هُوَ الْمِغْيَارُ فِيهِ، كَمَا إِذَا بَاعَ مُجَازَفَةً، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِسْلَامُ فِي الْحِنِطَةِ وَتَحْوِهَا وَزَنًّا لِرُجُودِ الْإِسْلَامِ فِي مَعْلُومٍ -

**অনুবাদ :** আর যে সকল দ্রব্য সম্পর্কে নবী করীম ﷺ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, সে সকল দ্রব্য লোক-প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হবে। কেননা, লোক-প্রচলন জায়েজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে [অপর একটি রেওয়াজাতে] বর্ণিত হয়েছে যে, শরিয়তে স্পষ্টভাবে যা [পাত্র-পরিমাপিত বা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে] উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীতেও লোক-প্রচলন ধর্তব্য হবে। কেননা, শরিয়তের বাণীতে, সেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে [তখনকার] লোক-প্রচলনের কারণেই। কাজেই লোক-প্রচলনই হলো মূল লক্ষণীয় বিষয়। আর তখনকার প্রচলন পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে গেছে [তাই পরিবর্তিত প্রচলনই ধর্তব্য হবে]। এই মতবিরোধের উপর ভিত্তি করে [বিধান হলো,] যদি কেউ গমের বিনিময়ে গম ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করে কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না- যদিও জনগণ এভাবে পরিমাপ করে বিক্রয়ের প্রচলন করে থাকে। কেননা, এ ক্ষেত্রে শরিয়তের যেটা পরিমাপ-মাধ্যম তার ভিত্তিতে এক পক্ষে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন উক্ত দ্রব্যের অনুমানের মাধ্যমে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে [একই কারণে নাজায়েজ হয়]। তবে গম বা গম জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওজনের ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা জায়েজ হবে। কেননা, [ওজন উল্লেখের মাধ্যমে] সুনির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করা হয়েছে, [আর সুনির্দিষ্ট হওয়াই হলো, 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার শর্ত, তা যেভাবেই হোক না কেন]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْهُ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ ওজন-পরিমাপিত হওয়া কিংবা পাত্র-পরিমাপিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি, সে সকল দ্রব্য লোক-প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হবে, অর্থাৎ লোক-প্রচলনে যদি তা ওজনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে তা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে, আর যদি লোক-প্রচলনে তা পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে তা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য করা হবে। কেননা, যে সকল ক্ষেত্রে نَصٌّ বা শরিয়তের বাণী বিদ্যমান নেই সে সকল ক্ষেত্রে লোক-প্রচলন (عُرْف) ই প্রচলিত নিয়মের বৈধতার প্রমাণ বহন করে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- " مَا رَأَى النَّاسُ لَوْ كَانَ قَبْرُ عِنْدَ اللَّهِ حَسْرًا " [উল্লেখ্য, হাদীসটি ব্যাখ্যাকারগণ مَرْثُوع হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে এটি مَرْثُوع হাদীস নয়; বরং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত مَرْثُوع হাদীস। দ্র. الْقَصَائِدُ ১: ১৫৯] হাদীস নং ৯৫৯। এছাড়া নবী করীম ﷺ বলেছেন- " لَا تَجْنِعُ أَمْنِيَّ عَلَى ضَلَالَةٍ " [আমার উম্মত কোনো ভ্রান্ত বিষয়ের উপর একমত হবে না।]



﴿قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُسُفٍّ (ر.)﴾ মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে একটি অপ্রসিদ্ধ গজ্ঞান-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করা হলেও লোক-প্রচলন যদি তার বিপরীত হয় তবে লোক-প্রচলনই ধর্তব্য হবে। কেননা, হাদীসে যে সকল দ্রব্যকে গজ্ঞান-পরিমাপিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তা নবী করীম (ﷺ)-এর যুগের লোক-প্রচলনের কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ যে সকল দ্রব্যকে পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তাও সে যুগের লোক-প্রচলনের কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মূল বিষয় ছিল লোক-প্রচলন। অতএব লোক-প্রচলন যদি পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিবর্তিত লোক-প্রচলনই ধর্তব্য হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয় যে, যেখানে **نَصْ** বা শরিয়তের স্পষ্ট বাণী বিদ্যমান থাকে সেখানে **عُرْفُ** বা লোক-প্রচলন ধর্তব্য হয় না, যার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও যেহেতু **نَصْ** বিদ্যমান আছে সেহেতু **عُرْفُ** বা লোক-প্রচলন ধর্তব্য হবে না। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ জবাব ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিলের বিপরীতে যথার্থ নয়। কেননা, তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে এ ক্ষেত্রে লোক-প্রচলন **نَصْ**-এর বিপরীত হচ্ছে না; বরং **نَصْ**-এর অনুকূলেই হচ্ছে। কেননা, **نَصْ**-এ উক্ত দ্রব্যসমূহকে গজ্ঞান-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত হিসেবে উল্লেখই করা হয়েছে লোক-প্রচলন (**عُرْفُ**)-এর কারণে। কাজেই **نَصْ**-এর ক্ষেত্রেও মূল বিষয় ছিল লোক-প্রচলন। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এভাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত অপ্রসিদ্ধ রেওয়াজেটটির দলিলকে তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

﴿قَوْلُهُ تَعَالَى هَذَا لِرَبِّهِ الْجَنَّةِ﴾ মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মতবিরোধের ভিত্তিতে নিম্নের মাসআলার বিধানের ক্ষেত্রে **طَرَفَيْنِ** তথা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মাসআলা হলো, কেউ গমের বিনিময়ে গম ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করল অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করল, তাহলে লোক-সমাজে এভাবে প্রচলন থাকলেও অর্থ্যাৎ গম ওজনের ভিত্তিতে আর স্বর্ণ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার প্রচলন থাকলেও **طَرَفَيْنِ** তথা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না। কেননা, **نَصْ** বা শরিয়তের বাণীতে গমকে পাত্র-পরিমাপিত আর স্বর্ণকে গজ্ঞান-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং গমকে পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে, আর স্বর্ণকে গজ্ঞানের ভিত্তিতে সমান সমান করা অপরিহার্য হবে। আর আলোচ্য সূরতে এর বিপরীত মাধ্যমে সমান সমান করা হয়েছে। ফলে শরিয়তের নির্ধারিত পরিমাপ পদ্ধতিতে তাতে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, উভয় পক্ষের গম ওজনে সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও পাত্রের মাপে কমবেশি হতে পারে, যেহেতু গম শুকনা হলে তার ওজন কম হয় আর তাজা হলে ওজন বেশি হয়। আর এই কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা বা সন্দেহ থাকার কারণে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা' বা সুদের ক্ষেত্রে প্রকৃত কমবেশি হওয়ার কারণে যেকোন ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়, তদ্রূপ কমবেশি হওয়ার সন্দেহের কারণেও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়। যেমন 'রিবা' বা সুদের আওতাভুক্ত দ্রব্যসমূহ অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করলে তা হারাম হয়, কেননা, তাতে কমবেশি হওয়ার সন্দেহ থাকে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত উক্ত রেওয়াজে অনুসারে উক্ত সূরতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, তাঁর মতে লোক-সমাজে যে পদ্ধতিতে পরিমাপ করে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন হবে সেই পদ্ধতিতেই সমান সমান করে বিক্রয় করা আবশ্যিক হবে। আর উক্ত সূরতে সে অনুযায়ী বিক্রয় করা হয়েছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

﴿قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَجُزُّ الْإِسْلَامُ فِي الْجَنَّةِ وَنَحْوَهَا وَزَنَا الْخ﴾ এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) **طَرَفَيْنِ** তথা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে পূর্বের মাসআলার ব্যতিক্রম বিধান উল্লেখ করছেন। অর্থ্যাৎ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যে সকল দ্রব্য নবী করীম (ﷺ) পাত্র-পরিমাপিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা সর্বদা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে" এর দাবি অনুযায়ী কেউ যদি ওজনের ভিত্তিতে গম 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় করে, তাহলে তা নাজায়েজ হওয়ার কথা। কেননা, গম নবী করীম (ﷺ) পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে ওজনের ভিত্তিতে গম বিক্রয় করা **طَرَفَيْنِ**-এর মতেও জায়েজ। এর কারণ হলো, 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য সমান সমান হওয়ার কোনো শর্ত নেই, বরং এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, দ্রব্যটি এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা যাতে বিবাদের সম্ভাবনা না থাকে। আর ওজনের ভিত্তিতে গম বিক্রয় করলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে গমের বিনিময়ে গম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমতা বিধান অপরিহার্য। আর এ সমতা শরয়ী পরিমাপ তথা পাত্র-পরিমাপের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যিক হবে।

قَالَ : وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّطْلِ فَهُوَ وَزْنِيَّ، مَعْنَاهُ مَا يُبَاعُ بِالْأَوَانِي، لِأَنَّهَا قُدِّرَتْ بِطَرِيقِ الْوَزْنِ، حَتَّى يُخْتَسَبَ مَا يُبَاعُ بِهَا وَزْنًا، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَكَائِيلِ، وَإِذَا كَانَ مَوْزُونًا فَلَوْ بَعِيَ بِمِكَئَالٍ لَا يُعْرَفُ وَزْنُهُ بِمِكَئَالٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ لِنَوْمِ الْفَضْلِ فِي الْوَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর যে সকল দ্রব্যের পরিমাপ 'রিতল' (رطل) -এর সাথে সম্পৃক্ত তা ওজন-পরিমাপিত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যা 'উকিয়া' পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়। কেননা, এ পাত্রের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়েছে ওজনের ভিত্তিতে। এজন্যই এর মাধ্যমে মেপে যা বিক্রয় করা হয় তা হিসাব করা হয় ওজনের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে পরিমাপের অন্যান্য পাত্রের বিষয় এর বিপরীত [অর্থাৎ তা দ্বারা মাপা দ্রব্য ওজনের ভিত্তিতে হিসাব করা হয় না]। আর যখন 'রিতল' (رطل) -এর সাথে সম্পৃক্ত দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত বলে গণ্য হলো, সুতরাং এরূপ দ্রব্য যদি এমন এক পাত্র দ্বারা বিক্রয় করে যার [অন্তর্স্থিত দ্রব্যের] ওজন জানা নেই অনুরূপ এক পাত্র পরিমাপ দ্রব্যের বিনিময়ে তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা, ওজনের দিক থেকে উভয় দ্রব্যের কোনো এক দিকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে [কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তা জায়েজ হয় না]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّطْلِ : এখানে মুসান্নিফ (র.) যে সকল দ্রব্য লোক-প্রচলনে رطل [রিতল] হিসেবে বিক্রয় করা হয় [যেমন- তেল] তা কি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে নাকি পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে- তা বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, رطل [রিতল] মূলত ওজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি পরিমাপের নাম, কিন্তু পরিমাপের সুবিধার্থে তা সাধারণত নির্দিষ্ট পাত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। ফলে ধারণা হতে পারে যে, এটা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য, তাই ইমাম কুন্হী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, رطل হিসেবে বিক্রয় প্রচলিত দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। আর رطل [রিতল] হলো তুলনামূলক একটি বড় পরিমাপের নাম যার এক হলো أَوْقِيَّةٌ বহুবচনে أَوْاقِيَّةٌ অর্থাৎ কোনো অঞ্চলে ১২ أَوْقِيَّةٌ [উকিয়া]-এ এক رطل হতো, আর কোনো অঞ্চলে ২০ أَوْقِيَّةٌ -এ এক رطل হতো। সুতরাং أَوْقِيَّةٌ হিসেবে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তাও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। কেননা, رطل এবং أَوْقِيَّةٌ হিসেবে বিক্রীত দ্রব্য নির্দিষ্ট পাত্রের মাধ্যমে মেপে দেওয়ার প্রচলন থাকলেও উভয়টির পরিমাপ মূলত নির্ধারণ করা হয়েছে ওজন হিসেবে। অবশ্য এর পরিমাপ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর যুগে ইক্বাদিরিয়ায় এক رطل হতো তিনশত বার দিরহাম ওজন সমপরিমাপ, মিশরে ছিল একশত চুয়াদিশ দিরহাম সমপরিমাপ, আর ইরাকে ছিল একশত আঠাশ দিরহাম সমপরিমাপ। আর ইরাকের প্রচলিত এ رطل -এর কথাই হযরত আবু উবায়দাহ উল্লেখ করেছেন এবং ফকীহগণও এ ইরাকী رطل -এর হিসেবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন। আর ইক্বাদিরিয়ায় এক رطل হলো ১২ أَوْقِيَّةٌ -এ। আর অনেক অঞ্চলে হতো বিশ أَوْقِيَّةٌ -এ, আর নবী করীম ﷺ -এর যুগে এক أَوْقِيَّةٌ হতো চল্লিশ দিরহামে। সারকথা স্থান ও কালভেদে এর পরিমাপ বিভিন্ন রকমের হয়েছে। তবে পরিমাণটি ছিল ওজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত। পক্ষান্তরে أَوْقِيَّةٌ হিসেবে বা رطل হিসেবে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য :

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ مَوْزُونًا فَلَوْ بَعِيَ بِمِكَئَالٍ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, رطل বা أَوْقِيَّةٌ হিসেবে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তা যেহেতু ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য সেহেতু কেউ যদি সে সকল দ্রব্য এভাবে বিক্রয় করে যে, নির্দিষ্ট একটি পাত্র পরিমাপ দ্রব্য অনুরূপ এক পাত্র দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করল, কিন্তু উক্ত পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের ওজন কতটুকু তা জানা নেই, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, উক্ত দ্রব্য হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত, সুতরাং তা ওজন হিসেবেই সমান সমান করে বিক্রয় করা আবশ্যিক হবে। অতএব যখন উক্ত পাত্রের দ্রব্যের ওজন জানা নেই তখন যে কোনো এক পক্ষে ওজনের দিক থেকে কম বা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা' বা সুদের ক্ষেত্রে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনার কারণেও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়। যেমন- 'রিবা'-এর দ্রব্যসমূহ কেউ যদি অনুমানের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করে, তাহলে তা হারাম হয়। কেননা, শরী পরিমাপের মাধ্যমে তা সমান সমান করা অপরিহার্য।

قَالَ : وَعَقْدُ الصَّرْفِ مَا وَقَعَ عَلَى جِنْسِ الْأَثْمَانِ يُغْتَبَرُ فِيهِ قَبْضٌ عَوَضِي فِي الْمَجْلِسِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْفِضَةِ هَاءٌ وَهَاءٌ مَعْنَاهُ يَدًا يَدًا وَسَنْبِينَ الْفِئَةِ فِي الصَّرْفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, 'বায় সরফ'-এর চুক্তি তথা যে চুক্তিতে উভয় পক্ষে মুদ্রা-দ্রব্য থাকে, তাতে চুক্তির মজলিসেই উভয় বিনিময়দ্রব্য উভয়ের হস্তগত করা আবশ্যিক হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, الْفِضَةُ "রূপার বিনিময়ে রূপার বিক্রয় [এভাবে হবে যে, একজন বলবে] এই নাও [অপর জন বলবে] এই নাও " এর অর্থ হলো, হাতে হাতে আদান প্রদান করবে। এ শর্ত আরোপের তাৎপর্য আমরা -ইনশাআল্লাহ- 'সরফ'-এর অধ্যায়ে আলোচনা করব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُذْ [এই নাও] -এর অর্থ হচ্ছে- শব্দ দুটি مَبْنًى بِرَفْعِهِ হা-হা-হা-এর অর্থ হলো, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে বলবে 'এই নাও' অর্থাৎ হাতে হাতে আদান প্রদান করবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি উভয় দিকে মুদ্রা-দ্রব্য হয় [অর্থাৎ স্বর্ণ বা রৌপ্য হয়, কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্য সৃষ্টিগত দিক থেকেই মুদ্রাদ্রব্য বলে গণ্য] তাহলে এক্রয়-বিক্রয়কে 'বায় সরফ' বলা হয়। 'বায় সরফ'-এর দুটি সূরত হতে পারে-

১. উভয় দিকে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য।
২. এক দিকে স্বর্ণ আর অপর দিকে রৌপ্য।

প্রথম সূরতে উভয় দিকে সমান সমান হওয়া এবং মজলিসে উভয়ের হস্তগত করা এ দুটি বিষয়ই শর্ত। আর দ্বিতীয় সূরতে কেবল মজলিসে উভয়ের হস্তগত করা শর্ত, কিন্তু সমান সমান হওয়া শর্ত নয়। [উল্লেখ্য, এখানে মজলিসে হস্তগত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা। সুতরাং যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তি সম্পাদনের পর উভয়ে মজলিস ছেড়ে একত্রে কয়েক মাইল হাঁটতে থাকে অবশেষে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ে অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে নেয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সঙ্গীহ হবে।]

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْفِضَةِ هَاءٌ وَهَاءٌ : মুসান্নিফ (র.) 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হওয়ার দলিল বর্ণনা করছেন যে, এ ক্ষেত্রে দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণী- الْفِضَةُ بِالْفِضَةِ هَاءٌ وَهَاءٌ "রূপার বিনিময়ে রূপার বিক্রয় [এভাবে হবে যে, একজন বলবে] এই নাও [অপর জন বলবে] এই নাও "।

উল্লেখ্য, এটি হাদীসের একটি অংশ। হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবায় হযরত ওমর (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

الذَّعْبُ بِالذَّعْبِ رِبًّا إِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ وَالزُّورُ بِالزُّورِ رِبًّا إِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ رِبًّا إِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ .

আর বুখারী ও মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে হযরত ওমর (রা.) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

الذَّعْبُ بِالزُّورِ رِبًّا إِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءٌ وَهَاءٌ .

মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হওয়ার কারণ ও হিকমত আমরা 'বায় সরফ'-এর অধ্যায়ে উল্লেখ করব। [মূল গ্রন্থের ৮৯ নং পৃষ্ঠার ওক্ততে 'বায় সরফ'-এর অধ্যায়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুসান্নিফ (র.) এ আলোচনা করেছেন।]

قَالَ : وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّغْيِينُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقَابُضُ ، خَلْقًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ ، لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ "يَدًا بِيَدٍ" ، وَلِإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ بِتَعَاقُبِ الْقَبْضِ ، وَلِلنَّقْدِ مِيزَةً فَيَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الرِّبَا . وَلَنَا أَنَّهُ مَبِيعٌ مُتَعَيَّنٌ فَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ الْقَبْضُ كَالثُّوبِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْفَائِدَةَ الْمَطْلُوبَةَ إِنَّمَا هُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ ، وَتَرْتَبُ ذَلِكَ عَلَى التَّغْيِينِ بِخِلَافِ الصَّرْفِ ، لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ لِيَتَعَيَّنَ بِهِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "يَدًا بِيَدٍ" عَيْنًا بِعَيْنٍ كَذَا رَوَاهُ عَبْدُادَةُ بْنُ الصَّامِتِ (رض) وَتَعَاقُبُ الْقَبْضِ لَا يُعْتَبَرُ تَفَاوُتًا فِي الْمَالِ عُرْفًا بِخِلَافِ النَّقْدِ وَالْمَوْجَلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুদ্রা-দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য যে সকল দ্রব্য 'রিবা'ভুক্ত সেগুলো ত্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [চুক্তির মজলিসে কেবল] দ্রব্যটি নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক ; উভয় পক্ষের হস্তগত করা আবশ্যিক নয়। কিন্তু খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয়ে উক্ত বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে [তার মতে সে ক্ষেত্রে মজলিসেই তা উভয়ের হস্তগত করা আবশ্যিক]। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, [পূর্বে উল্লিখিত 'রিবা' সম্পর্কিত] প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর এই বাণী- "يَدًا بِيَدٍ" -হাতে হাতে" [অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য তোমরা বিক্রয় করে তা নগদ হাতে হাতে আদান প্রদান কর]। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, যদি চুক্তির মজলিসেই উভয়ে হস্তগত না করে তাহলে উভয়ের কজা [হস্তগত করা] আগে পিছে হবে, আর নগদ বা আগে হস্তগত করার মাঝে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বা লাভ রয়েছে। ফলে 'রিবা' [বা এক পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া]-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। [আর 'রিবা'-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হলে তা বিক্রয় জায়েজ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়।] আর আমাদের দলিল হলো, এটা [অর্থাৎ মুদ্রা-দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য] হচ্ছে এমন বিক্রীত-দ্রব্য যা নির্দিষ্ট, কাজেই তা মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হবে না। যেমন কাপড় [এর ক্ষেত্রে একমতো মজলিসে হস্তগত করা শর্ত নয়]। এর কারণ হচ্ছে এই যে, [ত্রয়-বিক্রয়ের] উদ্দিষ্ট ফায়দা বা লাভ হচ্ছে দ্রব্যটি কাজে লাগানোর সক্ষমতা অর্জন করা। আর তা নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় [তাই কজা করা শর্ত থাকবে না]। পক্ষান্তরে 'বায় সরফ' [যাতে উভয় পক্ষে মুদ্রা-দ্রব্য হয়] এর বিষয় ভিন্ন। কেননা, তাতে [মজলিসেই] কজা করা এজন্য আবশ্যিক, যাতে দ্রব্যদ্বয় নির্দিষ্ট হয়ে যায় [কেননা, মুদ্রা-দ্রব্য কজা করার পূর্বে নির্দিষ্ট হয় না]। আর নবী করীম ﷺ-এর বাণী- "يَدًا بِيَدٍ" -হাতে হাতে"-এর অর্থ হলো, "নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু", যেমন-হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন। আর 'কজা আগে পিছে হওয়া' লোক-প্রচলনে সম্পদের মাঝে [মূল্যের দিক থেকে] তারতম্য সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হয় না। পক্ষান্তরে নগদ এবং বাকি বিক্রয়ের বিষয় ভিন্ন [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে নগদ ও বাকির কারণে সম্পদের মূল্যের তারতম্য হয় বলে লোক-প্রচলনে বিবেচনা করা হয়]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ: مَاسْأَلَا هَلَا، مَدْرَدْرَا تَهَا هَرْفٌ وَ رَوَپَا بَآئِیْتِ اَنَآنَا یَه سَكَلْ دُرَآ 'رِیَا' بُؤُتْ  
[যেমন- ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য] তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা  
আবশ্যক নয়; বরং কেবল তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে চাই উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হোক [যেমন- গমের বিনিময়ে  
পদ্ম] কিংবা উভয় দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হোক [যেমন- গমের বিনিময়ে যব] উভয় সুরতেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক নয়;  
বরং মজলিসে নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমতে পোষণ করেন। তাঁর মতে যদি উভয় দ্রব্য খাদ্যদ্রব্য হয়, তাহলে মজলিসেই তা হস্তগত  
করা আবশ্যক হবে। সুতরাং যদি উভয়ে তা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَه قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْحَدِیْثِ الْمَعْرُوفِ بِدَا بَدٍ: মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর স্বপক্ষে দুটি  
দলিল উল্লেখ করেছেন, প্রথমটি নকলী আর দ্বিতীয়টি আকলী। তাঁর নকলী দলিল হলো, 'রিবা' সংক্রান্ত নবী করীম ﷺ থেকে  
বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস [হাদীসটি এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদীসটি হযরত উবাদাহ ইবনে সমিত ও হযরত  
আবু সাঈদ খুদরী (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে]। উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ  
বলেছেন بِدَا بَدٍ "হাতে হাতে" অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যগুলো [স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, লবণ, খেজুর] সমান সমান করে এবং "হাতে  
হাতে" বিক্রয় করতে হবে। আর এখানে بِدَا بَدٍ "হাতে হাতে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নগদ হস্তগত করা। সুতরাং এ হাদীস  
দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, 'রিবা'ভুক্ত সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক, চাই তা স্বর্ণ-রৌপ্য হোক বা অন্য  
দ্রব্য হোক। [উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে স্বর্ণ-রৌপ্য ও খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য 'রিবা'ভুক্ত নয়, তাই সেগুলো  
তাঁর মতে মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক নয়।]

قَوْلُهُ وَلَا تَه إِذَا لَمْ يَبْضُ فِی الْمَجْلِیْسِ الخ: ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিল হলো, যদি উভয় দ্রব্য মজলিসে  
হস্তগত করা না হয় তাহলে এক পক্ষের দ্রব্য আগে হস্তগত করা হবে আর আরেক পক্ষের দ্রব্য পরে হস্তগত করা হবে। আর যা  
আগে হস্তগত করা হবে তার মূল্যমান অপরটির চেয়ে বেশি হবে [এ কারণেই তো নগদ দ্রব্যের মূল্য বেশি হয় আর বাকি  
দ্রব্যের মূল্য কম হয়]। ফলে 'রিবা' বা অতিরিক্ততার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত  
অতিরিক্ততার কারণে যেকোন ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয় তদুপ 'অতিরিক্ততার সন্দেহের' কারণেও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়। সুতরাং  
খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ مِیْعٌ مَّتَعِیْنٌ لَّا یُسْتَرْطُ الخ: আমাদের দলিল হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য নির্দিষ্ট করার  
দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যে সকল দ্রব্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক হয় না। এর  
কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিকারীদ্বয়ের যে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তা হলো, ক্রয়কৃত দ্রব্য ক্রেতার হস্তক্ষেপ  
করার অধিকার লাভ করা। আর এ উদ্দেশ্য দ্রব্যটি নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বারা অর্জিত হয়। নির্দিষ্ট হলেই দ্রব্যটিতে তার হস্তক্ষেপ  
করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য তা মজলিসে হস্তগত করার আবশ্যকতা নেই। যেমন-  
কাপড়ের বিনিময়ে কাপড় কিংবা দাসের বিনিময়ে দাস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক  
নয়। কারণ, তা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 'বায় সরফ' তথা মুদ্রাদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য  
মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক। কেননা, মুদ্রাদ্রব্য [স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা] নির্দিষ্ট করা হলেও তা হস্তগত করার পূর্বে নির্দিষ্ট হয়  
না। তাই নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য তা হস্তগত করা অপরিহার্য। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য তা মজলিসেই হস্তগত করা  
আবশ্যক হবে, অন্যথায় চুক্তির উদ্দেশ্য [হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করা] অর্জিত হবে না।

হানাকীদের উপর একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে হানাকী ওলামাগণের উপর একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো- যদি একটি স্বর্ণের পেয়ালার বিনিময়ে একটি স্বর্ণের পেয়লা বিক্রয় করা হয়, তাহলে হানাকীগণের মতেও উভয় পেয়লা বিক্রয়-মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যিক। অথচ স্বর্ণের পেয়লা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, অতএব তা উপরিউক্ত কারণ [ইদ্রাত] অনুযায়ী মজলিসে হস্তগত করা শর্ত না হওয়ার কথা। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, স্বর্ণের পেয়লা [বা মুদ্রা ছাড়া স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা তৈরি অন্যান্য দ্রব্য] যদিও নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায় তথাপিও স্বর্ণ ও রৌপ্য যেহেতু সৃষ্টিগত দিক থেকেই মুদ্রা হিসেবে গণ্য, তাই তা নির্দিষ্ট হলেও অনির্দিষ্ট থাকার একটা সন্দেহ (مُشْكَه) থেকে যায় [কেননা, মুদ্রাদ্রব্য অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে]। তাই স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি দ্রব্যের ক্ষেত্রে সর্বদা মজলিসে হস্তগত করা শর্ত করা হয়েছে ॥

الْخ : قَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَدَا يَدَا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত নকলী দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে- উক্ত হাদীসে উল্লিখিত يَدَا يَدَا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু"। অর্থাৎ রিবার আওতাভুক্ত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করা সহীহ হওয়ার জন্য উভয় দ্রব্য নির্দিষ্ট হতে হবে। আর উক্ত হাদীসে يَدَا يَدَا দ্বারা যে عَيْنَا عَيْنَا উদ্দেশ্য এর প্রমাণ হলো হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে يَدَا يَدَا -এর পরিবর্তে عَيْنَا عَيْنَا রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالسُّبْرِ بِالسُّبْرِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرِ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً سَوَاءً عَيْنَا عَيْنَا فَمَنْ زَادَ أَوْ أَسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَىٰ .

আর عَيْنَا عَيْنَا -এর কেবল একটিই অর্থ হতে পারে তা হলো 'নির্দিষ্টের বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু'। পক্ষান্তরে يَدَا يَدَا -এর দুটি অর্থ হতে পারে তা হলো-

ক. হাতে হাতে হস্তগত করা। কেননা, হাত হচ্ছে হস্তগত করার মাধ্যম।

খ. উভয়ে তাদের দ্রব্যদ্বয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া। কেননা, নির্দিষ্ট করা সাধারণত হাত দ্বারাই হয়ে থাকে।

অতএব এখানে يَدَا يَدَا -এর দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করতে হবে যাতে উভয় হাদীসের অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়; নতুবা عَيْنَا عَيْنَا -এর অর্থ পরিহার করা আবশ্যিক হয়ে পড়বে। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, 'রিবা'ভুক্ত দ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে নির্দিষ্ট করা শর্ত; হস্তগত করা শর্ত নয়।

الْخ : قَوْلُهُ وَتَعَابَقَ الْقَبْضُ لَا يُعْتَبَرُ تَفَاوُتًا فِي الْمَالِ عَرَفَا الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত আকলী দলিলের জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, যদি উভয় দ্রব্যের কোনোটি বাকি না হয় [উল্লেখ্য, বাকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা অনির্দিষ্ট থাকে এবং পরিশোধের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়]। আর যা মজলিসে নির্দিষ্ট করা হয় এবং পরে হস্তগত করা হয় তা বাকি বলে গণ্য নয় ॥ বরং উভয় দ্রব্যই মজলিসে নির্দিষ্ট করা হয় অতঃপর একটি মজলিসে হস্তগত করা হয় আর অপরটি মজলিসের পরে হস্তগত করা হয়, তাহলে লোক-প্রচলনে এই আগে পরে হস্তগত করার কারণে দ্রব্যের মূল্যের মাঝে তারতম্য ধরা হয় না। অর্থাৎ এরূপ বিবেচিত হয় না যে, যে দ্রব্যটি মজলিসে হস্তগত করা হয়েছে তার মূল্য বেশি হবে, আর যে দ্রব্য পরে হস্তগত করা হয়েছে তার মূল্য কম হবে; বরং মূল্যের দিক থেকে এ ক্ষেত্রে সমানই গণ্য করা হয়। সুতরাং যখন লোক-প্রচলনে এ ক্ষেত্রে মূল্যের মাঝে কমবেশি হয় না তখন রিবা [সুদ]-এর সন্দেহও সাব্যস্ত হবে না। কাজেই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে যদি উভয় দ্রব্যের একটি নগদ হয় আর অপরটি বাকি হয় [অর্থাৎ নির্দিষ্ট করা না হয় এবং তা পরিশোধের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়] তাহলে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে। কেননা, নগদ ও বাকির কারণে লোক-প্রচলনে দ্রব্যের মূল্য কমবেশি হয়ে থাকে, তাই সেখানে রিবা বা সুদের সন্দেহ (مُشْكَه) সাব্যস্ত হয়।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَتَيْنِ، وَالْحَبْزَةِ بِالْحَبْزَتَيْنِ، لِإِنْعِدَامِ الْمِغْيَارِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَالشَّائِعِيُّ (رح) يُخَالِفُنَا فِيهِ لِرُجُودِ الطَّعْمِ عَلَى مَا مَرَّ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দুটি ডিমের বিনিময়ে একটি ডিম, দুটি খেজুরের বিনিময়ে একটি খেজুর এবং দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোট বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এগুলো [শরিয়তের] পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই 'রিবা' সাব্যস্ত হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতবিরোধ করেন, [তার মতে জায়েজ হবে না]। কেননা, [তার মতে, 'রিবা'-এর 'ইল্লাত'] খাদ্যযোগ্যতা বিদ্যমান আছে, যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ الْخ : আমাদের মতে দুটি ডিমের বিনিময়ে একটি ডিম, দুটি খেজুরের বিনিময়ে একটি খেজুর, দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোট বিক্রয় করা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো, উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করতে হবে। কোনো এক পক্ষের দ্রব্য যদি বাকি হয় তাহলে জায়েজ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উল্লিখিত সবকয়টি সুরভেই ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এ অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রিবা [সুদ] হারাম হওয়ার ইল্লাত হলো 'খাদদ্রব্য হওয়া'। সুতরাং যদি উভয় দ্রব্য খাদদ্রব্য হয়, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে। আর উল্লিখিত সুরতগুলোতে উভয় দ্রব্য খাদদ্রব্য, অতএব কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে।

আর আমাদের দলিল হলো, আমাদের মতে 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার ইল্লাত [কারণ] হলো, أَرْثَا "الْفَنَرُ مَعَ الْجَنِيِّ" অর্থ "উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া" [পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া বলতে কেবল উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া উদ্দেশ্য। উভয় দ্রব্য গণনা-প্রচলিত হলে এর আওতাভুক্ত হবে না। সুতরাং উল্লিখিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে ডিম এবং আখরোট হচ্ছে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য। কাজেই তাতে نَرَّ তথা 'পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া' পাওয়া যায়নি। আর খেজুর যদিও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য কিন্তু أَرْثَا "الْفَنَرُ مَعَ الْجَنِيِّ" পৌনে দুই কেজি। পরিমাণের চেয়ে কম দ্রব্য হলে তা শরিয়তে পরিমাপ মাধ্যমের আওতাভুক্ত বলে গণ্য হয় না। সুতরাং একটি বা দুটি খেজুর পরিমাপ মাধ্যমের আওতাভুক্ত নয়। কাজেই তাতেও نَرَّ বিদ্যমান নেই। অতএব ইল্লাত বিদ্যমান না থাকার কারণে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কিন্তু যেহেতু সব কয়টি সুরভেই উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক, আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হয়- পরিমাপ মাধ্যম এক না হয়, তাহলে বাকি বিক্রয় করা হারাম [এর দলিল বিস্তারিতভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]। সুতরাং উক্ত সুরতগুলোতে বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَلَسِ بِالْفَلَسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا عِنْدَ ابْنِ حَبِيبَةَ (رح) وَابْنِ بُرْسَةَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) : لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ الثَّمَنِيَّةَ تَثْبُتُ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا ، وَإِذَا بَقِيَتْ اِثْمَانًا لَا تَتَعَيَّنُ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا يَغْيِرُ أَعْيَانَهُمَا ، وَكَبِنَعَ الدِّرْهَمَ بِالذِّرْهَمَيْنِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِي حَقِّهِمَا تَثْبُتُ بِاصْطِلَاحِهِمَا ، إِذَا لَا لَأَيَّةٍ لِلغَيْرِ عَلَيْهِمَا فَتَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا ، وَإِذَا بَطَلَتِ الثَّمَنِيَّةُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، وَلَا يَعُودُ وَزْنِيًّا لِبَقَاءِ الْإِصْطِلَاحِ عَلَى الْعِدِّ إِذَا فِي نَقْضِهِ فِي حَقِّ الْعِدِّ فَسَادُ الْعَقْدِ فَصَارَ كَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ ، بِخِلَافِ النُّقُودِ ، لِأَنَّهَا لِلثَّمَنِيَّةِ خَلْفَةٌ ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا يَغْيِرُ أَعْيَانَهُمَا ، لِأَنَّهُ كَالْيَ ، بِالنَّكَالِيِّ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَغْيِرُ عَيْنِهِ ، لِأَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ يُحَرِّمُ النِّسَاءَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট দুটি পয়সার বিনিময়ে [নির্দিষ্ট] একটি পয়সা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা, সমাজের সকল মানুষের ব্যবহারের মাধ্যমে তা মূল্য-দ্রব্য হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তাদের দুজনের প্রয়োগের কারণে মূল্যদ্রব্য হওয়া বাতিল হবে না। আর যখন তা মূল্য-দ্রব্য হিসেবে বহাল থাকল তখন [নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও] তা নির্দিষ্ট হবে না। কাজেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় [বিধানের ক্ষেত্রে] দুটি অনির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করার মতো হলো। আর দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয়ের মতো হলো [যা সকলের ঐকমত্যে নাজাজেজ]। আর শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, পয়সা [যা সোনা-রূপা ব্যতীত অন্য ধাতু দ্বারা তৈরি তা সৃষ্টিগতভাবে মুদ্রা-দ্রব্য নয়, কাজেই তা] চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা-দ্রব্য হওয়া সাব্যস্ত হয়েছিল তাদের ব্যবহারের মাধ্যমেই। কেননা, তাদের উপর অন্যদের কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং তাদের প্রয়োগের মাধ্যমে তা আবার বাতিল হয়ে যাবে। আর যখন [তাদের ক্ষেত্রে] মুদ্রা-দ্রব্য হওয়া বাতিল হয়ে গেল তখন নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তবে [মুদ্রা-দ্রব্য হওয়া বাতিল হওয়ার কারণে] তা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যে ফিরে যাবে না। কারণ, গণনার ব্যাপারে তাদের সমঝোতা বহাল রয়েছে। কেননা, গণনার ব্যাপারে তাদের সমঝোতা ভঙ্গ করা হলে চুক্তিটি ফাসদ হয়ে যাবে [অথচ তারা চুক্তি সহীহভাবে সম্পন্ন করতে চাচ্ছে]। কাজেই তাদের এ বিক্রয় 'দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোটের মতো' হলো [আর তা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ]। পঞ্চাশের স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা হচ্ছে 'দাইন' [অনির্দিষ্ট বস্তু]-এর বিনিময়ে 'দাইন' [অনির্দিষ্ট বস্তু] বিক্রয় করা। আর হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। এরূপভাবে [পয়সার বিনিময়ে পয়সা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] যে কোনো এক দিকের পয়সা যদি অনির্দিষ্ট থাকে, তবে সে সুরতের বিষয়টিও ভিন্ন [অর্থাৎ তা জায়েজ নয়]। কেননা, শুধু উভয় দ্রব্যের একই শ্রেণীর হওয়া বাকি বিক্রয়কে হারাম করে দেয়।



### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْمَلَسَ এর অর্থ হলো, এমন প্রচলিত মুদ্রা যা স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতব পদার্থ দ্বারা তৈরি। এর বহুবচন হচ্ছে - قُلُوبٌ এবং قُلُوبٌ।

উল্লিখিত ইবরাতে এরূপ ধাতবমুদ্রা অনুরূপ ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে কিনা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করার মোট চারটি সূরত হতে পারে-

১. একটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।

২. একটি নির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।

৩. একটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।

৪. একটি নির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।

উক্ত চারটি সূরতের মধ্যে প্রথমে ৩ টি সূরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় নাজায়েজ। আর চতুর্থ সূরতে শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি অতিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে না। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় একটি অতিমত। মুসান্নিফ (র.) উক্ত চতুর্থ সূরত নিয়েই আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ لَأَنَّ التَّمْيِيزَ تَبَيَّنَ بِاصْطِلَاحِ الْكَلِمَةِ: ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ধাতবমুদ্রা মুদ্রারূপে পরিগণিত হয়েছে সর্বসাধারণের প্রচলনের মাধ্যমে। সুতরাং যদি চুক্তিকারীদ্বয় তথ্য ত্রুটি ও বিত্রেতা তা মুদ্রারূপে পরিগণিত না করে সাধারণ পণদ্রব্য হিসেবে গণ্য করতে চায় তাহলে তা সাধারণ পণ্য হিসেবে গণ্য হবে না; বরং মুদ্রা হিসেবেই বহাল থাকবে। [এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সূরতে চুক্তিকারীদ্বয় তাদের ধাতবমুদ্রা নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে তা সাধারণ পণ্য হিসেবে গণ্য করতে চাচ্ছে বলে বিবেচিত হচ্ছে। কেননা, পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুদ্রাদ্রব্য সর্বদা জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়; তা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। বরং এরূপ যে কোনো মুদ্রা দ্বারা তা পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু ধাতবমুদ্রা যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে মুদ্রাদ্রব্য বলে গণ্য নয়, তাই শায়খাইন (র.) বলেন, নির্দিষ্ট করার দ্বারা তা পুনরায় সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যেহেতু উক্ত ধাতবমুদ্রা সর্বসাধারণের প্রচলনের কারণে মুদ্রা হিসেবে গণ্য হয়েছে সেহেতু তা ওধু চুক্তিকারীদ্বয়ের নির্দিষ্ট করার কারণে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে স্বর্ণ ও রৌপ্য যেহেতু সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রাদ্রব্য বলে গণ্য, তাই স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা নির্দিষ্ট করলেও তা সাধারণ পণদ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা মুদ্রা বলেই বিবেচিত হবে এবং তা অনির্দিষ্টই থেকে যাবে, আর এ ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যখন উক্ত ধাতবমুদ্রা মুদ্রারূপেই বহাল থাকল তখন তা নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে না। সুতরাং চতুর্থ সূরতটিও অন্যান্য ৩টি সূরতের ন্যায় হলো, [অর্থাৎ অন্যান্য ৩টি সূরতে যে-কোনো এক পক্ষের কিংবা উভয় পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকার কারণে শায়খাইন (র.)-এর মতেও ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েজ। অতএব, আলোচ্য সূরতেও একই কারণে নাজায়েজ হবে।]

قَوْلُهُ وَكَسِبَ الْوِزْمَ بِالْوِزْمَيْنِ: ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আলোচ্য চতুর্থ সূরতটি দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয়ের মতোই হলো। [অর্থাৎ দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয় করা শায়খাইন (র.)-এর মতেও কোনো সূরতে বিক্রয় করা জায়েজ নয়, চাই তা নির্দিষ্ট করা হোক বা না হোক। সুতরাং ধাতবমুদ্রার ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে না।] قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ التَّمْيِيزَ فِي حَقِّهِمَا تَبَيَّنَ بِاصْطِلَاحِهَا: এখানে থেকে মুসান্নিফ (র.) শায়খাইন (র.)-এর দলিল উল্লেখ করেছেন। তাদের দলিল হলো, ধাতবমুদ্রা যদিও সর্বসাধারণের প্রচলনের কারণে মুদ্রা বলে গণ্য হয়েছে, কিন্তু চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হয়েছে তাদের উভয়ের প্রচলনের কারণে। কেননা, তাদের উভয়ের উপর অন্যান্য জনপণের কোনো কর্তৃত্ব নেই। [অর্থাৎ চুক্তিকারীদ্বয় উক্ত প্রচলনের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সাথে শরিক ছিল এবং তারা এটাকে মুদ্রা বলে গণ্য করে নিজেছে বিধায় মুদ্রা হয়েছে। তারা যদি মুদ্রা হিসেবে গণ্য না করে, তাহলে অন্যান্য জনপণের প্রচলনের কারণে তাদের ক্ষেত্রে এটা মুদ্রা হওয়া অপরিহার্য হবে না। কেননা, অন্যান্য জনগণের কোনো কর্তৃত্ব তাদের উভয়ের উপর নেই।] আর যখন চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হয়েছে তাদের প্রচলন যেনে নেওয়ার কারণে তখন তারা ইচ্ছা করলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য না করে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য করার অধিকার তাদের থাকবে। অতএব, আলোচ্য সূরতে চুক্তিকারীদ্বয় যখন ধাতবমুদ্রাগুলো নির্দিষ্ট করে বিক্রয় করছে তখন বুঝা গেল যে, তারা এগুলো মুদ্রা হিসেবে না রেখে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় করছে। আর সাধারণ দ্রব্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যেহেতু ধাতবমুদ্রাগুলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য,

তাই সেগুলো 'রিবা'-এর ইল্লাত **فَرَّ** তথা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়ার আওতাভুক্ত হচ্ছে না। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে **فَرَّ** বা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া। আর এখানে তা হচ্ছে না। আর যখন রিবা বা সুদ হারাম হওয়ার ইল্লাত [কারণ] বিদ্যমান নেই, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

**قَوْلُهُ وَلَا يَعْوَدُ زَيْبًا لِبَفَاءِ الْأَصْطِلَاحِ عَلَى الْعَمَلِ** : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) শায়খাইন (র.)-এর দলিলের উপর উত্থাপিত হতে পারে এরূপ একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, ধাতবমুদ্রা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হয়েছে তা মুদ্রারূপে গণ্য হওয়ার পর, মুদ্রা হওয়ার পূর্বে তা ছিল ওজন-প্রচলিত দ্রব্য। সুতরাং শায়খাইন (র.)-এর মতানুযায়ী যখন তা চুক্তিকারীদ্বয়ের নির্দিষ্ট করার কারণে মুদ্রা হওয়া বাতিল হয়ে গেছে তখন তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়াও বাতিল হয়ে গেছে এবং তার পূর্বের অবস্থা তথা ওজন-প্রচলিত দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। আর যখন উভয় পণ্য ওজন-প্রচলিত দ্রব্য এবং তাদের শ্রেণীও এক তখন তা 'রিবা' [সুদের] ইল্লাতের আওতাভুক্ত হয়েছে। কাজেই তা কমবেশি করে দুটির বিনিময়ে একটি বিক্রয় করা হারাম হওয়ার কথা। তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতানুসারে তা কীভাবে জায়েজ হলো?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, ধাতবমুদ্রার মাঝে দুটি বিষয় ছিল- ১. তা মুদ্রা হওয়া। ২. তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়া। আর চুক্তিকারীদ্বয়ও সর্বসাধারণের ন্যায় উভয় বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। অতঃপর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তারা যখন মুদ্রাগুলো নির্দিষ্ট করেছে তখন সেগুলোর মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি বাতিল হয়েছে, কিন্তু সেগুলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়ার বিষয়টি বাতিল হয়নি। কেননা, চুক্তিকারীদ্বয় সেগুলোকে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবেই বহাল রাখতে চাচ্ছে। কারণ, তারা চাচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হোক, আর তা অর্জিত হবে যদি সেগুলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবে বহাল থাকে। নতুবা বিক্রয় হারাম হয়ে যাবে, যা তাদের কথা নয়। সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয়টি দুটি আখরোতের বিনিময়ে একটি আখরোটে বিক্রয়ের মতোই হলো [অর্থাৎ আখরোটে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়ার কারণে দুটির বিনিময়ে একটি বিক্রয় করা যেমন সকলের মতে জায়েজ, তদ্রূপ আলোচ্য সূরতে ধাতবমুদ্রাও দুটির বিনিময়ে একটি বিক্রয় করা জায়েজ হবে]।

**قَوْلُهُ يَخْلَافُ النَّفْسَ لِأَنَّهَا لِلْمُتَوَلِّفِ** : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য চতুর্থ সূরতটিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে "দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয়ের" মাসআলার সাথে কিয়াস করেছেন তার জবাব দিচ্ছেন। জবাব হলো, ধাতবমুদ্রার বিষয়টি রৌপ্যমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কিয়াস করা সঠিক হবে না। কারণ, স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রা বলে গণ্য, ফলে চুক্তিকারীদ্বয় তা [নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে] মুদ্রা হওয়া বাতিল করতে চাইলেও তা বাতিল হবে না; বরং তা মুদ্রা হিসেবে বহাল থাকবে এবং অনির্দিষ্টই থেকে যাবে। সুতরাং তা কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

**قَوْلُهُ وَيَخْلَافُ مَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ أَغْنَائِهِمُ الْخ** : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য চতুর্থ সূরতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে প্রথম সূরত তথা "দুটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে একটি অনির্দিষ্ট দ্রব্যবস্তু" বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেছেন [যা শায়খাইন (র.)-এর মতেও নাজায়েজ] তার জবাব দিচ্ছেন। জবাব হলো, যদি উভয় পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকে তখন বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হচ্ছে তা **بَيْعُ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ** অর্থাৎ "যা অনির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব হয় এরূপ বস্তুর বিনিময় তদ্রূপ অনির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয় করা"-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর নবী কবীর **ﷺ** এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [উল্লেখ্য, হাদীসটি দারাকুতনী, মুসনাদে হাকিম, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে ইবনে আবি শায়বাহ গ্রন্থসমূহে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَاعَ كَالِيٌّ بِكَالِيٍّ" : হাদীসটির সনদ দুর্বল, তবে হাদীসটির মর্মার্থ অর্থাৎ "দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রি করা" নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা সাকল ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে।]

**قَوْلُهُ وَيَخْلَافُ إِذَا كَانَ أَدْمَعًا بِغَيْرِ عَيْنِهِمُ الْخ** : এখানেও মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন যে, আলোচ্য চতুর্থ সূরতকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূরত [তথা এক পক্ষের ধাতবমুদ্রা যদি অনির্দিষ্ট থাকে সে সূরত]-এর সাথে কিয়াস করাও সঠিক হবে না। কেননা, যদি এক পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, যদি কোনো এক পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকে তাহলে তা বাকি বলে গণ্য হবে, আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত'-এর দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি পাওয়া যায়, তাহলে বাকি বিক্রয় করা হারাম হয়। আর এখানে একটি বিষয় পাওয়া গেছে, তা হলো উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য চতুর্থ সূরতে যেহেতু উভয় দিকের মুদ্রা নির্দিষ্ট, তাই তা বাকি হচ্ছে না। সুতরাং তা জায়েজ।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَلَا بِالسُّونْقِ ، لِأَنَّ الْمَجَانَسَةَ بَاقِيَةٌ مِنْ وَجْهِ  
لَا نَهْمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْجَنْطَةِ ، وَالْمِغْيَارُ فِيهِمَا الْكَيْلُ ، لَكِنَّ الْكَيْلَ غَيْرُ مُسَمَّرٍ  
بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجَنْطَةِ لِأَكْتِنَازِهِمَا فِيهِ وَتَخْلُخِلُ حَبَاتِ الْجَنْطَةِ فَلَا يَجُوزُ . وَإِنْ  
كَانَ كَيْلًا بِكَيْلٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, আর আটার বিনিময়ে কিংবা ছাতুর বিনিময়ে গম বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। কেননা, আটা এবং ছাতু গমেরই গুঁড়ো অংশ, তাই এক দিক থেকে গম এবং আটা বা ছাতুর মাঝে একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়ার গুণ বিদ্যমান রয়েছে [যা ‘রিবা’ হারাম হওয়ার একটি ‘ইল্লাত’] আর উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম হচ্ছে পাত্র। কিন্তু পাত্র-পরিমাপ ছাতু কিংবা আটা আর গমের মাঝে সমতা নির্ধারণ করতে পারে না। কেননা, আটা কিংবা ছাতু পাত্রের মাঝে ভরাট হয়ে থাকে আর গমের দানা ফাঁক ফাঁক হয়ে থাকে। কাজেই এক ‘কাইল’ পরিমাপের বিনিময়ে এক ‘কাইল’ পরিমাপ বিক্রয় করা সত্ত্বেও [সমান সমান সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে] তা জায়েজ হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَنْطَةِ الْخ :

মাসআলা : আমাদের মতে আটার বিনিময়ে গম বিক্রয় করা কিংবা গমের তৈরি ছাতুর বিনিময়ে গম বিক্রয় করা জায়েজ নয়। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও প্রসিদ্ধতম অভিমত এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত দুটি অভিমতের একটি অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধতম অভিমত হলো, উভয় সুরতই বিক্রয় জায়েজ হবে।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, গমের আটা এবং গমের ছাতু প্রকৃতপক্ষে গমই, শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, গমের অংশসমূহকে বিভাজিত করা হলে তাকে আটা আর ভাজার পর বিভাজিত করা হলে তাকে ছাতু বলে, আর তার অংশসমূহ একত্রিত থাকা অবস্থায় তাকে গম বলে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন খুব ছোট ছোট গমের বিনিময়ে বড় আকারের গম বিক্রয় করা হচ্ছে। আর ছোট গমের বিনিময়ে বড় আকারের গম বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ। অতএব, এ ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে।

আমাদের দলিল হলো, গম এবং গমের আটা বা ছাতু এ উভয়ের মাঝে “একই শ্রেণীর হওয়া”-এর বিষয়টি এক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে আবার এক হিসেবে বিদ্যমান নেই। বিদ্যমান আছে এ হিসেবে যে, গমকে ভাসানো দ্বারা বা পেশার দ্বারা তার কেবল অংশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর কোনো জিনিসের অংশসমূহ বিক্ষিপ্ত হওয়া বা একত্রিত হওয়ার দ্বারা ঐ জিনিসের পরিবর্তিত হয় না বা তা অন্য বস্তুতে পরিণত হয় না; বরং তা পূর্বের বস্তু হিসেবেই বহাল থাকে।

সুতরাং ভাসানোর পূর্বে তা যে দ্রব্য ছিল সেই দ্রব্যই রয়েছে। আর এক হিসেবে উভয়ের মাঝে مُجَانَسَةٌ বা একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান নেই। তার কারণ হলো, দুটি দ্রব্যের মাঝে যদি নাম, সুরত ও গুণাগুণ এ তিনটি দিক থেকে পার্থক্য পাওয়া যায়, তাহলে তাদের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হয়। আর গম এবং আটা বা ছাতুর মাঝে উক্ত তিন দিক থেকেই পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এক হিসেবে উভয়ের শ্রেণী এক। সারকথা, গম এবং তার আটা বা ছাতুর মাঝে একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি অবশিষ্ট থাকা বা না থাকার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং পূর্বে যেহেতু উভয়টি একই শ্রেণীর ছিল, তাই তাদের একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি অবশিষ্ট আছে বলে গণ্য হবে। কেননা, যা বিদ্যমান ছিল বলে নিশ্চিত জানা আছে তা পরবর্তী সন্দেহের কারণে দূর হয় না; যতক্ষণ না দূরীভূত হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। অতএব যেহেতু গম এবং তার আটা বা ছাতুর মাঝে مُجَانَسَةٌ [একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি] বিদ্যমান আছে, আর তাদের উভয়ের পরিমাপ মাধ্যমও এক, তাই ‘রিবা’র ‘ইল্লাত’ পাওয়া গেছে। সুতরাং সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য। কিন্তু গম, আটা এবং ছাতু এই তিনটিরই পরিমাপ-মাধ্যম হচ্ছে পাত্র [অর্থাৎ এগুলো পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য], অথচ পাত্র দ্বারা গম এবং আটা বা ছাতুর মাঝে সমান সমান করা সম্ভব নয়। কেননা, আটা বা ছাতু পাত্রের মাঝে ভর্তি করলে তাতে ফাঁকা থাকে না, পক্ষান্তরে গম পাত্রের মাঝে ভর্তি করলে তার দানাসমূহের মাঝে ফাঁকা থাকে। ফলে উভয়ের মাঝে এভাবে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। আর সমতা বিধান করা বাস্তবিক বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কোনো সুরত নেই। সুতরাং গমের বিনিময়ে ছাতু বা আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا كَيْلًا لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ، وَيَبْعُ الدَّقِيقُ  
بِالسُّوْقِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) مُتَفَاضِلًا وَلَا مُتَسَاوِيًا، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ  
الدَّقِيقِ بِالمَقْلَبَةِ، وَلَا بَيْعُ السُّوْقِ بِالمَقْلَبَةِ، فَكَذَا بَيْعُ أَجْزَائِهِمَا لِإِحْصَاءِ  
المُجَانِسَةِ مِنْ وَجْهِ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لِإِخْتِلَافِ  
المَقْصُودِ، قُلْنَا: مُعْظَمُ المَقْصُودِ وَهُوَ التَّغْذِي يَشْمَلُهُمَا، وَلَا يَبَالِي بِغَوَاثِ  
البَعْضِ كَالْمَقْلَبَةِ مَعَ غَيْرِ المَقْلَبَةِ، وَالْعَلَكَةِ بِالمُسَوَّسَةِ.

**অনুবাদ :** আর আটার বিনিময়ে আটা পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, [সমান সমান হওয়ার] শর্ত বিদ্যমান আছে। আর ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে কমবেশি করেও জায়েজ নয় এবং সমান সমান করেও জায়েজ নয়। কেননা, ভাজা গমের বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা এবং [কাঁচা] গমের বিনিময়ে ছাতু বিক্রয় করা জায়েজ নয়। সুতরাং এ উভয়ের [ভাজা গম ও কাঁচা গমের] অংশও [একটি অপরটির বিনিময়ে] বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। কারণ, এক দিক থেকে উভয়ের মাঝে একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়ার গুণ বহাল আছে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। কেননা, আটা ও ছাতুর শ্রেণী (جنس) ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, উভয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। [আটার উদ্দেশ্য হয় রুটি তৈরি করা, আর ছাতুর উদ্দেশ্য হয় ঘি বা পানি মিশিয়ে সরাসরি খেয়ে ফেলা। আর উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার মাধ্যমে শ্রেণীর ভিন্নতা প্রকাশ পায়।] [সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাবে] আমরা বলব, বৃহত্তর উদ্দেশ্য হলো খাদ্যরূপে গ্রহণ করা, আর এ উদ্দেশ্য উভয়ের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। [সুতরাং উভয়ের শ্রেণী একই হবে।] আর আংশিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান না থাকে ধর্তব্য হবে না। যেমন- ভাজা গম এবং অভাজা গম এরূপভাবে উৎকৃষ্ট গম এবং পোকায খাওয়া গম [এওলে প্রত্যেকটি অপরটির সাথে একই শ্রেণীর দ্রব্য বলে গণ্য হয়, অথচ এর একটিতে যে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তা অপরটিতে পূর্ণরূপে হয় না]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ : আমাদের মতে পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। ইমাম আহমাদ (র.)-এর অভিमतও তাই। আর ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, পাত্র দ্বারা সমান সমান করে বিক্রয় করা হলেও আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হলো, আটা পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হলে উভয় দিকে সমান সমান করা সম্ভব হয় না। কেননা, পাত্রে পূর্ণ করার সময় চাপের ভারতম্বের কারণে একবার বেশি ধারণ করে আবার আরেকবার কম ধারণ করে, তাই উভয় দিকে পূর্ণরূপে সমান সমান করা সম্ভব হয় না। কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমবেশি হলে যেক্ষণ বিক্রয় হারাম হয় তদ্রূপ কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা (سُبْحَةُ الرِّبَا) -এর কারণেও বিক্রয় হারাম হয়। কাজেই পাত্রের ভিত্তিতে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

আর আমাদের দলিল হলো, পাত্র দ্বারা আটা পরিমাপ করা হলে উভয় দিকে সমান সমান করা সম্ভব হয়। আর যে সামান্য কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা ধর্তব্য হবে না। কেননা, এতটুকু কমবেশির সম্ভাবনা গমের বিনিময়ে গম বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও থাকে। কারণ, গমও চাপের ভারতম্বের কারণে একবার কম আবার আরেকবার বেশি ধারণ হতে পারে। অথচ সেক্ষেত্রে

সকলের ঐকমত্যে এ সম্ভাবনা দ্বর্ভব্য নয়; কাজেই আটার ক্ষেত্রেও দ্বর্ভব্য হবে না। [উল্লেখ্য, ফতোয়ার গ্রন্থ ذخيرة-এ ইমাম ফাযলী (র.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাত্র-পরিমাণের ভিত্তিতে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পাত্রে উভয় পক্ষের আটা ভালভাবে চেপে পূর্ণ করতে হবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন যে, অতিমতটি যথার্থ।]

قَوْلُهُ وَبِعَ الدَّقِيقِ بِالسُّوْنَى لَا يَجُوزُ: ছাত্তুর বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সমান সমান করেও জায়েজ নয়, আর কমবেশি করেও জায়েজ নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সমান সমান করেও বিক্রয় করা জায়েজ হবে এবং কমবেশি করেও বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ لَا تَمَّا جَسَانُ مَخْلِفَانِ: সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, গমের ছাত্তু এবং গমের আটা যদিও উভয়ের মূল এক ছিল, কিন্তু এখন প্রত্যেকটির শ্রেণী ভিন্ন হয়ে গেছে। কেননা, আটা এবং ছাত্তু দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। যেমন- আটা দ্বারা রুটি তৈরি করা হয়, কিন্তু ছাত্তু দ্বারা তা তৈরি হয় না। আর ছাত্তু পানিতে মিশিয়ে কিংবা ঘি বা চিনি দ্বারা মাখিয়ে খাওয়া হয়, কিন্তু আটা এভাবে খাওয়া হয় না। আর উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হয়। আর যখন আটা এবং ছাত্তুর শ্রেণী ভিন্ন বলে স্বাযুক্ত হলো তখন এগুলোর একটির বিনিময়ে অপরটি সমান সমান করে অথবা কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, শ্রেণী ভিন্ন হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ।

قَوْلُهُ لَئِنَّ لَا يَجُوزُ بَعِّ الدَّقِيقِ بِالسُّوْنَى: আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর স্বপক্ষে দুভাবে দলিল পেশ করা হয়। ১. ভাজা গমের বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা অথবা [অভাজা] গমের বিনিময়ে ছাত্তু বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ।

আর এ নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, ভাজা গম এবং আটার মাঝে তদ্রূপ অভাজা গম এবং ছাত্তুর মাঝে مُحَانَنَةٌ বা শ্রেণী এক হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে, তাই সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য। আর পাত্রের মাধ্যমে উভয়কে সমান সমান করা সম্ভব নয়, তাই বিক্রয় নাজায়েজ। সুতরাং আমাদের আলোচ্য সূরতও অর্থাৎ ছাত্তুর বিনিময়ে আটা বিক্রয় করাও নাজায়েজ হবে। কেননা, আটা হচ্ছে কেবল গমের গুড়া, তাতে অন্য কোনো পরিবর্তন হয়নি, আর ছাত্তু হচ্ছে ভাজা গমের গুড়া তাতেও অন্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর কোনো বস্তুর অংশসমূহকে বিক্ষিপ্ত কিংবা একত্রিত করার দ্বারা তার শ্রেণী পরিবর্তন হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রেও আটা ও ছাত্তুর মাঝে এক হিসেবে مُحَانَنَةٌ [একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি] বিদ্যমান আছে। সুতরাং সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য হবে। কিন্তু আটা বা ছাত্তু পাত্র দ্বারা মেপে সমান সমান করা সম্ভব হয় না; বরং কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে [কারণ একই পাত্রে ছাত্তুর তুলনায় আটা অধিক পরিমাণ ধারণ করানো যায়]। অতএব কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

২. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলিল হলো, ভাজা গমের বিনিময়ে স্বাভাবিক গম বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ। এ ক্ষেত্রেও কারণ তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। [অর্থাৎ উভয়ের মাঝে مُحَانَنَةٌ বিদ্যমান আছে, কিন্তু পাত্রের দ্বারা উভয়কে সমান সমান করা সম্ভব হয় না। কেননা, ভাজা গমের তুলনায় স্বাভাবিক গম পাত্রের মাঝে অধিক ধারণ করানো সম্ভব হয়।] সুতরাং ছাত্তুর বিনিময়ে আটা বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে। কেননা, আটা হচ্ছে স্বাভাবিক গমের বিক্ষিপ্ত অংশ আর ছাত্তু হচ্ছে ভাজা গমের বিক্ষিপ্ত অংশ। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো বস্তুর অংশসমূহকে বিক্ষিপ্ত কিংবা একত্রিত করার দ্বারা তার শ্রেণী পরিবর্তন হয় না। কাজেই এক হিসেবে مُحَانَنَةٌ বিদ্যমান আছে। অতএব, একই কারণে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় নাজায়েজ হবে। [উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর স্বপক্ষে কেবল প্রথম দলিলটিই উল্লেখ করেছেন।]

قَوْلُهُ قَلْنَا: مُعْظَمُ الْمَنْصُورِ وَهُوَ النَّفْثِيُّ يَنْهَلُهَا: সাহেবাইন (র.)-এর উল্লেখকৃত দলিলের জবাব হলো, আটা এবং ছাত্তুর মৌলিক উদ্দেশ্য এক, আর তা হলো খাদ্যরূপে গ্রহণ করা। কাজেই উভয়ের শ্রেণী (جِنْس) একই হবে। সুতরাং ক্ষুদ্র কিছু উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য দ্বর্ভব্য হবে না। যেমন- ভাজা গম এবং অভাজা গম সাহেবাইন (র.)-এর মতেও একই শ্রেণীভুক্ত, অথচ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা, অভাজা গম পিষে বা ভাঙ্গিয়ে রুটি বানানো হয়, কিন্তু ভাজা গম দ্বারা তা হয় না, আবার অভাজা গম বপন করে গম উৎপন্ন করা হয়, কিন্তু ভাজা গম দ্বারা তা হয় না। এরূপভাবে ভাল গম এবং পোকায় খাওয়া গম সাহেবাইন (র.)-এর মতেও একই শ্রেণীভুক্ত, অথচ এ দুটিও তাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এক, কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বুঝা গেল মৌলিক উদ্দেশ্য তথা খাদ্যরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এক হলেই একই শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য হবে। অতএব, আটা ও ছাত্তু একই শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ উভয়ের মাঝে مُحَانَنَةٌ বিদ্যমান আছে।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ (رحا) وَابْنِ يُونُسَ (رحا)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحا) : إِذَا بَاعَهُ بِلَحْمٍ مِنْ جِنْسِهِ لَا يَجُوزُ، إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّحْمُ الْمَفْرُزُ أَكْثَرَ لِيَكُونَ اللَّحْمُ بِمُقَابَلَةِ مَا فِيهِ مِنَ اللَّحْمِ، وَالْبَاقِي بِمُقَابَلَةِ السَّقَطِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ الرِّبَا مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ السَّقَطِ وَمِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ اللَّحْمِ فَصَارَ كَالْحَلِّ بِالسَّمِيسِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ بَاعَ الْمَوْزُونَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونَ، لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يَوْزَنُ عَادَةً وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ثِقَلِهِ بِالْوَزْنِ، لِأَنَّهُ يُخَفِّفُ نَفْسَهُ مَرَّةً وَيُسْقِلُ أُخْرَى، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، لِأَنَّ الْوَزْنَ فِي الْحَالِ يُعْرِفُ قَدْرَ الدَّهْنِ، إِذَا مِيزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّجِيرِ، وَيَوْزَنُ الشَّجِيرُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পশুকে যদি একই শ্রেণীর পশুর গোশতের বিনিময়ে বিক্রয় করে তাহলে জায়েজ হবে না, তবে যদি কাটা গোশত [জীবিত পশুটির গায়ে যতটুকু গোশত আছে তার চেয়ে] বেশি হয় তাহলে জায়েজ হবে। যাতে জীবিত পশুর গায়ে যতটুকু গোশত আছে তার বিনিময়ে কর্তিত গোশত থেকে ততটুকু ধরা যায়, আর কর্তিত গোশতের বাকিটুকু পশুর গায়ে যে [গোশত ছাড়া] অন্যান্য অংশ রয়েছে [যেমন- চামড়া, ভুঁড়ি, খুরা ইত্যাদি] তার বিনিময়ে ধরা যায়। কেননা, যদি এরূপ [কর্তিত গোশত বেশি] না হয়, তাহলে হয়তো পশুর অন্যান্য অংশ বেশি হওয়ার দিক থেকে নতুবা পশুর গোশত [কর্তিত গোশতের চেয়ে] বেশি হওয়ার দিক থেকে 'রিবা' সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব, এটা তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয়ের মতো হলো। আর শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এখানে বিক্রোতা ওজন-পরিমাপিত নয় এমন বস্তুর বিনিময়ে ওজন-পরিমাপিত বস্তু বিক্রয় করেছে। কেননা, পশু সাধারণত ওজন করে পরিমাপ করা হয় না, আর মাপের মাধ্যমে পশুর ওজন জানা সম্ভবও হয় না। কারণ, পশু কখনও নিজেকে হালকা করে ফেলে, আবার কখনও নিজেকে ভারী করে ফেলে। পক্ষান্তরে সরিষা ও তেলের মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা, তৎক্ষণাৎ [চুক্তির সময়] সরিষা পরিমাপ করা-ই [তার ভিতরে নিহিত] তেলের পরিমাণ জানিয়ে দেবে যখন তার তেল ও খৈল আলাদা করা হবে এবং শুধু খৈল মেপে দেখা হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ : জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমামগণের অভিমত : জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত হলো, যে প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় করা হবে গোশত যদি একই শ্রেণীর প্রাণীর হয়ে থাকে [যেমন- বকরির বিনিময়ে বকরির গোশত কিংবা গরুর বিনিময়ে গরুর গোশত] তাহলে কোনো সুরতেই তা জায়েজ হবে না। আর যদি উক্ত গোশত অন্য শ্রেণীর

প্রাণীর হয়ে থাকে [যেমন- জীবিত বকরির বিনিময়ে গরুর গোশত কিংবা জীবিত গরুর বিনিময়ে বকরির গোশত] তাহলে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে, আর ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ ক্ষেত্রে দুটি অভিমত বর্ণিত আছে তন্মধ্যে বিতর্কিতম অভিমত হলো, জায়েজ হবে না।

আমাদের ইমামগণের অভিমত : প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের কয়েকটি সূরত হতে পারে।

১. এক শ্রেণীর প্রাণীর গোশত অন্য শ্রেণীর জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা [যেমন- গরুর গোশত জীবিত বকরির বিনিময়ে বিক্রয় করা]। এ সূরতে আমাদের ইমামগণের সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে, চাই যে কোনো পক্ষ গোশত কম হোক বা বেশি হোক।
২. কোনো প্রাণীর গোশত একই শ্রেণীর প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা [যেমন- বকরির গোশত বকরির বিনিময়ে বিক্রয় করা] কিন্তু প্রাণীটি জবাইকৃত এবং চামড়া, খুর, হুঁড়ি ইত্যাদি তার থেকে পৃথক করা হয়েছে। এ সূরতে যদি জবাইকৃত আন্ত প্রাণীটির ওজন অপর দিকের গোশতের সমান হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে, নতুবা জায়েজ হবে না। কেননা, উভয়টা এখন ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য এবং উভয়ের শ্রেণী এক, তাই সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য।
৩. এ সূরতটি দ্বিতীয় সূরতের অনুরূপ, তবে জবাইকৃত প্রাণীটির চামড়া, খুর, হুঁড়ি ইত্যাদি (سَنْط) তার থেকে পৃথক করা হয়নি। এ সূরতে সকলের ঐকমত্যে যদি জবাইকৃত প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান গোশতের তুলনায় অপর পক্ষের গোশত পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে নতুবা জায়েজ হবে না।
৪. কোনো প্রাণীর গোশত একই শ্রেণীর জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা [যেমন- জীবিত বকরির বিনিময়ে বকরির গোশত বিক্রয় করা কিংবা জীবিত গরুর বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রয় করা] এ সূরতটির বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে গোশত কম হোক বা বেশি হোক উভয় অবস্থায়ই বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে কজা বা গ্রহণ করতে হবে কিংবা নির্দিষ্ট করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ সূরতে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, জীবিত প্রাণীটির মাঝে যতটুকু গোশত আছে তার তুলনায় অপর পক্ষের কাটা গোশত পরিমাণে বেশি হতে হবে। আর যদি সমান সমান হয় কিংবা কম হয়, তাহলে জায়েজ হবে না। উল্লেখ্য আমাদের আলোচ্য ইবারাতে শুধু এ চতুর্থ সূরতটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيَكُونَ اللَّحْمُ سَعْبًا بَلَدًا مَا فِيهِ مِنَ اللَّحْمِ الْخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যদি প্রাণীটির মাঝে যে পরিমাণ গোশত আছে যদি তার চেয়ে অপর পক্ষের কাটা গোশতের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে জায়েজ হবে। তার কারণ হলো, জীবিত প্রাণীটির মাঝে গোশতও আছে এবং অন্যান্য দ্রব্য যেমন- চামড়া, হুঁড়ি, খুর ইত্যাদিও আছে। কাজেই প্রাণীটির মাঝে যতটুকু গোশত আছে তার বিনিময়ে সমপরিমাণ অপর পক্ষের কাটা গোশত থেকে ধরা হবে। আর কাটা গোশতের মাঝে যতটুকু বেশি আছে তা উক্ত চামড়া, হুঁড়ি, খুর ইত্যাদির বিনিময়ে ধরা হবে, এভাবে ধরা হলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না, ফলে বিক্রয় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে যদি কাটা গোশতের পরিমাণ প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান গোশতের সমান হয় কিংবা কম হয়, তাহলে কাটা গোশতের সমপরিমাণ প্রাণীটির গোশত বিনিময়ে ধরার পর প্রাণীটির মাঝে যে অতিরিক্ত জ্বিনিসত্তো রয়েছে [চামড়া, হুঁড়ি, খুর ইত্যাদি] অথবা তার সাথে কিছু গোশত অতিরিক্ত সাব্যস্ত হচ্ছে। আর এটা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে। তাই বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ نَصَارَ كَانَعَلَى بِالْخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের এ সূরতটি তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয়ের মতোই হলো। অর্থাৎ যদি তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয় করা হয়, তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতেও তা জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তিলের মধ্যে যে পরিমাণ তেল বিদ্যমান আছে তার চেয়ে অপর পক্ষের তেল বেশি হতে হবে। যাতে উভয় দিকের তেল সমান সমান ধরা যায়, আর অতিরিক্ত তেলটুকু তিলের মাঝে বিদ্যমান থেলের বিনিময়ে ধরা যায়। ফলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। কাজেই আমাদের আলোচ্য প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের মাসআলাটিও একই হবে।

قَوْلُهُ وَلَهِيَ أَنْ بَاعَ الْمَرْذُوقَ بِمَا لَيْسَ بِمَرْذُوقٍ الْح: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, আলোচ্য সূরতে জীবিত প্রাণীটির গোশত এবং কাটা যদি একই শ্রেণী (جنس) -এর ধরা হয় তবুও উভয়ের পরিমাণ মাধ্যম (قَدْر) এক নয়। কেননা, গোশত পরিমাণ করা হয় ওজন মেপে, পক্ষান্তরে প্রাণী ওজন মেপে পরিমাণ করা হয় না। আর ওজন মেপে তার সঠিক পরিমাণ জানাও সম্ভব হয় না। কেননা, প্রাণী কখনও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে ভাঙ্গী করে ফেলে আবার কখনও শক্তি প্রয়োগ না করার মাধ্যমে নিজেকে হালকা করে ফেলে। তাই তার সঠিক ওজন মাপার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং যখন উভয়ের পরিমাণ মাধ্যম এক নয় তখন 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার عِلَّتْ [কারণ] -এর দুটি বিষয় الْقَدْرُ [শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাণ মাধ্যম এক হওয়া]-এর একটি পাওয়া গেছে, আর একটি পাওয়া যায়নি। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইল্লাভের একটি বিষয় পাওয়া গেলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ, তবে বাকি বিক্রয় নাজায়েজ। সুতরাং আলোচ্য সূরতে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হবে, বাকি বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দাবি অনুসারে জীবিত প্রাণীর গোশত এবং কাটা গোশতের শ্রেণী এক মেনে নিয়ে জবাব দিয়েছেন। অন্যথায় ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জীবিত প্রাণীর গোশত এবং কাটা গোশতের শ্রেণী ভিন্ন এবং উভয়ের পরিমাণ-মাধ্যমও ভিন্ন। তবে শ্রেণী ও পরিমাণ মাধ্যম উভয়টা ভিন্ন হলে বাকি বিক্রয়ও জায়েজ হওয়ার কথা, কিন্তু আলোচ্য সূরতে বাকি বিক্রয় জায়েজ নয়- তার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য বাকি হলে বিক্রয়টি 'বায় সলম'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর গোশত কিংবা প্রাণীর মাঝে 'বায় সলম' জায়েজ নয়।

-[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الْح: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লেখকৃত কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের বিষয়টি তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয়ের মতো নয়। কারণ হলো, বিক্রয়ের সময় তিলের ওজন মাপা সম্ভব এবং তিলের ওজন মাপার মাধ্যমে তাতে কতটুকু তেল রয়েছে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে যখন তা ভাঙ্গিয়ে তার তৈল মেপে দেখা হবে। কাজেই উভয়টির পরিমাণ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে। আর উভয়ের শ্রেণী (جنس)ও এক। অতএব উভয় দিকের তেলের পরিমাণ সমান সমান হওয়া আবশ্যিক। আর তিলের মাঝে বিদ্যমান তৈলের বিনিময়ে অপর পক্ষে কিছু অতিরিক্ত তেল থাকা আবশ্যিক। পক্ষান্তরে গোশত ও প্রাণীর বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা, প্রাণীটির ওজন মাপা সম্ভব নয় এবং সাধারণত তার ওজন মাপা হয় না। কাজেই উভয়ের পরিমাণ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে না।

এছাড়া শায়খাইন (র.)-এর মতে জীবিত প্রাণী ও কাটা গোশত একই শ্রেণীভুক্ত নয়। কারণ, একটি নিশাপ জড়পদার্থ আর অপরটি হচ্ছে জীবিত প্রাণী। পক্ষান্তরে তিল এবং তিলের তেল একই শ্রেণীভুক্ত। কেননা, এ ক্ষেত্রে তেল হচ্ছে তিলের বিভক্ত অংশ। আর শুধু অংশ বিভক্ত হওয়ার দ্বারা শ্রেণী পরিবর্তন হয় না। আর গোশত শুধু বিভক্ত অংশই নয়; বরং তা প্রাণহীন জড়পদার্থে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার উপর ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসমূহের মাঝে কিছু রয়েছে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত, আর কিছু রয়েছে দুর্বল সনদে বর্ণিত। শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে একটি হচ্ছে মুয়াত্তা মালিক ও মারাসীলে আবু দাউদ এহুয়ে হযরত সায়ীদ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ - হাদীসটি মুরাসাল হলেও শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) থেকে মুরাসাল সনদে বর্ণিত হাদীস- وَكَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النّٰعِمِ بِالْعَبْرَانِ - এ হাদীসটি মুরাসাল হাদীস সকলের একমতো গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় আরেকটি হাদীস হযরত সামুরাহ (রা.) থেকে ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন- عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَبَاعَ الشَّاءُ بِالنّٰعِمِ - এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করার পর বলেছেন إِنْ شَاءَ صَحِيحٌ -এর সনদ সহীহ।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এ হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন; কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর কোনো জবাব উল্লেখ করেননি।



قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ (رحا) وَقَالَ : لَا يَجُوزُ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ أَوْ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ (ع) لَا إِذَا وَلَهُ أَنَّ الرُّطْبَ تَمَرٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَهْدَى إِلَيْهِ رُطْبًا ، أَوْ كُلُّ تَمَرٍ خَيْرٌ هَكَذَا : سَمَاهُ تَمَرًا ، وَيَبِيعُ التَّمَرُ بِمِثْلِهِ جَائِزٌ ، لِمَا رَوَيْنَا ، وَلَئِنَّهُ لَوْ كَانَ تَمَرًا جَازَ الْبَيْعُ بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَمَرٍ فَيَاخِرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا اخْتَلَفَ النَّوعَانِ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَمَدَارُ مَا رَوَاهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّفْلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাকা তাজা খেজুর সমান সমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা, নবী করীম (র.)-কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'যখন তাজা খেজুর শুকিয়ে যায় তখন কি তা [ওজনে] কমে যায়?' বলা হলো, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, 'তাহলে না' [অর্থাৎ জায়েজ হবে না]। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, رُطْبٌ [তাজা খেজুর]-কে تَمَرٌ [খেজুর বা শুকনো খেজুর] বলা হয়। কেননা, নবী করীম ﷺ-কে যখন رُطْبٌ [তাজা খেজুর] হাদিয়া দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আমাদের সমস্ত تَمَرٌ কি এরূপই হয়ে থাকে?' নবী করীম ﷺ এখানে رُطْبٌ-কে تَمَرٌ বলে উল্লেখ করেছেন। আর আমাদের পূর্বে বর্ণিত হাদীস (التَّمَرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ) এর কারণে تَمَرٌ সমপরিমাণ তَمَرٌ-এর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। তাছাড়া এ কারণে যে, যদি تَمَرٌ 'রুতাব খেজুর' বলে গণ্য হয়, তাহলে উক্ত হাদীসের প্রথমংশের কারণে জায়েজ হবে। আর যদি তা (رُطْبٌ)-এর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তাহলে উক্ত হাদীসের শেষাংশের কারণে জায়েজ হবে। আর শেষাংশ হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণীর এই অংশ- إِذَا اخْتَلَفَ النَّوعَانِ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ 'যদি দ্রব্যদ্বয়ের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার।' আর সাহেবাইন (র.) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার সনদের ভিত্তি হলো যাকে ইবনে আইয়্যাসের উপর, আর তিনি হাদীস সংকলকদের মতে গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে দুর্বল ব্যক্তি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطْبِ الْحِ : تَمَرٌ বলা হয় পাকা তাজা খেজুরকে আর تَمَرٌ বলা হয় পাকা শুকনো খেজুরকে। শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে تَمَرٌ [শুকনো খেজুর]-এর বিনিময়ে رُطْبٌ [তাজা খেজুর] সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ। আর অন্যান্য সকল ইমামগণ তাহা ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে تَمَرٌ-এর বিনিময়ে رُطْبٌ কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয় এবং সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ يَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَنَّ سَيْلٌ عَنْهُ الْخ : ইমাম আবু হানীফা (র.) ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণের দলিল মুয়াত্তা মালিক, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী শরীফে হযরত সা'আদ ইবনে আদী ওয়াহ্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস, হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي قَرَّاسٍ (رَضِيَ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْتَقَضِ الرُّطْبُ إِذَا جَفَّ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .

“হযরত সা'আদ ইবনে ওয়াহ্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাজা খেজুর কি শুকনো হলে কমে যাবে? প্রশ্নকারী বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এরূপ বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করলেন।” ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন- “হাদীসটির সনদ হাসান, সহীহ”।

مُسَانِنُف (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষে দুটি দলিল পেশ করেছেন। প্রথম দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-কে رُطْبُ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন تَمْر ਕਿ এরূপই হয়ে থাকে? এ হাদীসে নবী করীম ﷺ-কে رُطْبُ বলে উল্লেখ করেছেন। এ ঘারা বুঝা গেল যে, تَمْر বলা হয় সাধারণ খেজুরকে। কাজেই رُطْبُ-ও تَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যখন رُطْبُ [তাজা খেজুর] বা সাধারণ খেজুর-এর অন্তর্ভুক্ত তখন একটির বিনিময়ে অপরটি সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন- “التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَمِثْلًا بِمِثْلٍ” “তমর খেজুরের বিনিময়ে তমর খেজুর বিক্রয় করতে হবে সমান সমান করে”।

উল্লেখ্য, আত্মা ইবনে হুমাম এবং আত্মা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উল্লিখিত দলিলটি তখনই সঠিক হতো যদি উক্ত হাদীসটির রেওয়ায়েতে এ কথা থাকতো যে, নবী করীম ﷺ-এর সামনে যে খেজুর দেওয়া হয়েছিল তা رُطْبُ ছিল। অথচ উক্ত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রাহ ও হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে উল্লেখ আছে যে, উক্ত খেজুর ছিল تَمْر বা শুকনো খেজুর। হাদীসটি নিম্নরূপ-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدَى الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاثْمَعْلَهُ عَلَى خَبِيرٍ فَقَدَّ يَخْتَرُ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتَ تَمْرَ خَبِيرٍ هَكَذَا ؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْكُلُ الْعَصَاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَتَيْنِ مِنَ الْجَنَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ يُمُتُّوْا هَذَا وَاشْتَرَوْا بِتَمَرِهِمْ مِنْ هَذَا .

“রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আদী আল-আনসারীর এক ব্যক্তিকে কর উসূলকারী রূপে খায়বারে প্রেরণ করলেন। সে উৎকৃষ্টমানের শুকনো খেজুর নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সকল খেজুর কি এরূপই হয়ে থাকে? উত্তরে সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! না; বরং আমাদের নিকৃষ্টমানের দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এরূপ এক সা' খেজুর পরিবর্তন করে আনি। .....।”

رُطْبُ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষে দ্বিতীয় দলিল হলো, رُطْبُ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ উভয়ের শ্রেণী (جنس) হয় এক ধরা হবে অথবা ভিন্ন ধরা হবে, এছাড়া আর কোনো সুরত হতে পারে না। যদি উভয়ের শ্রেণী এক ধরা হয়, তাহলে এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত ‘রিবা’ সংক্রান্ত মূল হাদীস... الخ. -এর প্রথমাংশের কারণে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ সাব্যস্ত হবে। কেননা, প্রথমাংশে বলা হয়েছে تَمْر-এর বিনিময়ে تَمْر বিক্রয় করতে হবে সমান সমান করে।

আর যদি উভয়ের শ্রেণী তিন ধরা হয়, তাহলে উক্ত হাদীসের শেষাংশের কারণে যে কোনোভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, শেষাংশে বলা হয়েছে- "وَاِذَا اَخْتَلَفَ التَّوْعَانِ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ" "আর যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী তিন হয়, তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার"।

উল্লেখ্য, এ দলিলটি মুসান্নিফ (র.) এখানে যেভাবে উল্লেখ করেছেন ঠিক সেভাবে মাবসূত গ্রন্থে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। মাবসূতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) যখন বাগদাদে আগমন করলেন, তখন সেখানকার লোকেরা তাঁকে رُطْبُ-এর বিনিময়ে ثَمَر বিক্রয়ের উক্ত মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন, رُطْبُ যদি ثَمَر-এর শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর বাণী اَلْتَّمَرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِسِمْنٍ-এর কারণে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর رُطْبُ যদি ثَمَر-এর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর বাণী اَخْتَلَفَ التَّوْعَانِ فَبَيْعُوا-এর কারণে বিক্রয় জায়েজ হবে। তখন প্রশ্নকারীরা رُطْبُ-এর বিনিময়ে ثَمَر বিক্রয় নিষেধ সংক্রান্ত পূর্বাভাস সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাদীসটি পেশ করে বললেন যে, নবী করীম ﷺ তো رُطْبُ-এর বিনিময়ে ثَمَر বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। উত্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) বললেন, হাদীসটির সনদের মূল বর্ণনাকারী হচ্ছেন য়ায়েদ ইবনে আইয়্যাহু, আর তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা হচ্ছে আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.) নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। আর رُطْبُ এবং ثَمَر-কে তিনি একই শ্রেণীর গণ্য করেছেন। আর উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হলে যে সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য সেক্ষেত্রে তিনি বিক্রয়ের সময় সমান সমান করা সম্ভব হলেই যথেষ্ট মনে করেন। সুতরাং পরবর্তীতে যদি এক পক্ষের দ্রব্য গুণকিমে কম যায় তা তাঁর মতে ধর্তব্য হবে না। অতএব, رُطْبُ এবং ثَمَر যেহেতু বিক্রয়ের সময় সমান সমান করা সম্ভব, তাই তার বিক্রয় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে ভাজা গম এবং অভাজা গম একই শ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও একাটির বিনিময়ে অপরাট বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, বিক্রয়ের সময়ই এদের উভয়কে সমান সমান করা সম্ভব হয় না। কারণ, এদের একটি পাড়ে বেশি ভর্তি করা যায় আর অপরাট কম ভর্তি করা যায়।

مُسَانِنِيف (র.) সাহেবাইন ও জমহূরের পক্ষ থেকে উল্লিখিত হাদীসের জবাব দিচ্ছেন যে, উক্ত হাদীসটির مَدَار বা সনদের মূল বর্ণনাকারী হচ্ছেন য়ায়েদ ইবনে আইয়্যাহু। আর য়ায়েদ ইবনে আইয়্যাহু হাদীসবিশাদরগণের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী, কাজেই তার বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম, আল্লামা য়াযলায়ী, আল্লামা আযনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে য়ায়েদ ইবনে আইয়্যাহু হাদীসবিশাদরগণের মতে দুর্বল কিংবা মজহুল বর্ণনাকারী নন, বরং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। কাজেই যদি হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আলোচ্য মাসআলায় জমহূরের দলিলই বেশি শক্তিশালী হবে। [অনুবাদক]

তবে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জবাব দেওয়া হয় যে, নবী করীম ﷺ যে, رُطْبُ-এর বিনিময়ে ثَمَر বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তা বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে উক্ত হাদীসটি يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ-এর বর্ণনায় এভাবে আছে- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالرُّطْبِ نَيْبَةً- "নবী করীম ﷺ رُطْبُ-এর বিনিময়ে ثَمَر বাকিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"। হাদীসটি এভাবে আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম, তাহাবী ও দারাকুতনীতে বর্ণিত হয়েছে। আর উক্ত يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, কাজেই তার বর্ণিত অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হবে। তবে উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে শুধু বাকির ক্ষেত্রে ধরলে নবী করীম ﷺ-এর বাণী اَلْيَتَمُّ الرُّطْبُ اِذَا جَعَلَ- "রুতাব গুণকিমে গেলে কি কমে যাবে?"-এর কোনো ফায়দা বা অর্থ থাকে না। কেননা, গুণকনের পরে যদি না কমে তাহলেও বাকি বিক্রয় হারাম।

قَالَ : وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّرِيْبِ ، يَغْنَى عَلَى هَذَا الْخَلْقِ ، وَالْوَجْهَ مَا بَيْنَهُ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ بِالْإِتْفَاقِ إِعْتِبَارًا بِالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ ، وَالرُّطْبِ بِالرُّطْبِ يَجُوزُ مَتَمَثِّلًا كَيْلًا عِنْدَنَا ، لِأَنَّهُ بَيْعُ التَّمْرِ ، بِالتَّمْرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এরূপভাবে কিসমিসের বিনিময়ে আঙ্গুর বিক্রয় করার বিধানও একই। অর্থাৎ এটাও এরূপ মতবিরোধপূর্ণ। আর [উভয় পক্ষে] কারণ তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর কেউ কেউ কাঁচা গমের বিনিময়ে ভাজা গম [বিক্রয়ের বিধান]-এর উপর কিয়াস করে বলেছেন যে, এটা সকলের একমতের নাজায়েজ। আর তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করা আমাদের মতে জায়েজ হবে। [ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না।] কেননা, এটা খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ الْخ : উপরিউক্ত ইবারতে কয়েকটি মাসাআলা বর্ণনা করা হয়েছে—

১. بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّرِيْبِ - কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা। উল্লেখ্য, কিসমিস হলো শুকনো আঙ্গুর।
২. بَيْعُ الرُّطْبِ بِالرُّطْبِ - তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা।
৩. بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرُّطْبَةِ أَوْ الْمَقْلُوَّةِ بِبَيْنِهَا - তাজা বা ভেজা গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।
৪. بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرُّطْبَةِ أَوْ الْمَقْلُوَّةِ بِأَنْبَاسَةٍ - শুকনো গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।
৫. بَيْعُ التَّمْرِ أَوْ الزَّرِيْبِ الْمُتَّفَعِ بِالْمُتَّفَعِ مِنْهَا - ভেজানো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ভেজানো শুকনো খেজুর বিক্রয় করা কিংবা ভেজানো কিসমিসের বিনিময়ে ভেজানো কিসমিস বিক্রয় করা।

ইমামগণের মতভেদ :

প্রথম মাসআলা : তথা কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম কুদুরী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, تَمْر -এর বিনিময়ে رُطْبُ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ মতবিরোধ এ ক্ষেত্রে ঠিক সেরূপ মতবিরোধ। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পাত্রের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ, আর সাহেবাইন (র.) মতে কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয় এবং সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ وَالْوَجْهَ مَا بَيْنَهُ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দলিল তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণিত করেছি। তমর -এর বিনিময়ে رُطْبُ বিক্রয়ের মাসআলায় উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কিসমিস এবং আঙ্গুরের শ্রেণী (جنس) এক। কাজেই সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, 'রিবা' সংক্রান্ত মূল হাদীস التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِنْ جُزِيَ فَيُقْبَلُ تَمْرٌ فَقَالَ -এর কারণে। আর যদি উভয়ের শ্রেণী এক ধরা না হয়, তাহলে তো কমবেশি করেও বিক্রয় করা জায়েজ হবে উক্ত হাদীসের শেষাংশ كَيْفَ نُسْتَمُّ إِذَا اُخْتَلَفَ النَّوَاعِي فَيُسْعَوُ كَيْفَ نُسْتَمُّ -এর কারণে। আর সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, তাজা আঙ্গুর যেহেতু শুকানোর পর কমে যাবে তাই পূর্বের تَمْر -এর বিনিময়ে رُطْبُ বিক্রয় নাজায়েজ হওয়া সংক্রান্ত যারূদ ইবনে আইয়্যাদের হাদীসের কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। হাদীসটির শেষাংশ হলো- إِنْ جُزِيَ فَيُقْبَلُ تَمْرٌ فَقَالَ "عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِذَا" বললেন, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না।"

قَوْلُهُ وَيُحْزَرُ بِالْإِغْفَارِ الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, কারো কারো মতে এ মাসআলাটি অর্থাৎ কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা আমাদের ইমামগণের ঐকমত্যে নাজায়েজ। [অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)ও এ ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.)-এর সাথে একমত।]

আর এ নাজায়েজ হওয়ার দলিল হলো, তাজা গমের বিনিময়ে তাজা গম বিক্রয়ের মাসআলার উপর কিয়াস। অর্থাৎ তাজা গমের বিনিময়ে তাজা গম বিক্রয় করা যেহেতু সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ [এ মাসআলা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে] তদ্রূপ শুকনো আঙ্গুর তথা কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা নাজায়েজ হবে।

অবশ্য এ যেভাবেই অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় بَيْعُ الْوَسْبِ (بَيْعُ الرُّطْبِ بِالْمُتَرِّ) এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় (بَيْعُ الرُّطْبِ بِالْمُتَرِّ) এ দু মাসআলার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা আবশ্যিক। কেননা, উভয়টি একই রকম হওয়া সত্ত্বেও এ রেওয়াজেটি অনুসারে কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা নাজায়েজ, আর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা জায়েজ। পার্থক্যটি হলো, رُطْبٌ শব্দটি رُطْبٌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তাই এদের উভয়ের পার্থক্য ধর্তব্য হবে না, সুতরাং উভয় দিকে সমান সমান হয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে زَيْبٌ শব্দটি عَنَبٌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, কাজেই এদের উভয়ের তারতম্য ধর্তব্য হবে। সুতরাং উভয় দিকে সমতা না পাওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয়ের মাসআলায় আদ্বামা ইবনে হমাম (র.) উল্লিখিত দুটি রেওয়াজেতে ছাড়া আরো দুটি রেওয়াজেতে উল্লেখ করেছেন।-[ফাতহুল কাদীর]

দ্বিতীয় মাসআলা :

قَوْلُهُ وَالرُّطْبُ بِالرُّطْبِ يَحْزَرُ مُتَسَاوِلًا كَيْدًا الْخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলা তথা তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের সকলের ঐকমত্য হলো যে, পাত্রের মাধ্যমে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও আমাদের মতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কমবেশি করেও বিক্রয় জায়েজ নয় এবং সমান সমান করেও বিক্রয় করা জায়েজ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, رُطْبٌ [তাজা খেজুর] সমান সমান করে বিক্রয় করা হলেও শুকানোর পর তা সমান সমান নাও থাকতে পারে। কেননা, খেজুর কোনোটি বেশি শুকায় আবার কোনোটি কম শুকায়। কাজেই বিক্রয়ের সময় সমান সমান থাকা যথেষ্ট হবে না; বরং শুকানোর পর উভয় দিকের খেজুর সমান থাকা আবশ্যিক। আর এক্ষেত্রে শুকানোর পর যেহেতু সমান সমান থাকবে কিনা তা জানা যাচ্ছে না, তাই বিক্রয় জায়েজ হবে না। সুতরাং এ সুরতটিও তাজা গমের বিনিময়ে অভাজা গম বিক্রয়ের মতোই হলো যা হানাফীগণের মতেও নাজায়েজ।

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.) তাজা খেজুরের ন্যায় অন্যান্য যে সকল ফল শুকানোর পর কমে যায়, সে সকল ফলের ক্ষেত্রেও একই অভিমত পোষণ করেন।

আমাদের দলিল হলো, رُطْبٌ-কে تَمْرٌও বলা হয়, আর تَمْرٌ-এর বিনিময়ে تَمْرٌ বিক্রয় করা জায়েজ হওয়া التَّمْرُ بِالْمُتَرِّ مِنْلَا يَسْنُو هাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

وَكَذًا بَيْعُ الْجَنْطَةِ الرُّطْبَةِ أَوْ الْمَبْلُورَةِ بِمِثْلِهَا أَوْ بِالنَّيَّاسَةِ أَوْ الشَّمْرِ أَوْ الزَّرْبِ  
 الْمُنْعِ بِالنَّمْعِ مِنْهُمَا مُتَمَاثِلًا عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَأَبْنِ يُونُسَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ  
 (رح) لَا يَجُوزُ جَمْعُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْمَسَاوَةُ فِي أَعْدِلِ الْأَحْوَالِ، وَهُوَ الْمَالُ، وَأَبْنُ  
 حَنِيفَةَ (رح) يُعْتَبَرُ فِي الْحَالِ، وَكَذَا أَبُو يُونُسَ (رح) عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْحَوِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ  
 تَرَكَ هَذَا الْأَصْلَ فِي بَيْعِ الرُّطْبِ بِالشَّمْرِ، لِمَا رَوَيْنَاهُ لَهُمَا، وَجَهَ الْفَرْقَ لِمُحَمَّدٍ  
 (رح) بَيْنَ هَذِهِ الْفُصُولِ وَبَيْنَ الرُّطْبِ بِالرُّطْبِ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهَا يَظْهَرُ مَعَ بَقَاءِ  
 الْبَدَلَيْنِ عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي عَقِدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَفِي الرُّطْبِ بِالشَّمْرِ مَعَ بَقَاءِ أَحَدِهِمَا  
 عَلَى ذَلِكَ، فَيَكُونُ تَفَاوُتًا فِي عَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَفِي الرُّطْبِ بِالرُّطْبِ التَّفَاوُتُ  
 بَعْدَ زَوَالِ ذَلِكَ الْإِسْمِ، فَلَمْ يَكُنْ تَفَاوُتًا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَلَا يُعْتَبَرُ -

অনুবাদ : এরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তাজা গম বা ভেজা গম তদ্রূপ গমের বিনিময়ে বা শুকনো গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা কিংবা পানিতে ভেজানো খেজুর বা কিসমিস তদ্রূপ খেজুর বা কিসমিসের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এগুলো সবই নাজায়েজ। কেননা, তিনি [উক্ত দ্রব্যগুলোর] সর্বাধিক স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় দিকে সমান সমান হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেন। আর সর্বাধিক স্বাভাবিক অবস্থা হলো, পরিশেষের অবস্থা [অর্থাৎ শুকনো অবস্থা]। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) বর্তমান অবস্থায় [সমান সমান হওয়ার বিষয়] বিবেচনা করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-ও তাই বিবেচনা করেন। [তারা এ বিবেচনা করেন 'রিবা' সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ] শর্তমুক্ত হাদীসের উপর আমল করার ভিত্তিতে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বিবেচনার এ নীতিটি **تَمَرٌ**-এর বিনিময়ে **رُطْبٌ** বিক্রয়ের মাসআলায় পরিহার করেছেন সেই হাদীসটির কারণে যা আমরা [উক্ত মাসআলায়] সাহেবাইন (র.)-এর স্বপক্ষে বর্ণনা করেছি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী এখানে উল্লিখিত সুরতগুলো এবং তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়ের সুরতের মাঝে পার্থক্য হলো, এখানে উল্লিখিত সুরতগুলোতে চুক্তির সময় উভয় দিকের দ্রব্যদ্বয়ের যে নাম ছিল সে নাম বহাল থাকা অবস্থায়-ই [শুকানোর পর] উভয় দ্রব্যের মাঝে তারতম্য প্রকাশ পায়। [তদ্রূপ] **تَمَرٌ**-এর বিনিময়ে **رُطْبٌ** বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দিকের দ্রব্য (**تَمَرٌ**) তার নামের উপর বহাল থাকা অবস্থায়ই [উভয় দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে]। সুতরাং এ সকল সুরতে যে দ্রব্যের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে হুবহু সেই দ্রব্যই তারতম্য প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে **رُطْبٌ** [তাজা খেজুর]-এর বিনিময়ে **رُطْبٌ** বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তারতম্য প্রকাশ পায় ঐ নাম (**رُطْبٌ**) বিলুপ্ত হওয়ার পর। কাজেই যে দ্রব্যের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে হুবহু তাতে তারতম্য প্রকাশ পায়নি। সুতরাং সে তারতম্য ধর্তব্য হবে না।

### শ্রাসজিক আলোচনা

الْح : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাসআলা বর্ণনা করছেন।

তৃতীয় মাসআলা : بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرُّطْبَةِ أَوْ الْمَبْلُولَةِ بِمَنْلِهَا - তাজা বা ভেজানো গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।

চতুর্থ মাসআলা : بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرُّطْبَةِ أَوْ الْمَبْلُولَةِ بِالْبَاسَةِ - শুকনো গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।

পঞ্চম মাসআলা : بَيْعُ النَّرِّ أَوْ الزَّيْبِ الْمُنْعَعِ بِالْمُنْعَعِ مِنْهَا - ভেজানো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে অভেজানো শুকনো খেজুর বিক্রয় করা কিংবা ভেজানো কিসমিসের বিনিময়ে অভেজানো কিসমিস বিক্রয় করা।

এ তিনটি সুরতেই ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে পাত্র দ্বারা মেপে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের অনুরূপ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, তিনি উভয় দিকে একই শ্রেণীর দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য মনে করেন দ্রব্যটির সর্বাধিক স্বাভাবিক অবস্থায় (فِي أَصْلِ الْأَحْوَالِ)। আর তা হলো, দ্রব্যটি শুকানোর পরের অবস্থা। কেননা, নবী করীম ﷺ তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, আর এ নিষেধের কারণ ছিল তাজা খেজুর শুকানোর পর কমে যাওয়া। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুকানোর পর সমান সমান হওয়া আবশ্যক। কাজেই বিক্রয়ের সময় যদি দ্রব্যটি শুকনো অবস্থায় না থাকে তাহলে পাত্র মেপে সমান সমান করা হলেও তা যথেষ্ট হবে না; বরং শুকানোর পর সমান সমান হওয়া অপরিহার্য। আর শুকানোর পর উভয় দিকের দ্রব্য সমান সমান হবে কিনা তা যেহেতু জানা সম্ভব হয় না, তাই বিক্রয় জায়েজ হবে না।

الْح : আর ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) সমান সমান হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য মনে করেন বিক্রয়ের সময়। কেননা, 'রিবা' সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীস- النَّارُ بِالنَّارِ مِثْلًا بِمَنْلِهَا -এ সমান সমান করে বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিক্রয়ের সময় সমান সমান থাকলেই যথেষ্ট হবে।

الْح : بَيْعُ الرُّطْبِ -এর বিনিময়ে رُطْبُ : তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) : بَيْعُ الرُّطْبِ : তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) : بَيْعُ الرُّطْبِ : তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) : বক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় সমান সমান হলেও তিনি নাজায়েজ বলেন, অথচ তাঁর মতে বিক্রয়ের সময় সমান সমান হলে জায়েজ হওয়ার কথা। এর কারণ হলো, رُطْبُ -এর বিনিময়ে رُطْبُ বিক্রয় যেহেতু হযরত সা'আদ ইবনে ওয়াহ্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে [যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে] তাই ক্রয়সের পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের কারণে নাজায়েজ হয়েছে। আর আলোচ্য মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু হাদীস বিদ্যমান নেই, তাই ক্রয়সের দাবি অনুসারে বিক্রয় জায়েজ হবে।

الْح : بَيْعُ الرُّطْبِ بِالرُّطْبِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তো ফল শুকানোর পর সমান সমান হওয়া আবশ্যক; বিক্রয়ের সময় সমান সমান হওয়া যথেষ্ট নয়। আর এ কারণেই আলোচ্য তিনটি মাসআলায় তাঁর মতে বিক্রয় জায়েজ নয়। কিন্তু তিনি الرُّطْبِ بِالرُّطْبِ "তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়" জায়েজ বলেছেন। অথচ رُطْبُ বা তাজা খেজুর শুকানোর পর উভয় পক্ষের খেজুর সমান সমান

না থাকতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তিনি বিক্রয়ের সময় সমান সমান হওয়াকেই যথেষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। এ পার্থক্যের কারণ কি? মুসান্নিফ (র.) এর পার্থক্য বর্ণনা করছেন যে, আলোচ্য তিনটি সুরতে দ্রব্যগুলো শুকানোর পর যখন তাতে তারতম্য সৃষ্টি হয় তখনও দ্রব্যগুলোর সেই নামই বহাল থাকে যে নাম বিক্রয়ের সময় ছিল। যেমন- গম তাজা অবস্থায় কিংবা ডেজা অবস্থায়ও এর নাম গম আবার শুকানোর পরও এর নাম গমই থাকে, এরূপভাবে تَمْر [শুকনো খেজুর] এবং কিসমিস ডেজানো অবস্থায়ও এদের নাম যা থাকে শুকানোর পরও তাই থাকে।

অতএব, এ সকল দ্রব্য শুকানোর পর যখন তারতম্য সৃষ্টি হবে তখন ধরা হবে যে, যে দ্রব্যের উপর চুক্তি হয়েছিল ঠিক সেই দ্রব্যের মাঝে তারতম্য পাওয়া গেছে। ফলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। এরূপভাবে بَيْعُ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ "শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়"-এর ক্ষেত্রেও তাজা খেজুর শুকানোর পর যখন তারতম্য সৃষ্টি হবে তখন رُطْبُ -এর নাম পরিবর্তন হয়ে تَمْر হয়ে যাবে, কিন্তু অপর পক্ষের যে تَمْر ছিল তার নাম বহালই থাকবে। তাই এ ক্ষেত্রেও এক পক্ষের নাম বহাল থাকার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

পক্ষান্তরে بَيْعُ الرُّطْبِ بِالرُّطْبِ "তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়"-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে যখন শুকানোর পর তারতম্য সৃষ্টি হবে তখন উভয় পক্ষের দ্রব্যের নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে। কেননা, رُطْبُ শুকানোর পর তার নাম تَمْر হয়ে যাবে। ফলে এরূপ ধরা হবে যে, যে দ্রব্যের উপর চুক্তি হয়েছিল ঠিক সেই দ্রব্যের মাঝে তারতম্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং তা 'রিবা' হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে।



وَلَوْ بَاعَ الْبُسْرُ بِالتَّمْرِ مَتَفَاضِلًا لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الْبُسْرَ تَمْرٌ، بِخِلَافِ الْكَفْرِى،  
 حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا شَاءَ مِنَ التَّمْرِ، إِنْ تَنَاسَلَ بِوَاحِدٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْرٍ فَإِنَّ هَذَا  
 الْإِسْمَ لَهُ مِنْ أَوَّلِهِ مَا تَنْعَقِدُ صُورَتُهُ لَا قَبْلَهُ وَالْكَفْرِى عَدِيدٌ مُتَفَاوِتٌ حَتَّى لَوْ بَاعَ  
 التَّمْرُ بِهِ نَسَبَتْهُ لَا يَجُوزُ لِذِهَالِهِ.

অনুবাদ : আর যদি তমর-এর বিনিময়ে বুর (আধা পাকা কাঁচা খেজুর) কমবেশি করে বিক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, তমর-ও-বুর [কেননা, আকার ধারণ করার পর থেকে খেজুর তমর বলে গণ্য হয়]। পক্ষান্তরে খেজুরের কুড়ির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা যতটুকু ইচ্ছা তমর-এর বিনিময়ে [যতটুকু ইচ্ছা] কুড়ি বিক্রয় করতে পারবে, যেমন- একটির বিনিময়ে দুটি। কারণ, খেজুরের কুড়ি তমর বা খেজুরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এ নামটি [অর্থাৎ তমর নামটি] খেজুরের আকার ধারণ করার পর থেকে বলা হয়, আকার ধারণের পূর্বে এ নাম বলা হয় না। আর খেজুরের কুড়ি তারতম্যপূর্ণ গণনা-নির্ভর দ্রব্য। কাজেই কুড়ির বিনিময়ে যদি তমর [খেজুর] বাকিতে বিক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, দ্রব্যটিতে অস্পষ্টতা রয়েছে [যা বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الْبُسْرُ بِالتَّمْرِ : মাসআলা হলো, তমর [শুকনো খেজুর]-এর বিনিময়ে বুর [আধা পাকা কাঁচা খেজুর] কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, আকার ধারণ করার পর থেকে সব ধরনের খেজুরই তমর-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুর বা আধা পাকা কাঁচা খেজুরও তমর-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উভয়ের শ্রেণী এক, তাই কমবেশি করলে 'রিবা' বা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। তবে [পাত্রের ভিত্তিতে] সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفْرِى، : পক্ষান্তরে তমর-এর বিনিময়ে খেজুরের কুড়ি [যা ফেটে গিয়ে প্রথম খেজুরের আকার ধারণ করে] সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ এবং কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ। সুতরাং একটি তমর-এর বিনিময়ে দুটি কুড়ি বিক্রয় করা কিংবা দুটি তমর-এর বিনিময়ে একটি কুড়ি বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, খেজুরের কুড়ি (الْكَفْرِى) বলা হয় খেজুরের আকার ধারণ করার পূর্বে, কাজেই তা তমর-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং উভয়ের শ্রেণী (جنس) ভিন্ন। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

قَوْلُهُ وَالْكَفْرِى عَدِيدٌ مُتَفَاوِتٌ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি কুড়ি এবং তমর-এর শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহলে তো কুড়িকে 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে তমর-এর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার কথা, একপভাবে কুড়ির বিনিময়ে বাকিতে তমর ক্রয় করা জায়েজ হওয়ার কথা। [কেননা, শ্রেণী এক হলে একটির বিনিময়ে অপরটি বাকি বিক্রয় জায়েজ নয়, কিন্তু শ্রেণী ভিন্ন হলে বাকি বিক্রয় জায়েজ হয়।] অথচ এ দু'সুরতের কোনোটিই জায়েজ নয়, তার কারণ কি?

জবাবের সারকথা হচ্ছে, খেজুরের কুড়ি হলো গণনা-প্রচলিত তারতম্যপূর্ণ দ্রব্য। অর্থাৎ এগুলো প্রচলনে গণনার ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় এবং এগুলো ছোট বড় হয়ে থাকে। আর তারতম্যপূর্ণ গণনা-প্রচলিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা কিংবা তা দ্বারা বাকিতে অন্য কোনো দ্রব্য ক্রয় করা জায়েজ নয়। কারণ হলো, তারতম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে তা সমর্পণের সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে। গ্রহীতা বড়গুলো দাবি করবে আর অর্পণকারী ছোটগুলো দিতে চাইবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَالسَّنْسِمِ بِالشَّجِيرِ، حَتَّى يَكُونَ الزَّيْتُ وَالشَّجِيرُ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الزَّيْتُونِ وَالسَّنْسِمِ، فَيَكُونُ الدَّهْنُ بِمِثْلِ الزَّيَادَةِ بِالشَّجِيرِ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ بَعْرَى عَنِ الرِّبَا، إِذَا مَا فِيهِ مِنَ الدَّهْنِ مَزُونٌ، وَهَذَا لِأَنَّ مَا فِيهِ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ فَالشَّجِيرُ وَبَعْضُ الدَّهْنِ أَوْ الشَّجِيرُ وَخَذَهُ فَضْلٌ، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ مَا فِيهِ لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا، وَالشُّبْهَةُ فِيهِ كَالْحَقِيقَةِ، وَالْجُوزُ بِدُهْنِهِ وَاللَّبَنُ بِسَمْنِهِ وَالْعِنَبُ بِعَصْنِهِ وَالتَّمْرُ بِدَبْسِهِ عَلَى هَذَا الْإِعْتِبَارِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْقُطْنِ بِغَزْلِهِ، وَالْكَرْبَاسِ بِالْقُطْنِ يَجُوزُ كَيْفَ مَا كَانَ بِالْإِجْمَاعِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যায়তুন ফলকে যায়তুন তেলের বিনিময়ে এবং সরিষাকে সরিষার তেলের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না, যদি উক্ত যায়তুন তেল এবং সরিষার তেল [বিক্রীত] যায়তুন ফল এবং সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের চেয়ে বেশি না হয়। [বেশি হলে জায়েজ হবে।] কেননা, তখন [সরিষা বা যায়তুনের ভিতরে বিদ্যমান] তেলের বিনিময়ে সমপরিমাণ তেল ধরা হবে, আর বেশিটুকু ধরা হবে খেলের বিনিময়ে। কেননা, তখন চুক্তিটি 'রিবা' [সুদ] থেকে মুক্ত হবে। কেননা, [যায়তুন ও সরিষার মধ্যে] যে তেল রয়েছে তাও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। আর [জায়েজ হওয়ার জন্য বিক্রীত] তেল বেশি হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, যদি যায়তুন এবং সরিষার মধ্যে বিদ্যমান তেল অপর পক্ষের তেলের চেয়ে বেশি হয় কিংবা তার সমান হয়, তাহলে [এক পক্ষে] খৈল ও কিছু তেল অথবা শুধু খৈল অতিরিক্ত হলো [যা 'রিবা' বা সুদ হবে]। আর যদি যায়তুন বা সরিষার মাঝে কি পরিমাণ তেল আছে তা জানা না যায়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, তখন 'রিবা' [সুদ] হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর 'রিবা' বা সুদের ক্ষেত্রে 'রিবা'-এর সঙ্গেইও প্রকৃত 'রিবা'-এর ন্যায় [ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে]। আর আখরোট ফল তার তেলের বিনিময়ে, দুধ তার ঘিয়ের বিনিময়ে, আঙ্গুর তার রসের বিনিময়ে এবং খেজুর তার সিরার বিনিময়ের বিধানও উক্ত বিধানের মতোই। আর তুলাকে তার সূতার বিনিময়ের ক্ষেত্রে ফিকহবিদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আর তুলার বিনিময়ে [তুলার তৈরি] সুতি কাপড় সর্বসম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় করা জায়েজ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ الْخ :

السَّنْسِمُ অর্থ- সরিষা      الزَّيْتُ অর্থ- যায়তুনের তেল।      الزَّيْتُونُ অর্থ- যায়তুন ফল যা থেকে যায়তুনের তেল তৈরি হয়।      الشَّجِيرُ অর্থ- খৈল।      الشَّجِيرُ অর্থ- সরিষার তেল।

মাসআলা : যদি যায়তুনের তেলের বিনিময়ে যায়তুন ফল বিক্রয় করা হয়, কিংবা সরিষার তেলের বিনিময়ে সরিষা বিক্রয় করা হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উক্ত যায়তুনের ফলের মাঝে যতটুকু তেল বিদ্যমান আছে অপর পক্ষের তেল তার চেয়ে বেশি হতে হবে। এক্ষেপভাবে এক পক্ষের সরিষার মাঝে যতটুকু তেল বিদ্যমান আছে অপর

পক্ষের ভাঙ্গানো তেল তার চেয়ে বেশি হতে হবে। কারণ, এভাবে হলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, যায়তুনের কিংবা সরিষার মাঝে যতটুকু তেল বিদ্যমান আছে, অপর পক্ষের ভাঙ্গানো তেল থেকে সমপরিমাণ তার বিনিময়ে ধরা হবে, আর অবশিষ্ট ভাঙ্গানো তেলটুকু যায়তুন বা সরিষার মাঝে বিদ্যমান থৈলের বিনিময়ে ধরা হবে। আর থৈল এবং তেল যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তাই সমান সমান হওয়ার আবশ্যকতা নেই। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে।

আর ভাঙ্গানো তেল যদি যায়তুনের মাঝে কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের চেয়ে বেশি না হয়; বরং তার চেয়ে কম হয় কিংবা সমান সমান হয়, তাহলে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে। কেননা, ভাঙ্গানো তেলও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য, আর যায়তুন কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই কোনো এক পক্ষে বেশি সাব্যস্ত হলে তা 'রিবা' [সুদ] হবে। আর এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে বেশি সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা, ভাঙ্গানো তেল যদি যায়তুন কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের সমান হয়, তাহলে থৈলটুকু বেশি হচ্ছে, যার বিনিময়ে ভাঙ্গানো তেলের দিকে কিছুই থাকছে না। আর ভাঙ্গানো তেল যদি যায়তুন কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের চেয়ে কম হয়, তাহলে যায়তুন বা সরিষার দিকে থৈলটুকু তো বেশি হবেই তার সাথে বিদ্যমান তেলও বেশি হবে। সুতরাং 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে। কাজেই এ দুটি সুরতে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ مَا فِيهِ لَا يَحْزُرُ الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, আর যদি উপরিউক্ত সুরতে বিষয়টি এমন হয় যে, যায়তুনের মাঝে কিংবা সরিষার মাঝে কতটুকু তেল আছে তা জানা যাচ্ছে না, তাহলে উক্ত সুরতে অর্থাৎ যায়তুনের বিনিময়ে যায়তুনের তেল বিক্রয় করা কিংবা সরিষার বিনিময়ে সরিষার তেল বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। কেননা, তখন 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে কার্যত কমবেশি হলে যেকূপ বিক্রয় হারাম হয় তদ্রূপ কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বিক্রয় হারাম হয়। কাজেই এ সুরতে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَالْحُزْرُ بِدَعْفِهِ وَالْكَبْنُ بِسَنِيهِ وَالْعَبْدُ بِعَيْسِهِ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত মাসআলার অনুরূপ নিয়মে আখরোটের তেলের বিনিময়ে আখরোট, ঘিয়ের বিনিময়ে দুধ, আঙ্গুরের রসের বিনিময়ে আঙ্গুর এবং খেজুরের শিরার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় করা জায়েজ কিংবা নাজায়েজ হবে। অর্থাৎ যদি ভাঙ্গানো তেল যদি অপর পক্ষের আখরোটের মধ্যে বিদ্যমান তেলের চেয়ে বেশি হয়, ঘি যদি দুধের মাঝে বিদ্যমান ঘিয়ের চেয়ে বেশি হয়, আঙ্গুরের রস যদি আঙ্গুরের মধ্যে বিদ্যমান রসের চেয়ে বেশি হয় এবং খেজুরের শিরা যদি অপর পক্ষের খেজুরের মাঝে বিদ্যমান শিরার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর যদি সমান হয় কিংবা কম হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي النُّقْطَنِ بِغُزْلِهِ الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, তুলাকে তুলার সুতার বিনিময়ে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে আমাদের ফিকহবিদগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। তাদের দলিল হলো, তুলা এবং সুতার শ্রেণী এক এবং উভয়টি ওজন-প্রচলিত দ্রব্য। কাজেই ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করলে জায়েজ হবে। আর কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে না। কেননা, উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। কারণ, তুলাকে সুতা বানানো হলে তার মাঝে ওজনের দিক থেকে কিছু ঘাটতি হয়। অর্থাৎ যদি এক কেজি তুলা দ্বারা সুতা বানানো হয়, তাহলে তার ওজন এক কেজি হয় না; বরং কম হয়। তবে কতটুকু কম হবে তা নিশ্চিত জানা সম্ভব নয়। সুতরাং বিক্রয়ের সময় উভয়ের ওজন সমান করা হলেও পরিণতির দিক থেকে উভয় সমান হচ্ছে না। অতএব বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْكَرْسَاءُ بِالنُّقْطَنِ يَحْزُرُ كَيْفَ مَا كَانَ بِالْإِجْتِمَاعِ: তুলার বিনিময়ে সুতার তৈরি কাপড় যে কোনো ভাবে অর্থাৎ কমবেশি করে কিংবা সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কেননা, কাপড় তৈরি হওয়ার পর তার শ্রেণী এবং তুলার শ্রেণী ভিন্ন হয়ে গেছে, যেহেতু উভয়ের গুণাগুণ এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন। আর যখন শ্রেণী ভিন্ন, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

قَالَ : وَيَجُزُّ بَيْعُ اللَّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاعِلًا ، وَمُرَادُهُ لَحْمُ  
الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، فَأَمَّا الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَا الْمَغْرُ مَعَ الضَّئَانِ ،  
وَكَذَا الْعِرَابُ مَعَ الْبُخَاتِي -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর গোশত একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর গোশত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উটের গোশত, গরুর গোশত এবং ছাগলের গোশত। পক্ষান্তরে গরু এবং মহিষ একই শ্রেণী (جِنْس) -এর অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ ছাগল এবং ভেড়া একই শ্রেণী (جِنْس) -এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপভাবে আরবীয় উট এবং 'বখতী' উট একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُزُّ بَيْعُ اللَّحْمَانِ الْخ :

মাসআলা : গোশত যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী হয়, তাহলে এক প্রাণীর গোশত অন্য প্রাণীর গোশতের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। যেমন- গরুর গোশতের বিনিময়ে উটের গোশত, ছাগলের গোশতের বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রয় করা। কেননা, গরু, উট এবং ছাগলের শ্রেণী (جِنْس) যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ এদের গোশতের শ্রেণীও ভিন্ন। আর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে কম-বেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। [পক্ষান্তরে যদি উভয় দিকে একই শ্রেণীর গোশত হয় যেমন গরুর গোশতের বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রয় করল, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।]

মুসান্নিফ (র.) বলেন, গরু এবং মহিষের শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে। কাজেই গরুর গোশতের বিনিময়ে মহিষের গোশত কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। এরূপভাবে ছাগল এবং ভেড়ার শ্রেণী এক বলে গণ্য, আর আরবীয় উট এবং বখতী উট [যা আরবীয় উট এবং অনারবী উটের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে] -এর শ্রেণীও এক বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রাণীর নেসাব পূর্ণ না হলে যে প্রাণীর দ্বারা নেসাব পূর্ণ করা হয় এদের উভয়ের শ্রেণী এক বলে গণ্য। যেমন- গরুর নেসাব পূর্ণ না হলে মালিকের মহিষ থাকলে তা দ্বারা গরুর নেসাব পূর্ণ করা হয়। পক্ষান্তরে বকরির নেসাব পূর্ণ না হলে মালিকের গরু থাকলে তা দ্বারা বকরির নেসাব পূর্ণ করা হয় না। কেননা, উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন।

উল্লেখ্য, ইমাম মালিক (র.)-এর মতে সকল গোশত তিন শ্রেণী (جِنْس) -এর মাঝে সীমাবদ্ধ-

১. সকল পাখির গোশত।
২. সকল পশুর গোশত, চাই তা গবাদি পশু হোক কিংবা বন্য পশু হোক সবই একই শ্রেণীভুক্ত।
৩. সামুদ্রিক সকল প্রাণীর গোশত।

قَالَ : وَكَذَلِكَ الْبَّانُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ (رحا) لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهَا جَنْسٌ  
وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ، وَلَنَا أَنَّ الْأَصُولَ مُخْتَلِفَةٌ حَتَّى لَا يَكْمُلُ نَصَابُ أَحَدِهِمَا  
بِالْآخَرِ فِي الزَّكْوَةِ، فَكَذَا أَجْزَاءُهَا إِذَا لَمْ تَتَبَدَّلْ بِالصَّنْعَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, গরুর দুধ এবং বকরির দুধও একরূপ [অর্থাৎ একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।] ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জায়েজ হবে না। কেননা, উভয়ের দুধ একই শ্রেণী (جَنْس) -এর বলে গণ্য। কারণ, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সকল দুধ একই। আর আমাদের দলিল হলো, উক্ত দুধের উৎস প্রাণীগুলোর শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই জাকাতের ক্ষেত্রে একটির নেসাবের অপূর্ণতা অপরটি দ্বারা পূর্ণ করা হয় না। সুতরাং এগুলোর অংশ [তথা দুধ] -এর শ্রেণীও ভিন্ন হবে, যতক্ষণ না তা কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَكَذَلِكَ الْبَّانُ الْبَقَرِ الْغَنَمِ :

মাসআলা : গাভীর দুধ, বকরির দুধ এবং উটনীর দুধের শ্রেণীও ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য। কাজেই এদের একটির দুধ অপরটির দুধের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, তাঁর মতে এ সকল প্রাণীর দুধের শ্রেণী এক, একরূপভাবে এদের গোশতের শ্রেণীও এক। কাজেই এদের একটির দুধ অপরটির দুধের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। তদ্রূপ এদের একটির গোশত অপরটির গোশতের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে না।

তাঁর দলিল হলো, সকল প্রাণীর দুধের উদ্দেশ্য এক, আর তা হলো, [একই পদ্ধতিতে] খাদ্যরূপে গ্রহণ করা। একরূপভাবে এদের গোশতের উদ্দেশ্যও এক, কেননা তারও উদ্দেশ্য হচ্ছে [একই পদ্ধতিতে] খাদ্যরূপে গ্রহণ করা। আর দুটি দ্রব্যের উদ্দেশ্য এক হলে তাদের শ্রেণী এক বলে গণ্য হয়।

উল্লেখ্য, এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম অভিমত নয়; বরং তাঁর বিশুদ্ধতম অভিমতও আমাদের মতের অনুরূপ। আমাদের দলিল হলো, গোশত বা দুধ হচ্ছে প্রাণীর অংশবিশেষ (أَجْزَاءُ)। আর দুধ বা গোশতসমূহের মূল তথা গুরু, উট ও বকরির শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই যাকাত উসুল করার ক্ষেত্রে একটির নেসাব পূর্ণ না হলে অন্যটি দ্বারা তা পূর্ণ করা হয় না। অর্থাৎ গরুর নেসাব পূর্ণ না হলে তা উট দ্বারা কিংবা বকরির দ্বারা পূর্ণ করা হয় না। আর মূলসমূহের শ্রেণী ভিন্ন হলে তাদের অংশসমূহের শ্রেণীও ভিন্ন হয়। কাজেই এগুলোর দুধ এবং গোশতের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হবে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রেণী ভিন্ন হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

قَوْلُهُ إِذَا لَمْ تَتَبَدَّلْ بِالصَّنْعَةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে উটনী, গাভী ও বকরির দুধের শ্রেণী তখনই ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হবে যখন দুধ কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত না হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তিত দ্রব্যটি একই হয়, তখন তার শ্রেণী একই বলে গণ্য হবে। যেমন-উটের দুধ দ্বারা তৈরি পনির এবং গরুর দুধ দ্বারা তৈরি পনির, এদের উভয়ের শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে এদের মূলের শ্রেণী ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না, বরং উভয়ের উদ্দেশ্য এক হওয়ার কারণে শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে।

قَالَ: وَكَذَا خَلَّ الدَّقْلَ يَخْلِي الْعِنَبَ، لِإِخْتِلَافِ بَيْنَ أَصْلَيْهِمَا، فَكَذَا بَيْنَ مَاتِيهِمَا، وَلِهَذَا كَانَ عَصِيرَاهُمَا جَنَسَيْنِ، وَشَعَرُ الْمَعِزِ وَصَوْفُ الْغَنَمِ جَنَسَانِ لِإِخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে আঙ্গুরের সিরকার বিনিময়ে খেজুরের সিরকা কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, উভয়ের মূল্যের শ্রেণী (جنس) ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাদের [মিশ্রিত] পানিরও শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন হবে। এ কারণেই [সকলের একমত্যে] উভয়ের 'রস'-এর শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হয়। আর ছাগলের পশম এবং ভেড়ার লোম দুই শ্রেণীর বলে গণ্য হবে। কেননা, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خَلَّ الدَّقْلُ - নিম্নমানের খেজুর [সাধারণত এর দ্বারাই সিরকা বানানো হয়]।  
قَوْلُهُ قَالَ: وَكَذَا خَلَّ الدَّقْلَ يَخْلِي الْعِنَبَ - অর্থ - সিরকা।

মাসআলা : আঙ্গুরের সিরকার বিনিময়ে খেজুরের সিরকা কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, উভয় সিরকার মূল তথা খেজুর এবং আঙ্গুরের শ্রেণী ভিন্ন। সুতরাং তাদের [মিশ্রিত] পানি তথা সিরকার শ্রেণীও ভিন্ন হবে। আর এ কারণেই আঙ্গুর নির্গত রস এবং খেজুর নির্গত রসের শ্রেণী সকলের একমত্যে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব যখন আঙ্গুরের সিরকা এবং খেজুরের সিরকার শ্রেণী ভিন্ন তখন একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ مُسَانِنِيف (র.) বলেন, ছাগলের পশম এবং ভেড়ার লোমের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যদিও ছাগল এবং ভেড়ার শ্রেণী এক বলে গণ্য এবং উভয়ের গোশত এবং দুধের শ্রেণীও এক বলে গণ্য [যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে] কিন্তু এদের উভয়ের লোম বা পশমের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে উভয়ের মূল্যের শ্রেণী এক হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। কারণ, ছাগলের পশম এবং ভেড়ার লোম দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, যথা ভেড়ার লোম দ্বারা শাল এবং মূল্যবান কাপড় তৈরি হয় আর ছাগলের পশম দ্বারা কশল এবং রশি তৈরি হয়। কাজেই উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হবে। আর যখন উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য তখন এদের একটির বিনিময়ে অন্যটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভেড়া এবং ছাগলের শ্রেণী এক হওয়া সত্ত্বেও এদের পশম ও লোমের উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গণ্য করা হয়েছে। আর গরুর দুধ, উটের দুধ ও বকরির দুধের শ্রেণী ভিন্ন ধরা হয়েছে, অথচ এগুলোর উদ্দেশ্য এক। আবার একই পশুর দুধ দ্বারা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি দুই ধরনের দ্রব্য তৈরি করা হয়, তাহলে উভয়টাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গণ্য করা হয়, যেমন- গাভীর দুধ দ্বারা তৈরি পনির এবং মিষ্টি। এই পার্থক্যের কারণ ইনয়াহ গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মূল (أَصْل) যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হয় তখন তাদের অংশসমূহের শ্রেণী ভিন্ন ধরা হবে চাই তাদের উদ্দেশ্য এক হোক না কেন। যেমন- গরুর দুধ এবং উটের দুধ। আর মূল যদি এক শ্রেণীর হয় এবং তাদের অংশসমূহের উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের শ্রেণী ভিন্ন ধরা হবে, যেমন- ভেড়ার লোম এবং ছাগলের পশম। আর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পরিবর্তিত দ্রব্যের উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তাহলে একই শ্রেণীর ধরা হবে- চাই তাদের মূল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হোক না কেন, যেমন- গরুর দুধের পনির এবং উটের দুধের পনির, এদের শ্রেণী এক ধরা হবে- আর যদি পরিবর্তিত দ্রব্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ধরা হবে- চাই তাদের মূল এক হোক না কেন, যেমন- গরুর দুধের পনির এবং গরুর দুধের দধি।

قَالَ : وَكَذَا شَعْمُ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ ، لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ  
وَالْمَعَانِي وَالْمَنَافِعِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا -

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, এরূপভাবে নিতম্বের গোশত কিংবা সাধারণ গোশতের বিনিময়ে উদরের চর্বি [কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ]। কেননা, দৃশ্যগত, গুণগত ও উপকারিতার দিক থেকে এগুলোর মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকায় এগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বলে গণ্য হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

شَعْمٌ অর্থ- চর্বি। اَلْيَةِ অর্থ- দুধার নিতম্বের গোশত।

মাসআলা : সাধারণ গোশতের বিনিময়ে কিংবা দুধার নিতম্বের গোশতের বিনিময়ে তার পেটের চর্বি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। [এরূপভাবে দুধার সাধারণ গোশতের বিনিময়ে তার নিতম্বের গোশত কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ]। কেননা, এগুলো [একই পশুর হওয়া সত্ত্বেও] ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু বলে গণ্য। কারণ, এগুলোর পরস্পরের মাঝে দৃশ্যগত (صُورَةً), বস্তুগত (مَعْنًى) এবং উপকারিতার (مَنْفَعَةً) দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। দৃশ্যগত যে পার্থক্য রয়েছে তাতো স্পষ্ট। আর বস্তুগত পার্থক্যের কারণ হলো, এগুলোর প্রত্যেকটির মূলবস্তু ভিন্ন ভিন্ন, এ কারণেই একটির নাম চর্বি (شَعْمٌ) আরেকটির নাম নিতম্বের গোশত (اَلْيَةِ) আর অপরটির নাম গোশত। আর উপকারিতার দিক থেকে ভিন্ন হওয়ার প্রমাণ হলো, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এগুলোর প্রত্যেকটির উপকারিতা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এ তিনও দিক থেকে এগুলোর মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় এগুলোর শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ধরা হবে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত দ্রব্যগুলোর কোনোটিই অপরটির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো ওজন-প্রচলিত দ্রব্য। সুতরাং 'রিবা' হারাম হওয়ার ইল্লাতের একটি বিষয় তথা উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, বাকি বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, পেটের চর্বি বাতীত অন্যান্য চর্বি [যেমন- পাজরের চর্বি] গোশতের সংশ্লিষ্ট ধরা হবে, কাজেই তার শ্রেণী এবং গোশতের শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে। অতএব, তা গোশতের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। আর মাথা, খুরা ও চামড়া এগুলো একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এগুলোর শ্রেণী ভিন্ন।

قَالَ : رَجَّزُ بِنِعِ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ وَالْدَّقِيقِ مُتَّفَاضِلًا ، لِأَنَّ الْخُبْزَ صَارَ عَدَدِيًّا أَوْ مَزُونًا ، فَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكِينًا مِنْ كُلِّ وَجْهِ ، وَالْحِنْطَةُ مَكِينَةٌ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رد) أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَا نَقْدَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْحِنْطَةُ نَسِيئَةً جَارَ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ نَسِيئَةً رَجَّزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رد) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَكَذَا السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ جَائِزٌ فِي الصَّحْنِجِ ، وَلَا خَيْرَ فِي اسْتِقْرَاضِهِ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رد) لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِالْخُبْزِ وَالْخَبَّازِ وَالْتَنُورِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأَخُّرِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رد) يَجْزُ بِهِمَا لِلتَّعَامِلِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رد) يَجْزُ وَزْنًا ، وَلَا يَجْزُ عَدَدًا لِلتَّفَاوُتِ فِي أَحَادٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, গম এবং আটার বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, রুটি গণনা-প্রচলিত দ্রব্য কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য পরিণত হয়েছে। সুতরাং তা সর্বদিক থেকেই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের আওতা-বহির্ভূত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে গম [এবং আটা] হলো পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়াজে অনুযায়ী এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ তা জায়েজ নয়]। তবে ফতোয়া প্রথমোক্ত অভিমতটির উপর। আর এ বৈধতার বিধান হলো, যদি উভয় দ্রব্য নগদ হয়। তদ্রূপ যদি গম [বা আটা] বাকি হয় [আর রুটি নগদ হয়] তাহলেও জায়েজ হবে। আর যদি রুটি বাকি হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে এবং তাঁর মতের উপরই ফতোয়া। এরূপভাবে বিশুদ্ধ মতে রুটির ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে গণনার ভিত্তিতে কিংবা ওজনের ভিত্তিতে রুটি ঋণ নেওয়ার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ জায়েজ নয়]। কেননা, বেলার কারণে, রুটি তৈরিকারীর কারণে, তন্দুরের কারণে এবং আগে বা পরে [তন্দুর থেকে] উঠানোর কারণে তাতে তারতম্য হয়ে থাকে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে লোক-প্রচলনের কারণে গণনার ভিত্তিতে এবং ওজনের ভিত্তিতে রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ওজনের ভিত্তিতে তা জায়েজ হবে, কিন্তু গণনার ভিত্তিতে তা জায়েজ হবে না। কেননা, রুটির মাঝে পারস্পরিক তারতম্য হয়ে থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : قَوْلُهُ قَالَ : رَجَّزُ بِنِعِ الْخُبْزِ : উপরিউক্ত ইবারতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে—

১. আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা, উভয়টি নগদ হস্তান্তর করে।
২. আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, রুটি নগদ আর আটা বা গম বাকি।
৩. আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, আটা বা গম নগদ আর রুটি বাকি।
৪. গণনার ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ঋণ নেওয়া।
৫. ওজনের ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ঋণ নেওয়া।



মাসআলা : আমাদের তিন ইমামের মতে যদি উভয় দ্রব্য নগদ হয়, তবে আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ لَئِنْ الْخُبْزَ صَارَ عَذْبًا أَوْ مَرُورًا الْخ : উল্লিখিত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) উভয় দ্রব্য নগদ হলে আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার দলিল পেশ করেছেন। জায়েজ হওয়ার দলিল হলো, গম এবং আটা হচ্ছে পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য পক্ষান্তরে রুটি গণনা-প্রচলিত দ্রব্য কিংবা কোনো কোনো অঞ্চলে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই রুটির পরিমাপ মাধ্যম এবং আটা বা গমের পরিমাপ মাধ্যম ভিন্ন। কাজেই একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এখানে শুধু উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম ভিন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ উভয়ের শ্রেণীও ভিন্ন। কেননা, আটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (بِالسَّعَةِ) পরিবর্তিত হয়ে রুটিতে পরিণত হয়েছে। আর পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হয়। কাজেই রুটি এবং আটা বা গমের শ্রেণী ভিন্ন এবং পরিমাপ-মাধ্যমও ভিন্ন। সুতরাং কোনো অঞ্চলে যদি রুটি ওজন-প্রচলিত দ্রব্য হয় এবং আটাও ওজন-প্রচলিত দ্রব্য হয়, তবু ওজনের ভিত্তিতে আটার বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رَح) أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ : ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে 'নাওয়াদের' ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ ব্যতীত অন্য গ্রন্থ]-এ বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর মতে আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না; সমান সমান করেও নয় এবং কমবেশি করেও নয়। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও তাই। এ মতটির দলিল হলো, রুটি এবং আটা বা গমের মূল যেহেতু এক, সেহেতু উভয়ের মাঝে একই শ্রেণী হওয়ার বিষয়টি (مَجَاسَتْ) এক হিসেবে বিদ্যমান আছে। কাজেই সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য। কিন্তু আটা বা গমের মাঝে এবং রুটির মাঝে সমান সমান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে না। তবে এ মতটির উপর ফতোয়া নয়, ফতোয়া প্রথম মতটির উপর।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ نَيْسَبَةً جَارِئًا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। দ্বিতীয় মাসআলা তথা আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, রুটি নগদ আর আটা বা গম বাকি। [উল্লেখ্য, এ সূরতটি প্রকৃতপক্ষে 'বায় সলম' -এর অন্তর্ভুক্ত।] এ সূরতে আমাদের ইমামগণের একমত্যে বিক্রয় জায়েজ। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রুটি এবং গম বা আটার শ্রেণীও ভিন্ন এবং পরিমাপ-মাধ্যমও ভিন্ন। কাজেই কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ এবং বাকি বিক্রয় করাও জায়েজ। আর এ ক্ষেত্রে বাকি দ্রব্য যেহেতু আটা বা গম, আর আটা বা গম হচ্ছে পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য যা বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। কাজেই তা হস্তান্তরের সময় বিবাদের সম্ভাবনা নেই। অতএব, বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ نَيْسَبَةً يَحْرُزُ عِنْدَ أَبِي يُونُسَ (رَح) الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয় মাসআলার বর্ণনা প্রদান করেছেন। তৃতীয় মাসআলা তথা আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, আটা বা গম, নগদ আর রুটি বাকি। উল্লেখ্য, এ সূরতটিও 'বায় সলম' -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মুদ্রা-দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্য বাকি হতে পারে কেবল 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রে। অতএব, এ সূরতটি হলো এরূপ যে, আটা বা গম মূলধন (أَسْلَال) হিসেবে নগদ প্রদান করা হলো আর দাদন-দ্রব্য (مُسْلَمَ فِيهِ) হিসেবে রুটি নির্ধারণ করা হলো যা নির্দিষ্ট সময়ে হস্তান্তর করা হবে। এ সূরতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, রুটির মাঝে অনেক তারতম্য হয়ে থাকে এবং তা বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। আর যে দ্রব্য বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, তা হস্তান্তরের সময় বিবাদের সম্ভাবনা থাকে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে রুটি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। [আর যদি কোনো অঞ্চলে গণনা-প্রচলিত হয় সেখানেও উক্ত সূরতে ওজনের ভিত্তিতে হস্তান্তরের

শর্তে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা জায়েজ। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া। অর্থাৎ মাশায়েখগণ মানুষের প্রয়োজনের কারণে এ মতটির উপরই ফতোয়া দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَكَذَا السَّلْمُ فِي الْغُبْرِ جَائِزٌ فِي السَّيِّحِ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিতৃষ্ণ অভিমত অনুযায়ী [অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত অনুযায়ী খার উপর ফতোয়া] 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতেও রুটি বিক্রয় করা জায়েজ। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর এ ইবারতটুকু উল্লেখ করার দ্বারা বিশেষ কোনো ফায়দা অর্জিত হয়নি। কারণ, আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, পূর্বের সূরতটিই প্রকৃতপক্ষে 'বায় সলম'-এর সূরত। কাজেই এর পূর্বের ইবারত এবং এ ইবারতের সূরত একটাই, তা হলো 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে রুটি বিক্রয় করা। তবে আগের ইবারতটি ছিল শুধু আটা বা গমের বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, আর এ ইবারতটি হচ্ছে যে কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন মুদার বিনিময়ে।—[হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-ইনায়াহ]

قَوْلُهُ وَلَا خَيْرَ فِي اسْتِقْرَاضِهِ عَدُوًّا أَوْ زَوْجًا الْ: চতুর্থ ও পঞ্চম মাসআলা তথা গণনার ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ধার বা ঋণ নেওয়া এবং ওজনের ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ঋণ নেওয়া। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দুটি সূরতের কোনো সূরতেই রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ নয়। তাঁর দলিল হলো, রুটি কয়েক কারণে তারতম্যাপূর্ণ হয়ে থাকে। যথা—

ক. বানানোর তারতম্যের কারণে। যেমন— কোনো রুটি পাতলা হয় আবার কোনোটি পুরু হয়। একরূপভাবে কোনোটি ছোট হয় আবার কোনোটি বড় হয়।

খ. রুটি তৈরিকারীর কারণে তারতম্য হয়। যদি তৈরিকারী দক্ষ হয় তাহলে তার রুটি উৎকৃষ্ট হয়, আর যদি দক্ষ না হয় তাহলে তার রুটি তুলনামূলক নিকৃষ্ট হয়।

গ. তন্দুরের কারণেও তারতম্য হয়ে থাকে। তন্দুর যদি নতুন হয় তাহলে রুটি ভাল হয়, আর যদি পুরাতন হয়, তাহলে রুটি তুলনামূলক খারাপ হয়।

ঘ. তৈরির ক্ষেত্রে আগে পরে হওয়ার কারণেও ভালমন্দ হয়ে থাকে। যেমন— তন্দুর গরম করার পর প্রথম দিকের রুটি খারাপ হয়ে থাকে এবং পরের দিকের রুটি ভাল হয়ে থাকে। অতএব, যখন রুটির মাঝে উল্লিখিত দিকগুলো থেকে তারতম্য হয়ে থাকে তা ذَوَاتُ الْأَمْتَالِ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু বলে গণ্য হবে না। আর ذَوَاتُ الْأَنْشَالِ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু না হলে তা ঋণরূপে নেওয়া জায়েজ হয় না। কেননা, সে ক্ষেত্রে যে বস্তু ঋণ নিবে তদ্রূপ বস্তু পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। কাজেই রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে না, চাই ওজনের ভিত্তিতে নেওয়া হোক কিংবা গণনার ভিত্তিতে নেওয়া হোক।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উভয় সূরতেই রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে। অর্থাৎ ওজনের ভিত্তিতেও নেওয়া জায়েজ হবে এবং গণনার ভিত্তিতেও নেওয়া জায়েজ হবে। কেননা, জনগণের মাঝে প্রতিবেশিনের নিকট হতে রুটি ঋণ গ্রহণ করার প্রচলন (تَسَامُلٌ) রয়েছে এবং এর প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এটা ওজনের ভিত্তিতেও হয়ে থাকে এবং গণনার ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। আর জন-প্রচলন (تَسَامُلُ النَّاسِ)-এর কারণে কিয়াস পরিহার করা হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি অনুসারে জায়েজ না; খার কথ্য সত্ত্বেও জন-প্রচলনের কারণে জায়েজ হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে কেবল পঞ্চম সূরতে অর্থাৎ ওজনের ভিত্তিতে রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে। চতুর্থ সূরতে তথা গণনার ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে রুটি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই ওজনের ভিত্তিতে হলে তা ذَوَاتُ الْأَمْتَالِ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু বলে গণ্য হবে। অতএব, ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে গণনার ভিত্তিতে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, রুটি ছোট বড় এবং পাতলা ও মোটা হওয়ার দিক থেকে তারতম্যাপূর্ণ হয়ে থাকে। কাজেই তা গণনার ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে না।

উল্লেখ্য, এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।—[রদ্দুল মুহতার, মারুতাবায়ে যাকারিয়া, খণ্ড-৭, পৃ: ৪২১]

قَالَ : وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَعَبْدِهِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكٌ لِمَوْلَاهُ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَهَذَا إِذَا كَانَ مَادُونًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ بِالْإِتْقَانِ، لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَيْسَ مِلْكُ الْمَوْلَى عِنْدَ آيَةِ حَنِيفَةٍ (رح)، وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَرْمَاءِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُكَاتِبِهِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মনিব ও তার গোলামের মাঝে কোনো 'রিবা' [সুদ] হয় না। কেননা, গোলাম এবং তার হস্তগত সবই তার মনিবের মালিকানাধীন। সুতরাং 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে না। এ বিধান হলো যদি গোলাম ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয় এবং তার উপর ঋণ না থাকে। কিন্তু যদি তার উপর ঋণ থাকে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে [কমবেশি করে বিক্রয় করা] জায়েজ হবে না। কেননা, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে [এ সূরতে] গোলামের হস্তগত সম্পদ মনিবের মালিকানাধীন নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার হস্তগত সম্পদের সাথে যেহেতু পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে সেহেতু গোলাম মনিবের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের মাঝে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে মনিব ও তার 'মুকাতা'ব [যার সাথে অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব-মুক্তির চুক্তি হয়েছে]-এর মাঝে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمَوْلَى الخ : মাসআলা হলো, গোলাম যদি তার মনিবের পক্ষ থেকে ব্যবসা করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয় এবং তার উপর এতটুকু পরিমাণ ঋণ না থাকে যা তার [গোলামের] মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে এমতাবস্থায় যদি উক্ত গোলাম তার মনিবের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'রিবা'-এর [সুদী] লেনদেন করে, তবে তা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে না। যেমন- মনিব তার উক্ত গোলামের নিকট হতে এক মণ গমের বিনিময়ে দুই মণ গম ক্রয় করল, তাহলে এটা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে না। কেননা, গোলাম এবং তার হাতে যে সম্পদ রয়েছে সবই তার মনিবের মালিকানাধীন বস্তু। কাজেই মনিব এবং তার উক্ত গোলামের মাঝে প্রকৃতপক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ই হচ্ছে না [বরং যেন মনিব তার কিছু সম্পদ পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য সম্পদ রাখল]। আর যখন তাদের মাঝে প্রকৃতপক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ই সংঘটিত হচ্ছে না তখন 'রিবা' বা সুদও সাব্যস্ত হবে না। কেননা, সুদ বলা হয় বিনিময়চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষের অতিরিক্ত বস্তুকে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ بِالْإِتْقَانِ الخ : আর যদি উক্ত গোলামের উপর অন্যদের এই পরিমাণ ঋণ পাওনা থাকে যে তা উক্ত গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি, আর এমতাবস্থায় সে তার মনিবের সাথে 'রিবা'-এর [সুদী] লেনদেন করে তাহলে তা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে এবং নাজায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা এবং সাহেবাইন (র.) একমত, তবে রিবা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে 'রিবা' বলে গণ্য হওয়ার কারণ হলো, তাঁর মতে যখন ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের উপর তার মূল্য সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি অন্যদের ঋণ পাওনা সাব্যস্ত হয় তখন মনিব গোলামের হস্তস্থিত সম্পদের মালিক থাকে না। কাজেই এমতাবস্থায় উক্ত লেনদেনের মাধ্যমে নিজের সম্পদ গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে না; বরং অন্যের সম্পদ 'রিবা'-এর চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে। অতএব, তা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদিও উল্লিখিত অবস্থায় মনিবই গোলামের হস্তস্থিত সম্পদের মালিক থাকে, কিন্তু যেহেতু সে সম্পদের সাথে পাওনাদারদের অধিকার জড়িত হয়ে গেছে সেহেতু গোলাম এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যক্তি (أَجْنَبِي) বলে বিবেচিত হবে। অতএব, ভিন্ন ব্যক্তির সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে যেকোনো সুদ সাব্যস্ত হয়, এ ক্ষেত্রে সেরূপ 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে মনিব এবং তার মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ে আজাদ করার চুক্তিকৃত গোলাম)-এর মাঝে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হয়। কেননা, মুকাতাবও তার চুক্তির কারণে তার উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তির মতোই। তাই তার মাঝে এবং তার মনিবের মাঝে সুদ সাব্যস্ত হয়।

উল্লেখ্য, মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোলামের উপর অন্যদের ঋণ পাওনা থাকার সুরতেও গোলাম এবং তার মনিবের মাঝে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। তবে মনিব যা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হবে অন্যদের পাওনা থাকার কারণে। যেমনিভাবে মনিব যদি উক্ত অবস্থায় গোলামের হস্তস্থিত সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি ছাড়া এমনিতেই গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হয়। তদ্রূপ সুদী লেনদেনের মাধ্যমে যা সে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হবে।

উল্লেখ্য, গোলাম এবং মনিবের মাঝে যেকোনো রিবা বা সুদ সাব্যস্ত হয় না, তদ্রূপ মনিব এবং তার مَدْبَرٌ এবং أُمُّ وَلَدٍ-এর মাঝেও 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না।

قَالَ : وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرَبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ خِلَافًا لِابْنِ بُيُوسَفٍ وَالشَّافِعِيِّ (رح)، لَهُمَا الْأَعْتِبَارُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرَبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا نَّ مَالَهُمْ مَبَاحٌ فِي دَارِهِمْ، قَبَائِي طَرِيقِي أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ أَخَذَ مَالًا مَبَاحًا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَدْرٌ، يَخْلَافُ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ، لِأَنَّ مَالَهُ صَارَ مَحْظُورًا بِعَقْدِ الْأَمَانِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দারুল হরব বা কাফির রাষ্ট্রে মুসলমান এবং হরবী [সেখানকার কাফির বাসিন্দা] -এর মাঝেও 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। [এ ক্ষেত্রে] ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের দলিল হলো, তাদের দেশ থেকে ভিসা গ্রহণ করে আমাদের দেশে আগত ব্যক্তির উপর কিয়াস [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে যেমন আগত ব্যক্তি ও মুসলিম বাসিন্দার মাঝে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হয় তদ্রূপ আলোচ্য ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হবে]। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- “দারুল হারব বা কাফির শত্রু রাষ্ট্রে মুসলিম ও 'হারবী' [কাফির বাসিন্দা]-এর মাঝে কোনো 'রিবা' বা সুদ নেই।” তাছাড়া এ কারণে যে, দারুল হরবে বিদ্যমান অবস্থায় তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ। সুতরাং মুসলমান যে-কোনো উপায়ে তা হস্তগত করলে সে বৈধ সম্পদ হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে, যদি তা হস্তগত করায় বিশ্বাসঘাতকতা না থাকে। পক্ষান্তরে ভিসা গ্রহণ করে আগত ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, ভিসার কারণে তার সম্পদ [আমাদের দেশে থাকা অবস্থায়] হস্তগত করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرَبِيِّ الخ : মাসআলা হলো, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দারুল হরব তথা কাফির রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় কাফির বাসিন্দার সাথে ভিসা নিয়ে কাফির রাষ্ট্রে গমনকারী মুসলমানের কোনো 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না, অর্থাৎ সুদী লেনদেন করা জায়েজ হবে, এ ক্ষেত্রে 'রিবা' বা সুদ হারাম হবে না। এরূপভাবে দারুল হরবের যে বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে চলে আসেনি তার সাথেও ভিসা নিয়ে গমনকারী মুসলিমের সুদী লেনদেন করা জায়েজ হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে উক্ত সুরতেও রিবা বা সুদ সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ সুদী লেনদেন করা হারাম হবে। কাজেই এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ لَهُمَا الْأَعْتِبَارُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا : ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী [এবং ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক] (র.)-এর দলিল হলো কিয়াস, আর তা হলো, যদি কোনো কাফির বাসিন্দা মুসলিম রাষ্ট্রে ভিসা গ্রহণ করে আগমন করে তাহলে মুসলিম রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় তার সাথে মুসলমানদের সুদী লেনদেন করা সকলের ঐকমত্যে হারাম। সুতরাং -এর উপর কিয়াস অনুসারে কোনো মুসলিম যদি ভিসা গ্রহণ করে কাফির রাষ্ট্রে গমন করে, তাহলে সেখানেও তার কাফিরদের সাথে সুদী লেনদেন করা হারাম হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এখানে কেবল জমহুরের কিয়াসের দলিল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মূল দলিল হলো, যে সকল 'নস' [আয়াত বা হাদীস] -এ 'রিবা' বা সুদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা مُطْنَنٌ অর্থাৎ তাতে সুদ হারাম হওয়ার জন্য কোনো স্থান বা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং তা শর্তবিহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং 'রিবা' হারাম হওয়ার বিষয়টি কোনো স্থান বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাস বা নির্দিষ্ট করা যাবে না; বরং তা مُطْنَنٌ বা শর্তমুক্তই রাখতে হবে।

قَوْلُهُ وَكَانَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَرَى بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْعَرَبِيِّ الْخَانِيكَ ۝ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বানী - دَارُ الْعَرَبِ الْمُسْلِمِ وَالْعَرَبِيِّ فِي دَارٍ - এর বানী [কাফির বাসিন্দা]-এর মাঝে কোনো 'রিবা' বা সুদ নেই।

উল্লেখ্য, এ হাদীসটি দুর্বল। ইবনে হুমাম (র.) এবং আনুমান্য যায়লায়ী (র.) বলেছেন, হাদীসটি عُرِبَ হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন كَمْ أَجْنَبَ "হাদীসটি আমি পাইনি"। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.) হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَبُو يَرْسَفَ إِنَّمَا قَالَ أَبُو حَبِيبَةَ (رَحِمَهُ) هَذَا لِأَنَّهُ بَعْضُ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا بَيْنَ أَمَلِ الْحَرْبِ أَطْنَهُ قَالَ وَاهِلِ الْإِسْلَامِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا الْعَوْدُ لَيْسَ بِرِبَايَ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ.

অর্থ- ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) এজন্য উক্ত অভিমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কোনো শাযখ আমাদের কাছে মাকহুল থেকে [মুসলমানরূপে] হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "সুদ সাব্যস্ত হবে না হরবী বাসিন্দাদের মাঝে"। [বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ শব্দও বলেছেন যে, "আর মুসলমানদের মাঝে"। ইমাম বায়হাকী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, হাদীসটি মুরাসাল এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর কাছে বর্ণনাকারী ব্যক্তি অজ্ঞাত বা مَكْحُول। কাজেই এটি দলিল হিসেবে খুবই দুর্বল।

মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে একটি নকলী দলিল উল্লেখ করেছেন। আনুমান্য ইবনে হুমাম (র.) আরেকটি নকলী দলিল উল্লেখ করেছেন। তা হলো, হযরত আবু বকর (রা.) হিজরতের পূর্বে যখন সূরা 'রুম' অবতীর্ণ হয় তখন মক্কার কাফিরদের সাথে রোমবাসীদের পুনরায় বিজয় লাভ করার বিষয়ে বাজি ধরেছিলেন এবং পরবর্তীতে ৭ম হিজরিতে যখন রোমবাসী পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে তখন তিনি তার বাজির সম্পদ কাফিরদের নিকট হতে গ্রহণ করেন এবং নবী করীম ﷺ তা গ্রহণে অনুমতি দান করেন। আর মক্কা তখন ছিল দারুল হরব বা কাফির রাষ্ট্র। এ মর্মের হাদীস তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এবং নাইয়্যার ইবনে মুকাররাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন- হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْأَلُهُمْ مَبَاحٌ فِي دَارِهِمْ، فَيَأْتِي طَرِيقَ أَخَاهُ السَّيِّئِ الْخ: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর আকলী দলিল হলো, [এটি প্রকৃতপক্ষে জমহরের নকলী দলিলের জবাব] দারুল হরবে থাকা অবস্থায় সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য হস্তগত করা বৈধ (مَبَاحٌ الْأَصْل)। কাজেই মুসলামান যে কোনো পন্থায়ই তা হস্তগত করুক তা তার জন্য জায়েজ হবে, তবে শর্ত হলো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। কেননা, বিশ্বাসঘাতকতা কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়। অতএব, কোনো মুসলমান যদি দারুল হরবে ভিসা নিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে সে চুরি বা ডাকাতির বা জোরপূর্বক কোনো হরবী বাসিন্দার সম্পদ হস্তগত করতে পারবে না। কেননা, তাতে ভিসার মাধ্যমে সে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। নতুবা তার জন্য জায়েজ হতো। যেমন- কেউ যদি ভিসা ছাড়া দারুল হরবে প্রবেশ করে জোরপূর্বক তাদের সম্পদ নিয়ে আসে তা জায়েজ হয়। কিন্তু গমনকারী মুসলমান যদি সুদী লেনদেনের মাধ্যমে তাদের সম্পদ হস্তগত করে, তাহলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। কেননা, যে সম্পদ তার জন্য [জোরপূর্বক] হস্তগত করা বৈধ ছিল তা সে গ্রহণ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসঘাতকতাও ছিল না। কেননা, সে অপর পক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তা গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ يَخْلِفُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ مَعْظُورًا الْخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) জমহরের কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হলো, তাদের কিয়াস সঠিক হয়নি। কেননা, দারুল হরবে থাকা অবস্থায় হরবীদের সম্পদ হলো (مَبَاحٌ الْأَصْل) বা "মুসলমানদের জন্য বৈধ সম্পদ" তাই তা সুদী লেনদেনের মাধ্যমে গ্রহণ করলেও ধরা হবে যে, সে তার জন্য যে সম্পদ এমনিতেই গ্রহণ করা বৈধ ছিল তা সে গ্রহণ করেছে, কাজেই সুদ হিসেবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে কোনো হরবী বাসিন্দা ভিসা গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রে আসলে তার সম্পদ মুসলমানদের জন্য হস্তগত করা বৈধ (مَبَاحٌ الْأَصْل) থাকে না। কেননা, ভিসার মাধ্যমে তার জ্ঞান-মাশেয় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। কাজেই সুদী লেনদেনের মাধ্যমে তা গ্রহণ করলে বৈধ সম্পদ গ্রহণ করেছে বলে ধরা হবে না; বরং নিষিদ্ধ সম্পদ (مَنْعٌ مَعْظُورٌ) চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করেছে। অতএব তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

## بَابُ الْحُقُوقِ

وَمِنْ اشْتَرَى مَنْزِلًا فَوْقَهُ مَنْزِلٌ فَلَيْسَ لَهُ الْأَعْلَى، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ، وَمِنْ اشْتَرَى بَيْتًا فَوْقَهُ بَيْتٌ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَعْلَى، وَمِنْ اشْتَرَى دَارًا بِحُدُودِهَا فَلَهُ الْعِلْوُ وَالْكِنِيفُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْبَيْتِ وَالْدَّارِ، فِاسْمِ الدَّارِ يَنْتَظِمُ الْعِلْوُ، لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا أُدِيرَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَالْعِلْوُ مِنْ تَوَابِعِ الْأَصْلِ وَأَجْزَائِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ، وَالْبَيْتُ اسْمٌ لِمَا يُبَاتُ فِيهِ وَالْعِلْوُ مِثْلُهُ وَالشَّيْءُ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِمِثْلِهِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ، إِلَّا بِالتَّنْصِيفِ عَلَيْهِ، وَالْمَنْزِلُ بَيْنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ، لِأَنَّهُ يَتَأْتَى فِيهِ مَرَافِقُ السَّكْنَى مَعَ ضَرْبِ قُصُورٍ، إِذْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَنْزِلُ الدَّوَابِّ، فَلِشَبْهِهِ بِالدَّارِ يَدْخُلُ الْعِلْوُ فِيهِ تَبَعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَّوَابِعِ، وَلِشَبْهِهِ بِالْبَيْتِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ بِدُونِهِ.

### পরিচ্ছেদ : অধিকার

অনুবাদ : কেউ যদি এমন একটি বাসভবন (মَنْزِل) ক্রয় করে, যার উপরে একটি তলা রয়েছে, তাহলে উপরের তলা তার মালিকানাভুক্ত হবে না। অবশ্য যদি সে ভবনটি তার সকল অধিকারসহ কিংবা তার সকল সুবিধাদিসহ কিংবা কমবেশি যা কিছু তাতে রয়েছে বা তা থেকে লাভ করা যায় তা-সহ ক্রয় করে, তাহলে সে উপরের তলারও মালিক হবে। আর কেউ যদি একটি ঘর (بَيْت) তার সকল অধিকারসহ ক্রয় করে, তাহলে উপরের তলা তার ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর কেউ যদি চতুর্দিকের সীমানাসহ কোনো বাড়ি ক্রয় করে, তাহলে উপরের তলা এবং শৌচাগার তার মালিকানাভুক্ত হবে। [ইমাম মুহাম্মদ (র.) এখানে] مَنْزِلٌ , بَيْتٌ এবং دَارٌ -এর আলোচনা একত্রে করেছেন। دَارٌ [বাড়ি] শব্দটি উপরের তলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, دار বলা হয় "চতুঃসীমা বেষ্টিত ভিটি" -কে; আর উপরের তলা হচ্ছে মূল ভিটির অনুবর্তী এবং তার অংশভুক্ত জিনিস। সুতরাং উপরের তলা دَارٌ [বাড়ি]-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর بَيْتٌ [ঘর] বলা হয় "যেখানে রাত্রি যাপন করা হয়" এমন স্থানকে। আর উপরের তলা এর সমকক্ষ। আর কোনো জিনিস তার সমকক্ষ জিনিসের অনুবর্তী হয় না। কাজেই স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া উপরের তলা ঘরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর مَنْزِلٌ [বাসভবন] دَارٌ এবং بَيْتٌ -এর মাঝামাঝি জিনিসকে বুঝায়। কেননা, তাতে বসবাসের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকে। তবে কিছুটা অপূর্ণতা থাকে, কারণ তাতে পশু রাখার ঘর থাকে না। সুতরাং دَارٌ -এর সাথে তার সাদৃশ্য থাকার কারণে مَنْزِلٌ ক্রয়কালে অনুবর্তী সুযোগ-সুবিধাসহ উল্লেখ করলে উপরের তলা অনুবর্তী জিনিসরূপে مَنْزِلٌ বা বাসভবনের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার بَيْتٌ -এর সাথে তার সাদৃশ্য থাকার কারণে [ক্রয়কালে] অনুবর্তী সুযোগ-সুবিধাসহ কথাটি উল্লেখ না করলে উপরের তলা তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**ভূমিকা:** حَقْنُ শব্দটি حَزَقَ -এর বহুবচন। حَزَقَ বলা হয়- مَا يَسْتَعِيقُ الرَّجُلُ অর্থাৎ “কোনো ব্যক্তি যার প্রাপক বা হকদার হয়”। এ পরিচ্ছেদে حَقْنُ ঘারা ঐ সকল বস্তু উদ্দেশ্য যা ক্রয়-বিক্রয়কালে বিক্রয়দ্রব্যের সাথে উল্লেখ না করা হলেও অনুগামী বস্তু হিসেবে ক্রেতার প্রাপ্য বলে সাব্যস্ত হয়।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) সহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারণ উল্লেখ করেছেন যে, এ পরিচ্ছেদটি “ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়” (كِتَابُ الْبَيْعِ) -এর শেষে “ইচ্ছাধিকারের পরিচ্ছেদ” (بَابُ الْخِيَارِ) -এর পূর্বে আলোচনা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল; কিন্তু মুসান্নিফ (র.) তাঁর হিদায়া গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ‘জামিউস সগীর’ গ্রন্থ অনুসারে বিন্যাস করেছেন। তাই ‘জামিউস সগীর’ গ্রন্থে যেহেতু এ পরিচ্ছেদটি ‘রিবার পরিচ্ছেদের’ পরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু মুসান্নিফ (র.)-ও ‘রিবা’-এর পরিচ্ছেদের পরে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, এ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বস্তুসমূহ হচ্ছে মূল বিক্রীত বস্তুর অনুগামী বস্তু (تَوَاتُغ), আর অনুগামী বস্তু মূল বস্তুর পরে হয়ে থাকে, তাই মুসান্নিফ (র.) বিক্রয় সংক্রান্ত মূল মাসআলাসমূহ আলোচনার পরে এ পরিচ্ছেদের মাসআলাগুলো উল্লেখ করেছেন।

**কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা:** بَيْتٌ - বলা হয় চতুর্দিকে দেওয়াল, ছাদ ও দরজাবিশিষ্ট কামরাকে যেখানে রাত্রি যাপন করা যায়; আমাদের পরিভাষায় একে কামরা বা রুম বলা হয়।

مَنْزِلٌ হলো- بَيْتٌ -এর চেয়ে বড়, অর্থাৎ যার মাঝে কয়েকটি কামরা থাকে, রান্নাঘর ও বাথরুম থাকে, কিন্তু তাতে আঙ্গিনা থাকে না।

আর دَارٌ হলো- مَنْزِلٌ -এর চেয়ে বড়। অর্থাৎ যার একাধিক কামরা, গোসলখানা, পাকঘর ও আঙ্গিনা থাকে এবং তা চতুর্দিকের সীমানাযুক্ত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য এ ব্যাখ্যা তৎকালীন আরববাসী এবং কুফাবাসীদের প্রচলন অনুসারে। বর্তমানে এগুলোর নাম ও ব্যাখ্যা ভিন্ন।

قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى مَنْزِلًا أَلِغَ: ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লিখিত ইবারতে তিনটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন-

১. যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি منزل [ঘর] ক্রয় করে যার উপরে একটি তলা রয়েছে, তাহলে ক্রেতা উপরের তলার মালিক হবে না। তবে ক্রয়কালে যদি এভাবে উল্লেখ করে থাকে যে, আমি مَنْزِلٌ [ঘর] টি তার সকল অধিকারসহ কিংবা তার সকল সুযোগ-সুবিধাসহ ক্রয় করলাম, অথবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কমবেশি যা কিছু রয়েছে তা-সহ ক্রয় করলাম, তাহলে ক্রেতা উপরের তলার মালিক হবে। অর্থাৎ এভাবে উল্লেখ করার কারণে উপরের তলা নিচের তলার অনুগামী হিসেবে ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

২. কেউ যদি এমন একটি بَيْتٌ [কামরা] ক্রয় করে যার উপরে আরেকটি কামরা রয়েছে, তাহলে ক্রেতা উপরের কামরাটির মালিক হবে না। এমনকি যদি সে ক্রয়কালে এভাবে বলে থাকে যে, আমি কামরাটির সকল সুযোগ-সুবিধাসহ কিংবা সকল অধিকারসহ অথবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কমবেশি যা কিছু রয়েছে সবসহ ক্রয় করলাম তবুও উপরের কামরাটি ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। [তবে যদি স্পষ্টরূপে বলে যে, আমি নিচের কামরাটি এবং এর উপরের কামরাটি ক্রয় করলাম, তাহলে সে উপরের কামরার মালিক হবে।]

৩. কেউ যদি কোনো دَارٌ [বাড়ি] তার চতুঃসীমাসহ ক্রয় করে তাহলে ক্রেতা উপরের তলার মালিক হবে, তদ্রূপ শৌচাগারেরও মালিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাড়ি বলার কারণে উপরের তলা এমনভাবেই ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে: অতিরিক্ত কোনো শর্ত উল্লেখ করতে হবে না।



মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এখানে دَار - مَنَزِل এবং بَيْت এ তিনটির আলোচনা করেছেন। دَار বা বাড়ি বলা হয়, চতুঃসীমা নির্ধারিত এমন ভিটিকে, যাতে একাধিক কামরা, উপরের তলা, আস্তাবল এবং উন্মুক্ত আগুনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব যেহেতু উপরের তলা বাড়ির একটি অংশ বা অনুগামী বস্তু সেহেতু তা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ না করা হলেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আর بَيْت বলা হয় ছাদবিশিষ্ট একক কামরাকে, যার মাঝে রাত্রি যাপন করা যায়। এর বিধান হলো, ক্রয়কালে স্পষ্টরূপে উপরের তলার কথা উল্লেখ না করা হলে উপরের তলা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, উপরের তলার কামরা নিচের তলার কামরার সমমানের বস্তু। কারণ, সেটিও ছাদবিশিষ্ট একক কামরা। আর সমমানের বস্তু একটি অপরটির অনুগামী (تَابِع) হয় না।

আর مَنَزِل হচ্ছে دَار এবং بَيْت -এর মাঝামাঝি। কেননা, مَنَزِل বলা হয় যা দুই বা ততোধিক কামরাবিশিষ্ট যেখানে দিবসে বাসস্থান এবং রাত্রে অবস্থান করা হয় (يُنْزَلُ فِيهَا لَيْلاً وَنَهَاراً) এবং যার রান্নাঘর ও শৌচাগার রয়েছে। এতে পরিবার নিয়ে বসবাস করা সম্ভব হয়, কিন্তু কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায়, কারণ এতে উন্মুক্ত আগুনা ও পশু রাখার আস্তাবল থাকে না। এর বিধান হলো, যদি কোনো শর্ত উল্লেখ না করে তাহলে উপরের তলা ক্রেতার মালিকানাধীন হবে না। আর যদি অনুগামী বস্তু অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ করে। যেমন- আমি এর সকল সুযোগ-সুবিধা কিংবা সকল অধিকারসহ ক্রয় করলাম অথবা এর যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বস্তুসহ ক্রয় করলাম, তাহলে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্রেতা উপরের তলারও মালিক হয়ে যাবে। কেননা, مَنَزِل হচ্ছে دَار এবং بَيْت -এর মাঝামাঝি। তাই একদিক থেকে এটা بَيْت -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আবার আরেক দিক থেকে دَار -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই بَيْت -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উপরিউক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ না করলে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর دَار -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উপরিউক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ করলে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَقِيلَ فِي عُرْفَيْنَا يَدْخُلُ الْعِلْوُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، لِأَنَّ كُلَّ مَسْكَنٍ يُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ خَانَهُ، وَلَا يَخْلُو عَنْ عِلْوٍ، وَكَمَا يَدْخُلُ الْعِلْوُ فِي إِسْمِ الدَّارِ يَدْخُلُ الْكَنِيفُ، لِأَنَّهُ مِنْ تَوَائِعِهِ، وَلَا يَدْخُلُ الظُّلَّةُ إِلَّا بِذِكْرِ مَا ذَكَّرْنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحم) لِأَنَّهُ مَبْنِيُّ عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَذَ حُكْمَهُ، وَعِنْدَهُمَا إِنْ كَانَ مُفْتَحَهُ فِي الدَّارِ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَّرْنَا لِأَنَّهُ مِنْ تَوَائِعِهِ فَشَابَهُ الْكَنِيفُ .

অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের [বুখারার] প্রচলিত রেওয়াজ অনুসারে উল্লিখিত সকল সুরতই উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, যে কোনো বাসস্থানকে ফারসিতে خَانَه বলা হয়, আর خَانَه উপরের তলাবিহীন হয় না। আর دَار [বাড়ি] শব্দের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে তেমনিভাবে শৌচাগারও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, শৌচাগারও دَار [বাড়ি]-এর অনুবর্তী জিনিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর 'বাড়ি' বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে طَلَّة [বাড়ির প্রবেশমুখ] রাস্তার উপরের ছাউনিবিশিষ্ট বারান্দা অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদি আমাদের পূর্বোল্লিখিত শর্তগুলো উল্লেখ না করে। কেননা, তা রাস্তার উপরে শূন্য তৈরি। সুতরাং তা রাস্তার বিধানই গ্রহণ করবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি তার প্রবেশপথ বাড়ির ভিতরে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পূর্বোল্লিখিত কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, তা دَار বা বাড়ির অনুবর্তী জিনিস, সুতরাং তা শৌচাগারের মতোই হলো।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ পার্থক্যগুলো হচ্ছে কুফাবাসীদের পরিভাষা অনুসারে। পক্ষান্তরে আমাদের [অর্থঃ বুখারা ও সমরকান্দবাসীদের] পরিভাষা অনুসারে সর্বাবস্থায় উপরের তলা বিক্রয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, যে কোনো আবাসস্থলকে ফারসি ভাষায় خَانَه [ঘর] বলে। আর خَانَه সাধারণত উপরের তলা ছাড়া হয় না : কাজেই যে শব্দ উল্লেখ করেছে তা বিক্রয় করুক না কেন উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, دَار [বাড়ি] বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তদ্রূপ শৌচাগারও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, শৌচাগারও دَار-এর অনুগামী বস্তু, কাজেই অনুগামী (تَابِع) হিসেবে তা دَار-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আর طَلَّة বলা হয় এমন চালা বা ছাউনিকে যা বাড়ি থেকে শুরু করে মূল রাস্তা পর্যন্ত নির্মিত হয়ে থাকে : [আর করে] কারো মতে طَلَّة হলো এমন ছাউনি যা দুটি বাড়ির মধ্যবর্তীতে নির্মিত হয়। এর বিধান হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যদি কোনো শর্ত উল্লেখ না করে, তাহলে এটি বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি পূর্বে উল্লিখিত শর্তসমূহের কোনো একটি উল্লেখ করে, [যেমন- আমি এর সকল সুযোগ-সুবিধা কিংবা সকল অধিকারসহ ক্রয় করলাম অথবা এর যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বস্তুসহ ক্রয় করলাম] তাহলে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তা ক্রেতার মালিকানাধীন হবে। কেননা, উক্ত طَلَّة বা ছাউনি নির্মিত হয় [মূল রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছার] ছোট রাস্তার উপর। কাজেই এর বিধানও তাই হবে যা এ ছোট রাস্তার বিধান। আর উক্ত ছোট রাস্তার বিধান হলো উল্লিখিত শর্তসমূহ উল্লেখ করা ছাড়া তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। অতএব, طَلَّة -ও শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি উক্ত طَلَّة বা ছাউনির প্রবেশমুখ বাড়ির অংশের উপর হয়, তাহলে কোনো শর্ত উল্লেখ ছাড়াই তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, তখন এটিও বাড়ির অনুগামী বস্তু বলে গণ্য। অতএব, শৌচাগারের নামে কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ أَوْ مَنَزِلًا أَوْ مَسْكَنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الطَّرِيقُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَكَذَا الشَّرْبُ وَالْمَسِيلُ، لِأَنَّهُ خَارِجُ الْحُدُودِ، إِلَّا أَنَّهُ مِنَ التَّوَابِعِ فَيَدْخُلُ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا تُعَقَّدُ لِلْإِنْتِفَاعِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ، إِذَا الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَشْتَرِي الطَّرِيقَ عَادَةً وَلَا يَسْتَأْجِرُهُ فَيَدْخُلُ تَخْصِيلاً لِلْفَائِدَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ، أَمَّا الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَبْنَعِ مُمَكِّنٌ بِذَوْنِهِ، لِأَنَّ الْمُسْتَرَى عَادَةً يَشْتَرِيهِ، وَقَدْ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَحَصَلَتِ الْفَائِدَةُ۔

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো বাড়ির একটি ঘর বা একটি বাসভবন কিংবা একটি বাসস্থান ক্রয় করে, তাহলে রাস্তা তার মালিকানাভুক্ত হবে না। অবশ্য যদি সে তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অধিকারসহ কিংবা সুযোগ-সুবিধাসহ অথবা তার কমবেশি যা কিছু রয়েছে তা সহ ক্রয় করে, তাহলে অন্তর্ভুক্ত হবে। পানির হিসসা এবং পানির নালার বিষয়টিও এরূপ। কেননা, এগুলো বিক্রীত জিনিসের চতুঃসীমার বহির্ভূত। তবে এগুলো যেহেতু তার অনুবর্তী জিনিস তাই অনুবর্তী জিনিসের কথা উল্লেখ করলে এগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে ইজারার বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ ইজারার ক্ষেত্রে উল্লেখ ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হবে]। কেননা, ইজারার চুক্তি সম্পাদন করা হয় উপকার লাভ করার জন্য। আর উক্ত জিনিসগুলো ছাড়া [শুধু ঘর বা ভবন দ্বারা] উপকার লাভ করা যায় না। কেননা, ভাড়ায় গ্রহণকারী ব্যক্তি সাধারণত আলাদাভাবে রাস্তা ক্রয় করে না বা তা ভাড়ায় গ্রহণ করে না। সুতরাং ইজারার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন হওয়ার জন্য উক্ত জিনিসগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে [ক্রয়ের ক্ষেত্রে] উক্ত জিনিসগুলো ছাড়াও বিক্রীত [ঘর বা ভবন] দ্বারা উপকার লাভ করা সম্ভব। কেননা, ক্রয়কারী সাধারণত তা আলাদাভাবে ক্রয় করে, আবার কখনও সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকে, তখন সে রাস্তা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই তা বিক্রয় করতে পারে। ফলে তার ফায়দা অর্জিত হয়ে যায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ الْخ : মাসআলা হলো, যদি কেউ কোনো একটি বাড়ির একটি কামরা বা একটি ঘর বা আবাসগৃহ ক্রয় করে, তাহলে ক্রেতা এগুলোর সংশ্লিষ্ট রাস্তার মালিক হবে না। তবে ক্রেতা যদি ক্রয়কালে পূর্বে উল্লিখিত শর্তসমূহের কোনো একটি উল্লেখ করে [যেমন- আমি এর সকল অধিকারসহ কিংবা সকল সুযোগ-সুবিধাসহ অথবা এর সংশ্লিষ্ট সবকিছুসহ ক্রয় করলাম] তাহলে ক্রেতা রাস্তার মালিক হবে।

এরূপভাবে জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পানির হিসসা [পানি নেওয়ার অধিকার] এবং পানির নালারও একই বিধান অর্থাৎ কোনো শর্ত উল্লেখ না করলে জমির ক্রেতা পানির হিসসা এবং পানির নালার মালিক হবে না, আর উপরিউক্ত কোনো শর্ত উল্লেখ করলে মালিক হবে।

দলিল হলো, উপরিউক্ত তিনটি বস্তু— রাস্তা, পানির হিসসা ও পানির নালা— এক্ষেত্রে ক্রেতার ক্রয়কৃত বস্তু [কামরা, ঘর, আবাসগৃহ কিংবা জমি]—এর সীমানার বহির্ভূত জিনিস। কাজেই অনুগামী বস্তু অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ না করলে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে উক্ত তিনটি জিনিসই অনুগামী বস্তু, অর্থাৎ রাস্তা ঘর এবং কামরার জন্য অনুবর্তী (تَوَاتُرًا) আর পানির হিসসা এবং পানির নালা জমির জন্য অনুবর্তী। কেননা, রাস্তা ছাড়া শুধু ঘর বা কামরা দ্বারা, একপভাবে পানি বা পানির নালা ব্যতীত জমি দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই অনুবর্তী বস্তু অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ করাব কারণে তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا تُعَقَّدُ لِلِإِنْتِفَاعِ الْعَيْنِ : মুসল্লিফ (র.) বলেন, তবে ইজারা বা ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে এর বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বাড়ির একটি কামরা বা একটি ঘর (مَنْزِلًا) ভাড়া গ্রহণ করে, তাহলে পূর্বেই কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই ভাড়া গ্রহণকারী রাস্তা ব্যবহারের অধিকার লাভ করবে। তদ্রূপ কেউ জমি ভাড়া নিলে সে কোনো শর্ত উল্লেখ ছাড়াই পানির হিসসা এবং পানির নালা ব্যবহার করার অধিকার লাভ করবে। এক্ষেত্রে অনুগামী বস্তু (تَوَاتُرًا) অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ করা আবশ্যিক হবে না।

ক্রয় এবং ভাড়া গ্রহণ করার মাঝে বিধানের এ পার্থক্যের কারণ হলো, ইজারা বা ভাড়ার চুক্তির উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে বস্তুটি থেকে উপকার অর্জন করা। এ কারণেই যে সকল জিনিস দ্বারা এখনই উপকার অর্জন করা সম্ভব নয় সে সকল জিনিস ভাড়া নেওয়ার চুক্তি সঠিক হয় না। অতএব, যখন ইজারার উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপকার অর্জন করা, আর রাস্তা ব্যতীত ঘর বা কামরা দ্বারা এবং পানি ও পানির নালা ব্যতীত জমি দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়; [আর সাধারণত ভাড়া গ্রহণকারী রাস্তা বা পানির নালা আলাদাভাবে ক্রয় করে না কিংবা আলাদাভাবে ভাড়াও নেয় না] তাই ইজারার মাধ্যমে উপকার অর্জন করার জন্য ঘর ও কামরার ইজারার ক্ষেত্রে রাস্তা এবং জমি ইজারার ক্ষেত্রে পানির হিসসা এবং পানির নালা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাস্তা, পানির হিসসা ও পানির নালা অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়াও ক্রেতার উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে কেননা, ক্রেতা সাধারণত রাস্তা বা পানির নালা আলাদাভাবে ক্রয় করে আবার কখনো সে কেবল অন্যের কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যেই ক্রয় করে। কাজেই রাস্তা, পানির হিসসা এবং পানির নালা অন্তর্ভুক্ত না হলেও তার ক্রয়ের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। সুতরাং কোনো শর্ত উল্লেখ না করলে এগুলো তার ক্রয়কৃত জিনিসটির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

## بَابُ الْإِسْتِحْقَاقِ

وَمِنْ أَشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بَيْنَهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَوَلَدَهَا، وَإِنْ أَقْرَبُ بِهَا لِرَجُلٍ لَمْ يَنْتَبِعْهَا وَلَدَهَا، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْبَيْتَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ فَإِنَّهَا كَاسِمُهَا مُبَيَّنَةٌ، فَيُظْهَرُ بِهَا مِنْكَ مِنَ الْأَصْلِ، وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا، فَيَكُونُ لَهُ أَمَّا الْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْمَخْبَرِ بِهِ ضَرُورَةٌ صَحَّةُ الْإِخْبَارِ، وَقَدْ إِنْدَفَعَتْ بِإِثْبَاتِهِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ، فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ، ثُمَّ قِيلَ يَدْخُلُ الْوَلَدُ فِي الْقَضَاءِ بِالْأَمِّ تَبَعًا، وَقِيلَ يُشْتَرِطُ الْقَضَاءُ بِالْوَلَدِ، وَإِلَيْهِ تُشِيرُ الْمَسَائِلُ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالرَّوَايَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا تَدْخُلُ الرَّوَايَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَذَا الْوَلَدُ إِذَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ بِالْأَمِّ تَبَعًا .

### পরিচ্ছেদ : অধিকার দাবি করা

অনুবাদ : কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে, অতঃপর দাসী তার কাছে থাকাবস্থায় সন্তান প্রসব করে; তারপর কোনো ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে উক্ত দাসীর মালিকানা দাবি করে, তাহলে সে দাসীটি তার সন্তানসহ পাবে। আর যদি কেহ তা কোনো ব্যক্তির অনুকূলে দাসীটির মালিকানা স্বীকার করে, তাহলে সন্তানটি দাসীর অনুবর্তী হবে না। উভয় সূরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, **بَيْتَةٌ** [সাক্ষ্য-প্রমাণ] হচ্ছে সর্বব্যাপী প্রমাণ। কেননা, **بَيْتَةٌ** শব্দের অর্থ প্রকাশকারী। সুতরাং **بَيْتَةٌ** [সাক্ষ্য-প্রমাণ] দ্বারা মূল থেকেই দাবিদারের মালিকানা প্রকাশ পাবে। আর সন্তানটি দাসীর সাথে যুক্ত ছিল। কাজেই সেও তার হবে। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি হচ্ছে, সীমিত পরিধির প্রমাণ, যা বর্ণিত জিনিসের মাঝে [স্বীকার করার মুহূর্তে] মালিকানা সাব্যস্ত করে স্বীকারকারীর বর্ণনা সঠিক বলে গ্রহণ করার অপরিহার্য তাগিদে। আর এ অপরিহার্য তাগিদ সন্তান [দাসী থেকে প্রসবের মাধ্যমে] বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মালিকানা সাব্যস্ত করার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং সন্তান লোকটির মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে না। অতঃপর কেউ কেউ বলেন, আদালতে মাতার সম্পর্কে রায় হলেই সন্তান মাতার অনুবর্তী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর কারো কারো মতে সন্তান সম্পর্কেও আদালতের রায় আবশ্যিক হবে। [মাবসূতে বর্ণিত] মাসআলাসমূহ এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, বিচারক যদি মূল থেকে সৃষ্ট অতিরিক্ত জিনিসসমূহ সম্পর্কে না জানে [এবং মূল সম্পর্কে কারো অনুকূলে রায় প্রদান করে] তাহলে সৃষ্ট অতিরিক্ত জিনিসসমূহ রায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তদ্রূপ সন্তান যদি অন্য কারো দখলে থাকে, তাহলে মাতার সম্পর্কে রায় প্রদান করা হলে সন্তান অনুবর্তী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হুম্বিকা: اسْتَحَقَّ -এর অর্থ হলো طَلَبَ الْمَعَى "অধিকার দাবি করা"। এ পরিচ্ছেদে বিক্রয়ের পর বিক্রীত দ্রব্যে অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানা দাবি করা সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ পরিচ্ছেদটি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল পরিচ্ছেদ আলোচনা করার পরে উল্লেখ করা অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল কেননা, বিক্রীত-দ্রব্যে অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাহ্যিকভাবে বিক্রয় সহীহ হওয়ার পর তা আবার সহীহ না হওয়ার প্রকাশ পাওয়া। কাজেই তা বাহ্যিকভাবে সহীহ হওয়ার সকল সুরত বর্ণিত হওয়ার পরেই উল্লেখ করা অধিক যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু যেহেতু এর পূর্বের পরিচ্ছেদ بَابُ الْحَقْوَق -এর সাথে এ পরিচ্ছেদের শব্দের দিক থেকে এবং অর্থের দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে, তাই মুসান্নিফ (র.) এ পরিচ্ছেদকে بَابُ الْحَقْوَق -এর পরে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عَنْهُ فَاسْتَحَقَّهَا زَعْلُ الْخ: মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করে আর ক্রয়ের পরে সে ক্রেতার নিকট কোনো সন্তান প্রসব করে, তারপর অন্য কোনো ব্যক্তি এসে দাসীটির মালিকানা দাবি করে, তাহলে এক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি মালিকানার দাবিদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তার দাবি সাব্যস্ত করে থাকে, তাহলে সে দাসীটির সাথে তার সন্তানটিরও অধিকারী হবে। আর যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে থাকে; বরং কেবল ক্রেতা এই বলে স্বীকারোক্তি করে যে, হ্যাঁ, দাসীটির প্রকৃত মালিক সে, তাহলে মালিকানার দাবিদার ব্যক্তি কেবল দাসীটির অধিকারী হবে; তার সন্তানটির অধিকারী হবে না।

قَوْلُهُ وَزَعْلُ الْفَرْقِ أَنَّ النِّسْنَةَ حَقٌّ سَطَقَهُ الْخ: সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং শুধু স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিধানগত এ পার্থক্যের কারণ হলো, সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে একটি সর্বব্যাপী দলিল, অর্থাৎ এটি কেবল যার বিপক্ষে ফয়সালা হয় তার উপরই কার্যকরী হয় না; বরং সংশ্লিষ্ট সকলের উপর কার্যকরী হয়। কেননা, نِسْنَةٌ [সাক্ষ্য-প্রমাণ]-এর শব্দের অর্থ যেমন প্রকাশকারী তেমনি কার্যত এটি পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকা বিষয়কে প্রকাশ করে। কারণ, সাক্ষীগণ যখন সাক্ষ্য প্রদান করে তখন এরূপ হওয়া সম্ভব নয় যে, তারা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মালিকানা সাব্যস্ত করছে; বরং এরূপ হবে যে, পূর্বে যে মালিকানা ছিল তা প্রকাশ করছে। [এ কারণেই যদি কোনো একটি বস্তু একজনের কাছ থেকে কেউ ক্রয় করে তারপর সে আবার আরেকজনের নিকট বিক্রি করে এবং এভাবে কয়েকজন পর্যন্ত বস্তুটি বিক্রি হয়, অতঃপর সর্বশেষ ক্রেতার বিপক্ষে বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করে যে, প্রথম বিক্রেতা বস্তুটির মালিক ছিল না বরং অন্য এক ব্যক্তি বস্তুটির মালিক, তাহলে সর্বশেষ ক্রেতা যেরূপ তার কাছে বিক্রয়কারীর নিকট হতে মূল্য ফেরত নিবে তদ্রূপ তার পূর্বের ক্রেতাগণও নিজ নিজ বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি এ ফয়সালা সর্বশেষ ক্রেতার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তাহলে কোনো ক্রেতা তার নিকট বিক্রয়কারীর কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে না।] সারকথা হচ্ছে— যেহেতু نِسْنَةٌ [সাক্ষ্য-প্রমাণ] দাবিকৃত জিনিসের উপর পূর্ব থেকে বিদ্যমান মালিকানা সাব্যস্ত বা প্রকাশ করে, আর পূর্বে সন্তানটি দাসীটির সাথে [তার গর্ভে] সম্পৃক্ত ছিল সেহেতু সন্তানটিও দাবিদার ব্যক্তির সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় যদি দাসীর মালিকানা কারো পক্ষে সাব্যস্ত হয় তাহলে সন্তানটিও তার বলে সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ حَقٌّ فَاصْرُ الْخ: পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি (إِقْرَار) হচ্ছে সীমিত পরিধির দলিল। অর্থাৎ এর কার্যকারিতা কেবল স্বীকারকারীর উপরই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদের উপর তা কার্যকরী হয় না। কেননা, কোনো ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে [সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া] শুধু তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কারো বিপক্ষে কোনো ফয়সালা কার্যকর করবে বা চাপিয়ে দিবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কেবল স্বীকারকারী ব্যক্তির কথা সঠিক সাব্যস্ত করার প্রয়োজনের তাকিদে স্বীকারকৃত জিনিসের মাঝে অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর তার কথা সঠিক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মালিকানা ছিল বলে ফয়সালায় আবশ্যিকতা নেই; বরং বর্তমানে দাবিদার ব্যক্তি দাসীটির মালিক এতটুকু সাব্যস্ত করলেই স্বীকারকারীর

স্বীকারোক্তি সাঠিক সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর বর্তমানে যেহেতু সন্তানটি দাসীটি থেকে পৃথক, তাই দাসীর উপর দাবিদারের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা সন্তানটির উপর মালিকানা সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَبْدُوْهُ الْوَلَدُ فِي الْقَضَاءِ بِأَلَا تَعْلَمُ النِّح : মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রথম সূরতে অর্থাৎ দাবিদার ব্যক্তি যদি সাক্ষা-প্রমাণের ভিত্তিতে দাসীটির মালিকানা সাব্যস্ত করে, তাহলে দাবিদার ব্যক্তি সন্তানটির হকদার হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি সন্তানটি সম্পর্কে বিচারকের ফয়সালায় উল্লেখ থাকতে হবে নাকি কেবল মাতা সম্পর্কে ফয়সালা হলেই দাবিদার সন্তানটি নিতে পারবে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের দুটি অভিমত রয়েছে। কারো কারো মতে সন্তান সম্পর্কে বিচারকের ফয়সালায় উল্লেখের আবশ্যিকতা নেই; বরং মাতা সম্পর্কে রায় হলেই দাবিদার সন্তানসহ গ্রহণ করতে পারবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার মাতার উপর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারাই সন্তানের উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে, কাজেই রায়ের ক্ষেত্রেও মাতা সম্পর্কে রায়ের মাধ্যমেই সন্তানের ব্যাপারে রায় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আর কারো কারো মতে সন্তানের ব্যাপারে বিচারকের ফয়সালা আবশ্যিক হবে। বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত দাবিদার সন্তান নিতে পারবে না। আন্বামা ইবনে হুমা (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ মতটিই হানাফী মাযহাবের সঠিক অভিমত।

قَوْلُهُ وَالْيَوْمِ تَشِيرُ الْمَسَائِلُ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ النِّح : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলা দ্বারা দ্বিতীয় মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি বিচারক زَوَانِد [মূল জিনিস থেকে সৃষ্ট জিনিসসমূহ যেমন- গরুর বাচ্চা, দাসীর সন্তান ইত্যাদি] সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে এবং মূল জিনিসটি সম্পর্কে কারো পক্ষে ফয়সালা করে, তাহলে زَوَانِد [সৃষ্ট জিনিসসমূহ] ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত হবে না অর্থাৎ যার পক্ষে ফয়সালা হয়েছে সে এগুলোর অধিকারী হবে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, زوائد [সৃষ্ট জিনিসসমূহ] সম্পর্কে স্পষ্ট বা পৃথক ফয়সালা আবশ্যিক।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْوَلَدُ إِذَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ النِّح : এরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, যদি সন্তান কোনো অনুপস্থিত (غَائِب) ব্যক্তির হাতে থাকে আর মাতা [দাসী] উপস্থিত ব্যক্তির হাতে থাকে, আর এমনভাবে যদি বিচারক মাতা সম্পর্কে কারো পক্ষে ফয়সালা করে, তাহলে সন্তান মাতার অনুবর্তী (تَابِع) হিসেবে ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত হবে না। উল্লেখ্য, যদিও অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে তার অনুপস্থিতিতে ফয়সালা কার্যকর হয় না, কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষের ফয়সালাটি যদি উপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফয়সালার ضَمَن -এ [অনুগামী হিসেবে] হয়, তাহলে কার্যকর হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে যেহেতু সন্তানটি তার মাতার ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, তাই বুঝা গেল যে, আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও সন্তানটি তার মাতার ফয়সালায় অন্তর্ভুক্ত হবে না; তার জন্য বিচারকের স্পষ্ট ফয়সালা আবশ্যিক হবে।

قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَإِذَا هُوَ حُرٌّ، وَقَدْ قَالَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتَنِي، فَإِنِّي عَبْدٌ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا غَنِيَةً مَعْرُوفَةً لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ، وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ أَرْتَهَنَ عَبْدًا مُقِرًّا بِالْعَبْدِيَّةِ فَوَجَدَهُ حُرًّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِمَا، لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِالْمَعَاوِضَةِ أَوْ بِالْكَفَالَةِ، وَالْمَوْجُودُ لَيْسَ إِلَّا الْأَخْبَارُ كَإِذَا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ الْأَجَنِيُّ ذَلِكَ أَوْ قَالَ الْعَبْدُ إِرْتَهَنِي فَإِنِّي عَبْدٌ، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি গোলাম ক্রয় করে, অতঃপর দেখা গেল যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি; অথচ গোলাম ক্রেতাকে বলেছিল যে, আপনি আমাকে ক্রয় করুন, আমি তার গোলাম, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে কিংবা জ্ঞাত স্থানে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উক্ত গোলামের উপর কোনো জারিমানা আরোপিত হবে না। আর যদি বিক্রেতা কোথায় আছে তা জানা না থাকে তাহলে ক্রেতা উক্ত গোলামের নিকট হতে মূল্য ফেরত নেবে, আর গোলাম সে মূল্য বিক্রেতার নিকট হতে ফেরত নেবে। আর নিজে দাস বলে স্বীকারকারী কোনো গোলামকে কেউ যদি বন্ধকরূপে গ্রহণ করে, আর পরে দেখে যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি, তাহলে কোনো সুরতেই সে গোলাম [স্বীকারকারী ব্যক্তি]-এর কাছ থেকে অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, ক্রয় এবং বন্ধক গ্রহণ এ উভয়ের কোনো সুরতেই সে গোলামের নিকট হতে অর্থ ফেরত পাবে না। কেননা, মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ হয় কেবল পারস্পরিক বিনিময় গ্রহণ কিংবা দায়ভার গ্রহণের ক্ষেত্রে। আর এখানে আছে শুধু মিথ্যা সংবাদ প্রদান। কাজেই [প্রথম মাসআলার] বিষয়টি যেন এমন হলো যে, কোনো তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত কথা বলল কিংবা 'গোলাম' বলল যে, আমি গোলাম, আমাকে বন্ধকরূপে গ্রহণ করুন, আর এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় মাসআলা [যেখানে সকলের মতেই গোলামের নিকট হতে মূল্য ফেরত নিতে পারবে না]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نَوَلَهُ قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدًا : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করল [যে প্রকৃতপক্ষে গোলাম নয়; বরং স্বাধীন ব্যক্তি] ক্রয়কালে [কথিত] গোলামটি ক্রেতাকে বলল যে, আপনি আমাকে ক্রয় করুন, আমি গোলাম। পরবর্তীতে [সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে] জানা গেল যে, ক্রয়কৃত ব্যক্তি গোলাম নয়; বরং সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি। তাহলে এক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি বিক্রেতা নিকটেই অবস্থানরত থাকে কিংবা দূরে এমন স্থানে অবস্থানরত থাকে যার ঠিকানা জানা আছে, তাহলে ক্রয়কৃত ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হবে না; বরং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে তার পরিশোধকৃত মূল্য ফেরত নিবে। আর যদি বিক্রেতা এমন স্থানে অবস্থানরত থাকে যার ঠিকানা জানা নেই, তাহলে ক্রেতা [গোলাম হিসেবে] ক্রয়কৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পরিশোধকৃত মূল্য আদায় করে নিবে। আর সে ব্যক্তি বিক্রেতাকে খুঁজে তার থেকে সমপরিমাণ মূল্য ফেরত নিবে।



দ্বিতীয় মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হতে কোনো ঋণের বিনিময়ে একটি গোলাম [যে প্রকৃতপক্ষে গোলাম নয়; বরং স্বাধীন ব্যক্তি] বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করল, আর বন্ধক হিসেবে গ্রহণকালে [কথিত] গোলামটি বলল, আমাকে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করুন, আমি একজন গোলাম। পরবর্তীতে [সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে] জানা গেল যে, বন্ধককৃত ব্যক্তি গোলাম নয়; বরং সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, কোনো অবস্থায়ই বন্ধকগ্রহণকারী বন্ধককৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তিটির কাছ থেকে কোনো জরিমানা আদায় করতে পারবে না। চাই বন্ধকদাতা নিকটেই অবস্থানকারী হোক কিংবা অজ্ঞাত স্থানে অবস্থানকারী হোক।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُسُفٍ (رَدَّ) أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا : মাসআলা দুটিতে উপরে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের তিন ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত জাহির রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ)। অর্থাৎ জাহির রেওয়ায়েত অনুসারে তিন ইমামের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। পক্ষান্তরে জাহিরী রেওয়ায়েত ব্যতীত ভিন্ন একটি বর্ণনা অনুসারে উপরিউক্ত মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মতে দ্বিতীয় মাসআলার ন্যায় প্রথম মাসআলায়ও ফেতা [গোলাম হিসেবে] ক্রয়কৃত ব্যক্তির নিকট হতে কোনো অবস্থায় পরিশোধকৃত মূল্য আদায় করতে পারবে না। অর্থাৎ তাঁর মতে বন্ধক গ্রহণ এবং ক্রয় উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান। قَوْلُهُ لِأَنَّ الرَّحْمَنَ بِالْعَمَارَةِ أَوْ بِانْكَفَالِ الْخ : এ বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মূল্য ফেরত গ্রহণ করার অধিকার সাব্যস্ত হতে পারে দুটি কারণে—

১. বিনিময়চুক্তির কারণে।
২. জিমাদার হওয়া বা দায়ভার গ্রহণ করার কারণে। আর উপরিউক্ত প্রথম মাসআলা তথা ক্রয়ের মাসআলায় ক্রয়কৃত [কথিত] গোলাম ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে এ দুটি কারণের কোনোটিই পাওয়া যায়নি। 'বিনিময়চুক্তি' পাওয়া যায়নি তার কারণ হচ্ছে সে ক্রেতার সাথে চুক্তি করেনি এবং কোনো কিছু গ্রহণও করেনি। আর 'দায়ভার গ্রহণ' পাওয়া যায়নি, তার কারণ হচ্ছে সে ক্রেতার নিকট এ মর্মে দায়িত্ব গ্রহণ করেনি যে, ক্রয়কৃত জিনিস সঠিক না হলে সে মূল্য ফেরত দিবে; বরং ক্রয়কৃত ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে কেবল মিথ্যা বক্তব্য পাওয়া গেছে। সুতরাং যেহেতু তার পক্ষ থেকে বিনিময়চুক্তি বা দায়ভার গ্রহণ এ দুটির কোনোটিই পাওয়া যায়নি সেহেতু তার নিকট হতে মূল্য ফেরত গ্রহণ করার অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ الْأَجَنِيُّ ذَلِكْ أَوْ قَالَ الْعَبْدُ إِرْتِهَانِ الْخ : ইমাম ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে কিয়াস হিসেবে দুটি মাসআলা পেশ করা হয়—

১. আলোচ্য ক্রয়ের মাসআলাটিতে যদি ক্রয়কৃত ব্যক্তিটি উক্ত কথা না বলত বরং তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি ফেতাকে বলত যে, “আপনি একে ক্রয় করুন, এ একজন গোলাম।” তাহলে সকলের মতেই উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির মিথ্যা বক্তব্যের কারণে তার উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হতো না। কাজেই ক্রয়কৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তির মিথ্যা কথার কারণেও তার উপর জরিমানা সাব্যস্ত হবে না।
২. উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় মাসআলাটি তথা বন্ধক গ্রহণ করার মাসআলা। অর্থাৎ বন্ধক গ্রহণ করার সুরতে যেমন সকলের ঐকমত্যে বন্ধককৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তির মিথ্যা বক্তব্যের কারণে তার উপর জরিমানা সাব্যস্ত হয় না, তদ্রূপ প্রথম সুরত তথা ক্রয় করার মাসআলায়ও তার উপর জরিমানা বা মূল্য ফেরত দেওয়ার বিধান সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ তিনটি মাসআলায়ই উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেবল মিথ্যা বক্তব্য পাওয়া গেছে, কাজেই তিন মাসআলার বিধানও একই হবে।

وَلَهُمَا أَنْ الْمُشْتَرَى شَرَعَ فِي الشِّرَاءِ مُعْتَمِدًا عَلَى أَمْرِهِ وَأَقْرَارِهِ أَنْتَى عَبْدٌ، إِذِ الْقَوْلُ لَهُ فِي الْحَرَبَةِ، فَيُجْعَلُ الْعَبْدُ بِالْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ لَهُ عِنْدَ تَعَدُّرِ رَجُوعِهِ عَلَى الْبَائِنِ دَفْعًا لِلْفُرُورِ وَالضَّرَرِ، وَلَا تَعَدُّرُ إِلَّا فِيمَا لَا يَغْفَرُ مَكَانَهُ، وَالْبَيْعُ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ فَامْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ الْأَمْرُ بِهِ ضَامِنًا لِلْسَّلَامَةِ كَمَا هُوَ مُوجِبُهُ بِخِلَافِ الرِّهْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ وَثِيقَةٌ لِاسْتِنْفَاءِ عَيْنِ حَقِّهِ حَتَّى يَجُوزَ الرِّهْنُ بِبَدْلِ الصَّرْفِ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ مَعَ حُرْمَةِ الْإِسْتِئْذَالِ، فَلَا يُجْعَلُ الْأَمْرُ بِهِ ضَامِنًا لِلْسَّلَامَةِ، وَبِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، لِأَنَّهُ لَا يُعْجَبُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْفُرُورُ، وَنَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا قَوْلُ الْمَوْلَى: بَايَعُوا عَبْدِي هَذَا، فَإِنِّي قَدْ أَذْنْتُ لَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ بِرَجْعُونٍ عَلَيْهِ بِقِيَمَتِهِ -

অনুবাদ : আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ক্রেতা গোলামের নির্দেশ এবং তার "আমি গোলাম" এ স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করেই ক্রয় করতে উদ্যোগী হয়েছে। কেননা, স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিক্রেতার নিকট হতে মূল্য ফেরত নেওয়া সম্ভব না হওয়ার সুরতে ক্রয় করতে নির্দেশ দেওয়ার কারণে [কথিত] গোলামকেই মূল্যের জামিন বলে সাব্যস্ত করা হবে, যাতে ধোঁকা ও ক্ষতির প্রতিকার হয়ে যায়। আর বিক্রেতার অবস্থানস্থল অজ্ঞাত থাকার সুরত ব্যতীত [অন্য] সুরতে বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া অসম্ভব নয়। আর ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে পারস্পরিক বিনিময়চুক্তি। সুতরাং ক্রয়ের আদেশদাতাকে বিক্রয়-দ্রব্যের সঠিক হওয়ার দায়ভার গ্রহণকারী সাব্যস্ত করা হবে, আর বিক্রয়-দ্রব্য সঠিক হওয়া হচ্ছে বিক্রয়চুক্তির দাবি। পক্ষান্তরে বন্ধক-চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা পারস্পরিক বিনিময়চুক্তি নয়; বরং তা হচ্ছে বন্ধকগ্রহণকারীর মূল প্রাপ্য উসূল করার নিশ্চয়তার একটি মাধ্যম। এ কারণেই 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে বিনিময় দ্রব্যের বিপরীতে এবং 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' তথা দাদনকৃত দ্রব্যের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েজ। অথচ এ দুটি ক্ষেত্রে মূল প্রাপ্যের পরিবর্তে অন্য বস্তু গ্রহণ করা হারাম। সুতরাং বন্ধক গ্রহণের আদেশকে বন্ধকী বস্তুটি সঠিক হওয়ার দায়ভার গ্রহণ বলে সাব্যস্ত করা যায় না। অনুরূপভাবে তৃতীয় ব্যক্তির আদেশ বা বক্তব্যের বিষয়টিও ভিন্ন। [গোলাম বা স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে] তার কথা ধর্তব্যই নয়। কাজেই [তার কথার কারণে] ধোঁকা সাব্যস্ত হবে না। আমাদের আলোচ্য মাসআলাটির নজির এই যে, মনিব [বাজারে] ঘোষণা করে দিল যে, তোমরা আমার এ গোলামের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে পার। কেননা, আমি তাকে [ব্যবসা করার] অনুমতি দিয়েছি। অতঃপর গোলামটির অধিকার প্রকাশ পেল [অর্থাৎ দেখা গেল যে, সে গোলাম নয়; বরং স্বাধীন ব্যক্তি]। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ উক্ত কথিত গোলামের বাজারমূল্য ফেরত নিবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنْ الشَّيْءَ يُشْرَعَ فِي الشَّرَاءِ الْغِ : আর জাহির রেওয়ায়েত ব্যতীত ভিন্ন রেওয়ায়েতটি অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, প্রথম মাসআলায় ক্রেতা ক্রয় করতে উদ্যোগী হয়েছে [কথিত] গোলামটির "আমাকে ক্রয় করুন" এ নির্দেশ এবং "আমি গোলাম" তার স্বীকারোক্তির উপর ভরসা করে। কেননা, গোলাম হওয়া বা সাধন হওয়ার ক্ষেত্রে তার কথাই ধর্তব্য। কাজেই উক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা ক্রয়কৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতারণার শিকার হয়েছে। আর যে সকল বিনিময়চুক্তিতে বিনিময়-দ্রব্য সঠিক থাকা চুক্তির দাবি সে সকল চুক্তিতে প্রতারণা করা প্রত্যাহারের জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য হয়। আর বিক্রয় হচ্ছে এরূপ একটি বিনিময়চুক্তি। কাজেই বিক্রেতার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা সম্ভব না হওয়ার সুরতে ক্রয়কৃত ব্যক্তিকেই মূল্য ফেরত দেওয়ার জন্য জাযিন বা জিন্মাদার সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, তার পক্ষ থেকেও ক্রেতা প্রতারণার শিকার হয়েছে। অবশ্য বিক্রেতার অবস্থানের ঠিকানা জানা থাকার সুরতে যেহেতু বিক্রেতার কাছ থেকেই জরিমানা আদায় করা সম্ভব, তাই এ সুরতে ক্রয়কৃত ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে না।

قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ عَقْدٌ مَعَاوَضَةٌ لَأَمْرٍ أَنْ يُجْعَلَ الْأَمْرُ بِه ضَائِنًا الْغِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। প্রথমে বন্ধকের মাসআলার সাথে কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হলো, ক্রয়ের মাসআলা এবং বন্ধক রাখার মাসআলা এক নয়; উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই বন্ধকের মাসআলার সাথে ক্রয়ের মাসআলাটির কিয়াস সঠিক হবে না। পার্থক্য হলো এই যে, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে একটি বিনিময়চুক্তি এবং এ চুক্তির দাবি হচ্ছে উভয় দিকের বিনিময়-দ্রব্য সঠিক থাকা। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিনিময়চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতারণা জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত ব্যক্তির নির্দেশটি বিক্রয়-দ্রব্য সঠিক হওয়ার দায়ভার গ্রহণ বলে বিবেচিত হবে। তাই বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় সম্ভব না হওয়ার সুরতে তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে।

পক্ষান্তরে বন্ধক রাখা ও গ্রহণ করা কোনো বিনিময়চুক্তি নয়। কেননা, প্রাপ্য ঋণের বিনিময় হিসেবে বন্ধক গ্রহণ করা হয় না; বরং প্রাপ্য ঋণ উসূল করার নিশ্চয়তার জন্য বন্ধক গ্রহণ করা হয়। এ কারণেই [অর্থাৎ বন্ধক যে বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, এ কারণেই] 'বায় সরফ' [মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয়]-এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের মুদ্রা হস্তগত করার পূর্বে তার স্থলে বন্ধক গ্রহণ করা জায়েজ। এরূপভাবে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত দ্রব্য] হস্তগত করার পূর্বে তার স্থলে কোনো কিছু বন্ধক রাখা জায়েজ। অথচ যদি বন্ধক নেওয়া বস্তুটি এ দৃষ্টি সুরতে বিনিময় হিসেবে গণ্য হতো, তাহলে জায়েজ হতো না। কেননা, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় দিকের মুদ্রা হস্তগত করার পূর্বে তার স্থলে বিনিময় হিসেবে অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নয়, অনুরূপভাবে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত দ্রব্য] হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

মোটকথা, বন্ধক গ্রহণ কোনো বিনিময়চুক্তি নয়। কাজেই তাতে প্রতারণা জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য হবে না; কাজেই এ ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত ব্যক্তির "আমাকে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করুন" এ নির্দেশটি বন্ধককৃত জিনিসটি সঠিক থাকার দায়ভার গ্রহণ বলে গণ্য হবে না। বিনিময়চুক্তি না হলে যে প্রতারণা জরিমানার কারণ হয় না, এ কারণে কেউ যদি কোনো বার্জাক রাস্তা নিরাপদ কিনা জিজ্ঞাসা করে আর সে উত্তরে বলে যে, আপনি এ রাস্তা দিয়ে যান এটি নিরাপদ। অতঃপর সে ঐ রাস্তা দিয়ে যায় এবং ডাকাতিদের করলে পড়ে, তাহলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এটি কোনো বিনিময়চুক্তি ছিল না। এরূপভাবে কেউ যদি বলে যে, এ খাবার আপনি খেয়ে নিন এতে বিষ নেই। অতঃপর

তা খেয়ে লোকটি মারা যায়, তাহলে নির্দেশদাতার উপর কিসাস সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এটি বিনিময়চুক্তি নয়। কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্রয়ের মাসআলা এবং বন্ধকের মাসআলা এক নয়। কাজেই কিয়াস সঠিক হয়নি।

قَوْلُهُ وَيَخْلَافُ الْأَخْيَرُ. لَا تَلَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর কিয়াস হিসেবে উল্লিখিত প্রথম মাসআলার জবাব দিচ্ছেন। তাঁর কিয়াস ছিল যে, ক্রয়ের মাসআলায় যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ক্রেতাকে বলে যে, একে ক্রয় করুন এ একজন গোলাম, তাহলে সকলের ঐকমত্যে উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হয় না। তদ্রূপ ক্রয়কৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তিও যদি বলে “আমাকে ক্রয় করুন, আমি গোলাম” তাহলে তার উপরও জরিমানা হবে না। জবাবের সারকথা হলো, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নির্দেশ এবং ক্রয়কৃত ব্যক্তির নির্দেশ ও স্বীকারোক্তির বিষয়টি এক নয়! কেননা, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কথা ধর্তব্য নয়, কারণ বিক্রয়চুক্তির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর যেহেতু তার কথা ধর্তব্য নয়, সেহেতু তার নির্দেশ ও মিথ্যা বক্তব্যটি প্রতারণা বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ক্রয়কৃত ব্যক্তিটির কথা ধর্তব্য ছিল। কেননা, গোলাম হওয়া বা স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে তার কথাই ধর্তব্য। সুতরাং কিয়াস সঠিক হয়নি।

قَوْلُهُ وَنَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا قَوْلُ الْمَوْلَى: بَايَعُوا عِبْنِي هَذَا الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের আলোচ্য মাসআলাটির একটি নজির হচ্ছে এই মাসআলা যে, কোনো মনিব বাজারে ঘোষণা করে দিল যে, আমার এ গোলামটির সাথে আপনারা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন। কেননা, আমি তাকে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছি। অতঃপর লোকজন গোলামটির সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছে এবং গোলামটির নিকট লোকজনের পাওনা রয়েছে এমতাবস্থায় [সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা] প্রমাণিত হলো যে, সে প্রকৃতপক্ষে গোলাম নয়, বরং স্বাধীন ব্যক্তি। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, পাওনাদারগণ উক্ত ঘোষণাকারী মনিবের নিকট হতে তাদের পাওনা আদায় করে নিবে, তবে এই পাওনার পরিমাণ যদি কথিত গোলামটি প্রকৃতপক্ষে গোলাম হলে যা মূল্য হতো তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে ঘোষণাকারী মনিব শুধু তার মূল্য সমপরিমাণ পাওনা পরিশোধ করবে: অবশিষ্ট পাওনার জিহাদার মনিব হবে না।

এ ক্ষেত্রে [কথিত] মনিবের উপর জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, লোকজন তার ঘোষণার কারণে প্রভাবিত হয়েছে। কেননা, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার পর যদি গোলাম ঋণগ্রস্ত হয় তখন হয় মনিব তা পরিশোধ করবে নতুবা গোলামকে বিক্রয় করে তা পরিশোধ করা হয়। অতএব, এভাবে পরিশোধ হবে এই ভরসা করে উক্ত [কথিত] গোলামটির সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছে। আর এ ক্ষেত্রে ঘোষণাকারী মনিব তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নয়। কেননা, গোলামের ক্ষেত্রে তার মনিবের ঘোষণা ধর্তব্য হয়।

ثُمَّ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ ضَرْبُ إِشْكَالٍ عَلَى قَوْلِ إِبْنِ حَنِيفَةَ (رحا)، لِأَنَّ الدَّعْوَى شَرْطٌ فِي حُرِّيَةِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ، وَالتَّنَاقُضُ يُفْسِدُ الدَّعْوَى، وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِي حُرِّيَةِ الْأَصْلِ فَالدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيمَ فَرْجِ الْأُمِّ، وَقِيلَ هُوَ شَرْطٌ لِكِنَّ التَّنَاقُضِ غَيْرُ مَانِعٍ لِيُخَفِّاءِ الْعُلُوقِ، وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِي الْإِعْتِقَادِ فَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ لِاسْتِبْدَادِ الْمَوْلَى بِهِ، فَصَارَ كَالْمُخْتَلِعَةِ تُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ قَبْلَ الْخُلْعِ، وَالْمَكَاتِبِ يُقِيمُهَا عَلَى الْإِعْتِقَادِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ.

অনুবাদ : তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ['মতন'-এর মূল আলোচ্য] মাসআলাটির সুরত গঠনে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। কেননা, তাঁর মতে গোলামের 'স্বাধীন ব্যক্তি' বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত। আর বক্তব্যের মাঝে স্ববিরোধিতা দাবিকে নষ্ট করে দেয়। [উক্ত জটিলতা নিরসনে] কেউ কেউ বলেছেন, যদি মাসআলাটির সুরত গঠন জ্ঞানগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে [গোলামের পক্ষ থেকে] দাবি উত্থাপন শর্ত নয়। কেননা, কোনো ব্যক্তির জ্ঞানগত স্বাধীন হওয়া তার মাতার লজ্জাহান হারাম হওয়ার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ ক্ষেত্রেও গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন শর্ত, তবে তার বক্তব্যের স্ববিরোধিতা [তার দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে] প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, গর্ভ সঞ্চারণের বিষয়টি গোপনীয় বিষয়। আর যদি মাসআলাটির সুরত গঠন আজাদ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে বক্তব্যের স্ববিরোধিতা [দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে] প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, আজাদ করার ক্ষেত্রে মনিব একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী [তাই হতে পারে যে, আজাদ করার বিষয়টি গোলাম আগে জানত না]। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গোলাম এমন খুলাপ্রাপ্ত [অর্থের বিনিময়ে স্বামীর নিকট হতে তালাক গ্রহণকারিণী] স্ত্রীর মতোই হলো, যে খুলা -এর পূর্বে স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল বলে সাক্ষ্য পেশ করেছে। আর ঐ 'মুকাতাব'-এর মতো হলো, যে 'কিতাবাত'-এর চুক্তির পূর্বে তার মনিব তাকে আজাদ করেছিল বলে সাক্ষ্য পেশ করেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ ضَرْبُ إِشْكَالٍ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে কথিত গোলামকে ক্রয় করা এবং বন্ধক রাখা সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে মাসআলাটির সুরত [বাস্তবায়িত] হওয়ার ক্ষেত্রে 'জটিলতা' রয়েছে। জটিলতায় বুঝার পূর্বে দুটি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক—

১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে কোনো গোলাম আজাদ বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত। অর্থাৎ সে যদি প্রথমে দাবি উত্থাপন করে যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি, তাহলে তার দাবির পক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর যদি সে দাবি উত্থাপন না করে; বরং সাক্ষীগণ স্বেচ্ছায় তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত নয়।
২. কারো দাবির মাঝে যদি স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) পাওয়া যায়, তাহলে তার দাবি বাতিল বলে গণ্য হয়।

এখন উক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে জটিলতার ব্যাখ্যা হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে উপরে বর্ণিত মাসআলার সুরত হতে পারে না। কেননা, ত্রয়কৃত কিংবা বন্ধককৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তিটি যখন ত্রয়কালে কিংবা বন্ধক গ্রহণকালে বলেছে যে, “আমি গোলাম” তখন পরবর্তীতে তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করতে হবে। আর যখন সে দাবি উত্থাপন করবে, তখন তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া যাবে। কেননা, সে চুক্তির সময় স্পষ্টভাবে বলেছে যে, সে গোলাম, আর এখন বলেছে যে, সে স্বাধীন। আর দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে দাবি বাতিল বলে গণ্য হয়। কাজেই স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার সুযোগ না থাকার কথা। অথচ মাসআলাটির সুরত ছিল এরূপ যে, ত্রয়কৃত ব্যক্তি চুক্তিকালে বলেছে, সে গোলাম আর পরে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি।

অবশ্য সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে কোনো জটিলতা নেই। কেননা, তাঁদের মতে স্বাধীন সাব্যস্ত হওয়ার জন্য গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত নয়। কাজেই দাবির মাঝে স্ববিরোধিতার প্রশ্ন আসবে না।

قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الرِّضْعُ فِي حُرِّهِ الْأَصْلِ النِّج: মুসান্নিফ (র.) ফুকাহায়ে কেরামগণ -এর পক্ষ থেকে এ জটিলতার জবাব বর্ণনা করছেন। জবাব হলো, যদি মাসআলাটির সুরত উক্ত ব্যক্তির জন্মগত স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, অর্থাৎ ত্রয়কৃত ব্যক্তি জন্মগত স্বাধীন হওয়া দাবি করে, তাহলে কোনো কোনো ফকীহ এর জবাব এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্য ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও দাবি উত্থাপন করা শর্ত নয়; বরং তাঁর মতে দাবি উত্থাপন করা কেবল আজাদ করার মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত করার জন্য শর্ত।

জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্য দাবি উত্থাপন শর্ত না হওয়ার কারণ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি জন্মগত স্বাধীন হয় তখন তার মা কারো দাসী হতে পারে না। আর তার মা যদি কারো দাসী না হয়, তাহলে তার লজ্জাস্থান [সতীত্ব] ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে যে তাকে তার দাসী বলে দাবি করবে। আর লজ্জাস্থান হারাম হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর হুক [কোনো মানুষের হুক নয়]। আর আত্মার হুক সাব্যস্ত করার জন্য দাবি উত্থাপন করার প্রয়োজন হয় না; বরং বৈজ্ঞান্য সাক্ষাদাতাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সুতরাং জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার মাঝে যেহেতু একটি আল্লাহর হুক সাব্যস্ত হওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্য দাবি উত্থাপন করা শর্ত থাকবে না। আর যখন দাবি উত্থাপন করা শর্ত থাকবে না, তখন ত্রয়কৃত উক্ত ব্যক্তির দাবি উত্থাপন করা ছাড়াই তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হতে পারবে।

আর কোনো কোনো ফিকহবিদ উল্লেখ করেছেন যে, জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্যও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে [কথিত] গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত। তবে এ ক্ষেত্রে দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা দাবিকে বাতিল করবে না। এর কারণ হলো, যে সকল বিষয় সাধারণত সহজে জানা যায় না (كُلُّ مَا كَانَ مَبْنًاءً عَلَى الْخَفَاءِ) সে সকল ক্ষেত্রে দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়। আর [কথিত] গোলামের জন্মগত স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি এরূপই একটি বিষয়। কেননা, জন্মগত স্বাধীন হওয়া নির্ভর করে গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার সময় তার মা স্বাধীন থাকার উপর। আর গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার বিষয়টি একটি গোপন বিষয়। সুতরাং হতে পারে গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার সময় তার মা স্বাধীন ছিল কিনা তা তার জানা ছিল না, তাই সে নিজেকে গোলাম বলে স্বীকার করেছে, কিন্তু পরে জানতে পেরেছে যে, তার মা গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার সময় স্বাধীন ছিল, তাই সে আবার নিজেকে স্বাধীন বলে দাবি করছে। অতএব, তার দাবির ক্ষেত্রে উক্ত স্ববিরোধিতা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হবে। কাজেই তার দাবি বাতিল হবে না। আর যখন তার দাবি গৃহীত হবে তখন সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব, মাসআলাটিতে গঠনগত জটিলতা থাকল না।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الرِّضْعُ فِي الْإِنْسَانِ: জটিলতা নিরসনে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ছিল মাসআলাটির গঠন [তথা গোলামটির দাবি] যদি জন্মগত স্বাধীন হওয়া সংক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে। আর যদি মাসআলাটির গঠন [তথা গোলামটির দাবি] আজাদ করার মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত জটিলতার নিরসন হলো, সকল ফুকাহায়ে কেরামের মতেই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে [কথিত] গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন শর্ত। তবে তার দাবির মাঝে উক্ত স্ববিরোধিতা দাবিকে

বাটল করবে না, বুযু' তা ক্ষমায়োগ্য বিবেচিত হবে। কেননা, গোলামকে আজাদ করার ক্ষেত্রে মনিব একচ্ছত্র অধিকার বাধে। সে যখন ইচ্ছা কাউকে না জানিয়ে আজাদ করে দিতে পারে। কাজেই হতে পারে যে, মনিব তাকে পূর্বেই আজাদ করে দিয়েছিল কিন্তু গোলামের তা জ্ঞানা ছিল না, তাই বিক্রয়ের সময় সে নিজেকে গোলাম বলে স্বীকার করেছে। পরবর্তীতে সে জানতে পারল যে বিক্রয়ের পূর্বে মনিব তাকে আজাদ করে দিয়েছিল, তা-ই আবার সে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবি করছে। অতএব, তার বক্তব্যের স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) ক্ষমায়োগ্য বিবেচিত হবে এবং দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যে সকল বিষয় সাধারণত সহজে জানা যায় না (كُلُّ مَا كَانَ مَبْنًى عَلَى الْغَفَا) সে সকল ক্ষেত্রে দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা ক্ষমায়োগ্য বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ نَصَارَ كَالْمُخْطَلَعَةِ يُبَيِّنُ السِّنَّةَ عَلَى الطَّلَاقِ الْفُلُوحِ : মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত মাসআলার দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। দৃষ্টান্ত দুটি দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) থাকা সত্ত্বেও দাবি গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, বিষয়টি এমন, যা জানা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই স্ববিরোধিতা ক্ষমায়োগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্ত হলো, কোনো স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে خُلْعٌ গ্রহণ করল [অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি গ্রহণ করল]। এরপর সে দাবি করল যে, خُلْعٌ গ্রহণ করার পূর্বেই স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল এবং সে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এ ক্ষেত্রে তার দাবি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়। অথচ তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) পাওয়া গেছে। কেননা, তিন তালাক দেওয়ার পর خُلْعٌ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কাজেই স্বন স্ত্রী خُلْعٌ গ্রহণ করেছে তখন যেন সে এ কথাই স্বীকার করেছে যে, স্বামী তাকে তখন পর্যন্ত তিন তালাক দেয়নি। এ স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) থাকা সত্ত্বেও তার দাবি গ্রহণ করা হয়, তার কারণ হলো, তালাক দেওয়ার বিষয়টি স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার। কাজেই হতে পারে যে, স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল কিন্তু সে তা জানত না, তাই সে خُلْعٌ গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে সে জানতে পেরেছে যে, স্বামী তাকে পূর্বেই তিন তালাক দিয়েছিল। তাই সে দাবি করেছে এবং সাক্ষ্য পেশ করেছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো, কোনো মুকাতাব [মনিবের সাথে অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তিকারী গোলাম] তার মনিবের সাথে 'কিতাবাত' অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তি করার পর বিচারকের কাছে দাবি উপস্থাপন করল যে, মনিব তাকে উক্ত চুক্তি করার পূর্বেই আজাদ করে দিয়েছিল এবং এই মর্মে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার দাবি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। অথচ এ ক্ষেত্রেও তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, পূর্বেই আজাদ করে দিয়ে থাকলে তার 'কিতাবাত'-এর চুক্তির তা প্রয়োজন ছিল না। এ স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) সত্ত্বেও তার দাবি গৃহীত হওয়ার কারণ হলো, আজাদ করার বিষয়টি মনিবের একচ্ছত্র অধিকার, কাজেই তা গোলামের জ্ঞানা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে যে, সে চুক্তির সময় আজাদ করার বিষয়টি জানতে পারেনি, কিন্তু পরে সে তা জানতে পেরেছে।

সারকথা 'মতন'-এর আমাদের আলোচ্য মাসআলাটিও ঠিক এ দুটি দৃষ্টান্তের মতোই হলো। কাজেই [কথিত] উক্ত গোলামের দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضٌ) থাকা সত্ত্বেও তার দাবি গৃহীত হবে এবং তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হবে। কাজেই মাসআলার গঠনগত জটিলতা থাকল না।

قَالَ : وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ ، مَعْنَاهُ حَقًّا مَجْهُولًا فَصَالِحُهُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى مِائَةِ ذَرَمٍ فَاسْتَحَقَّتِ الدَّارُ إِلَّا ذِرَاعًا مِنْهَا لَمْ يَرْجِعْ يَشْنُ ، لِأَنَّ لِلْمُدْعَى أَنْ يَقُولَ دَعَوَايَ فِي هَذَا الْبَاقِي وَإِنْ ادَّعَاهَا كُلُّهَا فَصَالِحُهُ عَلَى مِائَةِ ذَرَمٍ فَاسْتَحَقَّ مِنْهَا شَيْءٌ رَجَعَ بِحِسَابِهِ ، لِأَنَّ التَّوْفِيقَ غَيْرَ مُمَكِّنٍ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ بِبَدْلِهِ عِنْدَ قَوَاتِ سَلَامَةِ الْمُبَدِّلِ ، وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُولِ عَلَى مَعْلُومٍ جَائِزٌ ، لِأَنَّ الْجَهَالََةَ فِيمَا يَسْقُطُ لَا تَفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি [অন্যের দখলে থাকা] কোনো বাড়ির অংশ দাবি করে অর্থাৎ কোনো অনির্দিষ্ট অংশ, অতঃপর বাড়িটি যার দখলে রয়েছে সে একশত দিরহামের বিনিময়ে তার সাথে সমঝোতা করে নেয়, তারপর এক হাত পরিমাণ জায়গা ছাড়া সম্পূর্ণ বাড়িটির হকদার বের হয়ে আসে, তাহলে বিবাদী বাদীর নিকট হতে [সমঝোতার জন্য প্রদত্ত] কোনো অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, বাদী এ ক্ষেত্রে বলতে পারে যে, আমার দাবি এ অবশিষ্ট [এক হাত পরিমাণ] -এর ক্ষেত্রেই ছিল। আর যদি বাদী পুরো বাড়িটির দাবি করে থাকে আর যার দখলে আছে সে একশত দিরহামের বিনিময়ে সমঝোতা করে থাকে, অতঃপর ঐ বাড়ির কোনো অংশের হকদার বের হয়ে আসে, তাহলে বিবাদী সেই অংশের হিসাব অনুসারে সমঝোতার অর্থ ফেরত আনতে পারবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে [বাদীর দাবির] সঙ্গতি সাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিনিময়কৃত বস্তু সঠিক না থাকার অবস্থায় বিনিময়রূপে প্রদত্ত বস্তু ফেরত পাওয়া আবশ্যিক বলে সাব্যস্ত হবে। আর আলোচ্য মাসআলাটি একথা প্রমাণ করে যে, অনির্দিষ্ট জিনিসের ব্যাপারে নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে সমঝোতা করা জায়েজ আছে। কেননা, যে বস্তু অধিকার থেকে বেরিয়ে যাবে তাতে অস্পষ্টতা থাকা বিবাদ সৃষ্টি করে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ : মাসআলা হলো, কোনো একটি বাড়ি এক ব্যক্তির দখলে আছে, এমতাবস্থায় অপর এক ব্যক্তি উক্ত বাড়িটির একটি অনির্দিষ্ট অংশ দাবি করল, অর্থাৎ বলল যে, আমি এ বাড়িটির একটি অংশের মালিক। কিন্তু কোন অংশের বা তার পরিমাণ কতটুকু তা নির্দিষ্ট করে বলেনি। অতঃপর যার দখলে বাড়িটি রয়েছে সে দাবিদার ব্যক্তির সাথে একশত রৌপ্যমুদ্রা [বা টাকা]-এর বিনিময়ে আপোষ করে নিল। এরপর যদি এমন হয় যে, অপর এক ব্যক্তি উক্ত বাড়িটির একহাত পরিমাণ জায়গা বাদে সম্পূর্ণ বাড়িটির মালিকানা প্রমাণিত করে তা নিয়ে নিল, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যার দখলে বাড়িটি ছিল সে প্রথম দাবিদার ব্যক্তিকে যে একশত রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিল তা থেকে কিছুই ফেরত পাবে না। কারণ হলো, প্রথম দাবিদার ব্যক্তি তার দাবিকৃত অংশের পরিমাণ কতটুকু বা তা কোন অংশ তা বলেনি, কাজেই তার এ কথা বলার সুযোগ রয়েছে যে, যে এক হাত পরিমাণ জায়গা আপনার দখলে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেই একহাত পরিমাণই আমার দাবি ছিল।



قَوْلُهُ وَإِنْ أَدْعَاكُمْ كُلُّهَا الْغ: এখানে পূর্বের মাসআলাটির আরেকটি সূরত বর্ণনা করা হয়েছে। সূরতটি হলো, যদি প্রথম দাবিদার কোনো অনির্দিষ্ট অংশের দাবি না করে; বরং সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবি করে, আর এমতাবস্থায় যার দখলে আছে সে একশত রৌপ্যমুদ্রা [বা টাকা]-এর বিনিময়ে সমঝোতা ও আপোষ করে নেয়, অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বাড়িটির কোনো একটি অংশের মালিকানা প্রমাণিত করে তা নিয়ে নেয়, তাহলে বিধান হলো, যার হাতে বাড়িটি রয়েছে সে প্রথম দাবিদার ব্যক্তিকে দেওয়া একশত রৌপ্যমুদ্রা থেকে বাড়ির যতটুকু অংশ অপর এক ব্যক্তি নিয়ে গেছে তার সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা ফেরত পাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দাবিদার ব্যক্তি যদি বাড়িটির অর্ধেক নিয়ে থাকে, তাহলে প্রদত্ত একশত রৌপ্যমুদ্রার অর্ধেক ফেরত পাবে। আর এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে থাকলে এক-তৃতীয়াংশ রৌপ্যমুদ্রা ফেরত পাবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে প্রথম দাবিদার ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবি করেছিল তা সঠিক ধরে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর যার দখলে বাড়িটি রয়েছে সে একশত রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিল সম্পূর্ণ বাড়িটির বিনিময়ে আপোষ করার জন্য। কাজেই যতটুকু অংশ দ্বিতীয় দাবিদার ব্যক্তি নিয়ে গেছে ততটুকু টাকা বা রৌপ্যমুদ্রা সে ফেরত পাবে। কেননা, مُبْدَلٌ مِنْهُ বা বিনিময়কৃত বস্তু সঠিক না হলে বিনিময় হিসেবে প্রদত্ত বস্তু ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হয়।

قَوْلُهُ وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُولِ الْغ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটি থেকে একটি বিষয় বুঝা গেল, তা হচ্ছে-অনির্দিষ্ট কোনো অংশের কেউ দাবি করলে, সেই অনির্দিষ্ট অংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কিছু দিয়ে সমঝোতা ও আপোষ করা জায়েজ আছে। এর কারণ হলো, যে বস্তু অধিকার থেকে বেরিয়ে যাবে তাতে অস্পষ্টতা থাকা বা তা অনির্দিষ্ট হওয়া বিবাদ সৃষ্টি করে না। কাজেই জায়েজ না হওয়ার কারণ বা عِلَّتُهَا এখানে বিদ্যমান নেই।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) সহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, মাসআলাটি থেকে আরেকটি বিষয়ও বুঝা যায়, তা হচ্ছে- সমঝোতা ও আপোষ সহীহ হওয়ার জন্য দাবি সহীহ হওয়া শর্ত নয়। কেননা, উপরিউক্ত মাসআলাটিতে দাবি সহীহ হয়নি, কারণ দাবিকৃত বস্তু অনির্দিষ্ট হলে দাবি সহীহ হয় না। এ কারণে কেউ যদি অনির্দিষ্ট কোনো অংশের দাবি করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দাবি সহীহ না হওয়া সত্ত্বেও সমঝোতা ও আপোষ সহীহ হয়েছে।

## فَصْلٌ : فِي بَيْعِ الْفُضُولِي

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَنَسَخَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحا) : لَا يَنْعَقِدُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصُدَّرْ عَنْ وَلَا يَتَّصِلُ بِشَرْعِيَّةٍ، لِأَنَّهَا بِالْمِلْكِ أَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَقَدْ فَقَدَا، وَلَا إِنْعِقَادَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَلَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ تَمْلِيكِ وَقَدْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، فَجَبَّ الْقَوْلُ بِإِنْعِقَادِهِ، إِذَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِلْمَالِكِ مَعَ تَخْيِيرِهِ، بَلْ فِيهِ نَفْعٌ حَيْثُ يَكْفِي مُؤْنَةُ طَلِبِ الْمُشْتَرِي وَقَرَارِ الثَّمَنِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَفْعُ الْعَاقِدِ لِمَصُونِ كَلَامِهِ عَنِ الْإِلْغَاءِ، وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِي فَتَثَبَّتِ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَحْصِيلًا لِهَذِهِ الْوُجُوهِ، كَيْفَ وَإِنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ دَلَالَةً، لِأَنَّ الْعَاقِلَ يَأْذَنُ فِي التَّصَرُّفِ النَّافِعِ -

### অনুচ্ছেদ : নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়

অনুবাদ : কেউ যদি অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করে, তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বিক্রয়কে অনুমোদন করবে, কিংবা ইচ্ছা করলে সে বিক্রয় রহিত করে দিবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি সংঘটিতই হবে না। কেননা, চুক্তিটি শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব থেকে সম্পাদিত হয়নি। শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব অর্জিত হয় মালিকানার দ্বারা কিংবা মালিকের অনুমতির দ্বারা। আর এখানে দুটি বিষয়ই অব্যাহত। আর শরিয়তসম্মত ক্ষমতা ছাড়া চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দলিল হলো, বিক্রয় হচ্ছে মালিকানা প্রদানের একটি পদক্ষেপ, আর এ পদক্ষেপ মালিকানা প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপযুক্ত পাঠে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং সংঘটিত হয়েছে বলে মেনে নেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। কেননা, মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকার কারণে তার কোনো ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না; বরং তাতে তার উপকার সাধিত হচ্ছে। কেননা, সে ক্রেতা সন্ধান করা, মূল্য স্থির করা ও অন্যান্য ব্যাপারের কষ্ট থেকে বেঁচে যাচ্ছে। আর তাতে চুক্তিকারীরও উপকার রয়েছে, কেননা তার কথা বৃথা যাওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আর তাতে ক্রেতারও উপকার রয়েছে। সুতরাং এ সকল উপকারগুলো রক্ষা করার জন্য শরিয়তসম্মত ক্ষমতা সাব্যস্ত হবে। আর কেনইবা চুক্তিটি সম্পাদিত হবে না? অথচ পরোক্ষভাবে অনুমতি বিদ্যমান আছে। কেননা, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি উপকারী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েই থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : فَضُولِي শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ : এ শব্দটির শেষের <sup>ی</sup> অক্ষরটি فَضُولِي -এর সাথে সম্পর্ক (نِسْبَةً) বুঝাবার জন্য যুক্ত করা হয়েছে। আর فَضُولِي শব্দটি فَضْل -এর বহুবচন। فَضْل -এর অর্থ হলো- অতিরিক্ত। আল-মুগরিব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহুবচন তথা فَضُولِي শব্দটি এমন অতিরিক্ত অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হয় যাতে কোনো কল্যাণ নেই! আর فَضُولِي এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে এমন কাজে লিপ্ত হয় যা তার জন্য অনর্থক (مَنْ يَفْعَلُ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ) আর ফিকহের পরিভাষায় فَضُولِي বলা হয়-

১. **مَنْ لَيْسَ بِأَسْلَبَ وَلَا يُوَكِّلُ وَلَا يَمُوسِي** অর্থঃ “যে [কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে] মূল ব্যক্তিও নয় কিংবা মূল ব্যক্তির প্রতিনিধি বা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিও নয়।”

২. আর কেউ কেউ বলেছেন— **الْفُضُولِيُّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ** অর্থঃ “বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে অন্যের অধিকারভুক্ত জিনিসের [বিষয়ের] মাঝে শরয়ী অনুমতি ব্যতিরেকে কার্য সম্পাদন করে।”

পরিচ্ছেদের সাথে অনুচ্ছেদের সম্পর্ক : পরিচ্ছেদের সাথে এ অনুচ্ছেদের সম্পর্ক স্পষ্ট। কেননা, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয় **إِسْتِغْنَانًا** বা অধিকার দাবিরই একটি সুরত। কারণ, **إِسْتِغْنَانًا**-এর ক্ষেত্রে মালিক এ কথাই দাবি করে যে, বস্তুটির মালিকানা আমার; তোমার কাছে যে জিনিসটি বিক্রয় করেছে সে আমার অনুমতি ছাড়াই বিক্রয় করেছে। আর **الْفُضُولِيُّ** বা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়ে থাকে।

**قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ** :

মাসআলা : কেউ যদি অন্যের মালিকানাভুক্ত কোনো জিনিস মালিকের অনুমতি ছাড়া কারো কাছে বিক্রয় করে, তাহলে আমাদের মতে বিধান হলো, বিক্রয়চুক্তিটি সম্পাদিত হয়ে যাবে তবে তা কার্যকর হওয়া মালিকের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। মালিক ইচ্ছা করলে চুক্তিটি কার্যকর করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে চুক্তিটি রহিত করতে পারবে। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত এবং এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও আমাদের অভিমতের অনুরূপ।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত চুক্তিটি সম্পাদিতই হবে না। কাজেই মালিক পরে অনুমতি দিলেও তা কার্যকর হবে না। ইমাম আহমদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও এরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে **فُضُولِيٌّ** তথা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির যে কোনো চুক্তি সম্পাদন বাতিল বলে গণ্য হয়।

**قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدَرْ عَنْ وَلَايَةِ شَرْعِيَّةِ الْخ** : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল বর্ণনা করছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে নকলী ও আকলী উভয় প্রকার দলিল পেশ করা হয়। মুসান্নিফ (র.) এখানে কেবল তাঁর আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। তাঁর আকলী দলিল হলো, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়চুক্তিটি শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব থেকে সম্পাদিত হয়নি। কেননা, শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব অর্জিত হয় দুভাবে—

১. বস্তুটির মালিক হওয়ার মাধ্যমে।

২. অথবা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতির মাধ্যমে।

আর আলোচ্য মাসআলায় নিঃসম্পর্ক **فُضُولِيٌّ** ব্যক্তির এ দুটির কোনোটিই ছিল না। আর শরিয়তসম্মত ক্ষমতা অর্জিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে তা সম্পাদিত হয় না। যেমন— উড়ন্ত অবস্থায় কোনো পাখি বিক্রয় করা, পলায়নরত গোলামকে বিক্রয় করা, নাবালগ ছেলের গ্রীকে তালক দেওয়া। এর কোনোটিই সম্পাদিত হয় না। কেননা, শরিয়তসম্মত ক্ষমতা কিংবা কর্তৃত্ব অর্জিত নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিল হলো,

**إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبِيدِهِمْ بَيْنَ حَرَامٍ : لَا يَبِيعُ مَا كَيْسَ عِنْدَكَ .**

অর্থঃ “নবী করীম ﷺ হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.)-কে বলেছেন, তোমার নিকট যা নেই তা তুমি বিক্রয় কর না।” এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে তোমার মালিকানায যা নেই, তা তুমি বিক্রয় কর না। কাজেই এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নিজের মালিকানাভুক্ত জিনিস ছাড়া অন্যের জিনিস বিক্রয় করা সহীহ হবে না।

**قَوْلُهُ وَلَئِنْ أَنَّهُ تَصَرَّفَ تَمْلِيكًا وَقَدْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ الْخ** : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকেও আকলী এবং নকলী উভয় প্রকার দলিল রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) শুধু আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন।

আমাদের আকলী দলিল হলো, বিক্রয় হচ্ছে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিক বানানোর একটি চুক্তি-কার্য সম্পাদন, আর আলোচ্য মাসআলায় এ কার্যটি এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে যার মাঝে এ কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা বিদ্যমান আছে, আর চুক্তি-কার্যটি তার যথাযথ ক্ষেত্রে (**مَحَلٍّ**)-এ সংঘটিত হয়েছে, কাজেই কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা আবশ্যিক। দলিলটির মাঝে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম কথা তথা বিক্রয় হচ্ছে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিক বানানোর একটি কার্য-সম্পাদন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আর দ্বিতীয় কথা তথা কার্যটি এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে, যার মাঝে এ কার্যসম্পাদনের যোগ্যতা বিদ্যমান আছে। এর কারণ হলো, চুক্তি-কার্য সম্পাদনের যোগ্য হওয়া নির্ভর করে বালগ হওয়া ও বিবেকসম্পন্ন হওয়ার উপর। আর আলোচ্য মাসআলায় এ দুটিই নিঃসম্পর্ক (**فُضُولِيٌّ**) ব্যক্তির মাঝে রয়েছে। আর তৃতীয় কথা তথা চুক্তি-কার্যটি তার যথাযথ ক্ষেত্রে (**مَحَلٍّ**)-এ সংঘটিত হয়েছে, এর

কারণ হলো: বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে—এরূপ বস্তু যায় মূল্য রয়েছে। আর শেষোক্ত কথা তথা “কাজেই কাথিট সম্পাদিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা আবশ্যিক”—এর কারণ হলো, যখন চুক্তিকারী যোগ্য হয় এবং চুক্তিটি যথাযথ ক্ষেত্রে সম্পাদিত হয় তখন কোনো প্রতিবন্ধক (مَنْع) না থাকলে তা সম্পাদিত হওয়া আবশ্যিক হয়ে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। কেননা, চুক্তিকারী দ্বয় এবং বস্তুটির মালিক—কোরাই কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। মালিকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কারণ তার চুক্তি কার্যকর করা বা না করার ইচ্ছাধিকার রয়েছে। বরং এ ক্ষেত্রে তার উপকারই হচ্ছে যেহেতু তাকে দ্রুততা খুঁজতে হচ্ছে না, মূল্য দিয়ে দর কষাকষি করতে হচ্ছে না। আর নিঃসম্পর্ক (مُضَرِّي) ব্যক্তির ক্ষতি হচ্ছে না, তার কারণ চুক্তিটি সম্পাদিত হলে তার কথাটি বৃথা যাওয়া থেকে রক্ষা পেল। আর ক্রেতার যে ক্ষতি হচ্ছে না তাতো স্পষ্টই। কাজেই যখন কারোই কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তখন কোনো প্রতিবন্ধক পাওয়া গেল না। অতএব চুক্তিটি স্থগিত হিসেবে। সম্পাদিত হয়েছে বলে আবশ্যিকরূপে সাব্যস্ত হবে।

**আমাদের নকলী দলিল :** আমাদের নকলী দলিল হলো, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত ওরওয়াহ আল-বারিকী (রা.)-এর হাদীস এবং তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। প্রথম হাদীসটি নিম্নরূপ—  
عَنْ عُرَّةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لَاشْتَرِيَهُ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَتْ لَهُ نَاعِثٌ نَيْعَتُ أَحَدُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالنَّاعِثِ وَالْدِينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَنَا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَمَا صَفَقْتُ بَيْنَهُمَا .

অর্থঃ “হযরত ওরওয়াহ আল-বারিকী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বকরি ক্রয় করার জন্য আমাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। স্বর্ণমুদ্রাটি দিয়ে দুটি বকরি ক্রয় করে একটি বকরি পুনরায় একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম। অতঃপর একটি বকরি এবং স্বর্ণমুদ্রাটি নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত ঘটনা বললাম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা’আলা তোমার কাজ-কারবারে বরকত দান করুন।”

এ হাদীসে সাহাবী প্রথমে বকরি দুটি ক্রয় করার পর তা নবী করীম ﷺ-এর মালিকানাধীন হয়েছিল, অতঃপর মালিকের অনুমতি ছাড়াই সাহাবী তা থেকে একটি বিক্রয় করেছেন এবং নবী করীম ﷺ পরে অনুমতি প্রদান করেছেন।

আর হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.)-এর হাদীসটিও একই মর্মে তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। [বিস্তারিত দ্র. ফাতহুল কাদীর, আল-বিনায়া, নাসবুর রায়া।]

قَوْلُهُ مُسْلِمٌ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে—ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বলেছেন, আলোচ্য সূরতে নিঃসম্পর্ক (مُضَرِّي) ব্যক্তির শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব নেই। কেননা, সে বস্তুটির মালিকও নয় এবং মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্তও নয়—এ কাথিটি সঠিক নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ থেকে পরোক্ষভাবে অনুমতি বিদ্যমান আছে। কারণ, উক্ত বিক্রয়চুক্তিতে মালিকের উপকার রয়েছে [তার কোনো ক্ষতি নেই]। আর বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের উপকারী জিনিসের ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েই থাকে। কাজেই যখন মালিকের পক্ষ থেকে পরোক্ষভাবে অনুমতি রয়েছে তখন নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জিত আছে।

সুতরাং তার চুক্তি-কাথিটি স্থগিতরূপে সম্পাদিত হয়ে যাবে।

**ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিলের উত্তর :** তাঁর উল্লেখকৃত হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.)-এর হাদীস—

لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ -এর দুটি উত্তর রয়েছে—

১. এখানে বিক্রয় ঘারা اَلْبَيْعُ الْمَطْلُوقُ বা পরিপূর্ণ বিক্রয় তথা কার্যকর বিক্রয় (اَلْبَيْعُ النَّائِذُ) উদ্দেশ্য। কেননা, সাধারণ বিক্রয় উল্লেখ করলে اَلْبَيْعُ الْاَقْرَدُ হিসেবে পরিপূর্ণ বিক্রয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর আমাদের আলোচ্য সূরতে বিক্রয় কার্যকর হচ্ছে না; বরং তা স্থগিত (اَلْبَيْعُ الْاَقْرَدُ) হচ্ছে। সুতরাং তা নিষেধের আওতায় পড়বে না।

২. দ্বিতীয় উত্তর হলো, উক্ত হাদীসের অর্থ হলো, কোনো জিনিস তোমার কাছে না থাকলে তুমি তা বাজার থেকে ক্রয় করে দিয়ে এ ইচ্ছায় অগ্রিম বিক্রয় কর না। এর প্রমাণ হচ্ছে উক্ত হাদীসে হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রা.) প্রথমে নবী করীম ﷺ-কে বলেছিলেন—  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيَنِي يَطْلُبُ مِنِّي سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي فَأَبِيعُهَا مِنْهُ ثُمَّ ادْخُلُ السُّوقَ فَاشْتَرِيَهَا فَأَسْلِمُهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

“হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি আমার নিকট এসে একটি দ্রব্য ক্রয় করতে চায় যা আমার কাছে নেই, তখন আমি তার কাছে [অগ্রিম] তা বিক্রয় করি, অতঃপর বাজারে গিয়ে তা ক্রয় করে তাকে হস্তান্তর করি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার কাছে যা নেই, তা তুমি বিক্রয় কর না।”

قَالَ : وَلَهُ الْإِجَارَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا ، وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا . لِأَنَّ  
الْإِجَارَةَ تَصَرُّتْ فِي الْعَقْدِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِهِ ، وَ ذَلِكَ بِقِيَامِ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ  
عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَجَارَ الْمَالِكُ كَانَ الثَّمَنُ مَمْلُوكًا لَهُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ  
الْإِجَارَةَ اللَّاحِقَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ ، وَلِلْفُضُولِيِّ أَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْإِجَارَةِ دَفْعًا  
لِلْحُقُوقِ عَنْ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ الْفُضُولِيِّ فِي التَّيَكَّاحِ ، لِأَنَّهُ مُعَيَّرَ مَحْضٍ ، هَذَا إِذَا كَانَ  
الثَّمَنُ دَيْنًا فَإِنْ كَانَ عَرْضًا مُعَيَّنًا إِنَّمَا تَصَحُّ الْإِجَارَةُ ، إِذَا كَانَ الْعَرْضُ بَاقِيًا أَيْضًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, মালিকের চুক্তি অনুমোদন করার অধিকার থাকবে যদি যে দ্রব্যের উপর চুক্তি হয়েছে তা বিদ্যমান থাকে এবং চুক্তিকারীদ্বয় তাদের উপযুক্ততার অবস্থায় বহাল থাকে। কেননা, অনুমোদন হচ্ছে চুক্তিটির মাঝে একটি হস্তক্ষেপ। অতএব, চুক্তি [হস্তক্ষেপকালে] বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। আর চুক্তি বিদ্যমান থাকে চুক্তিকারীদ্বয় এবং চুক্তিকৃত দ্রব্য বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে। আর মালিক যখন অনুমতি প্রদান করবে তখন বিক্রয়-মূল্য তার মালিকানাধীন হয়ে যাবে এবং তা তখন চুক্তিকারী তৃতীয় ব্যক্তিটির হাতে আমানতরূপে থাকবে, মালিকের প্রতিনিধি [ওয়াকিল] হিসেবে। কেননা, পরবর্তীতে যুক্ত অনুমোদন পূর্ববর্তী প্রতিনিধি নিয়োগের সমপর্যায়ভুক্ত। আর মালিকের অনুমোদন প্রদানের পূর্বে চুক্তিকারী তৃতীয় ব্যক্তির উক্ত চুক্তি রহিত করার অধিকার আছে, যাতে সে তার উপর আপত্তি অধিকারসমূহ রোধ করতে পারে। পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ তার রহিত করার অধিকার থাকবে না]। কেননা, বিবাহের ক্ষেত্রে সে শুধু বক্তব্য উচ্চারণকারী। [মালিকের অনুমতি প্রদানের] উল্লিখিত শর্ত হচ্ছে তখন, যখন বিক্রয়-মূল্য হবে মুদ্রদ্রব্য [যা জিম্মায় অনিদিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়]। আর যদি বিক্রয়-মূল্য নির্ধারিত কোনো পণ্যদ্রব্য হয়, তাহলে অনুমোদন প্রদান সঠিক হবে যদি সে দ্রব্যটিও [অনুমোদনকালে] বহাল থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَهُ الْإِجَارَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا الخ : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যদি অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিস অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি স্থগিত হিসেবে সম্পাদিত হবে এবং মালিকের বিক্রয়চুক্তি কার্যকর করা বা তা রহিত করার ইচ্ছাধিকার থাকবে। আলোচ্য ইবারতে বলা হচ্ছে যে, মালিক যদি উক্ত বিক্রয়চুক্তি কার্যকর করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে শর্ত হলো, কার্যকর করার সময় বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান থাকতে হবে এবং চুক্তিকারীদ্বয় অর্থাৎ ক্রেতা এবং নিঃসম্পর্ক (فُضُولِي) ব্যক্তিটি চুক্তিসম্পাদনের যোগ্যতা সহকারে জীবিত থাকতে হবে। [উল্লেখ্য, চুক্তি কার্যকর করার জন্য স্বয়ং মালিকের জীবিত থাকাও শর্ত]। সুতরাং যদি মালিক মারা যায়, তাহলে তার ওয়ারিশগণ তা কার্যকর করতে পারবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَصَرُّتْ فِي الْعَقْدِ الخ : উক্ত শর্তের দলিল হলো, কার্যকর করা বা অনুমতি প্রদান করা মূলত পূর্বের চুক্তির মাঝে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ। কেননা, অনুমতি দেওয়ার পূর্বে চুক্তি স্থগিত থাকে, আর অনুমতি দেওয়ার পর তা কার্যকর হয়। আর কোনো জিনিসের মাঝে পদক্ষেপ গ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করার জন্য ঐ জিনিসটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। কাজি ই মালিকের অনুমতি প্রদানের সময় বিক্রয়চুক্তি বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। আর বিক্রয়চুক্তি বিদ্যমান থাকে বিক্রীতবস্তু এবং চুক্তিকারীদ্বয় বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে। অতএব অনুমতি প্রদানের সময় বিক্রীত-বস্তুটি এবং চুক্তিকারীদ্বয় বিদ্যমান থাকা শর্ত।

উল্লেখ্য, আয়্যামা ইবনে হুন্সাম (র.) উপস্থিত শর্তসমূহের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবেও দলিল বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে, ১. বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, মালিকের অনুমতির পূর্বে বস্তুটির মালিকানা ক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হয় না, বরং অনুমতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। আর কোনো বস্তু হালাক হয়ে গেলে তার মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়।

২. ক্রেতা বিদ্যমান থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, বিক্রয়চুক্তিটির অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর যত্নের পর কারো জিহাদয় কোনো কিছু ওয়াজিব সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

৩. বিক্রেতা তথা নিঃসম্পর্ক ব্যাক্তি জীবিত থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, অনুমতির মাধ্যমে তার উপর উক্ত চুক্তিটির সংশ্লিষ্ট কিছু অধিকার তার উপর বর্তায়। আর জীবিত না থাকলে কারো উপর কিছু বর্তায় না।

৪. মালিকের জীবিত থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, চুক্তিটির অনুমতি সেই দিতে পারবে তার ওয়ারিশ দিতে পারবে না। কাজেই তার জীবিত থাকা আবশ্যিক।

عَنْ مُسْلِمٍ (ر.) قَالَ وَإِذَا أَحَازَ الْمَالِكُ كَانَ الثَّمَنُ مَثْلُوكًا لَهُ الْحَقُّ (فُضُولُ) বলেন, যখন মালিক বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করবে তখন [ক্রেতা বিক্রীত-বস্তুটির মালিক হয়ে যাবে এবং] মূল্য মালিকের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। নিঃসম্পর্ক (فُضُولُ) ব্যক্তিটির হাতে তখন মূল্য আমানত হিসেবে গণ্য হবে। সে এ ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ থেকে বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি (وَكِيلُ) হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়ের পর মালিকের বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করা বিধানগত দিক থেকে পূর্বে বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি বানানোর পর্যায় বলে গণ্য হয়। আর বিক্রয়ের জন্য কাউকে প্রতিনিধি বানানো হলে সে যদি বস্তুটি বিক্রয় করে তার মূল্য হস্তগত করে, তাহলে তার কাছে তা আমানত হিসেবে থাকে। আর আমানতের বিধান হলো, তা হালাক হলে মালিকের পক্ষ থেকে হালাক হয়েছে বলে গণ্য হয়। আমানতদারের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য সূরতে যদি নিঃসম্পর্ক (فُضُولُ) ব্যক্তির হাতে থাকাবস্থায় মূল্য হালাক হয়ে যায়, তাহলে তা মালিকের পক্ষ থেকে হালাক হবে। নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

عَنْ مُسْلِمٍ (ر.) قَالَ لِلْفُضُولِ أَنْ يَنْسَخَ قَبْلَ الْإِحْزَارِ الْحَقُّ (فُضُولُ) বলেন, মালিক বিক্রয়চুক্তিটিকে অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে নিঃসম্পর্ক (فُضُولُ) ব্যক্তিটি ইচ্ছা করলে চুক্তিটি বাতিল করে দিতে পারবে। কাজেই সে যদি মালিকের অনুমোদনের পূর্বে তা বাতিল করে দেয়, তাহলে মালিক পরে অনুমোদন করলে তা কার্যকর হবে না। নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিটির এই অধিকার থাকার কারণ হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিকের অনুমোদনের পর সে মালিকের প্রতিনিধি (وَكِيلُ) বলে গণ্য হয়। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ যথা- বিক্রীত-বস্তুটি ক্রেতার পক্ষ থেকে হস্তান্তর দাবি করা, বিক্রীত-বস্তুতে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তা নিয়ে আদালতে মামলায় বিবাদী বানানো ইত্যাদি বিষয় প্রতিনিধির উপর বর্তায়। আর এ অধিকারগুলো তার উপর বর্তানো তার জন্য ক্ষতিকর। কাজেই ক্ষতিকর বিষয় তার উপর সাব্যস্ত হওয়ার আগে তা দূর করে দেওয়ার অধিকার তার থাকবে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো ক্ষতিকর বিষয় তার উপর সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সে তা দূর করার অধিকার রাখে।

পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে এ মাসআলার বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ কোনো নিঃসম্পর্ক (فُضُولُ) ব্যক্তি যদি অনুমতি ছাড়া কারো বিবাহ-কার্য সম্পাদন করে, তাহলে যার অনুমোদনের উপর তা স্থগিত থাকবে সে অনুমোদন দেওয়ার আগে যদি আবার উক্ত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি তা বাতিল করার ইচ্ছা করে, তাহলে সে তা করতে পারবে না। এর কারণ হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ সর্বশ্রুতি অধিকারসমূহ প্রতিনিধির উপর বর্তায় না; বরং সে কেবল বিবাহের বাক্যগুলো উচ্চারণকারী বা ব্যাচকারী বলে গণ্য হয়। অতঃপর যখন যথাযথ কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করবে তখন বিবাহ সর্বশ্রুতি সকল অধিকারসমূহ কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে; নিঃসম্পর্ক (فُضُولُ) ব্যক্তির উপর বর্তাবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে সে কোনো প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। অতএব, তার বিবাহকার্যটি বাতিল করার অধিকার থাকবে না।

عَنْ مُسْلِمٍ (ر.) قَالَ هَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَنْبًا فَإِنْ كَانَ عَرَبًا الْحَقُّ (فُضُولُ) বলেন, পূর্বে যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিঃসম্পর্ক (فُضُولُ) ব্যক্তির সম্পাদিত বিক্রয়চুক্তিটি মালিক যদি অনুমোদন করতে চায় তাহলে শর্ত হলো, বিক্রীত-বস্তু এবং চুক্তিকারীয়ায় বিদ্যমান থাকা-এটা হলো এ সূরতে যখন উক্ত বিক্রয়চুক্তিতে বস্তুটির মূল্য হিসেবে 'দাইন' তথা মুদ্রাবা [বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি] নির্ধারণ করা হবে। আর যদি মূল্য হিসেবে কোনো পণ্যদ্রব্য [মুদ্রাদ্রব্য ব্যতীত অন্য যে কোনো বস্তু] নির্ধারণ করা হয়, তাহলে উপরিউক্ত শর্তের সাথে আরেকটি শর্ত যুক্ত হবে। তা হলো মূল্য হিসেবে নির্ধারিত উক্ত পণ্যদ্রব্যটিও বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় অনুমোদন কার্যকর হবে না।

ثُمَّ الْإِجَارَةُ إِجَارَةٌ نَقْدٌ لَا إِجَارَةَ عَقْدٍ، حَتَّى يَكُونَ الْعَرْضُ الثَّمَنَ مَثَلُكَ لِلْمُضَوَّلِيْنَ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الْمَبِيعِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا، لِأَنَّهُ شَرَاءٌ وَجَعٌ، وَالشَّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَارَةِ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَالِكُ لَا يَنْفَعُ بِإِجَارَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَضْلَيْنِ، لِأَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَارَةِ الْمَوْرِثِ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَجُوزُ بِإِجَارَةِ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يُعْلَمُ حَالُ الْمَبِيعِ جَازَ الْبَيْعِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (رَح) أَوَّلًا، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رَح) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ (رَح)، وَقَالَ: لَا يَبِيعُ، حَتَّى يُعْلَمَ قِيَامُهُ عِنْدَ الْإِجَارَةِ، لِأَنَّ الشُّكَّ وَقَعَ فِي شَرْطِ الْإِجَارَةِ فَلَا يَشْبُتُ مَعَ الشُّكِّ.

অনুবাদ : আর এ ক্ষেত্রে অনুমোদনটি হবে [মালিকের মাল থেকে] বস্তুটি নগদ প্রদানের অনুমতি; চুক্তিটি কার্যকর করার অনুমোদন নয় [বরং চুক্তিটি তৃতীয় ব্যক্তির নিজের জন্য পূর্বেই কার্যকর হয়ে রয়েছে]। অতএব মূল্যরূপে নির্ধারিত পণ্য বস্তুটি তৃতীয় ব্যক্তিটির মালিকানাভুক্ত হবে। আর তার উপর আবশ্যক হবে বিক্রীত-বস্তুর অনুরূপ বস্তু মালিককে পরিশোধ করে দেওয়া, যদি বিক্রীতদ্রব্যটি এমন বস্তু হয় যার সদৃশ বস্তু আছে। আর যদি তার সদৃশ বস্তু না থাকে, তাহলে তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা, এটা [অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করা] এক হিসেবে [মূল্য-বস্তুটি] ক্রয় বলে গণ্য। আর ক্রয় কারো অনুমতির উপর নির্ভর থাকে না। আর মালিক যদি মারা যায়, তাহলে উভয় সুরতেই ওয়ারিশের অনুমোদনের দ্বারা চুক্তি কার্যকর হবে না। কেননা, চুক্তিটি মৃত ব্যক্তির নিজস্ব অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং অন্যের অনুমোদন দ্বারা তা বৈধ হবে না। আর মালিক যদি তার জীবদ্দশায় অনুমোদন দিয়ে থাকে, কিন্তু বিক্রীত-বস্তুর অবস্থা জানা না যায়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর পূর্ববর্তী অভিমত অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। আর এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। কেননা, বিক্রীত-দ্রব্যটি বিদ্যমান থাকাই হচ্ছে তার মূল অবস্থা। পরবর্তীতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর পূর্বের অভিমত প্রত্যাহার করে বলেছেন যে, অনুমোদনের সময় বিক্রীত-দ্রব্যটি বহাল থাকার কথা জানা না যাওয়া পর্যন্ত বিক্রয়-চুক্তির অনুমোদন বৈধ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অনুমোদন কার্যকরী হওয়ার শর্তের মাঝে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং সন্দেহ থাকা অবস্থায় অনুমোদন কার্যকর বলে সাব্যস্ত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْإِجَارَةُ إِجَارَةٌ نَقْدٌ لَا إِجَارَةَ عَقْدٍ : এ ইবারতটুকু বুঝার আগে দুটি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক—

১. কোনো বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি তার মূল্য হিসেবে মুদ্রা নির্ধারণ না করে অন্য কোনো বস্তু (عَرْضُ) নির্ধারণ করা হয়, তাহলে এরূপ বিক্রয়কে بَيْعُ الْمَقَابَضِ বলা হয়। আর بَيْعُ الْمَقَابَضِ-এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্যই বিক্রীত-বস্তু (مَبِيعٌ) হিসেবে ধরা হয়। আর উভয় পক্ষকেই এক হিসেবে (مِنْ وَجْهِ) ক্রেতা ধরা হয়।

২. আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের অনুমতি ছাড়া তার জন্য কোনো কিছু ক্রয় করে, তাহলে ক্রয়চুক্তিটি সে তার নিজের জন্য করেছে বলে গণ্য হয় এবং চুক্তিটি অপর ব্যক্তির অনুমোদনের উপর স্থগিত থাকে না। অর্থাৎ ক্রয় কারো অনুমোদনের উপর মওকুফ থাকে না।

এখন আমাদের আলোচ্য ইবারতের ব্যাখ্যা হলো, পূর্বে উল্লিখিত সূরতে অর্থাৎ যখন কোনো নিঃসম্পর্ক (فُضُولِي) ব্যক্তি অন্যের কোনো বস্তু মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে এবং মূল্য হিসেবে মুদ্রা নির্ধারণ না করে অন্য কোনো বস্তু (عَرْض) নির্ধারণ করে, তখন এ বিক্রয়চুক্তি بَيْعُ الْمُنَافَضَةِ। এ ক্ষেত্রে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিটি এক হিসেবে জেতা এবং তার চুক্তিটি ক্রয় বলে গণ্য হবে। আর ক্রয় কারো অনুমোদনের উপর মওকুফ বা স্থগিত থাকে না। কাজেই চুক্তিটি সে নিজের জন্য করেছে বলে গণ্য হবে। অতএব, মূল্য হিসেবে যে বস্তুটি নির্ধারণ করা হয়েছে, এ নিঃসম্পর্ক (فُضُولِي) ব্যক্তিটিই তার মালিক হবে।

সূতরাং এ সূরতে বিক্রীত-বস্তুটির মালিক যখন অনুমোদন প্রদান করবে তখন তার অনুমোদন-চুক্তিটি কার্যকর কবাব অনুমোদন বলে গণ্য হবে না; বরং অনুমোদনের অর্থ এরূপ হবে যে, মালিক নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার বস্তুটির বিনিময়ে যে অপর পক্ষের বস্তুটি ক্রয় করেছ, তা বাস্তবায়িত করার জন্য আমার বস্তুটি তুমি তাকে প্রদান কর, এটি তোমাকে আমি ঋণ হিসেবে দিলাম।

অতঃপর নিঃসম্পর্ক (فُضُولِي) ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে, উক্ত বস্তুটি যদি এমন বস্তু হয় যার অনুরূপ বস্তু দেওয়া যায় [যেমন- ধান, গম ইত্যাদি] তাহলে সে মালিককে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু দিয়ে দিবে। আর যদি বস্তুটি এমন হয়, যার অনুরূপ বস্তু দেওয়া যায় না [যেমন- পণ্ড বা তারতম্যপূর্ণ বস্তু] তাহলে সে মালিককে বস্তুটির মূল্য পরিশোধ করে দিবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَكَ الْمَالُ لَا يَبْعُدُ بِإِجَارَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَضْلِ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মালিক নিঃসম্পর্ক (فُضُولِي) ব্যক্তির বিক্রয়-চুক্তি অনুমোদন করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে মালিকের ওয়ারিসের অনুমোদন দ্বারা চুক্তিটি কার্যকর হবে না। এ বিধান উভয় সূরতেই, অর্থাৎ মূল্য হিসেবে মুদ্রাদ্রব্য নির্ধারণ করার সূরতেও এবং মূল্য হিসেবে মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু নির্ধারণ করার সূরতেও। কোনো সূরতেই ওয়ারিসের অনুমোদন দ্বারা বিক্রয় কার্যকর হবে না। কারণ, বিক্রয়-চুক্তি স্বয়ং মূল মালিক তথা মৃত ব্যক্তির অনুমোদনের উপর মওকুফ বা স্থগিত ছিল, কাজেই অন্যের অনুমোদনের দ্বারা তা কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ فِي حَبَابِهِ وَلَا يُعْلَمُ حَالُ النَّبِيِّ الْخ: আর যদি এমন হয় যে, মালিক তার জীবদ্দশায় বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করে গেছে, কিন্তু একথা জানা যাচ্ছে না যে, তার অনুমোদনের সময় বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান ছিল কিনা, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, চুক্তিটি কার্যকর হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমতও তাই ছিল। পরবর্তীতে তিনি তাঁর এ অভিমত প্রত্যাহার করেছেন। এ অভিমতটির দলিল হলো, কোনো বিদ্যমান বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা (أَصْلُ) হলো, তা বিদ্যমান থাকা। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত তা হালকা হয়েছে বলে জানা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিদ্যমান আছে বলে ধর্তব্য হবে। কাজেই মালিক অনুমোদন করার সময় বস্তুটি বিদ্যমান ছিল বলে ধরা হবে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) পরবর্তীতে তাঁর উপরিউক্ত প্রথম অভিমত প্রত্যাহার করে এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে চুক্তি কার্যকর হবে না, যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, অনুমোদনকালে বস্তুটি বিদ্যমান ছিল। কারণ, এখানে চুক্তি কার্যকর হওয়ার জন্য যে বিষয়টি শর্ত, তা পূরণ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আর সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা থাকাবস্থায় কোনো বিষয় [নতুনভাবে] সাব্যস্ত করা যায় না। কাজেই সন্দেহ থাকার কারণে বিক্রয় কার্যকর করা সম্ভব হবে না।



قَالَ : وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ وَاعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ فَلَا عِتْقَ جَائِزٍ اسْتِحْسَانًا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَأَبِي يُوسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) : لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُونِ الْمِلْكِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَالْمَوْقُوفُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ، وَلَوْ ثَبَتَ فِي الْآخِرَةِ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا، وَهُوَ نَائِبٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ، وَالْمَصْحُوحُ لِلْإِعْتِقَاقِ الْمِلْكَ الْكَامِلُ لِمَا رَوَيْنَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি [অন্যের] গোলাম আত্মসাৎ করে তা বিক্রয় করে ফেলে, অতঃপর ক্রেতা তাকে আজাদ করে দেয়, তারপর গোলামের [মূল] মালিক বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করে, তাহলে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। এ বিধানটি হচ্ছে 'ইসতিহসান' বা সূক্ষ্ম ক্রয়সের ভিত্তিতে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আজাদ করা কার্যকর হবে না। কেননা, মালিকানা ব্যতীত আজাদ করার অধিকার নেই। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান যে দাসের মালিক নয়, তা আজাদ করা কার্যকর হবে না"। আর স্থগিত বিক্রয়চুক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করে না। আর যদি পরবর্তীতে [অনুমোদন প্রদানের কারণে] মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তাহলে তা সাব্যস্ত হবে [আত্মসাৎকারীর বিক্রয়ের উপর] ভিত্তিশীল হয়ে, আর অন্য কারণের উপর ভিত্তিশীল মালিকানা এক হিসেবে সাব্যস্ত, আর অন্য হিসেবে সাব্যস্ত নয়। অথচ আমাদের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মালিকানাই হচ্ছে আজাদ করাকে কার্যকরকারী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ غَصَبَ عَبْدًا الْخ : মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো গোলাম আত্মসাৎ করে, অতঃপর তা কারো কাছে বিক্রয় করে ফেলে, তাহলে আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে যে ক্রয় করেছে, সে যদি গোলামটি আজাদ করে দেয়, তারপর গোলামের মূল মনিব আত্মসাৎকারীর বিক্রয়কে অনুমোদন করে তবে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি হলো ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হবে না।

উল্লেখ্য, আদ্রামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) "জামিউস সাগীর" গ্রন্থে মাসআলাটি এভাবেই কোনো মতবিরোধ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। "জামিউস সাগীর" গ্রন্থ লেখার পর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যখন গ্রন্থটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর নিকট পেশ করেন তখন ইমাম আবু ইউসুফ (র.) গ্রন্থটির প্রশংসা করেন। কিন্তু কয়েকটি মাসআলা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত নিয়ে তাঁদের উভয়ের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, তুমি যেভাবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত লিখেছ আমি তোমার নিকট সেভাবে বর্ণনা করিনি; বরং এর বিপরীত বর্ণনা করেছিলাম, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বরং আপনি আমার নিকট একরূপই বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু আপনার স্মরণ নেই। আলোচ্য মাসআলাটিও তার একটি। এ মাসআলা সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছিলাম যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এ সুরত ক্রেতার আজাদ করা বাতিল হবে। জবাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, না, বরং আপনি বর্ণনা করেছিলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) মন্তব্য করেছেন যে, কাজেই “জামিউস সাগীরের” উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে এ কথা বলা সঠিক হবে না যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব হচ্ছে, ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হওয়া। কেননা, মূল বর্ণনাকারীই পরবর্তী বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে সঠিক নয় বলে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। কমপক্ষে এতটুকু বলতে হবে যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর থেকে দুই রকম বর্ণনা রয়েছে।

যা হোক মুসান্নিফ (র.) যেভাবে মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন তাতে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে আত্মসাৎকারী থেকে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কার্যকর হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি কiyাসের অনুকূল। আর শায়খাইন (র.)-এর অভিমতটি سَيِّئَانِ তথা বাহ্যিক কiyাস পরিহার করে নিগূঢ় কiyাসের অনুকূল। উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমতও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَرُ لِابْنِ آدَمَ فَيْسًا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ لَهُ فَيْسًا وَلَا يَمْلِكُ - هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মালিকানা ছাড়া আজাদ করা যায় না। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, “آدَمَ سَبْتَانِ يَارَ مَالِكِ نَیَّ لَا سَے آجَآدَ كَرَتَے پَارَے نَآ” হাদীসটি তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তিরমিযী শরীফে হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَرُ لِابْنِ آدَمَ فَيْسًا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ لَهُ فَيْسًا وَلَا يَمْلِكُ - هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আর আলোচ্য মাসআলায় আত্মসাৎকারী থেকে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটির মালিক হয়নি। কেননা, তার ক্রয়চুক্তিটি মালিকের অনুমোদনের উপর স্থগিত ছিল। আর স্থগিত-চুক্তি মালিকানার ফায়দা দেয় না।

আর যদি আপনি বলেন যে, যখন মালিক বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করে তখন ক্রয়কারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং এ মালিকানা অনুমোদনের সময় থেকে সাব্যস্ত হয় না বরং ক্রয়ের সময় থেকে মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার জবাব হলো, অনুমোদন যে ক্রয়ের কাল থেকে মালিকানা সাব্যস্ত করে তা করে اِبْتِئَانِ অর্থাৎ বর্তমানের কোনো কার্য পূর্বের কোনো কারণ (سَبَبٍ)-এর দিকে সম্পর্কিত (مَنْسُوبٍ) হয়ে বিধান সাব্যস্ত হওয়ার পন্থায়। আর এরূপ পন্থায় যে মালিকানা সাব্যস্ত হয় তা পরবর্তী কার্য তথা অনুমোদনের পূর্বের সময় পর্যন্ত অপূর্ণ (وَمِنْ جَوْوَدُونَ وَجَوٍ) মালিকানা ছিল বলে সাব্যস্ত হয়। কাজেই আজাদ করার সময় তার মালিকানা ধরা হলেও তা হবে অপূর্ণ মালিকানা। অথচ আজাদ সহীহ হওয়ার জন্য পূর্ণ মালিকানা অপরিহার্য। কেননা, আমাদের বর্ণিত হাদীস لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ -এ মালিকানার কথা শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শর্তহীন (مُطْلَقٌ) ভাবে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়ে তা দ্বারা পূর্ণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই আজাদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা অপরিহার্য। আর আলোচ্য সূরতে কোনোভাবেই ক্রেতার আজাদ করার সময় পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে না। অতএব, তার আজাদ করা কার্যকর হবে না।

وَلِهَذَا لَا يَصَحُّ أَنْ يُعْتَقَ الْغَاصِبُ، ثُمَّ يُؤَدَّى الضَّمَانُ، وَلَا أَنْ يُعْتَقَ الْمُشْتَرَى،  
وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ يُجْزَى الْبَائِعُ ذَلِكَ وَكَذَا لَا يَصَحُّ بَيْعُ الْمُشْتَرَى مِنَ الْغَاصِبِ  
فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ أَسْرَعُ يَفَازًا، حَتَّى نَفَذَ مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا أَدَّى الضَّمَانُ وَكَذَا  
لَا يَصَحُّ إِعْتَاؤُ الْمُشْتَرَى مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا أَدَّى الْغَاصِبُ الضَّمَانُ، وَلَهُمَا أَنْ الْمَلِكُ  
تَبَتَّ مَوْقُوفًا يَتَصَرَّفُ مَطْلَقًا مَوْضِعًا لِإِقَادَةِ الْمَلِكِ، وَلَا ضَرَرُ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ،  
فَيَتَوَقَّفُ الْإِعْتَاؤُ مُرْتَبًا عَلَيْهِ، وَيَنْفَذُ بِنَفَائِهِ.

অনুবাদ : আর এ কারণেই তো আত্মসাৎকারী গোলামকে আজাদ করলে এবং পরে জরিমানা পরিশোধ করলে তা কার্যকর বলে গণ্য হয় না। এরূপভাবে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকাবস্থায় ক্রেতা যদি আজাদ করে দেয় আর পরে বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করে, তাহলে আজাদ করা কার্যকর হয় না। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর [পুনরায়] বিক্রয় সঠিক হয় না। অথচ বিক্রয় হচ্ছে আজাদ করার চেয়ে দ্রুত কার্যকর। এজন্যই আত্মসাৎকারী বিক্রয় করার পর যদি ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় কার্যকর হয়ে যায়। এরূপভাবে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী আজাদ করার পর যদি আত্মসাৎকারী ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়, তাহলে [সকলের মতেই] ক্রেতার আজাদ করা কার্যকর হয় না। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, [আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর] মালিকানা [মালিকের অনুমোদনের উপর] স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হয়েছে এমন একটি শর্তমুক্ত লেনদেনের মাধ্যমে যা মালিকানা সৃষ্টির জন্যই শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। আর এতে কোনো পক্ষের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না; যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আজাদ করার বিষয়টি [অপেক্ষমাণ] মালিকানার উপর সম্পৃক্তরূপে স্থগিত থাকবে। আর মালিকানা কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে আজাদ করাও কার্যকর হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَا يَصَحُّ أَنْ يُعْتَقَ الْغَاصِبُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন, যেগুলোতে পূর্ণ মালিকানা না থাকার কারণে সকলের ঐকমত্যে আজাদ করা কিংবা বিক্রয় কার্যকর হয় না। সুতরাং বুঝা যায় যে, আজাদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা শর্ত।

প্রথম উদাহরণ হলো : যদি কোনো আত্মসাৎকারী গোলাম আত্মসাৎ করে তা আজাদ করে দেয়, অতঃপর সে মালিককে তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার আজাদ করা কার্যকর হবে না। অথচ ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে আত্মসাৎের সময় থেকেই তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। তা সত্ত্বেও আজাদ হয় না, তার কারণ হলো, উক্ত মালিকানা অ-পূর্ণ (نَائِبٌ مِنْ وَجُودِ وَجَدٍ)।

قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يُعْتَقَ الْمُشْتَرَى، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ الخ : দ্বিতীয় উদাহরণ হলো :

যদি কোনো গোলামের বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেতার শর্ত [ভেবে দেখার ইচ্ছাধিকার থাকে] আর এমতাবস্থায় ক্রেতা গোলামটি নিয়ে আজাদ করে দেয় অতঃপর বিক্রেতা তার ইচ্ছাধিকার তুলে নিয়ে চুক্তি কার্যকর করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে ক্রেতার আজাদ করা কার্যকর হয় না। কেননা, আজাদ করার সময় ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ছিল না।

الْعَاصِبِ الْخ : তৃতীয় উদাহরণ হলো :

আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ই যদি আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটি [আজাদ করার পরিবর্তে] বিক্রয় করে আর পরে মালিক আত্মসাৎকারীর বিক্রয় অনুমোদন করে, তাহলে সকলের একমতের দ্বিতীয় বিক্রয়টি [অর্থাৎ আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর বিক্রয়] কার্যকর হয় না। অথচ আজাদ করার তুলনায় বিক্রয় দ্রুত ও সহজে কার্যকর হয়। সুতরাং যখন বিক্রয়ই সকলের মতে কার্যকর হয় না, তখন তার আজাদ করা [যা আমাদের আলোচ্য মাসআলা] অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে কার্যকর হবে না। আর আজাদ করার তুলনায় বিক্রয় যে দ্রুত ও সহজে কার্যকর হয় তার প্রমাণ হচ্ছে, যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তি গোলামকে বিক্রয় করে ফেলে তারপর সে মালিককে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় সকলের মতে কার্যকর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি গোলামকে আজাদ করে দেয় তারপর মালিককে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সকলের মতে আজাদ করা কার্যকর হয় না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আজাদ করার তুলনায় বিক্রয় দ্রুত ও সহজে কার্যকর হয়।

الْعَاصِبِ الْخ : চতুর্থ উদাহরণ হলো :

যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামকে আজাদ করে দেয়, অতঃপর আত্মসাৎকারী মালিককে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সকলের একমতের ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয় না। সুতরাং ক্ষতিপূরণের সুরতে যখন আজাদ করা কার্যকর হয় না তখন অনুমোদনের সুরতেও কার্যকর হবে না। কেননা, উভয় সুরতেই একই প্রকারের মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

الْعَاصِبِ الْخ : এখান থেকে মুসল্লিফ (র.) শায়খাইনের দলিল বর্ণনা করেছেন। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয় করার সময় থেকেই ক্রয়কারীর মালিকানা মওকুফ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আর আজাদ করা সেই মওকুফ মালিকানার উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। অতঃপর যখন মালিক বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করবে তখন ক্রয়কারীর স্থগিত মালিকানা কার্যকর হবে এবং সে স্থগিত মালিকানার উপর নির্ভরশীল আজাদ করার বিষয়টিও কার্যকর হবে। আমরা এখানে যে বলেছি, “ক্রয় করার সময় থেকেই ক্রয়কারীর মালিকানা মওকুফ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে” এর কারণ হলো, বিক্রয়চুক্তি শরিয়তে নির্ধারণ করাই হয়েছে মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য। আর আলোচ্য সুরতে বিক্রয়চুক্তি হয়েছে কোনো পক্ষের ইচ্ছাধিকার (خيار شرط) থেকে মুক্ত রূপে। কাজেই তা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে দাবি করে। আর এ স্থগিত মালিকানা সাব্যস্ত করার মাঝে মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার কোনো ক্ষতি নেই। আর কোনো বিধানের দাবিকারী বিষয় (مُنْتَظَى) পাওয়া গেলে যদি কোনো বাধা না থাকে, তাহলে আবশ্যিকরূপে উক্ত বিধান সাব্যস্ত হয়।

কাজেই উক্ত বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। অবশ্য মালিকের অনুমতি না থাকার কারণে এ মালিকানা স্থগিত রয়েছে। আর আমরা যে বলেছি, আজাদ হওয়ার বিষয়টি সেই স্থগিত মালিকানার উপর নির্ভরশীল হয়ে স্থগিত থাকবে এবং মালিকানার বিষয়টি কার্যকর হওয়ার সময় তার উপর নির্ভরশীল আজাদ হওয়ার বিষয়টিও কার্যকর হবে। এটিও সঙ্গত এবং শরিয়তে এর নজির রয়েছে। মুসল্লিফ (র.) এর স্বপক্ষে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন- যা পরবর্তী ইবারতে আলোচিত হবে।

وَصَارَ كِبَاعَتَايَ الْمُشْتَرَى مِنَ الرَّاهِنِ، وَكِبَاعَتَايَ الْوَارِثِ عَبْدًا مِنَ التَّرَكَّةِ، وَهِيَ مُسْتَفْرَقَةٌ بِالذُّبُونِ بَصَحٌ وَيَنْفَدُ إِذَا قَضَى الدُّيُونُ بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ إِعْتِقَايَ الْغَاصِبِ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّ الْغَضَبَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْبَيْعِ خَبَارٌ لِلْبَائِعِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ، وَقِرَانُ الشَّرْطِ بِهِ يَمْنَعُ إِنْعِقَادَهُ فِي حَقِّ الْحَكْمِ أَصْلًا، وَبِخِلَافِ الْمُشْتَرَى مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا بَاعَ، لِأَنَّهُ بِإِلْجَازَةٍ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ مِلْكٌ بَاتٌ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مِلْكٍ مَوْقُوفٍ لِغَيْرِهِ أَبْطَلَهُ وَأَمَّا إِذَا آدَى الْغَاصِبُ الضَّمَانَ يَنْفَدُ إِعْتِقَاكُ الْمُشْتَرَى مِنْهُ، كَذَا ذَكَرَهُ هَلَالٌ (رحا) وَهُوَ الْأَصَحُّ.

অনুবাদ : এ ক্ষেত্রে বিষয়টি বন্ধকদাতার নিকট হতে ক্রয়কারীর আজাদ করার মতো হলো। আর মৃত ব্যক্তির যে ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ঋণ দ্বারা আবদ্ধ তা থেকে ওয়ারিসের একটি গোলাম আজাদ করে ফেলার মতো হলো। এ বিক্রয় কার্যকর হয় যদি ওয়ারিশ আজাদ করার পর ঋণ পরিশোধ করে দেয়। পক্ষান্তরে আত্মসাৎকারী নিজেকে আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আত্মসাৎ মালিকানা সৃষ্টি করার জন্য [শরিয়ত কর্তৃক] নির্ধারিত হয়নি। তদ্রূপ বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকার সুরতের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, তা নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ বিক্রয় নয়; বরং বিক্রয়চুক্তিতে ইচ্ছাধিকারের শর্ত যুক্ত হওয়া মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার পথে পূর্ণরূপেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এরূপভাবে আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর [পুনরায়] বিক্রয় করার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, [মালিকের] অনুমোদনের মাধ্যমে বিক্রেতার নিরঙ্কুশ মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। কাজেই এই নিরঙ্কুশ মালিকানা যখন স্থগিত মালিকানার উপর উদ্ভূত হবে তখন নিরঙ্কুশ মালিকানা [অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে] স্থগিত মালিকানা বাতিল করে দিবে। আর আত্মসাৎকারী যদি [মালিককে] ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়, তাহলে তার থেকে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। ফকীহ হিলাল (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন এবং এটিই বিতর্কিতম অভিমত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصَارَ كِبَاعَتَايَ الْمُشْتَرَى مِنَ الرَّاهِنِ : প্রথম উদাহরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে তার নিকট একটি গোলাম বন্ধক রাখে, অতঃপর বন্ধকগ্রহণকারীর অনুমতি ছাড়াই যদি বন্ধকদাতা গোলামটি কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলে এবং ক্রেতা গোলামটি আজাদ করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে গোলামের আজাদ হওয়ার বিষয়টি বন্ধকগ্রহণকারীর অনুমোদন কিংবা তার ঋণ পরিশোধের উপর স্থগিত থাকবে। যদি বন্ধকগ্রহণকারী বিক্রয় অনুমোদন করে কিংবা বন্ধকদাতা তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে ক্রেতার পক্ষ থেকে গোলামকে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের আলোচ্য সুরতে মালিকের অনুমোদনের মাধ্যমে আজাদ করার বিষয়টি কার্যকর হবে। কেননা, উভয় সুরতেরই একই অবস্থা, তা হলো আজাদ করার বিষয়টি স্থগিত বিক্রয়চুক্তির উপর নির্ভরশীল হবে।



قَالَ : فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ فَأَخَذَ أَرْضَهَا ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ فَلَا رُشَ لِلْمُشْتَرِي، لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّ لَهُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطْعَ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ، وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى مُعْتَدٍ (رد) وَالْعُدْرُ لَهُ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ وَجْهِ يَكْفِي لِإِسْتِحْقَاقِ الْأَرْضِ، كَالْمَكَاتِبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا وَأَخَذَ الْأَرْضَ ثُمَّ رَدَّ فِي الرَّيِّ يَكُونُ الْأَرْضُ لِلْمَوْلَى، وَكَذَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُشْتَرِي فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِبَارُ لِلْبَّائِعِ ثُمَّ أُجِيزَ الْبَيْعُ فَلَا رُشَ لِلْمُشْتَرِي، بِخِلَافِ الْإِعْتِقَاقِ عَلَى مَا مَرَّ وَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ أَوْ فِيهِ شُبْهَةٌ عَدَمِ الْمِلْكِ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি গোলামটির হস্ত কর্তন করা হয় আর ক্রয়কারী কর্তনকারীর কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ উসূল করে নেয় অতঃপর [মূল মালিক] বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ ক্রেতারই মালিকানাভুক্ত হবে। কেননা, [মালিকের অনুমোদনের মাধ্যমে] ক্রয়ের সময় থেকেই ক্রেতার মালিকানা পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ক্রেতার মালিকানায় থাকা অবস্থায়ই গোলামটির হস্ত কর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিপক্ষে একটি প্রমাণ হলো। অবশ্য তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, কোনো প্রকারের মালিকানা থাকলেই তা ক্ষতিপূরণের হকদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন- মুকাতাবের হাত যদি কর্তন করা হয়, আর মনিব যদি তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে অতঃপর [নির্ধারিত অংক পরিশোধ করতে না পারায়] মুকাতাব যদি পুনরায় দাসত্বে ফিরে যায়, তাহলে উক্ত ক্ষতিপূরণ মনিবেরই মালিকানাভুক্ত হয়। একরূপভাবে যদি বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার রয়েছে একরূপ বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় ক্রয়কৃত গোলামের হস্ত কর্তন করা হয় অতঃপর বিক্রেতা চুক্তি কার্যকর করে, তাহলে [হস্ত কর্তনের] ক্ষতিপূরণ ক্রেতারই মালিকানাভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন, যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে [অর্থাৎ আজাদ করার জন্য যে কোনো প্রকারের মালিকানা যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ণ মালিকানা অপরিহার্য]। আর [কর্তনকারীর কাছ থেকে উসূলকৃত জরিমানা থেকে যে পরিমাণ টাকা গোলামটির] অর্ধেক মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত হবে তা ক্রেতা সদকা করে দিবে। কেননা, গোলামটি তার দায়ভুক্ত হয়নি কিংবা গোলামের মাঝে তার মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْ قَوْلِهِ قَالَ : فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ الْغ : মাসআলা হলো, যদি আত্মসাৎকারীর নিকট হতে গোলামটি ক্রয় করার পর ক্রয়কারী তাকে আজাদ কিংবা বিক্রয় না করে আর এমতাবস্থায় কেউ গোলামটির হাত কেটে ফেলে এবং ক্রয়কারী যে হাত কেটেছে তার কাছ থেকে হাত কাটার জরিমানা উসূল করে, তারপর যদি গোলামটির মূল মালিক আত্মসাৎকারীর বিক্রয় অনুমোদন করে, তাহলে হাত কাটার উসূলকৃত জরিমানা ক্রয়কারীরই মালিকানাভুক্ত হবে। কেননা, যখন মালিক বিক্রয় অনুমোদন করেছে তখন ক্রয়কারীর গোলামটির উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে এবং এ মালিকানা ক্রয়ের সময় থেকে সাব্যস্ত হবে। কারণ, ক্রয়ই হচ্ছে তার মালিকানার سَبَب বা কারণ। কাজেই গোলামটির হস্ত কর্তন ক্রেতার মালিকানায় থাকা অবস্থায়ই হয়েছে। অতএব, সে-ই উসূলকৃত ক্ষতিপূরণের মালিক হবে।

(رح) قَوْلُهُ وَلَهُمْ حُجَّةٌ عَلَى مُعْتَدٍ (র.) মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলায় ক্রেতার ক্ষতিপূরণের মালিক হওয়ার বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিপক্ষে একটি প্রমাণ। কেননা, তিনি পূর্বের মাসআলায় ক্রেতার আত্মদ কক্ষকে কার্যকর সাব্যস্ত করেননি। আর এ মাসআলায় তিনিও একমত যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণের মালিক হবে। অথচ পূর্বের মাসআলায় আত্মদ করা হয়েছে স্থগিত মালিকানার অবস্থায় আর এ মাসআলায় হস্ত কর্তন করাও হয়েছে স্থগিত মালিকানার অবস্থায়। কাজেই বিধান উভয় সুরতের একই রূপ হওয়া আবশ্যিক ছিল।

قَوْلُهُ وَالْمُتْرُكُ أَنْ يَلْبِسَ مِنْ وَجَعِ يَحْشَى لِإِسْتِغْنَائِي الْأَرْضِ النِّع (র.) মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট, কিন্তু আত্মদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা প্রয়োজন। আর মালিকের অনুমোদনের পূর্বে ক্রেতার যে মওকুফ মালিকানা ছিল তা অপূর্ণ মালিকানা [যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি]। ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য যে অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট তার প্রমাণ হিসেবে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে দৃষ্টি উপমা পেশ করেছেন—

قَوْلُهُ كَالْمُكَانِبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُ النِّع : প্রথম উপমা হলো, কেউ যদি 'মুকাতা'ব [যে অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য চুক্তি করেছে]—এর হাত কেটে ফেলে আর তার মনিব যে হাত কেটেছে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ উসুল করে নেয়, অতঃপর 'মুকাতা'ব তার চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় পুনরায় গোলাম হিসেবেই থেকে যায়, তাহলে মনিবই উসুলকৃত ক্ষতিপূরণের মালিক হয়। এখানে মুকাতা'ব থাকা অবস্থায় মুকাতা'বের উপর মনিবের পূর্ণ মালিকানা ছিল না। তা সত্ত্বেও মনিব ক্ষতিপূরণের মালিক হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُشْتَرَى فَيُرَى بِدِ الْمُنْتَرَى : দ্বিতীয় উপমা হলো, যদি গোলামের বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেতার হস্ত কর্তনের পরে দেখার ইচ্ছাধিকার থাকে আর এমতাবস্থায় ক্রেতা গোলামটিকে নিজের কাছে নিয়ে রাখে এবং তার কাছে থাকাবস্থায় কেউ গোলামটির হাত কেটে ফেলে তারপর বিক্রেতা তার ইচ্ছাধিকার তুলে নিয়ে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর করে দেয়, তাহলে ক্রেতাই হস্ত কর্তনের ক্ষতিপূরণের মালিক হয়। এ মাসআলায়ও হস্ত কর্তনের সময় ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ছিল না; বরং বিক্রেতার কার্যকর করার কারণে পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে যা পূর্বের বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত (مُتَّصِدٌ) হয়েছে। কাজেই হস্ত কর্তনের সময় ক্রেতার অপূর্ণ মালিকানা ছিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে আত্মদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা আবশ্যিক, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

قَوْلُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى نَفْسِ الْكُسْرِ النِّع : মাসআলা হলো, কর্তনকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ক্রয়কৃত গোলামের হস্ত কর্তনের যে ক্ষতিপূরণ উসুল করেছে সেই ক্ষতিপূরণ যদি যে মূল্য দিয়ে সে গোলামটি ক্রয় করেছে তার অর্ধেকের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা তার উপর সদকা করা ওয়াজিব হবে।

কেননা, গোলামের হাত মূল্যমানের দিক থেকে গোলামের অর্ধেক হিসেবে গণ্য হয়। তাই কেউ তার কর্তন করলে কর্তনকালে গোলামটির যা বাজারমূল্য রয়েছে তার অর্ধেক ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হয়। আর ক্রেতার ক্রয়মূল্যের চেয়ে বাজারমূল্য বেশি হতে পারে, ফলে ক্ষতিপূরণের টাকা গোলামটির ক্রয়মূল্যের অর্ধেকের চেয়ে বেশি হবে। আর এ বেশিটুকু ক্রেতার লাভ হলো। কিন্তু আলোচ্য সুরতে ক্রেতার জন্য লাভ গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। তার কারণ হলো, হাত কর্তন যদি ক্রেতা গোলামটি হস্তগত করার পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে গোলামটি তখন তার জিম্মাদারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর যে বস্তু কারো জিম্মাদারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তার লাভ গ্রহণ করা তার জন্য জায়েজ নয় (لَا يَجُوزُ رِبْحُ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَمِلُ)। আর যদি গোলামটি ক্রেতার হস্তগত করার পর তার হস্ত কর্তন করা হয়ে থাকে, তাহলে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, কর্তনকালে তার প্রকৃত পক্ষে মালিকানা ছিল না; বরং পরবর্তীতে মালিক বিক্রয় অনুমোদন করার ফলে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে পূর্বের ক্রয়ের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে (بَطَرْنَاهُ الْإِسْتِغْنَاءَ)। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদম মালিকানা হলো অপূর্ণ মালিকানা (مِنْ وَجَعِ دُونَ وَجَعِ)। কাজেই তাতে মালিকানা না হওয়ার সন্দেহ রয়ে গেছে। আর সন্দেহযুক্ত মালিকানাধীন বস্তুর লাভ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। অতএব, যখন উভয় অবস্থায়ই তার জন্য লাভ গ্রহণ করা জায়েজ নয়, তখন তার জন্য লাভের অংশটুকু সদকা করা ওয়াজিব হবে।



قَالَ : فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرَى مِنْ آخَرَ ثُمَّ أَجَارَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَمْ يَجْزِ الْبَيْعُ الثَّانِي لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَئِنْ فِيهِ غَرَرٌ الْإِنْفِسَاحَ عَلَى إِعْتِبَارِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، وَالْبَيْعُ يَفْسُدُ بِهِ ، بِخِلَافِ الْإِعْتِقَاقِ عِنْدَهُمَا ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْثِرُ فِيهِ الْغَرَرُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারী ব্যক্তি পুনরায় গোলামটি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে ফেলে অতঃপর মনিব প্রথম বিক্রয়টি অনুমোদন করে, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয়টি কার্যকর হবে না। এর কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়া এ কারণে যে, প্রথম বিক্রয়চুক্তি অনুমোদিত না হলে দ্বিতীয় চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এই ঝুঁকি রয়েছে। আর এরূপ ঝুঁকির কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.)-এর মতে [আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর] আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ প্রথম বিক্রয় অনুমোদনের পর তা কার্যকর হয়ে যায়]। কেননা, বাতিল হওয়ার ঝুঁকি আজাদ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرَى مِنْ آخَرَ الخ : মাসআলা হলো, যদি আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটি আবার অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলে তারপর মূল মালিক আত্মসাৎকারীর বিক্রয় [অর্থাৎ প্রথম বিক্রয়] অনুমোদন করে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয় তথা প্রথম ক্রয়কারীর বিক্রয় কার্যকর হবে না। এর একটি কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মালিকের অনুমোদনের ফলে প্রথম ক্রেতার নিরঙ্কুশ ও কার্যকর মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। আর ক্রয়কারীর কাছ থেকে যে পুনরায় ক্রয় করেছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রয়কারীর মালিকানা ছিল মওকুফ; আর একই বস্তুর উপর এক সময় দুই ব্যক্তির মালিকানা হতে পারে না। তাই নিরঙ্কুশ ও কার্যকর মালিকানা মওকুফ মালিকানাকে বাতিল করে দিবে। ফলে প্রথম ক্রয়কারীর মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং দ্বিতীয় ক্রয়কারীর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই দ্বিতীয় বিক্রয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ فِيهِ غَرَرٌ الْإِنْفِسَاحَ الخ : আরেকটি কারণ হলো, দ্বিতীয় বিক্রয় কার্যকর হওয়া নির্ভর করে মূল মালিকের প্রথম বিক্রয়টি অনুমোদনের উপর। আর প্রথম বিক্রয়টি মালিক আদৌ অনুমোদন করবে কিনা তা জানা নেই। ফলে দ্বিতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। আর ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ঝুঁকির সম্ভাবনার কারণে আজাদ করা বাতিল হয় না। তাই তাদের মতে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী যদি গোলামকে আজাদ করে দেয় তারপর যদি মালিক বিক্রয়টি অনুমোদন করে, তাহলে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যায় [যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে]।

উল্লেখ্য, ঝুঁকির সম্ভাবনার কারণে যে আজাদ করা বাতিল হয় না কিন্তু বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয় তার প্রমাণ হলো, যদি কেউ একটি গোলাম ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বেই আজাদ করে দেয়, তাহলে তার আজাদ করা কার্যকর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি গোলামটি হস্তগত করার পূর্বে অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হয়।

উল্লেখ্য, এখানে একটি জটিল প্রশ্ন দাখিল দিতে পারে। তা হলো, যদি বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হওয়া না হওয়ার ঝুঁকির কারণে বাতিল বলে গণ্য হয়, তাহলে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে প্রথম ক্রেতার ক্রয়ও বাতিল হওয়ার কথা। কেননা, হতে পারে যে, মালিক এ বিক্রয় অনুমোদন করবে না। কাজেই মালিকের অনুমোদনের পর তা কার্যকর না হওয়ার কথা। এক্ষেপাভাবে নিঃসম্পর্ক (مُتْرِكٌ) ব্যক্তির বিক্রয়ও বাতিল হওয়ার কথা। কেননা, সেখানেও এ ঝুঁকি থাকে যে মালিক বিক্রয় অনুমোদন করবে না। অথচ এ উভয় সুরতে বিক্রয় বাতিল হয় না; বরং মালিক অনুমোদন করলে তা কার্যকর হয়।

এ প্রশ্নের জবাব হলো, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয় এবং আত্মসাৎকারীর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে কার্যকর না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে যা বিক্রয় বাতিল হওয়া দাবি করে, কিন্তু অন্য দিকে তাতে মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার উপকার রয়েছে [যা আমরা نَصْلُ بْنُ بَيْعِ الدُّمُورِ -তে আলোচনা করেছি] এবং কারো কোনো ক্ষতির দিক নেই, যা চুক্তিটো জায়েজ হওয়ার দাবি করে। তাই উপকারের দিকে লক্ষ্য করে মওকুফ হিসেবে এর বিক্রয়কে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর দ্বিতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই উপকার বিদ্যমান নেই। কেননা, ক্রয়কারী তখনও মালিকই যদি কার্যকর হওয়ার নতুন ক্রেতা তাগাসনে প্রশ্ন আসবে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যখন জায়েজ হওয়ার দিক এবং নাজায়েজ হওয়ার দিক উভয়টিই বিদ্যমান তখন জায়েজ হওয়ার দিকটি কেন প্রাধান্য দেওয়া হলো? তার জবাব হচ্ছে, উপকারের দিক বিবেচনা না করে শুধু ঝুঁকির কারণে বিক্রয় বাতিল গণ্য করা সম্ভব নয়। কেননা, তাহলে কোনো বিক্রয়ই জায়েজ হবে না। কারণ, সকল বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই এই ঝুঁকি থাকে যে, বিক্রয়ের পর হস্তান্তরের আগে বকুটি হালকা হয়ে যেতে পারে। কাজেই বুখা শেল, যে ক্ষেত্রে উপকার বিদ্যমান নেই সে ক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণে বিক্রয় বাতিল হয়। অন্যথায় উপকারের দিক বিবেচ্য হবে।

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَبْعَهُ الْمُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدِهِ أَوْ قُتِلَ ثُمَّ أَجَارَ الْبَيْعَ لَمْ يَحْزَ، لِمَا  
 ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِجَارَةَ مِنْ شَرْطِهَا قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ، وَكَذَا بِالْقَتْلِ،  
 إِذْ لَا يُمَكِّنُ إِنْجَابُ الْبَدْلِ لِلْمُشْتَرِي بِالْقَتْلِ حَتَّى يُعَدَّ بَاقِيًا بِبَقَاءِ الْبَدْلِ، لِأَنَّهُ  
 لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الْقَتْلِ مِلْكًا يُقَابَلُ بِالْبَدْلِ فَيَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ  
 الصَّحِيحِ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي ثَابِتٌ فَأُمَكِّنَ إِنْجَابُ الْبَدْلِ لَهُ، فَيَكُونُ الْمَيْعُ  
 قَائِمًا بِقِيَامِ خَلْفِهِ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَةَ  
 عَلَى إِفْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ وَأَرَادَ رَدَّ الْبَيْعِ لَمْ تُقْبَلْ بَيْعَتُهُ  
 لِلتَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى، إِذِ الْإِقْدَامُ عَلَى الشِّرَاءِ إِفْرَارٌ مِنْهُ بِصَحَّتِهِ، وَالْبَيْعَةُ مَبْنِيَّةٌ  
 عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى.

অনুবাদ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটিকে বিক্রয় না করে; বরং তার হাতে থাকারস্থায় গোলামটি মারা যায় কিংবা নিহত হয় অতঃপর যদি মনিব বিক্রয়কে অনুমোদন করে, তাহলে অনুমোদনটি কার্যকর হবে না। কেননা, পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, [মালিকের] অনুমোদন কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অনুমোদনকালে বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান থাকতে হবে। আর [আলোচ্য সূরতে] মৃত্যুর মাধ্যমে বিক্রীত গোলাম অব্যবস্থাপিত হয়ে গেছে। এরূপভাবে হত্যার ক্ষেত্রেও একই কথা। কেননা, হত্যার কারণে ক্রেতার জন্য গোলামটির বিনিময় বস্তু সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়, এটা সম্ভব হলে না হয় বিনিময়বস্তু বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে গোলামটি বিদ্যমান আছে বলে বিবেচনা করা যেত। কারণ, হত্যার সময় ক্রেতার এমন মালিকানা ছিল না, যার ভিত্তিতে গোলামটির বিনিময়বস্তু তার জন্য সাব্যস্ত করা যায়। কাজেই [অনুমোদনকালে] গোলামটির অব্যবস্থাপিততা নিশ্চিত। পক্ষান্তরে [এ সূরতটি] বিশুদ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হলে তার বিধান ভিন্ন। কেননা, [তখন হত্যার সময়] ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত রয়েছে। ফলে নিহত গোলামের বিনিময়বস্তু তার জন্য সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে। অতএব, স্থলাভিষিক্ত বস্তু [তথা বিনিময়বস্তু] বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে বিক্রীত গোলাম বিদ্যমান আছে বলে বিবেচিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি অন্যের গোলাম তার অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা বিক্রোতা কিংবা গোলামের মনিবের এই মর্মে স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামের মালিক বিক্রোতাকে বিক্রয়ের নির্দেশ দেয়নি আর ক্রেতা এভাবে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে চায়, তাহলে ক্রেতার উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। কেননা, তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেছে। কারণ, তার গোলামটি ক্রয়ের উদ্যোগই তার পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তির সমতুল্য যে, বিক্রয়চুক্তিটি সঠিক ছিল। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা দাবি সঠিক হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

### শ্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَغْنَمْ الْمُسْلِمُونَ الْغَنَمَ: মাসআলা হলো, যদি কর্তনকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটি বিক্রয় না করে; বরং তার হাতে থাকা অবস্থায় গোলামটি মারা যায় কিংবা নিহত হয় তারপর যদি মূল মালিক বিক্রয় অনুমোদন করে, তাহলে মালিকের এ অনুমোদন কার্যকর হবে না।

এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মালিকের অনুমোদন কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অনুমোদনের সময় বিক্রীত-বস্তু [এখানে গোলামটি] বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় তার অনুমোদন কার্যকর হবে না। আর আলোচ্য মাসআলায় অনুমোদনের পূর্বেই গোলামটি মারা গেছে কিংবা নিহত হয়েছে। কাজেই মালিকের অনুমোদন কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِحْبَابِ الْبَيْتِ لِمُسْتَرْزِقِ الْغَنَمِ: কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আলোচ্য মাসআলায় গোলামটি নিহত হওয়ার সুরতে মালিকের অনুমোদনের সময় যদিও বিক্রীত-বস্তু তথা গোলামটি বিদ্যমান নেই, কিন্তু গোলামটির হত্যার বিনিময়ে প্রাপ্ত 'দিয়াত' তো ক্রেতার পক্ষে সাব্যস্ত করে সেই 'দিয়াত'-কে গোলামটির স্থলাভিষিক্ত ধরে অনুমোদনের সময় গোলামটি বিদ্যমান বলে ধরা যেতে পারে। কেননা, কোনো কিছু বা বিনিময়বস্তু বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে আসল বস্তুটি বিদ্যমান ধরা যায়। যেমন সাধারণ বিক্রয় তথা (الْبَيْعُ الصَّاعِلُ)-এর ক্ষেত্রে কেউ যদি একটি গোলাম ক্রয় করে অতঃপর তা হস্তগত করার পূর্বে কেউ তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি রহিত হয়ে যায় না, কিন্তু যদি গোলামটি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি রহিত হয়ে যায়। এর কারণ হলো, নিহত হওয়ার সুরতে গোলামটির বিনিময় তথা দিয়াত বিদ্যমান থাকে, তাই বিক্রীত-বস্তু বিদ্যমান আছে বলে গণ্য করা হয়। আর মৃত্যুর সুরতে যেহেতু তার কোনো বিনিময়বস্তুও বিদ্যমান থাকে না, তাই বিক্রয় রহিত হয়ে যায়। কাজেই আমাদের আলোচ্য সুরতে গোলামটির বিনিময়বস্তু 'দিয়াত' ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত করে মালিকের অনুমোদন কেন কার্যকর বলে গণ্য হবে না?

এর জবাব হলো, যখন গোলামটি হত্যা করা হয়েছে [অর্থাৎ মালিকের অনুমোদনের পূর্বে] তখন আত্মসাৎকারী থেকে ক্রয়কারীর এমন কোনো মালিকানা ছিল না যার ভিত্তিতে সে গোলামটির বিনিময় তথা 'দিয়াত'-এর মালিক হতে পারে। কেননা, তার মালিকানা ছিল মওকুফ মালিকানা, আর স্থগিত মালিকানার মাধ্যমে বিনিময়বস্তুর মালিক হতে পারে না। কাজেই মালিকের অনুমোদনের সময় বিক্রীত-বস্তু তথা গোলাম বা তার বিনিময়বস্তু কোনোটিই বিদ্যমান ছিল না, অতএব মালিকের অনুমোদন কার্যকর হবে না।

পক্ষান্তরে সাধারণ বিক্রয় তথা (الْبَيْعُ الْمُوَعَّظُ)-এর ক্ষেত্রে ক্রয়ের পরই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। অতএব হত্যার সময় ক্রেতা গোলামটি হস্তগত না করলেও গোলামটির মাঝে তার পূর্ণ মালিকানা ছিল। সুতরাং গোলামটির 'দিয়াত' তার জন্য সাব্যস্ত হবে। তাই বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল বা রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ الْغَنَمَ: মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো গোলাম মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা গোলামটি এই বলে ফেরত দিতে চায় যে, তুমি গোলামটি মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করেছ আর বিক্রীতা তা অস্বীকার করে তখন ক্রেতা যদি বিচারকের কাছে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রীতা ইত্যপূর্বে স্বীকার করেছিল যে, সে গোলামটি মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করেছে কিংবা সে এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, গোলামটির মালিক ইত্যপূর্বে স্বীকার করেছিল যে, সে বিক্রীতাকে গোলামটি বিক্রয় করার অনুমতি দেয়নি, তাহলে ক্রেতার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না।

এর কারণ হলো, ক্রেতার দাবির মাঝে এ ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, ক্রেতার গোলামটি ক্রয় করার উদ্যোগ তার পক্ষ থেকে এ কথার প্রমাণ যে, বিক্রয়চুক্তিটি সঠিক ছিল। আর এখন সে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে এ কথার দাবি করছে যে, বিক্রয়চুক্তিটি সঠিক ছিল না। কাজেই তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (نَاقِضٌ) পাওয়া গেল। আর দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা দাবিকে বাতিল করে দেয়। আর দাবি সঠিক না হলে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় না। কাজেই আলোচ্য সুরতে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

وَأَنَّ أَقْرَبَ الْبَائِعِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي بَطْلَ الْبَيْعِ إِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، لَأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صَحَّةَ الْإِقْرَارِ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَحَقَّقَ الْإِنْفَاءُ بَيْنَهُمَا، فَلِهَذَا شُرِطَ طَلَبُ الْمُشْتَرِي. قَالَ (رض): وَذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا صَدَّقَ مُدْعِيَهُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إِقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لِلْمُسْتَحَقِّ تَقْبُلُ، وَفَرَّقُوا أَنَّ الْعَبْدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَفِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُسْتَحَقُّ، وَشُرْطُ الرَّجُوعِ بِالْثَمَنِ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَيْنُ سَالِمًا لِلْمُشْتَرِي.

অনুবাদ : আর বিক্রেতা যদি বিচারকের নিকট তা স্বীকার করে তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে; যদি ক্রেতা চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার আবেদন জানায়। কেননা, দাবির স্ববিরোধিতা স্বীকারোক্তি সঠিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সুতরাং ক্রেতার অধিকার রয়েছে এ স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে সহায়তা করা। তখন উভয়ের মাঝে একমত্য সাব্যস্ত হবে। আর এ কারণেই ক্রেতার আবেদন জানানো শর্ত করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, **الزِّيَادَاتُ** গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতা যদি গোলামের মালিকানা দাবিকারীর দাবির সত্যায়ন করে অতঃপর এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতা স্বীকার করেছিল “গোলামটি উক্ত দাবিকারীর মালিকানাভুক্ত” তাহলে ক্রেতার উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। ফিকহবিদগণ এ দু মাসআলার মাঝে এভাবে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, এ মাসআলায় [অর্থাৎ মতনে বর্ণিত মাসআলায়, সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার সময়] গোলামটি রয়েছে ক্রেতার দখলে। পক্ষান্তরে [**زِيَادَاتُ**-এর বর্ণিত] সেই মাসআলায় গোলামটি রয়েছে অন্যের দখলে অর্থাৎ মালিকানা দাবিকারীর দখলে। আর মূল্য ফেরত পাওয়ার জন্য শর্ত হলো দ্রব্যটি ক্রেতার জন্য নিরাপদ না থাকা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**تَوَلَّهْ وَإِنْ أَقْرَأَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ الْخ** : মাসআলা হলো, যদি বিক্রেতা নিজে বিচারকের নিকট স্বীকার করে যে, আমি গোলামটি মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করেছি আর ক্রেতাও যদি বিক্রয় বাতিল সাব্যস্ত করার বিচারকের নিকট দাবি জানায়, তাহলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

এর কারণ হলো, বক্তব্যের মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলেও স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয়। এ কারণেই কেউ যদি কোনো একটি বিষয় প্রথমে স্বীকার করে পরে আবার স্বীকার করে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি গৃহীত হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে যদিও বিক্রেতার প্রথম বিক্রয় করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বিক্রয়টি সঠিক আর পরের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে যে, বিক্রয়টি সঠিক ছিল না, তবু তার স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে। কিন্তু স্বীকারোক্তি যেহেতু **حُجَّةٌ نَاصِرَةٌ** অর্থাৎ সীমিত পরিসরের প্রমাণ, যা কেবল স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর উপরই প্রযোজ্য হয় অন্যের উপর প্রযোজ্য হয় না, তাই বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য বিক্রেতারও সম্মতি প্রয়োজন। অতএব, তার পক্ষ থেকে চুক্তিটি বাতিল করার দাবি জানাতো হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাব দাবিটি স্বতন্ত্র দাবি নয়; বরং বিক্রেতার স্বীকারোক্তির সমর্থন। কাজেই ক্রেতা এ সমর্থন করার অধিকার পাবে।

زَادَاتُ : মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর লিখিত زَادَاتُ গ্রন্থের একটি মাসআলা উল্লেখ করছেন। মাসআলাটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- পূর্বে যে মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর লিখিত جَامِع صَغِير গ্রন্থের। আর পূর্বে উল্লেখিত جَامِع صَغِير-এর মাসআলা এবং زَادَاتُ গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলা দুটির মাঝে বাহ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। তাই মুসান্নিফ (র.) 'যিয়াদাত'-এর মাসআলাটি উল্লেখ করে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

'যিয়াদাত'-এ বর্ণিত মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি একটি গোলাম ক্রয় করে অতঃপর ক্রেতার নিকট এক ব্যক্তি এসে দাবি করে যে, গোলামটি তার এবং ক্রেতা তার দাবির সত্যায়ন করে তারপর যদি ক্রেতা বিচারকের নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রোতাও ইতঃপূর্বে স্বীকার করেছিল যে, গোলামটি উক্ত ব্যক্তির, তাহলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, তার ক্রয়ের উদ্যোগ তার পক্ষ থেকে এ কথার প্রমাণ ছিল যে, বিক্রয় সঠিক আর এখন তার দাবি হচ্ছে বিক্রয় সঠিক ছিল না। কাজেই তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেছে। সুতরাং جَامِع صَغِير-এর মাসআলা ও زَادَاتُ-এর মাসআলার মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা, جَامِع صَغِير-এর মাসআলায় দাবির মাঝে স্ববিরোধিতার কারণে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়নি, আর زَادَاتُ-এর মাসআলায় স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ফিকহবিদগণ এ দু মাসআলার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, جَامِع صَغِير-এর মাসআলায় [যা মতনে উল্লেখ করা হয়েছে] ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার সময় গোলামটি ক্রেতারই হাতে রয়েছে। সুতরাং বিক্রীত-বস্তু তথা গোলাম তার কাছে নিরাপদভাবে আছে, তাই সে বিক্রোতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করবে না। কেননা, মূল্য ফেরত পাওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রীত-বস্তু ক্রেতার হাতে নিরাপদভাবে [অর্থাৎ অন্যের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া থেকে মুক্তভাবে] না থাকা।

আর زَادَاتُ-এর মাসআলায় ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার সময় গোলামটি ক্রেতার হাতে নেই; বরং তা যে ব্যক্তি গোলামটি দাবি করেছে তার হাতে চলে গেছে। সুতরাং ক্রেতার মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা, বিক্রীত-বস্তু ক্রেতার হাতে নিরাপদ [অন্যের অধিকারমুক্ত] ভাবে না থাকলে ক্রেতার মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে, যাতে সে মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ করে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا لِرَجُلٍ وَأَدْخَلَهَا الْمُشْتَرَى فِي بَيْتِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ (রহ), وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ يَوْسُفَ (রহ) إِجْرًا، وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا، يَضْمَنْ الْبَائِعُ؛ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (ر)، وَهِيَ مَسْأَلَةُ غَضَبِ الْعَقَّارِ، وَسَبَبُهُ فِي الْغَضَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّرَافِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি অন্যের একটি বাড়ি [-এর ভিটি তার নির্দেশ ছাড়া] বিক্রয় করে আর ক্রেতা তা নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তাহলে বিক্রেতা ক্ষতিপূরণের জিদ্দার হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এরও পরবর্তী অভিমত। প্রথমে তিনি বলতেন যে, বিক্রেতা ক্ষতিপূরণের জিদ্দার হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও তাই। এটা স্থাবর সম্পত্তি 'গসব' বা আত্মসাতের মাসআলা। এ মাসআলা আমরা ইনশাআল্লাহ 'গসব' বা আত্মসাতের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। সঠিক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ دَارَ الرَّجُلِ الْخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি অন্যের বাড়ির ভিটি তার অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে এবং ক্রেতা তা দখল করে নেয়। তারপর বিক্রেতা যদি স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, সে অন্যের বাড়ি আত্মসাৎ করে বিক্রয় করেছে, বাড়িটি তার নিজের নয়। আর ক্রেতা তার এ স্বীকারোক্তি অস্বীকার করে, আর বাড়িটির মালিকের সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর পরবর্তীকালের অভিমত হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে মালিককে বিক্রেতার কোনো জরিমানা দিতে হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত হলো, মালিককে বিক্রেতার জরিমানা দিতে হবে। [উল্লেখ্য, যদি মালিকের এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে যে, বাড়িটি তার তাহলে সকলের একমত্যাে মালিককে বিক্রেতার জরিমানা দিতে হবে না, বরং সে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ক্রেতার কাছ থেকে বাড়িটি নিয়ে নিবে। তদ্রূপ যদি ক্রেতা বিক্রেতার স্বীকারোক্তি মেনে নেয়, তাহলেও মালিককে বিক্রেতার জরিমানা দিতে হবে না; বরং সে ক্রেতার কাছ থেকে বাড়িটি নিয়ে নিবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করবে।]

قَوْلُهُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ غَضَبِ الْعَقَّارِ وَسَبَبُهُ فِي الْغَضَبِ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটি স্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা সংক্রান্ত মাসআলা। আমরা এ মাসআলাটি 'আত্মসাতের অধ্যায়ে' মতবিরোধ ও দলিল সহকারে বর্ণনা করব। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) মাসআলাটি হিদায়া গ্রন্থের كِتَابُ الْغَضَبِ বা "আত্মসাতের অধ্যায়"-এর তৃতীয় পৃষ্ঠা তথা ৩৫৮ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। মূল মাসআলাটি তিনি মতবিরোধ ও দলিল সহকারে প্রথমে আলোচনা করেছেন, যার সারকথা হচ্ছে- ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থাবর সম্পত্তি কেউ আত্মসাৎ করলেও তা আত্মসাৎ বলে গণ্য হয় না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে আত্মসাৎ বলে গণ্য হয়। অতএব, আমাদের এখানে আলোচ্য মাসআলায় শায়খাইন (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে যেহেতু আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে না, সেহেতু বিক্রেতাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিক্রেতা আত্মসাৎ করেছে বলে গণ্য হবে, কাজেই তাকে জরিমানা দিতে হবে।

## بَابُ السَّلَمِ

السَّلَامُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ، وَهُوَ آيَةُ الْمَدَائِنَةِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رَضِيَ) : أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ، وَأَنْزَلَ فِيهَا أَطْوَلَ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (الْآيَةُ) . وَبِالسُّنَّةِ، وَهُوَ مَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ، وَالْقِيَاسِ وَإِنْ يَأْبَاهُ وَلَكِنَّا تَرَكْنَاهُ بِمَا رَوَيْنَاهُ، وَوَجَّهَ الْقِيَاسُ أَنَّ بَيْعَ الْمَعْدُومِ، إِذَا الْمَبِيعُ هُوَ الْمُسْلِمُ فِيهِ .

### পরিচ্ছেদ : বায় সলম

অনুবাদ : 'সলম' হলো এমন একটি ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি, যা কিতাবুল্লাহ দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত। আর তা হলো ঋণ দান সংক্রান্ত আয়াত। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদেয় হিসেবে 'সালাফ' [অগ্রিম মূল্য প্রদান] হালাল করেছেন এবং সে সম্পর্কে তাঁর কিতাবের দীর্ঘতম আয়াত নাজিল করেছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পাঠ করলেন- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ।' আর সুন্নাহ দ্বারাও 'বায় সলম' অনুমোদিত হয়েছে। আর তা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন দ্রব্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যা [বিক্রয়কারী] ব্যক্তির নিকট নেই, তবে তিনি 'বায় সালাম'-এর অনুমতি দিয়েছেন। আর কিয়াস যদিও এর বৈধতা অস্বীকার করে, কিন্তু আমরা আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে কিয়াস পরিহার করেছি। কিয়াস-এর বৈধতা অস্বীকার করার কারণ হলো, 'বায় সালাম' হচ্ছে অবিদ্যমান দ্রব্য বিক্রয় করা। কেননা, এখানে বিক্রয়দ্রব্য হচ্ছে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত-দ্রব্য] যা বিক্রোতার কাছে চুক্তিকালে বিদ্যমান নেই, [আর অবিদ্যমান দ্রব্য বিক্রয় করা বৈধ নয়]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : পূর্ব ও পরের পরিচ্ছেদের সাথে ধারাবাহিকতার সম্পর্ক : মুসান্নিফ (র.) ইতিপূর্বে সে সকল ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন যার মাঝে দুই বিনিময়দ্রব্য [পণ্যদ্রব্য ও মূল্যদ্রব্য]-এর কোনোটিই মজলিসে হস্তগত করা শর্ত নয়। আর এ পরিচ্ছেদে এমন ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন, যার মাঝে দুই বিনিময়দ্রব্যের একটি মজলিসে হস্তগত করা শর্ত। কেননা, 'বায় সলম'-এর মাঝে মূল্যদ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যিক। পরবর্তী পরিচ্ছেদে তিনি এমন ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেন যেতে উভয় বিনিময়দ্রব্যই মজলিসে হস্তগত করা শর্ত। আর তা হলো 'বায় সরফ'।

'সলম'-এর আভিধানিক অর্থ ও নামকরণের কারণ : এ ক্ষেত্রে কয়েকটি অভিমত রয়েছে-

১. আভ্যামা ইবনুল হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন, سَلَمٌ শব্দটি تَسْلِيمٌ ক্রিয়ামূল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- হস্তান্তর করা, অর্পণ করা। যেহেতু 'বায় সলম'-এর মাঝে মূল্যদ্রব্য (رَأْسُ الْمَالِ) [মজলিসেই] অর্পণ করা অপরিহার্য, তাই এর নাম 'সলম' রাখা হয়েছে। তবে এ অর্থে 'বায় সরফ' এর নাম 'সলম' হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল, কেননা, তাতে উভয় বিনিময়দ্রব্যই মজলিসে অর্পণ করা অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও 'বায় সলম'-এর নাম 'সলম' হওয়ার কারণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে 'বায় সলম'-এর প্রচলনই অধিক ছিল, তাই 'সলম' নামটি 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

২. আত্তামা কাকী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আত্তামা বদরুদ্দীন আইনী উল্লেখ করেছেন, **سَلَمٌ** শব্দটি **سَلَامٌ** থেকে নেওয়া হয়েছে যা **الْعَمَلُ** -এর মাসদার। আর এখানে বাবে **إِنْعَالٌ** -এর হামযাহ **سَلَامٌ** -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে- 'নিরাপত্তা বিনষ্ট করা'। সুতরাং 'বায় সলম' এজন্য নামকরণ হয়েছে যে, দাদনদাতা [রাব্বুল মাল] ক্রয়কৃত দ্রব্য লাভ করার পূর্বেই মূলধন মুসলাম ইলাইহি-কে অর্পণ করে যেন মূলধনের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে। তবে আত্তামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেছেন, এ অভিমতটি দুর্বল। কেননা, এটা তখন সঠিক হতো যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধন বিনষ্ট হতো। অথচ তা হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা বিক্রয়দ্রব্য হস্তান্তর করে থাকে।

৩. আল ইয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, **سَلَمٌ** শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে **اسْتِعْمَالٌ** তথা কোনো কিছু দ্রুত চাওয়া বা কোনো কাজ দ্রুত করা। **سَلَمٌ** শব্দের একই অর্থ। সুতরাং 'বায় সলম' -এর নাম 'সলম' এজন্য হয়েছে যে, 'বায় সলম' -এর মাঝে বিক্রীতদ্রব্য অস্তিত্বে আসার পূর্বেই মূলদ্রব্য [রা'সুল মাল] দ্রুত গ্রহণ করা হয়।

৪. কারো কারো মতে, যেহেতু 'সলম' -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- দ্রুত কোনো কাজ করা বা দ্রুত কিছু চাওয়া, আর 'বায় সলম' বিক্রয়ের প্রকৃত সময় আসার পূর্বেই সম্পন্ন হয়, তাই একে 'সলম' নাম রাখা হয়েছে। কেননা, বিক্রয়ের প্রকৃত সময় হচ্ছে বিক্রয়দ্রব্য বিক্রেতার মালিকানায় আসার পর। অথচ 'বায় সলম' সাধারণত যে বস্তু বিক্রেতার মালিকানায় নেই তাতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

'বায় সলম' -এর পারিভাষিক অর্থ : 'বায় সলম' -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে আত্তামা ইবনুল হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, কেউ কেউ এর সংজ্ঞা করেছেন, **أَخَذَ عَاجِلٍ بِعَاجِلٍ** অর্থাৎ, "বাকি কোনো জিনিসের বিনিময়ে নগদ কোনো জিনিস গ্রহণ করা।" কিন্তু সংজ্ঞাটি সঠিক নয়। কেননা, এ সংজ্ঞাটি বাকি মূল্যে সাধারণ বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এর সঠিক সংজ্ঞা হলো, **بَيْعَ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ** অর্থাৎ, "নগদ কোনো জিনিসের বিনিময়ে বাকি কোনো জিনিস বিক্রয় করা।"

'বায় সলম' -এর রোকন, হুকুম ও শর্ত :

রোকন : 'বায় সলম' -এর রোকন হলো, প্রস্তাব দেওয়া [ইজাব] ও প্রস্তাব গ্রহণ করা [কবুল]। যেমন- এক পক্ষ বলল, তুমি [আগামী] অমুক মাসের এত তারিখে] ৫ মণ ধান দেবে সেজন্য আমি তোমাকে এক হাজার টাকা প্রদান করলাম। অপর পক্ষ বলল, আমি তা গ্রহণ করলাম।

হুকুম : 'বায় সলম' -এর হুকুম বা বিধানগত ফলাফল হলো, মূলধন বা 'রা'সুল মাল' -এর মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] -এর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। আর দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] -এর মাঝে অনির্দিষ্টভাবে [দাইন হিসেবে] দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] -এর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। অর্থাৎ দাদনগ্রহীতার নিকট দাদনদাতার বিক্রয়দ্রব্যটি অনির্দিষ্টরূপে পাওনা থাকবে। যখন তা হস্তগত করবে তখন তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

শর্ত : 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে, সেগুলো মতভেদসহ মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন।

এ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা :

১. **رَبُّ السَّلَمِ** [রাব্বুস সলম] - যে ব্যক্তি 'বায় সলম' -এর মাঝে চুক্তির ক্ষেত্রে মূল্য [দাদন] প্রদান করে। আমরা 'রাব্বুস সলম' -এর অনুবাদ 'দাদন দাতা' করেছি।

২. **سَلَمٌ إِلَيْهِ** [মুসলাম ইলাইহি] - যে ব্যক্তি বিক্রয়-দ্রব্য প্রদানের বিনিময়ে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করে। আমরা 'মুসলমান ইলাইহি' -এর অনুবাদ 'দাদনগ্রহীতা' করেছি।

৩. **رَأْسُ الْمَالِ** [রা'সুল মাল] - প্রদেয় অগ্রিম মূল্য বা মূলধন। আমরা 'রা'সুল মাল' -এর অনুবাদ 'মূলধন' করেছি।

৪. **مَنْفَعَةٌ** [মুসলাম ফীহ] - যে দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অগ্রিম মূল্য প্রদান করা হয়েছে বা দাদনদ্রব্য। আমরা 'মুসলাম ফীহ' -এর অনুবাদ 'দাদনদ্রব্য' করেছি।

উদাহরণস্বরূপ-যায়েদ আমরের সাথে এই মর্মে বিক্রয়চুক্তি করল যে, যায়েদ এখন এক হাজার টাকা প্রদান করবে, আর তার বিনিময়ে আমার আগামী ফাল্হুন মাসে দশ মণ ধান দেবে, তাহলে যায়েদ হলো 'রাব্বুস সলম' বা দাদনদাতা, আমার হলো 'মুসলাম ইলাইহি' বা দাদনগ্রহীতা, উক্ত এক হাজার টাকা হলো 'রা'সুল মাল' বা মূলধন, আর দশ মণ ধান হলো 'মুসলাম ফীহ' বা দাদনদ্রব্য।

৫. **دَيْنٌ** [দাইন] - অনির্দিষ্ট পাওনা বস্তু। অর্থাৎ দাইন বলা হয় এমন পাওনা বস্তুকে যা নির্দিষ্ট নয়, যেমন- কারো নিকট অন্য ব্যক্তির কোনো বিক্রীতদ্রব্যের মূল্য হিসেবে দশ টাকা পাওনা আছে। এ ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট কোনো দশ টাকা প্রদান করা



আবশ্যক নয়; বরং যে কোনো দশ টাকা প্রদান করতে পারবে। সুতরাং উক্ত পাওনা দশ টাকা 'দাইন' বা অনির্দিষ্ট পাওনা বস্তু। পক্ষান্তরে কেউ যদি নির্দিষ্ট এক মণ ধান বিক্রয় করে, তাহলে তার ঐ নির্দিষ্ট ধানই হস্তান্তর করা আবশ্যক। এক্ষণে নির্দিষ্ট বস্তুকে عَيْنٌ [আইন] বা নির্দিষ্ট বস্তু বলা হয়।

এখানে জানা আবশ্যক যে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' বা দাদনদ্রব্য সর্বদা 'দাইন' বা অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে; কিন্তু সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়দ্রব্য 'আইন' বা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ السَّلَمُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ الْخ

'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার দলিল : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর বৈধতা কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনের দলিল হলো ঋণ লেনদেন সম্পর্কিত আয়াত (أَيُّهُ الدَّائِنَةُ)। আয়াতটি হলো, إِذَا آتَيْنَا النَّاسَ سَلَامًا فَفِيهَا سَلَامٌ وَأَوْفَوْا بِعُقُودِكُمْ (الْبَايَعَاتُ) অর্থাৎ, "হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা পরস্পরে ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে উক্ত আয়াতটি 'সলফে ময়মুন' তথা 'বায় সলম' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা 'সলফে ময়মুন' তথা 'বায় সলম' হালাল করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি তাঁর কিতাবের দীর্ঘতম আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াতটি তিলওয়াত করেছেন।

আর হাদীসের দলিল হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এই হাদীস-

أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ .

অর্থাৎ, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দ্রব্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যা বিক্রেতার নিকট বিদ্যমান নেই। তবে তিনি 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়েছেন।"

মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা আইনী (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত হলো এটি স্বতন্ত্র একটি হাদীস নয়; বরং দুটি হাদীসের সমন্বিত রূপ বা মুরাক্কাব। প্রথম অংশ যা মানুষের নিকট নেই তা বিক্রয় নিষেধ সম্পর্কিত হাদীসটি সুনানে আরবায়ায় উল্লিখিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন হাদীসটি হাসান, সহীহ। আর দ্বিতীয় অংশ তথা 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে অবকাশ দেওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি বুখারী মুসলিমসহ সিহাহ সিতার সব ক'টি গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَسْلِفُونَ فِي النَّسْرِ لِلنِّسَاءِ وَالسَّيِّئِينَ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَارْتِي مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

অর্থাৎ, "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [মদীনায়া] আগমন করলেন, তখন জনগণ খেজুরের ক্ষেত্রে এক বছর, দুই বছর বা তিন বছর মেয়াদে 'বায় সলম' করত। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট পাত্রের পরিমাণে বা নির্দিষ্ট ওজনে, নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করে।" এছাড়া বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী অযুফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে-

قَالَ : إِنْ كُنَّا نَسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي بَكْرٍ وَعَسَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْخِيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْتَرْتِيبِ .

অর্থাৎ "তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর যুগে গম, যব, খেজুর ও কিসমিসের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করতাম।"

মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত দুটি দলিল কুরআন ও হাদীস ছাড়া শরিয়তের তৃতীয় দলিল তথা উম্মতের ইজমা দ্বারাও 'বায় সলম'-এর বৈধতা প্রমাণিত। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত সর্বদা 'বায় সলম'-এর বৈধতার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْفَيْسُ وَإِنْ كَانَ يَبَاءَهُ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, কিয়াসের দাবি হচ্ছে 'বায় সলম' বৈধ না হওয়া। কিন্তু আমরা আমাদের উল্লিখিত হাদীসের কারণে কিয়াস পরিহার করেছি। কেননা, হাদীস ও কিয়াসের মাঝে যদি বিরোধ হয়, তাহলে কিয়াস পরিহার করতে হয়। কিয়াস অনুসারে 'বায় সলম' বৈধ না হওয়ার কারণ হলো, 'বায় সলম'-এর মাঝে যে দ্রব্যটি বিক্রয় করা হচ্ছে সেটি এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি। আর অবিদ্যমান বস্তু বিক্রয় জায়েজ নয়; বরং বিদ্যমান বস্তুও যদি মালিকানাধীন কিংবা হস্তান্তর করা বিক্রেতার সামর্থ্যের বাইরে হয়, তাহলে তা বিক্রয় জায়েজ নয়।

قَالَ : وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمَزُونَاتِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَالْمُرَادُ بِالْمَزُونَاتِ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ وَالْدَّنَانِيرِ ، لِأَنَّهُمَا أَثْمَانٌ ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُثْمَنًا ، فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِمَا ، ثُمَّ قِيلَ يَكُونُ بَاطِلًا ، وَقِيلَ يَنْتَفِقِدُ بَيْنَا يَثْمِنُ مُوجِبٌ تَخْصِيلًا لِمَقْصُودِ الْمُتَعَاقِدِينَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِأَنَّ التَّصْحِيحَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي مَحَلٍّ أَوْجَبَا الْعَقْدَ فِيهِ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত যাবতীয় বস্তুতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বায় সলম করে, তাহলে সে যেন নির্ধারিত পাত্র ও নির্ধারিত ওজন ধার্য করে নির্ধারিত মেয়াদে 'বায় সলম' করে।" ইমাম কুদুরী (র.)-এর ইবারতে ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিরহাম-দিনার ছাড়া অন্যান্য ওজন পরিমাপিত দ্রব্যসমূহ। কেননা, এ দুটি হচ্ছে 'সামান' [মূলদ্রব্য], অথচ 'মুসলাম ফীহ' [দাদনদ্রব্য] পণদ্রব্য হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দিরহাম ও দিনারের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। [কেউ করে ফেলেলে সে ক্ষেত্রে] কারো কারো মতে এ বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। আর কারো কারো মতে চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্যকে যথাসম্ভব কার্যকর করার জন্য এটা বাকি মূল্যে বিক্রয়চুক্তিরূপে সম্পাদিত হবে। কেননা, চুক্তির ক্ষেত্রে শব্দ নয় মর্মই ধর্তব্য। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিক বিতণ্ড। কেননা, [যথাসম্ভব] কার্যকর করা সে ক্ষেত্রেই আবশ্যক হয় যে ক্ষেত্রে তারা চুক্তি সাব্যস্ত করেছে। আর এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না। [কেননা, দিরহাম-দিনার কখনও পণদ্রব্য সাব্যস্ত হয় না। এ দুটি সৃষ্টি হয়েছে মূলদ্রব্য হিসেবে।]

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمَزُونَاتِ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, 'বায় সলম' ওজন দ্বারা পরিমাপিত এবং পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রে জায়েজ হবে। অর্থাৎ এগুলো 'বায় সলম'-এ দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হতে পারবে। কেননা, পূর্বে উল্লিখিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট পাত্রের পরিমাণে বা নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করে।" এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত এবং ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَالْمَرَادُ بِالْمَرْزُوقَاتِ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ الْخ: মুসল্লিফ (র.) বলেন, এখানে ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু বলে উদ্দেশ্য হলো স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু। কেননা, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা মূলত মূলদ্রব্য হিসেবে গণ্য হয়, যা নির্দিষ্ট করলেও [আদায়ের ক্ষেত্রে] নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয় না। অথচ 'বায় সলম'-এ দানদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] পণদ্রব্য হওয়া আবশ্যক, যা নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ দুটিকে 'বায় সলম'-এ দানদ্রব্য সাব্যস্ত করলে তা সহীহ হবে না।

আলোচ্য মাসআলাটির দুটি সূরত হতে পারে—

১. দানদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এবং মূলধন [রা'সুল মাল] উভয়টিই স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা হবে। এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি সকলের ঐকমত্যে, বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ে যদি পণ্য ও মূল্য উভয়টি স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা হয়, তাকে 'বায় সরফ' বলে, আর 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে বাকি বিক্রয় জায়েজ নয়; বরং উভয় পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য।
২. স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রাকে দানদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এবং গম বা ধান মূলদ্রব্য [রা'সুল মাল] সাব্যস্ত করে চুক্তি করা। যেমন বলল, আমি একশত স্বর্ণমুদ্রা 'বায় সলম' হিসেবে নগদ দশ মণ গমের বিনিময়ে ক্রয় করলাম। এ ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে 'বায় সলম' সহীহ হবে না, তবে চুক্তিটি গম বা ধানকে পণ্যদ্রব্য ধরে বাকি মূল্যে বিক্রয়চুক্তি হিসেবে সম্পাদিত হবে কিনা? তা নিয়ে ফিকহবিদগণের মতবিরোধ রয়েছে। হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মতে চুক্তিটি সম্পূর্ণ বাতিল বলেই গণ্য হবে। আর হযরত আবু বকর আল আ'মশ (র.)-এর মতে চুক্তিটি বাকি মূল্যে সাধারণ বিক্রয় হিসেবে সহীহ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদিও 'বায় সলম' হিসেবে স্বর্ণমুদ্রাকে পণ্যদ্রব্য সাব্যস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু গমকে পণ্যদ্রব্য এবং স্বর্ণমুদ্রাকে মূলদ্রব্য ধরে বাকি বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা সম্ভব এবং তাই সাব্যস্ত করা হবে। কারণ, এখানে চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন এখন গম বা ধান হস্তগত করবে, আর অপরজন পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করবে এবং তাদের এ উদ্দেশ্য উল্লিখিত উপায়ে অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। আর চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিকারীর উদ্দেশ্যই ধর্তব্য। এ ব্যাপারে মুসল্লিফ (র.) বলেন, হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মতটিই অধিক সঠিক। কারণ, কোনো চুক্তিকে সঠিক সাব্যস্ত করতে হলে তা এমন স্থলে রেখেই সঠিক সাব্যস্ত করা আবশ্যক যে স্থলে চুক্তিকারীদ্বয় তা সাব্যস্ত করেছে। আর এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, চুক্তিকারীদ্বয় এখানে স্বর্ণমুদ্রাকে বিক্রয়দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে। অথচ স্বর্ণমুদ্রা কখনও বিক্রয়দ্রব্য হতে পারে না। কেননা, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা সৃষ্টিগতভাবেই মূলদ্রব্য, যা নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে বিক্রয়দ্রব্য এমন বস্তু হওয়া আবশ্যক যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনুল হমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে হযরত আবু বকর আ'মশ (র.)-এর মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) আল-'বাহকর রায়িক' গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন।

قَالَ : وَكَذَا فِي الْمَذْرُوعَاتِ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِذِكْرِ الذَّرْعِ وَالصَّفَةِ وَالصَّنْعَةِ ، وَلِأَنَّهُ مِنْهَا لِيَتَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ ، فَيَتَحَقَّقُ شَرْطُ صِحَّةِ السَّلَمِ ، وَكَذَا فِي الْمَعْدُودَاتِ الَّتِي لَا يَتَفَاوَتْ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ ، لِأَنَّ الْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَ مَعْلُومٌ مَضْبُوطٌ الرِّضْفِ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ ، فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ . وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ بِإِصْطِلَاحِ النَّاسِ عَلَى إِهْدَارِ التَّفَاوُتِ ، بِخِلَافِ الْبَطِينِجِ وَالرُّمَّانِ ، لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتْ أَحَادُهُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا ، وَيَتَفَاوَتْ الْأَحَادِ فِي الْمَالِيَّةِ يُعَرَّفُ الْعَدَدِيُّ الْمُتَفَاوْتُ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي بَيْضِ التَّعَامَةِ ، لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتْ أَحَادُهُ فِي الْمَالِيَّةِ ثُمَّ كَمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا عَدَدًا يَجُوزُ كَيْلًا ، وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَجُوزُ كَيْلًا : لِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ ، وَلَيْسَ بِمَكِيلٍ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَدَدًا أَيْضًا لِلتَّفَاوُتِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمِقْدَارَ مَرَّةً يُعَرَّفُ بِالْعَدَدِ وَتَارَةً بِالْكَيْلِ ، وَإِنَّمَا صَارَ مَعْدُودًا بِالإِصْطِلَاحِ فَيَصِيرُ مَكِيلًا بِإِصْطِلَاحِهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে গজ দ্বারা পরিমাপিত বস্তুসমূহের ক্ষেত্রেও ‘বায় সলম’ জায়েজ। কেননা, এ সকল বস্তুর গজের পরিমাণ গুণাগুণ ও শিল্পের ধরন উল্লেখের মাধ্যমে তার পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব। আর এগুলো উল্লেখ করা অপরিহার্য যাতে অস্পষ্টতা দূর হয়ে ‘বায় সলম’ বৈধ হওয়ার শর্ত বাস্তবায়িত হয়। এরূপভাবে বেশি তারতম্যপূর্ণ নয় এমন গণনা-প্রচলিত বস্তুর মাঝেও ‘বায় সলম’ জায়েজ। যেমন- আখরোট ও ডিম। কেননা, প্রায় একই পরিমাপের গণনা-প্রচলিত বস্তুসমূহের পরিমাপ জ্ঞাত, তার গুণাগুণ নির্ধারণযোগ্য এবং তা সর্মপণ করা সম্ভব। সুতরাং তাতে ‘বায় সলম’ বৈধ হবে। এগুলোর মধ্য ছোট-বড় সমান। কেননা, লোক প্রচলনে এগুলোর পার্থক্য ধর্তব্য হয় না। পক্ষান্তরে তরমুজ ও আনারের হকুম ভিন্ন [তাতে ‘বায় সলম’ বৈধ নয়]। কেননা, এর পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। আর পারস্পরিক মূল্যের তারতম্যের দ্বারাই গণনা-প্রচলিত বস্তুসমূহ তারতম্যপূর্ণ বলে বুঝা যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, উটপাখির ডিমের ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে না। কেননা, মূল্যের ক্ষেত্রে এগুলোর এক একটির মাঝে পার্থক্য হয়। অতঃপর গণনা-প্রচলিত বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে গণনার ভিত্তিতে যেমন ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে, তেমনি পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতেও জায়েজ হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন, পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো গণনা-প্রচলিত বস্তু- পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু নয়। তাঁর পক্ষ থেকে এরূপও বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলোতে গণনার ভিত্তিতেও ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলোর পরস্পরের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, পরিমাপ কখনও গণনা দ্বারা জানা যায়, আবার কখনও পাত্র দ্বারা জানা যায়। তবে জন-প্রচলনে এগুলো গণনা নির্ভর হয়েছে। সুতরাং তাদের দু জনের পরিভাষায় তা পাত্র পরিমাপিত হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْمَذْرُوعَاتِ الخ: ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যেক্রপ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত এবং ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ, তদ্রূপ গজ দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রেও 'বায় সলম' জায়েজ। মুসান্নিফ (র.) এ বিধানের দলিল বর্ণনা করছেন যে, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এমনভাবে সুস্পষ্ট করে নির্ধারণ করা, যাতে বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। আর এটা গজ দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রেও সম্ভব। কেননা, কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিকে কত গজ হবে, কাপড়টি উৎকৃষ্টমানের হবে নাকি নিকৃষ্টমানের হবে এবং কোন শিল্পের হবে? এ তিনটি বিষয় উল্লেখ করলে কাপড়টি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। কাজেই সহীহ হওয়ার শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরূপভাবে যে সকল দ্রব্য গণনা করে বিক্রয় হয়, সেগুলো যদি মূল্যের দিক থেকে পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ না হয়। অর্থাৎ ছোট বড় হওয়ার কারণে তার মূল্যের মাঝে কোনো তারতম্য না হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। যেমন- ডিম বা আখরোট [ফল]। কারণ, যে সকল গণনা-প্রচলিত দ্রব্য কাছাকাছি আকারের এবং তার মূল্যের মাঝে কোনো তারতম্য হয় না, সেগুলোর পরিমাণ ও গুণাগুণ সুস্পষ্ট করা সম্ভব এবং তা হস্তান্তরের সময় বিবাদ সৃষ্টি হবে না। আর এটাই হলো 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার শর্ত। কাজেই শর্তের উপস্থিতির কারণে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। এগুলোর ক্ষেত্রে ছোট বড় এক সমান বলেই গণ্য হবে। কেননা, জনগণ এগুলোর ছোট বড়-এর পার্থক্য ধর্তব্য মনে করে না। যেমন- মুরগির ডিম। কোনোটি একটু ছোট হয় আবার কোনোটি একটু বড় হয়, কিন্তু জনগণ উভয়টি একই মূল্যে ক্রয় করে। সুতরাং বুঝা যায় এগুলোর পার্থক্য ধর্তব্য নয়। মূল্যের ক্ষেত্রে সবই সমান।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে তরমুজ বা আনারে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, মূল্যের দিক থেকে এগুলো পার্থক্যপূর্ণ হয়। যদি ছোট হয় তাহলে মূল্যও কম হয়, আর যদি বড় হয় তাহলে মূল্যও বেশি হয়। কাজেই সুস্পষ্টরূপে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে। সারকথা, গণনা-প্রচলিত দ্রব্য যদি মূল্যের দিক থেকে পার্থক্যপূর্ণ হয়, তাহলে তা পার্থক্যপূর্ণ দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর যদি মূল্যের দিক থেকে পার্থক্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তা পার্থক্যপূর্ণ দ্রব্য বলে গণ্য হবে না এবং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

উটপাখির ডিম সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, এগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ হলো, উটপাখির ডিম ছোট বড় হলে তার মূল্যও কমবেশি হয়। কাজেই পূর্ববর্ণিত মূলনীতি অনুসারে তা পার্থক্যপূর্ণ গণনা-প্রচলিত দ্রব্য। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ كَمَا يَجُزُّ السَّلَامُ فِيهَا عَدَدُ الخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে সকল গণনা-প্রচলিত দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ, তাতে যেক্রপ গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা বৈধ তদ্রূপ তাতে পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতেও 'বায় সলম' করা বৈধ হবে। যেমন- কেউ যদি ডিম বা আখরোট [ফল] গণনার ভিত্তিতে বিক্রয় না করে এভাবে 'বায় সলম' করে যে, সে নির্দিষ্ট পাত্রের দশ পাত্র ডিম হস্তান্তর করবে, তাহলে এরূপ 'বায় সলম'ও জায়েজ হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন, এরূপ গণনা-প্রচলিত দ্রব্যে পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ, এগুলো পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য নয়। কাজেই পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে তার 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। অপর একটি বর্ণনায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এরূপ দ্রব্যে অর্থাৎ যা কিছুটা ছোট-বড় হয় কিন্তু মূল্যের মাঝে তারতম্য হয় না, তাতে গণনার ভিত্তিতেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না এবং পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতেও জায়েজ হবে না। কারণ, তাতে তারতম্য রয়েছে। কাজেই তারতম্য কম হোক বা বেশি হোক তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো, কোনো দ্রব্যের পরিমাণ কখনও গণনার দ্বারা নির্ণয় করা হয়, আবার কখনও পাত্র দ্বারা মেপে নির্ণয় করা হয়। আর গণনা-প্রচলিত দ্রব্যসমূহ গণনা-নির্ভর হয়েছে কেবল জন-প্রচলনের মাধ্যমে, শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণের মাধ্যমে নয়। কাজেই যখন চুক্তিকারীদ্বয় পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে চুক্তি করবে, তখন গণনা-প্রচলিত দ্রব্যও তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে তাদের সমঝোতার কারণে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য বলে বিবেচিত হবে।

وَكَذَٰلِكَ فِي الْفُلُوسِ عَدَدًا، وَقِيلَ هَٰذَا عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَإِنِّي يُوَسِّفُ (رحا) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحا) لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهَا أَتَمُّ، وَلَهُمَا أَنَّ التَّمَيِّنَةَ فِي حَقِّهِمَا بِإِصْطِلَاحِهِمَا فَيَبْطُلُ بِإِصْطِلَاحِهِمَا، وَلَا تَعْرُدُ وَزْنِيًّا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : একপভাবে ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রেও গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেউ কেউ বলেন, এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে এ ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো হচ্ছে মূলদ্রব্য [অথচ 'বায় সলম' জায়েজ হয় পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে]। শাযখাইনের দলিল হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে এগুলো মূলদ্রব্য হওয়া সাব্যস্ত হয়েছিল তাদের পরিভাষার মাধ্যমে। সুতরাং তাদের পরিভাষার মাধ্যমে তা আবার বাতিল হয়ে যাবে। তবে মূলদ্রব্য হওয়া বাতিল হওয়ার ফলে তা ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুতে ফিরে যাবে না। এর কারণ আমরা ইতোপূর্বে 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব-মুদ্রা গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হবে। অর্থাৎ ধাতব-মুদ্রাকে দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] সাব্যস্ত করা যাবে। স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিধান এবং ধাতব-মুদ্রার বিধান এ ক্ষেত্রে এক নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামিউস সাগীর গ্রন্থে মাসআলাটি এভাবেই কোনো মতবিরোধের কথা উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন। কাজেই বুঝা যায়, ধাতব-মুদ্রা গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) ঐকমত্যে রয়েছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিন্তু কোনো কোনো ফিকহবিদ উল্লেখ করেছেন যে, এটা কেবল ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ধাতব-মুদ্রা 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। এ বর্ণনা অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে দলিল হলো, ধাতব-মুদ্রাও [স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার ন্যায়] মূলদ্রব্য (ئُتْمَن) আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলদ্রব্যসমূহ 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে বিক্রয়দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হতে পারবে না। কাজেই ধাতব-মুদ্রা 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর পক্ষে দলিল হলো, প্রচলনের মাধ্যমে। কাজেই চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হবে যদি তারা মুদ্রা হিসেবে সাব্যস্ত করে। সুতরাং যখন তারা এটাকে দাদনদ্রব্য তথা বিক্রয়দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে তখন তাদের ক্ষেত্রে এটা মুদ্রা হওয়া বাতিল হয়ে সাধারণ দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। ফলে অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যের ন্যায় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

الخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, ধাতব-মুদ্রা মুদ্রা হিসেবে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে তা পিতল বা অন্য কোনো ধাতব খণ্ড ছিল। আর তা ছিল ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য। কিন্তু যখন মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত হয়েছে তখন তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত মাসআলায় যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হওয়া বাতিল হয়ে সাধারণ দ্রব্যে পরিণত হয়, তাহলে তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য না হয়ে পুনরায় ওজন-প্রচলিত দ্রব্যে পরিণত হওয়া উচিত। কেননা, তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হয়েছিল মুদ্রা হওয়ার পরে। সুতরাং তা যদি মুদ্রা হিসেবে সাব্যস্ত না হয়, তাহলে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবেও সাব্যস্ত হবে না। আর গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবে যদি সাব্যস্ত না হয়, তাহলে তা গণনার ভিত্তিতে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ না হওয়ার কথা।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদন-দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হওয়ার জন্য মুদা না হওয়া শর্ত, কিন্তু গণনা-প্রচলিত দ্রব্য না হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যখন তা দাদন-দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে, তখন বুঝা যাচ্ছে যে তারা এর মুদা হওয়ার ব্যাপারে বিমুখতা প্রকাশ করছে, কিন্তু এর গণনা-প্রচলিত হওয়ার ব্যাপারে বিমুখতা প্রকাশ করছে না। কাজেই তার মুদা হওয়া বাতিল হবে, গণনা-নির্ভর হওয়া বাতিল হবে না। চুক্তিকারীদ্বয়ের বিমুখতা প্রকাশ না পাওয়ায় প্রচলনের কারণে তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবেই বহাল থেকে যাবে।

উপরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এবং ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হলো, কোনো কোনো ফিকহবিদ যে বলেছেন আলোচ্য মাসআলায় তাঁদের মতবিরোধ রয়েছে তার ভিত্তিতে। অন্যথায় জামিউস সাগীরের বর্ণনা মোতাবেক মাসআলাটি তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত। এটাই জাহিরে রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ) এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো, 'রিবা'র অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি ধাতব-মুদ্রার বিনিময়ে দুটি ধাতব-মুদ্রা বিক্রয় করা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ নয়। সেখানে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করেছেন যে, যখন জন-প্রচলনে তা মুদা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন চুক্তিকারীদ্বয়ের পরিভাষায় তা মুদা হওয়া বাতিল হবে না। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, জাহিরে রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ) অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে কিভাবে তা মুদা হওয়া বাতিল হবে। এ প্রশ্নের জবাব হলো, 'বায় সলম' এ বিক্রয়দ্রব্য হওয়ার জন্য মুদা না হওয়া শর্ত, কিন্তু সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রয়দ্রব্য হওয়ার জন্য মুদা না হওয়া আবশ্যিক নয়। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যখন 'বায় সলম' করছে তখন বুঝা যাবে যে, তারা এর মুদা হওয়ার ব্যাপারে বিমুখতা প্রকাশ করছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে তা বুঝা যাবে না। তাই 'বায় সলম'-এ মুদা হওয়া বাতিল হবে, কিন্তু সাধারণ বিক্রয়ে বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلِ: অর্থাৎ মুদা হওয়া বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার মতবিরোধ এবং মুদা সাব্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও তা ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যে পরিণত না হওয়ার কারণ আমরা ইতোপূর্বে [রিবা'র অধ্যায়ে মূল গ্রন্থের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় وَجُوزَ بَيْعُ الْفُلِّسِ بِالْفُلِّسَيْنِ]-এর অধীনে উল্লেখ করেছি।

وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ فِي الْحَيَوَانِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوزُ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا  
بِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالسِّنِّ وَالتَّنَوُّعِ وَالصِّفَةِ، وَالتَّفَاوُتُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسِيرٌ، فَأَنْشَبَهُ التِّيَابَ .  
وَلَنَا أَنْ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا ذُكِرَ يَبْقَى فِيهِ تَفَاوُتٌ فَاحْشُرْ فِي الْمَالِيَةِ بِإِغْتِبَارِ الْمَعَانِي  
الْبَاطِنَةِ، فَيُفْضَى إِلَى الْمَنَازَعَةِ، بِخِلَافِ التِّيَابِ، لِأَنَّهُ مُصْنُوعٌ لِلْعِبَادِ، فَقَلَّمَا  
يَخْفَاوُ الثَّوْبَانِ إِذَا نُسِجَا عَلَى مَنَوَالٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ التَّيَّيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى  
عَنِ السَّلَامِ فِي الْحَيَوَانِ، وَدَخَلَ فِيهِ جَمِيعُ أَجْنَاسِهِ حَتَّى الْعَصَافِيرُ.

অনুবাদ : জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জায়েজ হবে। কেননা, জীব-জন্তুর শ্রেণী, বয়স, প্রকার ও গুণাগুণ উল্লেখ করার দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এরপর যে পার্থক্য থাকে তা সামান্য। সুতরাং এগুলো কাপড়সামগ্রীর মতো [অতএব, কাপড়সামগ্রীতে যেমনিভাবে ‘বায় সলম’ জায়েজ, তেমনিভাবে এগুলোর ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে]। আমাদের দলিল হলো, উল্লিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করার পরও অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের কারণে এগুলোতে মূল্যের দিক থেকে অনেক পার্থক্য থেকে যায়। কাজেই তা বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। পক্ষান্তরে কাপড়সামগ্রীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা মানুষের তৈরি। সুতরাং দুটি কাপড় যদি একই পদ্ধতিতে বয়ন করা হয়, তাহলে তাতে খুব সামান্যই পার্থক্য থাকে। আর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ করতে নিষেধ করেছেন। সকল প্রকার জীব-জন্তু এমনকি চড়াইপাখিও তাঁর এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْحَيَوَانُ السَّلَامُ فِي الْحَيَوَانِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ فِي الْحَيَوَانِ জীব-জন্তু ও দাস-দাসী ‘বায় সলম’-এর ভিত্তিতে বিক্রয় জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে জীব-জন্তু ও দাস-দাসীর ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে। আর হানাফী ইমামগণের মতে তা জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) [এবং ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালেক (র.)]-এর পক্ষে আকলী ও নকলী উভয় প্রকারের দলিল পেশ করা হয়। মুসান্নিফ (র.) কেবল আকলী দলিল পেশ করেছেন। তা হলো, জীব-জন্তু ও দাস দাসীর শ্রেণী যেমন- উট বা গরু, তাব বয়স যেমন- দ্বিবর্ষী উট বা পঞ্চবর্ষী উট, তার গুণাগুণ, যেমন- মোটাতাজা বা মাখারি ধরনের বা শীর্ণকায় ও তার প্রকার যেমন- আরবীয় উট বা অনারবীয় উট ইত্যাদি উল্লেখ করলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এরপর যে তারতম্য থাকে তা খুবই সামান্য যা বিবাদের সৃষ্টি করে না। কাজেই ‘বায় সলম’-এর শর্ত- দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-কে এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা যা হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি না করে- এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকার কারণে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে এগুলো কাপড়ের অনুরূপ। কেননা, কাপড়ের গুণাগুণ, প্রকার ইত্যাদি উল্লেখ করার পরও তাতে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। তা সত্ত্বেও কাপড়ে ‘বায় সলম’ সর্বসম্মতভাবে জায়েজ। কাজেই জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে তা জায়েজ হবে।



তাদের বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো, হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটি সম্পর্কে হযরত ইয়াহইয়া ইবনুল কাস্তান (র.) বলেছেন— **صَعِبَ مُضْطَرَبُ الْإِسْنَادِ** “হাদীসটি দুর্বল এবং এর সনদের মাঝে ইযতিরাব রয়েছে।” পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি সনদের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী। ইমাম বাযযার (র.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, **كَسِرَ فِي الْكَلْبِ أَجَلٌ**, “প্রাণী বাকি বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীসের মাঝে এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী সনদের কোনো হাদীস নেই।” কেউ কেউ বলেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীসটি রিবা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ঘটনা। রিবা সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে। [যতদূর কবীর ও আদীম]

قَالَ : وَلَا فِى أَطْرَافِهِ كَالرُّؤُوسِ وَالْأَكْرَاعِ لِلتَّفَاوُتِ فِيهَا ، إِذْ هُوَ عَدَدِي مُتَّفَاوِتٌ لَا مُقَدَّرَ لَهَا ، قَالَ : وَلَا فِى الْجُلُودِ عَدَدًا وَلَا فِى النُّحْطِ حَزْمًا وَلَا فِى الرُّطْبَةِ جَزْرًا لِلتَّفَاوُتِ ، إِلَّا إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ بِأَن يُبَيِّنَ لَهُ طَوْلَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْحَزْمُ أَنَّهُ شَبِيرٌ أَوْ ذِرَاعٌ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ ، إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَتَّفَاوُتُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, জীব-জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না; যেমন এগুলোর মাথা ও পা। কেননা, এগুলোতেও পার্থক্য রয়েছে। কারণ, এগুলো তারতম্যপূর্ণ গণনা-নির্ভর বস্তু, যার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, চামড়ার ক্ষেত্রে গণনার ভিত্তিতে এবং লাকড়ির ক্ষেত্রে আঁটির ভিত্তিতে এবং তাজা ঘাসের ক্ষেত্রেও আঁটির ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, এগুলোর মাঝেও তারতম্য রয়েছে। তবে যদি এগুলোর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করা যায় যেমন 'মুসলাম ইলাহি' [দাদনখীত]-কে আঁটি বাঁধার রশির দৈর্ঘ্য বর্ণনা করে দেওয়া হলো যে, এক বিঘত বা এক হাত হতে হবে, তাহলে এগুলোতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে, যদি এমনভাবে হয় যাতে তারতম্যপূর্ণ না হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا فِى أَطْرَافِهِ كَالرُّؤُوسِ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন- মাথা বা পা-এগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো বিক্রয় হয় গণনার ভিত্তিতে। আর এগুলোর মাঝে মূল্যের দিক থেকে অনেক তারতম্য হয়। ছোট হলে তার মূল্যও কম হয়, আর বড় হলে তার মূল্যও বেশি হয়। তার সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই গণনার ভিত্তিতে এগুলোতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর এগুলোতে গুজনের ভিত্তিতে যদি 'বায় সলম' করে, তবে এক রেওয়াজে অনুসারে তা জায়েজ হবে। আদ্বামা ইবনে হুমাম (র.) এ রেওয়াজেটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَا فِى الْجُلُودِ عَدَدًا : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এরূপভাবে প্রাণীর চামড়াও গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কারণ, চামড়ার মাঝে অনেক তারতম্য থাকে কোনোটি মোটা হয়, কোনোটি পাতলা হয়। আবার কোনোটি অধিক চর্বিযুক্ত হয় আর কোনোটি অল্প চর্বিযুক্ত হয়। আর এ তারতম্যের কারণে তার মূল্যের মাঝেও পার্থক্য হয়। কাজেই তা হস্তান্তরকালে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। তবে যদি এমন বিষয় উল্লেখ করে যাতে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জায়েজ হবে। যেমন- সংখ্যার উল্লেখের সাথে এটাও উল্লেখ করল যে, চামড়ার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কতটুকু হবে, তা কতটুকু পুরু হবে।

قَوْلُهُ وَلَا فِى النُّحْطِ حَزْمًا وَلَا فِى الرُّطْبَةِ جَزْرًا : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, লাকড়ি ও তাজা ঘাসের ক্ষেত্রে আঁটির ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা জায়েজ নয়। কেননা, আঁটি ছোট বড় হয় এবং আঁটি ছোট বা বড় হলে তার মূল্যের মাঝে ব্যবধান হয়। কাজেই হস্তান্তরের সময় তা বিবাদ সৃষ্টির কারণ হবে। কিন্তু যদি আঁটি কতটুকু এবং কিরূপ হবে তা এমনভাবে নির্দিষ্ট করে যে তাতে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে জায়েজ হবে। যেমন- বলে দিল যে, যে রশি বা ফিতা দ্বারা আঁটি বাঁধা হবে তা এক গজ লম্বা হবে কিংবা দুই গজ লম্বা হবে। আর লাকড়িগুলো এক হাত লম্বা হবে কিংবা দু হাত লম্বা হবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلِمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ جِنِّ الْعَقْدِ إِلَى جِنِّ الْمَحَلِّ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحَلِّ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ أَوْ مُنْقَطِعًا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَفَتَ الْمَحَلِّ لَوْجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ حَالًا وَجُودِهِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُسَلِّمُوا فِي التِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا، وَلَئِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ بِالتَّخْصِيلِ فَلَا بَدَّ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْوُجُودِ فِي مَدَّةٍ الْأَجَلِ لِيَتِمَّكَنَ مِنَ التَّخْصِيلِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, চুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত যদি 'মুসলাম ফীহ' [বা দাদনকৃত দ্রব্য বাজারে] বিদ্যমান না থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। সুতরাং যদি চুক্তি সম্পাদনের সময় অব্যাদ্যমান থাকে আর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকে অথবা এর বিপরীত হয় অথবা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে অব্যাদ্যমান থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকে, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, যখন তার উপর হস্তান্তর করা ওয়াজিব হবে তখন সে হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে। আমাদের দলিল হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী— “যতক্ষণ পর্যন্ত ফলফলাদির উপযুক্ততা প্রকাশ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে 'বায় সলম' করো না।” তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ হলো, সংগ্রহ করার মাধ্যমে হস্তান্তর করার সক্ষমতা প্রকাশ পায়। সুতরাং মেয়াদের পূর্ণ সময়ে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত-দ্রব্য]-এর বিদ্যমানতা অব্যাহত থাকা অপরিহার্য, যাতে [তার সুযোগ অনুসারে যে কোনো সময়] তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ حَتَّى يَكُونَ الخ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার শর্ত হলো, দাদনকৃত-দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] চুক্তি করার সময় থেকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত [বাজারে] বিদ্যমান থাকতে হবে। অর্থাৎ দাদনকৃত-দ্রব্য চুক্তি করার সময়ও বাজারে বিদ্যমান থাকতে হবে, অতঃপর মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়ও তা বাজারে বিদ্যমান থাকতে হবে এবং মধ্যবর্তী সময়ও বিদ্যমান থাকতে হবে। সুতরাং যদি এমন হয় যে, চুক্তি করার সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল না, অথবা মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু চুক্তির সময় বিদ্যমান ছিল না কিংবা চুক্তির সময় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মধ্যবর্তী সময় তা বাজারে পাওয়া যেত না, তাহলে উক্ত তিন সুরতেই 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শর্ত হলো, কেবল মেয়াদ পূর্তির সময় তা বাজারে বিদ্যমান থাকা। কাজেই যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা চুক্তি করার সময় তা বাজারে বিদ্যমান না থাকে, তাহলেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে মুসান্নিফ (র.) শুধু আকলী দলিল শেখ করেছেন। দলিলটি হলো, দাদনকৃত-দ্রব্য বিদ্যমান থাকার শর্ত হয়েছে কেবল এজন্য যে, দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] যাতে উক্ত দ্রব্য হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়। আর হস্তান্তর করার উপর ওয়াজিব হবে মেয়াদ পূর্তির সময়। কাজেই মেয়াদ পূর্তির সময় তা বিদ্যমান থাকলেই যথেষ্ট হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিল হলো, এ অধ্যায়ের শুরুতে আমাদের উল্লিখিত হযরত ইবনে আকবাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায়া আগমন করেন তখন লোকদেরকে দেখতে পান তারা এক বছর, দু বছর ও তিন বছর মেয়াদের ভিত্তিতে ফলের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করেছে। তখন তিনি তাদেরকে 'বায় সলম'-এর শর্ত জ্ঞানিয়ে দিলেন। তিনি তাতে কেবল পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্য বিদ্যমান থাকার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং শর্তসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে যা তিনি উল্লেখ করেননি তা শর্ত না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আমাদের পক্ষে মুসান্নিফ (র.) নকলী ও আকলী উভয় প্রকার দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের নকলী দলিল হলো, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ যথেষ্ট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির শেষাংশ নবী করীম ﷺ বলেছেন- 'وَلَا تَسْلُمُوا فِي تَخْلٍ مَّتَى يَبْدُو صِلَاةُ' 'তোমরা খেজুরের উপযুক্ততা প্রকাশের পূর্বে তাতে 'বায় সলম' কর না'। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু মেয়াদ পূর্তির সময় বিদ্যমান থাকা যথেষ্ট নয়; বরং চুক্তির সময়ই তা বিদ্যমান থাকতে হবে। তবে হাদীসটির সনদের মাঝে একজন অজ্ঞাত পরিচয় [মাজহুল] ব্যক্তি থাকায় হাদীসটি দুর্বল। শক্তিশালী হাদীস হলো, বুখারীতে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّخْلِ حَتَّى يَصْلَحَ .

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করতে বিম্বেধ করেছেন"। এ হাদীসটিতে 'বায় সলম'-এর কথা উল্লেখ না থাকলেও 'বায় সলম' উক্ত নিষেধের আওতাভুক্ত। এর প্রমাণ হলো, বুখারী হযরত শরীফে আবুল বুখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَامِ فِي التَّخْلِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّخْلِ حَتَّى يَصْلَحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً يَنْاجِزُ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَامِ فِي التَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّخْلِ حَتَّى يُوْكَلَ مِنْهُ .

এ হাদীসটির সারমর্ম হচ্ছে, হযরত আবুল বুখারী খেজুরের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করা সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত ইবনে আকবাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন তারা উভয়ে বলেছেন, হজুর ﷺ খেজুরের [খাওয়ার] উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে ওমর ও হযরত ইবনে আকবাস (রা.)-এর মতো অগাধ ইলমের অধিকারী সাহাবীদ্বয়ও 'বায় সলম'-কে হজুর ﷺ-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত মনে করেছেন। সুতরাং দাদনকৃত-দ্রব্য জনসমাজে বিদ্যমান হওয়ার পূর্বে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না, এটা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আমাদের আকলী দলিল হলো, দাদনগ্রহীতা দাদনকৃত-দ্রব্য হস্তান্তর করতে সক্ষম হওয়ার জন্য তা অর্জন করা জরুরি। আর অর্জন করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। অতএব, চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত সর্বদা তা জনসমাজে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যাতে সে অল্প অল্প করে একাধিক বারে তা সংগ্রহ করে নিতে পারে। কেননা- সর্বক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা মেয়াদ-পূর্তির সময় একবারে দাদনকৃত-দ্রব্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। যেমন- যে ব্যক্তি গুটিকির ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করেছে সে অল্প অল্প করে মাছ ধরে কিংবা ক্রয় করে তা গুটিকি করে সংগ্রহ করে রাখে। একপভাবে যে চামড়ার ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করেছে সে মেয়াদের পূর্ণ সময়ে জবাইকৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করে রেখে তা হস্তান্তর করে। একদিনে সে সকল পশু জবাই করে না। সুতরাং মেয়াদের পূর্ণ সময়ে দাদনকৃত-দ্রব্য বিদ্যমান থাকার দ্বারা দাদনগ্রহীতার সক্ষমতা প্রকাশ নেবে। তাই পূর্ণ সময়ে তা বিদ্যমান থাকা 'বায় সলম'-এর জন্য শর্ত।

وَلَوْ اِنْقَطَعَ بَعْدَ الْمَحَلِّ قَرَّبَ السَّلَامُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ فَسَخَّ السَّلَامُ اِنْ شَاءَ اِنْتَظَرُ  
وَجَوْدَهُ، لِأَنَّ السَّلَامَ قَدْ صَحَّ، وَالْعَجَزُ الطَّارِئُ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ، فَصَارَ كِبَاقِ الْمُبِيعِ  
قَبْلَ الْقَبْضِ .

অনুবাদ : আর যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর অবিদ্যমান হয়, তাহলে 'রব্বুস সলম' [দাদনদাতা]-এর ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে সলমের চুক্তি প্রত্যাহার করবে আবার ইচ্ছা করলে দ্রব্যটি বিদ্যমান হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। কেননা, 'সলম'-এর চুক্তি [শর্ত মোতাবেক হওয়ার কারণে] সঠিক হয়েছিল, আর উদ্ধৃত অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনার মুখে রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি অধিকারে নেওয়ার পূর্বে বিক্রীত গোলাম পালিয়ে যাওয়ার মতো হলো [অতএব, বিধানও একই রকম হবে, অর্থাৎ চুক্তি বহাল থাকবে কিন্তু ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اِنْقَطَعَ بَعْدَ الْمَحَلِّ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্য বাজারে বিদ্যমান থাকা। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে, যদি এমন হয় যে, চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ আসা পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্য বাজারে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পর হস্তান্তরের পূর্বে তা আর পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে দাদনদাতা [রব্বুস সলম]-এর ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করে নেবে আবার ইচ্ছা করলে উক্ত দ্রব্য বাজারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে না, দাদনদাতা চাইলে তা বহাল থাকবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.)-এর মতে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও তাই এবং ইমাম কারযী (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও এরূপ। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, যেহেতু হস্তান্তর করার পূর্বে দাদনগ্রহীতা দ্রব্যটি হস্তান্তর করতে অপারগ হয়ে গেছে, সেহেতু চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমনিভাবে সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রীত-দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সকলের ঐকমত্যে বাতিল হয়ে যায়।

আমাদের দলিল হলো, মেয়াদ পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্যটি বিদ্যমান থাকার কারণে চুক্তিটি সহীহ হয়ে গেছে। আর এখন যে দাদনগ্রহীতা অপারগ হয়ে গেছে তার কারণটি চুক্তি সহীহ হওয়ার পর নব্য সূষ্ট, যা পরে আবার দূরীভূত হয়ে যাবে। কেননা, পরে যখন তা পুনরায় বাজারে আসবে তখন তার অপারগতা দূর হয়ে যাবে। কাজেই চুক্তিটি বহাল থাকবে, বাতিল বলে গণ্য হবে না। যেমন- কেউ যদি গোলাম বিক্রয় করে অতঃপর হস্তান্তরের পূর্বেই গোলামটি পলায়ন করে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয় না; বরং ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকে। ক্রেতা ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে গোলাম ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। সুতরাং এখানের বিধানও তদ্রূপ হবে। অর্থাৎ দাদনদাতা ইচ্ছা করলে 'বায় সলম'-এর চুক্তি বাতিল করবে আবার ইচ্ছা করলে দ্রব্যটি পুনরায় বাজারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার বিষয় এবং 'বায় সলম'-এর অপারগতার বিষয়টি এক নয়। কারণ, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্যটি নির্দিষ্ট। কাজেই তা বিনষ্ট হওয়ার ফলে চুক্তির ক্ষেত্র (مَحَلٌّ) অবশিষ্ট নেই, তাই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত-দ্রব্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা অনির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব। কাজেই সাময়িক অপারগতার কারণে চুক্তির ক্ষেত্র (مَحَلٌّ) বিনষ্ট হয়ে যায়নি। কাজেই চুক্তি বহাল থাকবে।

قَالَ : وَيَجُوزُ السَّلَامُ فِي السَّكِّ الْمَالِجِ وَزَنًا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ  
الْقَدْرُ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ ، إِذْ هُوَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ ، وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ فِيهِ  
عَدَدًا لِلتَّفَاوُتِ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট প্রকারের ভিত্তিতে লবণমিশ্রিত [শুটকি] মাছে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, তার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট এবং তার গুণাগুণ নির্ধারিত এবং তা সমর্পণ করাও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। কেননা, তা [বাজার থেকে] অবিদ্যমান হয়ে যায় না। তবে এগুলোতে গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' বৈধ হবে না। কেননা, এগুলোর মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ السَّلَامُ فِي السَّكِّ الْمَالِجِ : এখানে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, লবণমিশ্রিত শুকনো মাছ তথা শুটকি মাছের যদি প্রকার নির্দিষ্ট করা হয় [যেমন- চিংড়ি মাছের শুটকি বা পুঁটি মাছের শুটকি] এবং ওজনের ভিত্তিতে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, শুটকি মাছ এমন দ্রব্য যার পরিমাণ ও গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। আর তা হস্তান্তর করার সক্ষমতা অর্জন করাও সম্ভব। কেননা, শুটকি মাছ সারা বছরই বিদ্যমান থাকে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে দ্রব্য এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব যে, তাতে অস্পষ্টতা থাকে না এবং বিবাদের সৃষ্টি না হয় ও হস্তান্তর করা সম্ভবপর হয়, তাতে 'বায় সলম' করা জায়েজ। সুতরাং শুটকি মাছে 'বায় সলম' করা জায়েজ হবে। কিন্তু গণনার ভিত্তিতে শুটকি মাছে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। যেমন কেউ বলল, অমুক প্রকারের মাছ থেকে একশত শুটকি মাছ দেব, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কারণ, মূল্যের দিক থেকে মাছের মাঝে অনেক তারতম্য হয়। যেমন- কোনো মাছ ছোট হয়, আবার কোনোটি বড় হয়। আর ছোট বড় হওয়ার কারণে তার মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়। আর পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, যে দ্রব্যের মাঝে তারতম্য থাকে এবং সেই তারতম্যের কারণে মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে সে দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। অতএব, শুটকি মাছে গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ : السَّكِّ الْمَالِجِ - লবণ মিশ্রিত শুকনো মাছ তথা শুটকি মাছ। উল্লেখ্য যে, আল-মুগরিব অভিধানের লেখক বলেছেন, এ ক্ষেত্রে سَكَّ مَلَجٌ বা سَكَّ مَلَجٌ বলা হয়। পক্ষান্তরে سَكَّ مَالِجٌ শব্দটি সাহিত্যের বিচারে মানসম্পন্ন ভাষা নয়। কাজেই مَلِجٌ বা مَلَجٌ শব্দই অধিক বিদ্বৎ। যদিও কবি 'রাজয'-এর নিম্নোক্ত কবিতায় এ অর্থই مَالِجٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে-  
بَفْرِئَةٍ تَزَوَّجَتْ بَصْرًا \* يَطْمَحُهَا الْمَالِجُ وَالطَّرِيقُ  
অর্থাৎ, "বসরার এক রমণী বসরার এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে, সে তাকে তাজা ও শুটকি মাছ খাওয়ায়"। কিন্তু এ ব্যবহারটি হচ্ছে বিরল, কাজেই তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা চলবে না।

قَالَ : وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَامِ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ إِلَّا فِي حَنِيبِهِ وَزَنَا مَعْلُومًا وَصَرًّا مَعْلُومًا ، لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ فِي زَمَانِ الشِّتَاءِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَنْقَطِعُ يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ وَزَنَا لَا عَدَدًا لِمَا ذَكَّرْنَا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي لَحْمِ الْكِبَارِ مِنْهَا ، وَهِيَ الَّتِي تُقَطَّعُ اعْتِبَارًا بِالسَّلَامِ فِي اللَّحْمِ عِنْدَهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ তা জায়েজ নয়]। তবে যদি মাছ ধরার মৌসুমে হয়, ওজন নির্দিষ্ট হয় এবং প্রকার নির্দিষ্ট হয় [তাহলে জায়েজ হবে]। [প্রথম সূরতে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, তাজা মাছ শীত মৌসুমে দুষ্পাণ্য হয়ে যায়। সূত্রাং কোনো অঞ্চলে যদি কোনো সময়ই তা দুষ্পাণ্য না হয়, সে অঞ্চলে সব সময় 'বায় সলম' জায়েজ হবে। তবে ওজনের ভিত্তিতে জায়েজ হবে: গণনা ভিত্তিতে নয়। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি [অর্থাৎ এগুলোর মাঝে মূল্যের দিক থেকে তারতম্য হয়]। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতানুসারে যে বড় মাছ কেটে বিক্রয় করা হয় তার মাংসের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। [এটা তিনি বলেন,] গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' -এর ব্যাপারে তাঁর অতিমতের উপর ভিত্তি করে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْخَيْرُ فِي السَّلَامِ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' কেবল তখনই জায়েজ হবে যদি তা মাছের মৌসুমে হয় এবং তার পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারিত হয়, তবে এ বিধান এমন অঞ্চলের জন্য যেখানে সারা বছর বাজারে মাছ পাওয়া যায় না। হয়তো গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালে তা বাজারে একবারেই পাওয়া যায় না। এরূপ অঞ্চলে তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, চুক্তিই বাজারে পাওয়া যাওয়ার মৌসুমে সম্পাদিত হতে হবে এবং তার মেয়াদও উক্ত মৌসুম শেষ হওয়ার পূর্বে উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সলম' সही হওয়ার জন্য শর্ত হলো, দাদনকৃত-দ্রব্যটি চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হতে হবে। সূত্রাং যে সকল অঞ্চলে তাজা মাছ সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায় সে সকল অঞ্চলে যে কোনো সময় যে কোনো মেয়াদে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে যদি তা ওজনের ভিত্তিতে হয়। আর যদি গণনার ভিত্তিতে হয়, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, মাছ ছোট বড় হয় এবং মূল্যের মাঝে তারতম্য হয়। ফলে হস্তান্তরের সময় তাতে বিবাদের সৃষ্টি হবে।

উল্লিখিত মাসআলায় ছোট মাছ এবং বড় মাছ [যা কেটে বিক্রয় করা হয়] উভয়ের বিধান একই অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রেই 'বায় সলম' জায়েজ। এটাই ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.) থেকে বর্ণিত জাহিরে রেওয়ায়েত। পক্ষান্তরে 'নাওয়াদের'-এর এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বড় মাছ যা কেটে বিক্রয় করা হয় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। এ মতটির কারণ হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পত্তর গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, চর্বিযুক্ত হওয়া ও চর্বিহীন হওয়ার দিক থেকে গোশতের মাঝে অনেক তারতম্য হয়ে থাকে। ফলে তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণটি কেটে বিক্রয়যোগ্য মাছের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। কেননা, চর্বির দিক থেকে তার মাঝেও তারতম্য হয়। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এরূপ একটি 'নাদির রেওয়ায়েত' রয়েছে, যদিও তাদের উভয়ের মতে পত্তর গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ। এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের মতে পত্তর গোশত ও মাছের 'গোশত'-এর মাঝে পার্থক্য হলো, পত্তর গোশতের ক্ষেত্রে তা কোন্ অংশের হবে তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় [যেমন-রানের গোশত বা পাঁজরের গোশত], কিন্তু মাছের গোশতের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। কাজেই মাছের গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এটা হচ্ছে 'নাদির রেওয়ায়েত'। কিন্তু পূর্ববর্ণিত জাহিরে রেওয়ায়েতেও অধিক বিতর্ক।

قَالَ : وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَامِ فِي اللَّحْمِ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَا : إِذَا وُصِفَ مِنَ اللَّحْمِ مَوْضِعًا مَعْلُومًا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ جَازَ ، لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ ، وَلِهَذَا يَضُنُّ بِالْمِثْلِ ، وَيَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهُ وَزَنًا ، وَيَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ ، بِخِلَافِ لَحْمِ الطَّيْرِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَصْفُ مَوْضِعٍ مِنْهُ . وَلَهُ أَنَّهُ مَجْهُولٌ لِلتَّفَاوُتِ فِي قَلْبِهِ الْعَظِيمِ وَكَثْرَتِهِ أَوْ فِي سَمْنِهِ وَهَزَالِهِ عَلَى اخْتِلَافِ قُصُولِ السَّنَةِ ، وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَّةٌ إِلَى الْمَنَازَعَةِ ، وَفِي مَخْلُوعِ الْعَظِيمِ لَا يَجُوزُ عَلَى التَّوَجِّهِ الثَّانِي ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَالتَّضْمِينُ بِالْمِثْلِ مَمْنُوعٌ ، وَكَذَا الْإِسْتِقْرَاضُ ، وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ فَالْمِثْلُ أَعَدَلُ مِنَ الْقِيَمَةِ ، وَلَآنَ الْقَبْضُ يُعَابِنُ فَيَعْرِفُ مِثْلَ الْمَقْبُوضِ بِهِ فِي وَقْتِهِ أَمَّا الْوَصْفُ فَلَا يُكْتَفَى بِهِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে গোশতের ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ করার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। সাহেবাইন বলেন, যদি গোশত [পশুর] কোন্ অংশের হবে তা নির্ধারণ করা হয় এবং গোশতের গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, এটা ওজন দ্বারা পরিমাপিত, এর গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট। এ কারণেই তো গোশতের ক্ষেত্রে ‘মিছল’ বা অনুরূপ গোশত দ্বারা ‘যিমান’ [ক্ষতিপূরণ] পরিশোধ করতে হয়, ওজনের ভিত্তিতে তা ধার নেওয়া জায়েজ হয় এবং তাতে ‘রিবা’-এর বিধান কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে পাখির গোশতের বিধান ভিন্ন [তাতে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে না]। কেননা, পাখির গোশতের ক্ষেত্রে বিশেষ অংশ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, গোশতে হাড় কমবেশি হওয়ার দিক থেকে অথবা বছরের মৌসুমের পরিবর্তনে মোটাতাজা ও শীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকার ফলে তাতে অস্পষ্টতা থেকেই যায়। আর এ অস্পষ্টতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। আর হাড়মুক্ত গোশতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণে [অর্থাৎ মোটাতাজা ও শীর্ণ হওয়ার দিক থেকে তারতম্যের কারণে] জায়েজ হবে না। এটাই হচ্ছে বিতর্কিতম অভিমত। [সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব হলো,] ‘মিছল’ বা সদৃশ গোশত দ্বারা ‘যিমান’ [ক্ষতিপূরণ] শোধ করতে হবে’ এটা আমরা মানি না। তদ্রূপ ধার নেওয়ার ব্যাপারেও একই কথা। আর যদি [উভয় ক্ষেত্রে আপনাদের উল্লিখিত অভিমত] মেনে নেওয়া ও হয়, তবে [যিমান পরিশোধের ক্ষেত্রে ‘মিছল’ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, যিমান পরিশোধের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য, আর] ‘মিছল’ বা সদৃশ বস্তু হচ্ছে সমতার ক্ষেত্রে মূল্যের তুলনায় মূল বস্তুর অধিক নিকটবর্তী। [এ কারণেই যিমানের ক্ষেত্রে ‘মিছল’ ওয়াজিব। গোশত ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু হওয়ার কারণে নয়।] আর দ্বিতীয় কারণ [অর্থাৎ ওজনের ভিত্তিতে গোশত ধার নেওয়া জায়েজ হওয়ার কারণ] হলো, ধার নেওয়ার সময় দেখেও নে হস্তগত করা হয়। ফলে হস্তগতকৃত বস্তুর সদৃশ বস্তু তখন নির্দিষ্টরূপে বুঝা যায়। কিন্তু শুধু বিবরণ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না।



### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَامِ إِلَى الْخَيْرِ: গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'বায় সলম' -এর দুটি সুরত হতে পারে-

১. হাড়সহ গোশতে 'বায় সলম'।

২. হাড়বিহীন গোশতে 'বায় সলম'।

প্রথম সুরতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে জায়েজ। আর হযরত ইবনে শুজা' (إِبْنُ شُجَاعٍ)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে জায়েজ নয়। মুসান্নিফ (র.) হযরত ইবনে শুজা'-এর রেওয়ায়েতটিকে অধিক বিস্তৃত বলে বর্ণনা করেছেন। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি গোশত পশুর কোন অংশের হবে এবং তার গুণাগুণ কিরূপ হবে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে [যেমন বলল, এক মন দু-বছর বয়সের খাসির রানের গোশত, যাতে চর্বি থাকবে], তাহলে উভয় সুরতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় ফতোয়া সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের উপর। -[ফাতাওয়ায়ে শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৫৭।] ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, গোশত ওজন-প্রচলিত দ্রব্য এবং গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। কেননা, যদি গোশতের প্রকার, তা পশুর কোন অংশের হবে এবং তার গুণাগুণ কিরূপ হবে তা উল্লেখ করে, তাহলে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওজন-প্রচলিত দ্রব্য সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, তা হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি হবে না। সুতরাং গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلِهَذَا يُمْضَى بِالْفَيْسَلِ: মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে তিনটি সমর্থন পেশ করছেন এ কথার উপর যে, গোশত ওজন-প্রচলিত দ্রব্য এবং তা বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব-

১. কেউ যদি অপর কোনো ব্যক্তির গোশত নষ্ট করে বা ভক্ষণ করে ফেলে, তাহলে তার জরিমানা [ওজন মেপে] তদ্রূপ গোশত দ্বারা পরিশোধ করতে হয়। অথচ যদি তা ওজন-প্রচলিত দ্রব্য না হতো এবং তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব না হতো তাহলে তার মূল্য দ্বারা জরিমানা পরিশোধ করা আবশ্যিক হতো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোশত সাদৃশ্যপূর্ণ (مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ) ওজন-নির্ভর দ্রব্য, আর এরূপ হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, গোশত সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব।

২. ওজন মেপে গোশত কর্ত্ত নেওয়া জায়েজ। অথচ গোশত যদি ওজন-প্রচলিত দ্রব্য না হতো এবং তা সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য (مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ) না হতো তাহলে ওজন মেপে তা কর্ত্ত নেওয়া জায়েজ হতো না।

৩. গোশতের বিনিময় গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি কমবেশি করা হয়, তাহলে তা 'রিবা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোশত ওজন দ্বারা প্রচলিত দ্রব্য, অন্যথায় তাতে রিবা হারাম হতো না। কারণ, রিবা হারাম হওয়ার জন্য একই প্রকারের দ্রব্য (جِنْسٍ) হওয়া এবং ওজন দ্বারা পরিমাপিত কিংবা পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং এ তিনটি নজির দ্বারা বুঝা গেল যে, গোশত ওজন-প্রচলিত সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য। আর এরূপ হওয়া এ কথার আলামত বা প্রমাণ যে, তা বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ يَخْلَفُ لَحْمَ الطَّيْرِ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে পাখির গোশতের বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ তাতে সাহেবাইন (র.)-এর মতেও 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কারণ, পশুর গোশতের ক্ষেত্রে গোশত পশুর কোন অংশের হবে তা উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব, কিন্তু পাখির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট হওয়ার কারণে তার কোন অংশের গোশত হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কাজেই তা অস্পষ্ট থেকে যাবে। সুতরাং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হতে না।

কিন্তু আন্তামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন, যে সকল পাখি শিকার করা হয় না তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। আর যে সকল পাখি শিকার করা হয় কিংবা পোষ মানিয়ে লালন করা হয় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রেও পশুর গোশতের ন্যায় মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ নয়;

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, সকলের মতেই জায়েজ। এ দ্বিতীয় মতটিই সঠিক : কারণ পাখির গোশতে যে হাড় থাকে তা জনসমাজে ধর্তব্য বলে মনে করা হয় না।

قَوْلُهُ وَكَانَ أَهْلُ هَانِيفَا (র.)-এর মতে গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' নাজায়েজ হওয়ার দলিল হলো, গোশতের মাঝে তারতম্য হয় দুটি কারণে

১. গোশতের মাঝে হাড় বেশি বা কম হওয়ার কারণে তাতে তারতম্য হয়। এ কারণেই দেখা যায় যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এ নিয়ে বিতর্ক হয়।

২. গোশত চর্বিযুক্ত হওয়া বা চর্বিহীন হওয়ার দিক থেকে তারতম্যপূর্ণ হয়। বছরের কোনো মৌসুমে পশুর গায়ে অধিক চর্বি থাকে আবার কোনো মৌসুমে কম চর্বি থাকে। কাজেই গোশতের ক্ষেত্রে উক্ত দুটি দিক থেকে অস্পষ্টতা থেকে যায় এবং তা বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয় না। আর এ অস্পষ্টতা বিবাদের সৃষ্টি করবে। সুতরাং গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَفِي مَخْلُوعِ الْعَظْمِ الخ : গোশত বিক্রয়ের দ্বিতীয় সূরতে অর্থাৎ হাড়হীন গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদিও হাড় কমবেশি হওয়ার দিক থেকে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়, কিন্তু চর্বির দিক থেকে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। ইবনে ওজা' তাঁর থেকে এ অভিমতটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিই তাঁর থেকে বর্ণিত অধিক বিশুদ্ধ অভিমত।

قَوْلُهُ وَالْأَتَّظِيفِينَ بِالْمِثْلِ مَنُوعُ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে সাহেবাইন (র.)-এর সমর্থনে উল্লিখিত নজিরসমূহের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হলো, সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে যে বলা হয়েছে "কেউ যদি অপরের গোশত নষ্ট করে, তাহলে তদ্রূপ গোশত দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করতে হয়" এটা সঠিক নয়; বরং সে ক্ষেত্রেও মূল্য দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করতে হয়। কেননা, الْإِنْعِقَاقُ الْغَائِمِ الْكَبِيرِ গ্রন্থের অর্থ "অনুরূপ গোশত দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করতে হয়" তবু এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হবে না যে, গোশত ওজন-প্রচলিত এমন দ্রব্য যা গুণাগুণ উল্লেখের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা যায়। তার কারণ হলো, যিমান বা জরিমানা পরিশোধের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা (الْعَادِلَةُ) অপরিহার্য বিষয়। আর গোশতের জরিমানা যদি গোশত দ্বারা পরিশোধ করা হয়, তাহলে সেটা সমতার দিক থেকে মূল্য পরিশোধের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হয়। কেননা, মূল্যের মাঝে সমতা হয় কেবল পরোক্ষভাবে (مَعْنَى فَقَطْ) আর এরূপ গোশতের মাঝে সমতা রক্ষা হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক থেকেই (صُورَةً وَمَعْنَى)। এ দিকটি বিবেচনা করে গোশতের জরিমানা গোশতের মাধ্যমে পরিশোধের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে গোশত নষ্ট করা হয়েছে তার মাঝে এবং পরিশোধকৃত গোশতের মাঝে তারতম্য নেই; বরং তারতম্য থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত কারণে এ বিধান হয়েছে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে যে উল্লেখ করা হয়েছে, "গোশত ওজন মেপে করজ গ্রহণ করা জায়েজ" এ কথাও সঠিক নয়। বরং এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ওজন মেপে করজ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তা জায়েজ তাহলেও 'বায় সলম' এবং করজ গ্রহণের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, করজ গ্রহণ করার সময় গোশত কিরূপ ছিল, তাতে চর্বি কিরূপ ছিল ইত্যাদি উভয়ে স্বচক্ষে দেখে। ফলে তা পরিশোধের সময় অনুরূপ গোশত পরিশোধ করা সহজ হয়। পক্ষান্তরে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে তা চুক্তির সময় কেউ দেখছে না, তাই শুধু বর্ণনার দ্বারা তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। সুতরাং 'বায় সলম' জায়েজ হবে না কিন্তু করজ গ্রহণ জায়েজ হবে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত "গোশতের বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রিবা হারাম"-এর জবাব মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেননি। এর জবাব হলো, শরিয়ত রিবাব দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের পার্থক্য বাতিল করে দিয়েছে। এ কারণেই যদি এক দিকে পশুর রানের গোশত হয় আর অপর দিকে পাঁজরের গোশত হয়, তবু কমবেশি করে বিক্রয় হারাম। কাজেই তাদের উল্লিখিত নজির দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, গোশতের মাঝে তারতম্য বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব।

وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ إِلَّا مُوجَّلاً، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوزُ حَالًا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَامِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فِيمَا رَوَيْنَا، وَلَأنَّهُ شَرَعَ رُخْصَةً دَفَعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْأَجَلِ لِيَقْدِرَ عَلَى التَّحْصِيلِ فِيهِ فَيُسَلِّمَ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّسْلِيمِ لَمْ يُوجَدْ الْمُرْخِصُ فَبَقِيَ عَلَى النَّافِي.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মেয়াদি না হলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [মেয়াদি ছাড়া] তাৎক্ষণিকভাবেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, হাদীসে নিঃশর্তরূপে উল্লেখ হয়েছে "আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বায় সলম' করার অনুমতি দিয়েছেন।" আমাদের দলিল হলো, আমাদের বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি "নির্ধারিত মেয়াদে"। আরেকটি কারণ হলো, দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণার্থে 'রুখসত' বা অবকাশ রূপে 'বায় সলম' [শরিয়তে] অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং তার জন্য একটি মেয়াদ থাকা আবশ্যিক, যাতে ঐ মেয়াদে সে তা অর্জন করে সমপর্ণ করতে সক্ষম হয়। অতএব, যদি সে তাৎক্ষণিকভাবে সমপর্ণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে উক্ত 'রুখসত' বা অবকাশের কারণ পাওয়া গেল না। সুতরাং তা "তোমার অধিকারে যা নেই তা তুমি বিক্রয় করো না" এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্তই থেকে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ إِلَّا مُوجَّلاً : আমাদের মতে 'বায় সলম' যদি মেয়াদের ভিত্তিতে না হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিमतও আমাদের মতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মেয়াদের ভিত্তিতে না হলেও 'বায় সলম' জায়েজ। যেমন কেউ বলল, নগদ এ দশ দিরহামের বিনিময়ে এক মণ গমের জন্য আমি 'বায় সলম' করলাম। অপরজন তা কবুল করল এবং তারা কোনো মেয়াদ উল্লেখ করল না, তাহলে এভাবে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, وَرَخَّصَ فِي، وَرَخَّصَ فِي (مُطْلَقًا)। কাজেই মেয়াদের শর্ত আরোপ করা হাদীসটির উপর অতিরিক্ত সংযোজন (زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ) বলে গণ্য হবে। আর তা জায়েজ নয়। কিন্তু আদ্যামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, সম্ভবত শাফেয়ীগণ এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন না। কেননা, وَرَخَّصَ فِي، السَّلَامُ এ শব্দে হাদীসটি হাদীসগ্রন্থে প্রমাণিত নেই। অথচ শাফেয়ীগণ হচ্ছেন হাদীস বিশারদ। বরং তাঁদের দলিল হলো, যেহেতু মেয়াদ শর্ত হওয়ার কোনো দলিল নেই সেহেতু মেয়াদ 'বায় সলম'-এর জন্য শর্ত বলে সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলিল হলো, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হুজুর ﷺ-এর হাদীস-

مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمِ مِنْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَزَيْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"তোমাদের কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে তা করে।" এ হাদীসে হুজুর ﷺ নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে হওয়া 'বায় সলম'-এর

জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। শাফেরীগণ এ হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, হাদীসটিতে মেয়াদের ভিত্তিতে হওয়াকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়নি; বরং এ হাদীসের অর্থ হলো, যদি কেউ মেয়াদের ভিত্তিতে 'বায় সলম' করে, তাহলে সে যেন মেয়াদ নির্দিষ্ট করে। আর যদি মেয়াদের ভিত্তিতে না করে, তাহলে মেয়াদ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কেননা, পূর্বের দুটি শর্ত (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ) ও তদ্রূপ। কারণ, পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে 'বায় সলম' হওয়া শর্ত নয়। অন্যথায় গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হতো না; বরং শর্ত হলো, পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে হলে তা নির্দিষ্ট হতে হবে, আর ওজন দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে হলে তাও নির্দিষ্ট হতে হবে। সুতরাং মেয়াদের ক্ষেত্রেও একই অর্থ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَكُنْ شَرَعَ رُخْصَةً دَفْعًا لِحَاجَةِ الْخ : আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, 'যা বিক্রেতার মালিকানায় নেই তা বিক্রয় জায়েজ নয়' এ সাধারণ (عَامٌّ) বিধান থেকে 'বায় সলম' -কে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ঐ সকল অভাবীদের সুবিধার্থে যাদের নগদ অর্থের প্রয়োজন এবং তারা এর বিনিময় পরিশোধে বর্তমানে সক্ষম নয়; কিন্তু পরবর্তীতে সক্ষম হবে। কাজেই মেয়াদের প্রয়োজন, যাতে সে এ মেয়াদে দাননকৃত-দ্রব্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যদি সে চুক্তির সময়ই তা হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার কারণ পাওয়া যাবে না। সুতরাং তা নাজায়েজের অন্তর্ভুক্ত থেকে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তাহলে তো যে ব্যক্তির নিকট গম বিদ্যমান আছে সে যদি মেয়াদের ভিত্তিতে গমের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করে, তাহলে তা জায়েজ না হওয়ার কথা, অথচ তা আপনাদের মতেও জায়েজ। এর জবাব হলো, 'বায় সলম' -এ বিক্রেতা নগদ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং সে যখন গম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কম মূল্যে মেয়াদের ভিত্তিতে বিক্রয় করতে যাচ্ছে, তখন এ কথা ধরে নিতে হবে যে, বিদ্যমান গম তার প্রয়োজন নিবারণের জন্য আবশ্যিক। কাজেই তা না থাকার পর্যায়ে। তাছাড়া প্রয়োজন হচ্ছে একটি আভ্যন্তরীণ বিষয়। কাজেই মেয়াদের ভিত্তিতে চুক্তি করাই প্রয়োজন থাকার আলামত হিসেবে গণ্য করা হবে। আর এ আলামতের উপরই বিধানটি নির্ভরশীল থাকবে। যেমন-নামাজের ক্ষেত্রে কসর (قَصْر) পড়ার কারণ হচ্ছে সফরের কষ্ট, কিন্তু এখন শুধু সফরের উপরই তা নির্ভরশীল।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لِمَا رَوَيْنَا ، وَلَئِنَّ الْجَهَالََةَ فِيهِ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا فِي النَّبْعِ ، وَالْأَجَلُ أَدْنَاهُ شَهْرٌ ، وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْيَوْمِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, নির্ধারিত মেয়াদ ছাড়া 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এর দলিল আমাদের বর্ণিত হাদীস। আরেকটি কারণ হলো, মেয়াদের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়, যেমন সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। মেয়াদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, এক মাস। কারো কারো মতে তিন দিন। আর কারো কারো মতে, অর্ধ দিনের চেয়ে অধিক। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিস্তৃত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ : পূর্বে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা মেয়াদের ভিত্তিতে হতে হবে। আর এখানে ইমাম কুদুরী (র.) বলেন যে, সে মেয়াদ নির্দিষ্ট হওয়াও অপরিহার্য। সুতরাং যদি কেউ এভাবে মেয়াদ নির্ধারণ করে যে, যখন মানুষ ফসল কাটবে তখন হস্তান্তর করব, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এর দলিল হলো, আমাদের পূর্বে বর্ণিত হাদীস—

مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ لَيْسَ لَهُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ زَيْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

এ হাদীসে বলা হয়েছে, কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করে। কাজেই মেয়াদ নির্দিষ্ট করা 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। দ্বিতীয় দলিল হলো, মেয়াদের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বিবাদের সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, মেয়াদ নির্দিষ্ট না থাকলে বিক্রেতা চাইবে বিলয়ে হস্তান্তর করতে আর ক্রেতা চাইবে দ্রুত হস্তগত করতে। ফলে বিবাদের সৃষ্টি হবে। কাজেই মেয়াদ নির্দিষ্ট না করলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

এরপর মুসান্নিফ (র.) 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে মেয়াদের সর্বনিম্ন সময় কতটুকু হতে পারবে এর সম্পর্কে তিনটি অভিমত উল্লেখ করেছেন—

১. সর্বনিম্ন সময় হলো, এক মাস।

২. কারো কারো মতে সর্বনিম্ন সময় হলো, তিন দিন।

৩. আর কেউ কেউ বলেন, মেয়াদের সর্বনিম্ন সময় হলো, অর্ধেক দিনের চেয়ে অধিক সময়।

প্রথম অভিমতটির দলিল হলো, কেউ যদি শপথ করে যে সে তার ঋণ দ্রুত পরিশোধ করবে। অতঃপর যদি সে এক মাসের ভিতরে তা পরিশোধ করে, তাহলে তার শপথ রক্ষা করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এক মাসের কম হলো দ্রুত সময় (عَاجِلٌ) -এর অন্তর্ভুক্ত, আর এক মাস বা তার অধিক হলো বিলম্বিত সময় (أَجَلٌ) -এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এক মাস মেয়াদের সর্বনিম্ন সময় বলে সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয় মতটির দলিল হলো, খিয়ারে শর্ত (خِيَارُ شَرْطٍ) -এর সময় যেহেতু তিন দিন, তাই 'বায় সলম' -এ তিন দিন সর্বনিম্ন সময় হবে। কিন্তু এ দলিলটি দুর্বল। কারণ, তিন দিন হলো খিয়ারে শর্তের সর্বোচ্চ সময়, অথচ আমাদের আলোচনা হচ্ছে সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ নিয়ে। কাজেই কিয়াসটি সঠিক হয়নি। আর তৃতীয় মতটির দলিল হলো, মজলিসে হস্তান্তর হলো নগদ আর মজলিসের পরে হলেই তা বিলম্ব। আর মজলিস সাধারণত অর্ধ দিনের চেয়ে বিলম্বিত হয় না। কাজেই অর্ধ দিনের বেশি হলেই তা মেয়াদ বলে গণ্য হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে প্রথম মতটিই [অর্থাৎ সর্বনিম্ন সময় হলো, এক মাস এ মতটিই] অধিক সঠিক। কেননা, এ মতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য, এ মতটির উপরই ফতোয়া।

— [ফতোয়ায়ে শামী-খণ্ড-৭, পৃ.-৪৬২ আল-বাহরুর রায়িক, ফতহুল কাদীর।]

وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ بِمَكِّيٍّ وَلَا يَذْرَأُ رَجُلٌ بِعَيْنِهِ مَعْنَاهُ لَا يُعْرِفُ مَقْدَارَهُ،  
لَأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ فِيهِ التَّسْلِيمُ، فَرَمًا يَضْعُ فَبُؤْدَى إِلَى الْمَنَازَعَةِ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ،  
وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَكِّيُّ مِمَّا لَا يَنْقِصُ وَلَا يَنْبَسِطُ كَالْقِصَاعِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَ مِمَّا  
يَنْكَبِسُ بِالنَّكَبْسِ كَالزَّنْبِيلِ وَالْجِرَابِ لَا يَجُوزُ لِلْمَنَازَعَةِ، إِلَّا فِي قَرَبِ الْمَاءِ  
لِلتَّعَامِلِ فِيهِ، كَذَا رَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحا) -

অনুবাদ : নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির পাত্র দ্বারা অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির হাতের মাগের ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা জায়েজ নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, যদি তার পরিমাণ জানা না থাকে। কেননা, এ ক্ষেত্রে পণ্য বিলম্বে সমর্পণ করা হয়। কাজেই কখনও উক্ত পাত্র বা হাত নষ্ট হয়ে যেতে পারে তখন বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। মাপপাত্র এমন হওয়া আবশ্যিক, যা সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হয় না; যেমন- পেয়ালা। আর যদি মাপপাত্রটি এমন হয় যে, চাপ দিলে তা সম্প্রসারিত হয়ে যায়, যেমন- থলে ও বুড়ি, তাহলে তার দ্বারা 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, তা বিবাদ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। তবে পানির মশকের ক্ষেত্রে জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে লোক-প্রচলন রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে :

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ السَّلَامُ بِمَكِّيٍّ : সূত্রে মাসআলা হলো, যদি কেউ এভাবে 'বায় সলম' করে যে, অমুক ব্যক্তির পাত্রের মাগে পঞ্চাশ পাত্র গম দেব, আর সেই পাত্রে কতটুকু গম ধরে তা চুক্তিকারীদ্বয়ের জানা নেই, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এরূপভাবে যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তির হাতের মাগের একশত হাত কাপড় দেব আর সেই ব্যক্তির হাত কতটুকু লম্বা তা জানা নেই, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত-দ্রব্য হস্তান্তর করা হয় নির্ধারিত মেয়াদের পর। আর এ দীর্ঘ সময়ে উক্ত ব্যক্তির পাত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে কিংবা চুরি হয়ে যেতে পারে। এরূপভাবে যার হাতে একশত হাত মাপার কথা বলা হয়েছে সে ব্যক্তি এই সময়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে। কাজেই এরূপ নির্দিষ্ট ব্যক্তির পাত্র দ্বারা কিংবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাত দ্বারা মাপার শর্তে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে যদি উক্ত পাত্রে কতটুকু গম ধরে তা জানা থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, তখন বিবাদের সৃষ্টি হবে না। হাতের বিষয়টিও তদ্রূপ।

قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ : অর্থাৎ এ বিষয়টি ইতঃপূর্বে মূল কিতাব (كِتَابُ الْمُبَيَّعِ)-এর ৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে মুসান্নিফ (র.) যা বলেছেন তার সারকথা হলো, নির্দিষ্ট পাত্র যার পরিমাণ জানা নেই অথবা নির্দিষ্ট পাত্রের যার ওজন জানা নেই তা দ্বারা (সাধারণ) ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কেননা, সাধারণ বিক্রয়ে বিক্রয়দ্রব্য দ্রুত হস্তান্তর করা হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে উক্ত পাত্রের বা পাত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া বিরল, কিন্তু 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে তা জায়েজ নয়। কারণ, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত-দ্রব্য দীর্ঘ সময় পরে হস্তান্তর করা হয়। আর এ দীর্ঘ সময়ে উক্ত পাত্র বা পাত্রের নষ্ট হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বিরল নয়। কাজেই তাতে বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَكِّيُّ : অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা মেগে দেওয়ার শর্ত করা হবে তা এমন হওয়া অপরিহার্য যা চাপ প্রয়োগ করলে সম্প্রসারিত কিংবা সংকুচিত হবে না। যেমন- লোহা, কাঠ বা শিতলের তৈরি পাত্র। এগুলো চাপ প্রয়োগ করলেও সম্প্রসারিত হবে না। আর যদি এরূপ পাত্র নির্ধারণ করা হয় যে তাতে চাপ প্রয়োগ করলে তা সম্প্রসারিত হয় আর চাপ প্রয়োগ না করলে সংকুচিত অবস্থায় থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, তাতে বিবাদের সৃষ্টি হবে। ক্রেতা চাইবে চাপ প্রয়োগ করে মেগে নিতে আর বিক্রেতা চাইবে চাপ প্রয়োগ না করে মেগে দিতে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে পানির মশকের ক্ষেত্রে তা জায়েজ হবে। অর্থাৎ পানির মশক চামড়ার তৈরি হওয়ার কারণে তাতে চাপ প্রয়োগ করলে তা সম্প্রসারিত হয়। তা সত্ত্বেও কেউ যদি পানি ক্রয়ের জন্য এরূপ মশক নির্ধারণ করে, তবে তা জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে জন-সমাজে সাধারণ প্রচলন রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ : وَلَا فِي طَعَامِ قَرِيْبٍ بَعِيْنِهَا أَوْ ثَمَرَةٍ نَخَلَةٍ بَعِيْنِهَا ، لِأَنَّهُ قَدْ بَعِيْرَهُ أَفَهُ  
فَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيْمِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَبَ اللَّهُ  
تَعَالَى الثَّمَرِيْمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ، وَلَوْ كَانَتِ النَّسَبَةُ إِلَى قَرِيْبٍ لِبَيْحَانِ  
الصِّفَةِ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا قَالُوا كَالْخُشْمَرَانِيِّ بَبْحَارًا وَالْبِسَاخِيِّ بِفَرْغَانَةٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট গ্রামের খাদ্যের ক্ষেত্রে কিংবা নির্দিষ্ট গাছের খেজুরের ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে না। কেননা, তাতে কোনো প্রকার আপদ আসতে পারে। ফলে তা সমর্পণ করতে সক্ষম হবে না। এদিকেই ইঙ্গিত করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— “বল তো! আল্লাহ তা’আলা যদি সে ফল নষ্ট করে দেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের মাল হালাল করে নেবে?” তবে যদি কোনো অঞ্চলের উল্লেখ শুধু দ্রব্যটির গুণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে ফিকহবিদগণের অভিমতে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, বুখারার খুশমুরান এলাকার গম কিংবা ফারাগানার বিসাখ এলাকার গম।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : : যদি নির্দিষ্ট গ্রামের ফসলের ক্ষেত্রে কিংবা নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল অথবা নির্দিষ্ট বাগানের ফলের ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ করে, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কারণ, দুর্যোগের ফলে উক্ত নির্দিষ্ট গ্রামের ফসল বা নির্দিষ্ট বৃক্ষ ও নির্দিষ্ট বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে শর্ত অনুযায়ী দাননকৃত-দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে না।

আর এ বিষয়টির দিকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন—

أَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى الثَّمَرِيْمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ .

অর্থাৎ, “বল তো! আল্লাহ তা’আলা যদি সে ফল নষ্ট করে দেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের মাল হালাল করে নেবে?” কেননা, হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, যদি নির্ধারিত বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতা মূল্যের প্রাপক হবে না। কাজেই এরূপ চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তা জায়েজ হবে না।

উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লাযী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) আপত্তি তুলেছেন যে, হাদীসটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর ‘বায় সলম’-এর ক্ষেত্রে দলিল পেশ করা যথার্থ হয়নি। কারণ, হাদীসটি হজুর ﷺ বলেছেন সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। ‘বায় সলম’-এর ক্ষেত্রে তিনি এটি বলেছেন তার প্রমাণ নেই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, হাদীসটি ‘বায় সলম’-এর সম্পর্কে বর্ণিত হোক কিংবা সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত হোক উভয় অবস্থায়ই এটি এ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে যে, নির্দিষ্ট বাগানের ফল- তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কামুক্ত হওয়ার পূর্বে- বিক্রয় করা কিংবা তাতে ‘বায় সলম’ করা জায়েজ নয়। কেননা, উভয় ক্ষেত্রে কারণ একই তা হলে ফল নষ্ট হয়ে চুক্তি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেখানে চুক্তি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে চুক্তি করা সহীহ নয়, যদি সম্ভাবনার দিকটি স্কীণ না হয়।

উল্লেখ্য মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهَرَ فَقُلْتُ لِأَنَسٍ رَمَا زَهَرَهَا قَالَ نَعَمْ أَوْ تَصْفَرَّ أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِيلُ مَالُ أَخِيكَ .

আর মুসলিম শরীফে হযরত আনিস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ بَيْعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَاصَابَتْهُ جَائِعَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالُ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

এছাড়া ‘বায় সলম’ সম্পর্কেও উপরিউক্ত অর্থে একটি হাদীস সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : তবে হাদীসটির সনদে একজন মাজহুল রাবী থাকায় হাদীসটি দুর্বল ।— [দৃষ্টব্য : ফতহুল কাদীর]

যদি এমন বড় কোনো অঞ্চল বা দেশের ফসলের কথা উল্লেখ করে যার সম্পূর্ণ অঞ্চলের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বিরল, তাহলে তাতে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে ।—[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ النَّسْبَةُ إِلَى قَرْبَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ الْخ : যদি কোনো গ্রাম বা অঞ্চলের ফসলের কথা উল্লেখ করা হয় সে অঞ্চলের ফসল নির্দিষ্ট করার জন্য নয়, বরং ফসলটি কেমন গুণাগুণের হবে তা নির্ধারণের জন্য, তাহলে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে । যেমন— নির্দিষ্ট একটি গ্রামের ফসলের কথা উল্লেখ করল, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের উদ্দেশ্য সে গ্রামে যে ধরনের ধান উৎপন্ন হয় সেই ধরনের ধান । মুসান্নিফ (র.) এখানে উদাহরণস্বরূপ বুখারার একটি অঞ্চল খুশমুরান এবং ফারাগানার একটি অঞ্চল বিসাখ-এর গমের কথা উল্লেখ করেছেন । কারণ, এ অঞ্চল দুটিতে উৎকৃষ্টমানের গম উৎপন্ন হতো । কাজেই উক্ত অঞ্চলের গম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে অঞ্চলে উৎপন্ন গমের মতো উৎকৃষ্টমানের গম । এ ক্ষেত্রে ‘বায় সলম’ জায়েজ হবে । কারণ, উক্ত অঞ্চলের গম নষ্ট হলেও তদ্রূপ গম সংগ্রহ করে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে ।



قَالَ : وَلَا يَصِحُّ السَّلَامُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحمہ) إِلَّا سَبْعَ شَرَائِطَ، جُنْسٌ مَعْلُومٌ،  
 كَقَوْلِنَا جَنْطَةً أَوْ شَعِيرٍ، وَنَوْعٌ مَعْلُومٌ، كَقَوْلِنَا سَقِيَّةً أَوْ بَخْسِيَّةً، وَصِفَةٌ مَعْلُومَةٌ،  
 كَقَوْلِنَا جَبِيدٌ أَوْ رِدْيٌ، وَمِقْدَارٌ مَعْلُومٌ، كَقَوْلِنَا كَذَا كَيْلًا بِمَكْيَالٍ مَعْرُوفٍ أَوْ كَذَا  
 وَزَنًا، وَأَجَلٌ مَعْلُومٌ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَيْنَا، وَالْفِقْهُ فِيهِ مَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সাতটি শর্ত না পাওয়া গেলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না- ১. নির্ধারিত 'নস' (جُنْس) বা শ্রেণী। যেমন- গম কিংবা যব। ২. নির্ধারিত প্রকার। যেমন- সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসল কিংবা বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত ফসল। ৩. নির্ধারিত গুণ। যেমন- উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট। ৪. নির্ধারিত পরিমাণ। যেমন- প্রচলিত কোনো মাপ পাত্রের এত পাত্র কিংবা ওজন হিসেবে এত পরিমাণ। ৫. নির্ধারিত মেয়াদ। এ শর্তগুলোর মূল দলিল হলো, আমাদের বর্ণিত হাদীস এবং এগুলো শর্ত হওয়ার হিকমত তাই, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَقِيَّةً -এর অর্থ হলো- এমন জমির ফসল যাতে সেচের মাধ্যমে পানি দেওয়া হয়েছে।

بَخْسِيَّةً অর্থৎ এমন জমির ফসল যাতে সেচের মাধ্যমে পানি দেওয়া হয়নি, বরং কেবল বৃষ্টির পানিতেই তাতে ফসল হয়েছে।

قَوْلُهُ نَالَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) 'বায় সলম'-এর ঐ সকল শর্তসমূহ উল্লেখ করছেন, যা চুক্তির সময় উল্লেখ করা অপরিহার্য। এক্ষণে শর্ত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সাতটি আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে পাঁচটি। উল্লেখ্য 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য এ ছাড়া আরো শর্ত রয়েছে, তবে সেগুলো অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদিত হওয়া আবশ্যিক, কিন্তু সেগুলো চুক্তির সময় উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়। সেগুলো অত্র পরিচ্ছেদে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে কেবল এমন শর্তসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলো চুক্তির সময় উল্লেখ করা অপরিহার্য। সাতটি শর্তের মধ্যে পাঁচটির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) একমত। আর অবশিষ্ট দুটি কেবল ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শর্ত, সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা শর্ত নয়।

যে পাঁচটি শর্তের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) একমত সেগুলো হচ্ছে-

১. দ্রব্যের নির্দিষ্ট শ্রেণী (جُنْس) উল্লেখ করা। যেমন- ধান, গম, যব ইত্যাদি।
২. দ্রব্যের নির্দিষ্ট প্রকার (نَوْع) উল্লেখ করা। যেমন- সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন গম বা শুষ্ক বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন গম কিংবা ইরি ধান বা বোরো ধান।
৩. গুণাগুণ নির্ধারণ করা। যেমন- উৎকৃষ্টমানের গম বা নিম্নমানের গম।
৪. পরিমাণ নির্ধারণ করা। যেমন- দশ কেজি বা দশ লিটার কিংবা অমুক পাত্রের দশ পাত্র। উপরিউক্ত চারটি শর্ত দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এবং মূলধন [রা'সুল মাল] উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫. মেয়াদ নির্ধারণ করা। যেমন বলল, আমি দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] আগামী পাঁচ মাস পর হস্তান্তর করব, বা আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে তা হস্তান্তর করব।

উক্ত পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করার পর মুসান্নিফ (র.) এ শর্তগুলোর দলিল বর্ণনা করেছেন তা হলো পূর্বে উল্লিখিত হুজুর ﷺ-এর হাদীস-“مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلَيْسَ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ” “তোমাদের কেউ যদি ‘বায় সলম’ করে, তাহলে সে যেন নির্দিষ্ট পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য এবং ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে তা করে।” এ হাদীসে দুটি শর্ত তথা পরিমাণ নির্ধারণ ও মেয়াদ নির্ধারণ-এর বিষয় স্পষ্টভাবে (نَصًّا) উল্লেখ আছে। আর অবশিষ্ট তিনটি শর্ত এ হাদীস থেকে বক্তব্যের উদ্দেশ্য বিচারের মাধ্যমে [السَّرُّ] হিসেবে প্রমাণিত হয়। তা এভাবে যে, হাদীসটির দিকে লক্ষ্য করলে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত দুটি শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চুক্তির বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা যাতে বিবাদের সম্ভবনা না থাকে। আর এভাবে সুনির্দিষ্ট করার জন্য অবশিষ্ট তিনটি শর্তও অপরিহার্য। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা উক্ত শর্ত তিনটিও প্রমাণিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَالْفَقْهُ فِيهِ مَا بَيَّنَّا : “এগুলো শর্ত হওয়ার হিকমত তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।” মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা উল্লিখিত পাঁচটি শর্তের আকলী দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব বিষয়ে অস্পষ্টতা বিবাদ সৃষ্টি করে, আর যা বিবাদ সৃষ্টি করে তা চুক্তি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলো শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِهِ، كَالْمِكْنِيلِ وَالْمَوَزُونِ  
وَالْمَعْدُودِ، وَتَسْمِيَةِ الْمَكَانِ الَّذِي يُوفِّيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمَوْنَةٌ، وَقَالَا لَا  
يَحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيَةِ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَلَا إِلَى مَكَانِ التَّسْلِيمِ، وَتَسْلِيمِهِ فِي  
مَوْضِعِ الْعَقْدِ، فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ، وَلَهُمَا فِي الْأَوَّلَى أَنْ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِالْإِشَارَةِ  
فَأَشْبَهَ الثَّمَنَ وَالْأَجْرَةَ، وَصَارَ كَالثَّوْبِ .

অনুবাদ : ৬. 'রা'সুল মাল' বা মূলধন যদি এমন হয় যার পরিমাণের সাথে চুক্তি সম্পর্কযুক্ত, তাহলে রা'সুল মালের পরিমাণ জানা। যেমন- পাত্র-পরিমাপিত বস্তু, ওজন-পরিমাপিত বস্তু অথবা গণনা প্রচলিত বস্তু। ৭. 'মুসলাম ফীহ' বা দানদনকৃত দ্রব্যটি যদি এমন হয় যে তা পরিবহন ও খরচ সাপেক্ষ, তাহলে যে স্থানে তা সমর্পণ করবে তা নির্ধারণ করা। সাহেবাইন (র.) বলেন, 'রা'সুল মাল' বা মূলধন যদি [ইশারার মাধ্যমে] নির্ধারিত হয়, তাহলে তার পরিমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। একরূপভাবে সমর্পণের স্থান উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বরং তা চুক্তি সম্পাদনের স্থানে সমর্পণ করবে। সুতরাং এখানে দুটি মাসআলা [যাতে সাহেবাইন ও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে]। প্রথম মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, এখানে যা [মূল] উদ্দেশ্য তা ইশারা দ্বারাই অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। [সুতরাং তার পরিমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।] এটা [ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] মূল্য এবং [ইজারার ক্ষেত্রে] ভাড়ার ন্যায় হলো এবং ['রা'সুল মাল' হিসেবে ইশারাকৃত] কাপড়ের ন্যায় হলো। [অর্থাৎ এই তিনটির ক্ষেত্রে যেমন শুধু ইশারাই যথেষ্ট হয়, এখানেও তদ্রূপ ইশারাই যথেষ্ট হবে।]

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ الْح : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) যে দুটি শর্তের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, তার আলোচনা করছেন। শর্ত দুটি বিস্তারিত উল্লেখের পূর্বে একটি ভূমিকা ভালভাবে বুঝতে হবে। তা হলো, বিক্রয়-দ্রব্য বা মূল্য-দ্রব্য দু'ধরনের বস্তু হতে পারে-

১. যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে। যথা- পাত্র-পরিমাপিত বস্তু, ওজন-পরিমাপিত বস্তু এবং গণনা-প্রচলিত বস্তু।
২. যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না। যথা- এমন কাপড় যা গজ হিসেবে বিক্রয় হয় না, বরং সম্পূর্ণ কাপড়টি একটি কাপড় হিসেবে বিক্রয় হয়। যেমন- শাড়ি কাপড়, চাদর ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের বস্তু যদি বিক্রয় করা হয়, তাহলে মূল্যের অংশসমূহ বিক্রীত-বস্তুর অংশসমূহের উপর বন্টিত হয়। ফলে যদি দশ কেজি বলে বিক্রয় করার পর মেপে দেখা যায় যে, তা নয় কেজি তাহলে নয় কেজির মূল্য পাবে- এক কেজির মূল্য কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু যদি বিক্রয় করা হয়, তাহলে তার মূল্যের অংশসমূহ বিক্রীত-বস্তুর অংশসমূহের উপর বন্টিত হয় না। ফলে যদি ১২ হাত শাড়ি বলে বিক্রয় করার পর ১১ হাত দেখা যায়, তাহলে মূল্যের অংশ কর্তন করা হবে না। [অবশ্য ক্রেতার চুক্তিটি বাতিল করার অধিকার থাকবে।]

উক্ত ভূমিকা উল্লেখের পর আমরা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে বিরোধপূর্ণ শর্ত দুটি আলোচনা করছি। প্রথমটি হলো, যদি মূলধন [রা'সুল মাল] প্রথম প্রকারের বস্তু হয় তথা এমন বস্তু হয় যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এক্ষণ মূলধন সম্মুখে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেও তার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে শুধু ইশারাই যথেষ্ট হবে তার পরিমাণ উল্লেখ করার আবশ্যিকতা থাকবে না।

আর দ্বিতীয় শর্তটি হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যদি দাননকৃত দ্রব্য [মুসলামা ফীহ] এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ, তাহলে তা কোন স্থানে হস্তান্তর করবে তা চুক্তির সময় উল্লেখ করতে হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে কোন স্থানে হস্তান্তর করবে তা উল্লেখ করা শর্ত নয়। যদি তারা তা নির্দিষ্ট না করে, তাহলে যে স্থানে চুক্তি করা হয়েছে সে স্থানেই দাননকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এ দুটি শর্তের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এবং একটি উক্তি (قَوْل) অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত সাহেবাইন (র.)-এর মতের অনুরূপ। কিন্তু হানাফীগণের নিকট ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া।

—[ফতোয়ায় শামী]

قَوْلُهُمَا تَانِ مَسَالَا: অর্থাৎ এখানে দুটি মাসআলা, যাতে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রথম মাসআলা হলো, মূলধন [রা'সুল মাল] যদি সম্মুখে ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যিক।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, দাননকৃত দ্রব্য [মুসলামা ফীহ] যদি এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা হস্তান্তর করার স্থান নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা আবশ্যিক নয়।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا فِي الْأُزْلَى الخ: প্রথম মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, মূলধন [রা'সুল মাল]-এর পরিমাণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, তা হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে যেন বিবাদ না হয়। সুতরাং যদি মূলধন [রা'সুল মাল] সম্মুখে থাকে এবং ইশারা করে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তার পরিমাণ উল্লেখ করার আবশ্যিকতা আর থাকছে না।

قَوْلُهُ فَاتَّبِعِ الشَّيْءَ وَالْأَجْرَةَ: সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের সমর্থনে তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে—

১. সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি মূল্য-দ্রব্যের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়। সুতরাং এখানেও তা আবশ্যিক হবে না।

২. ইজারার ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি নগদ ভাড়া-দ্রব্যের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়। যেমন বলল, 'আমি এ আমগোলের বিনিময়ে আপনার সাইকেলটি একদিনের জন্য ভাড়া নিলাম'-তাহলে সকলের ঐকমত্যে উক্ত ভাড়া-দ্রব্যের পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়। সুতরাং মূলধন [রা'সুল মাল]-এর ক্ষেত্রেও তা আবশ্যিক হবে না।

৩. মূলধন [রা'সুল মাল] যদি এমন কাপড় হয় যা গজ হিসেবে বিক্রয় হয় না; বরং সম্পূর্ণটি একটি কাপড় হিসেবে বিক্রয় হয় যেমন— শাড়ি, লুঙ্গি, জামা, চাদর ইত্যাদি তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়। সুতরাং উক্ত প্রকারের কাপড় ছাড়া অন্য দ্রব্য হলেও তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যিক হবে না।

কেননা, উল্লিখিত তিনটি নজিরেই উভয় ক্ষেত্রে কারণ বা ইন্দ্ভাত একই। তা হলো, ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়ার ফলে হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি হবে না। কাজেই বিধানও উভয় ক্ষেত্রে একই হবে।

وَلَهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يَجُودُ بَعْضُهَا زُؤُفًا وَلَا يَسْتَبْدِلُ فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ لَا يُدْرِي فِي كَمْ بَقِيَ، أَوْ رُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلِمِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِّقِ لِشَرْعِهِ مَعَ الْمَنَافِي، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ ثَوْبًا، لِأَنَّ الدَّرْعَ وَصَفُ فِيهِ لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِهِ، وَمِنْ قُرُوبِهِ إِذَا أَسْلَمَ فِي جَنْسَيْنِ وَلَمْ يَبَيِّنْ رَأْسَ مَالٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ أَسْلَمَ جَنْسَيْنِ وَلَمْ يَبَيِّنْ سِقْدَارَ أَحَدِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- কখনও এমন হতে পারে যে, 'রা'সুল মাল' বা মূলধনের কিছু অংশ অতিরিক্ত খাদযুক্ত বের হবে এবং তা সেই মজলিসে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে না। সুতরাং যদি তার পরিমাণ জানা না থাকে তাহলে জানা যাবে না যে, অবশিষ্ট কতটুকু অংশে 'বায় সলম' সঠিক থাকল। [কেননা, অতিরিক্ত খাদযুক্ত অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়ে গেছে।] আবার কখনও এমন হতে পারে যে, 'মুসলাম ইলাইহি' বা দানদ্রবীতা দানদ্রব্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো না, তখন তাকে মূলধন ফেরত দিতে হবে [যদি মূলধনের পরিমাণ জানা না থাকে, তাহলে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না]। আর এরূপ সম্ভাবনাময় বিষয়কে 'বায় সলম'-এর চুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তবের সমপর্যায়ের বিবেচনা করা হয়। কেননা, 'বায় সলম'-এর মধ্যে নিষিদ্ধতার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরিয়তে অনুমোদিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'রা'সুল মাল' বা মূলধন যদি কাপড় হয় [সে ক্ষেত্রে পরিমাণ উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। তার কারণ হলো,] গজের পরিমাণ কাপড়ের গুণগত বিষয়। এর পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না। উল্লেখ্য, এটা ঐ কাপড়ের কথা বলা হচ্ছে যা গজ হিসেবে বিক্রয় হয় না। যেমন- শাড়ি, লুঙ্গি। উক্ত মতবিরোধের উপর ভিত্তি করেই এ মাসআলা নির্গত হয়েছে যে, 'রাব্বুস সলম' বা দানদদাতা দুই শ্রেণীর দ্রব্যের ক্ষেত্রে মূলধন প্রদান করল, কিন্তু প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে মূলধন বর্ণনা করল না [তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা জায়েজ হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না।] কিংবা দুই শ্রেণীর মুদ্রা মূলধন হিসেবে প্রদান করল, কিন্তু দুটির মধ্য হতে একটির পরিমাণ উল্লেখ করল না [তাহলে এ ক্ষেত্রেও একই রকম মতপার্থক্য]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يَجُودُ بَعْضُهَا : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যদি মূলধন [রা'সুল মাল]-এর পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়, তাহলে দানদ্রব্য দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর পরিমাণ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়তে পারে। আর দানদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] অনির্দিষ্ট হলে সকলের ঐকমত্যে 'বায় সলম' সহীহ হবে না। মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা না হলে দানদ্রব্য দ্রব্যের পরিমাণ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়তে পারে এভাবে যে, দানদ্রবীতা [মুসলাম ইলাইহি] মূলধন হস্তগত করার পর তা সাধারণত একসাথে খরচ না করে ক্রমান্বয়ে খরচ করে। সুতরাং এমন হতে পারে যে, মূলধন থেকে কিছু পরিমাণ খরচ করার পর দেখা গেলে যে, মূলধনের কিছু অংশ ক্রটিযুক্ত। ফলে সে তা ফেরত দিবে। এমন মাসআলা হলো, ফেরত দেওয়ার সময় দানদদাতা যদি উক্ত ক্রটিযুক্ত মূলধনের পরিবর্তে ক্রটিহীন দ্রব্য মজলিসেই নগদ দানদ-এরীতার [মুসলাম ইলাইহি]-এর নিকট হস্তান্তর না করে, তাহলে উক্ত ক্রটিযুক্ত মূলধনের অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, যদি চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়ে থাকে বরং শুধু ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে মূলধনের ক্রটিযুক্ত অংশ বাদ দিয়ে

অবশিষ্ট কতটুকু অংশ দানমুহীতী খরচ করেছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। ফলে এটা নির্ধারণ করা যাবে না যে, কতটুকু অংশের 'বায় সলম' সঠিক রয়েছে আর কতটুকু অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়েছে। সুতরাং সঠিক অংশের দাননকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]—এর পরিমাণ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ল। অতএব দাননকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]—এর পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখার জন্য চুক্তির সময় মূলধন [রা'সুল মাল]—এর পরিমাণ উল্লেখ করাও আবশ্যিক।

অথবা এমন হতে পারে যে, দানমুহীতী মূলধন খরচ করার পর 'বায় সলম'—এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দাননকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করতে সক্ষম হলো না। তাহলে দাননদাতাকে তার মূলধন ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং যদি চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়ে থাকে, তাহলে মূলধন ফিরিয়ে দিতে জটিলতা সৃষ্টি হবে। কাজেই চুক্তির সময় মূলধন [রা'সুল মাল]—এর পরিমাণ উল্লেখ করা অপরিহার্য হবে।

قَوْلُهُ وَالتَّزْوِجُ مِنْ هَذَا الْعَقْدِ الخ: এখানে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)—এর উপরিউক্ত দলিলের উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.)—এর পক্ষ থেকে যে সকল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হলো যেমন—মূলধনের কিছু অংশ খরচ করার পর কিছু অংশ ক্রটিমুক্ত দেখা যেতে পারে আবার তা ফেরত দেওয়ার সময় মজলিসেই তার পরিবর্তে অন্য দ্রব্য হস্তান্তর না করতে পারে, এ সকল বিষয় সাধারণত হয় না। বরং এগুলো কেবল সম্ভাবনাময় ধারণা, যা ধর্তব্য হয় না। কেননা, শরিয়তের বিধিবিধান সাধারণত যা ঘটে তার উপর নির্ভরশীল হয়।

মুসান্নিফ (র.)—এর জবাব দিচ্ছেন যে, এগুলো যদিও ধারণাকৃত বিষয় তবুও 'বায় সলম'—এর ক্ষেত্রে এগুলো বাস্তব বিষয়ের মতোই ধর্তব্য হবে। কেননা, শরিয়তে 'বায় সলম' নাজায়েজ হওয়ার কারণ [অর্থাৎ 'দ্রব্য অস্তিত্বে আসার পূর্বেই তা বিক্রয় করা' এ কারণ] থাকা সত্ত্বেও তা বৈধ করা হয়েছে। আর এরূপ বৈধ বিষয়কে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে এক পক্ষের প্রতারিত হওয়া বা ঠক হওয়ার ধারণাও তাতে প্রভাব ফেলে। সুতরাং উল্লিখিত সম্ভাবনাময় বিষয়গুলো ধর্তব্য হবে এবং তার কারণে 'বায় সলম' নাজায়েজ হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)—এর পক্ষে নকলী দলিল হলো, এ মতটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আর ফকীহ সাহাবীর অভিমত কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার পায়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইনের পক্ষ থেকে উল্লিখিত কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইনের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিনটি নজিরের কেবল শেষোক্ত নজিরের জবাব উল্লেখ করেছেন। জবাবের সারকথা হলো, মূলধন [রা'সুল মাল] কাপড় হওয়া [যা গজ হিসেবে বিক্রয় করা হয় না] এবং মূলধন অন্য দ্রব্য হওয়া এ উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এগুলোর একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা সঠিক হবে না। পার্থক্য হলো এই যে, কাপড় বা পোশাক যা গজ হিসেবে মেপে বিক্রয় করা হয় না, তার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না; বরং তাতে গজের পরিমাণ তার গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই কেউ যদি একটি শাড়ি বা চাদর ১০ হাত বলে বিক্রয় করে অতঃপর ক্রেতা তা ১১ হাত পায়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। আর যদি ৯ হাত পায়, তাহলে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম দিতে পারবে না। [অবশ্য বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে।] কাজেই এরূপ কাপড়ের পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে অন্য দ্রব্য যেমন—ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য, পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য এগুলোর পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে। কাজেই তার পরিমাণ উল্লেখ করা অপরিহার্য। সুতরাং একটির কিয়াস অপরটির উপর সঠিক হবে না।

قَوْلُهُ وَمِنْ فُرُوعِهِ إِذَا أَسْلَمَ الخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.)—এর মাঝে মতভিন্নতা সম্পূর্ণ উপরিউক্ত মূল মাসআলার উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত দুটি মাসআলা নির্ণত হয়েছে—

১. কেউ দু প্রকারের দ্রব্য [যেমন—এক মণ গম ও এক মণ ধান]—এর জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] নির্ধারণ করল এবং তার পরিমাণও উল্লেখ করল [যেমন বলল, ছয় শত টাকা] কিন্তু প্রত্যেক প্রকার দ্রব্যের জন্য কতটুকু মূলধন তা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করল না, তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র.)—এর মতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)—এর মতে জায়েজ হবে।
২. কেউ 'বায় সলম' হিসেবে কোন দ্রব্য ক্রয়ের জন্য দু প্রকারের দ্রব্য মূলধন [রা'সুল মাল] নির্ধারণ করল। যেমন বলল, আমি এক মণ গমের জন্য এ দিরহামগুলোর এবং এ দিনারগুলোর প্রদান করব। কিন্তু সে এ দু প্রকারের মূলধনের এক প্রকারের পরিমাণ উল্লেখ করছে, আর অপর প্রকারের দিকে গুণ ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছে তার পরিমাণ উল্লেখ করবনি, তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র.)—এর মতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)—এর মতে তা জায়েজ হবে। কারণ, এ দুটি মাসআলায়ও পূর্বে উল্লিখিত "দাননকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা" বিদ্যমান।

وَلَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ أَنْ مَكَانَ الْعَقْدِ يَتَعَيَّنُ لَوْجُودِ الْعَقْدِ الْمَوْجِبِ لِلتَّسْلِيمِ فِيهِ،  
وَلَأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ مَكَانٌ آخَرُ فِيهِ فَيَصِيرُ نَظِيرُ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَوَامِرِ، وَصَارَ  
كَالْقَرْضِ وَالْغَضَبِ، وَلَا يَبْنَى حَنِيفَةً (رح) أَنَّ التَّسْلِيمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْحَالِ،  
فَلَا يَتَعَيَّنُ بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَالْغَضَبِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَالْجَهَالَةُ فِيهِ تَقْضِي إِلَى  
الْمَنَازَعَةِ، لِأَنَّ قِيمَ الْأَشْيَاءِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ، وَصَارَ  
كَجَهَالَةِ الصِّفَةِ.

অনুবাদ : দ্বিতীয় মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তির স্থানটিই [দ্রব্য সমর্পণের জন্য] নির্ধারিত হয়ে  
যাবে। যেহেতু সমর্পণ ওয়াজিবকারী চুক্তি সেখানেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাছাড়া অন্য কোনো স্থান সমর্পণের  
ব্যাপারে চুক্তির স্থানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে না। সুতরাং এটা শরিয়তের আদেশাবলির ক্ষেত্রে তা পালনের  
সম্ভাবনার সময়গুলোর প্রথম অংশের ন্যায় হবে। [অর্থাৎ প্রথম অংশের সাথে কোনো অংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায়  
ওয়াজিব হওয়ার 'সবব' বা কারণ হিসেবে প্রথম অংশই স্যাব্যস্ত হয়।] আর এটা 'কর্জ' ও 'গসব'-এর মতো হবে  
[কেননা, কর্জ ও গসবের ক্ষেত্রে তা সংঘটিত হওয়ার স্থানেই সমর্পণ করতে হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল  
হলো, [মুসলাম ফীহ চুক্তির সময়] তাৎক্ষণিকভাবে সমর্পণ করা ওয়াজিব হচ্ছে না। সুতরাং চুক্তির স্থানটি [সমর্পণের  
জন্য] নির্ধারিত হবে না। পক্ষান্তরে কর্জ ও গসব এর ব্যতিক্রম [কেননা, তা তাৎক্ষণিকভাবে সমর্পণ করা ওয়াজিব  
হয়]। সুতরাং চুক্তির স্থানটি যখন নির্ধারিত হলো না, তখন স্থান সম্পর্কে অস্পষ্টতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। কেননা,  
স্থানের ভিন্নতার ফলে বস্তুসমূহের মূল্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব, স্থান বর্ণনা করে দেওয়া অপরিহার্য। আর এটা  
গুণাগুণ সম্পর্কে অস্পষ্টতার মতোই হলো।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ الْخ: দ্বিতীয় মাসআলায় অর্থাৎ 'দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য  
নয়' এ ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, কোনো স্থানের কথা উল্লেখ না করা হলে চুক্তি করার স্থানটি হস্তান্তরের জন্য  
নির্ধারিত হয়ে যাবে। কেননা, চুক্তিটিই দাদনদাতার উপর দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করা ওয়াজিব করেছে। সুতরাং হস্তান্তর  
ওয়াজিব হওয়ার কারণটি যে স্থানে সংঘটিত হয়েছে, কোনো স্থান উল্লেখ করা না হলে সে স্থানটিই হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত  
হয়ে যাবে। আর যখন চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হলো, তখন 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করার  
অপরিহার্যতা থাকল না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তরের জন্য স্থানের প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে সকল স্থান সমান। কোনো স্থানকে  
অধাধিকার দেওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু চুক্তির স্থানটিকে অধাধিকার দেওয়ার কারণ পাওয়া যাচ্ছে। আর তা  
হলো সেখানে চুক্তিটি সংঘটিত হওয়া। কাজেই অন্য কোনো স্থান চুক্তি সংঘটিত হওয়ার স্থানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা  
করেছে না। পক্ষান্তরে অন্য স্থানগুলো একটি অপরটির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সুতরাং চুক্তির স্থানটিই হস্তান্তরের জন্য  
নির্ধারিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَيَسِيرُ بِهِمْ أَوْ أَتَاتِ الْأَمَّكَانَ الخ: যেমন- শরীয়তের নির্দেশাবলি, জোহরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য সَبِّ [কারণ] হিসেবে নির্ধারণ করা হয় জোহরের সময়ের প্রথম অংশকে। কেননা, প্রথম অংশ যখন শুরু হয় তখন পরবর্তী অংশগুলো না থাকার কারণে প্রথম অংশের কোনো প্রতিদ্বন্দী থাকছে না, কাজেই সময়ের প্রথম অংশই জোহরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য সَبِّ [কারণ] হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। [অবশ্য এটি ইমাম কারখী (র.)-এর মতানুসারে। কারো কারো অন্য অভিমতও রয়েছে।] সুতরাং দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করার জন্য চুক্তির স্থানটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। কেননা, সে স্থানটির কোনো প্রতিদ্বন্দী নেই।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ الخ: সাহেবাইন (র.)-এর কiyাসের স্বপক্ষে দুটি উপমা পেশ করেছেন-

১. কেউ যদি কারো নিকট হতে ঋণ (قَرْض) গ্রহণ করে আর তা পরিশোধের স্থান নির্ধারণ না করে, তাহলে ঋণ গ্রহণের স্থানটিই তা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যায়।  
২. কেউ যদি কারো কোনো বস্তু غَصْب [আত্মসাৎ বা অন্যায় দখল] করে, তাহলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার স্থান নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে যে স্থান থেকে সে তা 'গসব' করেছে সে স্থানটিই তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করার জন্য চুক্তির স্থানটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ حِينَئِذٍ (رحم) أَنَّ التَّسْلِيمَ غَيْرُ وَاجِبِ الخ: ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করা চুক্তির সময় তৎক্ষণাৎ (فِي الْحَالِ) দাদনগ্রহীতার উপর ওয়াজিব নয়; বরং তা মেয়াদ শেষাভ্যন্তে তার উপর হস্তান্তর করা ওয়াজিব। কাজেই চুক্তির স্থানটি তা হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হবে না। যদি তৎক্ষণাৎ (فِي الْحَالِ) তা হস্তান্তর করা ওয়াজিব হতো, তাহলে সে স্থানটি নির্ধারিত হতো।

قَوْلُهُ يَخْلَافُ الْقَرْضُ وَالْغَصْبُ الخ: পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) কiyাস হিসেবে যে 'কর্জ' এবং 'গসব'-এর উপমা পেশ করেছেন তা যথার্থ হয়নি। কারণ, 'কর্জ' বা ঋণ পরিশোধ করা ঋণ গ্রহীতার উপর সাথে সাথে (فِي الْحَالِ) ওয়াজিব হয়। এ কারণেই যদি ঋণ পরিশোধের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তা ঋণদাতার জন্য রক্ষা করা অপরিহার্য হয় না; বরং সে ঋণ দেওয়ার পরপরই তা চাইতে পারে। সুতরাং যখন ঋণ গ্রহণের পর তা সাথে সাথেই পরিশোধ করা ওয়াজিব হয় তাই ঋণ গ্রহণের স্থানটি তা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত হয়।

অনুরূপভাবে 'গসব' বা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রেও গসবকৃত বস্তু গসব করার পর সাথে সাথেই তা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়। তাই গসবের স্থানটিই গসবকৃত বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় দাদনকৃত দ্রব্য সাথে সাথে হস্তান্তর করা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হবে না। আর যখন চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হলো না তখন এই হস্তান্তরের স্থান অনির্দিষ্ট থাকা বিবাদ সৃষ্টি করবে। কেননা, দ্রব্যের মূল্য স্থানভেদে কমবেশি হয়ে থাকে। কাজেই দাদনদাতা চাইবে এমন স্থানে তা গ্রহণ করতে যেখানে তার মূল্য বেশি হয় এবং বহন করে নিতে খরচ লাগে, আর দাদনগ্রহীতা চাইবে এমন স্থানে হস্তান্তর করতে যেখানে তার মূল্য কম হয় এবং বহন করার খরচ লাগে না। অতএব, হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করা অপরিহার্য হবে।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا هِيَ الصَّفَةُ الخ: হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ না করার বিষয়টি দাদনকৃত দ্রব্য বা মূলধনের গুণাগুণ উল্লেখ না করার মতোই হলো। অর্থাৎ দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] কিংবা মূলধন [রা'সুল মাল]-এর গুণাগুণ যদি অস্পষ্ট থাকে, তাহলে যেমন বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে 'বায় সলম' সहीহ হয় না, তদ্রূপ হস্তান্তরের স্থান অস্পষ্ট থাকলেও বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) সাহেবাইনের অভিমতের দুর্বলতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা বদুন তো "যদি তারা উভয়ে চলন্ত নৌকায় বসে 'বায় সলম'-এর চুক্তি করে, তাহলে কি যে স্থানে থাকা অবস্থায় চুক্তিটি হয়েছে সে স্থান হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে?" অর্থাৎ এটা তো কোনো জ্ঞানী বলবে না।



وَعَنْ هَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَشَايِخِ : إِنَّ الْأَخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَهُ يُوجِبُ التَّحَالَفَ كَمَا فِي الصِّفَةِ، وَقِيلَ : عَلَى عَكْسِهِ، لِأَنَّ تَعَيَّنَ الْمَكَانِ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ عِنْدَهُمَا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الثَّمَنُ وَالْأَجْرَةُ وَالْقِسْمَةُ، وَصُورَتُهَا إِذَا اقْتَسَمَا دَارًا وَجَعَلَا مَعَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا شَيْئًا لَهُ حَمْلٌ مُؤْتَةً، وَقِيلَ : لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا، وَهُوَ اخْتِيارُ شَمْسِ الْأَيَّامَةِ السَّرْحَسِيِّ (رح) وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الدَّارِ وَمَكَانُ تَسْلِيمِ الدَّابَّةِ لِلْإِيْقَاءِ .

অনুবাদ : আর এ কারণেই কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন যে, স্থান [কোনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল সে] সম্পর্কে চুক্তিকারীদ্বয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পরস্পরের শপথ গ্রহণকে অনিবার্য করবে। যেমন- গুণাগুণ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিলে [শপথ গ্রহণ অনিবার্য হয়]। আর কেউ কেউ বলেছেন; বরং এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীত। [অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শপথ গ্রহণ অনিবার্য নয়; আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা অনিবার্য]। কেননা, সাহেবাইন (র.)-এর মতে, চুক্তির স্বাভাবিক দাবিতেই চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাবে। মূল্য, ভাড়া ও বাটোয়ারার ক্ষেত্রেও ঠিক একই মতবিরোধ। [অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এগুলো হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করতে হবে, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে চুক্তির স্থান-ই নির্ধারিত হয়ে যাবে।] বাটোয়ারার সুরত হলো, দুই ব্যক্তি তাদের শরিকানা বাড়ি বাটোয়ারা করল এবং একজনের ভাগে এমন কোনো বস্তু নির্ধারণ করল যা পরিবহন ও খরচসাপেক্ষ। কেউ কেউ বলেছেন, মূল্যের ক্ষেত্রে [সকলের মতেই] স্থান নির্ধারণ করা শর্ত নয়। তবে বিতৃষ্ণ অভিমত হলো, মূল্য যদি মেয়াদি হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে স্থান নির্ধারণ শর্ত হবে। শামসুল আইনুহ সা রাখসী (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে বাটোয়ারার ক্ষেত্রে উক্ত বস্তু হস্তান্তরের জন্য যে বাড়ি বাটোয়ারা করা হয়েছে সে স্থানটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর ভাড়ার ক্ষেত্রে যে স্থানে বাহন জন্তু হস্তান্তর করা হয়েছে সে স্থানটিই ভাড়া পরিশোধের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خَالَفَ هَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَشَايِخِ (র.) বলেন, যেহেতু হস্তান্তরের স্থানের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা গুণাগুণের অস্পষ্টতার মতো [অর্থাৎ যেমনিভাবে দ্রব্যের গুণাগুণের পার্থক্যের কারণে তার মূল্যের মাঝেও পার্থক্য তদ্রূপ স্থানের পার্থক্যের কারণেও মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়] সেহেতু কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন যে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে যদি দানদাতা ও দানগ্রহীতার মাঝে দানকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করার জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, [একজন বলে অমুক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল আর অপরজন বলে, না; বরং অমুক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল] আর কারো স্বপক্ষে সাক্ষী না থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তাদের উভয়ের উপর তা কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে। যদি একজন কসম খেয়ে বলতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তার বিপক্ষে ক্ষয়সালা হয়ে যাবে। আর যদি দুজনই

কসম খেয়ে বলে, তাহলে চুক্তিটি রহিত (نَسَخَ) করে দেওয়া হবে। যেমনিভাবে কিরূপ গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নিয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে উভয়ের উপর কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হয়, তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে না।

আর কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ উপরে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার বিপরীত। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তাদের উপর কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে না; বরং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তাদের উপর কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে। [ইমাম কুদুরী, ঈযাহ এস্তের প্রণেতা ও 'কিফায়াহ' গ্রন্থের প্রণেতাগণ মতবিরোধটি এভাবেই উল্লেখ করেছেন।]

কারণ, সাহেবাইন (র.)-এর মতে চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাওয়া চুক্তির সত্তাগত দাবি (مُنْتَضَى الْعَقْد)। সুতরাং তাতে মতবিরোধ দেখা দেওয়া স্বয়ং চুক্তির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার মতো। আর চুক্তির মাঝে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সকলের একমততা উভয়ের উপর কসম ওয়াজিব হয়। অতএব, স্থান নিয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয়ের উপর কসম ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যেহেতু চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাওয়া চুক্তির সত্তাগত দাবি (مُنْتَضَى الْعَقْد) নয়, তাই এটা মেয়াদের ক্ষেত্রে মতবিরোধের ন্যায়। আর মেয়াদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে কসম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করার স্থান সম্পর্কে মতবিরোধের ক্ষেত্রেও কসম ওয়াজিব হবে না; বরং যার উপর হস্তান্তর করা ওয়াজিব অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ وَكَفَى هَذَا الْخَلَاءِ التَّمَنُّ وَالْأَجْرَةَ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে উপরে যে মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এ তিনটি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-১. মূল্য ২. ভাড়া ৩. বন্টন। এগুলোর সুরতে মাসআলা হলো নিম্নরূপ-

১. কেউ কোনো নগদ দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করল, আর মূল্য নির্ধারণ করল এরূপ বস্তু যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ। তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত মূল্য পরিশোধ করার স্থান উল্লেখ করা অপরিহার্য। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে স্থান উল্লেখ করা অপরিহার্য নয়; বরং স্থান উল্লেখ না করলে যে স্থানে চুক্তি হয়েছে সে স্থানেই উক্ত মূল্য পরিশোধ করবে।
২. কেউ কোনো বাড়ি বাকিতে ইজারা [ভাড়া] নিল, আর ভাড়া নির্ধারণ করল এমন বস্তু, যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ [যেমন- দশ মণ গম]। তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ভাড়া-দ্রব্য পরিশোধের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। নতুবা ইজারা সহীহ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে স্থান নির্ধারণ না করলেও সহীহ হবে। যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছে সেই বাড়িতে ভাড়া পরিশোধ করবে। আর যদি এভাবে কোনো বাহন জন্তু ভাড়া নেয়, তাহলে বাহন জন্তুটি যে স্থানে হস্তগত করেছে সে স্থানেই ভাড়া-দ্রব্য পরিশোধ করতে হবে।
৩. কেউ তার অপর অংশীদারের সাথে বাড়ি বন্টন করল, বন্টনের ক্ষেত্রে একজন অংশীদার কিছু অংশ বেশি নিয়ে তার বিনিময়ে সে মেয়াদের ভিত্তিতে এমন বস্তু দেওয়ার কথা বলল, যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ। তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত বস্তু হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক হবে। অন্যথায় বন্টন-চুক্তি সহীহ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সহীহ হবে এবং বন্টনের স্থানে তা পরিশোধ করবে।

قَوْلُهُ وَيَنْبَغُ لَا يَسْتَحْتَطُّ ذَلِكَ: কোনো কোনো মাশায়েখ উল্লেখ করেছেন যে, উপরে বর্ণিত মাসআলাগুলোর মধ্যে হতে প্রথমটিতে তথা বাকি মূল্যের সুরতটিতে মতবিরোধ নেই; বরং সকলের একমততা উক্ত মূল্য পরিশোধের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। কিন্তু মুসান্নিফ (র.) বলেন, সহীহ হলো মূল্য বাকি হলে সে ক্ষেত্রেও স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। আল্লামা সারাখসী (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত তিনটি মাসআলায়ই ফতোয়া ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতের উপর।

قَالَ: وَمَا لَكُمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمَوْتُهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى بَيَانٍ مَكَانِ الْإِنْفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ، وَيُوفِّيهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَهَذِهِ رَوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَذَكَرَ فِي الْأَجَارَاتِ أَنَّهُ يُوفِّيهِ فِي أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كُلَّهَا سَوَاءٌ وَلَا وَجُوبَ فِي الْحَالِ، وَلَوْ عَيْنًا مَكَانًا قِيلَ: لَا يَتَعَيَّنُ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ، وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ، لِأَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ، وَلَوْ عَيْنَ الْمَصْرَ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ وَمَوْتُهُ يَكْتَفِي بِهِ، لِأَنَّهُ مَعَ تَبَايُنِ أَطْرَافِهِ كَبْقَعَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا ذَكَرْنَا.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর যে সকল বস্তু পরিবহন ও খরচসাপেক্ষ নয়, সকলের ঐকমত্যে তা সমর্পণের জন্য স্থান নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, [স্থানভেদে] তার মূল্য বিভিন্ন হয় না। এ ক্ষেত্রে তা সেই স্থানে সমর্পণ করবে যেখানে 'বায় সলম' করেছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটা হলো জামিউম সাগীর এবং [মাবসূতের] বিক্রয় অধ্যায়ের বর্ণনা। পক্ষান্তরে [মাবসূতের] ইজারা অধ্যায়ে [ইমাম মুহাম্মদ] উল্লেখ করেছেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তা হস্তান্তর করবে। আর এটিই বিতর্কিত অতিমত। কেননা, [এ ক্ষেত্রে] সকল স্থানই সমান। কেননা, [চুক্তির সময়] তৎক্ষণাৎ সমর্পণ ওয়াজিব হচ্ছে না [তাহলে সে স্থান নির্ধারিত হতো]। আর যদি উভয়ে কোনো একটি স্থান নির্ধারণ করে, তাহলে কারো কারো মতে তা নির্ধারিত হবে না। কেননা, এ নির্ধারণ কোনো ফায়দা বয়ে আনে না। আর কারো মতে, নির্ধারিত হবে। কেননা, তা পথকে ঝুঁকিমুক্তকরণের ফায়দা বয়ে আনে। আর যে সকল বস্তুর বহন সমস্যা ও পরিবহন খরচ রয়েছে সে ক্ষেত্রে যদি কোনো শহর নির্ধারণ করে, তবে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, শহরের সীমানা বিস্তৃত হলেও আমাদের উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় তা একই স্থানের ন্যায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْحَمْلُ: যদি দানকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ নয়, যেমন- অল্প পরিমাণ মেশক, কর্পূর বা জাফরান, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা হস্তান্তরের স্থান চুক্তির সময় উল্লেখ করা অপরিহার্য নয়। কেননা, স্থানের পার্থক্যের কারণে এরূপ দ্রব্যের মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয় না। [এগুলোর ক্ষেত্রে যে মূল্যের পার্থক্য দেখা যায় তা স্থানের পার্থক্যের কারণে নয়; বরং তার বিদ্যমানের স্বল্পতা ও আধিক্য এবং তার প্রতি মানুষের আস্থা কম বা বেশি হওয়ার কারণে হয়]। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সকল স্থান সমান। তাই সকলের ঐকমত্যে হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। তবে কোন স্থানে তা হস্তান্তর করবে সে ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে-

১. জামিউস সাগীর এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থের ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে (بَابُ الْبَيْعِ)-এর বর্ণনা হলো, যে স্থানে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেখানেই তা হস্তান্তর করবে। কেননা, হস্তান্তর করা সে স্থানেই তার উপর অপরিহার্য হয়েছিল, সুতরাং অন্যান্য স্থানের উপর সে স্থানটি অধাধিকার পাবে।

২. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থের “ইজারা অধ্যায়” (كِتَابُ الْإِجَارَةِ)-এর বর্ণনা হলো, চুক্তির স্থানটি এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়: বরং যে-কোনো স্থানেই তা হস্তান্তর করতে পারবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাবসূত গ্রন্থের “ইজারা অধ্যায়”-এর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটিই অধিক সঠিক। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তির সময় তার উপর সাথে সাথে (فِي الْحَالِ) হস্তান্তর করা ওয়াজিব হয়নি এবং উল্লিখিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমস্ত স্থান সমান। কেননা, তা বহন করতে খরচ ও কষ্ট নেই, ফলে স্থানের পার্থক্যের কারণে তার মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয় না। সুতরাং চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হবে না। অতএব, যে-কোনো স্থানে তা হস্তান্তর করতে পারবে।

উল্লেখ্য, আদ্বামা শামী ফতোয়ায় শামীতে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লিখিত দুটি বর্ণনার প্রথম বর্ণনাকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে কামাল এবং তিনি তা ‘মুহীতে সারাক্ষসী’ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরূপভাবে আল-বাহরুর রায়েক’ গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং ফাতহুল কাদীরে আদ্বামা ইবনুল হুমাম (র.) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ মাবসূতের ইজারা অধ্যায়ের বর্ণনাটিই সকল ‘মুতুন’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং হিদায়া এবং ‘মুলতাকা’ গ্রন্থে এটিকেই সঠিক বলে অভিমত পেশ করা হয়েছে। -[ফতোয়ায় শামী, খণ্ড-৭, পৃ. ৪৬৪]

تَوَلَّوْهُ وَلَوْ عَيْنًا مَكَانَ الْخ: উল্লিখিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি উভয়ে হস্তান্তরের জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করে, তাহলে সে স্থানটি কি নির্ধারিত হবে নাকি যে কোনো স্থানে তা হস্তান্তর করতে পারবে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে সে স্থানটি নির্ধারিত হবে না। কেননা, যে দ্রব্য বহন করতে কষ্ট বা অর্থ খরচ হয় না তা হস্তান্তরের জন্য স্থান নির্ধারণ করায় কোনো লাভ নেই। আর যা শর্ত করায় কোনো লাভ নেই তা শর্ত করা সहीহ নয়। সুতরাং হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করলেও তা নির্ধারিত হবে না।

আর অপর বর্ণনা মতে যদি তারা কোনো স্থান নির্ধারণ করে, তাহলে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং সে স্থানেই তা হস্তান্তর করতে হবে। কেননা, যদিও উক্ত দ্রব্য বহন করতে কষ্ট বা অর্থ-খরচ হয় না তবুও স্থান নির্ধারণ করায় পথিমধ্যে উক্ত দ্রব্য নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকার লাভ এবং স্বার্থকতা রয়েছে। কেননা, যদি কোনো স্থান নির্ধারিত থাকে আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাহি] তা অন্য স্থানে দাদনদাতাকে হস্তান্তর করে, তাহলে দাদনগ্রহীতার জন্য আবশ্যক হবে তা উক্ত নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর পথিমধ্যে যদি তা কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি স্থান নির্ধারিত না থাকে আর দাদনগ্রহীতার কোনো স্থানে হস্তান্তর করার পর তা বহন করে কোনো স্থানে পৌঁছিয়ে দিতে যায় এবং পথিমধ্যে তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা দাদনদাতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। কাজেই এভাবে দাদনদাতা কোনো স্থান নির্ধারণ করে পথের ঝুঁকি দাদনগ্রহীতার উপর দিতে পারে। ফলে স্থান নির্ধারণ করায় তার লাভ হবে। অতএব, তারা স্থান নির্ধারণ করলে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এ দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ স্থান নির্ধারণ করলে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে- এ বর্ণনাটিকে আদ্বামা ইবনে হুমাম (র.) অধিক বিতর্ক বলে বর্ণনা করেছেন এবং দূররে মুখতার গ্রন্থেও এটিকে অধিক বিতর্ক বলা হয়েছে। সুতরাং এর উপরই ফতোয়া হবে। -[ফতোয়ায় শামী, ফাতহুল কাদীর]

تَوَلَّوْهُ وَلَوْ عَيْنَ الْمَضَرَّعِ: পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যে সকল দ্রব্য বহন করা কষ্টসাধ্য এবং খরচসাপেক্ষ সে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। তবে এ ক্ষেত্রে যদি কোনো শহর নির্দিষ্ট করে তাহলেই যথেষ্ট হবে, শহরের কোনো মহল্লা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক হবে না। কেননা, যদিও শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দূরে হয়ে থাকে তবুও আমাদের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের দিক থেকে অর্থাৎ স্থানের ব্যবধানের কারণে মূল্যের পার্থক্য না হওয়ার দিক থেকে একটি শহরের সকল স্থান একটি স্থানের মতো। কাজেই যে কোনো স্থানে তা হস্তান্তর করতে পারবে। উল্লেখ্য, ‘মুহীত’, ফাতহুল কাদীর ও আল-বাহরুর রায়িক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত বিধান কেবল এরূপ শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব এক ফারসাখ [প্রায় ৮ কিলোমিটার] না হয়। আর যদি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব এক ফারসাখ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার নির্দিষ্ট স্থান বা মহল্লা উল্লেখ করা অপরিহার্য। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। ‘নাহর’ গ্রন্থে এটিকেই সঠিক বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

قَالَ : وَلَا يَصُحُّ السَّلَامُ حَتَّى يُقْبَضَ رَأْسُ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يَفَارِقَهُ فِيهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ التَّقْوَدِ فَلِأَنَّهُ إِفْتِرَاقٌ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَلِأَنَّ السَّلَامَ أَخَذُ عَاجِلٍ بِأَجَلٍ، إِذَا الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ يُنْبِئَانِ عَنِ التَّعْجِيلِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِ الْعُرْضَيْنِ، لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْإِسْمِ، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ، لِيَتَقَلَّبَ الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ فِيهِ، فَيَقْدِرَ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: لَا يَصُحُّ السَّلَامُ إِذَا كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ مَا يَنْعَا مِنَ الْإِنْعِقَادِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ، وَكَذَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرَّوْيَةِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ، وَلَوْ اسْقَطَ خِيَارَ الشَّرْطِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ وَرَأْسُ الْمَالِ قَائِمٌ جَازٍ خِلَافًا لِرَفَرٍ (رح) وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মজলিসে একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মূলধন হস্তগত না করা পর্যন্ত 'বায় সলম' সহীহ হবে না। কেননা, মূলধন যদি মুদ্রা [দিরহাম-দিনার] হয়, তাহলে এটা হবে 'দাইনের বিনিময় দাইনের' চুক্তি করে পৃথক হওয়া। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকি বস্তুর বিনিময় বাকি বস্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর মূলধন যদি [মুদ্রা না হয়ে] নির্দিষ্ট বস্তু হয়, তাহলে [নাজায়েজ হওয়ার] কারণ হলো, 'সলম' হলো বাকির বিনিময়ে নগদ গ্রহণ করা। কেননা, 'সলম' থেকে নিষ্পন্ন আর। 'আবু' এবং 'আল-আসলাম' শব্দ দুটি দ্রুত করার অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং শব্দের অর্থ প্রতিফলিত হওয়ার জন্য দুটি বিনিময়ের একটি নগদ গ্রহণ করা অপরিহার্য। আরেকটি কারণ হলো, মূলধন নগদ সমর্পণ করা জরুরি যাতে 'মুসলাম ইলাইহি' [দাদনগ্রহীতা] তা কাজে লাগিয়ে 'মুসলাম ফীহ' [দাদন দ্রব্য] সংগ্রহ করে সমর্পণ করতে পারে। এ কারণেই আমরা বলেছি, যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের উভয়ের পক্ষে কিংবা তাদের কোনো একজনের পক্ষে ইচ্ছাধিকারের শর্ত [খিয়ারে শর্ত] আরোপিত হয়, তাহলে 'বায় সলম' সহীহ হবে না। কেননা, ইচ্ছাধিকারের শর্ত কজা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কারণ, তা হুকুম তথা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। এক্রপভাবে তাতে দেখার ইচ্ছাধিকারও সাব্যস্ত হয় না। কেননা, তা কোনো লাভ বয়ে আনে না। কিন্তু দোষজনিত ইচ্ছাধিকার তার ব্যতিক্রম। কেননা, তা কজা পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। আর পৃথক হওয়ার পূর্বেই যদি মূলধন বিদ্যমান থাকে অবস্থায় ইচ্ছাধিকারের শর্ত বাতিল করে দেয়, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এক্রপ মাসআলা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الح: 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, চুক্তিকারীদ্বয় একে অপরের থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করা। সুতরাং যদি দাদনগ্রহীতা মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বেই একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে 'বায় সলম' সহীহ হবে না। [উল্লেখ্য, এটি 'বায় সলম'-এর চুক্তি সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত নয়; বরং চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর তা সহীহ হিসেবে বহাল থাকার জন্য শর্ত।]

এ শর্তটির দলিল হলো, মূলধন [রা'সুল মাল] দু'ধরনের বস্তু হতে পারে—

১. মূলদ্রব্য (الْمُؤَدَّ) যেমন— বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা-পয়সা।

২. মূলদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য বস্তু (الْعَيْنُ) যেমন— ধান, গম বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য।

যদি প্রথম প্রকার বস্তু অর্থাৎ বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা কিংবা টাকা-পয়সা মূলধন [রা'সুল মাল] হয়, তাহলে তা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হলে 'বায় সলম' জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, মূলদ্রব্য (الْمُؤَدَّ) হলো এমন বস্তু যা নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং তা মজলিসে হস্তগত না করলে দাদনদাতার জিম্মায় তা অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব থেকে যাবে। আর এটাকে 'দাইন' (دَيْن) বলে। অন্যদিকে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]—ও দাদনগ্রহীতার জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়। সুতরাং সেটাও 'দাইন'। অতএব, যদি [রা'সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বে তারা পৃথক হয়ে যায়, তাহলে দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়ের পর পৃথক হওয়া হলো। অথচ পূর্বে রিবা-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, نَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِنْكَالَيْنِ بِالنَّكْلِ "নবী করীম ﷺ বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" বাকির বিনিময় বাকি বিক্রয়ের অর্থ হলো, দাইন [যা জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়]—এর বিনিময় দাইনের বিক্রয় করা।

আর মূলধন [রা'সুল মাল] যদি দ্বিতীয় প্রকার বস্তু অর্থাৎ মূলদ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো বস্তু হয় তাহলে তা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হলে 'বায় সলম' জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, যদিও এ সুরতে দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয় হচ্ছে না। কারণ, মূলদ্রব্য টাকা-পয়সা ছাড়া অন্যান্য বস্তু নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব হয়, ফলে তা দাইন হয় না। তাই কিয়াসের দাবি অনুযায়ী জায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু 'ইসতিহসান' (اِسْتِحْسَانُ)—এর কারণে এ সুরতেও নাজায়েজ হবে। আর তা হলো, 'সলম' বলা হয় اَخَذَ عَاجِلٍ بِأَجَلٍ "বাকি বস্তুর বিনিময়ে নগদ বস্তু গ্রহণ করা।" কেননা, سَفَوٌ وَ كَسَفٌ উভয় শব্দের একই অর্থ। আর উভয় শব্দ থেকে 'ফেল' (فَعَلَ) ব্যবহৃত হয় اِنْفَاعٌ থেকে এবং এদের ক্রিয়ামূল বা মাসদার হলো যথাক্রমে اِنْفَاعٌ এবং اَلْاِنْفَاعُ। আর এ মাসদার দুটি اَلْمُغْعِجِلُ বা নগদ গ্রহণ করা এবং দ্রুত গ্রহণ করার অর্থ প্রদান করে। অতএব 'বায় সলম'—এ যেহেতু দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] বাকি এবং মেয়াদি হয়ে থাকে, তাই মূলধন [রা'সুল মাল] নগদ গ্রহণ করা অপরিহার্য হবে। যাতে শব্দের আভিধানিক অর্থের দাবি রক্ষিত হয়। কেননা, শরিয়ত 'বায় সলম' যে অর্থে ব্যবহৃত হতো সেই অর্থেই একে বৈধ করেছে। সুতরাং উক্ত অর্থ রক্ষা করার জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] চুক্তির মজলিসেই হস্তগত করা অপরিহার্য। فَوَكَهَ وَلَا تَكُلْ لَا يَدُ مِنْ تَلْبِيسِ رَأْسِ الْمَالِ الْخ: দ্বিতীয় আরেকটি দলিল। আর এ দলিলটি বুঝার পূর্বে দুটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে—

১. শরিয়তে 'বায় সলম' জায়েজ হয়েছে অভাবীদের প্রয়োজনের কারণে। অর্থাৎ যার কাছে নগদ অর্থ নেই সে যাতে অন্যের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে তার বিনিময়-দ্রব্য প্রদানে সমর্থ হয় সে জন্য 'বায় সলম' জায়েজ করা হয়েছে।

২. 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য দাদনগ্রহীতার দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করতে [পরোক্ষভাবে হলেও] সক্ষম হওয়া আবশ্যক। উক্ত দুটি বিষয় জানার পর এবার উল্লিখিত দলিলের ব্যাখ্যা হলো, যেহেতু দাদনগ্রহীতাকে অভাবী ধরা হচ্ছে তাই চুক্তির মজলিসেই তার জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করার বিষয়টি শর্ত হওয়া আবশ্যক। যাতে সে তা কাজে লাগিয়ে চুক্তির শর্ত মোতাবেক দাদনকৃত দ্রব্য অর্জন করে তা হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় তাকে দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তরে সক্ষম বলে সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না।

تَوَكَّلْ وَلِهَذَا قُلْنَا: لَا يَمِصُّ التَّلْمُ الْخ: আর যেহেতু চুক্তির মজলিসেই মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করা শর্ত বা অপরিহার্য তাই আমরা বলেছি যে, 'বায় সলম'—এর ক্ষেত্রে যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের উভয়ের কিংবা তাদের একজনের 'খিয়ারে শর্ত' থাকে অর্থাৎ এরূপ শর্ত করে যে, আমার দুদিন চুক্তিট বহাল রাখা বা না রাখার বিষয়ে চিন্তা করে দেখার অধিকার থাকবে, তাহলে চুক্তির মজলিসেই মূলধন হস্তগত করলেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ, 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে বস্তুটি হস্তগত করলেও তা পূর্ণরূপে হস্তগত হয় না। কেননা, পূর্ণরূপে হস্তগত তখনই সাব্যস্ত হবে যখন বস্তুটির উপর দাদনগ্রহীতার পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হবে। অথচ এক পক্ষের 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে ইমাম আবু হানীফা (র.)—এর মতে অপর পক্ষের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, আর সাহেবাইন (র.)—এর মতে যদিও মালিকানা সাব্যস্ত হয় কিন্তু তা অপূর্ণ। কেননা, যে পক্ষের 'খিয়ারে

শর্ত' রয়েছে সে তা বাতিল করে দিতে পারে। সুতরাং যখন দাদনগ্রহীতা বকুটি হস্তগত করা সত্ত্বেও তাতে তার পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে না, তাই তার হস্তগত করাও পূর্ণ হয়নি। আর হস্তগত পূর্ণ না হওয়ার কারণে 'বায় সলম' সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَنْبَغُ فِيهِ خِبَارُ الرَّؤُفَةِ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরূপভাবে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'খিয়ারে কুইয়াত' অর্থাৎ চুক্তির পর ক্রেতা বিক্রয়-দ্রব্য দেখার পর তা পছন্দ না হলে তা ফিরিয়ে দিয়ে চুক্তি বাতিল করার অধিকার-সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য, এখানে উদ্দেশ্য হলো দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর ক্ষেত্রে خِبَارُ الرَّؤُفَةِ সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে মূলধন [রা'সুল মাল]-এর ক্ষেত্রে خِبَارُ الرَّؤُفَةِ সাব্যস্ত হবে। দাদনকৃত দ্রব্য-এর ক্ষেত্রে خِبَارُ الرَّؤُفَةِ সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, দাদনকৃত দ্রব্য-এর ক্ষেত্রে خِبَارُ الرَّؤُفَةِ ফলপ্রসূ হবে না। কারণ, خِبَارُ الرَّؤُفَةِ-এর ফায়দা হলো, বকুটি পছন্দ না হলে তা ফিরিয়ে দিয়ে চুক্তি বাতিল করা। আর এ ফায়দা দাদনকৃত দ্রব্য-এর ক্ষেত্রে অর্জিত হবে না। কেননা, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত দ্রব্য নির্দিষ্ট হয় না, বরং তা অনির্দিষ্টভাবে দাদনগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হয়। কাজেই যদি خِبَارُ الرَّؤُفَةِ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে দাদনদাতা যদি পছন্দ না হওয়ার কারণে তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না, বরং শর্ত অনুযায়ী পুনরায় তাকে দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করতে হবে। এভাবে বারবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু চুক্তি বাতিল হবে না। কেননা, চুক্তি নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নয় যে, তা ফিরিয়ে দিলে চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, خِبَارُ الرَّؤُفَةِ-এর ফায়দা প্রকাশ পাবে না, তাই خِبَارُ الرَّؤُফَةِ সাব্যস্ত হবে না; বরং দাদনগ্রহীতা শর্ত অনুযায়ী তা হস্তান্তর করবে এবং দাদনদাতা তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

قَوْلُهُ يَخْلَافُ خِبَارُ الْعَيْبِ: পক্ষান্তরে মূলধন [রা'সুল মাল]-এর ক্ষেত্রে خِبَارُ الْعَيْبِ অর্থাৎ 'দ্রব্যের মাঝে ত্রুটি পাওয়া গেলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার' সাব্যস্ত হবে। সুতরাং চুক্তির মজলিসে তা হস্তগত করার পর তাতে যদি ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে। কেননা, মূলধনের ক্ষেত্রে خِبَارُ الْعَيْبِ সাব্যস্ত হওয়াতে মূলধন হস্তগত হওয়া অসম্পূর্ণ থাকে না। কারণ, উভয়ের যদি পূর্ণ সম্মতি থাকে তাহলে চুক্তি পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়, আর চুক্তি পূর্ণরূপে সম্পন্ন হলে কজা পূর্ণ হয়। সুতরাং خِبَارُ الْعَيْبِ যেহেতু এর কোনোটির জন্য অন্তরায় নয়, তাই কজা পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব, خِبَارُ الْعَيْبِ তাতে সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) يَخْلَافُ خِبَارُ الْعَيْبِ বলে মূলধনের ক্ষেত্রে خِبَارُ الْعَيْبِ সাব্যস্ত হবে এ কথা বুঝিয়েছেন নাকি দাদনকৃত দ্রব্যে خِبَارُ الْعَيْبِ সাব্যস্ত হবে তা বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু تَمَامُ الْقَبْضِ বলে যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তাতে বুঝা যায় মূলধনের ক্ষেত্রে خِبَارُ الْعَيْبِ-এর কথাই তিনি বুঝিয়েছেন। এজন্য আমরা এর ব্যাখ্যায় মূলধনের কথাই উল্লেখ করছি। পক্ষান্তরে ফাতহুল কাদীরি গ্রন্থে 'দাদনকৃত দ্রব্য'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় ফাতহুল কাদীরির উক্ত শব্দটি (أَيُّ الْمُسْلَمِ فِيهِ) সুস্বাভাবিক ভুল।

قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْتَطَاعَ خِبَارُ الشَّرْطِ قَبْلَ الْإِنْتِرَاقِ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে الشَّرْطِ থাকলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, চুক্তির সময় চুক্তিকারীদ্বয় الشَّرْطِ সাব্যস্ত করেছে অতঃপর মজলিসে থাকা অবস্থায়ই যার الشَّرْطِ ছিল সে তা বাতিল করে দিয়েছে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মতে যদি ততক্ষণ পর্যন্ত মূলধন বিদ্যমান থাকে তবে চুক্তিটি সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তা আর সহীহ হবে না। আর যদি ততক্ষণে মূলধন [রা'সুল মাল] ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা দাদনগ্রহীতা তা খরচ করে ফেলে, তাহলে কারো মতে চুক্তিটি সহীহ হবে না। উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটির অনুরূপ মাসআলা একই মতবিরোধ ও দলিলসহ পূর্বে الْبَيْعِ بَابِ الْفَائِدِ-এ বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যদি অস্পষ্ট মেয়াদে [যেমন- ফসল কাটার সময়] বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি করে, তাহলে তা ফাসিদ হবে। কিন্তু উক্ত অস্পষ্ট মেয়াদ আসার পূর্বে যদি সে মেয়াদ বাতিল করে দেয়, তাহলে আমাদের মতে চুক্তিটি সহীহ হবে। আর ইমাম যুফার (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে তা সহীহ হবে না।

وَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ جَمْعُهَا فِي قَوْلِهِمْ : اِعْلَامُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَعَجُّيلُهُ ، وَاِعْلَامُ الْمُسْلِمِ فِيهِ وَتَاَجِيلُهُ وَبَيَانُ مَكَانِ الْإِنْفَاءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ ۔

অনুবাদ : ফকীহগণ 'বায় সলম'-এর সব কয়টি শর্ত একবাক্যে এভাবে উল্লেখ করেছেন, মূলধন সম্পর্কে অবহিত করা এবং তা দ্রুত হস্তান্তর করা, দাদন-দ্রব্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং তার মেয়াদ উল্লেখ করা, হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করা এবং তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ جَمْعُهَا الخ মুসান্নিফ (র.) বলেন, ফকীহগণ 'বায় সলম'-এর সব কয়টি শর্ত উক্ত একটি বাক্যে উল্লেখ করেছেন ।

মূলধন সম্পর্কে অবহিত করা : অর্থাৎ মূলধন [রা'সুল মাল]-এর শ্রেণী, প্রকার, তার গুণাগুণ উল্লেখ করা এবং ওজন, পাত্র বা সংখ্যার হিসেবে তার পরিমাণ উল্লেখ করা ।

দ্রুত হস্তান্তর করা : অর্থাৎ মূলধন চুক্তির মজলিসেই পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তান্তর করা ।

দাদনকৃত দ্রব্য সম্পর্কে অবহিত করা : দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর শ্রেণী, প্রকার ও গুণাগুণ উল্লেখ করা এবং যথাযথভাবে তার পরিমাণ উল্লেখ করা ।

মেয়াদ উল্লেখ করা : দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করা ।

হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করা : অর্থাৎ দাদনকৃত দ্রব্য যদি এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ তাহলে তা হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করা ।

সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া : দাদনগ্রহীতার দাদনকৃত দ্রব্য অর্জন করতে সক্ষম হওয়া । অর্থাৎ দাদনকৃত দ্রব্য চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত তা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হওয়া বা বিদ্যমান থাকা ।



فَإِنْ أَسْلَمَ مَاتَ فِي كُرٍّ جَنْطَةٍ مِائَةً مِنْهَا دَيْنٌ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ وَمِائَةٌ نَقْدٌ  
فَإِلَّا سَلَّمَ فِي حِصَّةِ الدِّينِ بَاطِلٌ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ، وَبِجُورٍ فِي حِصَّةِ التَّقْدِيرِ لِاسْتِجْمَاعِ  
شَرَائِطِهِ، وَلَا يَشِينُ الْفَسَادَ، لِأَنَّ الْفَسَادَ طَارٍ، إِذَا السَّلَامُ وَقَعَ صَحِيحًا، وَلِهَذَا لَوْ نَقَدَ  
رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ صَحَّ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْإِفْتِرَاقِ لِمَا بَيَّنَّا، وَهَذَا لِأَنَّ الدِّينَ  
لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْبَيْعِ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِدَيْنٍ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا دِينَ  
لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فَيَنْعَقِدُ صَحِيحًا -

অনুবাদ : সুতরাং যদি এক 'কুর' গেমের জন্য দুই শত দিরহাম মূলধন হিসেবে প্রদান করে এভাবে যে, একশত দিরহাম 'মুসলাম ইলাইহি'-এর নিকট পাওনা ছিল আর একশত দিরহাম নগদ, তাহলে পাওনা অংশটুকুর 'বায় সলম' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, কজা পাওয়া যায়নি। আর নগদ মূলধনের অংশে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, এ অংশে সকল শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। [অপর অংশের] ফাসিদ হওয়া পূর্ণ চুক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করবে না। কেননা, ফাসিদ হওয়াটা পরে যুক্ত হয়েছে। যেহেতু 'বায় সলম' প্রথমে সঠিক হয়েছিল। এ কারণেই যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে [সম্পূর্ণ] মূলধন নগদ হস্তান্তর করে, তাহলে [সম্পূর্ণ অংশে] 'বায় সলম' জায়েজ হয়ে যাবে। কিন্তু [কজা না করে] পৃথক হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। [উল্লিখিত মাসআলায় আমরা যে বলেছি, 'বায় সলম' প্রথমে সঠিক হয়েছিল] তার কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্য ঋণ নির্দিষ্ট হয় না। [বরং অনির্দিষ্টরূপে তার অনুরূপ বস্তুর সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয়।] তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, যদি দু জন ব্যক্তি প্রাপ্য ঋণের বিনিময়ে কোনো বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করে এবং পরে তারা একমত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো ঋণ পাওনা ছিল না, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয় না। সুতরাং উল্লিখিত 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি সঠিক হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كُرٍّ -এর পরিচয় : كُرٍّ এক 'কুর' সমান ষাট قَفِيزٌ আর এক قَفِيزٌ সমান আট মাক্ক (مَكُونٌ) আর এক মাক্ক সমান দেড় صَاعٌ সুতরাং এক 'কুর' সমান সাতশত বিশ صَاعٌ আর এক صَاعٌ সমান প্রায় সাড়ে তিন কেজি।  
تَوَلَّى فَإِنْ أَسْلَمَ مَاتَ فِي كُرٍّ: সূরতে মাসআলা হলো, আমরের কাছে যায়েদের একশত দিরহাম পাওনা আছে। এখন যায়েদ আমরের কাছ থেকে এক 'কুর' গম 'বায় সলম' হিসেবে দুইশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল। চুক্তি করার সময় এভাবে বলল যে, তোমার কাছে আমার যে একশত দিরহাম পাওনা আছে সেই একশত দিরহাম এবং এ নগদ একশত দিরহামের বিনিময়ে আমি ক্রয় করলাম। অথবা বলল, আমি দুইশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলাম, অতঃপর সে নগদ একশত দিরহাম হস্তান্তর করল আর বাকি একশত দিরহাম পাওনা দিরহামের বিনিময়ে কেটে নিল। এ দু সূরতের যেভাবেই করুক না কেন, বিধান একই হবে। তা হলো, নগদ যে একশত দিরহাম মজলিসে পরিশোধ করেছে সে অংশের 'বায় সলম' সহীহ হবে, আর পাওনা একশত দিরহামের অংশের 'বায় সলম' সহীহ হবে না।

পাওনা একশত দিরহামের অংশে সহীহ না হওয়ার কারণ হলো, সেই একশত দিরহাম মজলিসে হস্তগত করা হয়নি। অথচ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধন [রা'সুল মাল] চুক্তির মজলিসেই হস্তগত করা 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। আর নগদ একশত দিরহামের অংশে সহীহ হওয়ার কারণ হলো, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য সমস্ত শর্ত এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই নগদ একশত দিরহামের অংশের 'বায় সলম' সহীহ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَبْنَعُ الْفَسَادَ لِأَنَّ الْفَسَادَ طَرِيعُ كَعْنَا: মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমতের জবাব দিচ্ছেন কেননা, উপরিউক্ত মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) বলেন, সম্পূর্ণ অংশের 'বায় সলম' ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, এখানে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি যেহেতু চুক্তির মূল অংশ তথা মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত তাই তা শক্তিশালী। সুতরাং তা সম্পূর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়বে। মুসান্নিফ (র.) তাঁর এ দলিলের জবাব দিচ্ছেন যে, এখানে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি চুক্তি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে। আর ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি যদি মূল চুক্তিতে না হয়ে পরবর্তীতে যুক্ত হয়, তাহলে তা যে অংশে যুক্ত হয় সে অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে, অপর অংশে তা বিস্তৃত হয় না। পরবর্তী ইবারতে মুসান্নিফ (র.) এখানে ফাসিদ হওয়ার পর কিভাবে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে তার প্রমাণ বর্ণনা করছেন।

قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَوْ نَفَذَ رَأْسُ الْمَالِ الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা বলেছি যে, এখানে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি চুক্তি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে, এ কারণেই উক্ত মাসআলায় যদি 'পাওনা একশত দিরহাম' মজলিস থেকে উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তান্তর করে দেয় এবং দাদনগ্রহীতা তা হস্তগত করে, তাহলে উভয় অংশের 'বায় সলম' জায়েজ হয়ে যায়। অথচ চুক্তি যদি প্রথমে সহীহ না হতো, তাহলে এ ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হতো না।

قَوْلُهُ وَمَذًا لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَبْنَعُ فِي الْبَيْعِ الْخ: এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলায় পাওনা দিরহামের দিকে চুক্তির সম্পর্ক করা সত্ত্বেও চুক্তি কেন সহীহভাবে সম্পাদিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করছেন। তা হলো এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'দাইন' বা পাওনাকে নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না। অর্থাৎ কেউ যদি 'দাইন' বা পাওনাকে মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করে, তাহলে নির্দিষ্টভাবে সেই পাওনা [দাইন] মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; বরং পাওনার অনুরূপ বস্তুর সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক হয়। এ কারণেই যদি কেউ পাওনা টাকা বা দাইনের বিনিময়ে কোনো বস্তু বিক্রয় করে অতঃপর ক্রেতা ও বিক্রেতা এ ব্যাপারে একমত হয় যে, আসলে কোনো পাওনা ছিল না, তাহলে উক্ত বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায় না। অথচ এমন জিনিসকে যদি মূল্য সাব্যস্ত করা হয় যা প্রকৃতপক্ষে মাল না বা কিছুই না, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে যেহেতু এমন দাইনকে মূল্য নির্ধারণ করেছিল যা কিছুই ছিল না, সেহেতু চুক্তি বাতিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দাইনকে নির্দিষ্ট করলেও যেহেতু নির্দিষ্ট হয় না, তাই বিক্রয় বাতিল হয়নি। সুতরাং বুঝা গেল দাইন বা পাওনা বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না।

অতএব, আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলায় যখন দাদনদাতা পাওনা একশত দিরহাম ও নগদ একশত দিরহামকে মূলধন [মূল] সাব্যস্ত করেছে, তখন পাওনা একশত দিরহাম মূলধন হিসেবে সাব্যস্ত না হয়ে সাধারণ (مُطْلَقًا) একশত দিরহামের সাথে চুক্তির সম্পর্ক হবে। তাই চুক্তি সহীহ হয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে। অতঃপর যখন নগদ একশত দিরহাম হস্তগত করার পর তারা পৃথক হয়ে গেছে, তখন অপর একশত দিরহাম মজলিসে হস্তগত না করার কারণে সে অংশে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। সুতরাং তা সেই অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মাসআলায় যদি উক্ত একশত দিরহাম দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর নিকট পাওনা না হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট দাদনদাতার পাওনা হয় আর সেই পাওনাকে মূলধন [রা'সুল মাল] হিসেবে সাব্যস্ত করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে উভয় অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে পাওনা দিরহাম চুক্তিকারীদ্বয়-এর ক্ষেত্রে মাল হিসেবে গণ্য হবে না। আর যা চুক্তিকারীদ্বয়-এর ক্ষেত্রে মাল না তার দিকে চুক্তি সম্পর্কিত করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسْلِمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمَّا فِيهِ مِنْ تَفْرِيتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ مَبِيعٌ ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হস্তগত করার পূর্বে মূলধন কিংবা দাদন-দ্রব্যতে অধিকার চর্চা করা বৈধ হবে না । মূলধনের ক্ষেত্রে কারণ হলো, চুক্তির কারণে তাতে যে [দাদনগ্রহীতার] হস্তগত করার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে তা অধিকার চর্চার কারণে বিনষ্ট হবে । আর দাদন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে কারণ হলো, দাদন-দ্রব্য হলো বিক্রয়-দ্রব্য । আর হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয়-দ্রব্যে অধিকার চর্চা করা জায়েজ নেই ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْعَنْ : 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা [যেমন- ক্রয়-বিক্রয় করা, হাদিয়া দেওয়া, তার বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ করা ইত্যাদি] জায়েজ নয় । একরূপভাবে দাদনদাতা [রাবুস সলম]-এর জন্য দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয় ।

সূরতে মাসআলা হলো, খালেদ বকরের কাছ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে পাঁচ মণ ধান 'বায় সলম' হিসেবে ক্রয় করল । কিন্তু বকর উক্ত এক হাজার টাকা হস্তগত করার পূর্বেই তা দ্বারা অপর একজনের কাছ থেকে কোনো বস্তু ক্রয় করে ফেলল বা কাউকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিল, তাহলে এটা জায়েজ হবে না । অনুরূপভাবে খালেদ উক্ত পাঁচ মণ ধান হস্তগত করার পূর্বেই তা অপর কারো কাছে বিক্রয় করে দিল কিংবা কাউকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিল কিংবা বকরের কাছ থেকে অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে পরিবর্তন করে নিল, তাহলে তাও জায়েজ হবে না ।

قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمَّا فِيهِ مِنْ تَفْرِيتِ الْقَبْضِ : প্রথম সূরতে তথা দাদনগ্রহীতার জন্য মূলধন [রা'সুল মাল]-এর মাঝে অধিকার চর্চা (تَصَرُّف) করা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধন চুক্তির মজলিসেই হস্তগত করা অপরিহার্য । আর এ শর্তটি চুক্তিকারীদ্বয়ের কারো ব্যক্তিগত হক না; বরং তা শরিয়তের হক । সুতরাং যদি মূলধন হস্তগত করার পূর্বেই তাতে অধিকার চর্চা (تَصَرُّف) করা হয়, তাহলে উক্ত শর্তটি বিনষ্ট হয়ে যাবে- মজলিসে তা হস্তগত করা হচ্ছে না, তাই তা জায়েজ হবে না ।

আর দ্বিতীয় সূরতে তথা দাদনদাতার জন্য দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, 'বায় সলম'-এর মাঝে দাদনকৃত দ্রব্যই হলো- বিক্রীত-দ্রব্য । আর বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা করা [অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করা, হাদিয়া দেওয়া বা কোনো কাজে লাগানো] জায়েজ নয় । পূর্বে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে । সুতরাং দাদনকৃত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয় ।

وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَهَ وَالتَّوْلِيَةَ فِي الْمُسْلِمِ فِيهِ، لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ.

অনুবাদ : [অনুরূপভাবে হস্তগত করার পূর্বে] দাদন-দ্রব্য কাউকে শরিক করা অথবা তা আসল মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, এটা হস্তক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

: قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَهَ الْخ

মাসআলা : দাদনদাতা [রাব্বুল সলম]-এর জন্য দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তগত করার পূর্বে তাতে কাউকে শরিক করা (شِرْكَةً) কিংবা ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে তা কারো নিকট বিক্রয় করা (تَوْلِيَةً) জায়েজ নয়। কাউকে শরিক করার সুরত হলো, যেমন- দাদনদাতা কাউকে বলল, আমি যা মূলধন [রা'সুল মাল] হিসেবে দিয়েছি তুমি তার অর্ধেক আমাকে প্রদান কর, তাহলে তুমি দাদনকৃত দ্রব্যের অর্ধেকের অংশীদার হয়ে যাবে। আর ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয়ের সুরত হলো, যেমন- দাদনদাতা কাউকে বলল, আমি যা মূলধন হিসেবে দিয়েছি তুমি আমাকে তার সমপরিমাণ প্রদান কর, তাহলে তুমি সম্পূর্ণ দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর মালিক হয়ে যাবে।

উল্লিখিত উভয় সুরত নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, কাউকে অংশীদার করার সুরতে যতটুকু অংশে তাকে অংশীদার করল, ততটুকু দাদনকৃত দ্রব্যে হস্তগত করার পূর্বে অধিকার চর্চা (تَصَرُّفٌ) করা হলো। আর ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয়ের সুরতে সম্পূর্ণ দাদনকৃত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা (تَصَرُّفٌ) করা হলো। আর ইতঃপূর্বে দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধন এবং দাদনকৃত দ্রব্য এর কোনোটিতেই হস্তগত করার পূর্বে কোনোরূপ তَصَرُّফ করা জায়েজ নয়।

[উল্লেখ্য, উক্ত দুটি সুরত নাজায়েজ হওয়ার বিষয়টি এর পূর্বের ইবারত الْمُسْلِمِ وَالسَّلَامِ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَامِ وَالتَّوْلِيَةَ فِيهِ-এর দ্বারা বুঝা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও এ দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, দাদনকৃত দ্রব্যে এ দুটি সুরত (تَوْلِيَةً وَ شِرْكَةً) জন-সমাজে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পক্ষান্তরে مُرَابَعَةً [লাভের ভিত্তিতে বিক্রয়] এবং وَصْبَةً [ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয়]-এর সম্ভাবনা কম।

فَإِنْ تَقَايَلَا السَّلَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمُسْلِمِ إِلَيَّ بِرَأْسِ الْكَمَالِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ كُلُّهُ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا سَلَمَكَ أَوْ رَأْسَ مَا لَكَ، أَيْ عِنْدَ الْفَيْسِخِ وَلَئِنْ أَخَذَ شِبْهًا بِالْمَيْنِ فَلَا يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِقَالَهَ بَصْعَ جَدِيدٍ فِي حَقِّ ثَالِثٍ، وَلَا يُمَكِّنُ جَعْلُ الْمُسْلِمِ فِيهِ مَيْنَعًا لِسُقُوطِهِ، فَجُعِلَ رَأْسُ الْمَالِ مَيْنَعًا، لِأَنَّهُ دَيْنٌ مِثْلُهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْإِبْتِدَاءِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَفِيهِ خِلَافٌ زُفَرٍ (رح) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

অনুবাদ : যদি উভয়ে 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে দাদনদাতার জন্য সম্পূর্ণ মূলধন গ্রহণ করার পূর্বে তা দ্বারা দাদনগ্রহীতার নিকট হতে কোনো কিছু ক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তুমি তোমার দাদন-দ্রব্য অথবা মূলধন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না", অর্থাৎ 'বায় সলম'-এর চুক্তি যদি রহিত হয়ে যায়। আরেকটি কারণ হলো, মূলধনটি বিক্রয়-দ্রব্যের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং [বিক্রয়-দ্রব্যের ন্যায়] তাতেও হস্তগত করার পূর্বে অধিকার চর্চা করা জায়েজ হবে না। আর [দাদন-দ্রব্যটি যে বিক্রয়-দ্রব্যের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে] তার কারণ হলো, বিক্রয় প্রত্যাহার তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়। আর [এ নতুন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] বিক্রয়-দ্রব্য হিসেবে [মুসলামা ফীহা] বা দাদন দ্রব্যকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং মূলধনকেই বিক্রয়-দ্রব্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, মূলধন এখন 'দাইন' বা প্রাপ্য ঋণ হয়ে পড়েছে যেরূপভাবে দাদন-দ্রব্য 'দাইন' ছিল। তবে চুক্তি-প্রত্যাহার মজলিসেই মূলধন হস্তগত করা আবশ্যিক নয়। কেননা, এটা সর্বদিক থেকে নতুনভাবে শুরু করা বিক্রয়ের মতো নয়। উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। আমরা যা উল্লেখ করলাম তা তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَقَايَلَا السَّلَامَ : মাসআলা হলো, যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এবং দাদনগ্রহীতা একমত হয়ে 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে দাদনদাতা দাদনগ্রহীতার নিকট হতে তার দেওয়া মূলধন হস্তগত করার পূর্বে তা দ্বারা দাদনগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো কিছু ক্রয় করা জায়েজ হবে না।

[অবশ্য তা হস্তগত করার পর তা দ্বারা দাদনগ্রহীতার নিকট হতে হোক বা অন্য কারো নিকট হতে হোক-যা ইচ্ছা ক্রয় করতে পারবে।]

দলিল: মুসান্নিফ (র.) এ ক্ষেত্রে দুটি দলিল বর্ণনা করেছেন- ১. নুকলী দলিল, ২. আকলী দলিল।

নকলী দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণী- لَا تَأْخُذْ إِلَّا سَلَمَكَ أَوْ رَأْسَ مَا لَكَ "তুমি তোমার দাদন-দ্রব্য অথবা মূলধন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না।" এ হাদীসটির অর্থ হলো, 'বায় সলম'-এর চুক্তি যদি বহাল থাকে তাহলে তুমি দাদনকৃত দ্রব্য

ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। আর 'বায় সলম'-এর চুক্তি যদি বহাল না থাকে তাহলে তুমি [দাদনদাতা] মূলধন ছাড়া অন্য অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করা অবস্থায় দাদনদাতা মূলধন গ্রহণ না করে তার বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, হাফিজ ইবনে হাজ্জার আসকালানী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হুবহু উল্লিখিত শব্দে আমি বুজে পাইনি। তবে একই অর্থের হাদীস আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (র.) **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَمَ شَيْءٌ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ.**

এছাড়া এ মর্মে **مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّازِيِّ** এবং **مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ** গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে একটি মওকুফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই— **إِذَا أَسْلَفْتَ فَيْئَ شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا بِرَأْسِ مَا لَكَ أَوْ الْوَلِيُّ اسْلَفَتْ فَيْئِهِ**—

বিস্তারিত দ্র. ফাতহুল কাদীর, নসবুর রায়াহ।

**قَوْلُهُ وَلَا تَأْخُذْ بِهَا بِالْمَبْنَعِ الْخ:** এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। দলিলটি হলো, 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহারকালে "মূলধন" মূল্য-দ্রব্য না হয়ে বিক্রয়-দ্রব্য (مَبْنَع) -এর মতো [অর্থাৎ مَبْنَع -এর مُتَابِع -এর মতো] হয়ে গেছে। আর বিক্রয়-দ্রব্য বা مَبْنَع -এর বিধান হলো তা হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা (تَصَرُّف) করা [অর্থাৎ ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি] জায়েজ নয়। সুতরাং মূলধন যেহেতু চুক্তিটি প্রত্যাহার কালে বিক্রয় দ্রব্যের মতো হয়ে গেছে, তাই তা হস্তগত করার পূর্বে তা দ্বারা অন্য কিছু ক্রয় করা জায়েজ হবে না। পরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) কিভাবে 'মূলধন' বিক্রয়-দ্রব্যের মতো হলো তা বর্ণনা করছেন।

**قَوْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِمَالَهَ بَيْنَ جَدِيدٍ فَيْئَ حَتَّى تَأْتِيَ الْخ:** মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার কালে মূলধন মূল্য-দ্রব্য না হয়ে বিক্রয়-দ্রব্যের মতো হয়ে গেছে, তার কারণ হলো, 'চুক্তি প্রত্যাহার' চুক্তিকারীদ্বয় ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার হিসেবে গণ্য হয় না, বরং তা নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে যখন চুক্তিকারীদ্বয় তা প্রত্যাহার করল, তখন এ প্রত্যাহার যেহেতু অন্যদের ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় সেহেতু দাদনকৃত দ্রব্য কিংবা মূলধন-এর যে-কোনো একটিকে مَبْنَع হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে। আর দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-কে এ ক্ষেত্রে مَبْنَع হিসেবে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, দাদনকৃত দ্রব্য নির্দিষ্ট বস্তু নয়; বরং তা দাদনগ্রহীতার জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব ছিল। চুক্তিটি প্রত্যাহারের কারণে তা তার জিম্মা থেকে বাদ হয়ে যায়, ফলে তা প্রত্যাহারের পর অবশিষ্ট আছে বলে গণ্য করা যায় না। সুতরাং তা এ ক্ষেত্রে مَبْنَع হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারবে না। কেননা, مَبْنَع এমন বস্তু হতে হবে যা চুক্তিটি প্রত্যাহারের পরও অবশিষ্ট থাকবে। তাই আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে মূলধনকে مَبْنَع হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে। যদিও মূলধন দাইন [জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব বস্তু], কিন্তু দাইনকে مَبْنَع হিসেবে সাব্যস্ত করতে অসুবিধা নেই। কেননা, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]ও দাইন ছিল, তা সত্ত্বেও তা 'বায় সলম'-এর চুক্তিকালে مَبْنَع হয়েছে। সুতরাং মূলধনও চুক্তি প্রত্যাহারকালে مَبْنَع হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারবে।

**قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ عَلَى السَّخِيرِ الْخ:** এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি চুক্তি প্রত্যাহার তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে যেহেতু চুক্তিটি ছিল 'বায় সলম'-এর চুক্তি সেহেতু এর প্রত্যাহারও তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'বায় সলম'-ই হবে। আর 'বায় সলম'-এর মাঝে মূলধন [রা'সুল মাল] তো মজলিসেই হস্তগত করা শর্ত। অথচ সকলের ঐকমত্যে চুক্তি প্রত্যাহারকালে মূলধন মজলিসে হস্তগত করা অপরিহার্য নয়; বরং তা মজলিসের পরেও হস্তগত করা জায়েজ।

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন যে, চুক্তি প্রত্যাহার যে নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয় তা পূর্ণরূপে ক্রয়-বিক্রয় নয়; বরং তা একদিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় আর অন্যদিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় নয়। কেননা, তা চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় নয়। সুতরাং মূলধন যে মজলিসেই হস্তগত করা শর্ত তা ছিল এমন 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে যা সর্বদিক থেকেই ক্রয়-বিক্রয়। কাজেই সে শর্ত এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এর কারণ হলো, মূলধন মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হওয়ার কারণ ছিল যাতে **بَيْعُ الْكَائِنِ بِالْكَائِنِ** অর্থাৎ "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়"-এর আওতাভুক্ত না হয়, যা নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে চুক্তি প্রত্যাহারকালে যেহেতু দাদনকৃত দ্রব্য দাদনগ্রহীতার জিম্মা থেকে বাদ হয়ে যায়, তাই মজলিসে হস্তগত না করলেও **بَيْعُ الْكَائِنِ بِالْكَائِنِ** "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়"-এর আওতাভুক্ত হবে না। তাই প্রত্যাহার-মজলিসে মূলধন হস্তগত করা অপরিহার্য নয়।

[উল্লেখ্য, হিদায়ার ভাষ্যকার **أَلْعِنَاةُ** গ্রন্থের লেখক লিখেছেন যে, এখানে আসলে উল্লিখিত প্রশ্ন উত্থাপিতই হওয়ার কথা নয়। কারণ, চুক্তি প্রত্যাহারকালে মূলধন তো **مِيبَع** হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তখন তা আর মূলধন হিসেবে গণ্য হবে না। অতএব, তা মজলিসে হস্তগত করার প্রশ্ন উঠবে না।]

মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর চুক্তি উভয়ে প্রত্যাহার করলে, দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] তার প্রাপ্য মূলধন হস্তগত করার পূর্বে তার বিনিময়ে দাদনগ্রহীতার নিকট হতে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারবে। [ইমাম শারফরী (র.)-এর অভিमतও ইমাম যুফার (র.)-এর মতের অনুরূপ।]

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তিটি প্রত্যাহারের মাধ্যমে 'বায় সলম' বাতিল হয়ে গেছে। ফলে মূলধন দাদনগ্রহীতার নিকট 'দাইন' বা ঋণ হিসেবে দাদনদাতার পাওনা রয়েছে। সুতরাং অন্যান্য 'দাইন' যেকোন হস্তগত করার পূর্বে তার বিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারে তদ্রূপ এ 'দাইন' হস্তগত করার পূর্বে তার বিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা পূর্বে যে দুটি নকলী ও আকলী দলিল উল্লেখ করেছি তা ইমাম যুফার (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল। [উল্লেখ্য, ইমাম যুফার (র.) যা উল্লেখ করেছেন তা-ই কিয়াসের দাবি, আর আমরা যা উল্লেখ করেছি তা কিয়াসের বিপক্ষে 'ইসতিহসান'।]

قَالَ : وَمَنْ أَسْلَمَ فِي كُرٍّ جَنْطَةٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلَ اشْتَرَى الْمُسْلِمَ الْيَمَّ مِنْ رَجُلٍ كُرًّا  
وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَامِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لَمْ يَكُنْ قَضَاءً، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يَقْبِضَهُ  
لِنَفْسِهِ فَاکْتَالَهُ لَهُ ثُمَّ اِكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ جَازٌ، لِأَنَّهُ اجْتَمَعَتِ الصَّفَقَتَانِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ  
فَلَا بُدَّ مِنَ الْكَيْلِ مَرَّتَيْنِ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرَى  
فِيهِ صَاعَانِ، وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالسَّلَامُ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا لِكُرِّ  
قَبْضِ الْمُسْلِمِ فِيهِ لِأَحَقِّ، وَلِأَنَّهُ يَمْنُزِلُهُ ابْتِدَاءً الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ غَيْرُ الدِّينِ حَقِيقَةً،  
وَإِنْ جُعِلَ عَيْنُهُ فِي حَقِّ حُكْمٍ خَاصٍّ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْإِسْتِبْدَالِ فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ بَعْدَ  
الشَّرْطِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَامًا وَكَانَ قَرْضًا فَاِمْرَهُ بِقَبْضِ الْكُرِّ جَازٌ، لِأَنَّ الْقَرْضَ إِعَارَةً،  
وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ، فَكَانَ الْمَرْدُودُ عَيْنَ الْمَاخُوذِ مُطْلَقًا حُكْمًا،  
فَلَا يَجْتَمِعُ الصَّفَقَتَانِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ এক 'কুর' [নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ]-এর জন্য 'বায় সলম' করল আর  
মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় দাদনগ্রহীতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হতে এক 'কুর' গম করে দাদনদাতাকে 'মুসলাম  
ফীহ' বা দাদন-দ্রব্য পরিশোধ হিসেবে তা হস্তগত করতে বলল, তাহলে এটা দাদন-দ্রব্য পরিশোধ হিসেবে গণ্য হবে  
না। আর যদি সে এভাবে নির্দেশ দেয় যে, প্রথমে তার পক্ষ হয়ে হস্তগত করবে অতঃপর দাদনদাতা তার নিজের জন্য  
হস্তগত করবে। সুতরাং সে সে হিসেবে প্রথমে [দাদনগ্রহীতার পক্ষ হতে] পরিমাপ করল এরপর নিজের জন্য পরিমাপ  
করল, তাহলে জায়েজ হয়ে যাবে। কেননা, এখানে পরিমাপ শর্তযুক্ত দুটি চুক্তি একত্রিত হয়েছে। সুতরাং দু-বার  
পরিমাপ করা আবশ্যিক। কারণ, নবী করীম ﷺ দু-বার পরিমাপ করার পূর্বে খাদ্যবস্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।  
আর এটাই হলো হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র। যেমন পূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি। আর 'সলম'-এর চুক্তিটি যদিও  
পূর্ববর্তী, কিন্তু দাদন-দ্রব্য হস্তগতকরণ তো পরবর্তীতে হচ্ছে। আর এ হস্তগতকরণ নতুন বিক্রয়চুক্তির সমতুল্য।  
কেননা, [হস্তগতকৃত] নির্ধারিত বস্তু প্রকৃতপক্ষে [জিম্মায় সাব্যস্ত] অনির্ধারিত বস্তু থেকে ভিন্ন। যদিও বিশেষ এক  
হুকুমের ক্ষেত্রে অভিন্ন ধরা হয়। তা হলো, [হস্তগত করার পূর্বে] পরিবর্তন করা। সুতরাং [আলোচ্য মাসআলায়  
দাদনগ্রহীতার উক্ত গম] ক্রয়ের পর [দাদনদাতার নিকট পুনরায়] বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি 'বায় সলম' না হয়;  
বরং কর্জ হয় আর তা পরিশোধের জন্য তাকে উক্ত এক 'কুর' গম কর্জ করার জন্য নির্দেশ দেয়, তাহলে [একবার  
পরিমাপ করে হস্তগত করলেই] তা জায়েজ হয়ে যাবে। কেননা, কর্জ হচ্ছে [প্রকৃতপক্ষে] 'আরিয়াত' [অর্থাৎ মূল বস্তু  
অবশিষ্ট রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ধার দেওয়া]। এ কারণেই কর্জ 'আরিয়াত'-এর শব্দ দ্বারা শুদ্ধ হয়।  
সুতরাং শরিয়তের বিধান হিসেবে [কর্জ গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে] ফেরত দেওয়া বস্তুটি সর্বাবস্থায়ই হুবহু গ্রহণকৃত বস্তু  
বলে গণ্য হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে দুটি চুক্তি একত্র হচ্ছে না। [তাই দু-বার পরিমাপের আবশ্যিকতা নেই।]



### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ كُرِّ جَنْطِ الْخ: সূরত মাসআলা হলো, কেউ অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে 'বায় সলম' হিসেবে এক কুর [অর্থাৎ ষাট কফীয পরিমাপ] গম ক্রয় করল। অতঃপর যখন তা পরিশোধের সময় হলো তখন দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] অন্য এক ব্যক্তির নিকট হতে এক 'কুর' গম ক্রয় করে তা নিজে হস্তগত না করে দাদনদাতা [রাব্বুল সলম]-কে বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট হতে এক কুর গম তোমার পাওনা হিসেবে হস্তগত করে নাও। ফলে দাদনদাতা উক্ত গম হস্তগত করে নিল। তাহলে দাদনদাতা তার প্রাপ্য গম উসুলকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। সূতরাং উক্ত গম যদি দাদনদাতার হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর গম হিসেবে ধ্বংস হবে। দাদনদাতা পুনরায় তার গম দাদনগ্রহীতার নিকট দাবি করতে পারবে।

আর যদি দাদনগ্রহীতা এভাবে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট হতে [অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা যার নিকট হতে উক্ত গম ক্রয় করেছে, তার নিকট হতে] প্রথমে আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত গম কজা কর, অতঃপর তা তোমার পাওনা হিসেবে কজা কর। তারপর দাদনদাতা উক্ত গম প্রথমে দাদনগ্রহীতার পক্ষ হয়ে মেপে নিল, তারপর নিজের জন্য পুনরায় মেপে নিল। তাহলে সে তার প্রাপ্য গম কজাকারী রূপে গণ্য হবে। সূতরাং এরপর তা ধ্বংস হলে তা দাদনদাতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اِخْتَمَمَتِ الصَّفَقَاتُ بِشَرْطِ الْكَفْلِ الْخ: উক্ত মাসআলায় দাদনদাতার যে দু-বার পরিমাপ করা অপরিহার্য তার দলিল হলো, এখানে একরূপ দুটি বিক্রয়চুক্তি একত্রিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিতে পরিমাপ করে গ্রহণ করা অপরিহার্য। দুটির একটি হলো, দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] এবং সে যার কাছ থেকে উক্ত গম ক্রয় করে দিলে তাদের উভয়ের মাঝে সম্পাদিত বিক্রয়চুক্তি। আর অপরটি হলো, দাদনগ্রহীতা এবং দাদনদাতার মাঝে সম্পাদিত বিক্রয়চুক্তি। আর যখন একরূপ দুটি চুক্তি একত্রিত হয়েছে তখন উভয় চুক্তির হস্তান্তর বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য দু-বার পরিমাপ করা অপরিহার্য হবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجُوزَ فَيْهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَايَعِ وَصَاعُ الشُّعْرَى.

"নবী করীম ﷺ খাদদ্রব্য [ক্রয়ের পর তা] দু-বার পরিমাপ করা বাতীত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একবার বিক্রেতার পরিমাপ, আরেকবার ক্রেতার পরিমাপ।" এ হাদীসটির এটাই অর্থ। অর্থাৎ যখন ক্রেতা ক্রয়ের পর তা আবার দ্বিতীয় কোনো ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে, তখন দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা পুনরায় পরিমাপ করা আবশ্যিক। এমনকি সে প্রথম ক্রেতার ক্রয়ের সময় উপস্থিত থেকে তার পরিমাপ প্রত্যক্ষ করে থাকলেও। [উল্লেখ্য, উক্ত হাদীসটি মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে الرَّابِعَةُ وَالثَّانِيَةُ-এর শেষে একটি অনুচ্ছেদ (فَصْلٌ)-এ ৫৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মুসনাদে বাযযারে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে جَزْدٌ সনদে এবং মুসনাদে বাযযার, সুনানে দারাকুতনী ও মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবায় হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَالسَّلَامُ إِنْ كَانَ سَائِلَ الْخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, উল্লিখিত মাসআলায় দাদনগ্রহীতা যে অপর ব্যক্তি থেকে উক্ত গম ক্রয় করেছে সে চুক্তি তো হয়েছে পরবর্তীতে পক্ষান্তরে দাদনগ্রহীতা ও দাদনদাতার মাঝে 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি হয়েছিল তার অনেক পূর্বে। সূতরাং উক্ত গম দাদনগ্রহীতা ক্রয় করার পর তাতে আর নতুন কোনো চুক্তি হচ্ছে না। অতএব, তাতে দুটি বিক্রয় চুক্তি একত্রিত হচ্ছে না। কাজেই দু-বার পরিমাপ করার অবশ্যকতা কেন হবে? কেননা, উল্লিখিত হাদীসের অর্থ হলো, কেউ খাদদ্রব্য ক্রয়ের পর তা আবার বিক্রয় করলে তখন দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা আবার পরিমাপ করা আবশ্যিক হবে।

মুসান্নিফ (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, দাদনদাতা এবং দাদনগ্রহীতার মাঝে সম্পাদিত 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি যদিও অনেক পূর্বে সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু তার দ্রব্য [এক কুর গম] দাদনদাতা হস্তগত করছে দাদনগ্রহীতা উক্ত গম অপর ব্যক্তি থেকে ক্রয় করার পর। আর দাদনদাতার এ হস্তগত করা 'নতুন বিক্রয়'-এর সমপর্যায়ের বলে গণ্য হবে। এভাবে দাদনগ্রহীতা গম ক্রয়ের পর তাতে আরেকটি বিক্রয়চুক্তি হয়েছে বলে সাব্যস্ত হলো, তাই তাতে দু-বার পরিমাপ করা আবশ্যিক হবে।

বাকি রইল এ বিষয়টি যে, দাদনদাতার উক্ত হস্তগত করা কেন নতুন বিক্রয় বলে গণ্য হবে অথচ 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি 'হা পূর্বেই হয়েছিল'। এখন তো শুধু হস্তগত করছে। মুসান্নিফ (ব.) **لَا يَزَالُ الْمَعِينُ غَيْرَ الدَّيْنِ حَقِيقَةً** বলে এর ব্যাখ্যা করছেন এর ব্যাখ্যা হচ্ছে- দাদনগ্রহীতার জিম্মায় 'বায় সলম'-এর কারণে যে এক কুর গম হস্তান্তর করা ওয়াজিব হয়েছিল, তা ওয়াজিব হয়েছিল অনির্দিষ্টভাবে শর্ত মোতাবেক যে কোনো গম।

আর একরূপ ওয়াজিব বস্তুকে দাইন (دَيْن) বলে। সুতরাং দাদনগ্রহীতার ক্রয়কৃত গম যখন দাদনদাতা হস্তান্তর করছে তখন তা নির্দিষ্ট গম হলো, আর এটাকে **عَيْن** বা নির্দিষ্ট বস্তু বলে। অতএব, জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া অনির্দিষ্ট বস্তু (دَيْن)-এর বিনিময়ে যখন নির্দিষ্ট বস্তু (عَيْن) প্রদান করছে তখন বিষয়টি একরূপ গণ্য হবে না যে, যা জিম্মায় ওয়াজিব ছিল এবং যা সে পরিশোধ করল উভয়টি হুবহু একই বস্তু; বরং একরূপ গণ্য হবে যে, যা জিম্মায় ওয়াজিব ছিল তার বিনিময়ে পরিশোধকৃত বস্তুটি সেন ক্রয় করে নিচ্ছে। এভাবে দাদনদাতা উক্ত এক কুর গম হস্তগত করার সময় যেন নতুনভাবে ক্রয় করল।

**الْعَنْ قَوْلَهُ وَإِنْ جُمِلَ عَلَيْهِ فَرَضٌ حُكْمُ خَائِرِ الْعَنْ** মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে একটি দিক থেকে উক্ত "দাদনগ্রহীতার জিম্মায় হা ওয়াজিব ছিল এবং যা সে পরিশোধ করেছে" এ উভয়কে হুবহু একই বস্তু হিসেবে গণ্য করতে হবে। তা হলো ইতঃপূর্বে এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, দাদনগ্রহীতার উপর যে, দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করা ওয়াজিব তা দাদনদাতা 'হস্তগত' করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা হারাম। অতএব, শর্ত মোতাবেক হস্তান্তরকৃত গমকে যদি জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া গমের পরিবর্তে গণ্য করা হয়, তাহলে তা হারাম হচ্ছে। আর তাহলে তো দাদনকৃত দ্রব্য কোনোভাবেই হস্তান্তর করা সম্ভব থাকছে না। তাই এ ক্ষেত্রে এটা হুবহু একই বস্তু বলে গণ্য করতে হবে- বিনিময় বা পরিবর্তন বলে গণ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আলোচ্য মূল মাসআলায় দু-বার পরিমাণ আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে পরিবর্তন বা বিনিময় তখন নতুন বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে।

**الْعَنْ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَا وَكَانَ قَرْضًا الْعَنْ** এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন। তা হলো, আমাদের প্রথমে বর্ণিত মূল মাসআলাটি যদি 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে না হয়ে 'কর্জ' গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়, যেমন- কোনো ব্যক্তি কারো নিকট হতে এক কুর গম কর্জ হিসেবে নিল। অতঃপর কর্জ পরিশোধের সময় সে অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে এক কুর গম খরিদ করে নিজের হস্তগত না করে কর্জদাতাকে বলল, 'তুমি অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে এক কুর গম তোমার পাওনা গম হিসেবে হস্তগত করে নাও। আর কর্জদাতা তা একবার পরিমাপ করে হস্তগত করে নিল। তাহলে এই একবার পরিমাপ করার দ্বারা সে তার প্রাপ্য উসুলকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে দু-বার পরিমাপ করার আবশ্যকতা থাকবে না।

এর কারণ হলো, কর্জ বিধানগতভাবে 'আরিয়াত' (الْعَارِيَّةُ) বা ধার গ্রহণ হিসেবে গণ্য হয়। আর আরিয়াত বা ধার গ্রহণ বলি- হয়- কোনো বস্তু কারো থেকে এ শর্তে গ্রহণ করা যে, মূল বস্তুটি মালিককে ফিরিয়ে দিবে আর কিছু সময়ের জন্য সে তা থেকে উপকৃত হবে [যেমন- রান্না করার জন্য কারো কাছ থেকে একটি পাতিল ধার গ্রহণ করল]। আর কর্জের ক্ষেত্রে যদিও মূল বস্তুটি খরচ করে তার অনুরূপ বস্তু কর্জদাতাকে দেওয়া হয় তবুও বিধানগত দিক থেকে তাকে আরিয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যথায় 'রিবা'র আওতাভুক্ত হয়ে হারাম হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, যদি কোনো ওজন-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য তার একই **جَنْس**-এর দ্রব্যের বিনিময় পরিবর্তন করে, তাহলে তা বাকির শর্তে হলে রিবা [সুদ]-এর অর্ন্তভুক্ত হয়। তাই কর্জকে বিধানগত দিক থেকে (**حُكْمًا**) সর্বক্ষেত্রে আরিয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই আরিয়াতের শব্দ দ্বারা কর্জের চুক্তি সहीহ হয়ে যায়, যেমন কেউ যদি বলে **هَذَا الْقَرْضُ أَتَرْتَهُ** 'আমি তোমাকে এ দিরহামগুলো আরিয়াত হিসেবে দিলাম' তাহলে তা কর্জ-চুক্তি রূপে সहीহ হয়ে যায়। অতএব যখন কর্জ পরিশোধ করা হয় তখন তাকে আরিয়াতের ন্যায় মূল বস্তুটিই ফেরত দিয়েছে একরূপ গণ্য করা হবে। তাই তাকে নতুন বিনিময় বা বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে না। কাজেই উক্ত মাসআলায় দুটি বিক্রয়চুক্তি একত্রিত হচ্ছে না, তাই দু-বার হস্তগত করা আবশ্যক হবে না।

قَالَ : وَمَنْ أَسْلَمَ فِي كُرٍّ فَأَمَرَ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكْنِيْلَهُ الْمُسْلِمُ الْيَوْنِي غَرَائِرَ رَبِّ السَّلَمِ فَفَعَلَ، وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْكَفِيلِ لَمْ يَصُحَّ، لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادَفْ بِمِلْكِ الْأَمِيرِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الدِّينِ دُونَ الْعَيْنِ، فَصَارَ الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ مُسْتَعْبِرًا لِلْغَرَائِرِ مِنْهُ وَقَدْ جَعَلَ مِلْكُ نَفْسِهِ فِيهَا، فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ دِينَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ كَيْسًا لِيَزِنَهَا الْمَدْيُونُ فِيهِ لَمْ يَصِرْ قَائِمًا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক কুর [গমের] জন্য 'বায় সলম' করে আর দাদনদাতা দাদনগ্রহীতাকে উক্ত গম দাদনদাতার বস্তায় মেপে ভরার জন্য নির্দেশ দেয় আর সে দাদনদাতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে এটা দাদন-দ্রব্য পরিশোধ বলে গণ্য হবে না। কেননা, [দাদনদাতার] নির্দেশ সঠিক হয়নি। কারণ, তার নির্দেশটি তার মালিকানাভুক্ত বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়নি। কেননা, তার অধিকার হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্তুর উপর- নির্ধারিত সেই বস্তুর উপর নয়। ফলে বিষয়টি এমন হলো যেন দাদনগ্রহীতা দাদনদাতার কাছ থেকে বস্তুগুলো ধার নিয়ে তাতে নিজের মালিকানার বস্তু রাখল। সুতরাং এটা এমন হলো যেন তার নিকট কারো কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। অতঃপর পাওনাদার একটি থলে দেনাদারের নিকট দিল যেন সে দিরহামগুলোর মেপে ভরে দেয়। এতে পাওনাদার দিরহামগুলোর কজাকারী হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ أَسْلَمَ فِي كُرٍّ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ কারো নিকট হতে এক 'কুর' [যাট কফীয় পরিমাণ] গম 'বায় সলম' হিসেবে ক্রয় করল, অতঃপর যখন তা পরিশোধের সময় হলো তখন দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ফীহ]-কে কতগুলো বস্তু দিয়ে বলল, তুমি এগুলোতে আমার প্রাপ্য গম মেপে দাও। এ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা যদি দাদনদাতার অনুপস্থিতিতে উক্ত গম দাদনদাতার বস্তায় মেপে ভরে দেয়, তাহলে এটা হস্তান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। দাদনদাতা পুনরায় তার প্রাপ্য দাবি করতে পারবে। পক্ষান্তরে দাদনগ্রহীতা তা মেপে দেওয়ার সময় যদি দাদনদাতা উপস্থিত থাকে, তাহলে [বস্তুগুলো যারই হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই] তা হস্তান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

দলিল হলো, দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] যে দাদনগ্রহীতাকে গমগুলো উক্ত বস্তায় মেপে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তার এ নির্দেশ সঠিক হয়নি। কারণ হলো, নির্দেশের সময় গমগুলোতে দাদনদাতার অধিকার সাব্যস্ত হয়নি; বরং তা দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর মালিকানাধীন। দাদনদাতার অধিকার এবং মালিকানা সাব্যস্ত হবে তা হস্তগত করার পর। কেননা, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] দাদনগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হয় অনির্দিষ্টভাবে [দাইন] হিসেবে। ফলে হস্তান্তরের পূর্বে নির্দিষ্ট কোনো দ্রব্যে দাদনদাতার মালিকানা বা অধিকার হয় না। সুতরাং দাদনদাতার উক্ত নির্দেশটি তার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার কারণে অকার্যকর বলে গণ্য হবে। অতএব, যখন দাদনগ্রহীতা দাদনদাতার অনুপস্থিতিতে গম মেপে বস্তায় ভরেছে তখন তা হস্তান্তর এবং দাদনদাতার কজা হয়েছে বলে গণ্য হবে না; বরং এরূপ গণ্য হবে যে, দাদনগ্রহীতা বস্তুগুলো ধার নিয়ে তাতে নিজের মালিকানার বস্তু ভরে রেখে দিয়েছে। কাজেই তা ধ্বংস হলে দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকেই ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ : উপরিউক্ত মাসআলার একটি নজির হলো, যেমন কেউ কারো নিকট হতে কিছু দিরহাম ঋণ নিল, অতঃপর ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে একটি থলে দিয়ে বলল, তুমি এ থলিতে আমার প্রাপ্য দিরহামগুলো মেপে ভরে দাও, তাহলে এ ক্ষেত্রেও যদি ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার অনুপস্থিতিতে দিরহামগুলো মেপে ভরে রেখে দেয় তাহলে তা ঋণদাতা হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রেও কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বের মাসআলায় উল্লেখ করেছি।

وَلَوْ كَانَتِ الْجَنْطَةُ مُشْتَرَاةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا صَارَ قَائِضًا، لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ صَحَّ حِينَ صَادَقَ وَلَكَ، لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعَيْنِ بِالْبَيْعِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالطَّحْنِ كَانَ الطَّحْنُ فِي السَّلَمِ لِلْمُسْلِمِ إِلَيْهِ وَفِي الشِّرَى لِلْمُشْتَرِي لِصِحَّةِ الْأَمْرِ، وَكَذَا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّهُ فِي الْبَحْرِ فِي السَّلَمِ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ وَفِي الشِّرَى مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَتَقَرَّرَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهَذَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ الْكَيْلِ فِي الشِّرَى فِي الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْكَيْلِ، وَالْقَبْضُ بِالْوُقُوعِ فِي غَرَائِرِ الْمُشْتَرِي.

অনুবাদ : আর পূর্বোল্লিখিত মাসআলায় গম ‘বায় সলম-এর’ না হয়ে সাধারণভাবে ক্রয়কৃত হয়, তাহলে ক্রেতা কজাকারী হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার নির্দেশ তার মালিকানাভুক্ত বস্তুর সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ, সে ক্রয়ের দ্বারা ই নির্ধারিত বস্তুটির মালিক হয়ে যায়। লক্ষ্য করে দেখ, যদি সে বিক্রেক্তাকে গম পেষার নির্দেশ দেয়, তাহলে ‘বায় সলম-এর’ ক্ষেত্রে আটাগুলো দাদনগ্রহীতার মালিকানাভুক্ত হয়। আর সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে তা নির্দেশ সঠিক হওয়ার কারণে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয়। তদ্রূপ যদি তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় [আর বিক্রেক্তা সেই নির্দেশ পালন করে] তাহলে ‘বায় সলম-এর’ ক্ষেত্রে তা দাদনগ্রহীতা [বিক্রেতা]-এর সম্পদ থেকে ধ্বংস হবে, আর সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উল্লিখিত কারণে [অর্থাৎ নির্দেশ সঠিক হওয়ার কারণে] তা ক্রেতার সম্পদ থেকে ধ্বংস হবে এবং ক্রেতার উপর তার মূল্য সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই বিশুদ্ধ মতানুসারে সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ একটি পরিমাপই যথেষ্ট হবে। কেননা, বিক্রেক্তা পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর ক্রেতার বস্তায় গম সংরক্ষিত হওয়ার দ্বারা ক্রেতার পক্ষে কজা বাস্তবায়িত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ الْجَنْطَةُ الْخ: পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] দাদনগ্রহীতাকে কিছু বস্তু দিয়ে বলে যে, আমার প্রাপ্য গম এগুলোতে মেপে দাও, অতঃপর দাদনগ্রহীতা দাদনদাতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে দাদনদাতা তা কজাকারী হয়েছে বলে গণ্য হবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে যে, যদি উক্ত মাসআলাটি ‘বায় সলম’-এর না হয়ে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে ক্রেতা কজাকারী হবে। অর্থাৎ যদি কেউ কারো নিকট হতে ‘বায় সলম’ হিসেবে নয়; বরং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এক ‘কুর’ পরিমাণ গম ক্রয় করে এবং ক্রেতা বিক্রেক্তাকে কতগুলো বস্তা দিয়ে বলল, তুমি এ বস্তাগুলোতে আমার গম মেপে ভরে দাও। অতঃপর বিক্রেক্তা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা মেপে ভরে রাখল, তাহলে ক্রেতা উক্ত গম কজাকারী হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং মেপে ভরে রাখার পর যদি বিক্রেক্তার কাছে থাকা অবস্থায়ই গমগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা ক্রেতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে, পুনরায় সে তা দাবি করতে পারবে না; বরং মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে।

‘বায় সলম’ এবং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে উল্লিখিত পার্থক্যের কারণ হলো, ‘বায় সলম’-এর ক্ষেত্রে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর নির্দেশ সঠিক ছিল না, যার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যখন তার বস্তায় গম মেপে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তখন তার নির্দেশ সঠিক ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ হলো, সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যখন কোনো দ্রব্য ক্রেতা ক্রয় করে, তখন

ক্রয়ের সাথে সাথে বিক্রীত-দ্রব্য ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং যখন ক্রেতা তার বস্তায় মেপে ভরে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তখন তার নির্দেশটি তার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে নির্দেশটি সঠিক ও যথার্থ ক্ষেত্রে হয়েছে। অতঃপর যখন বিক্রোতা গমগুলো মেপে ক্রেতার বস্তায় ভরে দিয়েছে তখন বস্তাগুলো যেহেতু ক্রেতার মালিকানাধীন এবং বিধানগত দিক থেকে (حُكْمًا) ক্রেতারই কজায় রয়েছে, সেহেতু তাতে যা ভরে দেওয়া হয়েছে তাও তার কজার অধীনে চলে এসেছে বলে গণ্য হবে। এভাবে ক্রেতা উক্ত গমের কজাকারী সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ زَامَهُ بِالطَّمْرِ الْخ: পূর্বে যে পার্থক্যের কথা বলা হলো, অর্থাৎ 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দানদাতা (রাব্বুস সলম) দানদাতৃত্ব দ্রব্য কজা করার পূর্বে তাতে দানদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্য ক্রেতা কজা করার পূর্বেই তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এ পার্থক্যের উপর ভিত্তিশীল উপরে উল্লিখিত মাসআলার অনুরূপ। দুটি উদাহরণ মুসান্নিফ (র.) এখানে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম উদাহরণ হলো, 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত গমের ক্ষেত্রে যদি দানদাতা (রাব্বুস সলম) গমগুলো কজা করার পূর্বে দানদান্বহীতাকে তা ভাগিয়ে আটা বানাতে বলে আর দানদান্বহীতা তা পালন করে, তাহলে আটা দানদান্বহীতার হবে-দানদাতার হবে না। কেননা, কজা করার পূর্বে গম দানদাতার মালিকানায় আসেনি, তাই তার নির্দেশ সঠিক স্থলে হয়নি। সুতরাং দানদাতার জন্য সে আটা গ্রহণ করা হারাম হবে। কারণ, তার প্রাপ্য 'গম' সে কজা করার পূর্বে সে তা দানদান্বহীতার আটা দ্বারা পরিবর্তন করেছে যা 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে জায়েজ নয়।

পক্ষান্তরে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রয়কৃত গমের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা গম কজা করার পূর্বে বিক্রোতাকে তা ভাগিয়ে আটা বানাতে বলে আর বিক্রোতা তা পালন করে, তাহলে আটা ক্রেতার হবে। কেননা, ক্রয়ের সাথে সাথেই তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তার নির্দেশ সঠিক স্থলে হয়েছে। আর বিক্রোতা ক্রেতার নির্দেশ অনুসারে তার প্রতিনিধি হিসেবে গম ভাগিয়েছে। সুতরাং আটা ক্রেতারই মালিকানাধীন হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا أَمَرَ أَنْ يَصَبَّهُ فِي الْبَحْرِ الْخ: দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত গমের ক্ষেত্রে যদি দানদাতা (রাব্বুস সলম) গমগুলো হস্তগত করার পূর্বে দানদান্বহীতাকে তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় আর দানদান্বহীতা তা পালন করে, তাহলে তা দানদান্বহীতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রোতাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে তা ক্রেতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ পার্থক্যের কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করলাম। অর্থাৎ 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দানদাতৃত্ব দ্রব্য (মুসলাম ফীহ) অনিদিষ্টভাবে ওয়াজিব হওয়ার কারণে তা হস্তগত করার পূর্বে তাতে দানদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। ফলে তার নির্দেশ সঠিক বলে গণ্য হয় না। আর সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত দ্রব্য কজা করার পূর্বেই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, ফলে তার নির্দেশ সঠিক ক্ষেত্রে হয়েছে বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَكُونُ بِذَلِكَ الْكَفْلُ فِي الشَّرَى فِي الصَّحِيحِ الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা যে বলেছি, সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়ের সাথে সাথে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, ফলে ক্রয়কৃত দ্রব্যে তার নির্দেশ সঠিক বলে গণ্য হয়, এ কারণেই বিত্বক্ক মতানুযায়ী ক্রেতা যদি বিক্রোতাকে গমগুলো তার বস্তায় মেপে ভরে দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং বিক্রোতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে বিক্রোতার এ পরিমাপই ক্রেতার জন্য যথেষ্ট হবে। ক্রেতার জন্য তা পুনরায় পরিমাপ করা আবশ্যিক হবে না। আর গম ক্রেতার কজাভুক্ত হয়ে যাবে।

একটি প্রশ্ন ও তার সদ্ব্তর :

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ক্রেতা অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় বিক্রোতা গমগুলো মেপে ভরার দ্বারা কিভাবে ক্রেতার হস্তগত হবে এবং তার জন্য উক্ত পরিমাপই কিভাবে যথেষ্ট হবে? তাহলে তো একই ব্যক্তি অর্পণকারী এবং গ্রহণকারী হওয়া আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা অসম্ভব। মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এই বলে غَرَّابٍ فِي غَرَّابٍ অর্থাৎ যেহেতু বস্তাগুলো ক্রেতার, তাই ক্রেতার নির্দেশে যখন গমগুলো তাতে ভরে দেওয়া হচ্ছে তখন ক্রেতাই কজাকারীরূপে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বিক্রোতা গ্রহণকারী হচ্ছে না; বরং ক্রেতার বস্তায় গম প্রবেশ করানোর দ্বারা ক্রেতার কজা হয়ে যাবে। সুতরাং বিক্রোতা কেবল অর্পণকারী হলো, গ্রহণকারী হলো না।

وَلَوْ أَمَرَهُ فِي الشِّرْئِ أَنْ يَكْبِلَهُ فِي غَرَائِرِ الْبَائِعِ فَعَمَلٌ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا، لِأَنَّهُ  
 اسْتَعَارَ غَرَائِرَهُ وَلَمْ يَفْقِضْهَا فَلَا تَصِيرُ الْغَرَائِرُ فِي يَدِهِ، فَكَذَا مَا يَنْعُقُ فِيهَا،  
 وَصَارَ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْبِلَهُ وَيَعْزِلَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِ الْبَائِعِ، لِأَنَّ الْبَيْتَ  
 يَنْوَاجِيهِ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَصِرِ الْمُشْتَرِي قَابِضًا -

অনুবাদ : কিন্তু সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও যদি ক্রেতা বিক্রেতার বস্তায় গমগুলো মেপে ভরার জন্য নির্দেশ দেয়, আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে ক্রেতা কজাকারী হলো না। কেননা, সে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার বস্তু ধার নিয়েছে, কিন্তু তা কজা করেনি। সুতরাং বস্তু যেদ্রুপ তার হস্তগত হয়নি তদ্রুপ তার ভিতরের গমও হস্তগত হয়নি। ফলে বিষয়টি এমন হলো যে, ক্রেতা গমগুলো মেপে বিক্রেতার ঘরের কোনো এক কোণে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিল। কেননা, সকল কোণসহ ঘরটি বিক্রেতার দখলেই রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা কজাকারী হয়নি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ فِي الشِّرْئِ الخ : পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, ক্রেতা যদি তার নিজের বস্তু বিক্রেতাকে দিয়ে তাতে গম মেপে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে তাহলে ক্রেতা গম কজাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর এখানে বলা হচ্ছে, কিন্তু ক্রেতা যদি নিজের বস্তু না দিয়ে বিক্রেতাকে বলে যে, তুমি তোমার বস্তায় আমার প্রাপ্য গমগুলো মেপে ভরে দাও আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে ক্রেতা উক্ত গমের কজাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না।

কারণ, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার বস্তু ধার নিয়েছে। আর ধার করা বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধার গ্রহণকারী কজা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ধার নেওয়া হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় না। কাজেই বিক্রেতার বস্তু বিক্রেতার কজায়ই রয়ে গেল। ফলে সে বস্তায় যে গম রাখা হবে তা-ও বিক্রেতার কজাভুক্ত হবে- ক্রেতার কজাভুক্ত হবে না।

মাসআলাটি এরূপ হলো, যেমন কেউ কারো নিকট হতে কোনো দ্রব্য ক্রয়ের পর বিক্রেতাকে বলল, তুমি দ্রব্যগুলো মেপে তোমার ঘরের এক কোণে রেখে দাও। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে ক্রেতা উক্ত দ্রব্যের কজাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, সম্পূর্ণ ঘর বিক্রেতারই কজাভুক্ত রয়েছে, কাজেই তাতে যা কিছু রাখা হবে তাও বিক্রেতার কজাভুক্তই থেকে যাবে।

وَلَوْ اجْتَمَعَ الدِّينُ وَالْعَيْنُ وَالْغَرَائِرُ لِلْمُشْتَرَىٰ إِنْ بَدَأَ بِالْعَيْنِ صَارَ قَابِضًا، أَمَّا  
 الْعَيْنُ فَلِصَحَّةِ الْأَمْرِ فِيهِ، وَأَمَّا الدِّينُ فَلِإِتِّصَالِهِ بِمِلْكِهِ وَيُغْلِبُ بِصِرِّ قَابِضًا،  
 كَمَنْ اسْتَفْرَضَ جَنْطَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا فِي أَرْضِهِ، وَكَمَنْ دَفَعَ إِلَى صَانِعٍ خَاتَمًا  
 وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَإِنْ بَدَأَ بِالدِّينِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا، أَمَّا الدِّينُ  
 فَلِعَدَمِ صِحَّةِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا الْعَيْنُ فَلِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمِلْكِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَصَارَ  
 مُسْتَهْلِكًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) فَيَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، وَهَذَا الْخَلَطُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ بِهِ  
 مِنْ جِهَتِهِ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْبِدَايَةَ بِالْعَيْنِ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ  
 نَقْضُ الْبَيْعِ وَإِنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَخْلُوطِ، لِأَنَّ الْخَلَطَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكِ عِنْدَهُمَا .

অনুবাদ : আর যদি অনির্ধারিত বস্তু [দাইন] এবং নির্ধারিত বস্তু [আইন] একত্রিত হয় আর বস্তা ক্রেতারই হয়, তাহলে নির্ধারিত বস্তু আগে মাপলে ক্রেতা [উভয় প্রকারের] কজাকারী হিসেবে গণ্য হবে। নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে কারণ হলো, তার নির্দেশ সঠিক ছিল। আর অনির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে কারণ হলো, সেটা [তার মালিকানাভুক্ত না হলেও] তার মালিকানাভুক্ত বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে গেছে। আর এভাবেও কজা সাব্যস্ত হয়। যেমন— কেউ গম ঋণ নিল এবং ঋণগ্রহীতা তার জমিতে ঋণদাতাকে উক্ত গম বপন করতে নির্দেশ দিল [তাহলে ঋণগ্রহীতা তা কজাকারীরূপে গণ্য হবে]। অথবা যেমন কোনো ব্যক্তি স্বর্ণকারের নিকট একটি আংটি দিয়ে তাতে স্বর্ণকারের পক্ষ থেকে অর্ধ দিনার যুক্ত করার নির্দেশ দিল [তাহলে উক্ত ব্যক্তি তা কজাকারী রূপে গণ্য হবে]। আর [পূর্বে উল্লিখিত মাসআলায়] যদি সে অনির্ধারিত বস্তু [দাইন] আগে মেপে দেয়, তাহলে ক্রেতা [কোনোটাই] কজাকারী হবে না। অনির্ধারিত বস্তু [বা দাইন]-এর ক্ষেত্রে কারণ হলো, [মালিকানা না থাকায়] তার নির্দেশ সঠিক হয়নি। আর নির্ধারিত বস্তু [আইন]-এর ক্ষেত্রে কারণ হলো, বিক্রেতা তা সমর্পণ করার পূর্বেই নিজের মালিকানাভুক্ত বস্তু [অর্থাৎ প্রথমে পরিমাপিত অনির্ধারিত বস্তু]-এর সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতা বিক্রীত মাল ধ্বংসকারী হলো। সুতরাং [হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রীত মাল ধ্বংস হওয়ার কারণে] বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে : আর এ মিশ্রণ ক্রেতার পক্ষ থেকে সত্ত্বষ্টিসূচক ছিল বলে গণ্য হবে না। কেননা, হতে পারে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল নির্ধারিত বস্তুটি প্রথমে মাপা। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বিক্রয়চুক্তি রহিত করবে আর ইচ্ছা করলে সে মিশ্রিত দ্রব্যে বিক্রেতার সাথে শরিক হবে। কেননা, সাহেবাইন (র.)-এর মতে মিশ্রিতকরণ ধ্বংস করার অন্তর্ভুক্ত নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَنَعَ الدِّينَ وَالْعَمَلُ النِّعَ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ কারো নিকট হতে এক মণ পরিমাণ গম 'বায় সলম' হিসেবে ক্রয় করল, অতঃপর যখন দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] পরিশোধের সময় হলো তখন দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] দাদনগ্রহীতার নিকট হতে আরো এক মণ [নির্দিষ্ট] গম সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়-এর ভিত্তিতে ক্রয় করল। [এভাবে দাদনগ্রহীতার উপর দু-মণ গম হস্তান্তর করা ওয়াজিব হলো। এক মণ 'বায় সলম'-এর যা অনির্দিষ্ট [দাইন] আর এক মণ সাধারণ বিক্রয়ের বা নির্দিষ্ট [আইন]।] অতঃপর দাদনদাতা [ক্রেতা] দাদনগ্রহীতা অর্থাৎ বিক্রেতাকে কয়েকটি বস্তা দিয়ে বলল, তুমি এগুলোতে উভয় মণ গম মেপে ভরে দাও। অতঃপর দাদনদাতা [বিক্রেতা] দাদনগ্রহীতার অনুপস্থিতিতে তা মেপে ভরে রাখল। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি বিক্রেতা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণ গম প্রথমে মেপে ভরে আর 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণ গম পরে ভরে, তাহলে ক্রেতা উভয় মণ গমের কজাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ أَمَّا الْعَيْنُ فَلِصِغَةِ الْأَمْرِ فِيهِ النِّع : এ ক্ষেত্রে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণের কজাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ পূর্ববর্তী মাসআলার দ্বারাই স্পষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্য হয় নির্দিষ্ট বস্তু এবং ক্রয়ের সাথে সাথে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ক্রেতার বস্তায় ভরে দেওয়ার নির্দেশটি তার মালিকানা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তা সঠিক হয়েছে আর গমগুলো তার বস্তায় তার নির্দেশে ভরে দেওয়ার মাধ্যমে তার কজা সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

আর 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত এক মণ গমের কজাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, [যদিও 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত দ্রব্য অনির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব হয় এবং তা কজা করার পূর্বে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। ফলে তার নির্দেশটি মালিকানাধীন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়নি, তবুও এ ক্ষেত্রে কজাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো,] 'বায় সলম'-এর গমগুলো ক্রেতার নির্দেশে তার অপর এক মণ গমের সাথে [যা তার মালিকানাধীন ছিল এবং ইতোমধ্যে তার কজাভুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে তার সাথে] মিশ্রিত করা হয়েছে। আর এভাবে সম্বতক্রমে যদি ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে বিক্রীত-দ্রব্য মিশ্রিত করে দেওয়া হয়, তাহলে ক্রেতার কজা সাব্যস্ত হয়ে যায়। মুসান্নিফ (র.) এর দুটি উদাহরণ উল্লেখ করছেন—

১. قَوْلُهُ كَسَى اسْتَقْرَصَ حَنْطَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا فَبَى أَرْجَمَ : যেমন কোনো ব্যক্তি কারো নিকট হতে কিছু গম কর্জ নিল, কিন্তু নিজে তা কজা না করে কর্জদাতাকে বলল তুমি গমগুলো আমার জমিতে বপন করে দাও। অতঃপর কর্জদাতা কর্জগ্রহীতার অনুপস্থিতিতে তা বপন করে দিল, তাহলে কর্জগ্রহীতা উক্ত গমের কজাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ, গমগুলো তার সম্বত্তিতে তার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে।

২. قَوْلُهُ وَكَسَنَ دَعَعَ إِلَى صَانِعٍ خَاسًا : অথবা যেমন কোনো ব্যক্তি স্বর্ণকারকে একটি আংটি দিয়ে বলল, তুমি এতে তোমার পক্ষ থেকে অর্ধ দিনার পরিমাণ স্বর্ণ যুক্ত করে দিবে। অতঃপর স্বর্ণকার আংটিদাতার মালিকের অনুপস্থিতিতে তাতে অর্ধ দিনার পরিমাণ যুক্ত করে দিল, তাহলে আংটির মালিক উক্ত অর্ধ দিনারের কজাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও একই কারণ।

قَوْلُهُ وَإِنْ بَدَأَ بِاللَّيْنِ لَمْ يَبْرَ قَابِصًا النِّع : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলায় যদি বিক্রেতা [মুসলাম ইলাহি] সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের এক মণ গম প্রথমে বস্তায় না ভরে; বরং 'বায় সলম'-এর এক মণ আগে ভরে আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণ পরে ভরে, তাহলে ক্রেতা [রাব্বুস সলম] কোনো প্রকার গমেরই কজাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।



'বায় সলম'-এর এক মণের কজাকারী না হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট, অর্থাৎ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয়কৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] বিক্রেতার জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়, ফলে তা কজা করার পূর্বে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং মালিকানা না থাকার কারণে বস্তায় মেপে দেওয়ার ক্রেতার নির্দেশটি সঠিক ছিল না। তাই ক্রেতার অনুপস্থিতিতে মেপে দেওয়ার মাধ্যমে ক্রেতা কজাকারী সাব্যস্ত হবে না।

আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে এক মণের কজাকারী না হওয়ার কারণ হলো, প্রথমে যে এক মণ বস্তায় ভরা হয়েছে [অর্থাৎ 'বায় সলম'-এর এক মণ] তা তো বিক্রেতার মালিকানারই রয়ে গেছে। অতঃপর যখন সাধারণ বিক্রয়ের এক মণ ভরেছে তখন বিষয়টি এমন হয়েছে যে, বিক্রেতা বিক্রীত-দ্রব্য ক্রেতাকে হস্তান্তর করার পূর্বে তা আবার নিজের মালিকানাধীন এমন বস্তুর সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে যা থেকে আর পৃথক করা সম্ভব নয়। কেননা, বস্তায় একত্র করার পর উক্ত সাধারণ বিক্রয়ের এক মণ আর পৃথক করা সম্ভব হবে না। আর বিক্রেতা যদি এরূপ করে, তাহলে এরূপ বিক্রীত-দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রীত-দ্রব্যটি বিক্রেতা হস্তান্তরের পূর্বে ধ্বংস করে ফেলেছে বলে গণ্য হবে। ফলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দ্রব্যটি ধ্বংস করে ফেলেছে বলে গণ্য হবে না: বরং ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করে দিতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে মিশ্রিত দ্রব্যে বিক্রেতার সাথে অংশীদার হতে পারবে। অর্থাৎ যতটুকু ক্রেতার ছিল ততটুকু পরিমাণ ভাগ করে নিয়ে নিবে।

সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সাধারণ বিক্রয়ের এক মণের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে আর 'বায় সলম'-এর এক মণ বিক্রেতা পুনরায় ক্রেতাকে হস্তান্তর করবে।

الْخَلَطُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ الْخ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যে 'উক্ত বিক্রীত-দ্রব্য বিক্রেতা ধ্বংস করে ফেলেছে বলে গণ্য হবে' এর উপর একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, মুসান্নিফ (র.) তার উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য মাসআলায় বিক্রেতা উক্ত গম 'বায় সলম'-এর গমের সাথে মিশ্রিত করেছে ক্রেতার নির্দেশে, কাজেই তা বিক্রেতা ধ্বংস করেছে বলে গণ্য হবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, উক্ত নির্দেশের কারণে এভাবে মিশ্রিত করার প্রতি ক্রেতার সম্মতি ছিল বলে সাব্যস্ত হবে না। কারণ, হতে পারে ক্রেতার উদ্দেশ্য ছিল আগে সাধারণ বিক্রয়ের এক মণ মেপে বস্তায় ভরা তারপর 'বায় সলম'-এর এক মণ বস্তায় ভরা, যাতে ক্রেতার কজা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর বিক্রেতা তার বিপরীত করে 'বায় সলম'-এর এক মণ আগে ভরেছে, কাজেই তাতে ক্রেতার সম্মতি ছিল বলে গণ্য হবে না। সুতরাং তা ধ্বংস করেছে বলে সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَمَنْ أَسْلَمَ جَارِيَةً فِي كُرِّ حَنْطَةٍ وَقَبَضَهَا الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ ثُمَّ تَقَايَلَا فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبْضِهَا ، وَلَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ جَاَزَ ، لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ تَعْتَمِدُ بَقَاءَ الْعَقْدِ ، وَذَلِكَ بِقِيَامِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَفِي السَّلَمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُسْلِمُ فِيهِ فَصَحَّتِ الْإِقَالَةُ حَالَ بَقَائِهِ ، وَإِذَا جَاَزَ ابْتِدَاءً أَوَّلَى أَنْ يَبْقَى انْتِهَاءً ، لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ ، وَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْمُسْلِمِ فِيهِ انْفَسَخَ فِي الْجَارِيَةِ تَبَعًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ رُدُّهَا ، وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رُدُّ قِيمَتِهَا .

**অনুবাদ :** ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক 'কুর' গমের জন্য দাদনরূপে একটি দাসী প্রদান করে এবং দাদনগ্রহীতা তাকে হস্তগত করে। অতঃপর তারা উভয়ে 'সলমের' চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়। তারপর ক্রেতার [অর্থাৎ দাদনগ্রহীতার] হাতেই দাসীটি মারা যায়, তাহলে কজা করার দিন দাসীটির যা মূল্য ছিল তা দাদনগ্রহীতার উপর ধার্য হবে। আর যদি দাসীটির মৃত্যুর পর তারা উভয়ে চুক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তা-ও জায়েজ হবে। কেননা, চুক্তি প্রত্যাহার সঠিক হওয়া নির্ভর করে চুক্তি বিদ্যমান থাকার উপর। আর চুক্তি বিদ্যমান থাকে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য [মা'কুদ আলাইহি] বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে। আর 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য হচ্ছে দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ]। সুতরাং তা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত চুক্তি প্রত্যাহার করা সঠিক হবে। আর [দ্বিতীয় সূরতে দাসীর মৃত্যুর পর] যখন সূচনা হিসেবেই প্রত্যাহার সঠিক হলো, [তখন প্রথম সূরতে পূর্বের প্রত্যাহার] দাসীর মৃত্যুর পর বহাল থাকা আরো স্বাভাবিক। কেননা, বহাল থাকা সূচনার চেয়ে সহজ হয়ে থাকে। আর যখন [চুক্তি প্রত্যাহারের কারণে] দাদনদ্রব্যের ক্ষেত্রে চুক্তি রহিত হয়ে গেছে তখন [মৃত] দাসীর ক্ষেত্রেও তা অনুবর্তী [তাবে] হিসেবে রহিত হয়ে যাবে। অতএব, তা ফিরিয়ে দেওয়া তার উপর আবশ্যিক। কিন্তু সে যেহেতু [দাসী মারা যাওয়ার কারণে] তাকে ফিরিয়ে দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে সেহেতু তার মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যিক হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ أَسْلَمَ جَارِيَةً : সূরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি 'বায় সলম' হিসেবে এক 'কুর' গম ক্রয় করল একটি দাসীর বিনিময়ে। অর্থাৎ এক 'কুর' গম হলো দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] আর দাসীটি হলো মূলধন [রা'সুল মাল]। আর দাসীটি দাদনদাতা হস্তান্তর করে দিল। পরবর্তীতে তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে উক্ত 'বায় সলম' চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু দাদনদাতা দাসীটি ফেরত হিসেবে কজা করার পূর্বেই দাসীটি মারা গেল। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, তাদের চুক্তি প্রত্যাহার বাতিল হয়ে যাবে না। অর্থাৎ প্রত্যাহার [وَأَنَّ] সঠিক থাকবে। আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] উক্ত দাসীটির মূল্য ফেরত দিবে। তবে মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেদিন দাদনগ্রহীতা দাসীটি হস্তগত করেছিল সেদিনের মূল্য দর্তবা হবে।

আর যদি এমন হয় যে দাসীটি দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর হাতে প্রথমে মারা গেছে তারপর তারা 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও তাদের চুক্তি প্রত্যাহার (إِلَاقَة) সহীহ হবে। আর বিধান পূর্বের মতোই হবে। অর্থাৎ দাসীটি দাদনগ্রহীতা যেদিন হস্তগত করেছিল সেদিনের দাম অনুযায়ী তার মূল্য দাদনদাতাকে ফেরত দিবে।

قَوْلُهُ لَا سَعَةَ الْأَخَانَةِ تَعْتَبِدُ بِنَاءً: মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলা দুটির দলিল বর্ণনা করেছেন। প্রথমে দ্বিতীয় সূরতটির দলিল বর্ণনা করছেন যে, দাসীটি মারা যাওয়ার পরও তাদের চুক্তি প্রত্যাহার সহীহ হওয়ার কারণ হলো, চুক্তি প্রত্যাহার সহীহ হওয়া নির্ভর করে প্রত্যাহারকাল পর্যন্ত চুক্তি বহাল থাকার উপর। আর চুক্তি বহাল থাকা নির্ভর করে চুক্তির মূল বস্তু (الْعَقْدُ عَلَيْهِ) বহাল থাকার উপর। আর 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে চুক্তির মূল বস্তু হলো দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় মূল বস্তু হলো এক 'কুর' গম, যা দাদনগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হিসেবে বহাল আছে। কাজেই দাসীটি মারা যাওয়া সত্ত্বেও চুক্তি-প্রত্যাহার সহীহ হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا جَارِئَتُهُ أَوَّلَى أَنْ يَفِيَّ إِنْتِهَاءَ: আর প্রথম সূরতের দলিল হলো, অর্থাৎ চুক্তি প্রত্যাহারের পর দাদনদাতা দাসীটি ফেরত গ্রহণ করার পূর্বেই মারা যাওয়া সত্ত্বেও চুক্তি-প্রত্যাহার (إِلَاقَة) সহীহ থাকার দলিল বর্ণনা করছেন যে, পূর্বের সূরতের দলিল অনুযায়ী যখন দাসীটি মারা যাওয়ার পর চুক্তি-প্রত্যাহার সহীহ হয়েছে, তখন জীবিত অবস্থায় কৃত প্রত্যাহার (إِلَاقَة) মারা যাওয়ার পর সহীহ হিসেবে বহাল থাকা আরো অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। কেননা, কোনো জিনিস [সহীহ হিসেবে] শুরু হওয়া যতটুকু সহজ তার চেয়ে শুরু হওয়ার পর তা বহাল থাকা অধিক সহজ।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْمُسْلِمِ فِيهِ الْخ: এখন থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, দাসীটি যখন মারা গেছে তখন দাসীর ক্ষেত্রে কীভাবে চুক্তি-প্রত্যাহারের কার্যকারিতা বাস্তবায়িত হবে? কেননা, যে বস্তুর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার বাস্তবায়িত করা হবে সে বস্তুটি তো কার্যকারিতার ক্ষেত্র (مَحَلٌّ) হিসেবে বহাল থাকা আবশ্যক। অথচ দাসীটি মারা যাওয়ার কারণে সে ক্ষেত্র বিদ্যমান নেই।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, চুক্তির মূল বস্তু (الْعَقْدُ عَلَيْهِ) তথা উক্ত এক 'কুর' গমের ক্ষেত্রে যখন প্রত্যাহার সহীহ হয়েছে তখন দাসীটি বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও মূল বস্তুর অধীন বস্তু (أَصْل)-এর (تَابِع) হিসেবে তাতে প্রত্যাহারের কার্যকারিতা সাব্যস্ত হবে। কারণ, অধীন বা تَابِع হিসেবে এমন অনেক বিষয় সাব্যস্ত হয় যা أَصْل বা মূল হিসেবে শর্ত মোতাবেক না হওয়ার কারণে সাব্যস্ত হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَجَبَّ عَلَيْهِ دَمًا: যখন উল্লিখিত দলিলের ভিত্তিতে উভয় সূরতে চুক্তি-প্রত্যাহার (إِلَاقَة) সহীহ হয়েছে তখন দাদনগ্রহীতার উপর মূলত দাসীটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে। অতঃপর যেহেতু তা মারা যাওয়ার কারণে ফেরত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু তার মূল্য ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। তবে মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেদিন দাদনগ্রহীতা দাসীটি হস্তগত করেছিল সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, দাসীটি দাদনগ্রহীতার জিম্মায় আসার سَبَب বা কারণ হলো দাসীটি হস্তগত করা। কাজেই سَبَب যেদিন সংঘটিত হয়েছে সেদিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে।

উল্লেখ্য, যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর মধ্যে দাসীটি কত মূল্যের ছিল তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে দাদনদাতা সাক্ষ্য পেশ করতে পারলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, আর সে সাক্ষ্য পেশ করতে অক্ষম হলে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَقَايَلَا فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرَى بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ،  
وَلَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِلْقَالَةُ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ  
الْجَارِيَةُ، فَلَا يَبْقَى الْعَقْدُ بَعْدَ هَلَاكِهَا، فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ إِبْتِدَاءً، فَلَا يَبْقَى  
إِنْتِهَاءً لِانْعِدَامِ مَحَلِّهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُقَابَضَةِ حَيْثُ يَصِحُّ الْإِقَالَةُ، وَتَبْقَى  
بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِ الْعَوْضَيْنِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ فِيهِ -

অনুবাদ : আর যদি 'বায় সলম'-এর মাধ্যমে নয়; বরং সাধারণভাবে এক হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করে, তারপর উভয়ে বিক্রয় প্রত্যাহার করার পর ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায়ই দাসীটি মারা যায়, তাহলে প্রত্যাহার [ইকালাহ] বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি দাসীর মৃত্যুর পর বিক্রয় প্রত্যাহার করে, তাহলে প্রত্যাহার [ইকালাহ] বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য [মা'কূদ আলাইহি] হচ্ছে দাসীটিই। সুতরাং দাসীটি মারা যাওয়ার পর চুক্তিই অবশিষ্ট থাকছে না। অতএব, সূচনাতেই প্রত্যাহার [ইকালাহ] সঠিক হবে না, কাজেই পরবর্তীতেও তা বহাল থাকবে না। কেননা, চুক্তির ক্ষেত্রে অবশিষ্ট নেই। পক্ষান্তরে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়ের বিধান উক্ত বিধানের বিপরীত। সেখানে [একটি পণ্য হালাক হওয়ার পর] প্রত্যাহার [ইকালাহ] সঠিক হয় এবং একটি পণ্য হালাক হওয়ার পর [পূর্বে কৃত] ইকালাহ বহালও থাকে। কেননা, উভয় বিনিময়দ্রব্য সেখানে বিক্রীত-বস্তু [বা চুক্তির উদ্দিষ্ট বস্তু]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ- (إِقَالَةُ) -এর বিষয়টি : পূর্বের মাসআলায় দাসীর মৃত্যুবরণ এবং চুক্তি-প্রত্যাহার (إِقَالَةُ) -এর বিষয়টি ছিল 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে। আর আলোচ্য মাসআলা তদ্রূপ বিষয়েরই, তবে 'বায় সলম'-এর নয়; বরং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। আর এ 'বায় সলম' এবং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্যের কারণে মাসআলা দুটিতে বিধানগত দিক থেকেও পার্থক্য হয়েছে। পূর্বের মাসআলা এবং আলোচ্য মাসআলার এ পার্থক্য বুঝানোই এখানে মূল বিষয়।

সূরতে মাসআলা : এখানের সূরতে মাসআলা হলো, কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে একটি দাসী ক্রয় করল এবং বিক্রেতা দাসীটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তরও করল। অতঃপর তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার (إِقَالَةُ) করে নিল। কিন্তু বিক্রেতা দাসীটি ফেরত নেওয়ার পূর্বেই তা ক্রেতার হাতে মৃত্যুবরণ করল। তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রত্যাহার (إِقَالَةُ) বাতিল হয়ে যাবে- পূর্বের বিক্রয়ই কার্যকর থাকবে। আর যদি দাসীটি ক্রেতার হাতে আগে মারা যায় তারপর তারা চুক্তি-প্রত্যাহার (إِقَالَةُ) করে, তাহলে তাদের প্রত্যাহার [তরুতেই] বাতিল বলে গণ্য হবে। তাদের বিক্রয়চুক্তিই কার্যকর থাকবে। উল্লেখ্য, পূর্বে উদ্ধৃতিত 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ উভয় সূরতেই চুক্তি-প্রত্যাহার (إِقَالَةُ) সही ছিল, আর এখানে উভয় সূরতেই চুক্তি-প্রত্যাহার (إِقَالَةُ) বাতিল হচ্ছে। দলিলের মাঝে এর কারণ স্পষ্ট হবে।

(إِقَالَةً) সহীহ না হওয়ার দলিল হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তি-প্রত্যাহার (إِقَالَةً) সহীহ হওয়া নির্ভর করে চুক্তি বিদ্যমান থাকার উপর। কেননা, চুক্তি যদি বিদ্যমানই না থাকে, তাহলে তা প্রত্যাহার কিভাবে সম্ভব হবে? আর চুক্তি বিদ্যমান থাকা নির্ভর করে চুক্তির মূল বস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) অবশিষ্ট থাকার উপর। আর আলোচ্য মাসআলায় চুক্তির মূল বস্তু তথা বিক্রয়-দ্রব্য (مَبِيع) ছিল উক্ত দাসীটি। সুতরাং যখন দাসীটি মারা গেছে তখন আর চুক্তি বিদ্যমান নেই, আর যখন চুক্তি বিদ্যমান নেই তখন চুক্তি-প্রত্যাহার (إِقَالَةً)ও সহীহ হবে না। আর প্রথম সূরতে অর্থাৎ প্রথমে তারা চুক্তি-প্রত্যাহার করার পর ক্রেতা দাসীটি ফেরত গ্রহণ করার পূর্বেই যদি দাসীটি মারা যায় সে ক্ষেত্রে যদিও প্রথমে প্রত্যাহার সহীহ হয়েছিল কিন্তু দাসীটি মারা যাওয়ার কারণে তা আবার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, প্রত্যাহার কার্যকর হওয়ার মূল ক্ষেত্র ছিল দাসীটি। কাজেই সে মারা যাওয়ার ফলে প্রত্যাহার কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্র বিদ্যমান নেই, ফলে চুক্তি প্রত্যাহার (إِقَالَةً) বাতিল হয়ে যাবে।

بَيْعُ الْمُفَاطَةِ : قَوْلُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُفَاطَةِ الخ, মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরিউক্ত দাসীর মাসআলাটি যদি بَيْعُ الْمُفَاطَةِ হয়, অর্থাৎ দাসীটি মুদ্রা দ্বারা ক্রয় না করে অন্য কোনো নির্দিষ্ট বস্তু (عَيْن) দ্বারা ক্রয় করে, তাহলে উক্ত উভয় সূরতেই চুক্তি-প্রত্যাহার (إِقَالَةً) সহীহ হবে, যদি দাসীটি যে বস্তুর বিনিময় ক্রয় করা হয়েছিল তা বিদ্যমান থাকে। কেননা, بَيْعُ الْمُفَاطَةِ [পণ্যের বিনিময় পণ্যের বিক্রয়]-এর ক্ষেত্রে উভয় পণ্যই বিক্রয়-দ্রব্য (مَبِيع) হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যে কোনো একটি যদি ধ্বংস হয়, আর অপরটি বিদ্যমান থাকে তাহলেও চুক্তি বিদ্যমান আছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর চুক্তি বিদ্যমান থাকার কারণে প্রত্যাহার (إِقَالَةً)ও সহীহ হবে।

দাসী মারা যাওয়া এবং চুক্তি-প্রত্যাহার সংক্রান্ত উপরিউক্ত মাসআলাগুলোর সারকথা এই হলো যে, إِقَالَةً বা চুক্তি-প্রত্যাহার সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো প্রত্যাহারকালে চুক্তি বিদ্যমান থাকা, আর চুক্তি বিদ্যমান থাকে চুক্তির মূল বস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) অবশিষ্ট থাকলে। আর এ চুক্তির মূল বস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) হলো, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্য যা মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে। আর (بَيْعُ الْمُفَاطَةِ) [পণ্যের বিনিময় পণ্যের বিক্রয়]-এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যই চুক্তির মূল বস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ)।

قَالَ : وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ فِي كُرٍّ حَنْطَةٍ فَقَالَ الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ شَرِطْتُ رَدِّيَا  
وَقَالَ رَبُّ السَّلَامِ لَمْ تَشْتَرِطْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ. لِأَنَّ رَبَّ السَّلَامِ  
مُتَعَيِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ الصَّحَّةِ. لِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ يَرْبُو عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فِي الْعَادَةِ.  
وَفِي عَكْسِهِ قَالُوا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِرَبِّ السَّلَامِ عِنْدَ أَيْ حَنْيَفَةٍ (رحا) لِأَنَّهُ  
يَدْعَى الصَّحَّةَ. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُنْكَرًا، وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ لِلْمُسْلِمِ إِلَيْهِ. لِأَنَّهُ  
مُنْكَرٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ الصَّحَّةَ. وَسَقَرَرَهُ مِنْ بَعْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক 'কুর' গমের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম দানন রূপে প্রদান করে অতঃপর দানগ্রহীতা বলে যে, আমি নিম্নমানের গম দেওয়ার শর্ত করেছিলাম। কিন্তু দাননদাতা বলে যে, তুমি কোনো শর্ত উল্লেখ করনি, তাহলে দানগ্রহীতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, দাননদাতার চুক্তিটির বৈধতা অস্বীকার করায় 'হটকারী' [নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী] বলে বিবেচিত হবে। কারণ, দাননদ্রব্য সাধারণত মূলধনের চেয়ে বেশি [লাভজনক] হয়ে থাকে। আর বিপরীত মাসআলার ক্ষেত্রে [অর্থাৎ দাননদাতা নির্দিষ্ট গুণ উল্লেখের দাবি করে, আর দানগ্রহীতা তা অস্বীকার করে, সে ক্ষেত্রে] ফকীহগণ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে দাননদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে চুক্তিটি বৈধ হওয়ার দাবি করেছে, যদিও তার প্রতিপক্ষ এ ক্ষেত্রে অস্বীকারকারী [মুনকির] হচ্ছে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে দানগ্রহীতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে অস্বীকারকারী [মুনকির], যদিও সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা বিষয়টি আলোচনা করব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ الْخ : এখান থেকে দাননকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] কিরূপ মানের দেওয়ার শর্ত ছিল এ ব্যাপারে যদি দাননদাতা [রাব্বুস সলম] এবং দানগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় তার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্যও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি বুঝে নিলে আলোচ্য মাসআলা এবং এর পরবর্তী মাসআলাগুলো বুঝা সহজ হবে। মূলনীতিটি হলো-

যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের মাঝে চুক্তির পরবর্তী সময়ে চুক্তির শর্তসমূহ কিরূপ ছিল এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং একজনের দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ হয়নি বলে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যিক হয়, আর অপর জনের দাবি অনুসারে তা সহীহ হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে- যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল না সে যদি مُتَعَيِّتٌ অর্থাৎ "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" বলে গণ্য হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং অপর জনের দাবি গ্রহণ করা হবে।

আর যদি সে مُنْكَرٌ বলে গণ্য না হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যদি উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার বিপক্ষ مُنْكَرٌ বা 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায় যে مُنْكَرٌ 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ না হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, এ মূলনীতিটি মুসল্লিফ (র.) পরবর্তী উল্লেখ করেছেন, আমরা মাসআলাগুলো সহজে বুঝার জন্য তা আগেই উল্লেখ করলাম।

সূরতে মাসআলা : কোনো ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে 'বায় সলম' হিসেবে এক 'কুর' পরিমাণ গম ক্রয় করল। অতঃপর যখন উক্ত গম পরিশোধের সময় হলো তখন দানগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] বলল, আমি নিম্নমানের গম দেওয়ার কথা শর্ত

উল্লেখ্য, যদি দাদনদাতা এবং দাদনগ্রহীতার মাঝে এভাবে মতবিরোধ দেখা দেয় যে, তাদের একজন দাবি করে উৎকৃষ্ট মানের গেমের শর্ত করা হয়েছিল, আর অপরজন দাবি করে নিম্ন মানের গেমের শর্ত করা হয়েছিল, তাহলে কারো স্বপক্ষে যদি প্রমাণ না থাকে তবে উভয়ের শপথ করে বলতে হবে। যদি উভয়ে শপথ করে তাহলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

وَلَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ الْيَوْنُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجَلٌ : وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ : بَلْ كَمَا لَهُ أَجَلٌ .  
 فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السَّلَمِ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ الْيَوْنُ مُتَعَنِّتٌ فِي انْكَارِهِ حَقًّا لَهُ، وَهُوَ الْأَجَلُ  
 وَالْفَسَادُ لِعَدَمِ الْأَجَلِ غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ لِمَكَانِ الْإِجْتِهَادِ، فَلَا يُعْتَبَرُ النَّفْعُ فِي رَدِّ رَأْسِ  
 الْمَالِ، بِخِلَافِ عَدَمِ الْوَصْفِ، وَفِي عَكْسِهِ الْقَوْلُ لِرَبِّ السَّلَمِ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ  
 حَقًّا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ الصَّعَّةَ كَرَّرَ الْمَالِ إِذَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ  
 شَرِطْتُ لَكَ نِصْفَ الرِّيحِ إِلَّا عَشْرَةً، وَقَالَ الْمُضَارِبُ لَا بَلْ شَرِطْتُ لِي نِصْفَ الرِّيحِ  
 فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ .

অনুবাদ : আর যদি দাদনগ্রহীতা বলে যে, কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিল না আর দাদনদাতা বলে যে, নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিল, তাহলে দাদনদাতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, দাদনগ্রহীতা তার অধিকার নির্ধারিত মেয়াদ অস্বীকার করার কারণে 'ইটকারী' বলে বিবেচিত হবে। আর মেয়াদ নির্ধারিত না হলে 'বায় সলম' ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। কারণ, তাতে [ফকীহগণের] মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং মূলধন ফেরত দেওয়া তার জন্য লাভজনক হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থ্য হবে না। পক্ষান্তরে [পূর্বের মাসআলায়] গুণাগুণ বর্ণনা না করার [মতবিরোধের] বিষয়টি ভিন্ন। [কেননা, গুণাগুণ উল্লেখ না করলে 'বায় সলম' ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মতবিরোধ না থাকায় তা ফাসিদ হওয়া সুনিশ্চিত।] আলোচ্য মাসআলার বিপরীত সূরতে [অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা মেয়াদ উল্লেখের দাবি করলে আর দাদনদাতা তা অস্বীকার করলে] সাহেবাইন (র.)-এর মতে দাদনদাতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে তার বিপরীতে সাব্যস্ত অধিকার অস্বীকার করছে, সুতরাং তার বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে, যদিও সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করছে। যেমন- [মুদারাবার ক্ষেত্রে] মূলধনদাতা [রাবুস সলম] মূলধনগ্রহীতা [মুদারিব]-কে যদি বলে তোমার জন্য আমি দশ দিরহাম রেখে অবশিষ্ট লভ্যাংশের অর্ধেক প্রদানের শর্ত করেছিলাম, আর মুদারিব বলে না; বরং পুরো লভ্যাংশের অর্ধেক প্রদানের শর্ত করা হয়েছিল, তাহলে 'রাবুস সলম' [বা মূলধনদাতার] বক্তব্য গ্রহণ করা হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ الْيَوْنُ : আলোচ্য মাসআলাটিও পূর্বের মাসআলার ভূমিকায় উল্লিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল। সূরতে মাসআলা হলো, যদি দাদনদাতা [রাবুস সলম] এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ফীহ]-এর মাঝে 'চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল কিনা' এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] বলে যে, মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি আর দাদনদাতা [রাবুস সলম] বলে যে, মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ যদি প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে আহনাফের সকলের ঐকমত্যে দাদনদাতা [রাবুস সলম]-এর দাবি [শপথ সহকারে] গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিল বলে সাব্যস্ত হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত।



قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُتَعَبِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ الْخ : কেননা, এ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] مُتَعَبِّتٌ বা “নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী” বলে সাব্যস্ত হচ্ছে। কারণ, মেয়াদ লাভ করা দাদনগ্রহীতার স্বার্থের অনুকূল। কেননা, মেয়াদের কারণে সে দাদনকৃত দ্রব্য বিলম্বে হস্তান্তর করার সুযোগ পায়। কাজেই সে তার স্বার্থ বা অধিকার অস্বীকার করার মাধ্যমে مُتَعَبِّتٌ বা “নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী” বলে সাব্যস্ত হবে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, مُتَعَبِّتٌ বলে যে সাব্যস্ত হবে সকলের ঐকমত্যে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তার বিপক্ষের কথা গ্রহণ করা হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَالْفَسَادُ لِعَدَمِ الْأَجَلِ غَيْرُ مُتَعَبِّتٍ لِمَكَانِ الْإِجْتِهَادِ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, এ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] কেন مُتَعَبِّتٌ বা “নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী” সাব্যস্ত হবে? কারণ, সে তো প্রকৃতপক্ষে নিজের লাভজনক বস্তু লাভ করার চেষ্টা করছে। কেননা, চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি তার এ দাবি অনুযায়ী চুক্তিটি সহীহ হয়নি। আর চুক্তি সহীহ না হলে তাকে কেবল মূলধন [রা'সুল মাল] ফেরত দিতে হবে, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] দিতে হবে না। ফলে সে লাভবান হবে। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধনের তুলনায় দাদনকৃত দ্রব্য সাধারণত অধিক লাভজনক হয়। এ কারণেই তো দাদনকৃত দ্রব্য বাকি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ 'বায় সলম' করতে আগ্রহী হয়। সুতরাং দাদনদাতা এভাবে নিজের লাভের চেষ্টা করছে। কাজেই সে مُتَعَبِّتٌ “নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী” কেন সাব্যস্ত হবে?

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে, চুক্তির সময় মেয়াদ উল্লেখ না করলে যে 'বায় সলম' সহীহ হয় না এ বিষয়টি মুজতাহিদগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মেয়াদ উল্লেখ না করলে 'বায় সলম' সহীহ হয়। আর যে বিষয়ে মুজতাহিদগণের মাঝে মতবিরোধ থাকে তা قَطْعِيٌّ বা 'নিশ্চিত বিষয়' বলে সাব্যস্ত হয় না; বরং তা ظَنِّيٌّ বা 'ধারণা-নির্ভর' বিষয় বলে সাব্যস্ত হয়। কাজেই ظَنِّيٌّ বিষয়ের মাধ্যমে তার লাভের দাবি ধর্তব্য হবে না। কেননা, মেয়াদ উল্লেখের কথা অস্বীকার করে مُتَعَبِّتٌ বা “নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী” সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি হলো قَطْعِيٌّ বা নিশ্চিত। আর قَطْعِيٌّ বিষয়ের বিপক্ষে ظَنِّيٌّ বিষয় ধর্তব্য হয় না। সুতরাং 'চুক্তি সহীহ না হলে সে মূলধন ফিরিয়ে দিয়ে লাভবান হবে' এ বিষয়টি ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ يَخْلُوفُ عَدَمَ الرِّضَنِ : পক্ষান্তরে এর পূর্বের মাসআলায় অর্থাৎ 'গম কি মানের হবে তা চুক্তির সময় উল্লেখ করা হয়েছিল কিনা' এ ব্যাপারে মতবিরোধের মাসআলায় বিষয়টি ছিল ভিন্ন। কেননা, চুক্তির সময় গমের গুণাগুণ বা মান উল্লেখ না করা হলে চুক্তি সহীহ না হওয়ার ব্যাপারে কারো মতবিরোধ নেই। কাজেই তা قَطْعِيٌّ বা নিশ্চিত বিষয়।

قَوْلُهُ وَفِي عَكْثِهِ الْقَوْلُ لِرَبِّ السَّلَامِ عِنْدَمَا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাসআলাটি যদি পূর্বের সূরতের বিপরীত হয়। অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] বলে যে, মেয়াদের কথা চুক্তির সময় উল্লেখ করা হয়েছিল আর দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] বলে, মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এর কথা গ্রহণ করা হবে আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ لَا بُدَّ بَيْنَكَ حَقًّا عَلَيْنَا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর দলিল বর্ণনা করছেন। তাঁদের দলিল হলো, উক্ত সূরতে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] তার দাবি অনুসারে যদিও চুক্তিটি সহীহ হওয়া অস্বীকার করছে, কিন্তু সে এ ক্ষেত্রে مُنْكَرٌ বা অস্বীকারকারী আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] হচ্ছে مُدْعِيٌّ বা দাবিদার।

আর বিধান হলো, **الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْبَيْتُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ** অর্থাৎ “যে দাবিদার সে প্রমাণ পেশ করবে অন্যথায় যে **مُنْكَرٌ** বা অস্বীকারকারী তার কথা শপথ সহকারে গ্রহণ করা হবে।” সুতরাং এখানে যেহেতু দাদনগ্রহীতা প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম নয়, তাই দাদনদাতার কথাই গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে **مُنْكَرٌ** বা অস্বীকারকারী। এখানে দাদনদাতা **مُنْكَرٌ** বা অস্বীকারকারী এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] **مُدْعَى** বা দাবিদার হওয়ার কারণ হলো, ‘মেয়াদ লাভ করা’ দাদনগ্রহীতার জন্য লাভজনক। কেননা, সে মেয়াদের পূর্ণ সময়ে মূলধন কাজে লাগিয়ে বা ব্যবসা করে তার দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] অর্জনের সুযোগ লাভ করে। কাজেই দাদনগ্রহীতা ‘চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল’ বলে তার এ লাভের বিষয়ের দাবিদার হলো। আর ‘মেয়াদ নির্ধারিত হওয়া’ দাদনদাতার স্বার্থের বিপরীত। কেননা, সে মেয়াদের কারণে দাদনকৃত দ্রব্য বিলম্বে লাভ করে। কাজেই ‘চুক্তির মেয়াদ উল্লেখ করা হয়নি’ বলে তার বিপক্ষে সাব্যস্ত হবে এমন বিষয়কে সে অস্বীকার করছে। সুতরাং সে **مُنْكَرٌ** বা অস্বীকারকারী।

**قَوْلُهُ كَرِبَ الْمَالِ إِذَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ الْخِ** : সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে একটি নজির পেশ করা হচ্ছে। তা হলো, **مُضَارِبَةٌ** [মুদারাবা]-এর মাসআলার ক্ষেত্রে যদি ‘মুদারিব’ [মূলধন গ্রহণকারী] এবং ‘রাব্বুল মাল’ [মূলধন প্রদানকারী]-এর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়; রাব্বুল মাল [মূলধন প্রদানকারী] বলে যে, আমি চুক্তির সময় এরূপ শর্ত করেছিলাম যে, লভ্যাংশ থেকে আমি প্রথমে দশ দিরহাম নিব তারপর অবশিষ্ট লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বন্টন করে নেওয়া হবে, আর ‘মুদারিব’ [মূলধন গ্রহণকারী] বলে যে, না বরং সম্পূর্ণ লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে সমান হারে বন্টন করা হবে এরূপ শর্ত করা হয়েছিল, তাহলে সকলের ঐকমত্যে ‘রাব্বুল মাল’ [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা গ্রহণ করা হবে। কারণ, সে এ ক্ষেত্রে মুদারিব যে সম্পূর্ণ লভ্যাংশের অর্ধেকের দাবি করছে তা অস্বীকার করছে। অথচ এ ক্ষেত্রেও ‘রাব্বুল মাল’ [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা অনুসারে ‘চুক্তিটি সহীহ না’ আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ, মুদারাবার ক্ষেত্রে ‘রাব্বুল মাল’ [মূলধন প্রদানকারী] যদি নিজের জন্য লভ্যাংশের কোনো নির্দিষ্ট অংশ শর্ত করে, তাহলে মুদারাবার চুক্তি সহীহ হয় না। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে **مُنْكَرٌ** বা অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে সকলের ঐকমত্যে ‘রাব্বুল মাল’ [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

لَا تَهْ يَنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ الرِّبْحِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الصَّحَّةَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) الْقَوْلُ لِلْمُسْلِمِ الْبَيِّنِ، لَا تَهْ يَدْعَى الصَّحَّةَ، وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَاحِدٍ فَكَانَا مُتَّفِقَيْنِ عَلَى الصَّحَّةِ ظَاهِرًا، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا تَهْ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَلَا يُغْتَمَرُ الْإِخْتِلَافُ فِيهِ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ، أَمَّا السَّلْمُ فَلَا زِمَ، فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ كَلَامُهُ تَعْنَتًا فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ خَرَجَ خُصُومَةٌ وَقَعَ الْإِتِّفَاقُ عَلَى عَقْدٍ وَاحِدٍ فَالْقَوْلُ لِمَدْعَى الصَّحَّةِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا لِلْمُنْكَرِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الصَّحَّةَ.

অনুবাদ : কেননা, সে তার নিকট হক প্রাপ্যতা অস্বীকার করছে, যদিও সে [দশ দিরহাম বা রাখার কারণে] চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করছে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দাদনগ্রহীতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে চুক্তিটিকে বৈধ হওয়ার দাবি করছে। আর তারা উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত হয়েছে। সুতরাং তার বৈধতার ব্যাপারেও দৃশ্যত একমত বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে মুদারাবার মাসআলাটি অনুরূপ নয়। [কারণ, তারা একই চুক্তির ব্যাপারে একমত হচ্ছে না। কেননা, মুদারাবা সঠিক হলে তা 'শিরকাভ' -এর অন্তর্ভুক্ত হয়, আর ফাসিদ হলে ইজারার অন্তর্ভুক্ত হয়।] উভয়ের মাঝে পার্থক্যের আরেকটি কারণ হলো, মুদারাবার চুক্তি বাধ্যতামূলক পালনীয় চুক্তি নয় [যে কোনো পক্ষ তা প্রত্যাহার করে নিতে পারে।] সুতরাং তাতে মতবিরোধ ধর্তব্য হবে না। ফলে মুদারিব কর্তৃক লভ্যাংশের প্রাপ্যতার দাবি অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে 'সলম' হচ্ছে বাধ্যতামূলক পালনীয় চুক্তি। সুতরাং মূলনীতি এই হলো যে, যার কথা হঠকারিতামূলক [অর্থাৎ নিজের স্বার্থের পরিপন্থি] হবে সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার প্রতিপক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। আর যার কথা বিবাদীর কথারূপে উচ্চারিত হবে [অর্থাৎ নিজের স্বার্থের অনুকূলে হবে] সে ক্ষেত্রে যদি উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে চুক্তির বৈধতা দাবিকারীর বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। যদিও সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْقَوْلُ لِلْمُسْلِمِ الْبَيِّنِ لَا تَهْ : قَالَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) الْقَوْلُ لِلْمُسْلِمِ الْبَيِّنِ لَا تَه الْخ  
 অভিমত ও তাঁর দলিল বর্ণনা করছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁর মতে উক্ত মাসআলায় দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এটাই সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল বুঝার পূর্বে একটি বিষয় জানতে হবে, তা হলো- 'বায় সলম' যদি ফাসিদ হয়, তাহলে তা অন্য কোনো চুক্তি রূপে গণ্য হয় না; বরং সহীহ হোক বা ফাসিদ হোক উভয় অবস্থায়ই তা 'বায় সলম' হিসেবে গণ্য হয়, পক্ষান্তরে مُضَارَبَةٌ [মুদারাবা]-এর চুক্তি যদি সহীহ হয় তাহলে তা شَرَكَةٌ [অংশীদারিত্ব]-এর চুক্তি বলে গণ্য হয় আর যদি ফাসিদ হয় তখন তা اجارة 'ইজারা'-এর চুক্তি বলে গণ্য হয়।

সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় দাদনদাতা এবং দাদনগ্রহীতা একই চুক্তি 'বায় সলম'-এর ব্যাপারে একমত। দুজনে দুই চুক্তির দাবি করছে না। আর মুসলমান চুক্তিকারীর ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক দাবি যে, সে ফাসিদ চুক্তি থেকে বিতৃত থাকবে এবং সহীহ চুক্তি করবে। অতএব, যখন তারা 'বায় সলম'-এর মূল চুক্তিটি স্বীকার করছে তখন তা সহীহ চুক্তির স্বীকারোক্তি (اِقْرَارٌ) বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] বলছে 'মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি' তখন সে যেন তার স্বীকারোক্তি (اِقْرَارٌ) প্রত্যাহার করতে চাচ্ছে। আর একবার স্বীকারোক্তি করলে তা আর প্রত্যাহার করা যায় না। তাছাড়া কোনো বিষয়ের شَرَطٌ 'শর্ত' মূল বিষয়ের نَاسِخٌ বা অনুগত হয়ে থাকে, কাজেই মূল চুক্তির স্বীকার করলে তা তার শর্তেরও স্বীকার বলে গণ্য হবে। কেননা, মূল বিষয় সাব্যস্ত হলে তার نَاسِخٌ বা অনুগত বিষয়ও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] 'বায় সলম'-এর শর্ত মেয়াদের কথা প্রথমে বাহ্যত স্বীকার করার পর তা আবার প্রত্যাহার করতে চাচ্ছে। ফলে তার কথার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। কাজেই তার কথা গ্রহণ করা হবে না। আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাহিহি] যেহেতু 'মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল' বলে চুক্তিটি সহীহ হওয়ার দাবি করছে, তাই তার কথার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়নি। সুতরাং তার কথা গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَأَلَةِ الْمُضَارَبَةِ الخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত কiyাসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সার কথা হলো, আমাদের আলোচ্য 'বায় সলম'-এর মতবিরোধের মাসআলাটি مُضَارَبَةٌ [মুদারাবা]-এর মাসআলার সাথে কiyাস করা ঠিক হয়নি। কেননা, উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে দুটি কারণে। প্রথম কারণ হলো, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, مُضَارَبَةٌ [মুদারাবা]-এর চুক্তি যদি সহীহ হয়, তাহলে তা شَرَكَةٌ বা অংশীদারিত্বের চুক্তি বলে গণ্য হয়, আর যদি ফাসিদ হয়, তাহলে তা اجارة 'ইজারা' বলে গণ্য হয়। কাজেই সাহেবাইন (র.)-এর উল্লিখিত مُضَارَبَةٌ [মুদারাবা]-এর মতবিরোধের মাসআলায় 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী] চুক্তিটি ফাসিদ হওয়ার দাবি করছে আর 'মুদারিব' [মূলধন গ্রহণকারী] চুক্তিটি সহীহ হওয়ার দাবি করছে। ফলে উভয়ের মতবিরোধের ক্ষেত্রে (مَحَلٌّ) ভিন্ন হয়েছে। 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর দাবি অনুযায়ী তা اجارة 'ইজারা'-এর চুক্তি ছিল আর 'মুদারিব' [মূলধন প্রদানকারী]-এর দাবি অনুযায়ী তা شَرَكَةٌ বা অংশীদারিত্বের চুক্তি ছিল। আর মতবিরোধের ক্ষেত্রে যদি এক না হয় তাহলে সে মতবিরোধ প্রকৃত মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না; বরং তা কেবল ভিন্ন ভিন্ন দাবি বলে গণ্য হয়। সুতরাং উক্ত মাসআলায় বিষয়টি এমন হয়েছে যে, মুদারিব রাব্বুল মালের সম্পদের [দশ দিরহামের] মাঝে হকদার হওয়ার দাবি করছে আর রাব্বুল মাল তা অস্বীকার করছে। কাজেই নিয়ম অনুসারে অস্বীকারকারী (مُنْكَرٌ)-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

পক্ষান্তরে 'বায় সলম'-এর মাসআলায় উভয়ের মতবিরোধের ক্ষেত্রে এক। কারণ, সহীহ হওয়ার সুরতেরও তা 'বায় সলম' এবং ফাসিদ হওয়ার সুরতেরও তা 'বায় সলম'। কাজেই তাদের মতবিরোধ প্রকৃত মতবিরোধ বলে গণ্য হবে। অতঃপর যেহেতু দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর কথার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে [যার ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি] তাই তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ لَيْسَ بِذَلِكَ فَلَا يَغْتَبِرُ الْإِخْلَاقُ الخ: পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ হলো, مُضَارَبَةٌ [মুদারাবা] চুক্তি অপরিহার্য চুক্তি নয়। এ কারণে مُضَارَبَةٌ [মুদারাবা]-এর চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যে কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়াই চুক্তি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সুতরাং যেহেতু তা অপরিহার্য চুক্তি নয় তাই মতবিরোধের কারণে তা এমনিতেই نُسَخٌ [ভঙ্গ]

হয়ে যাবে। ফলে মতবিরোধ ধর্তব্য হবে না; বরং শুধু 'মুদারিব' [মূলধন গ্রহণকারী]-এর দাবি বলে গণ্য হবে। কাজেই অস্বীকারকারী তথা 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

পক্ষান্তরে 'বায়ু সলম'-এর চুক্তি হলো অপরিহার্য চুক্তি। এ কারণে তা সম্পাদিত হওয়ার পর এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া তা প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মতবিরোধের কারণে তা আপনা-আপনি فَسَخَ [ভঙ্গ] হবে না; বরং প্রকৃত মতবিরোধ বলে গণ্য হবে। অতঃপর যেহেতু দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর কথা মাঝে বৈপরীত্য (تَنَافُضٌ) দেখা দিয়েছে তাই তার কথা গ্রহণ করা হবে না; বরং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

عَنْهُ : قَوْلُهُ فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ كَلَامُهُ الْخ উল্লেখ করেছিলাম তা বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) আমরা পূর্বের মাসআলার ভূমিকায় যে মূলনীতিটি উল্লেখ করেছিলাম তা বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, উদ্ভিখিত মাসআলাগুলো থেকে এ মূলনীতিটি পাওয়া গেল যে, যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের মাঝে চুক্তির পরবর্তী সময়ে চুক্তির শর্তসমূহ কিরূপ ছিল এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং একজনের দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ হয়নি বলে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যিক হয় আর অপরজনের দাবি অনুসারে তা সহীহ হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল না, সে যদি مُتَعَبِّتٌ অর্থাৎ "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" বলে গণ্য হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং অপরজনের দাবি গ্রহণ করা হবে।

আর যদি কোনো পক্ষ مُتَعَبِّتٌ বলে গণ্য না হয়; বরং প্রত্যেকে তার স্বার্থের অনুকূলের বিষয়ের দাবিদার হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যদি উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার বিপক্ষ مُنْكَرٌ বা 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায় যে مُنْكَرٌ 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ না হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

قَالَ : وَجُوزُ السَّلَمِ فِي الشَّيَابِ إِذَا بَيْنَ طَوْلًا وَعَرَضًا وَرَفْعَةً، لِأَنَّهُ أَسْلَمَ فِي مَعْلُومٍ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ كَانَ ثَوْبٌ حَرِيرٌ لَأَبَدٌ مِنْ بَيَانٍ وَزَيْنٍ أَيْضًا، لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَا فِي الْخَزْرِ، لِأَنَّ أَحَادَهَا تَتَفَاوَتْ تَفَاوُتًا فَاجِشًا وَفِي صَغَارِ اللَّوْلُؤِ الَّتِي تَبَاعُ وَزْنَا يَجُوزُ السَّلَمُ، لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالْوَزْنِ وَلَا بِأَسِّ السَّلَمِ فِي اللَّيْنِ وَالْأَجْرِ إِذَا سَمِيَ مِلْبِنًا مَعْلُومًا، لِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ مُتَقَارِبٌ لَا سَمِيًّا إِذَا سَمِيَ الْمِلْبِنِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও কতটুকু মোটা [বা পাতলা] হবে তা উল্লেখ করা হয়, তাহলে কাপড়ের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, সে নির্দিষ্ট এবং হস্তান্তর সম্ভব বস্তুর জন্য 'বায় সলম' করেছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আর যদি রেশমের কাপড় হয়, তাহলে তার ওজনও উল্লেখ করা অপরিহার্য। কেননা, রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রে ওজন উদ্দিষ্ট হয়। মূল্যবান পাথর ও মণি-মুজার ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলোর একেকটি [অপরটি থেকে] অনেক পার্থক্যপূর্ণ হয়। আর যে সকল ছোট মুক্তা ওজন মেপে বিক্রয় করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, ওজন করে তার পরিমাণ জানা সম্ভব। কাঁচা ইট ও পাকা ইটের ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট ছাঁচ উল্লেখ করে, তাহলে 'বায় সলম' করতে কোনো দোষ নেই। কেননা, ইট গণনা-নির্ভর ও কাছাকাছি আকারের বস্তু। বিশেষত যদি নির্দিষ্ট ছাঁচ উল্লেখ করে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَجُوزُ السَّلَمِ فِي الشَّيَابِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রেশমের কাপড় ব্যতীত অন্যান্য কাপড়ের ক্ষেত্রে যদি তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং তা কতটুকু মোটা বা পাতলা হবে তা চুক্তির সময় উল্লেখ করে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কারণ, উক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করার দ্বারা কাপড় সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তা হস্তান্তর করার সময় বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে সকল বস্তু বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয় এবং হস্তান্তরকালে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

আর যদি রেশমের কাপড় হয়, তাহলে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও কাপড়ের ওজন কতটুকু হবে তাও উল্লেখ করা আবশ্যিক। কারণ, রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, প্রস্থের সাথে তার ওজনও ত্রেতার উদ্দিষ্ট বিষয় হয়। এ কারণেই রেশমের কাপড়ের ওজন কমবেশি হওয়ার কারণে তার মূল্যের মাঝেও তারতম্য হয়। অতএব, চুক্তির সময় তার ওজন কতটুকু হবে তা উল্লেখ করা অপরিহার্য হবে। উল্লেখ্য, মাসআলাটি সমাজের প্রচলনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রেও যদি ওজনের কারণে মূল্যের মাঝে তারতম্য হওয়ার প্রচলন না থাকে, তাহলে চুক্তির সময় তার ওজন কতটুকু হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যিক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রে ওজন কতটুকু হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ السَّلْمُ فِي الْجَوَاهِرِ الْخ : মূল্যবান পাথর ও মণি-মুক্তার ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কারণ, মূল্যের দিক থেকে এগুলোর মাঝে অনেক তারতম্য হয়। কেননা, একই ওজনের হওয়া সত্ত্বেও দুটি মুক্তার সৌন্দর্যের তারতম্যের কারণে তাদের মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদ সৃষ্টি হবে। অতএব, তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে এগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

আর যে সকল ছোট মুক্তা ওজন হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে সেগুলোতে ওজনের ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কারণ, এরূপ ক্ষুদ্র একই ওজনের দুটি মুক্তার মাঝে মূল্যের দিক থেকে পার্থক্য হয় না। কাজেই তা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিবাদের সৃষ্টি হবে না। কাজেই ওজন উল্লেখ করার দ্বারাই তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا بِأَسْرِ السَّلْمِ الْخ :

মাসআলা : ইট কাঁচা হোক বা পাকা হোক উভয় অবস্থায় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। তবে শর্ত হলো, তার ছাঁচ কি আকারের হবে; কতটুকু প্রশস্ত এবং কতটুকু দীর্ঘ হবে তা উল্লেখ করতে হবে। কেননা, নির্দিষ্ট আকারের ছাঁচ দ্বারা তৈরি করার পর ইটের মাঝে যে তারতম্য থাকে তা খুবই সামান্য, তা মূল্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। কাজেই তা عَدْوِي مُتَقَارِبٍ অর্থাৎ গণনা, নির্ভর কাছাকাছি আকারের বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরূপ عَدْوِي مُتَقَارِبٍ বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ। কারণ, তা হস্তান্তরকালে বিবাদ সৃষ্টি করবে না। [তবে পাকা ইটের ক্ষেত্রে তা কিরূপ পোড়ানো হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যিক হবে। কেননা, পোড়ানোর তারতম্যের কারণে মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়।]

قَالَ : وَكُلُّ مَا أَمَكَّنَ ضَبَطُ صَفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَزَاءُ السَّلَامِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُفْضَى إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَمَا لَا يُضَبُّ صَفَتَهُ وَلَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَامُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَبِدُونِ الْوَصْفِ يَبْقَى مَجْهُولًا جِهَالَةً تُفْضَى إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ فِي طَسَبٍ أَوْ تُفْصِمَةٍ أَوْ خَفِيٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ لِاجْتِمَاعِ شَرَائِطِ السَّلَامِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ مَجْهُولٌ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে সকল বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ ও তার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব সে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, তা বিবাদ সৃষ্টি করবে না। আর যে সকল বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ ও পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না সেগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, দাদন-দ্রব্য হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্তু [দাইন]। আর গুণাগুণ নির্ধারণ না করা হলে তা এমন অস্পষ্ট থাকে যা বিবাদ সৃষ্টি করে। তশতরি, আতরের শিশি অথবা মোজা বা এ জাতীয় অন্য কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করতে কোনো দোষ নেই, যদি গুণাগুণ ও পরিমাণ বর্ণনা দ্বারা তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, তখন সকল শর্ত বিদ্যমান পাওয়া যাচ্ছে। আর যদি বর্ণনা দ্বারা তা সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' করায় কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ জায়েজ নয়]। কেননা, তা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট বস্তু বা দাইন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكُلُّ مَا أَمَكَّنَ ضَبَطُ صَفَتِهِ الخ : ইমাম কুদুরী (র.) এখানে কোন কোন দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ হবে, আর কোন কোন দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না তার একটি মূলনীতি বর্ণনা করছেন। মূলনীতিটি হলো, যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সম্ভব এবং তার গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, যখন পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে এবং গুণাগুণ সুস্পষ্ট থাকবে তখন তা হস্তান্তর করার সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে না কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

আর যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না কিংবা তার গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয় না তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] দাদনগ্রহীতার জিহায় অনির্দিষ্টভাবে [দাইন হিসেবে] ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই তা গুণাগুণ উল্লেখ করে স্পষ্ট করা না গেলে তাতে এমন অস্পষ্টতা থেকে যায় যা বিবাদ সৃষ্টি করবে। আর যে অস্পষ্টতা বিবাদ সৃষ্টি করে তা ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ করে দেয় সুতরাং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ فِي طَسَبٍ أَوْ تُفْصِمَةٍ الخ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তশতরি, শিশি, মোজা বা এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য [যেমন- পেয়লা, লোহা বা পিতলের পাত্র ইত্যাদি] যদি গুণাগুণ উল্লেখের মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, তখন 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার সমস্ত শর্ত পাওয়া যাচ্ছে। আর যদি তা এমন হয় যে গুণাগুণ উল্লেখ করার পরও তা সুনির্দিষ্ট হয় না [যেমন- এমন কাঁচের এমন পাত্র যার এক এক প্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির তৈরি হয়ে থাকে] তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এ সুরতে দাদনকৃত দ্রব্য অস্পষ্ট 'দাইন' [জিহায় ওয়াজিব অনির্দিষ্ট বস্তু]। সুতরাং তা বিবাদ সৃষ্টি করবে। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।



قَالَ : وَإِنْ اسْتَضَعَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ جَازٍ اسْتَحْسَانًا لِلْإِجْمَاعِ الثَّابِتِ بِالتَّعَامُلِ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعًا لَا عِدَّةً، وَالْمَعْدُومُ قَدْ يَغْتَبَرُ مَوْجُودًا حُكْمًا، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ دُونَ الْعَمَلِ حَتَّى لَوْ جَاءَ بِهِ مَفْرُوعًا عَنْهُ لَا مِنْ صَنْعَتِهِ أَوْ مِنْ صَنْعَتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَأَخَذَهُ جَازًا، وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُسْتَضَعُّ جَازًا، وَهَذَا كُلُّهُ هُوَ الصَّحِيحُ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উল্লিখিত বস্তুসমূহের কোনোটি যদি মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই [বিক্রেতা পরে] প্রস্তুত করে দিবে এই শর্তে ক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে। সাধারণ প্রচলনের মাধ্যমে প্রমাণিত ইজমা [সর্বসম্মতি]-এর কারণে 'ইসতিহাসান' হিসেবে। ক্রয়সের দাবি অনুসারে তা জায়েজ না হওয়ার কথা। কেননা, তা অবিদ্যমান বস্তুর বিক্রয়। বিশুদ্ধ মতে এটা জায়েজ হবে 'বিক্রয়' রূপে 'ওয়াদা' রূপে নয়। অবিদ্যমান বস্তুও কখনও কখনও বিধানগতভাবে বিদ্যমান হিসেবে গণ্য হয়। আর এরূপ ফরমায়েশি চুক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত বস্তুটিই হচ্ছে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য [বা মা'কুদ আলাইহি] [বিক্রেতার] কর্ম এখানে উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। সুতরাং ফরমায়েশি গ্রহণকারী যদি এমন তৈরিকৃত দ্রব্য প্রদান করে যা তার তৈরি নয় কিংবা তার পূর্বের তৈরিকৃত এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করে, তাহলে জায়েজ হবে। আর এরূপ ফরমায়েশি চুক্তি (الْإِسْتِضَاعُ)-এর দ্রব্য ফরমায়েশিকারীর গ্রহণ করা ব্যতীত তা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং কারিগর যদি ফরমায়েশিদাতার দেখার পূর্বে তা অন্যের নিকট বিক্রয় করে, তবে তা জায়েজ হবে। উল্লিখিত বিধানগুলোই বিশুদ্ধ অভিমত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَضَعَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর মাসআলা বর্ণনা করছেন। [الْإِسْتِضَاعُ] [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর সূরত হলো, কোনো ব্যক্তি পেশাদার কারিগরের নিকট গিয়ে বলল, তুমি আমাকে এরূপ গুণাগুণ এবং এরূপ আকারের অমুক দ্রব্য এত টাকার বিনিময়ে তৈরি করে দিবে। আর কারিগর তা গ্রহণ করল। এরূপ চুক্তিকে [ফরমায়েশি চুক্তি] বা অর্ডারের ভিত্তিতে দ্রব্য তৈরির চুক্তি বলে। ফরমায়েশি চুক্তি (الْإِسْتِضَاعُ) এবং 'বায় সলম'-এর মাঝে পার্থক্য হলো, 'বায় সলম'-এর মাঝে বিক্রেতার জন্য অবকাশ স্বরূপ (إِسْتِثْنَاءً) মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় আর [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর মাঝে বিক্রেতার জন্য এরূপ মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় না; বরং [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর মাঝে যদি সময় উল্লেখ করা হয় তাহলে তা যদি দ্রুত দ্রব্যটি গ্রহণের উদ্দেশ্য (إِسْتِغْبَاً) হয় তাহলে তা সহীহ হবে অন্যথায় তা সহীহ হবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে উল্লিখিত প্রবাসমুহ অর্থাৎ তপতরি, শিশি, মোজা বা এ জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ না করে তা তৈরি করে দেওয়ার অর্ডার প্রদান করে, তাহলে ক্রয়সের দাবি অনুযায়ী যদিও তা জায়েজ না হওয়ার কথা কিন্তু **اِئْتِخَانٌ**-এর ভিত্তিতে তা জায়েজ। আর ইমাম শাফেরী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এরূপ **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি] জায়েজ নয়। ক্রয়সের দাবিও তাই। কেননা, চুক্তির সময় দ্রব্যটি অবিসদায়ন (مُتَّوَر) আর অবিসদায়ন বস্তু [বায় সলম] বাতীত। বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, পূর্বেই এ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে- **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَعَصَ فِي السَّلَمِ** "হজুর ﷺ যা মানুষের নিকট বিদ্যমান নেই তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তবে তিনি 'বায় সলম' করার অবকাশ দিয়েছেন।" সুতরাং **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি] যেহেতু 'বায় সলম'-এর অন্তর্ভুক্ত নয় কাজেই তা জায়েজ না হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা **اِئْتِخَانٌ** [ক্রয়সের বিপরীত **نَص** কিংবা **إِجَاعٌ** বা **إِفْسَارٌ خَفِيُّ**-এর কারণে **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি] জায়েজ বলেছি। এখানে **اِئْتِخَانٌ**-এর ভিত্তি হলো উম্মতের 'ইজমা'। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর জমানা থেকে আজ পর্যন্ত জনসমাজে সাধারণভাবে **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর প্রচলন রয়েছে এবং কেউ এর বিরোধিতা করেনি। কাজেই এটা উম্মতের **إِجَاعٌ عَلَى** হলো। এছাড়া স্বয়ং নবী করীম ﷺ **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর ভিত্তিতে আংটি বানিয়েছেন। এ মর্মে সুনানে নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَطْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْفُزُ عَلَيْهِ أَحَدٌ - إِنْ شَاءَ حَيِّدٌ وَرَحَاهُ بَقَاتٌ .

এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলছেন যে, ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, **الاستصناع** [ফরমায়েশি চুক্তি] কি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বলে গণ্য হবে, নাকি চুক্তিকালে তা শুধু ওয়াদা হবে আর হস্তান্তর কালে তা আদান-প্রদান (**اِلْتِخَاطٌ**)-এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হবে। এ ক্ষেত্রে ফকীহ হাকিম শহীদ, মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ, আল-মানসুর গ্রন্থের মুসান্নিফ (র.) প্রমুখদের মতে চুক্তিকালে এটি উভয় পক্ষ থেকে কেবল ওয়াদা বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন বিক্রোতা দ্রব্য হস্তান্তর করবে তখন আদান-প্রদানের মাধ্যমে **اِلْتِخَاطٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর পর উভয়ের হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। যেহেতু এটা কেবল ওয়াদা এ কারণেই **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর পর উভয়ের এখতিয়ার থাকে। অর্থাৎ চুক্তির পর যদি কারিগর উক্ত দ্রব্য তৈরি করতে না চায়, তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে অর্ডার প্রদানকারী যদি দ্রব্যটি দেখার পর তা গ্রহণ করতে না চায়, তাহলে তার সে অধিকার থাকবে। আর এরূপ উভয়ের অধিকার বা এখতিয়ার ওয়াদার মধ্যে সাব্যস্ত হয়, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাঝে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং বুঝা গেল **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি] মূলত ওয়াদা, চুক্তি নয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে সহীহ অভিমত [যা অধিকাংশ ফকীহ-এর তা] হলো, **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি চুক্তি] সম্পাদনকালেই তা ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি বলে গণ্য হবে- শুধু ওয়াদা বলে গণ্য হবে না। কারণ-

১. ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে একে বিক্রয় বলে উল্লেখ করেছেন।
২. **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] কেবল ঐ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে জায়েজ যা অর্ডারের ভিত্তিতে বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে। অথচ যদি কেবল তা ওয়াদা হতো, তাহলে প্রচলন থাক বা না থাক উভয় অবস্থায়ই জায়েজ হতো।
৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, **اِئْتِخَانٌ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে ক্রয়সের দাবি হলো জায়েজ না হওয়া আর ইসতিহসানের দাবি হলো জায়েজ হওয়া। অথচ কেবল ওয়াদা হলে এটা প্রযোজ্য হয় না। কেননা, ওয়াদা হলে তা সর্বাবস্থায়ই জায়েজ হতো।

আর উভয়ের এখতিয়ার সাব্যস্ত হয় বলে তা ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে না, এটা সঠিক নয়। কেননা, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের বিক্রয় (بَيْعُ الْمُبَايَعَةِ)-এর ক্ষেত্রে যদি চুক্তির সময় কেউ অপর পক্ষের দ্রব্য না দেখে, তাহলে উভয়ের তা গ্রহণ না করার এখতিয়ার থাকে। সুতরাং উভয়ের এখতিয়ার সাব্যস্ত হলেই তা ক্রয়-বিক্রয় হবে না, এটা আবশ্যক নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَالْمَعْقُودُ فَدُ بَعْتِ مَرْجُوءًا حَكْمًا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, اَلْاِنْصِنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] কিভাবে বিক্রয়চুক্তি হবে? অথচ চুক্তিকালে তো দ্রব্যটির অস্তিত্বই নেই। আর যার অস্তিত্ব নেই তা কিভাবে বিক্রয়-দ্রব্য (مَبِيع) বলে সাব্যস্ত হবে? এ প্রশ্নের জবাব হলো, শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে যখন اَلْاِنْصِنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] জায়েজ বলে সাব্যস্ত হয়েছে তখন এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, শরিয়ত এ ক্ষেত্রে অবিদ্যমান বস্তুকে বিধানগত দিক থেকে (حُكْمًا) বিদ্যমান বলে গণ্য করেছে। আর শরিয়তে এরূপ অনেক নজির রয়েছে। যেমন- মুক্তাদি কেরাত না পড়া সত্ত্বেও তার কেরাত হয়েছে বলে গণ্য হয়, জবাইকারী ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তার বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে বলে গণ্য হয়, مُسْتَحَاضَةٌ মহিলা অজ্ঞ করলে পবিত্র হয়েছে বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ دُونَ الْعَمَلِ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ফকীহ আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বিরদায়ীর অভিমত স্বপ্ন করেছেন। তাঁর মতে اَلْاِنْصِنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে চুক্তির মূলবস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) তৈরিকৃত দ্রব্য নয়; বরং কারিগরের কাজ হচ্ছে চুক্তির মূলবস্তু। এখানে টাকার বিনিময়ে শ্রমের চুক্তি হয়েছে। কাজেই এটা ইজারার অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাঁর উক্ত অভিমত সঠিক নয়; বরং এ ক্ষেত্রে চুক্তির মূলবস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) হচ্ছে তৈরিকৃত দ্রব্য, কারিগরের কাজ নয়। এ কারণেই কারিগর যদি চুক্তির দ্রব্য নিজে তৈরি না করে অন্যের তৈরিকৃত দ্রব্য প্রদান করে অথবা চুক্তির পূর্বে তার নিজের তৈরিকৃত দ্রব্য প্রদান করে এবং কেতা [ফরমায়েশ প্রদানকারী] তা গ্রহণ করে, তাহলে তা জায়েজ হয়। অথচ যদি চুক্তির মূলবস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) কারিগরের কাজ হতো, তাহলে উক্ত দুই সূরতে اَلْاِنْصِنَاعُ জায়েজ হতো না। কেননা, প্রথম সূরতে কারিগরের কাজ পাওয়া যাচ্ছে না আর দ্বিতীয় সূরতে তার কাজ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তা চুক্তির পূর্বের। কাজেই তা চুক্তির মূলবস্তু عليه المعقود হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْاِغْتِيَابِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلْاِنْصِنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে ফরমায়েশদাতা যতক্ষণ পর্যন্ত তৈরিকৃত দ্রব্য গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ফরমায়েশদাতার দ্রব্য বলে নির্দিষ্ট হবে না। সুতরাং কারিগর যদি দ্রব্যটি তৈরি করার পর তা ফরমায়েশদাতার দেখার পূর্বে অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে তাহলে জায়েজ হবে। আর যদি দ্রব্যটি আগেই ফরমায়েশদাতার জন্য নির্দিষ্ট হতো, তাহলে তা অন্যের নিকট বিক্রয় করা জায়েজ হতো না।

قَوْلُهُ وَمَا كُنَّا مَرَّ السَّيِّعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلْاِنْصِنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে আমরা যে বিধানগুলো উল্লেখ করলাম তা হলো এই—

১. ফরমায়েশি-চুক্তি [ফরমায়েশি-চুক্তি] ওয়াদা নয়; বরং ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি।

২. اَلْاِنْصِنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে চুক্তির মূলবস্তু (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) হলো, তৈরিকৃত দ্রব্য; কারিগরের কাজ নয়।

৩. ফরমায়েশদাতা যতক্ষণ পর্যন্ত তৈরিকৃত দ্রব্য গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ফরমায়েশদাতার দ্রব্য বলে নির্দিষ্ট হবে না।

এ অভিমতগুলোই হচ্ছে সঠিক অভিমত। অর্থাৎ এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই বিপরীত অভিমতও রয়েছে, কিন্তু আমরা যা উল্লেখ করেছি তাই হচ্ছে সঠিক অভিমত।

قَالَ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، لِأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَلَا خِيَارَ  
لِلصَّانِعِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ ، وَعَنْ أَبِي  
حَنِيفَةَ (رحا) أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ  
إِلَّا بِضَرْبٍ ، وَهُوَ قَطْعُ الصَّرْمِ وَغَيْرِهِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحا) أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُمَا ، أَمَّا  
الصَّانِعُ ، فَلَمَّا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْمُسْتَضْنِعُ فَلِأَنَّ فِي إثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُ إِضْرَارًا  
بِالصَّانِعِ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهِ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيمَا لَا تَعَامُلُ فِيهِ لِلنَّاسِ ،  
كَالْتِّيَابِ لِعَدَمِ الْمَجُوزِ ، وَفِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أُمِّنَ إِعْلَامُهُ  
بِالْوَصْفِ لِيُمْكِنَ التَّسْلِيمُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফরমায়েশদাতার ইচ্ছাধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে আর ইচ্ছা করলে পরিত্যাগ করবে। কেননা, সে না দেখা বস্তু ক্রয় করেছে। পক্ষান্তরে কারিগরের কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিতর্কহীন অভিমত। কেননা, সে না দেখা বস্তু বিক্রয় করেছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, কারিগরেরও ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা, ক্ষতি ছাড়া চুক্তির দ্রব্য হস্তান্তর করা সম্ভব হয় না। যেমন- চামড়া ইত্যাদি কর্তন করা। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, উভয়ের কারোরই ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কারিগরের ক্ষেত্রে কারণ হলো যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর ফরমায়েশদাতার ক্ষেত্রে কারণ হলো, তার ইচ্ছাধিকার থাকলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, তার জন্য তৈরি দ্রব্য অন্য কেউ অনুরূপ মূল্যে খরিদ করবে না। যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে জনসমাজে ফরমায়েশি চুক্তির প্রচলন নেই সে সকল দ্রব্যে ফরমায়েশি চুক্তি জায়েজ হবে না। কেননা, বৈধতা দানকারী কারণ বিদ্যমান নেই। আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রচলন রয়েছে তাতে ফরমায়েশি চুক্তি জায়েজ হবে, যদি গুণাগুণ বর্ণনা দ্বারা দ্রব্যটি সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয়, যাতে [হুবহু ফরমায়েশি বস্তুটি] অর্পণ করা সম্ভব হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْإِسْتِضَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যখন  
কারিগর দ্রব্য তৈরি করে ফরমায়েশদাতার নিকট উপস্থিত করবে তখন ফরমায়েশদাতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে  
তা গ্রহণ করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ নাও করতে পারবে। পক্ষান্তরে কারিগরের কোনো অধিকার থাকবে  
না, সে তা তৈরি করতে এবং তা হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর মাবসূত গ্রন্থে এ মতটিই উল্লেখ  
করেছেন এবং কোনো মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এটিই হচ্ছে 'জাহির রেওয়ায়েত' (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ)। আর

এটাই অধিক বিতর্ক অতিমত। কেননা, কারিগর হচ্ছে বিক্রেতা, সে তার দ্রব্য দেখার পূর্বে বিক্রয় করছে। আর বিক্রেতা যদি তার দ্রব্য না দেখে বিক্রয় করে, তাহলে না দেখার কারণে তার কোনো অখতিয়ার **خِيَارُ الرُّؤْيَةِ** সাব্যস্ত হয় না; বরং ক্রেতা যদি না দেখে ক্রয় করে তাহলে দেখার পর তার অখতিয়ার **(خِيَارُ الرُّؤْيَةِ)** সাব্যস্ত হয়।

জাহির রেওয়াজে ব্যতীত অন্য রেওয়াজে **أ- (غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ)** উপরিউক্ত অতিমত ছাড়া আরো দুটি অতিমত বর্ণিত হয়েছে—

১. ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারিগরেরও ইচ্ছাধিকার থাকবে, অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে চুক্তি সম্পাদিত করার পরও চুক্তির দ্রব্য তৈরি না করতে পারে, আবার তৈরি করার পর তা ফরমায়েশদাতাকে দেখানোর পূর্বে অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারে। কেননা, চুক্তির দ্রব্য ফরমায়েশদাতার নিকট পেশ করতে কারিগরের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, যেমন— দ্রব্যটি যদি জুতা হয়ে থাকে তাহলে তা তৈরি করার জন্য তার চামড়া কাটতে হবে, সুতা ও অন্যান্য বস্তু নষ্ট করতে হয়। আর দ্রব্যটি তৈরির পর ফরমায়েশদাতা যে তা গ্রহণ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। কেননা, ফরমায়েশদাতা তো **(خِيَارُ الرُّؤْيَةِ)**—এর ভিত্তিতে তা গ্রহণ নাও করতে পারে, ফলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কারিগরের এ ইচ্ছাধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে তা তৈরি করবে আর ইচ্ছা করলে তা তৈরি করবে না। অতএব **الْإِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] কোনো পক্ষেই অপরিহার্য চুক্তি বলে গণ্য হবে না; বরং তাতে উভয়েরই অখতিয়ার থাকবে।

২. ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়াজে আছে যে, ফরমায়েশদাতা বা কারিগর কারোরই অখতিয়ার থাকবে না। কারিগরের অখতিয়ার না থাকার কারণ তো পূর্বেই উল্লেখ করা হলো যে, কারিগর হচ্ছে বিক্রেতা আর বিক্রেতা তার দ্রব্য না দেখে বিক্রয় করলে তার না দেখার কারণে অখতিয়ার **(خِيَارُ الرُّؤْيَةِ)** সাব্যস্ত হয় না। আর ফরমায়েশদাতার অখতিয়ার না থাকার কারণ হলো, যদি ফরমায়েশদাতার অখতিয়ার সাব্যস্ত হয় তাহলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, কারিগর দ্রব্যটি তৈরি করার পর যদি ফরমায়েশদাতা অখতিয়ারের ভিত্তিতে তা গ্রহণ না করে, তাহলে কারিগর সেই মূল্যে তা হয়তো অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। আবার হয়তো সে দ্রব্য অন্যের নিকট বিক্রয়ই করতে পারবে না। যেমন— কোনো বস্তা মিষ্কার বানাল, অতঃপর সে যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে সাধারণ জনতা তা ক্রয় করবে না। ফলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং কোনো পক্ষেই অখতিয়ার সাব্যস্ত হবে না।

উল্লেখ্য, মাসআলাটি এখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হলো, হিদায়ার বাহ্যিক 'ইবারত' থেকে এবং মুসান্নিফ (র.) **لَا يَكُنْ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلَّا بِضَرْ وَكُ قَطْعُ الصَّرِّ وَغَيْرِهِ** বলে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত **(غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ)**—এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা থেকে সেরূপই বুঝা যায় এবং হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ আল-বিনায়াহ ও আল-ইনয়াহ গ্রন্থের ইবারত থেকেও এরূপই বুঝা যায়। অর্থাৎ মাভসূত গ্রন্থে উল্লেখিত **ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ** মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনের পর কারিগরের কোনো অখতিয়ার থাকবে না। সে চুক্তির দ্রব্য তৈরি করতে এবং তা হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত **غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ** অনুযায়ী কারিগরের অখতিয়ার থাকবে— ইচ্ছা করলে দ্রব্যটি তৈরি করবে আর ইচ্ছা করলে তা তৈরি করবে না। [উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) **كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَسْئُوطِ** বলে যে রেওয়াজেতের কথা বলেছেন তা হলো **ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ** আর **(رَح)** **وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ** এবং **(رَح)** **وَعَنْ أَبِي يُونُسَ** বলে যে দুটি রেওয়াজেতের কথা বলেছেন তা হলো **ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ**। সুতরাং সারকথা এই হলো যে, **ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ** [যাতে আমাদের তিন ইমামের কারো মতবিরোধ নেই] অনুসারে চুক্তি সম্পাদনের পর কারিগরের চুক্তির দ্রব্য তৈরি করা না করার অখতিয়ার থাকবে না। আর **تَنْتَوَرُ الْإِنْصَارِ** [দুয়ের মুখতার গ্রন্থের 'মতন']—এ ঠিক এরূপ—ই উল্লেখ করা হয়েছে, তার ইবারত হলো,

فَجَبَرُ الصَّانِعُ عَلَى عَمَلِهِ.

পক্ষান্তরে الْكَافِي لِلْعَاكِمِ الشَّهِيدِ, بَدَائِعُ الْمُنَانِيعِ, فَتَحُ الْقَدِيرِ, الْبَعْرُ الرَّائِقِ পক্ষান্তরে যে, চুক্তির পর কারিগরের এখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে তা তৈরি করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে তা তৈরি নাও করতে পারে আবার তৈরি করার পর ফরমায়েশদাতাকে তা দেখানোর পূর্বে অন্যের নিকট বিক্রয়ও করতে পারবে। এটাই সর্বসম্ভব অভিমত। তবে দ্রব্য তৈরি করার পর যদি তা ফরমায়েশদাতার সামনে উপস্থিত করে আর ফরমায়েশদাতা তা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তা হস্তান্তর করতে সে বাধ্য থাকবে। তখন আর তার এখতিয়ার থাকবে না। ফাতোয়ায়ে শামীতে আল্লামা শামী (র.) এ সকল গ্রন্থের ইবারত উল্লেখ করে এ সকল গ্রন্থের বক্তব্যই সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর বলেছেন, হিদায়ার গ্রন্থকার যে উল্লেখ করেছেন وَهُوَ الْأَصَحُّ .... وَلَا خِيَارَ لِلصَّانِعِ .... এটা এ ক্ষেত্রে যখন কারিগর দ্রব্য তৈরি করে তা ফরমায়েশদাতার সামনে উপস্থিত করবে। কিন্তু আল্লামা শামী (র.)-এর এ কথা অনুযায়ী হিদায়ার পরবর্তী ইবারত لَأَنَّهُ لَا يُنْكِنُ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (رحم) .... -এর ব্যাখ্যা করা জটিল।

-[ফাতোয়ায়ে শামী-মাকতাবায়ে যাকারিয়া, খণ্ড-৭, পৃ.-৪৭৫-৪৭৬।]

সুতরাং আলোচ্য বিষয়টিতে এ কথা বলাই সম্ভবত সঠিক হবে যে, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) طَاهِرُ الرِّوَايَةِ -কে এ অর্থে গ্রহণ করেছেন যে, কারিগরের কোনো অবস্থাতেই এখতিয়ার থাকবে না। আর উল্লিখিত অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তা এ অর্থে নিয়েছেন যে, ফরমায়েশদাতাকে দেখানোর পর কারিগরের কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

الْإِنْتِصَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] মুসান্নিফ (র.) قَوْلُهُ وَلَا يَجُزُّ فِيمَا لَا تَعَامُلُ فِيهِ لِلنَّاسِ الخ জন্য দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন-

১. যে দ্রব্যের জন্য ফরমায়েশ করা হবে সে দ্রব্যটি এমন হতে হবে যাতে জনসমাজে [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন (تَعَامُلٌ) রয়েছে। সুতরাং যে সকল দ্রব্যে [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর প্রচলন নেই তাতে [ফরমায়েশি-চুক্তি] জায়েজ হবে না। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কiyাসের দাবি হচ্ছে الانتصاع [ফরমায়েশি-চুক্তি] জায়েজ না হওয়া। কিন্তু تَعَامُلُ النَّاسِ বা জন-প্রচলনের কারণে انتصاع 'ইসতিহাসান' হিসেবে তা জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং যে দ্রব্যে এরূপ চুক্তির প্রচলন নেই সে ক্ষেত্রে জায়েজের কারণ تَعَامُلُ النَّاسِ পাওয়া গেল না। অতএব, তা কiyাসের দাবির উপরই বহাল থাকবে।

২. দ্রব্যটি এমন হতে হবে যা গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করা সম্ভব। কেননা, গুণাগুণ উল্লেখ করার দ্বারা যদি তা সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে তা হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি হবে। কাজেই তা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে না।

وَأَيْمًا قَالَ : بِغَيْرِ أَجَلٍ ، لِأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ فَيَمَّا فِيهِ تَعَامَلُ بِضَمٍّ سَلَمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا ، وَلَوْ ضَرَبَهُ فَيَمَّا لَا تَعَامَلُ فِيهِ بِضَمٍّ سَلَمًا بِالِاتِّفَاقِ لَهُمَا أَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةً لِلِاسْتِصْنَاعِ فَيُحَافِظُ عَلَى قَضِيَّتِهِ ، وَيُحْمَلُ الْأَجَلَ عَلَى التَّغْيِيلِ ، بِخِلَافِ مَا لَا تَعَامَلُ فِيهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِصْنَاعٌ فَاسْتِصْنَاعٌ فَاسْتِصْنَاعٌ عَلَى السَّلَامِ الصَّحِيحِ ، وَلَا بَيِّنَةَ حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ دَيْنٌ يَحْتَمِلُ السَّلَامَ وَجَوَازُ السَّلَامِ بِاجْتِمَاعٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، وَفِي تَعَامُلِهِمُ الْإِسْتِصْنَاعُ نَوْعٌ شُبْهَةٌ ، فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى السَّلَامِ أَوْلَى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : আর [প্রথমোক্ত মাসআলায়] 'মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই' কথাটি উল্লেখ করার কারণ হলো, যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে ফরমায়েশি চুক্তির প্রচলন রয়েছে তাতে যদি মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা 'বায় সলম' হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে 'বায় সলম' হবে না। আর যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রচলন নেই তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করলে তা সকলের ঐকমত্যে 'বায় সলম' হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, ফরমায়েশের শব্দ প্রকৃতভাবে ফরমায়েশের অর্থই প্রদান করে। সুতরাং তার অর্থ-চাহিদা রক্ষা করতে হবে। আর মেয়াদের উল্লেখ দ্রুত চাওয়ার অর্থে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রচলন নেই [সে সকল ক্ষেত্রে তা 'বায় সলম' হবে]। কারণ, তা হচ্ছে একটি ফাসিদ ফরমায়েশি চুক্তি, তাই [মেয়াদ উল্লেখের সূত্রে] তা বৈধ 'বায় সলম' বলে সাব্যস্ত করা হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ফরমায়েশি দ্রব্যটি হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্তু [বা দাইন] যা 'বায় সলম' হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর 'বায় সলম'-এর বৈধতা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোনো প্রকারের সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে ফরমায়েশি চুক্তির প্রচলনের বিষয়ে এক প্রকার সন্দেহ রয়েছে। [কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।] সুতরাং উক্ত ফরমায়েশি চুক্তিকে 'সলমের' অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম হবে। আল্লাহ তা'আলা-ই অধিক জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ وَإِنْ اسْتَصْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ مَتْنِ (র.) পূর্বের মুসান্নিফ (র.) : قَوْلُهُ وَإِيمًا قَالَ بِغَيْرِ أَجَلٍ الْغَيْرِ : وَأَيُّ شَيْءٍ اسْتَصْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ : عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : جَاءَ اسْتِصْنَاءُ (উল্লিখিত বস্তুসমূহের কোনোটি যদি মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই [বিভ্রতে পড়ে] প্রস্তুত করে দিবে এ শর্তে ক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে" এ ইবারতের মাঝে 'মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই' বলার কারণ ও ফায়দা কি ছিল তা বর্ণনা করছেন। এটি বুঝার পূর্বে একটি ভূমিকা বুঝতে হবে, তা হলো মেয়াদ বা সময় উল্লেখ করার দৃষ্টি উদ্দেশ্য হতে পারে—

১. অর্থের অবকাশ বা সময় দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যেমন— 'বায় সলম' -এর মাঝে দানগ্রহীতাকে সময় দেওয়া হয়।

২. **اِسْتِغْنَاءُ** অবকাশ বা সুযোগ দানের উদ্দেশ্য নয়; বরং দ্রব্যটি দ্রুত লাভের উদ্দেশ্যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। যেমন বলল, (আগামী তিন দিনের ভিতর তুমি দ্রব্য তৈরি করে দিবে। **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যে, পূর্বে মতনে বলা হয়েছে “মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রথম প্রকার অর্থাৎ কারিগরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ না করতে হবে।

মুসল্লিক (র.) বলেন, পূর্বে যে বলা হয়েছে ‘মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই’ এর কারণ হলো, **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যদি মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় এবং তা কারিগরকে অবকাশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে **اِسْتِغْنَاءُ** হয়, তাহলে চুক্তিটি যদি এমন দ্রব্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যাতে **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন রয়েছে তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা ‘বায় সলম’ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তা জায়েজ হওয়ার জন্য সেসকল শর্ত আবশ্যিক হবে যা ‘বায় সলম’ সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যিক। [ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং আহমদ (র.)-এর অভিমতও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতের অনুরূপ।] আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য হবে। আর যদি চুক্তিটি এমন দ্রব্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যাতে [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন নেই, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা ‘বায় সলম’ বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, যদি মেয়াদ উল্লেখ না করে কিংবা মেয়াদ উল্লেখ করে দ্রুত গ্রহণের জন্য কারিগরকে সময় বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যে **اِسْتِغْنَاءُ** তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]- বলেই গণ্য হবে। **قَوْلُهُ لَهَا أَنْ تَلْغُظَ حَقِيقَةً لِلْاِسْتِغْنَاءِ** : বিরোধপূর্ণ সূরতের ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, যেহেতু চুক্তিকারীদ্বয় **اِسْتِغْنَاءُ** [অর্ডার প্রদান ও অর্ডার গ্রহণ]-এর শব্দ দ্বারা চুক্তিটি করেছে আর **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] হওয়াই-এর প্রকৃত অর্থ। কাজেই শব্দের প্রকৃত অর্থ হিসেবে তা **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য করা হবে। বাকি থাকল মেয়াদ উল্লেখ করার বিষয়টি। তা সে ক্ষেত্রে আমরা বলব, মেয়াদ উল্লেখ যেহেতু দুটি অর্থে হতে পারে—

১. **اِسْتِغْنَاءُ** বা দ্রব্য দ্রুত গ্রহণের জন্য কারিগরকে সময় বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্য।

২. **اِسْتِغْنَاءُ** অর্থাৎ কারিগরকে অবকাশ বা একটা মেয়াদের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

প্রথম অর্থ ধরা হলো তা সকলের ঐকমত্যে **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য হয়। সুতরাং শব্দের প্রকৃত অর্থ বলল রাখতে আমরা মেয়াদের উল্লেখকে প্রথম অর্থে ধরে নিব। অতএব, তা **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে দ্রব্যের ক্ষেত্রে **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন নেই, সে ক্ষেত্রে যেহেতু **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] হিসেবে গণ্য করলে চুক্তিটি ফাসিদ হয় তাই শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করে তা মেয়াদ উল্লেখের কারণে ‘বায় সলম’-এর অর্থে গণ্য করা হবে, যাতে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের চুক্তি যথাসম্ভব সঠিক রাখা যায়।

**قَوْلُهُ وَلَا يَسْ خَبِيفَةً (رحا) : أَنَّهُ دَيْنٌ يَحْتَمِلُ السَّلَمَ** : এর মতবিরোধপূর্ণ সূরতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ফরমায়েশকৃত দ্রব্যটি কারিগরের জিম্মায় ওয়াজিব বা দাইন হয়ে থাকে। আর এরূপ জিম্মায় ওয়াজিব [দাইন] ‘বায় সলম’-এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে এবং **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যখন মেয়াদের উল্লেখ করেছে তখন তা ‘বায় সলম’-এর চুক্তি হওয়ার সজাবনা রাখে এবং **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] হওয়ারও সজাবনা রাখে। কিন্তু ‘বায় সলম’-এর চুক্তির অর্থে গ্রহণ করাই অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, ‘বায় সলম’-এর বৈধতা এমন ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, ‘বায় সলম’ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো মতবিরোধ নেই। তাছাড়া ‘বায় সলম’-এর বৈধতা কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। পক্ষান্তরে **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর বৈধতা যে **اِخْتِصَانُ** বা **تَعَامُلُ** **الْأَنْسِ** -এর উপর ভিত্তিলাভ তা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে। কারণ, **اِسْتِغْنَاءُ** [ফরমায়েশি-চুক্তি] বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। অতএব, যখন মেয়াদ উল্লেখের কারণে তাতে উভয় চুক্তি হওয়ার সজাবনা রয়েছে, তখন যে চুক্তির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সেই চুক্তিই গণ্য হবে।



## مَسَائِلُ مَنْشُورَةٌ

قَالَ : وَجُوزُ بَيْعِ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسَّبَاعِ، الْمَعْلَمُ وَغَيْرُ الْمَعْلَمِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رَح) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَح) لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مَنِ السُّخْتِ مَهْلُ الْبَغْيِ وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَلَئِنَّ نَحْسَ الْعَيْنِ، وَالتَّجَاسَةَ تُشْعِرُ بِهِوَانِ الْمَحَلِّ، وَجَوَّازِ الْبَيْعِ يُشْعِرُ بِإِعْزَازِهِ فَكَانَ مُنْتَفِعًا، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَبِيدٍ أَوْ مَا شِئِئَةٍ، وَلَئِنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِهِ حَرَّاسَةً وَأَصْطِيْدًا، فَكَانَ مَالًا فَيجُوزُ بَيْعُهُ، بِخِلَافِ الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ، لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِنْتِدَاءِ قَلْعًا لَهُمْ عَنِ الْإِقْتِنَاءِ وَلَا نُسَلِّمُ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ، وَلَوْ سَلِّمَ فَيَحْرُمُ التَّنَاوُلُ دُونَ الْبَيْعِ.

### বিক্রিও কিছু মাসআলা

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কুকুর, চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী বিক্রয় করা জায়েজ। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উভয়ে সমান। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা মতে দংশনকারী কুকুর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, দংশনকারী কুকুর দ্বারা উপকার অর্জিত হয় না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো প্রকার কুকুর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন—“নিশ্চয়ই ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক এবং কুকুরের মূল্য হারাম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।” আরেকটি কারণ এই যে, কুকুর হচ্ছে সত্তাগতভাবে নাপাক, আর নাপাক হওয়া বস্তুটির তুচ্ছ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। পক্ষান্তরে কোনো বস্তু বিক্রয় জায়েজ হওয়া তার মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই বিক্রয়ের বৈধতা নিষিদ্ধ হবে। আর আমাদের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ শিকারের কুকুর ও পশুপাল পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এ কারণে [জায়েজ] যে, কুকুর দ্বারা পাহারা দেওয়ানো এবং শিকার করানোর মাধ্যমে তা দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। সুতরাং তা [মূল্যাসম্পন্ন] মাল হবে। অতএব, তা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তদ্বারা উপকার লাভ করা হয় না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। [এ নিষেধাজ্ঞার] উদ্দেশ্য ছিল, তাদের কুকুর পালার অভ্যাস নির্মূল করা। আর আমরা কুকুর সত্তাগত নাপাক হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করি না। আর যদি স্বীকার করেও নিই তাহলে আমাদের জবাব হলো, এ কারণে তা ঋণায়া হারাম হবে—বিক্রয় হারাম হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَسَائِلُ مَنفُورَةٌ : আত্মা ইবনে হুযাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, যে সকল মাসায়েল পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে উল্লেখ করা থেকে বাদ পড়ে যায় সেগুলোকে যখন পরিশিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয় তখন তার শিরোনাম 'مَسَائِلُ مَنفُورَةٌ' বা 'বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ' দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল মাসায়েল 'ক্রয়-বিক্রয়' সংক্রান্ত পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে উল্লেখ করা থেকে বাদ পড়েছে, তার আলোচনা।

قَوْلُهُ قَالَ : وَبَيَّزَ بَيْعَ الْكَتْبِ الْغ : মাসআলা : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কুকুর, চিতাবাঘ এবং হিংস্র প্রাণীসমূহে বিক্রয় করা জায়েজ। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে চাই প্রাণীটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোক কিংবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হোক উভয় অবস্থায়ই বিক্রয় জায়েজ হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে (عَنْ ظَاهِرِ الرَّوَّانَةِ) এ- বর্ণিত আছে যে, দংশনকারী কুকুর যাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না, তা বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, তা দ্বারা কোনো উপকার অর্জিত হয় না। উল্লেখ্য, ইমাম সারাবসী (র.) তাঁর মাকসুত গ্রন্থে এ মতটিকে আমাদের মাফহাবের সঠিক মত বলে বর্ণনা করে বলেছেন, যে সকল প্রাণী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা বিক্রয় করা জায়েজ হবে, আর যা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না তা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। -[বিস্তারিত দেখুন, ফাতহুল কাদীর ও ফতোয়ায়ে শামী, ৭ম খণ্ড-] بَابُ الْمَتَعَرَّكَاتِ প্রশিক্ষণ গ্রহণের অর্থ হলো, প্রাণীটিকে মালিক শিকারের নির্দেশ দিলে শিকারের জন্য উদ্যত হয় এবং বারণ করলে থেমে যায়। আর শিকার করার পর সে নিজে তা থেকে ভক্ষণ করে না; বরং মালিকের অপেক্ষায় রেখে দেয়।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো প্রকারের কুকুর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। উল্লেখ্য, তাঁর এ মতবিরোধ বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে; কুকুর পোষার ক্ষেত্রে নয়। কেননা, শিকারের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি, ফসল বা পশু পাহারার জন্য কুকুর পোষা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল রয়েছে।

قَوْلُهُ لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مِنَ السَّعْبِ الْخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিল হলো-

১. সহীহ ইবনে হিব্বান ও দারাকুতনীতে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْبَنِيِّ وَتَمَنَ الْكَتْبِ وَكَسَبَ النِّعَامِ مِنَ السَّعْبِ .

"নবী করীম ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক, কুকুরের মূল্য এবং শিক্ষা লাগিয়ে উপার্জনকারীর উপার্জন হারামের অন্তর্ভুক্ত।"

২. বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَتْبِ وَمَهْرَ الْبَنِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক এবং গণকের মিষ্টান্ন [গ্রহণ করতে] নিষেধ করেছেন।

৩. মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ تَمَنِ الْكَتْبِ .

"নবী করীম ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।"

قَوْلُهُ وَلَا تَهْجَسُ الْعَمِينَ وَالْجَائِسَةَ تُنْفِرُ بِهِمَا السَّحْلُ الْخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিল হলো, কুকুর সন্তাপ্তভাবে নাপাক। তার প্রমাণ হলো, এর ঝুটা নাপাক। আর ঝুটা নাপাক হয় তার মুখের লাল নাপাক হওয়ার কারণে, আর মুখের লাল নাপাক হয় গোশত নাপাক হওয়ার কারণে, সুতরাং বুঝা গেল কুকুরের গোশত নাপাক। আর যা সন্তাপ্ত নাপাক তা বিক্রয় করা হারাম হয়। কেননা, সন্তাপ্ত নাপাক হওয়া বহুটি হীন ও নিকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে বিক্রয় জায়েজ হওয়া বহুটির মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর একই বস্তু হীন এবং মর্যাদাপূর্ণ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যেহেতু কুকুর হীন হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে সেহেতু তা বিক্রয় করা নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلَبَ صَنِيعِ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকেও নকলী এবং আকলী উভয় প্রকারের দলিল পেশ করেছেন। আমাদের নকলী দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস-  
 'أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلَبَ صَنِيعٍ أَوْ مَاسِيَةٍ'  
 'নবী করীম ﷺ শিকারের কুকুর ও পশুপাল পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"

এ হাদীসটি মুসান্নিফ (র.) যে শব্দে উল্লেখ করেছেন সে শব্দে হাদীস এচ্ছে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ মর্ষের হাদীস দুর্বল সনদে তিরমিযীতে হয়রত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এবং ইবনে আদীর 'আল-কামিল'-এ হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটু পরে আমরা আলোচনা করব।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلَبَ صَنِيعٍ أَوْ مَاسِيَةٍ : আমাদের আকলী দলিল হলো, কুকুর এমন একটি মাল বা সম্পদ, যা দ্বারা উপকার অর্জিত হয়। যেমন- শিকার করা, পাহারা দেওয়া। আর শরিয়ত কুকুর দ্বারা এ সকল উপকার অর্জন করার অনুমতিও প্রদান করেছে। [কেননা, শিকার করা বা পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পোষা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ।]। সুতরাং কুকুর শরিয়তসম্মত মালের অন্তর্ভুক্ত। আর যা শরিয়তসম্মত মালের অন্তর্ভুক্ত তা বিক্রয় জায়েজ। অতএব, কুকুর বিক্রয় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গ বা প্রাণী বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, তা দ্বারা উপকার অর্জিত হয় না। তাই তা শরিয়তসম্মত মালের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, তা বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْحَيْدُوتُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِنْبِذِ الْخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো-

১. বিক্রয় নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস প্রথম দিকের, পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। এর দলিল হচ্ছে, জাহিলিয়া যুগ থেকে সাধারণত সখের কারণে কুকুর পোষার প্রবণতা ছিল। আর এ প্রবণতা সমূলে দূর করার জন্য প্রথম দিকে সব ধরনের কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা রহিত করে শিকারি ও পাহারার কুকুর পোষার অনুমতি দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফ ও তাহাবী শরীফে হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا لِي وَلِلْكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ بَيْنَ كَلْبِ الصَّنِيدِ وَفِي كَلْبِ آخَرِ نَيْسَةٍ سَوِيَّةٍ.

"নবী করীম ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করলেন। পরবর্তীতে বললেন, কুকুরের সাথে আমার কী [শত্রুতা] আছে! অতঃপর তিনি শিকারি কুকুর ও অন্য একটি কুকুর-যা বর্ণনাকারী সাঈদ ভুলে গিয়েছেন- পোষার অনুমতি প্রদান করলেন।" এ হাদীসের ভিত্তিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- বিক্রয় নিষেধের হাদীসটিও প্রথম দিকের, যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

২. আমাদের দ্বিতীয় জবাব হলো, উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে কুকুর বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে, তদ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা শিকার কিংবা পাহারার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না। কেননা, এরূপ কুকুর পোষা জায়েজ নয়, তাই তা বিক্রয়ও জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে শিকারি কুকুর কিংবা পাহারার কুকুর শরিয়তে পোষার অনুমতি দিয়েছে, কাজেই তা 'উপকারী সম্পদ'। কেননা, শরিয়তের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, যা কাজে ব্যবহার করার এবং তা থেকে উপকার অর্জন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা ক্রয়-বিক্রয় করারও অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায় বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, বস্তুটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু তা অর্জন করার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হলো- যা শরিয়তের সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী। আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন হচ্ছে ঐ সকল রেওয়ায়েত যাতে শিকারি কুকুরকে বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার বহির্ভূত (مُسْتَفْنَى) করা

হয়েছে। যদিও হাদীসগুলোর সনদ দুর্বল, কিন্তু তা কমপক্ষে শরিয়তের সাধারণ নিয়মের অনুকূলে সমর্থন যোগাবে। এ সকল রেওয়াজের মধ্যে রয়েছে—

১. পূর্বে বর্ণিত মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লেখকৃত হাদীস—**أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَبِيٍّ أَوْ مَاشِيَةٍ**
২. তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—**نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَبِيٍّ**

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল।

৩. ইবনে আদী 'কামিল'-এ হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন—**أَرْخَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَنِ كَلْبِ الصَّبِيِّ**

উল্লেখ্য, আমাদের এ জবাব অনুযায়ী কেবল উপকার-উপযোগী কুকুর বিক্রয় জায়েজ; উপকার-অনুপযোগী কুকুর বিক্রয় জায়েজ নয়। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম সারাখসী (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এ অভিমতটিই আমাদের মাযহাবের বিশুদ্ধতম অভিমত।

**خُفِيَ عَنْهُ** : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, প্রথমত আমরা তাঁর এ দাবি স্বীকার করি না যে, কুকুর সত্তাগতভাবে নাপাক। কেননা, নিঃশর্তভাবে কুকুর দ্বারা উপকার অর্জন করা শরিয়ত জায়েজ করেছে, আর এটা প্রমাণ বহন করে যে, কুকুর সত্তাগত নাপাক নয়। আর দ্বিতীয়ত যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, কুকুর সত্তাগত নাপাক, তাহলেও তাঁর দলিলের জবাব হলো, সত্তাগত নাপাক হওয়ার কারণে কুকুর খাওয়া হারাম হবে, কিন্তু তা বিক্রয় করা হারাম হবে না। যেমন— আমাদের মতে গোবর বা লেদ সত্তাগতভাবে নাপাক, কিন্তু তা বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, শরিয়ত তা ব্যবহার করে উপকার গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে, কাজেই তা বিক্রয়ও জায়েজ। পক্ষান্তরে মানুষের পায়খানা সত্তাগত নাপাক এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, সুতরাং তা বিক্রয় করাও জায়েজ নয়। অবশ্য যে প্রক্রিয়ায় তা ব্যবহারের বৈধতার কথা ফকীহগণ বলেন, সে ক্ষেত্রে তা বিক্রয় বৈধ হওয়ার কথাও বলেন। যেমন— তা যদি মাটির সাথে মিশ্রিত করা হয় তবে ফিকহবিদগণের মতে তা ব্যবহার করা জায়েজ, তদ্রূপ তা বিক্রয় করাও জায়েজ। সারকথা, যে সকল বস্তু বা প্রাণীর দ্বারা উপকার গ্রহণ করা জায়েজ করা হয়েছে সে সকল বস্তু বা প্রাণী বিক্রয় করাও জায়েজ করা হয়েছে। কাজেই কুকুর বিক্রয় করাও জায়েজ হবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ ، إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَآكَلَ ثَمَرِهَا ، وَلَئِنَّ لَيْسَ بِمَالٍ فَيُحَقِّقْنَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মদ ও শূকর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ মদ সম্পর্কে বলেছেন, যে মহান সত্তা তা পান করা হারাম করেছেন তিনি তা বিক্রয় করা এবং মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম করেছেন। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, তা আমাদের [মুসলামানদের] জন্য মাল বলে গণ্য নয়। এ বিষয়টি আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

### শাসনিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ :

মাসআলা : মদ ও শূকর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। মদ বিক্রয় হারাম হওয়ার দলিল হলো নবী করীম ﷺ-এর হাদীস। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ يَعْصُرُ مِنَ الْعَبْتِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى الْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شَرْبَهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَسَأَلْتُ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَأَرْتَهُ ؟ قَالَ : أَمَرْتَهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا .

“আব্দুর রহমান ইবনে ও'লা বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে আব্দুর নিংড়ানো রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এক ব্যক্তি একটি মদের মশক নবী করীম ﷺ-কে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করেছিল। তখন নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, তুমি কি জান যে, আল্লাহ তা'আলা মদ পান করা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তখন এক ব্যক্তি সেই লোকটির সাথে কানে কানে কি যেন বলল। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কানে কানে তাকে কি বললে? সে বলল, আমি তাকে এ মদ বিক্রয় করে ফেলার পরামর্শ দিয়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে মহান সত্তা এটা পান করা হারাম করেছেন, তিনি এটা বিক্রয় করাও হারাম করে দিয়েছেন।”

উল্লেখ্য, এ হাদীসটিতে কেবল মদ বিক্রয় হারাম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) শূকর বিক্রয় হারাম হওয়া সংক্রান্ত কোনো হাদীস উল্লেখ করেননি। এ সংক্রান্ত হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ—

عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ وَهُوَ يَمْكُهُ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ الخ -

“হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় থাকাকালীন বলতে শুনেছেন, নিচয় আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃত জানোয়ার, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।”

قَوْلُهُ وَلَئِنَّ لَيْسَ بِمَالٍ فَيُحَقِّقْنَا : মদ ও শূকর বিক্রয় করা হারাম হওয়ার আকসী দলিল হলো, শরিয়তের দৃষ্টিতে মদ ও শূকর মুসলমানদের ক্ষেত্রে মূল্যসম্পন্ন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে বস্তু মূল্যসম্পন্ন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয় তা বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কাজেই মদ ও শূকর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমরা ‘ফাসিদ বিক্রয়’ অধ্যায়ের শুরুতে [মূল গ্রন্থের ৩৩ নং পৃষ্ঠার শুরুতে] আলোচনা করেছি।

قَالَ : وَأَهْلُ الدِّمَةِ فِي الْبَيْعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ : فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَهُمُّ مَكْلَفُونَ مُخْتَاَجُونَ كَالْمُسْلِمِينَ، قَالَ : إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ خَاصَّةً، فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ، وَعَقْدُهُمْ عَلَى الْخِنْزِيرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ، لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ فِي إِعْتِقَادِهِمْ، وَتَحْنُ أَمْرُنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَغْتَفِدُونَ، دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ (رض) : وَلَوْ هُمْ بَيْنَهُمَا وَخَذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهِمَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জিম্মিগণ সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতোই। কেননা, নবী করীম ﷺ সেই হাদীসে বলেছেন—“তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের জন্য থাকবে সে সকল সুযোগ-সুবিধা যা মুসলমানদের রয়েছে এবং তাদের উপর থাকবে সে সকল দায়-দায়িত্ব যা মুসলমানদের উপর রয়েছে।” তাছাড়া এ কারণে যে, তারাও মুসলমানদের ন্যায় [বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে] শরিয়তের পক্ষ থেকে সম্বোধিত এবং [জীবনযাপনের জন্য লেনদেন করার] মুখাপেক্ষী। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে কেবলমাত্র মদ এবং শূকরের ক্ষেত্রে [তাদের বিধান ব্যতিক্রম]। অতএব, মদের ক্ষেত্রে তাদের চুক্তি মুসলমানদের ফলের রসের ক্ষেত্রে চুক্তির ন্যায় হবে এবং শূকরের ক্ষেত্রে তাদের চুক্তি মুসলমানদের বকরির ক্ষেত্রে চুক্তির ন্যায় হবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস মতে এগুলো [মুলাস্পন্ন] সম্পদ। আর আমরা তাদেরকে তাদের বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিতে আদিষ্ট হয়েছি। হযরত ওমর (রা.)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশটি এ বিষয়টির প্রমাণ— “তাদেরকে ঐ দুটি বস্তু বিক্রয় করার ক্ষমতা দিয়ে দাও এবং তার মূল্য থেকে উশর গ্রহণ কর”।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْبَيْعَةُ এবং أَهْلُ الدِّمَةِ পরিচিতি :

الْبَيْعَةُ : শব্দটি بَيْعَةٌ-এর বহুবচন। আব্বাসী আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, الْبَيْعَةُ-এর অর্থ হচ্ছে [পণদ্রব্য]। এখানে الْبَيْعَاتُ فِي দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে الْبَيْعَاتُ [পণদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে]। বাহ্যত মনে হয় ফকীহগণ الْبَيْعَاتُ বলে ক্রয়-বিক্রয় বুঝিয়েছেন, কিন্তু অভিধানে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় না।

أَهْلُ الدِّمَةِ : জিম্মি বলা হয় এমন কাফের ব্যক্তিকে, যে মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও তাদের আইন-কানুন মেনে নিয়ে বসবাস করে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَأَهْلُ الدِّمَةِ فِي الْبَيْعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেন সম্পর্কিত চুক্তির ক্ষেত্রে জিম্মিদের ক্ষেত্রে বিধান তাই প্রযোজ্য হবে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যে সকল ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের জন্য বৈধ তা তাদের জন্যও বৈধ হবে, আর যে সকল ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় তা তাদের জন্যও বৈধ হবে না। উদাহরণস্বরূপ তারা পরস্পরে এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না, বায় সলম [দান-চুক্তি]-এর ভিত্তিতে পশু বিক্রয় করতে পারবে না এবং ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে বাকি বিক্রয় করতে পারবে না।

الْحَدِيثُ الْخ : قَوْلُهُ لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُنَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْخ  
উল্লিখিত হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর বাণী-  
نَبِيَّ كَرِيمٍ : যখন হযরত মুয়ায (রা.)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন।  
তন্মধ্যে এ নির্দেশনাটি ছিল যে, "তুমি তাদেরকে [অর্থাৎ সেখানকার কাফির অধিবাসীদেরকে] জানিয়ে দিবে যে, মুসলমানদের  
জনা যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও বৈধতা রয়েছে তা তারাও লাভ করবে, আর মুসলামানদের উপর যে সকল কর্তব্য ও  
বিধি-নিষেধ রয়েছে তা তাদের উপরও বর্তাবে।"

الْح : قَوْلُهُ وَلَئِنَّهُمْ كَفَلُونَ مَعْنَاهُ كَانُوا لِيَسْلِمِينَ الْخ : উক্ত মাসআলার দ্বিতীয় দলিল হলো, জিম্মিরা সকলের ঐকমত্যে  
লেনদেন সম্পর্কিত বিধিবিধানের 'মুকাত্বাফ' বা আওতাধীন এবং জীবনোপকরণ অর্জন করার জন্য তারাও এ সকল ক্রয়-বিক্রয়  
ও লেনদেনের মুখাপেক্ষী। আর তারা আমাদের দেশের বিধি-বিধান মেনে নিয়ে বসবাস করতে সম্মতি প্রদান করেছে। সুতরাং  
ক্রয়-বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিধিবিধান তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

الْح : قَوْلُهُ قَالَ : إِنْ فِي الْخَيْرِ وَالْخَيْرِ خَاصَّةُ الْخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে জিম্মিদের ক্ষেত্রে মদ ও শূকরের বিধান  
মুসলামানদের বিধানের ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ এ দুটির ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের জন্য যদিও জায়েজ নয়, কিন্তু জিম্মিদেরকে এ  
দুটি ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান করা হবে। তারা পরস্পরে যদি মদ ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তার বিধিবিধান মুসলমানদের  
পারস্পরিক আঙ্গুরের রস বিক্রয়ের বিধিবিধানের অনুরূপ হবে। আর তারা যদি পরস্পরে শূকর ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তার  
বিধিবিধান মুসলমানদের পারস্পরিক বকরি বিক্রয়ের বিধিবিধানের ন্যায় হবে।

الْح : قَوْلُهُ لَأَنْهَا أَمْوَالٌ فَمِنْ إِنْغِيَابِهِمُ الْخ : এ মাসআলার দলিল হলো, মদ ও শূকর জিম্মিদের ধর্ম-বিশ্বাস মতে মূল্যমান সম্পদ  
সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদেরকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমরা শরিয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট।  
সুতরাং যখন এ দুটি তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে মূল্যমানসম্পদ সম্পদ তখন এ দুটির ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হবে।

الْح : قَوْلُهُ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ عَمَرَ (رَضَ) : وَلَوْهُمْ بَيْعُهُمَا الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা যে জিম্মিদেরকে তাদের  
ধর্ম-বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিতে শরিয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট, এর প্রমাণ বহন করে গভর্নরদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর  
নিম্নোক্ত ফরমান-  
وَلَوْهُمْ بَيْعُهُمَا رَخَدُوا الْعُسْرَ مِنْ أَنْفَاهِمَا "তাদেরকে ঐ দুটি বস্তু বিক্রয় করার ক্ষমতা দিয়ে দাও  
এবং তার মূল্য থেকে উশর গ্রহণ কর।" পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ عَفْلَةَ يَقُولُ : حَضَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ عَمَّالُهُ، فَقَالَ يَا  
مَوْلَاهُ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكُمْ تَأْخُذُونَ فِي الْجِزْيَةِ الْمَنِيَّةِ وَالْخَزِيرِ وَالْخَمْرِ فَقَالَ بَلَّاءُ : أَجَلُ إِنَّهُمْ يَتَعَلَّلُونَ ذَلِكَ.  
فَقَالَ : فَلَا تَتَعَلَّلُوا وَلَكِنْ وَلَوْ أَنَّهَا بَيْعُهُمَا ثُمَّ خُذُوا الثَّمَنَ مِنْهُمْ وَلَا تَجِيزُوا فِيهَا بَيْعَهُمْ بَعِثَ الْمَنِيَّةَ وَالْبَلَمَ .

উল্লেখ্য, 'হাদীসটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর গ্রন্থ 'কিতাবুল খিরাজ'-এ বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুর রাযযাক ও আবু  
উবায়দে তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَمَنْ قَالَ لِعَهِدِهِ بَعْ عَبْدَكَ مِنْ فُلَانٍ يَأْلَفُ ذَرْهَمٍ عَلَى أُنَى ضَامِنٍ لَكَ خَمْسَ مِائَةٍ مِنَ الثَّمَنِ سِوَى أَلْفٍ فَفَعَلَ قَهْوَ جَائِزٍ، وَيَأْخُذُ أَلْفَ مِنَ الْمُشْتَرَى وَالْخَمْسَ مِائَةً مِنَ الضَّامِنِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ مِنَ الثَّمَنِ جَازَ الْبَيْعِ يَأْلَفُ ذَرْهَمٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الضَّمِينِ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّمَنِ وَالْمُثْمِنِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا، وَتَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِرُفْرُ وَالشَّافِعِيِّ (رح) لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ وَصْفٍ مَشْرُوعٍ إِلَى وَصْفٍ مَشْرُوعٍ وَهُوَ كَوْنُهُ عَدْلًا أَوْ خَاسِرًا أَوْ رَابِحًا ثُمَّ قَدْ لَا يَسْتَفِيدُ الْمُشْتَرَى بِهَا شَيْئًا بِأَنْ زَادَ فِي الثَّمَنِ وَهُوَ يَسَاوِي الْمَبِيعَ بِذَوْنِهَا، فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ كَبَدْلِ الْخُلْعِ، لَكِنْ مِنْ شَرْطِهَا الْمُقَابَلَةُ تَسْمِيَةً وَصُورَةً فَإِذَا قَالَ مِنَ الثَّمَنِ وَجَدَ شَرْطُهَا فَيَصِحُّ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لَمْ يَوْجَدْ فَلَمْ يَصَحَّ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ অপরকে বলে 'তুমি তোমার গোলামটি অমকের নিকট এক হাজার দিরহামে এই শর্তে বিক্রয় কর যে, এক হাজার দিরহাম ব্যতীত মূল্য থেকে পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার আমি, অতঃপর বিক্রেতা যদি তা করে তাহলে এটা জায়েজ হবে। আর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম উসূল করবে এবং দায়গ্রহণকারীর নিকট হতে পাঁচশত দিরহাম গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে দায়গ্রহণকারী যদি 'মূল্য থেকে' কথাটি না বলে তাহলে এক হাজার দিরহাম মূল্য সাব্যস্ত হয়ে বিক্রয়টি জায়েজ হয়ে যাবে। আর দায়গ্রহণকারীর উপর কোনো পাওনা সাব্যস্ত হবে না। এ ক্ষেত্রে মূলনীতিটি হলো, আমাদের মতে মূল্য এবং বিক্রীত-দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত সংযোজন করা জায়েজ এবং তা মূল চুক্তির সাথেই যুক্ত হয়। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হলো, এটা হচ্ছে চুক্তিটিকে একটি বৈধ গুণ থেকে আরেকটি বৈধ গুণে পরিণত করা। এখানে বৈধ গুণগুলো হলো- চুক্তিটি [বিক্রয়মূল্যের সাথে বাজারমূল্যের তুলনার ক্ষেত্রে] সমান সমান হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা লাভজনক হওয়া। আর কখনো এমন হয় যে, ক্রেতা অতিরিক্ত সংযোজিত মূল্যের বিনিময়ে কোনো ফায়দা অর্জন করে না। যেমন- সে মূল্যের সাথে অতিরিক্ত সংযোজন করল অথচ বর্ধিত অংশ ছাড়া প্রথম মূল্যই বিক্রীত-বস্তুর [বাজারমূল্যের] সমান ছিল। সুতরাং অতিরিক্ত সংযোজনের শর্ত তৃতীয় ব্যক্তির উপর করাও সঠিক হবে। যেমন- 'খুলা' [অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর তালাক গ্রহণ]-এর বিনিময়-বস্তুর ক্ষেত্রে [অর্থাৎ 'খুলা'কারিণী স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি 'খুলা'-এর বিনিময়-বস্তু আদায় করে দিবে এরূপ শর্ত করলে তা সঠিক হয়]। তবে অতিরিক্ত সংযোজন সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উল্লেখ্যত দিক থেকে এবং দৃশ্যত দিক থেকে তা [অপর বস্তুর] বিনিময় হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া [এজন্যই দায়গ্রহণকারী ব্যক্তির 'মূল্য থেকে'



কথাটি উল্লেখ করতে হবে এবং প্রথম মূল্য ও সংযোজিত মূল্য উভয়টি বিক্রীত-বস্তুর বিনিময় বলে গণ্য করতে হবে। সুতরাং যখন দায়গ্রহণকারী ব্যক্তি 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ করবে তখন শর্ত পাওয়া যাবে; অতএব তা সঠিক হবে। আর যখন 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ না করবে, তখন শর্ত পাওয়া যাবে না। অতএব তা সঠিকও হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ قَالَ لَغَيْرِهِ بَيْعُ عَبْدِكَ الخ : মাসআলাটির সুরত হলো, কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি গোলাম ক্রয় করতে চাচ্ছে এবং সে চাচ্ছে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করতে, কিন্তু বিক্রেতা পনের শত দিরহামের কমে দিতে সম্মত হচ্ছে না, এমতাবস্থায় তৃতীয় এক ব্যক্তি বিক্রেতাকে বলল, তুমি তার নিকট এক হাজার দিরহামে গোলামটি এ শর্তে বিক্রয় কর যে, 'আমি এ এক হাজার ছাড়াও মূল্য থেকে আরো পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার হলাম' অতঃপর বিক্রেতা বিক্রয় করে দিল। এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, বিক্রয়চুক্তিটি জায়েজ হবে এবং তৃতীয় ব্যক্তির শর্তও সহীহ হবে। কাজেই বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে আর তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে পাঁচশত দিরহাম আদায় করবে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় ব্যক্তিটি যদি উক্ত কথা বলার সময় 'মূল্য থেকে' কথাটি না বলে; বরং শুধু বলে যে, তুমি তার নিকট এক হাজার দিরহামে গোলামটি এ শর্তে বিক্রয় কর যে, 'আমি পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার' অতঃপর বিক্রেতা বিক্রয় করে দেয় তাহলে বিধান হলো, কেবল এক হাজার দিরহামে গোলামটির বিক্রয় কার্যকর হবে। তৃতীয় ব্যক্তিটির জিম্মায় কোনো দিরহাম সাব্যস্ত হবে না। কাজেই বিক্রেতা কেবল ক্রেতার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে কোনো কিছু আদায় করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ أَنَّ الزَّيَادَةَ عَلَى الثَّمَنِ وَالْثَمَنِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটির ভিত্তি হচ্ছে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি। বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর ক্রেতা ইচ্ছা করলে নির্ধারিত মূল্যের সাথে আরো কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে দিতে পারে, তদ্রূপ বিক্রেতা ইচ্ছা করলে বিক্রয়-দ্রব্য বৃদ্ধি করে দিতে পারে। তবে আমাদের মতে উভয় ক্ষেত্রে বর্ধিত মূল্য নির্ধারিত মূল্যের সাথে যুক্ত হয়ে উভয়টি প্রকৃত মূল্য হিসেবে গণ্য হবে, এরূপভাবে বর্ধিত বিক্রয়-দ্রব্যমূল্য বিক্রীত-দ্রব্যের সাথে যুক্ত হয়ে উভয়টি প্রকৃত বিক্রীত-দ্রব্য বলে গণ্য হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে বর্ধিত মূল্য পূর্বের মূল্যের সাথে যুক্ত হবে না তদ্রূপ বর্ধিত বিক্রয়-দ্রব্যমূল্য বিক্রীত-দ্রব্যের সাথে যুক্ত হবে না; বরং উভয়টি স্বতন্ত্র দান বা 'হিবা' হিসেবে গণ্য হবে। [এ মূলনীতিটি মতবিরোধ ও দলিলসহ মূল গ্রন্থের التَّوْبَةِ وَالْأَوْفَاءِ -এর শেষে ৫৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।]

قَوْلُهُ لَأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ وَصْفِ مَسْرُوعِ الخ : মতবিরোধপূর্ণ উল্লিখিত মূলনীতিটির ক্ষেত্রে আমাদের দলিল হচ্ছে, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্য কিংবা বিক্রয়-দ্রব্য বৃদ্ধি করে দেওয়ার কারণে কেবল চুক্তির শরীয়ত অনুমোদিত একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে অপর একটি শরীয়ত অনুমোদিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অর্থাৎ বিক্রয় তিনটি গুণের যে কোনো একটি গুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। গুণ তিনটি হলো : বিক্রয় লাভজনক হওয়া, সমান সমান হওয়া এবং লোকসান হওয়া। আর এ তিন প্রকার বিক্রয়ই শরীয়ত অনুমোদিত। আর চুক্তিকারীদ্বয়ের যখন তাদের চুক্তি সম্পাদন করার পর তা প্রত্যাহার (إِلْأَالَةً) করার অধিকার রয়েছে তখন চুক্তিকে তার এক গুণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন করার অধিকার থাকা অধিক যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং তাদের বর্ধিত মূল্য বা বর্ধিত বিক্রয়-দ্রব্য মূল্যের সাথে যুক্ত হয়ে চুক্তির গুণগুণ পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর:

قَوْلُهُ ثُمَّ قَدْ لَا يَنْفَعُكَ الْكَفَرُ بِهَا فَنُفِثَ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো- আমাদের আলোচ্য মাসআলায় তৃতীয় ব্যক্তির পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার হওয়া জায়েজ না হওয়ার কথা। কেননা, কোনো বস্তু যদি এ শর্তে ক্রয় করে যে, 'এর মূল্য অমুক তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় থাকবে' কিংবা 'এর আংশিক মূল্য অমুক [তৃতীয় কোনো] ব্যক্তির জিম্মায় থাকবে' তাহলে তা জায়েজ হয় না। অথচ আলোচ্য সুরতে তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় আংশিক মূল্য থাকার শর্তেই ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, কাজেই তা জায়েজ না হওয়ার কথা।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে- আলোচ্য মাসআলায় তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত দিরহাম প্রদানের বিষয়টি بَذْلُ الْخَلْع অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদানের শর্তে স্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় টাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামঞ্জস্য হচ্ছে এদিক থেকে যে, 'বদলুল খুলা'-এর বিনিময়ে যেদ্রুপ স্ত্রী কোনো বস্তু লাভ করে না; বরং শুধুমাত্র তার উপর থেকে স্বামীর কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যায়, তদ্রূপ বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর ক্রেতা যদি মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে বর্ধিত মূল্যের বিপরীতে সাধারণত ক্রয়কর্তৃ দ্রব্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হয় না। কেননা, যদি প্রথম নির্ধারিত মূল্য দ্রব্যটির বাজারদরের সমান বা বেশি হয়ে থাকে, তাহলে বর্ধিত মূল্যের বিপরীতে ক্রেতার কোনো কিছুই লাভ হচ্ছে না। কাজেই এটি 'বদলুল খুলা'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো। আর 'বদলুল খুলা' তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জিম্মায় থাকার শর্তে 'খুলা'-এর চুক্তি করা জায়েজ। কাজেই 'বদলুল খুলা'-এর উপর কিয়াস করে এ ক্ষেত্রেও তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় মূল্য থাকার শর্তে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আদ্যামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তম জবাব হলো, বর্ধিত মূল্য সাব্যস্ত হয় মূল মূল্যের অনুগামী (تَابِع) হিসেবে, আর যা অনুগামী হিসেবে সাব্যস্ত হয় তা তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় থাকার শর্তে বিক্রয় জায়েজ হয়। পক্ষান্তরে প্রথম মূল্য আসল ও মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়, কাজেই তা তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় থাকার শর্তে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

—ফাতহুল কাদীরি, খণ্ড- পৃ. ১১৮।

قَوْلُهُ لَكِنْ مِنْ شَرْطِهَا الْمَقَابَلَةُ تَسْبِيَةً وَصُورَةَ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উপরে বর্ণিত দুটি মাসআলার মাঝে পার্থক্য করছেন। প্রথম মাসআলায় তৃতীয় ব্যক্তি 'মূল্য থেকে পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার' বলার কারণে তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়েছে। ফলে বিক্রেতা তার কাছ থেকে তা আদায় করার অধিকার লাভ করেছে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় 'মূল্য থেকে' কথাটি না বলার কারণে তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়নি ফলে বিক্রেতা তার কাছ থেকে পাঁচশত দিরহাম আদায় করার অধিকার লাভ করেনি। এ পার্থক্যের কারণ হলো, আমরা যে বলেছি 'বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর মূল্য বৃদ্ধি করে দেওয়া জায়েজ'-এর জন্য শর্ত হলো, বর্ধিত মূল্যটি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এবং বাহ্যত দিক থেকে বিক্রীত-দ্রব্যের বিনিময়ে হতে হবে। উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিনিময়ে হওয়ার অর্থ হলো- এ কথা উল্লেখ করতে হবে যে, এ টাকা বা দিরহাম উক্ত বস্তুর মূল্য হিসেবে প্রদান করছি। আর বাহ্যত দিক থেকে বিনিময়ে হওয়ার অর্থ হলো উক্ত বর্ধিত মূল্য যদিও প্রকৃতপক্ষে বিক্রীত-বস্তুর বিনিময়ে হচ্ছে না। কেননা, বর্ধিত মূল্য ছাড়াই বিক্রীত-বস্তুটি ক্রেতা লাভ করেছে, কিন্তু দৃশ্যত তা উক্ত বিক্রীত-বস্তুর বিনিময় হিসেবেই প্রদান করতে হবে।

সুতরাং আমাদের আলোচ্য প্রথম মাসআলায় যখন তৃতীয় ব্যক্তি 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ করেছে তখন উক্ত শর্ত পূরণ হয়েছে। কাজেই তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় যেহেতু সে 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ করেনি সেহেতু উক্ত শর্ত পূরণ হয়নি। কাজেই তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়নি; বরং তার কথাটি এরূপ হয়েছে যে, তুমি যদি এ বস্তুটি অমুকের নিকট বিক্রয় কর তাহলে আমি তোমাকে এত টাকা দিব। আর এটা হচ্ছে ঘুষ (رِشْوَةٌ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর ঘুষ সর্বাবস্থায়ই হারাম। সুতরাং তা কার্যকর হবে না।

قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَفِيضْهَا حَتَّى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَلَا تَكُنْ جَائِزٌ لَوْجُودِ سَبَبِ الْوَلَايَةِ، وَهُوَ الْمِلْكُ فِي الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَهَذَا قَبْضٌ لِأَنَّ وَطِئَ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيْطٍ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ فِعْلُهُ كِفْعَلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَطْنِهَا فَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَصْنُرَ قَابِضًا، لِأَنَّهُ تَغْيِيْبٌ حَكْمِيٌّ فَيُغْتَبَرُ بِالتَّغْيِيْبِ الْحَقِيقِيِّ، وَجْهُ الْإِسْتِخْسَانِ أَنَّ فِي الْحَقِيقِيِّ اسْتِثْلَاءً عَلَى الْمَحَلِّ، وَبِهِ يَصْنُرُ قَابِضًا، وَلَا كَذَلِكَ الْحَكْمِيُّ فَافْتَرَقَا -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে এবং তাকে হস্তগত করার পূর্বে অন্য কারো সাথে বিবাহ দেয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তাহলে বিবাহ বৈধ হবে। কেননা, [ক্রেতার পক্ষ] বিবাহ দানের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ বিদ্যমান রয়েছে, আর তা হলো 'দাসসত্তার পূর্ণ মালিকানা'। আর স্বামীর উপর মোহর সাব্যস্ত হবে। আর এ বিবাহ দান ও স্বামীর সহবাসই ক্রেতার দাসীটি হস্তগতকরণ বলে গণ্য হবে। কেননা, তার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমেই স্বামীর সহবাস হয়েছে; সুতরাং স্বামীর 'কর্ম' তারই 'কর্মের' ন্যায় বলে বিবেচিত হবে। আর যদি স্বামী সহবাস না করে থাকে, তাহলে শুধু বিবাহ দান হস্তগতকরণ বলে গণ্য হবে না। [বাহ্যিক] ক্রিয়াসের দাবি অনুসারে [এ ক্ষেত্রেও] হস্তগতকারী হয়েছে বলে গণ্য হওয়ার কথা। কেননা, শুধু বিবাহ দানও বিধানগতভাবে ক্রটিযুক্তকরণ বলে গণ্য হয়, কাজেই প্রকৃত ক্রটিযুক্তকরণের [অর্থাৎ সহবাসের সুরতের] উপরই এর ক্রিয়াস হওয়ার কথা। কিন্তু সূক্ষ্ম ক্রিয়াসের দিক হলো, প্রকৃত ক্রটিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে পাত্রের উপর [তথা দাসীটির উপর ক্রেতার পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য] আধিপত্য অর্জন করানো হয়, আর সে কারণেই ক্রেতা হস্তগতকারী বলে গণ্য হয়। কিন্তু শুধু বিধানগত ক্রটিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে [আধিপত্য] অর্জিত হয় না। সুতরাং দুটির মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : قَوْلُهُ وَمِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَفِيضْهَا : মাসআলা : কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে এবং দাসীটি হস্তগত করার পূর্বেই তাকে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয় আর বিবাহের পর স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তাহলে বিধান হলো, উক্ত বিবাহ জায়েজ হবে, স্বামীর উপর মোহর সাব্যস্ত হবে এবং ক্রেতা দাসীটিকে হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং স্বামীর সহবাসের পর যদি দাসীটি মারা যায়, তাহলে ক্রেতা হস্তগত করার পর মারা গেছে বলে সাব্যস্ত হবে, কাজেই তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। [উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে উক্ত সূরতে স্বামীর সহবাসের কারণে ক্রেতা হস্তগত করেছে বলে সাব্যস্ত হবে না। কাজেই দাসীটি মারা গেলে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে না।]

আর যদি ক্রেতা দাসীটিকে বিবাহ দেওয়ার পর স্বামী তার সাথে সহবাস না করে থাকে, তাহলে শুধু বিবাহ দেওয়ার কারণে সে দাসীকে হস্তগত করেছে বলে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং যদি স্বামীর সহবাসের পূর্বে দাসীটি মারা যায়, তাহলে হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রেতার হাতে মারা গেছে বলে গণ্য হবে। কাজেই ক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে না।

عَنْ قَوْلِهِ لَوْ وَفِدَ سَبَبُ الْوَلَايَةِ، وَهُوَ السَّلَاحُ الْغَنِي: এশান থেকে মুসল্লি (র.) উক্ত বিধানগুলোর দলিল বর্ণনা করছেন। প্রথম বিধান তথা ক্রেতার দাসীটিকে হস্তগত করার পূর্বে বিবাহ প্রদান জায়েজ হবে এর দলিল হলো, বিবাহ প্রদানের কর্তৃত্ব অর্জন হয় দাসীর দাসসত্তার পূর্ণ মালিকানা লাভ করার মাধ্যমে। আর এখানে ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা বিদ্যমান। কেননা, ক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পরই ক্রয়কৃত বস্তুতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং যখন ক্রেতার দাসীর উপর বিবাহ দানের কর্তৃত্ব অর্জিত হয়েছে তখন তার বিবাহ দানও জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আব্বাসী ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, দাসীকে হস্তগত করার পূর্বে বিবাহ দেওয়া জায়েজ, কিন্তু হস্তগত করার পূর্বে তাকে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। এর কারণ হলো, হস্তগত করার পূর্বে যদি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে সে ক্ষেত্রে যদি প্রথম ক্রেতা হস্তগত করার পূর্বে দাসীটি মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তিটি রহিত হয়ে যাবে। আর যে ক্ষেত্রে এক্ষণ সম্ভাবনা থাকে যে, চুক্তিটি আদৌ কার্যকর হবে না, সে ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হয় না। পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে হস্তগত করার পূর্বে যদি দাসীটি মারা যায়, তাহলে বিবাহ রহিত হবে না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, বিক্রীত-বস্তুর উপর বিক্রেতার হস্তান্তরের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকতে হবে, অথচ এ ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্বে অর্জিত হয় না। পক্ষান্তরে বিবাহের জন্য তা শর্ত নয়। কাজেই হস্তান্তরের ক্ষমতা না থাকলেও বিবাহ দেওয়া জায়েজ হবে।

عَنْ قَوْلِهِ وَهَذَا قَبْضٌ لَأَنْ رَفَى الرَّجُلُ حَصَلَ يَسْلُطُ مِنْ جِهَتِهِ الْغَنِي: দ্বিতীয় বিধান তথা 'বিবাহ দানের পর স্বামী দাসীটির সাথে সহবাস করলে ক্রেতা দাসীটি হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে'-এর দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে স্বামীর সহবাস হয়েছে ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের কারণে। কাজেই এ ক্ষেত্রে স্বামীর সহবাস [বিধানের দিক থেকে] ক্রেতার সহবাসের পর্যায় গণ্য হবে। আর ক্রেতা যদি দাসীটির সাথে সহবাস করত, তাহলে তা তার পক্ষ হতে হস্তগতকরণ বলে গণ্য হতো। সুতরাং স্বামীর সহবাসও ক্রেতার হস্তগতকরণ বলে গণ্য হবে।

عَنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهُ فَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَلِأَيَّاسٍ أَنْ يُصَوِّرَ نَابِئًا الْغَنِي: তৃতীয় বিধান তথা 'স্বামী যদি সহবাস না করে তাহলে শুধু বিবাহ দানের কারণে ক্রেতা হস্তগতকারী হবে না'-এর দলিল। মুসল্লি (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবি হচ্ছে ক্রেতা শুধু বিবাহ দানের কারণেই হস্তগতকারী হওয়া, কিন্তু 'ইসতিহাসান' (إِسْتِحْسَانٌ) বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে বিধান হচ্ছে হস্তগতকারী না হওয়া। কিয়াসের দাবি ছিল হস্তগতকারী হওয়া তার কারণ হলো, দাসীর ক্ষেত্রে বিবাহিত হওয়া দাসী ক্রটিযুক্ত হওয়া বলে গণ্য হয়। [এ কারণেই কেউ যদি দাসী ক্রয় করার পর জানতে পারে যে দাসীটির স্বামী আছে যদিও তার সাথে সহবাস হয়নি, তাহলে ক্রেতা দাসীকে ক্রটিযুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারে।] আর ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত বস্তুর মাঝে ক্রটি সৃষ্টি করে, তাহলে সে উক্ত বস্তুটির হস্তগতকারী হয়ে যায়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা বিবাহ দানের মাধ্যমে দাসীকে ক্রটিযুক্ত করার কারণে দাসীকে সে হস্তগত করেছে বলে গণ্য হওয়াই ছিল কিয়াসের দাবি। উল্লেখ্য, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত অনুসারে আলোচ্য মাসআলায় বিধানও তাই।

আর 'ইসতিহাসান' (إِسْتِحْسَانٌ) বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে ক্রেতা হস্তগতকারী না হওয়ার কারণ হলো, বিবাহ হচ্ছে দাসীর প্রতি একটি বিধানগত অধিকার চর্চা এবং এর মাধ্যমে তার মাঝে বিধানগত ক্রটি সৃষ্টি হয়েছে। দাসীর শরীয়ে দৃশ্যত (مَبْنِي) কোনো কার্য সংঘটিত হয়নি। আর বিধানগত ক্রটির অর্থ এর কারণে ক্রেতাদের আগ্রহ কমে যাওয়া, যেমন যদি দাসীর উপর অন্যদের ঋণ পাওনা আছে বলে স্বীকার করা হয় তাহলে দাসীকে ক্রেতাদের ক্রয় করার আগ্রহ কমে যায়। আর এক্ষণ ক্রটিযুক্ত করার কারণে হস্তগতকারী বলে সাব্যস্ত হয় না। যেমন ক্রেতা যদি দাসীকে ক্রয় করার পর হস্তগত না করে তার উপর অন্যদের ঋণ পাওনা থাকার কথা স্বীকার করে, তাহলে সে হস্তগতকারী হয়েছে বলে গণ্য হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রেও শুধু বিবাহের কারণে তার হস্তগতকারী হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

পক্ষান্তরে দৃশ্যত কোনো সংঘটিত করার মাধ্যমে ক্রটিযুক্ত করার বিষয় ভিন্ন। যেমন- দাসীর হাত কেটে ফেলল, কিংবা তার চক্ষু ফুঁড়ে দিল। এ ক্ষেত্রে সে এ কারণে হস্তগতকারী সাব্যস্ত হয়ে যে, এর মাধ্যমে সে দাসীর শরীয়ে কার্যত অধিকার চর্চা করেছে। আর এটাই হচ্ছে হস্তগতকরণ। সুতরাং বিধানগত ক্রটিযুক্ত করা ও দৃশ্যত ক্রটিযুক্ত করা এ উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

قَالَ : وَمِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَعَابَ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَأَقَامَ الْبَائِعُ النَّيْسَةَ أَنَّهُ بَاعَهُ  
إِيَّاهُ فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً لَمْ يَبْعَ فِي دَيْنِ الْبَائِعِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إِنْصَالُ الْبَائِعِ  
إِلَى حَقِّهِ بِدُونِ الْبَيْعِ، وَفِيهِ إِنْطِلَاقُ حَقِّ الْمُشْتَرَى، وَإِنْ لَمْ يَدْرَ أَيْنَ هُوَ يَبْعُ الْعَبْدَ  
وَأَوْفَى الثَّمَنَ، لِأَنَّ مَلِكَ الْمُشْتَرَى ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ، فَيَظْهَرُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقْرَبَهُ  
مَشْغُولًا بِحَقِّهِ، وَإِذَا تَعَدَّرَ اسْتِيفَائُهُ مِنَ الْمُشْتَرَى يَبِيعُهُ الْقَاضِي فِيهِ كَالرَّاهِنِ إِذَا  
مَاتَ، وَالْمُشْتَرَى إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا وَالْمَبِيعُ لَمْ يُقْبَضْ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ  
حَقَّهُ لَمْ يَبْقَ مُتَعَلِّقًا بِهِ، ثُمَّ إِنْ فَضَّلَ شَيْءٌ يُمْسِكُ لِلْمُشْتَرَى، لِأَنَّهُ بَدَلَ حَقِّهِ وَإِنْ  
نَقَصَ يَتْبَعُ هُوَ أَيْضًا -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি গোলাম ক্রয় করে এবং [মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই] ক্রেতা  
গায়েব হয়ে যায় অথচ গোলামটি বিক্রেতার হাতেই রয়েছে, আর বিক্রেতা এ মর্মে [আদালতে] সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ  
করে যে, সে গোলামটি গায়েব ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে যদি ক্রেতার অনুপস্থিতির স্থান জানা  
থাকে তবে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধের জন্য গোলামটি বিক্রয় করা হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে গোলামটি বিক্রয় না  
করেও বিক্রেতাকে তার প্রাপ্য হক পর্যন্ত উপনীত করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে বিক্রয় করা হলে ক্রেতার হক নষ্ট করা  
হবে। আর যদি ক্রেতা কোথায় রয়েছে তা জানা না থাকে, তাহলে গোলামটি বিক্রয় করে [বিক্রেতাকে] মূল্য পরিশোধ  
করে দেওয়া হবে। কেননা, ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে বিক্রেতার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। সুতরাং সে ক্রেতার  
মালিকানা যেভাবে নিজের প্রাপ্য হকের সাথে আবদ্ধরূপে স্বীকার করছে সেভাবেই তা সাব্যস্ত হবে। আর যেহেতু  
ক্রেতার নিকট হতে মূল্য উসূল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে সেহেতু বিচারক তা পরিশোধ করার জন্য গোলামটি বিক্রয়  
করে দিবে। যেমন- বন্ধকদাতা [বন্ধকি বস্তু ফেরত গ্রহণের পূর্বে] মারা গেলে [বিচারক বন্ধকি বস্তু বিক্রয় করে বন্ধক  
গ্রহণকারীর প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করে দেয়]। আর [অনুরূপভাবে] ক্রেতা যদি বিক্রীত-বস্তু হস্তগত করার পূর্বে দেওলিয়া  
হয়ে মৃত্যুবরণ করে [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান]। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি গোলামটি হস্তগত করার পরে গায়েব  
হয়ে যায়, তাহলে বিধান ভিন্ন [অর্থাৎ ক্রেতার দাবির কারণে গোলাম বিক্রয় করা হবে না]। কেননা, বিক্রেতার প্রাপ্য  
হক বিক্রীত গোলামের সাথে সংযুক্ত নেই [বরং তা ক্রেতার জিম্মায় ঋণ রূপে সাব্যস্ত হয়ে রয়েছে]। আর [পূর্বের  
সূরতে] যদি [গোলামের মূল্য দ্বারা বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করার পর] কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা  
ক্রেতার জন্য রেখে দিতে হবে। কেননা, এটা তারই প্রাপ্যের বিনিময়। আর যদি [গোলামের মূল্য দ্বারা বিক্রেতার  
পাওনা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে] কিছু টাকার ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে তাও ক্রেতার কাছ থেকেই উসূল করা হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَغَابَ الْخ: হাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করে, অন্তঃপর তার মূল্য পরিশোধ না করে এবং তা হস্তগত না করে অন্য কোথাও চলে যায় তাহলে বিধান হলো, যদি বিক্রেতা বিচারকের নিকট প্রমাণ পেশ করে যে, সে গোলামটিকে উক্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করেছে এবং সে মূল্য পরিশোধ করেনি, তাহলে ক্রেতার অবস্থানের ঠিকানা জানা থাকলে বিচারক বিক্রেতার পাওনা পরিশোধের জন্য গোলামকে বিক্রয় করবে না। আর যদি ক্রেতা কোথায় অবস্থান করছে তা জানা না থাকে, তাহলে বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করে দিবে। বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করার পর যদি টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বিচারক তা ক্রেতার জন্য সংরক্ষণ করে রেখে দিবেন। আর যদি গোলামটি বিক্রয়ের টাকা দ্বারা বিক্রেতার পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হয়, তাহলে অবশিষ্ট পাওনা ক্রেতার জিম্মায় বহাল থাকবে বিক্রেতা তা উসুলের জন্য ক্রেতার অপেক্ষায় থাকবে।

আর যদি এমন হয় যে, ক্রেতা গোলামটি হস্তগত করার পর মূল্য পরিশোধ না করে কোথাও চলে গিয়েছে, তাহলে বিচারক ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে না এবং সে ভিত্তিতে গোলামটি বিক্রয়ও করবে না। বিক্রেতার পাওনা ক্রেতার উপর ঋণ হয়েই থাকবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ بَيْعَكَ إِبْصَالَ الْبَائِعِ إِلَى حَقِّهِ الْخ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত হাসআলায় বিধানগুলোর দলিল বর্ণনা করছেন : 'ক্রেতার অবস্থানস্থল জানা থাকলে বিচারক যে গোলামটি বিক্রয় করবে না'-এর দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধের জন্য গোলামটি বিক্রয় করা অপরিহার্য হয়ে পড়েনি। কেননা, যখন ক্রেতার অবস্থানস্থল জানা আছে তখন তার কাছ থেকে বিক্রেতার পাওনা উসুল করা অসম্ভব হয়ে পড়েনি। কাজেই গোলামটি বিক্রয় করা ছাড়াই বিক্রেতার পাওনা উসুল করা সম্ভব। পক্ষান্তরে গোলামটি বিক্রয় করা হলে অনিবার্য কারণ ছাড়াই ক্রেতার হক বিনষ্ট করা হবে। কেননা, ক্রয়কৃত গোলামটির মাঝে তার মালিকানা ও অধিকার সাব্যস্ত হয়ে আছে। কাজেই কোনো অনিবার্য কারণ ছাড়া তা বিনষ্ট করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ آيَنَ هُوَ بَيْعُ الْعَبْدِ الْخ: 'ক্রেতা কোথায় আছে তা জানা না থাকলে বিচারক যে গোলামটি বিক্রয় করে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করবে' তার দলিল হলো, গোলামটির উপর ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে কেবল বিক্রেতার স্বীকারোক্তি (إقرار)-এর ভিত্তিতে। কাজেই ক্রেতার মালিকানা ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত হবে যেভাবে সে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আর বিক্রেতার স্বীকারোক্তি ছিল এরূপ যে, ক্রেতা গোলামটি হস্তগত করেনি এবং তার মূল্য পরিশোধ করেনি, কাজেই গোলামটির সাথে তার পাওনা সম্পৃক্ত রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা কোথায় আছে তা জানা না থাকার কারণে বিক্রেতার পাওনা উসুল করা যেহেতু অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সেহেতু বিচারক তার পাওনা উসুল করানোর জন্য গোলামটি বিক্রয় করে দিবে।

মুসান্নিফ(র.) এ হাসআলার দুটি নজির উল্লেখ করেছেন। প্রথম নজির হলো, বন্ধকদাতা যদি তার বন্ধকি বস্তু বন্ধকগ্রহণকারীর নিকট আবদ্ধ থাকাবস্থায় মারা যায়, তাহলে বন্ধকগ্রহণকারী বন্ধকি বস্তুটির উপর অন্যান্য পাওনাদারদের চেয়ে অধিক হকদার হয় এবং বস্তুটি বিক্রয় করে তার পাওনা উসুল করে নিতে পারে। তদ্রূপ আলোচ্য হাসআলায়ও গোলামটি বিক্রেতার হাতে বন্ধকি বস্তুর ন্যায়। কেননা, সে তার মূল্য পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত গোলামটি আটক রাখতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সে অধিক হকদার এবং তার পাওনা উসুলের জন্য বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে দিবে।

দ্বিতীয় নজির হলো, ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে এবং ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে বিক্রেতাই সেই বস্তুটির উপর অধিক হকদার হয় এবং বস্তুটি বিক্রয় করে তার পাওনা উসুল করতে পারে। সুতরাং আলোচ্য সূরতেও ক্রেতার অবস্থানস্থল অজ্ঞাত থাকার কারণে একই বিধান হবে।

উল্লেখ্য, উপরে দলিলটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, গোলামটির উপর ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে কেবল বিক্রেতার স্বীকারোক্তি (إقرار)-এর ভিত্তিতে। অর্থাৎ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, অথচ হাসআলার সূরত বর্ণনায় বলা হয়েছিল

যে, বিক্রেতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রেতা গোলামটি ক্রয় করেছে এবং মূল্য পরিশোধ ও হস্তগত করার পূর্বে সে কোথাও চলে গিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গিয়েছে যে, বিচারক বিক্রেতার কথা গ্রহণ করেছে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। তাহলে দলিলের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা না বলে স্বীকারোক্তির কথা কেন বলা হলো? আদ্যামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এর কারণ হলো, মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, এ ক্ষেত্রে বিচারক যে গোলামটি বিক্রয় করবে তা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় নয়। কেননা, কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় তার উপর কোনো ঋণ সাব্যস্ত করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় না, বরং তার উপস্থিতি আবশ্যিক হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ কেবল স্বীকারোক্তির পর্যায়। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা তার এ জন্য আবশ্যিক হয়েছে যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া বিচারক তার কথায় কর্ণপাত করবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ النَّبْضِ. لِأَنَّ حَقَّ الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি গোলামটি হস্তগত করার পর মূল্য পরিশোধ না করে কোথাও চলে যায় এবং তার অবস্থানস্থল জানা না থাকে, তাহলে বিক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলেও বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করবে না। এর কারণ হলো, ক্রেতা তার ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পর বিক্রেতার পাওনা কেবল ক্রেতার জিম্মায় ঋণ হয়ে থাকে; তা আর বিক্রীত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে না। আর ক্রেতা অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার উপর ঋণ সাব্যস্ত হবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে বিচারক বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে না এবং গোলামটি বিক্রয় করে তার পাওনা পরিশোধ করবে না।

ثُمَّ إِنْ تَصَلَ شَيْءٌ بِمَسْكٍ لِنَمْتِئِرِي الْخ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে সুরতের বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করবে সে সুরতে যদি তার পাওনা পরিশোধ করার পর টাকা উদ্ভূত থাকে, তাহলে তা ক্রেতার জন্য রেখে দিবে। ক্রেতা আসলে তা তাকে হস্তান্তর করে দিবে। উদারহণস্বরূপ বিক্রেতার পাওনা ছিল আট শত টাকা আর বিচারক গোলামটি বিক্রয় করল এক হাজার টাকায়, তাহলে বিক্রেতাকে আট শত টাকা দিয়ে অবশিষ্ট দু-শত টাকা ক্রেতার জন্য রেখে দিবে। কেননা, এটা ক্রেতারই প্রাপ্য।

আর যদি বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা বিক্রেতার পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হয়, তাহলে অবশিষ্ট পাওনা ক্রেতার উপরই ঋণ হয়ে থাকবে। ক্রেতা আসলে তার কাছ থেকে তা উসূল করে নিবে।

উল্লেখ্য, এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা হলো, বিচারক ক্রেতার পক্ষ হয়ে গোলামটি বিক্রয় করছে অথচ গোলামটি ক্রেতা হস্তগত করেনি। আর বিধান হলো, স্থানান্তরযোগ্য কিছু ক্রয় করলে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। তাহলে বিচারকের বিক্রয় কীভাবে জায়েজ হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আদ্যামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এ ক্ষেত্রে বিচারক একজন লোক নির্ধারণ করে দিবে সে ক্রেতার পক্ষে প্রথমে গোলামটি হস্তগত করবে, তারপর গোলামটি বিক্রয় করা হবে।

আর কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এ ক্ষেত্রে লোক নির্ধারণ করে হস্তগত করানো আবশ্যিক হবে না। কেননা, এখানে বিক্রয় মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিক্রেতার প্রাপ্য হক পূরণ করা। আর সেই হক পূরণার্থে অনুগামী হিসেবে (ضَنْئًا) বিক্রয় বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর যে কার্য অনুগামী হিসেবে (ضَنْئًا) বাস্তবায়িত হয় তার জন্য সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যিক হয় না, যা মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বাস্তবায়িত হওয়ার সময় আবশ্যিক হয়।

فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنْشَيْنِ فَعَابَ أَحَدُهُمَا فَلِلْحَاضِرِ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمْنَ كُلَّهُ وَيَقْبِضَهُ، وَإِذَا حَضَرَ الْآخَرَ لَمْ يَأْخُذْ نَصِيبَهُ، حَتَّى يَنْقُذَ شَرِيكَهُ الثَّمْنَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) إِذَا دَفَعَ الْحَاضِرُ الثَّمْنَ كُلَّهُ لَمْ يَقْبِضْ إِلَّا نَصِيبَهُ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا بِمَا آدَى عَنْ صَاحِبِهِ، لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ، فَلَا يَقْبِضُهُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مُضْطَرٌّ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُ الْإِنْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ صَفَقَةً وَاحِدَةً، وَلَهُ حَقُّ الْحَبْسِ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ، وَالْمُضْطَرُّ يَرْجِعُ كَمُعِيرِ الرِّهْنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْحَبْسُ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفَى حَقَّهُ، كَالْوَكِيلِ بِالشَّرَاءِ إِذَا قَضَى الثَّمْنَ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ -

অনুবাদ : আর যদি ক্রেতা দুজন হয় আর তাদের একজন গায়েব হয়ে যায়, তাহলে উপস্থিত জন পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে গোলামটি হস্তগত করার অধিকার লাভ করবে। পরে যখন অপরজন উপস্থিত হবে তখন আগতজন তার অংশীদারকে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তার অংশ নিতে পারবে না। এটি হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, উপস্থিত জন যদি পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে তবু সে শুধু তারই অংশ হস্তগত করতে পারবে। আর অপরজনের পক্ষ থেকে যা সে পরিশোধ করেছে সে ক্ষেত্রে সে ঐচ্ছিক পরিশোধকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, সে অন্যের ঋণ তার অনুমতি ছাড়া পরিশোধ করেছে, কাজেই তা ফেরত দাবি করতে পারবে না। আর সে অপর ব্যক্তির অংশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি বলে গণ্য, সুতরাং তার অংশ সে হস্তগত করতে পারবে না। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, উপস্থিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে অনন্যোপায়। কেননা, সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত তার অংশ দ্বারা তার উপকার লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, বিক্রয়চুক্তিটি যেহেতু অভিন্ন সেহেতু মূল্যের সামান্য অংশও অবশিষ্ট থাকলে ক্রেতা বিক্রীত-বস্তুটি আটক রাখতে পারবে। আর অনন্যোপায় ব্যক্তি [তার আদায়কৃত ঋণের টাকা] ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ করে। যেমন- বন্ধক রাখার জন্য কোনো বস্তু ধার হিসেবে প্রদানকারী [অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা দেওলিয়া হয়ে গেলে ধার দাতা নিজে বন্ধক দাতার ঋণ আদায় করে বস্তুটি ছাড়িয়ে আনলে সে টাকা ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ করে]। আর যখন উপস্থিত ব্যক্তির অপর ব্যক্তির নিকট হতে [পরিশোধকৃত অর্থ] ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ হলো, তখন সে তার পাওনা উসুল হওয়া পর্যন্ত হস্তগতকৃত গোলামটি আটক রাখার অধিকার লাভ করবে। যেমন- ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যদি তার নিজের সম্পদ থেকে মূল্য পরিশোধ করে।



### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُتَخَيَّرُ ابْتَيْنَ فَعَلَّ أَحَدَهُمَا الخ : মাসআলা : পূর্বের মাসআলাটি ছিল যদি ক্রেতা একজন হয় তার বিধান সম্পর্কিত। আর আলোচ্য মাসআলাটি হলো, যদি ক্রেতা একজন না হয়ে দুজন হয়। অর্থাৎ দুজনে মিলে একটি গোলাম ক্রয় করে। এবং মূল্য পরিশোধ ও হস্তগত করার পূর্বে তাদের একজন কোথাও চলে যায়, তাহলে তার বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে তাঁরা সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, ক্রেতাঘরের যেজন উপস্থিত রয়েছে সে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তার অংশ হস্তগত করার অধিকার লাভ করবে না। আর তিনটি স্থলে তাঁদের মতবিরোধ—

১. যদি উপস্থিতজন অনুপস্থিতজনের অংশ পরিশোধ করে দিতে চায়, তাহলে বিক্রেতাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে কি না? ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে না।
২. যদি বিক্রেতা উপস্থিতজনের নিকট হতে অনুপস্থিতজনের অংশের টাকা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে অনুপস্থিতজনের অংশও উপস্থিতজনের নিকট হস্তান্তর করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে কিনা? হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে না; বরং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিতজন কেবল তার অংশই হস্তগত করতে পারবে। পালাবদল প্রক্রিয়ায় সে তার থেকে খিদ্মত গ্রহণ করতে থাকবে।
৩. যদি উপস্থিতজন অনুপস্থিতজনের অংশ পরিশোধ করে দেয় তাহলে সে অনুপস্থিতজন আসলে তার কাছ থেকে তার পরিশোধকৃত টাকা আদায় করার অধিকার পাবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে তার পরিশোধকৃত টাকা আদায় করে নিতে পারবে এবং আদায় হওয়া পর্যন্ত অপরজনের অংশ আটক রাখতে পারবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে তার পরিশোধকৃত টাকা আদায় করার অধিকার পাবে না।

الخ : قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ (رحا) إِذَا دَعَا الْحَاضِرُ الشَّيْءَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিত ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সে শুধু তার অংশই হস্তগত করতে পারবে— অনুপস্থিতজনের অংশ হস্তগত করতে পারবে না। আর সে যা পরিশোধ করেছে সে ক্ষেত্রে সে ঐচ্ছিক পরিশোধকারী বলে বিবেচিত হবে।

الخ : قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ الخ : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির ঋণ তার নির্দেশ ছাড়া পরিশোধ করেছে। আর কেউ কারো ঋণ তার নির্দেশ ব্যতীত পরিশোধ করলে সে ঐচ্ছিক দানকারী বিবেচিত হয়; তা ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করে না। কাজেই উপস্থিত ব্যক্তি পরিশোধকৃত টাকা ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করবে না। আর যেহেতু তার ফেরত গ্রহণের অধিকার নেই সেহেতু সে অনুপস্থিতজনের অংশ হস্তগত করতে পারবে না।

কেননা, অনুপস্থিতজনের অংশের ক্ষেত্রে সে সম্পর্কহীন ব্যক্তি। আর উপস্থিত ব্যক্তি যেহেতু এ ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক দানকারী, তাই বিক্রেতাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, ঐচ্ছিক দান গ্রহণে বাধ্য করা যায় না।

الخ : قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَنَّهُ مَضْطَرٌّ فَيُؤْتَى لَهُ لَا بِسَكْنِهِ الْإِئْتِمَاعُ الخ : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, উপস্থিত ব্যক্তিকে এ ক্ষেত্রে বাধ্য ও অপারগ হয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ পরিশোধ করতে হয়েছে। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তি গোলামটির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করে তার অংশ দ্বারা উপকৃত হতে পারছে না। কারণ, গোলামটির বিক্রয়চুক্তি একটিই অর্থাৎ উভয় ক্রেতা একটি চুক্তির মাধ্যমেই গোলামটি ক্রয় করেছে। আর বিক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রীত-বস্তু আটক রাখতে পারে। কাজেই উপস্থিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত তার অংশও হস্তগত করতে পারবে না। ফলে তার অংশ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশের মূল্যও পরিশোধ করতে

হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি বাধ্য ও অপারগ হয়ে অন্য ব্যক্তির ঋণ তার নির্দেশ ব্যতীত পরিশোধ করে সে তা ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করে। যেমন- কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে একটি বস্তু এ জন্য ধার দিল যে, ধারণকারী তা অন্য কারো কাছে বন্ধক রেখে কিছু টাকা ঋণ নিবে। অতঃপর ধার গ্রহণকারী তা অন্য এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক রেখে কিছু টাকা ঋণ নিল। এরপর ধার গ্রহণকারী ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেল কিংবা নিষেজ হয়ে গেল। ফলে ধারদাতা অর্থাৎ বস্তুটির মালিক বাধ্য হয়ে ধার গ্রহণকারীর উপর বন্ধক গ্রহণকারীর যে পাওনা ছিল তা পরিশোধ করে দিয়ে তার বস্তুটি মুক্ত করে আনল। এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদিও বস্তুটির মালিক ধার গ্রহণকারীর নির্দেশ ছাড়াই তার ঋণ পরিশোধ করেছে, কিন্তু সে বাধ্য হওয়ার কারণে এ ঋণ ধার গ্রহণকারীর নিকট হতে ফেরত গ্রহণ করার অধিকার পাবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও উপস্থিত ব্যক্তি তার পরিশোধকৃত টাকা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট হতে ফেরত গ্রহণের অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْعَبْسُ الْخ : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে যখন উপস্থিত ব্যক্তি তার পরিশোধকৃত টাকা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করার অধিকার লাভ করেছে তখন সে তার প্রাপ্য সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ আটক রাখার অধিকারও লাভ করবে। যেমন- কেউ যদি কাউকে কোনো বস্তু ক্রয় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে কিন্তু ক্রয় করার টাকা অগ্রিম প্রদান না করে, অতঃপর প্রতিনিধি তার নিজের টাকা দিয়ে বস্তুটি ক্রয় করে আনে, তাহলে প্রতিনিধি উক্ত টাকা আদায় করার আগ পর্যন্ত বস্তুটি নিজের কাছে আটক রাখার অধিকার লাভ করে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায়ও উপস্থিত ব্যক্তি তার প্রাপ্য আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত গোলামটি আটক রাখতে পারবে।

قَالَ : وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَهِيَ نِصْفَانِ، لِأَنَّهُ أَضَافَ  
 الْمِثْقَالَ إِلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ، فَيَجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُ مِائَةٍ مِثْقَالٍ لَعَدِمَ  
 الْأَوَّلِيَّةَ، وَيُمَثِّلُهُ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَجِبُ مِنَ الذَّهَبِ  
 مِثْقَايِلٌ وَمِنَ الْفِضَّةِ دَرَاهِمُ وَزَنْ سَبْعَةٍ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْآلْفَ إِلَيْهِمَا فَيَنْصَرِفُ إِلَى  
 الْوِزْنِ الْمَعْهُودِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ একটি দাসী এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে স্বর্ণ ও রৌপ্য অর্ধেক অর্ধেক বলে গণ্য হবে। কেননা, সে মিছকালকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দিকে সমভাবে সম্পর্কিত করেছে। সুতরাং কোনোটির অগ্রাধিকার না থাকার কারণে প্রত্যেকটি থেকে পাঁচশত মিছকাল আবশ্যক হবে। একরূপভাবে কেউ যদি একটি দাসী স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক হাজারের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পাঁচশত মিছকাল ওয়াজিব হবে, আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে পাঁচশত দিরহাম ওয়াজিব হবে প্রতি দশ দিরহাম সাত মিছকাল ওজনের। কেননা, ক্রেতা এক হাজারকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দিকে সম্পর্কিত করেছে। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত ওজনের মূদার সাথেই তা সম্পৃক্ত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خ - مَاسْأَلَا : যদি কোনো ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করে এবং ক্রয়কালে বিক্রেতাকে এভাবে বলে যে, আমি দাসীটি এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করলাম, তাহলে বিধান হলো, ক্রেতাকে স্বর্ণ ও রৌপ্য সমানভাবে পাঁচশত মিছকাল করে দিতে হবে। অর্থাৎ পাঁচশত মিছকাল স্বর্ণ এবং পাঁচশত মিছকাল রৌপ্য তার উপর সাব্যস্ত হবে।

ع : قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِثْقَالَ إِلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ، الخ : এ মাসআলার দলিল হলো, ক্রেতা এখানে এক হাজার মিছকালকে সমানভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে সম্পর্কিত করেছে। কাজেই এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বিভক্ত হবে। কেননা, কমবেশি করার জন্য কোনোটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ বিদ্যমান নেই। কাজেই উভয়টি থেকে তাকে পাঁচশত মিছকাল করে পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইনয়ায'-এর গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য মাসআলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য গুণগত দিক থেকে কি মানের হবে অর্থাৎ তা উৎকৃষ্ট মানের হবে, নাকি নিম্নমানের হবে, নাকি মধ্যম মানের হবে তা চূড়িকালে উল্লেখ করা আবশ্যক হবে। মুসান্নিফ (র.)-এর এ বিষয়টি উল্লেখ করা উচিত ছিল। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর এবং মাবসূত গ্রন্থের বিক্রয় অধ্যায়ে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে মুসান্নিফ (র.) হয়তো এজন্য উল্লেখ করেননি যে, বিক্রয় অধ্যায়ে ওরুর মাসআলা থেকে বিষয়টি জানা হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, যদি দিরহাম বা দিনারের উল্লেখ করা হয় তখন তা কি মানের হবে তা উল্লেখ করার আবশ্যকতা থাকে না। কেননা, প্রচলনের ভিত্তিতে তখন উৎকৃষ্ট মানেরটিই সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَيَمْنِلُهُ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ الْخ : এরূপ আরেকটি মাসআলা হলো, কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে এবং ক্রয়কালে বিক্রেতাকে এভাবে বলে যে, আমি স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে এক হাজারটির বিনিময়ে ক্রয় করলাম তাহলে বিধান হলো, তাকে পাঁচশত মিছকাল স্বর্ণ ও পাঁচশত দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা] পরিশোধ করতে হবে। তবে দিরহামগুলো হবে এমন যার দশটির ওজন হবে সাত মিছকাল।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَضَافَ أَلْفَ الْبَيْهَاتِ الْخ : এ মাসআলার দলিল হলো, পূর্বের মাসআলার ন্যায় ক্রেতা এ ক্ষেত্রেও এক হাজারকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে সমানভাবে সম্পর্কিত করেছে। কাজেই উভয়টিই সমানভাবে অর্ধেক অর্ধেক করে সাব্যস্ত হবে। তবে স্বর্ণের ক্ষেত্রে যেহেতু মিছকালের পরিমাপ প্রচলিত, তাই প্রচলনের ভিত্তিতে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পাঁচশত মিছকাল সাব্যস্ত হবে। আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু وَزَنَ سَبْعَةَ 'সাত মিছকালের দিরহাম' [অর্থাৎ যার দশ দিরহামের ওজন সাত মিছকাল] প্রচলিত সেহেতু এরূপ ওজনের পাঁচশত দিরহাম সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, কোনো দেশে যদি এর ব্যতিক্রম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহলে সেখানকার প্রচলিত মুদ্রাই সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخِرِ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ جِيَادٌ فَقَضَاهُ زَيْوْفًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَاَنْفَقَهَا أَوْ  
 هَلَكَتْ فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) بَرْدٌ مِثْلُ  
 زَيْوْفِهِ وَيَرْجِعُ بِدَرَاهِمِهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْوَصْفِ مَرْغِيٌّ كَهَوْفِي الْأَصْلِ، وَلَا يُمْكِنُ  
 رِعَايَتُهُ بِإِجَابِ ضَمَانِ الْوَصْفِ، لِأَنَّهُ لَا قِيَمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ، فَوَجَبَ  
 الْمَصِيرُ إِلَى مَا قُلْنَا، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، حَتَّىٰ لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِيمَا لَا يَجُوزُ  
 الْإِسْتِبْدَالُ جَازًا، فَيَقَعُ بِهِ الْإِسْتِيفَاءُ، وَلَا يَنْقُضِي حَقَّهُ، إِلَّا فِي الْجَوْدَةِ وَلَا يُمْكِنُ  
 تَدَارُكُهَا بِإِجَابِ ضَمَانِهَا لِمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَا بِإِجَابِ ضَمَانِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ إِجَابٌ لَهُ  
 عَلَيْهِ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ۔

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কারো যদি অপর কারো নিকট উৎকৃষ্ট দশ দিরহাম পাওনা থাকে আর সে তা নিকট দিরহামে পরিশোধ করে আর প্রাপক তা না জেনে খরচ করে ফেলে কিংবা তার নিকট থেকে তা হালাক হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঋণ পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, প্রাপক [খরচকৃত] তদ্রূপ নিকট দিরহাম ফিরিয়ে দিবে এবং তার প্রাপ্য উৎকৃষ্ট দিরহাম পুনরায় উসূল করে নিবে। কেননা, মূল দিরহামের ক্ষেত্রে তার হক যেক্রপ বিবেচ্য তেমনি গুণাগুণের ক্ষেত্রেও তার প্রাপ্য হক বিবেচ্য। আর এখানে গুণাগুণের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে গুণাগুণের ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য হক রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, সমশ্রেণীর বস্তুর সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে গুণাগুণের কোনো স্বতন্ত্র মূল্য থাকে না। সুতরাং আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তা অবলম্বন করা অনিবার্য। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, নিকট দিরহাম তার প্রাপ্য হকেরই শ্রেণীভুক্ত। এ কারণেই যে সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্য হককে অন্য কিছু দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েজ নেই সে সকল ক্ষেত্রে যদি প্রাপ্য উৎকৃষ্ট দিরহামের স্থলে নিকট দিরহাম গ্রহণ করে, তাহলে জায়েজ হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, নিকট দিরহাম দ্বারা প্রাপ্য হক উসূল হয়ে যাবে। শুধু উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষেত্রে তার হক অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তার এ হক পূরণ করা সম্ভব নয়; যার কারণ আমরা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি [অর্থাৎ উৎকৃষ্টতার গুণের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই]। আবার মূল দিরহাম [পুনরায়] সাব্যস্ত করার মাধ্যমেও [হক পূরণ করা] সম্ভব নয়। কেননা, এটা হবে প্রাপকের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য প্রাপকের উপরই [ঋণগ্রহীতার] অধিকার সাব্যস্ত করা। আর শরিয়তে এর কোনো নজির নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخِرِ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ الْخ :

মাসআলা : যদি কারো অপর এক ব্যক্তির নিকট দশটি উৎকৃষ্টমানের দিরহাম পাওনা থাকে, অতঃপর ঋণগ্রহীতা দশটি নিম্নমানের দিরহাম দ্বারা তা পরিশোধ করে দেয় কিন্তু ঋণদাতা জানতে পারেনি যে, দিরহামগুলো নিম্নমানের ছিল, ফলে সে তা খরচ করে ফেলে কিংবা তা হালাক হয়ে যায় তাহলে বিধান হলো, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার

প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে, সে ঋণগ্রহীতার নিকট কিছু দাবি করতে পারবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ঋণপ্রাপক উক্ত নিকটমানের অনুরূপ দশটি দিরহাম ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দিবে এবং তার পাওনা উৎকৃষ্টমানের দশ দিরহাম গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, ইমাম ফাখরুল ইসলাম বাযদবী ও অন্যান্য ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো ক্রিয়াসের দাবি অনুযায়ী, আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো ‘ইসতিহাসান’ বা সুস্থ ক্রিয়াসের দাবি অনুসারে।

قَوْلُهُ لَأَنَّهُ حَقُّ نَسِ الْوَسْفِ مَرْعَى الْخ: ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, প্রাপকের হক যেমনিভাবে দিরহামগুলোর পরিমাণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তেমনিভাবে দিরহামগুলোর গুণাগুণের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য। পরিমাণের ক্ষেত্রে যদি ঋণগ্রহীতা কম দিত যেমন দশ দিরহামের স্থলে যদি সে আট দিরহাম দিত তাহলে দুই দিরহাম তার যেমন পাওনা থেকে যেত তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টতার গুণ তার পাওনা থেকে যাবে। তবে উৎকৃষ্টতার গুণের জরিমানা ঋণগ্রহীতার উপর সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কোনো দ্রব্য তার সমশ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে গুণাগুণের স্বতন্ত্রভাবে কোনো মূল্য সাব্যস্ত হয় না। যেমন- একটি উৎকৃষ্ট দিরহামের বিনিময়ে একটি নিকট দিরহাম বিক্রয় করলে সমান সমান বলে গণ্য হয়, পক্ষান্তরে একটি উৎকৃষ্ট দিরহামের বিনিময়ে দুটি নিকট দিরহাম বিনিময়ে দিলে ‘রিবা’ [সুদা] সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যখন ঋণগ্রহীতার উপর স্বতন্ত্রভাবে উৎকৃষ্টতার গুণের জরিমানা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় তখন আমাদের উল্লিখিত পন্থা অর্থাৎ নিকট দশটি দিরহাম ফেরত দিয়ে দশটি উৎকৃষ্ট দিরহাম গ্রহণ করা ছাড়া প্রাপকের হক উসূল করার আর কোনো বিকল্প নেই। কাজেই এ পন্থাই সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَهْمَا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ الْخ: ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, নিকট দিরহামও ঋণপ্রাপকের প্রাপ্যের শ্রেণীভুক্ত। এর দলিল হচ্ছে, ‘বায় সলম’-এর ক্ষেত্রে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] যদি উৎকৃষ্ট দিরহামের স্থলে নিকট দিরহাম দেয় এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] তা হস্তগত করে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে তা জায়েজ। অথচ ‘বায় সলম’-এর ক্ষেত্রে মূলধন [রা’সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নয় এবং মূলধন মজলিসে হস্তগত না করে পৃথক হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জায়েজ হওয়ার দ্বারা বুঝা গেল নিকট দিরহামগুলো নির্ধারিত মূলধন তথা উৎকৃষ্ট দিরহামেরই ‘শ্রেণীভুক্ত’। এরূপভাবে ‘বায় সরফ’ [মুদ্রা বিক্রয়চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যদি এক পক্ষ উৎকৃষ্ট দিরহামের পরিবর্তে নিকট দিরহাম দেয় আর অপর পক্ষ তা হস্তগত করে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ নয়। অথচ ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ তাদের প্রাপ্য হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েজ হয় এবং হস্তগত করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বুঝা গেল যে, উৎকৃষ্ট দিরহামের স্থলে নিকট দিরহাম দিলে তা প্রাপ্য হকেরই ‘শ্রেণীভুক্ত’ গণ্য হয়। তাহলে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় এটাই সাব্যস্ত হয়ে যাবে যে, ঋণদাতার মূল প্রাপ্য উসূল হয়েছে এখন শুধু তার উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষেত্রে তার হক রয়েছে। কিন্তু এ উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেননা, ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য দুটি সূরত হতে পারে-

১. শুধু উৎকৃষ্টতার গুণের জারিমানা আদায় করা

২. উৎকৃষ্টতার গুণসহ মূল দিরহাম আদায় করা।

প্রথম সূরত সম্ভব নয়, তার কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, উৎকৃষ্টতার গুণের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া মূল বস্তু ছাড়া তার গুণের পৃথক অস্তিত্বও হয়। কাজেই শুধু গুণের জরিমানা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয় সূরত সম্ভব নয় তার কারণ হলো, উৎকৃষ্টতার গুণসহ মূল দিরহাম আদায় করতে হলে প্রথমে ঋণদাতার উপর তার খরচকৃত নিকট দিরহামগুলোর জরিমানা সাব্যস্ত করতে হচ্ছে। ফলে যার স্বার্থে জরিমানা সাব্যস্ত করা হবে তার উপরই প্রথমে জরিমানা সাব্যস্ত করা হচ্ছে। আর শরিয়তে এরূপ কোনো নজির নেই। কাজেই শরিয়তে যার কোনো নজির নেই তা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। অতএব, যখন গুণের জরিমানা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় এবং গুণের জন্য স্বতন্ত্র মূল্য হয় না আর প্রাপক তার মূল প্রাপ্যও উসূল করে নিয়েছে তখন প্রাপকের আর কোনো হক দাবি করার অধিকার থাকবে না।

قَالَ : إِذَا أَفْرَحَ طَيْرٌ فِي أَرْضٍ رَجُلٍ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَكَذَا إِذَا بَاصَ فِيهَا، وَكَذَا إِذَا تَكَنَسَ فِيهَا طَيْرٌ، لِأَنَّهُ مَبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ، وَلَأَنَّهُ صَيْدٌ، وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ وَالصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَكَذَا الْبَيْضُ، لِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ، وَلِهَذَا يَحِبُّ الْجَرَّاءُ عَلَى الْمُحَرِّمِ بِكَسْرِهِ أَوْ شَبِّهِ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ لَمْ يُعِدَّ أَرْضَهُ لِذَلِكَ، فَصَارَ كَتَنَصِبِ شَبَكَةٍ لِلْجَفَافِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَ الصَّيْدُ دَارَهُ أَوْ وَقَعَ مَا نَشْرَ مِنَ السُّكَّرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ فِي ثِيَابِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لَمْ يَكْفُهُ، أَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لَهُ، يَخْلَافُ مَا إِذَا عَسَلَ النُّحْلُ فِي أَرْضِهِ، لِأَنَّهُ عَدَّ مِنْ أَنْزَالِهِ فَيَمْلِكُهُ تَبَعًا لِأَرْضِهِ، كَالشَّجَرِ النَّابِتِ فِيهَا وَالتُّرَابِ الْمُجْتَمِعِ فِي أَرْضِهِ بِجَرَيَانِ الْمَاءِ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো পাখি যদি কারো জমিতে বাস্কা ফুটায়, তাহলে যে [প্রথম] তা হস্তগত করবে সেই তার মালিক হবে। এরূপভাবে পাখি যদি ডিম পাড়ে কিংবা হরিণ যদি কারো জমিতে ঘর করে নেয় [সেক্ষেত্রেও একই বিধান]। কেননা, এগুলো হচ্ছে সকলের জন্য বৈধ [মালিকানাহীন] মাল এবং হস্তগতকারীর কজা তাতে সর্বপ্রথম হয়েছে [কাজেই সেই মালিক হবে]। তাছাড়া কৌশল ছাড়া ধরা গেলেও এগুলো মূলত শিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর [হাদীসের ভিত্তিতে] শিকার যে হস্তগত করবে তারই মালিকানাভুক্ত হবে। ডিমের বিষয়টিও একই। কেননা, তা শিকারের মূল। এ কারণেই হজের ইহরামের অবস্থায় কেউ ডিম ভাঙ্গলে কিংবা ভাজলে তার উপর 'দণ্ড' আদায় করা ওয়াজিব হয়। আর জমির মালিক যেহেতু তার জমি ঐ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেনি সেহেতু এটা শুকানোর উদ্দেশ্যে জাল ছড়িয়ে রাখার মতো হলো। কিংবা [বিতরণের উদ্দেশ্যে] ছড়িয়ে দেওয়া চিনি বা দিরহাম তার কৌচড়ে পড়ার মতো হলো; [এ ক্ষেত্রে] ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা [চিনি বা দিরহাম] তার মালিকানাভুক্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কাপড় গুটিয়ে না নিবে কিংবা যদি সে হস্তগত করার জন্যই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মৌমাছি যদি কারো জমিতে চাক বানায়, তাহলে বিধান ভিন্ন হবে [সে ক্ষেত্রে জমির মালিকই তার মালিক হবে]। কেননা, তা জমির উৎপন্ন বস্তু বলে গণ্য হয়। সুতরাং জমির অনুবর্তী হিসেবে সে তার মালিক হয়ে যাবে। যেমন- জমিতে উৎপন্ন গাছ এবং পানির ঢলের কারণে তার জমিতে জমে উঠা মাটি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا أَفْرَحَ طَيْرٌ فِي أَرْضٍ رَجُلٍ: মাসআলা হলো, কারো জমিতে যদি পাখি বাসা বেঁধে বাস্কা ফোটায় কিংবা ডিম পাড়ে কিংবা হরিণ বাসা বাঁধে তাহলে বিধান হলো, এগুলো যে ব্যক্তি প্রথম ধরবে সেই তার মালিক হবে। জমির মালিক তার জমির মালিকানার ভিত্তিতে এগুলোর মালিক হবে না। তবে জমির মালিক যদি জমিকে এ সকল জিনিস তথা পাখি, পাখির

বাচ্চা, পাখির ডিম কিংবা হরিণ লাভ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখে থাকে, তাহলে এগুলো যেই ধরক না কেন জমির মালিকই তার মালিক হবে। যেমন- সে জমিতে গর্ত করে রাখল এজন্য যে, হরিণ তাতে পড়ে আটকা পড়বে, তাহলে হরিণের মালিক সে-ই হবে।

قَوْلُهُ لَا تَمَسَّحُ سَفَتَ بَيْتِهِ إِلَيْهِ الْح: উল্লিখিত মাসআলার দলিল হলো, এ সকল জিনিস অর্থাৎ হরিণ, পাখি, পাখির বাচ্চা ও পাখির ডিম হচ্ছে 'মুবাহ' বা সকলের জন্য বৈধ, উনুক্ক মাল; যে কেউ এগুলোকে ধরে মালিক হতে পারে। সুতরাং যে-ই প্রথম এগুলোকে ধরবে সেই এর মালিক হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, পাখির বাচ্চা ও হরিণ শিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর নবী করীম ﷺ-এর বাণী السَّبْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ "শিকার যে ধরবে তারই হবে"-এর ভিত্তিতে শিকার প্রথম যে ধরবে সেই তার মালিক হবে। আর ডিমের ক্ষেত্রেও শিকারের বিধানই হবে। কেননা, ডিম যদিও শিকার নয় কিন্তু তা শিকারের মূল ও উৎস। এ কারণেই হজ্ব বা ওমরা আদায়কারী ব্যক্তি ইহরামের অবস্থায় যদি ডিম ভেঙ্গে ফেলে কিংবা তা ভুনা করে ফেলে তাহলে তার উপর প্রাণী শিকার করলে যেদ্রুপ কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় তদ্রুপ কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ডিমের বিধানও শিকারের বিধানের অনুরূপ।

قَوْلُهُ وَمَا حَبَّ الْأَرْضَ لَمْ يُعَدَّ أَرْضَهُ لِيَذَلِكَ الْح: মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মাসআলায় জমির মালিক উক্ত জিনিসগুলোর মালিক না হওয়ার কারণ হলো, সে তার জমিকে এগুলো ধরার জন্য প্রস্তুত করে রাখেনি। পক্ষান্তরে জমির মালিক যদি ঐ সকল জিনিস ধরার জন্য প্রস্তুত করে রাখে, তাহলে যেই ধরক না কেন জমির মালিকই ঐ গুলোর মালিক হবে। মুসান্নিফ (র.) এ ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. কেউ তার জাল যদি শুকানোর উদ্দেশ্যে বিছিয়ে রাখে, অতঃপর কোনো শিকার তাতে আটকা পড়ে তাহলে জালের মালিক শিকারটির মালিক হবে না; বরং যে শিকারটি প্রথম ধরবে সেই তার মালিক হবে। পক্ষান্তরে জালের মালিক যদি শিকার ধরার উদ্দেশ্যে তার জাল বিছিয়ে রাখে, অতঃপর তাতে শিকার আটকা পড়ে তাহলে জালের মালিকই তার মালিক হবে; যে প্রথম ধরবে সে মালিক হবে না।

২. যদি কারো ঘরে শিকারযোগ্য কোনো প্রাণী প্রবেশ করে কিন্তু ঘরের মালিক তা জানতে পারেনি। সে ঘটনাক্রমে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে যে ব্যক্তি প্রথম প্রাণীটি ধরবে সেই তার মালিক হবে, ঘরের মালিক প্রাণীটির মালিক হবে না। পক্ষান্তরে ঘরের মালিক যদি টের পায় যে, তার ঘরে প্রাণী প্রবেশ করেছে এবং সেটা ধরার জন্য সে ঘরের দরজা বা জানালা বন্ধ করে দেয় তাহলে সেই তার মালিক হবে; অন্য কেউ প্রথম ধরলেও মালিক হবে না।

৩. কেউ যদি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মিষ্টিদ্রব্য কিংবা রৌপ্যমুদ্রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে থাকে আর কারো কাপড়ে গিয়ে তা পড়ে তাহলে যদি সে ব্যক্তি উক্ত মিষ্টি বা রৌপ্যমুদ্রা পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে না থাকে তাহলে যে ব্যক্তি প্রথম তা ধরবে সেই মালিক হবে। আর যার কাপড়ে পড়েছে সে যদি পড়ার পর তার কাপড় গুটিয়ে নেয় কিংবা পূর্ব থেকে তা লাভ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে সেই তার মালিক হবে; অন্য কেউ ধরলেও মালিক হবে না।

قَوْلُهُ يَخْلُفُ مَا عَسَلَ الْحَلْلُ الْح: মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তার ব্যতিক্রম বিধান হলো, যদি কারো জমিতে মৌমাছি বাসা বাধে এবং তাতে মধু সঞ্চয় করে। এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, সর্বাবস্থায় জমির মালিকই উক্ত মধুর মালিক হবে, কেউ তা সংগ্রহ করার অধিকার পাবে না। এর কারণ হলো, মধু জমির বর্ধিত বস্তু অস্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। পূর্বের মাসআলায় উল্লিখিত হরিণ, পাখির বাচ্চা ও পাখির ডিমের মাঝে এবং মধুর মাঝে পার্থক্য হলো, মধু যখন কোনো জমিতে সঞ্চিত হয় তখন জমির সাথে স্থিতিশীলভাবে যুক্ত হয়, কাজেই তা জমির অনুগামী (تَابِع) হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হরিণ, পাখির বাচ্চা অস্থিতিশীলভাবে জমিতে থাকে, কাজেই তা জমির অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে না।

জমির বর্ধিত বস্তু যে জমির অনুগামী হিসেবে জমির মালিকেরই মালিকানাধীন হয় তার নজির হচ্ছে, জমিতে উৎপন্ন গাছ না বপন করলেও জমির মালিকই জমিতে উৎপন্ন গাছের মালিক হয়। এরূপভাবে ঢলের পানির সাথে চলে আসা মাটি যদি কারো জমিতে জমে যায়, তাহলে জমির মালিকই উক্ত মাটির মালিক হয়- অন্য কেউ তা নেওয়ার অধিকার রাখে না। তদ্রূপ যার জমিতে মৌমাছি মধু সঞ্চয় করবে সেই তার মালিক হবে।



# كِتَابُ الصَّرْفِ

قَالَ : الصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَوَضَيْهِ مِنْ جَنْسِ الْأَثْمَانِ، سَمِيَ بِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّنْقِيلِ فِي بَدَلَتِهِ مِنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ، وَالصَّرْفُ هُوَ التَّنْقِيلُ وَالرَّدُّ لُغَةً، أَوْ لَوْلَا لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إِلَّا الزِّيَادَةُ، إِذَا لَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ، وَالصَّرْفُ هُوَ الزِّيَادَةُ لُغَةً، كَذَا قَالَ الْخَلِيلُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْعِبَادَةُ النَّافِلَةُ صَرْفًا -

## অধ্যায় : ‘বায় সরফ’ বা মুদ্রা বিনিময়

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ‘সরফ’ হলো এমন ক্রয়-বিক্রয় যার উভয় বিনিময়দ্রব্য মুদ্রাশ্রেণীভুক্ত হয়। আর ‘সরফ’-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থানান্তর করা, ফেরত দেওয়া। সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয়কে ‘সরফ’ নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, তাতে উভয় বিনিময়দ্রব্য [তাৎক্ষণিকভাবে] হস্তান্তর করা আবশ্যিক। কিংবা এ কারণে ‘সরফ’ বলা হয় যে, এ বিক্রয়চুক্তি দ্বারা শুধু গুণগত অতিরিক্ততাই [চুক্তিকারীর] উদ্দেশ্য থাকে। আর ভাষাবিদ খলীলের মতে ‘সরফ’-এর আভিধানিক অর্থ হলো ‘অতিরিক্ততা’। এজন্যই নফল ইবাদতকে ‘সরফ’ বলা হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

‘বায় সরফ’-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : صَرْفٌ -এর আভিধানিক অর্থ-

1. التَّنْقِيلُ স্থানান্তরিত করা, ফিরিয়ে দেওয়া,
2. الزِّيَادَةُ বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত করা।

صَرْفٌ -এর পারিভাষিক অর্থ- “الصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَوَضَيْهِ مِنْ جَنْسِ الْأَثْمَانِ” ‘সরফ বলা হয় এমন বিক্রয়চুক্তিকে, যার উভয় পক্ষের বিনিময়দ্রব্য হয় মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য।”

পূর্বের পরিচ্ছেদসমূহের সাথে সম্পর্ক : মুসান্নিফ (র.) ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে ‘বায় সরফ’-এর আলোচনা সর্বশেষে করেছেন। এর কারণ হলো-

1. ‘বায় সরফ’ হলো, মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, আর মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত মূলদ্রব্য হয়ে থাকে। আর বিক্রয়চুক্তিতে মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে বিক্রয়দ্রব্য, মূল্য হয় তার অনুগামী (تَابِعٌ)। আর যা অনুগামী (تَابِعٌ) হয় তা মূল্যের পরে হয়ে থাকে। তাই অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনার পরে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় তথা ‘বায় সরফ’-এর আলোচনা করেছেন।
2. আরোেকটি কারণ হলো, ‘বায় সরফ’-এর শর্ত ও বিধি-নিষেধ বেশি হওয়ার কারণে এর অস্তিত্ব কম হয়। তাই যে সকল ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব বেশি তা আলোচনা করার পর যার অস্তিত্ব কম তার আলোচনা করতে গিয়ে ‘বায় সরফ’-এর আলোচনা সর্বশেষে এনেছেন।

‘বায় সরফ’-এর শর্ত : এর শর্ত হলো, চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের বিনিময়দ্রব্য হস্তগত করা। উল্লেখ্য, এ শর্তের কারণেই ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে বাকি বিক্রয় জায়েজ হয় না এবং خِيَارُ مَرْطُ [চিন্তা করে দেখার ইচ্ছাধিকার] সহীহ হয় না। তবে বাকি চুক্তি করার পর মজলিসে থাকাবস্থায়ই যদি বাকির মেয়াদ উভয়ে বাতিল করে নগদ করে নেয়, তাহলে

চুক্তি জায়েজ হয়ে যাবে। তদ্রূপ **خَبَارٌ شَرَطُ** সাব্যস্ত করার পর মজলিসেই যদি তা বাতিল করে দেয়, তাহলে চুক্তি জায়েজ হয়ে যাবে। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে উভয় সুরতেই চুক্তি জায়েজ হবে না।

**قَوْلُهُ قَالَ: اَلصَّرْفُ مَوْالٍ نَّبِيْعٌ اِذَا كَانَ الْخ** মুসান্নিফ (র.) এখানে 'বায় সরফ'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। এর সংজ্ঞা হলো, **اَلصَّرْفُ مَوْالٍ نَّبِيْعٌ اِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَوْنِهِ مِنْ جَنَسِ الْاَنْسَانِ** "সরফ বলা হয় এমন বিক্রয়চুক্তিকে যার উভয় পক্ষের বিনিময়দ্রব্য হয় মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য।"

আল্লামা ইবনে হমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) 'বায় সরফ'-এর সংজ্ঞায় **يَبِيْعُ ثَمَنٍ بَيِّنٍ** [মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা বিক্রয় করা] না বলে **مِنْ جَنَسِ الْاَنْسَانِ** [মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য] বলেছেন, এর কারণ হলো, যাতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি পাত্র বা অলংকার মুদ্রার বিনিময়ে কিংবা এরূপ পাত্র বা অলংকারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিও 'বায় সরফ'-এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, এরূপ ক্রয়-বিক্রয় 'বায় সরফ'-এর অন্তর্ভুক্ত, অথচ **يَبِيْعُ ثَمَنٍ بَيِّنٍ** [মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা বিক্রয় করা] বললে 'বায় সরফ'-এর সংজ্ঞায় তা অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কারণ, পাত্র বা অলংকার বাহ্যিক মুদ্রা নয়, (এজন্যই তা নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়, পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না।) কিন্তু স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র বা অলংকার **مِنْ جَنَسِ الْاَنْسَانِ** [মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য]। কেননা, স্বর্ণ ও রৌপ্য মূলত মুদ্রা বা মূলদ্রব্য হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এ দুটি মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য। অতএব, এ দুটির ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায় সরফ'-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত সংজ্ঞায় **يَبِيْعُ ثَمَنٍ بَيِّنٍ** [মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা বিক্রয় করা] না বলে **مِنْ جَنَسِ الْاَنْسَانِ** [মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য] বলেছেন।

**قَوْلُهُ سَمِّيَ بِهِ لِلْحَاجَةِ اِلَى التَّحْلِ الْ** মুসান্নিফ (র.) এখানে 'বায় সরফ'-এর নামকরণের কারণ [ **صُرْفٌ** -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে কি সম্পর্ক তা] বর্ণনা করেছেন। এর নামকরণের দুটি কারণের যে কোনোটি হতে পারে। প্রথম কারণ : **صُرْفٌ** -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- স্থানান্তরিত করা, ফিরিয়ে দেওয়া। আর 'বায় সরফ'-এ উভয় পক্ষের দ্রব্য কার্যত [মজলিসেই] এক পক্ষের হাত অপর পক্ষের হাতে স্থানান্তরিত করা আবশ্যিক ও শর্ত। আর এ ভৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা আবশ্যিক হওয়ার কারণেই এ ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায় সরফ' নাম রাখা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, **صُرْفٌ** -এর আভিধানিক একটি অর্থ হচ্ছে, **الرِّبَاةُ** 'অতিরিক্ত'। ভাষাবিদ খলীল ইবনে আহমদ **صُرْفٌ** -এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ অর্থ হিসেবেই নফল ইবাদতকে **صُرْفٌ** বলা হয়। যেমন হাদীসে আছে- **سَمِيَ اِتْمَنَى اِلَى غَيْرِ اَيْبِهِ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صُرْفًا وَلَا عَدْلًا** "যে ব্যক্তি নিজের প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে পিতা হিসেবে পরিচয় দিবে আল্লাহ তা'আলা তার কোনো নফল ও ফরজ ইবাদত কবুল করবেন না।" এ হাদীসে **صُرْفٌ** -এর অর্থ হচ্ছে নফল ইবাদত। যেহেতু নফল হচ্ছে ফরজের পরে অতিরিক্ত ইবাদত, তাই একে **صُرْفٌ** বলা হয়েছে। এ অর্থ হিসেবে 'বায় সরফ'-এর নামকরণের কারণ হলো, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদের উদ্দেশ্য সর্বদা অতিরিক্ত লাভ অর্জন করা হয়ে থাকে; ক্রয়কৃত বস্তুর সত্তার দ্বারা উপকৃত হওয়া উদ্দেশ্য হয় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য বস্তু যেমন- খাদ্য, প্রাণী ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তুটির সত্তা দ্বারা উপকৃত হওয়াও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন- খাদ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় তা ভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবারণ করা, গরু ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় চাষ করা ইত্যাদি। আর মুদ্রাদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার সত্তা দ্বারা কোনো উপকার অর্জন করা উদ্দেশ্য হয় না; বরং কিছু লাভ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর লাভই হচ্ছে অতিরিক্ত বিষয়। সুতরাং যেহেতু এ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিষয় অর্জন করাই সর্বদা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে **صُرْفٌ** 'বায় সরফ'। কেননা, এর আভিধানিক অর্থও হচ্ছে "অতিরিক্ত"।

قَالَ : فَإِنْ بَاعَ فِضَّةً بِنِصْفَةِ أَوْ ذَهَبًا يَذْهَبُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فِي  
الْجَوْدَةِ وَالصِّبَاغَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ بِدَا  
يَسِدِّ وَالْفَضْلُ رِبَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جَبَدَهَا وَرَدِيهَا سَوَاءٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ  
فِي الْبَيِّنَةِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, তাহলে সমপরিমাণের বিনিময়ে সমপরিমাণ ব্যতীত বিক্রয় জায়েজ হবে না। যদিও তা উৎকৃষ্টতা ও তৈরির দিক থেকে তারতম্যপূর্ণ হয়। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, “স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান সমান, ওজন সমান সমান হতে হবে, হাতে হাতে [হস্তান্তর] হতে হবে, আর অতিরিক্ত হলে তা হবে রিবা [সুদ]। আর নবী করীম ﷺ বলেছেন, “এগুলোর উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমান।” এ বিষয়টি আমরা ‘বিক্রয় অধ্যায়’-এ আলোচনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَ فِضَّةً بِنِصْفَةِ الْخ : মাসআলা : কেউ যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করে কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনের দিক থেকে সমান সমান হতে হবে। অন্যথা ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষের দ্রব্য যদি উৎকৃষ্ট মানের হয় কিংবা উন্নত কারুকার্যবিশিষ্ট হয় আর অপর পক্ষের দ্রব্য তদপেক্ষা নিম্নমানের হয় তবুও ওজনের দিক থেকে উভয় পক্ষের দ্রব্য সমান সমান হওয়া অপরিহার্য।

উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া শর্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয়ের চুক্তিকালে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হতে হবে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনে সমান, শুধু বাস্তবে যদি সমান হয় চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তিকালে তা জ্ঞাত না হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। সুতরাং যদি অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করে, অতঃপর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পরে মেপে দেখল যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য সমান তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না; বরং মজলিসেই উভয়ের জানতে হবে যে, উভয় দ্রব্য ওজনে সমান।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ : উল্লিখিত মাসআলার দলিল হিসেবে মুসান্নিফ (র.) দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীস হচ্ছে নবী করীম ﷺ ‘سَوَاءٌ وَرَدِيهَا سَوَاءٌ’ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য’ এভাবে ছয়টি দ্রব্যের কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন, ‘مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ يَدَا يَسِدِّ وَالْفَضْلُ رِبَا’ [তোমরা বিক্রয় কর] সমপরিমাণের বিনিময়ে সমপরিমাণ, ওজনের দিক থেকে সমান সমান এবং হাতে হাতে আদান প্রদান করে। আর [কোনো পক্ষে] অতিরিক্ত হলে তা হবে ‘রিবা’ [সুদ]।’ এ হাদীসে নবী করীম ﷺ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

১. ওজনের দিক থেকে উভয় দ্রব্য সমান সমান হওয়া।

২. চুক্তির মজলিসেই উভয় পক্ষের দ্রব্য উভয়ে হস্তগত করা।

উল্লেখ্য, এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে একাধিক সাক্ষী হতে বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিগতার সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা ‘রিবা’-এর পরিচ্ছেদের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় হাদীস হচ্ছে- নবী করীম ﷺ -এর বাণী ‘جَبَدَهَا وَرَدِيهَا سَوَاءٌ’ এগুলোর [অর্থাৎ ‘রিবা’ দ্রব্যের] উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বরাবর।’ অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে ‘রিবা’ সাব্যস্ত হয় তার উৎকৃষ্টতার ও নিকৃষ্টতার তারতম্য ধর্তব্য হবে না; বরং উভয়টিকে সমান সমান ধরা হবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, এক পক্ষের স্বর্ণ যদি উৎকৃষ্ট আর অপর পক্ষের স্বর্ণ যদি নিম্নমানের হয় তবুও ক্রয়বিক্রয় করে বিক্রয় করা যাবে না। উল্লেখ্য, এ হাদীসটি মুসান্নিফ (র.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তবে এর মর্মার্থ ‘রিবা’ সংক্রান্ত সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কেও আমরা ‘রিবা’-এর পরিচ্ছেদের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয় হারাম হওয়া সম্পর্কে আমরা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে ‘রিবা’-এর পরিচ্ছেদের শুরুতে মূল গ্রন্থের ৬১ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

قَالَ : وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعَوَضَيْنِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ لِمَا رَوَيْنَا ، وَلِقَوْلِ عُمَرَ (رض) وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تَنْظِرُهُ ، وَلَئِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا لِيُخْرِجَ الْعَقْدَ عَنِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْآخَرِ تَحْقِيقًا لِلْمَسَاوَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا ، وَلَئِنْ أَحَدُهُمَا لَيْسَ بِأَوَّلَى مِنَ الْآخَرِ فَوَجِبَ قَبْضُهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصْرُوعِ ، أَوْ لَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَضْرُوبِ ، أَوْ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلَئِنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ شُبْهَةٌ عَدَمِ التَّعَيُّنِ لِكُونِهِ ثَمَنًا خِلْقَةً ، فَيَشْتَرِطُ قَبْضَهُ إِعْتِبَارًا لِلشُّبْهَةِ فِي الرِّبَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, [মজলিস থেকে] পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় বিনিময়দ্রব্য হস্তগত করা অপরিহার্য। এর দলিল হলো, একটু পূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীসটি। আরেকটি দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্য- “যদি অপর পক্ষ তোমার কাছে তার ঘরে প্রবেশ করার সময়টুকু অবকাশ চায়, তাহলে তুমি তাকে ততটুকু অবকাশ দিবে না।” তাছাড়া এ কারণে যে, বিনিময়দ্রব্যদ্বয়ের একটি হস্তগত করা তো আবশ্যিক এজন্য যে, চুক্তিটি যাতে [হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ] বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় না হয়। অতঃপর সমতা রক্ষার্থে অপর বিনিময়দ্রব্যটিও হস্তগত করা আবশ্যিক হবে, যাতে রিবা [সুদ] সাব্যস্ত না হয়। আর এ কারণে যে, বিনিময়দ্রব্যদ্বয়ের কোনোটিই [হস্তগতকরণের ক্ষেত্রে] অপরটির উপর অগ্রাধিকার রাখে না, সুতরাং [একই মজলিসে] উভয়টি হস্তগত করা আবশ্যিক হবে। চাই উভয় দ্রব্য নির্ধারণযোগ্য হোক যেমন- কারুকার্য খচিত [অলংকার বা পাত্র] কিংবা নির্ধারণযোগ্য না হোক যেমন- মোহরাক্ষিত মুদ্রা কিংবা একটি নির্ধারণযোগ্য আর অপরটি অনির্ধারণযোগ্য হোক [সর্বাবস্থায় বিধান এক]। কেননা, আমাদের বর্ণিত হাদীসটি শর্তমুক্ত। তাছাড়া এ কারণে যে, দ্রব্যটি [অলংকার বা পাত্র হওয়ার কারণে] নির্ধারণযোগ্য হলেও তাতে নির্ধারণযোগ্য না হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। কেননা, [স্বর্ণ ও রৌপ্য] সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রাদ্রব্য। অতএব, তাও হস্তগত করা আবশ্যিক হবে। কারণ, রিবা [সুদের]-এর ক্ষেত্রে সন্দেহও ধর্তব্য হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعَوَضَيْنِ : ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য উভয়ে হস্তগত করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলে একমত। মুসান্নিফ (র.) এ মাসআলার নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا : মুসান্নিফ (র.) নকলী দলিল হিসেবে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীস হলো, পূর্বের মাসআলার দলিলে আমাদের উল্লিখিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ স্বর্ণ, রৌপ্যসহ ছয়টি দ্রব্যের বিক্রয়ের বিধান উল্লেখ করে বলেছেন- بِدَائِي [উভয় পক্ষের দ্রব্য] হাতে হাতে হস্তান্তর করতে হবে। আর হাতে হাতে হস্তান্তরের অর্থ হচ্ছে উভয়ে নগদ হস্তান্তর করা। কাজেই এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [অর্থাৎ ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে] উভয় পক্ষ নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য ও বিক্রয় জাজেজ হওয়ার জন্য শর্ত।

দ্বিতীয় হাদীস হলো, হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত মওকুফ হাদীস। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন-  
 وَإِنْ اسْتَظَّرَكَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تَنْظُرْ [বায় সরফ-এর ক্ষেত্রে] যদি অপর পক্ষ তোমার নিকট তার ঘরে প্রবেশের অবকাশ চায়, তাহলে তুমি তাকে সে অবকাশ দিবে না।” অর্থাৎ অপর পক্ষ যদি বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর তার দ্রব্যটি হস্তান্তর করার জন্য ঘরে প্রবেশ করে এনে দেওয়ার অবকাশ চায়, তাহলে তুমি তাকে সে অবকাশ দিতে পারবে না। হযরত ওমর (রা.) -এর এ বাণী থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ‘বায় সরফ’ -এর ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের পর মজলিসেই উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যিক।

উল্লেখ্য, হযরত ওমর (রা.)-এর এ হাদীসটি সহীহ সনদে মুয়াত্তা মালিকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا الزَّوْجَ بِالذَّهَبِ أَحَدَمًا غَانِبًا وَالْآخَرَ نَاجِرًا وَإِنْ اسْتَظَّرَكَ أَنْ يَبْلُغَ بَيْتَهُ فَلَا تَنْظُرْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ هَاتِ وَهَاتِ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الرِّيَا .

“হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, তোমরা সমান সমান ব্যতীত স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করো না। আর স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এভাবে বিক্রয় করো না যে, একটি উপস্থিত আর অন্যটি অনুপস্থিত। আর অপর পক্ষ যদি তোমার নিকট তার ঘরে প্রবেশের অবকাশ চায় তাহলে তুমি সে অবকাশ দিও না। কেবল হাতে হাতে নগদ নগদ বিক্রয় করবে। আমি তোমাদের জন্য ‘রিবা’ [সুদ]-এর আশঙ্কা করছি।”

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত দুটি হাদীস ছাড়াও বুখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত ‘রিবা’ সংক্রান্ত হাদীস দ্বারাও মাসআলাটি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তাতে নবী করীম ﷺ বলেছেন-  
 وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَانِبًا -“আর তোমরা এ সকল দ্রব্য [অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্যসহ উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্য]-এর মধ্যে থেকে কোনোটি বাকির বিনিময়ে নগদ বিক্রয় করো না।”

قَوْلُهُ وَلَئِنْ لَدِدْتُ مِنْ قَبِضِ أَحَدِمَا الْخ -এখন থেকে মুসান্নিফ (র.) আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। আকলী দলিল হলো, ‘বায় সরফ’ -এর ক্ষেত্রে যে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা তো এজন্য অপরিহার্য যে বিক্রয়চুক্তিটিকে যেন بَيْعُ الْكَالِيِّ “দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়”-এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়। ‘দাইন’ হলো যা জিম্মায় অনিদিষ্টকপে সাব্যস্ত হয়। যেমন- স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা এগুলো নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; বরং একটি নির্দিষ্ট করলেও তার স্থলে অন্য একটি দেওয়ার অধিকার থাকে। ‘বায় সরফ’ -এর মাঝে যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয় কাজেই তা বাকি রাখা হলে জিম্মায় অনিদিষ্টভাবেই ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়ে থাকবে। ফলে ‘দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়’ হয়ে যাবে। অথচ নবী করীম ﷺ ‘দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়’ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ নিষেধের ভিত্তিতে যে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যিক হবে।

যখন এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যিক সাব্যস্ত হলো তখন অপর পক্ষের দ্রব্যও হস্তগত করা আবশ্যিক হবে দুটি কারণে :  
 قَوْلُهُ ثُمَّ لَئِنْ لَدِدْتُ مِنْ قَبِضِ الْآخَرِ الْخ : প্রথম কারণ হলো, যদি একটি দ্রব্য নগদ হস্তগত করা হয় আর অপর দ্রব্য বাকি থাকে, তাহলে যে নগদ হস্তগত করল তার লাভ সাব্যস্ত হবে। কেননা, বাকির চেয়ে নগদ হস্তগত করা লাভজনক গণ্য হয়। সুতরাং উভয় পক্ষের দ্রব্যের মাঝে সমতা রক্ষা হবে না। ফলে ‘রিবা’ [সুদ] সাব্যস্ত হবে। অতএব, উভয় পক্ষে সমতা রক্ষা করার জন্য অপর পক্ষের দ্রব্যও মজলিসেই হস্তগত করা আবশ্যিক হবে।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ أَحَدَمَّا لَيْسَ بِأَوَّلِي الْخ : দ্বিতীয় কারণ হলো, যখন এক পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যিক হয়েছে তখন প্রশ্ন দেখা দিবে যে, কোন পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা হবে? এ ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান নেই। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত যাতে কোনো পক্ষের দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দিতে না হয় সে জন্য উভয় পক্ষের দ্রব্যই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যিক হবে।

قَوْلُهُ سَرَّاءُ كَانَتْ تَبْعَتَانِ كَالْمَصْرُغِ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘বায় সরফ’ -এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করতে হবে’ এ বিধানটি ‘বায় সরফ’ -এর সব সুরতেই প্রযোজ্য। এখানে জানা আবশ্যিক যে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা (النَّفْرُوبُ) নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না, তাই বিক্রয়কালে কোনো মুদ্রা নির্দিষ্ট করলেও তার পরিবর্তে তদ্রূপ অন্য মুদ্রা দিতে পারে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি পাত্র বা অলংকার

(النَّصْرَةَ) নির্দিষ্ট করা হলে তা নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই কেউ নির্দিষ্ট কোনো পাত্র বা অলংকার বিক্রয় করলে তার পরিবর্তে অন্য অন্য একটি পাত্র দিতে পারে না। সুরতাহ 'বায় সরফ' -এর তিনটি সুরত হতে পারে—

১. উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়। যেমন— উভয় পক্ষে স্বর্ণালংকার কিংবা স্বর্ণের পাত্র।
২. উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন— উভয় পক্ষে স্বর্ণমুদ্রা কিংবা রৌপ্যমুদ্রা।
৩. এক পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় আর অপর পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন— স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণের বা রৌপ্যের পাত্র ক্রয় করল। এ তিন সুরতেই উভয় পক্ষের দ্রব্য চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক হওয়ার মুসান্নিফ (র.) যে আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন তা তো কেবল উল্লিখিত তিন সুরতের মধ্য থেকে কেবল এক সুরতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তা হলো, দ্বিতীয় সুরত তথা যখন উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন হয় যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। কেননা, কেবল এ সুরতেই যদি কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত না করে চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে **بَيْنَ الْكَائِلِيْنَ يَنْكَالِيْ** “দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রয়” সাব্যস্ত হয়, যা নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দু সুরতে যদি কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত না করে চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে **بَيْنَ الْكَائِلِيْنَ يَنْكَالِيْ** “দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রয়” সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এ দু সুরতে যেহেতু উভয় পক্ষে কিংবা এক পক্ষে এমন দ্রব্য রয়েছে যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য কাজেই তা ‘দাইন’-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই “দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রয়” সাব্যস্ত হবে না। সূতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত আকলী দলিলের ভিত্তিতে কেবল এক সুরতে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক সাব্যস্ত হয়, অথচ বিধান হলো, তিনটি সুরতেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক।

**উক্ত প্রশ্নের দুটি জবাব :**

**قَوْلُهُ بِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا :** এ ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত প্রশ্নের দুটি জবাবের প্রথম জবাবটির বিবরণ দিয়েছেন। প্রথম জবাব হলো, এ ক্ষেত্রে বিধানটি মূলত ‘নস’ তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আমরা যে কিয়াস উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে উক্ত বিধানের ‘ইল্লাত’। আমরা পূর্বে ‘রিবা’ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ যে হাদীস উল্লেখ করেছি তাতে যে বলা হয়েছে **يُؤَدُّ بِسِدِّ** “হাতে হাতে” অর্থাৎ উভয় পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করতে হবে, নবী করীম ﷺ -এর এ নির্দেশে কোনো সরতকে বাদ রাখা হয়নি; বরং তা নিঃশর্ত ও সর্বব্যাপী। কাজেই উক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই ‘বায় সরফ’ -এর তিনটি সুরতেই উভয় পক্ষের দ্রব্য চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

**قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْخ :** এ ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত প্রশ্নের দুটি জবাবের দ্বিতীয় জবাবের বিবরণ প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় জবাব হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি পাত্র কিংবা অলংকার যদিও নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়, কিন্তু তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কিছুটা সন্দেহ (شُبْهَةٌ) থেকে যায়। কেননা, স্বর্ণ ও রৌপ্য সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রদ্রব্য হিসেবে গণ্য। কাজেই তা দ্বারা পাত্র বা অলংকার তৈরি করা হলেও তা মুদ্রদ্রব্য হিসেবে বহাল থাকার সন্দেহ (شُبْهَةٌ) রয়েছে। আর মুদ্রদ্রব্য সর্বদা অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আর ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, ‘রিবা’ [সুদ]-এর ক্ষেত্রে সন্দেহমূলক বিদ্যমান বিষয়কে কার্যত বিদ্যমান হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া হবে যে, উক্ত দুই সুরতেও নির্দিষ্ট করা হলেও নগদ হস্তগত করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট হয়নি। কাজেই উভয় পক্ষের দ্রব্যই চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

وَالْمَرَادُ مِنْهُ الْإِفْتِرَاقُ بِالْأَبْدَانِ حَتَّى لَوْ ذَهَبَا عَنِ الْمَجْلِسِ بِمَشْيَانٍ مَعًا، فِي جِهَةٍ  
وَاحِدَةٍ أَوْ نَامَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا لَا يَبْطُلُ الصَّرْفُ، لِقَوْلِ ابْنِ عَسَمَرٍ  
(رض) : وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فِثَبَ مَعَهُ، وَكَذَا الْمُعْتَبَرُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي قَبْضِ رَأْسِ مَالٍ  
السَّلَمِ، يَخْلَافُ خِيَارَ الْمُحَيَّرَةِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ.

অনুবাদ : আর [পূর্বে উল্লিখিত] পরস্পর পৃথক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া। সুতরাং যদি উভয়ে মজলিস থেকে উঠে একই দিকে হাঁটতে থাকে কিংবা উভয়ে মজলিসে ঘুমিয়ে পড়ে বা বেহঁশ হয়ে পড়ে, তাহলে 'সরফ'-এর চুক্তিটি বাতিল হবে না। এর দলিল হলো হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্য—“আর যদি অপর পক্ষ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাহলে তুমিও তার সাথে লাফিয়ে পড়বে”। আর ‘বায় সলম’-এর মূলধন হস্তগত করার ক্ষেত্রেও এ অর্থই [অর্থাৎ শারীরিকভাবে পৃথক হওয়াই] বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে তালাকের ইচ্ছাধিকারপ্রাপ্তা স্ত্রী ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে মজলিস ত্যাগ করাই বিবেচ্য হবে]। কেননা, অনীহা প্রকাশের মাধ্যমে তালাকের ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যায়। [আর মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যমে অনীহা প্রকাশ পায়।]

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمَرَادُ مِنْهُ الْإِفْتِرَاقُ بِالْأَبْدَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় ক্ষেত্র দ্রব্য হস্তগত করা অপরিহার্য’ এ ক্ষেত্রে পরস্পরে পৃথক হওয়ার অর্থ হলো, শারীরিকভাবে পরস্পরে পৃথক হওয়া। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যদি চুক্তি সম্পাদনের পর উভয়ে একত্রে চুক্তির মজলিস ত্যাগ করে একই দিকে হাঁটতে থাকে কিংবা তারা উভয়ে চুক্তির মজলিসে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা উভয়ে মজলিসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে তাহলে এতে তাদের চুক্তিটি বাতিল হবে না, তারপর তারা উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে নিলে তা জায়েজ হবে। কেননা, তারা শারীরিকভাবে পৃথক হয়নি।

قَوْلُهُ لِقَوْلِ ابْنِ عَسَمَرٍ (رض) : وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فِثَبَ مَعَهُ الخ : উক্ত মাসআলার দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর বক্তব্য—“যদি [বায় সরফের ক্ষেত্রে উভয়ের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে] অপর পক্ষ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তুমিও তার সাথে লাফিয়ে পড়বে।” তাঁর এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, মজলিস ত্যাগ করার পর যদি উভয়ে একই দিকে চলতে থাকে, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না। অর্থাৎ শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বে চুক্তি বাতিল হবে না। উল্লেখ্য, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.), আল্লামা যায়লাযী (র.) ও আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এ হাদীসটি হাদীসের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে মাযসুতে পূর্ণ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ أَبِي جَبَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَسَمَرٍ فَقُلْتُ : إِنَّا نَقْدِمُ أَرْضَ الشَّامِ وَمَعَنَا الْوَرَقُ الْتَائِفَةُ وَعِنْدَهُمُ الْوَرَقُ الْغَفَالُ الْكَاسِدَةُ فَنَبْتَاعُ وَرَقَهُمُ الْعَسَمَرُ يَنْسَعِفُ وَيَصِفُ فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ بَعْ وَرَقَكَ بِدَهَبٍ وَاشْتَرِ وَرَقَهُمْ بِالذَّهَبِ وَلَا تَفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوِفَى وَإِنْ وَثَبَ عَنْ سَطْحٍ فِثَبَ مَعَهُ .

قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُعْتَبَرُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ‘বায় সলম’ [দাদন-ফিজি]-এর ক্ষেত্রে যে, ‘রা’ সুল মাল’ [মূলধন] চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা শর্ত’ সে ক্ষেত্রেও পৃথক হওয়ার অর্থ হচ্ছে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া, যেহেতু আমরা এখানে উল্লেখ করলাম। যেমন— কেউ যদি কারো নিকট হাতে এক হাজার টাকায় পাঁচ মণ ধান এভাবে ক্রয় করে যে, ক্রেতা এখন মূল্য দিবে আর বিক্রেতা হয় মাস পরে ধান দিবে তাহলে এ চুক্তিটি হলো ‘বায় সলম’। আর প্রদেয় এক হাজার টাকা হচ্ছে ‘রা’ সুল মাল’। আর ‘রা’ সুল মাল’ চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা শর্ত। তবে পৃথক হওয়ার অর্থ হবে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া; শুধু কথাবার্তা শেষ করার মাধ্যমে পৃথক হওয়া নয়।

قَوْلُهُ يَخْلَافُ خِيَارَ الْمُحَيَّرَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার প্রদান করে, তাহলে এ ইচ্ছাধিকার কেবল ইচ্ছাধিকার প্রদানের মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্ত্রী যদি মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ায় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কিংবা উক্ত মজলিসেই যদি অন্য কারো সে আখনিয়োগ করে, তাহলেও বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে স্বামী থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছাধিকার থাকে না। এ ক্ষেত্রে বিধানটি ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হলো, স্বামী প্রদত্ত তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার স্ত্রী যদি তালাক গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাহলেই বাতিল হয়ে যায়। আর মজলিস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ানো কিংবা অন্য কোনো কাজে আখনিয়োগ করা তালাক গ্রহণে অনীহা প্রকাশ বলে গণ্য হয়। সুতরাং মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ালেই উক্ত ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যায়।

وَأَنَّ بَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ جَارَ التَّفَاضُلِ لِعَدَمِ الْمَجَانَسَةِ وَ وَجَبَ التَّقَابُضُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّهَبُ بِالنُّورِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ، فَإِنْ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعَوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ، وَهُوَ الْقَبْضُ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَلَا الْأَجَلُ، لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا لَا يَبْقَى الْقَبْضُ مُسْتَحِقًّا، وَبِالثَّانِي يَفُوتُ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ، إِلَّا إِذَا اسْقَطَ الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ فَيَعُودُ إِلَى الْجَوَازِ لِارْتِفَاعِهِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ، وَفِيهِ خِلَافٌ زُفَرَ (رح).

অনুবাদ : আর যদি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, তাহলে কমবেশি করা জায়েজ হবে। কেননা, সমশ্রেণীতার শর্ত বিদ্যমান নেই। তবে পরস্পরে হস্তগত করা আবশ্যক হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন— “রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় রিবা [সুদ] হবে, যদি হাতে হাতে হস্তগত করা না হয়।” যদি ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে উভয় বিনিময়দ্রব্য কিংবা দ্রব্যদ্বয়ের একটি হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, হস্তগত করার শর্তটি বিদ্যমান নেই। এ কারণেই ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে ইচ্ছাদিকারের শর্ত এবং মেয়াদের শর্ত আরোপ জায়েজ নয়। কেননা, এ দুটির একটির কারণে [অর্থাৎ ইচ্ছাদিকারের কারণে] হস্তগত করার অধিকার থাকে না, আর দ্বিতীয়টি তথা মেয়াদ নির্ধারণের কারণে [চুক্তির দ্বারা সাব্যস্ত] হস্তগত করার অধিকার রহিত হয়ে যায়। তবে যদি মজলিসেই ইচ্ছাদিকারের শর্ত বাতিল করে দেওয়া হয়, তাহলে চুক্তিটি বৈধতায় ফিরে আসবে। কেননা, বাতিল হওয়ার কারণ ‘স্থিত’ হওয়ার পূর্বেই দূরীভূত হয়ে গেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْحُجَّةُ : قَوْلُهُ وَأَنَّ بَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ جَارَ التَّفَاضُلِ : মাসআলা : যদি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, অর্থাৎ এক পক্ষে পরিমাপে কম আর অপর পক্ষে বেশি হলে তা জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী (جنس) ভিন্ন। আর ‘রিবা’ পরিস্ফেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হয়, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

الْحُجَّةُ : قَوْلُهُ وَ وَجَبَ التَّقَابُضُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّهَبُ بِالنُّورِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, কিন্তু পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের দ্রব্য হস্তগত করা এ ক্ষেত্রেও আবশ্যক হবে। এর দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণী— “رِبَاٌ الذَّهَبُ بِالنُّورِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ” “রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় ‘রিবা’ [সুদ] হবে যদি ‘তুমি এই নাও আর তুমি এই নাও’ এভাবে না হয় [অর্থাৎ নগদ আদান-প্রদান করা না হয়]।” উল্লেখ্য, এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিনতার সকল গ্রন্থে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ—

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالنُّورِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ، وَالنُّعْمُ بِالنُّعْمِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ، وَالنُّعْمُ بِالنُّعْمِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ، وَالنُّعْمُ بِالنُّعْمِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ.



قَوْلُهُ فَإِنِ انْتَرَفَا فِي الصَّرَبِ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা শর্ত। সুতরাং যদি চুক্তিকারীদ্বয় উভয় পক্ষের কিংবা কোনো এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে পরস্পরে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, 'বায় সরফ' চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তা সহীহ হিসেবে বহাল থাকার জন্য শর্ত ছিল উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা। কাজেই যখন শর্তটি পাওয়া যায়নি তখন সম্পাদিত হওয়ার পর চুক্তিটি আবার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِهَذَا لَا يَصَحُّ شَرْطُ الْخَبَارِ فِيهِ وَلَا الْأَخْلُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ কারণেই অর্থাৎ চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় দ্রব্য হস্তগত করার শর্তটি পূরণ না হলে যে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এ কারণেই 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে 'খিয়ারে শর্ত' [চিন্তাভাবনা করে দেখার ইচ্ছাধিকার] এবং বাকির বিক্রয় সহীহ হয় না। 'খিয়ারে শর্ত'-এর সুরত হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের কোনো একজন বলল, আমি এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, আমার তিন দিন চিন্তাভাবনা করে দেখার সুযোগ থাকবে। আর বাকি বিক্রয়ের সুরত হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের কোনো একজন বলল, আমি তোমার দিরহামগুলো পাঁচ দিনার দিয়ে ক্রয় করলাম তবে এ পাঁচ দিনার এক মাস পরে পরিশোধ করব।

এ দুটি সুরত জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে যদি কোনো এক পক্ষের 'খিয়ারে শর্ত' থাকে, তাহলে অপর পক্ষের দ্রব্য তার হস্তগত করার অধিকার থাকে না। অথচ 'বায় সরফ'-এর জন্য নগদ হস্তগত করা শর্ত। সুতরাং এ শর্ত বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

আর বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যখন মেয়াদ উল্লেখ করা হয়, তখন চুক্তির কারণে যে হস্তগত করার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছিল তা পুনরায় বাতিল হয়ে যায়। কেননা, মেয়াদ হচ্ছে নগদ হস্তগত করার বিপরীত। ফলে এ ক্ষেত্রেও 'বায় সরফ'-এর শর্ত বিনষ্ট হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে خِبَارُ الرُّؤْيَةِ [দেখার পর অপছন্দ হওয়ার কারণে চুক্তি প্রত্যাহার করার ইচ্ছাধিকার] এবং خِبَارُ غَيْبٍ [ক্রটিযুক্ত হওয়ার কারণে চুক্তি প্রত্যাহার করার ইচ্ছাধিকার] সাব্যস্ত হবে। কেননা, এ দুটি ইচ্ছাধিকার নগদ হস্তগত করার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না। তবে خِبَارُ الرُّؤْيَةِ কেবল এ দ্রব্যে সাব্যস্ত হবে যা নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়। আর যা নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না তাতে সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا اسْتَطَّ الْعِبَارُ نَى السَّجَلِ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এখানে বলা হচ্ছে যে, তবে খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে 'বায় সরফ'-এর চুক্তি সম্পাদন করার পর চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তির মজলিসে থাকাবস্থায় যদি যার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' ছিল সে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে চুক্তিটি তাত্ক্ষণিকভাবে কার্যকর করে দেয়, তাহলে আবার চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.) মতবিরোধ করেন। তাঁর মতে উক্ত সুরতে চুক্তিটি আর জায়েজ হবে না।

আমাদের দলিল হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি বাতিল হওয়ার যে কারণটি ছিল অর্থাৎ 'খিয়ারে শর্ত' তা সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বেই আবার দূর হয়ে গেছে। কেননা, যদি চুক্তিকারীদ্বয় মজলিসে ত্যাগ করে চলে যেত তাহলে তা সুদৃঢ় হয়ে যেত। আর যখন মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে 'খিয়ারে শর্ত' প্রত্যাহার করে নিয়েছে তখন তা সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বে দূরীভূত হয়ে গেছে। কাজেই চুক্তিটি আবার বৈধতায় ফিরে আসবে।

আর ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হচ্ছে, 'খিয়ারে শর্ত'-এর কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে। আর যা একবার বাতিল হয় তা আর সহীহ হতে পারে না। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলটি হচ্ছে কিয়াস। আর আমাদের দলিলটি হচ্ছে 'ইসতিহাসান' বা বাহ্যিক কিয়াসের বিপরীতে সূক্ষ্ম কিয়াস।

উল্লেখ্য, বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই বিধান ও একই মতবিরোধ। অর্থাৎ বাকিতে 'বায় সরফ'-এর চুক্তি সম্পাদন করার পর যদি চুক্তিকারীদ্বয় মজলিসে থাকাবস্থায় বাকির মেয়াদ বাতিল করে দিয়ে চুক্তিটি নগদ করে নেয়, তাহলে চুক্তিটি আবার সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সহীহ হবে না।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَ ذِينَارًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقْبِضِ الْعَشْرَةَ حَتَّى اشْتَرَى بِهَا ثَوْبًا فَلْيَبِيعَ فِي الثَّوْبِ قَابِضًا، لِأَنَّ الْقَبْضَ مُسْتَحِقٌّ بِالْعَقْدِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَفِي تَجْوِيزِهِ قَوَاتُهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْعَقْدُ فِي الثَّوْبِ كَمَا نَقَلَ عَنْ زُفَرٍ (رح) لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَتَعَيَّنُ فَيَنْصَرِفُ الْعَقْدُ إِلَى مُطْلَقِهَا، وَلَكِنَّا نَقُولُ الثَّمَنُ فِي بَابِ الصَّرْفِ مَبْنِيٌّ، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَدُ لَه مِنْهُ، وَلَا شَيْءَ سِوَى الثَّمَنِ فَيَجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبْنِيًّا لِعَدَمِ الْأَوَّلِيَّةِ، وَيَبِيعُ الْمَبْنِيَّ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ كَوْنِهِ مَبْنِيًّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَيِّنًا كَمَا فِي الْمُسْلِمِ فِيهِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, হস্তগত করার পূর্বে 'সরফ'-এর মূল্যের মাঝে অধিকার চর্চা জায়েজ নয়। সুতরাং যদি কেউ দশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিক্রয় করে, অতঃপর রৌপ্যমুদ্রা দশটি হস্তগত করার পূর্বেই তা দ্বারা একটি কাপড় ক্রয় করে তাহলে কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি ফাসদ হবে। কেননা, [রৌপ্যমুদ্রাগুলো] হস্তগত করা আল্লাহ তা'আলার হুকুম হিসেবে চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যিক হয়েছে। অতএব, কাপড়ের চুক্তিকে বৈধতা দেওয়া হলে আল্লাহর হুকুমটিকে বিনষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি [কিয়াসের দাবি অনুসারে] বৈধ হওয়ারই কথা ছিল। ইমাম যুফার (র.) থেকে একরূপ বর্ণিতও রয়েছে। কেননা, রৌপ্যমুদ্রা নির্ধারণযোগ্য বস্তু নয় [কেননা, মুদ্রা নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হয় না]। সুতরাং কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি অনির্দিষ্ট রৌপ্যমুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত হবে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে মুদ্রাদ্রব্যই বিক্রয়দ্রব্য [মবী'] হিসেবে গণ্য হয়। কেননা, বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রয়বস্তু থাকা আবশ্যিক। আর 'বায় সরফ'-এর মাঝে [উভয় পক্ষে] মুদ্রাদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু নেই। কাজেই কোনো পক্ষের মুদ্রার অধিকার না থাকার কারণে উভয় পক্ষের মুদ্রাকেই বিক্রয়বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। আর হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয়বস্তু [পুনরায়] বিক্রয় করা জায়েজ নয়। আর বিক্রয়বস্তু হওয়ার জন্য 'নির্দিষ্ট বস্তু' হওয়া অপরিহার্য নয়। যেমন- 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দানদ্রব্য [অনির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তা বিক্রয়দ্রব্য]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ الخ অর্থঃ 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয়। আলোচ্য ইবারতে ثَمَنِ الصَّرْفِ দ্বারা উভয় পক্ষের দ্রব্যই উদ্দেশ্য। কেননা, 'বায় সরফ'-এ উভয় পক্ষের দ্রব্যই হচ্ছে ثَمَنٌ বা মুদ্রাদ্রব্য। সুতরাং কোনো পক্ষের দ্রব্যই হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা জায়েজ হবে না। অধিকার চর্চা হচ্ছে যেমন- তা হস্তগত করার পূর্বে কারো নিকট বিক্রয় করা, কাউকে দান করে দেওয়া, কাউকে সদ্কা করে দেওয়া ইত্যাদি।

এ বিধানের উপর ভিত্তি করে একটি মাসআলা হলো : কেউ যদি দশ দিরহামের বিনিময়ে একটি দিনার বিক্রয় করে, অতঃপর দিনার বিক্রোতাপর পক্ষের নিকট হতে দশ দিরহাম হস্তগত না করে তার বিনিময়ে দিরহামের মালিক হতে একটি কাপড় ক্রয় করে, তাহলে কাপড়ের ক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَأَكْفِيَنَّكَ الْقَيْصَ مُسْتَجِبٌ بِالْعَقْدِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى الْخ : উক্ত মাসআলার দলিল হলো, 'বায় সরফ'-এর চুক্তির কারণে উভয়ের দ্বাা উভয়ে হস্তগত করা শর্ত। আর এ শর্তটি আদ্বাহ তা'আলার হক হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে- চুক্তিকারীদের কারো হক হিসেবে নয়। এ কারণেই চুক্তিকারীদের যদি নগদ হস্তগত করার ব্যাপারে সম্মত হয়, তাহলেও তা জায়েজ হয় না। সুতরাং যদি কাপড়ের বিক্রয়চুক্তি জায়েজ করা হয়, তাহলে দিনারের মালিকের উপর যে দশ দিরহাম নগদ হস্তগত করা ওয়াজিব ছিল তা বাস্তবায়ন হবে না। আদ্বাহ তা'আলার হক হিসেবে যে শর্ত সাব্যস্ত হয়েছিল তা বাতিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। কাজেই নগদ হস্তগত করার শর্তটি বহাল রাখার জন্য কাপড়ের বিক্রয়চুক্তি বাতিল সাব্যস্ত করা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ وَكَانَ يَتَبَيَّنُ أَنْ يَحْزُرَ الْعَقْدُ فِي الثَّوْبِ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিয়াসের দাবি অনুসারে কাপড়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হওয়ার কথা ছিল। একটি বর্ণনা মতে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে বিধানও তাই, অর্থাৎ কাপড়ের বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে।

কিয়াসের দাবি অনুসারে জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুদ্রা তথা দিরহাম-দিনার নির্দিষ্ট করা হলেও তা নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; বরং তা জিম্মায় অনির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই কেউ যদি কোনো বস্তু ক্রয়করা বলে যে, আমি এ দশ দিরহামের বিনিময়ে তোমার এ বস্তুটি ক্রয় করলাম, তাহলে তার ঐ দশ দিরহামই দেওয়া আবশ্যক নয়; বরং যে কোনো দশটি দিরহাম সে দিতে পারে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দিনার বিক্রয়কারী তার প্রাপ্য দশ দিরহামের বিনিময়ে যখন কাপড়টি ক্রয়ের চুক্তি করেছে তখন চুক্তি তার প্রাপ্য দশ দিরহামের সাথে নির্দিষ্ট না হয়ে অনির্দিষ্টভাবে দশ দিরহামের সাথে সম্পর্কিত হবে। সুতরাং দিনারের বিনিময়ে তার প্রাপ্য দশ দিরহাম সে হস্তগত করে নিবে আর কাপড়ের বিনিময়ে ভিন্নভাবে দশ দিরহাম পরিশোধ করবে। এভাবে কাপড়ের চুক্তি কিয়াস অনুসারে জায়েজ হওয়ার কথা। আর এটিই এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত।

قَوْلُهُ وَلَكِنَّا نَقُولُ لَلثَمَنُ فِي بَابِ الصَّرْفِ مَبْنِعُ الْخ : উক্ত কিয়াসের জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে মুদ্রা হলেও তাকে বিক্রয়দ্রব্য (مَبْنِع) হিসেবে ধরতে হবে। কেননা, যে কোনো বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রয়দ্রব্য থাকা আবশ্যক। 'বায় সরফ'-এ যেহেতু উভয় পক্ষে মুদ্রাদ্রব্য তাই কোনো এক পক্ষের দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান না থাকায় উভয় পক্ষের দ্রব্যকেই বিক্রয়দ্রব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দিনার বিক্রয়কারীর প্রাপ্য দশ দিরহাম বিক্রয়দ্রব্য হিসেবে সাব্যস্ত হলো। অতঃপর কাপড়ের বিনিময়ে উক্ত দশ দিরহাম নির্ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, উক্ত দশ দিরহামকে হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা। আর এ বিধান পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রয়দ্রব্য যদি স্থানান্তরযোগ্য বস্তু (مَنْقُولِي شَيْءٍ) হলে তা হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয়। সুতরাং উক্ত দশ দিরহামের বিনিময়ে কাপড়ের ক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে না। কেননা, এতে স্থানান্তরযোগ্য বস্তু (مَنْقُولِي شَيْءٍ) ক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বেই তাতে অধিকার চর্চা করা হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ كَوْنُهُ مَبْنِعًا أَنْ يَحْزُرَ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি 'বায় সরফ'-এ উভয় পক্ষের দ্রব্যকে বিক্রয়দ্রব্য (مَبْنِع) ধরা হয়, তাহলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। কেননা, বিক্রয়দ্রব্য সর্বদা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অতঃপর দিরহাম দিনার তো নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিক্রয়দ্রব্য হলেই নির্দিষ্ট হতে হবে এ কথাটি সঠিক নয়; বরং অনির্দিষ্ট হয়েও বিক্রয়দ্রব্য (مَبْنِع) হতে পারে। যেমন- 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনদ্রব্য [মুসলামা ফীহ]। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি কারো নিকট এক হাজার টাকার এ শর্তে পাঁচ মণ ধান বিক্রয় করে যে, টাকা এখন দিবে আর ধান ছয় মাস পরে দিবে, তাহলে এটি হলো 'বায় সলম'। আর পাঁচ মণ ধান হলো 'মুসলামা ফীহ'। এ ক্ষেত্রে এ পাঁচ মণ ধান নির্দিষ্ট নয়; বরং শর্ত মোতাবেক যে কোনো পাঁচ মণ ধান সে পরিশোধ করবে। আর এই পাঁচ মণ ধান হচ্ছে সকলের মতে বিক্রয়দ্রব্য (مَبْنِع)। কাজেই দেখা গেল যে, বিক্রয়দ্রব্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বস্তু হওয়া অপরিহার্য নয়। সুতরাং 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে দিরহাম বা দিনার অনির্দিষ্ট বস্তু হওয়া সত্ত্বেও তা 'বিক্রয়দ্রব্য' হিসেবে গণ্য হতে পারবে।

উল্লেখ্য, আদ্বামা ইবনে হুদাম (র.) এ জবাবটি দুর্বল বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর দুর্বলতা বর্ণনা করার পর লিখেছেন-

وَعَلَىٰ هَذَا قِسْطَانِ بَيْعِ الثَّوْبِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ جَوَابُ الْمَذْعَبِ مُشْكِرٌ

-[ফাতহুল কাদীর]

وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِصَّةِ مُجَازَفَةً، لِأَنَّ الْمَسَاوَاةَ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ فِيهِ، وَلَكِنْ  
يُسْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِمَا ذَكَرْنَا، بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِجَنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيهِ  
مِنْ اخْتِمَالِ الرِّبَا -

অনুবাদ : আর অনুমানের ভিত্তিতে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এক্ষেত্রে সমতা বন্ধ করা শর্ত নয়। তবে আমাদের পূর্বোক্তির কারণে (উভয় দ্রব্য) মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হবে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্য তার সমশ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ তা জায়েজ হবে না]। কেননা, তাতে রিবা [সুদ] হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ الْح:

মাসআলা : যদি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হয় তাহলে পরিমাপ করে বিক্রয় করা আবশ্যিক নয়; বরং অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করাও জায়েজ। কেননা, উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী যদি ভিন্ন হয় তাহলে সমান সমান করে বিক্রয় করা শর্ত নয়। এর দলিল হচ্ছে, হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত ‘রিবা’ সংক্রান্ত হাদীস, যার শেষাংশে নবী করীম ﷺ বলেছেন- “أَرَأَيْتَ إِنْ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَمْثَالُ كَيْفَ عُرِفَتْ شَيْئًا إِذَا كَانَ بِدَا بَيْدٍ - “আর যদি [বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] এ সকল দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় করতে পার, [এ শর্তে যে], যদি তা হাতে হাতে আদান-প্রদান করা হয়।” [এ হাদীসটি আমরা বিস্তারিতভাবে ‘রিবা’র পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি।] সুতরাং উভয় পক্ষের দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হলে যেহেতু সমান সমান করে বিক্রয় করা আবশ্যিক নয় সেহেতু অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করায় কোনো বাধা রইল না। কাজেই তা জায়েজ হবে। কিন্তু আলোচ্য সুরতেও চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা অপরিহার্য হবে। এর নকলী ও আকলী দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নকলী দলিল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বে উল্লিখিত হাদীস- “وَمَا - الذَّهَبُ بِالزُّرِّيِّ رِبَاٌ إِلَّا هَا وَهََا -” রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় ‘রিবা’ [সুদ]-এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি ‘তুমি এই নাও আর তুমি এই নাও’ এভাবে আদান প্রদান করা না হয় অর্থাৎ নগদ হাতে হাতে আদান-প্রদান করা না হয়।”

قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِجَنْسِهِ مُجَازَفَةً الْح: পক্ষান্তরে উভয় পক্ষের দ্রব্য যদি একই শ্রেণীর হয়, যেমন- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য যদি বিক্রয় করা হয়, তাহলে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হারাম হবে। বাস্তবে যদি উভয় পক্ষের দ্রব্য সমানও হয় তবু বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তিকালে এ ব্যাপারে জানতে হবে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনে সমান সমান আছে। এর কারণ হচ্ছে, অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হলে তখন সম্ভাবনা থাকে যে, কোনো পক্ষের দ্রব্য ওজনে বেশি হবে। আর পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ‘রিবা’ [সুদ]-এর ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় বিষয় কিংবা সন্দেহযুক্ত বিষয় বাস্তব বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই বেশি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে বিক্রয় হারাম হবে, যদিও তা বাস্তবে সমান সমান হয়। তাছাড়া নবী করীম ﷺ যে বিক্রম জায়েজ হওয়ার জন্য সমান সমান হওয়ার শর্ত সাব্যস্ত করেছেন, এ সমান সমান হওয়ার অর্থ অবশ্যই এটা হবে না যে, আল্লাহ তা’আলার জ্ঞান অনুসারে সমান সমান। কেননা, আল্লাহ তা’আলার নিকট সমান সমান কিনা তা বান্দার জানার উপায় নেই; বরং এ অর্থ হবে যে, চুক্তিকারীদ্বয়ের জ্ঞান অনুসারে সমান সমান হতে হবে। সুতরাং অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয়কালে যেহেতু চুক্তিকারীদ্বয় সমান সমান হয়েছে কিনা তা জানতে পারেনি, সেহেতু বিক্রয় জায়েজ হবে না।

উল্লেখ্য, অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করার পর যদি মজলিসে থাকাবস্থায় চুক্তিকারীদ্বয় উভয় পক্ষের দ্রব্য মেপে জানতে পারে যে, তা সমান সমান তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, মজলিসের পূর্ণ সময়কে একই মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। কাজেই যেন তারা চুক্তিকালেই সমান সমান হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরেছে, কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে মজলিসের পরেও যদি তারা মেপে জানতে পারে যে, উভয় দ্রব্য সমান তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। তাঁর মতে বাস্তবে সমান সমান হওয়া শর্ত, বিক্রয়কালে চুক্তিকারীদ্বয়ের জ্ঞান শর্ত নয়।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً قِيمَتَهَا أَلْفَ مِثْقَالٍ فِصَّةٍ ، وَفِي عَنْقِهَا طَوْقٌ فِصَّةٍ قِيمَتُهُ أَلْفَ مِثْقَالٍ يَأْتِي مِثْقَالُ فِصَّةٍ ، وَنَقَدَ مِنَ التَّمَنِ أَلْفَ مِثْقَالٍ ، ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَتُ ذِي نَقَدٍ تَمَنَ الْفِصَّةِ ، لِأَنَّ قَبْضَ حِصَّةِ الطَّوْقِ وَاجِبٌ فِي الْمَجْلِسِ لِكُونِهِ بَدَلُ الصَّرْفِ ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِتِّبَانُ بِالْوَجِبِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا بِأَلْفَى مِثْقَالٍ أَلْفَ نِيسِنَةٍ وَأَلْفَ نَقَدٍ فَالْتَّقَدُّ تَمَنَ الطَّوْقِ ، لِأَنَّ الْأَجَلَ بَاطِلٌ فِي الصَّرْفِ جَائِزٌ فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ ، وَالْمَبَاشَرَةُ عَلَى وَجْهِ الْجَوَازِ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কেউ যদি দুই হাজার মিছকাল রৌপ্যের বিনিময়ে এমন একটি দাসী বিক্রয় করে যার বাজারমূল্য এক হাজার মিছকাল রৌপ্য, আর তার গলায় একটি হার রয়েছে যার বাজারমূল্য এক হাজার মিছকাল রৌপ্য, আর ক্রেতা মূল্য থেকে এক হাজার মিছকাল নগদ প্রদান করার পর তারা উভয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে যা নগদ পরিশোধ করেছে তা রূপার [হারের] মূল্য ধরা হবে। কেননা, হারের মূল্য সরফ-এর চুক্তিতে বিনিময়দ্রব্য হওয়ার কারণে মজলিসেই হস্তগত করা ওয়াজিব। আর স্বাভাবিক এটাই যে, ক্রেতা ওয়াজিবই আদায় করেছে। এরূপভাবে যদি উক্ত দাসী ও তার গলার হার এক হাজার নগদ ও এক হাজার বাকি এ দু হাজার মিছকালের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে নগদ এক হাজার হারের মূল্য ধরা হবে। কেননা, 'সরফ'-এর চুক্তিতে মেয়াদ নির্ধারণ করা বাতিল, কিন্তু দাসী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েজ। আর বৈধ পন্থায় চুক্তি সম্পাদন করাই হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয়ের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক বিষয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً قِيمَتَهَا أَلْفَ مِثْقَالٍ الْخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ যদি একটি দাসী তার গলার এক হাজার মিছকাল ওজনের একটি রৌপ্যের হারসহ দু হাজার মিছকাল রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা কেবল এক হাজার মিছকাল রৌপ্য নগদ হস্তান্তর করার পর তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তাহলে বিধান হলো, বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

আলোচ্য মাসআলায় দু হাজার মিছকাল থেকে এক হাজার মিছকাল হচ্ছে দাসীটির গলার হারের মূল্য, এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে রৌপ্য হওয়ার কারণে এটি 'বায় সরফ', তাই এ হাজার মিছকাল নগদ হস্তান্তর করা অপরিহার্য। আর অবশিষ্ট এক হাজার মিছকাল হচ্ছে দাসীটির মূল্য। এটি 'বায় সরফ' না হওয়ার কারণে এ এক হাজার মিছকাল নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য নয়। সুতরাং ক্রেতা যখন এক হাজার মিছকাল নগদ হস্তান্তর করেছে এবং তা দাসীটির মূল্য হিসেবে দিয়েছে নাকি হারটির মূল্য হিসেবে দিয়েছে তা উল্লেখ করেনি তখন ধরে নেওয়া হবে যে, সে নগদ এক হাজার হারের মূল্য হিসেবে পরিশোধ করেছে। কেননা, হারের মূল্য নগদ পরিশোধ করা হচ্ছে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য অপরিহার্য, আর দাসীর মূল্য নগদ পরিশোধ করা অপরিহার্য নয়। আর স্বাভাবিকভাবে এটাই ধরে নেওয়া হবে যে, যা তার জন্য অপরিহার্য সে তাই করেছে। কেননা, চুক্তিকারী চায় তার চুক্তিটি সহীহ হোক, বাতিল না হোক।

উল্লেখ্য, যদি ক্রেতা এক হাজার মিছকাল দেওয়ার সময় এভাবে বলে যে, 'তুমি দুটির মূল্য থেকে নগদ এ এক হাজার মিছকাল গ্রহণ কর' তাহলেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং প্রদত্ত এক হাজার হারের মূল্য ধরা হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে যে, 'দাসীর মূল্য হিসেবে এ এক হাজার গ্রহণ কর' তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, স্বাভাবিক হিসেবে (ظاهراً) যা ধরা যেত সে স্পষ্টভাবে তার বিপরীত উল্লেখ করে দিয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا بِأَلْفَى مِثْقَالٍ الْخ : পূর্বের মাসআলায় উল্লিখিত দাসী ও তার গলার হার যদি ক্রেতা দু হাজার মিছকাল রৌপ্যের বিনিময়ে এ শর্তে ক্রয় করে যে, এক হাজার মিছকাল নগদ আর এক হাজার মিছকাল বাকি তাহলেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং নগদের শর্তটি হারটির ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে আর বাকির শর্তটি দাসীর ক্ষেত্রে ধরা হবে।

কেননা, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হারটির বিক্রয় হচ্ছে 'বায় সরফ'। আর 'বায় সরফ' বাকি জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে দাসীটির বিক্রয় যেহেতু 'বায় সরফ'-এর অন্তর্ভুক্ত নয় সেহেতু তা বাকি বিক্রয় জায়েজ। অতএব, যদি নগদের শর্তটি হারের ক্ষেত্রে না ধরে দাসীর ক্ষেত্রে ধরা হতো তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর হারের ক্ষেত্রে ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর ক্রেতা-বিক্রেতার এটাই কামা হয় যে, তাদের চুক্তিটি সঠিক হবে। সুতরাং যেভাবে ধরা হলে চুক্তিটি জায়েজ হয় সেভাবেই তারা শর্ত করেছে এটাই স্বাভাবিক হবে। কাজেই নগদের শর্তটি হারের ক্ষেত্রে সার্বভূমি হয়ে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হয়ে যাবে।

وَكَذَلِكَ لَوَبَّاعٌ سِفْنَا مُحَلَّى بِمَانَةِ ذَرَمِهِ وَحَلِيَّتُهُ خَمْسُونَ، وَدَفَعَ مِنَ الثَّمَنِ خَمْسِينَ جَارَ الْبَيْعِ، فَكَانَ الْمَقْبُوضُ حَصَّةَ الْفِضَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَبَيِّنْ ذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهَا، لِأَنَّ الْإِثْنَيْنِ قَدْ يُرَادُ بِذِكْرِهِمَا الْوَاحِدُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ، وَالْمَرَادُ أَحَدُهُمَا، فَيَحْمَلُ عَلَيْهِ بِظَاهِرِ حَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحَلِيَّةِ، لِأَنَّهُ صَرَّفَ فِيهَا وَكَذَا فِي السَّيْفِ إِنْ كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ إِلَّا بِضَرِّهِ، لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ تَسْلِيمَهُ بِدُونِ الضَّرْرِ.

**অনুবাদ :** এরূপভাবে কেউ যদি রূপার কারুকাজ খচিত তলোয়ার একশত দিরহামে বিক্রয় করে, আর তার খচিত রূপার পরিমাণ পঞ্চাশ দিরহাম হয়, আর ক্রেতা নগদ পঞ্চাশ দিরহাম পরিশোধ করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা উল্লেখ করে না দিলেও হস্তগতকৃত দিরহামগুলো খচিত রূপার মূল্য ধরা হবে। এর কারণও তাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। একই বিধান হবে যদি ক্রেতা [এভাবে] বলে যে, উভয়ের মূল্য থেকে এ পঞ্চাশ দিরহাম গ্রহণ কর। কেননা, [আরবি ভাষায়] কখনো কখনো দুটি উল্লেখ করে [তাদের] একটি উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-“সমুদ্র দুটি থেকে মুক্তা ও মারজান বের হয়।” অথচ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সমুদ্র থেকে [অর্থাৎ ‘নোনা পানির সমুদ্র থেকে।’ কেননা, মিঠা পানির সমুদ্রে মুক্তা হয় না]। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ‘উভয়ের’ কথাটি ‘উভয়ের একটির’ অর্থে ধরে নেওয়া হবে। যদি উভয়ে তাদের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে খচিত রূপার অংশে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, রূপার অংশে চুক্তিটি ‘বায় সরফ’। তদ্রূপ যদি সংযুক্ত রূপা থেকে মূল তরবারি কোনোরূপ ক্ষতিসাধন ছাড়া পৃথক করা সম্ভব না হয়, তাহলে তরবারির অংশও বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন ছাড়া বিক্র্যেতা তরবারিটি হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خَوَّلَهُ وَكَذَلِكَ لَوَبَّاعٌ سِفْنَا مُحَلَّى: পূর্বের মাসআলার অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হচ্ছে- কেউ একশত দিরহামের বিনিময়ে এমন একটি তরবারি বিক্রয় করল যাতে পঞ্চাশ দিরহাম সমপরিমাণ রৌপ্য সংযুক্ত রয়েছে। অতঃপর ক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বে কেবল পঞ্চাশ দিরহাম নগদ হস্তান্তর করল, কিন্তু সে এ কথা উল্লেখ করেনি যে, এ পঞ্চাশ দিরহাম কি তরবারির সাথে সংযুক্ত রৌপ্যের মূল্য নাকি শুধু তরবারিটির মূল্য নাকি উভয় অংশের মূল্য। তাহলে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং নগদ যে পঞ্চাশ দিরহাম হস্তান্তর করেছে তা সংযুক্ত রৌপ্যের মূল্য ধরা হবে। এ ক্ষেত্রে জায়েজ হওয়ার কারণ তাই, যা আমরা এর পূর্বের মাসআলায় উল্লেখ করেছি। যার সারকথা হলো, সংযুক্ত রৌপ্যের অংশের বিক্রয় হচ্ছে ‘বায় সরফ’। কাজেই তার মূল্য নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য। আর তরবারির অংশটির বিক্রয় ‘বায় সরফ’ না হওয়ার কারণে তার মূল্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যিক নয়। সুতরাং ক্রেতা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য যা অপরিহার্য তাই করেছে, এটাই স্বাভাবিক হিসেবে ধর্তব্য হবে।

خ : قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ خَذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ تَيْنِهِمَا الْخ : আর যদি ক্রেতা নগদ পঞ্চাশ দিরহাম দেওয়ার সময় উল্লেখ করে বলে যে, 'উভয়ের মূল্য থেকে এই পঞ্চাশ দিরহাম গ্রহণ কর' তাহলেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং প্রদত্ত পঞ্চাশ দিরহাম রৌপ্যের অংশের মূল্যই ধরা হবে। এর কারণ হলো, দুটি উল্লেখ করে বক্তার তন্নাখ্য থেকে একটি উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- আদ্বাহ তা'আলার বাণী- الْكُلُّ وَالنَّارُجَانُ - "إِذَا سَأَرْتَنَا فَأَذِنًا وَأَفِينًا" "যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমরা দু-জনে আজান দিবে এবং ইক্বামাত বলবে।" এখানে উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের একজন আজান দিবে এবং ইক্বামাত বলবে। এরূপ ব্যবহার মানুষের কথাবার্তায় সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং যখন দুটি উল্লেখ করে তন্নাখ্য একটি উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যবহার রয়েছে তখন আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতার উক্তি 'উভয়ের মূল্য থেকে'-এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ধরা হবে একটির মূল্য, আর তা হচ্ছে 'রৌপ্যের অংশের মূল্য'। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য হয় চুক্তিটি সঠিক হওয়া। কাজেই যে অর্থে চুক্তিটি সঠিক হয় সে অর্থ সম্ভাব্য হলে তাই ধর্তব্য হবে।

خ : قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত সূরতে যদি রৌপ্যের অংশের মূল্য হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হয়ে যায় তাহলে রৌপ্যের অংশের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর রৌপ্য ব্যতীত অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি অবশিষ্ট অংশ রৌপ্যের অংশ থেকে পৃথক করতে ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে অবশিষ্ট অংশের বিক্রয়ও বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করা ব্যতীত উভয় অংশ পৃথক করা সম্ভব হয়, তাহলে অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় সही থাকবে আর রৌপ্যের অংশের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

خ : قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَرَفَ فِيهَا الْخ : রৌপ্যের অংশের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, রৌপ্যের অংশের বিক্রয় উভয় পক্ষে রৌপ্য হওয়ার কারণে 'বায় সরফ'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর 'বায় সরফ'-এ চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় দ্রব্য হস্তগত করা শর্ত। সুতরাং শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

خ : قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيْنُهُ بِذَوْنِ الصَّرِ : অবশিষ্ট অংশ রৌপ্যের অংশ থেকে পৃথক করতে ক্ষতি সাধিত হলে অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া অবশিষ্ট অংশ হস্তান্তর করা সম্ভব হবে না। আর যা ক্ষতিসাধন ছাড়া হস্তান্তর করা সম্ভব হয় না তা পৃথক করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়েজ হয় না। এ কারণেই বিক্রয়তা যদি এরূপ অবস্থায় উক্ত তরবারির রৌপ্যের অংশ ছাড়া শুধু অবশিষ্ট অংশের বিক্রয়চুক্তি করত, তাহলে তা জায়েজ হতো না।

وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَالْجِذْعِ فِي السَّفْفِ، وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ السَّفْفُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ النَّبْعُ فِي السَّفْفِ وَيَطْلُ فِي الْجَلْبَةِ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ إِفْرَادَهُ بِالْبَيْعِ فَصَارَ كَالطَّوِيِّ وَالْجَارِيَةِ، وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الْمُفْرَدَةُ أَزِيدَ مِمَّا فِيهِ، فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَا يَذُرَى لَا يَجُوزُ النَّبْعُ لِلرَّيْسِ أَوْ لِإِخْتِمَالِهِ، وَجِهَةُ الصَّحَّةِ مِنْ وَجْهِ وَجِهَةِ الْفَسَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ، فَتَرَجَّحَتْ -

অনুবাদ : এ কারণেই এরূপ ক্ষেত্রে তরবারিটি পৃথকভাবে [রূপার অংশ ছাড়া] বিক্রয় করা জায়েজ নয়; যেমন ঘরের চালের কড়িকাঠ [চালের সাথে যুক্ত থাকাবস্থায় বিক্রয় করা জায়েজ নয়]। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ততা ছাড়া তরবারিটি রৌপ্যের অংশ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়, তাহলে তরবারির অংশে বিক্রয়চুক্তি বৈধ থাকবে। আর খচিতি রৌপ্যের অংশে বাতিল হবে। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে তরবারিটি পৃথকভাবে বিক্রয় করা সম্ভব। কাজেই এটা বৈধতার ক্ষেত্রে দাসী ও তার গলার হারের মতো হলো। তবে এ বৈধতার বিধান তখন হবে, যখন [ক্ষেত্রে প্রদেয়] পৃথক রূপা তরবারির সাথে সংযুক্ত রূপার চেয়ে বেশি হবে। পক্ষান্তরে যদি তা তরবারির রূপার সমান হয় কিংবা কম হয় অথবা তার পরিমাণ অজানা থাকে, তাহলে 'রিবা'-এর কারণে কিংবা 'রিবা'-এর সম্ভাবনার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। আর [পরিমাণ অজানার ক্ষেত্রে] চুক্তি সঠিক হওয়ার দিক হলো একটি, আর ফাসিদ হওয়ার দিক হচ্ছে দুটি। কাজেই ফাসিদ হওয়ার দিকটি অস্বাধিকার পাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَالْجِذْعِ فِي السَّفْفِ : উক্ত সূরতের একটি উদাহরণ হলো, কেউ যদি তার ঘরের চালের সাথে সংযুক্ত থাকাবস্থায় চালের একটি কড়িকাঠ বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয় না। কেননা, উক্ত কড়িকাঠটি হস্তান্তর করতে গেলে বিক্রেতার চালের ক্ষতি সাধিত হবে। অবশ্য যদি এমন অবস্থায় থাকে যে, কড়িকাঠটি সরিয়ে নিলে কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ السَّفْفُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ : আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যদি রৌপ্যের অংশ থেকে অবশিষ্ট তরবারি পৃথক করতে কোনো ক্ষতি সাধিত না হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট তরবারিটি কোনো প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই ক্রেতাকে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা থাকছে না। এ কারণেই এরূপ সূরতে যদি বিক্রেতা কেবল অবশিষ্ট তরবারিটি বিক্রয় করে, তাহলে তা জায়েজ হয়। এ সূরতে তরবারির উভয় অংশ [রৌপ্যের অংশ ও অবশিষ্ট তরবারি] -এর বিষয়টি এর পূর্বের মাসআলায় উল্লিখিত দাসী ও তার গলার হারের মতোই হলো। সেক্ষেত্রে যেরূপ গলার হারের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার সূরতে দাসীর বিক্রয় সহীহ হিসেবে বহাল রয়েছে। সেরূপ এ ক্ষেত্রেও রৌপ্যের অংশে বিক্রয় বাতিল হওয়ার সূরতে অবশিষ্ট তরবারিতে বিক্রয় সহীহ থাকবে। কেননা, উভয় সূরতেই কারণ একই; তা হলো, একটি থেকে অপরটি পৃথক করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

قَوْلُهُ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الْمُفْرَدَةُ أَزِيدَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তরবারি বিক্রয়ের মাসআলায় আমরা যে বিস্তারিত বিধান উল্লেখ করেছি তা কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মূল্য হিসেবে ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্যের পরিমাণ তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়। কেননা, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া শর্ত। কাজেই তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য থেকে সমপরিমাণ ধরা হবে আর বেশিটুকু অবশিষ্ট তরবারির মূল্য হিসেবে ধরা। এভাবে চুক্তি জায়েজ হয়ে যাবে।



পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের চেয়ে বেশি না হয়; বরং তার সমান হয় কিংবা কম হয় অথবা এমন হয় যে সমান নাকি কম তা চুক্তিকারীদ্বয়ের জানা নেই, তাহলে সম্পূর্ণ চুক্তিটিই নাজায়েজ হবে। কেননা, প্রথম দুই সূরতে অর্থাৎ ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের সমান হলে কিংবা কম হলে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হচ্ছে। সমান হলে 'রিবা' হচ্ছে এভাবে যে, ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্যের বিনিময়ে যখন সে তরবারির সাথে যুক্ত সমপরিমাণ রৌপ্য পাচ্ছে তখন তরবারির অবশিষ্ট অংশ সে অতিরিক্ত পাচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে 'রিবা'।

আর ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য কম হলে 'রিবা' হচ্ছে এভাবে যে, ক্রেতা তার দেওয়া রৌপ্যের বিনিময়ে তার চেয়ে বেশি রৌপ্য তরবারির সাথে পাচ্ছে, উপরন্তু তরবারির অবশিষ্ট অংশও পাচ্ছে। কাজেই দুভাবে সে অতিরিক্ত পাচ্ছে। সুতরাং তা 'রিবা' [সুদ] হবে।

আর তৃতীয় সূরত অর্থাৎ ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির রৌপ্যের সমান নাকি কম তা ক্রেতা ও বিক্রেতার জানা নেই, এ সূরতে বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, এ সূরতে 'রিবা' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, যখন ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য কম নাকি বেশি তা জানা নেই তখন তা কমও হতে পারে, আবার বেশিও হতে পারে কিংবা সমানও হতে পারে। যদি তা বেশি হয় তাহলে তো 'রিবা' সাব্যস্ত হবে না, কিন্তু সমান বা কম হলে 'রিবা' সাব্যস্ত হবে, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ সূরতে 'রিবা' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, 'রিবা' [সুদ]-এর ক্ষেত্রে 'রিবা' হওয়ার সন্দেহ বা সম্ভাবনা থাকলে তা কার্যত 'রিবা' হয়েছে বলে গণ্য হয়ে বিক্রয় হারাম হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে 'রিবা'-এর সম্ভাবনা থাকার কারণে বিক্রয় হারাম হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَجْهَةُ الصَّعَةِ مِنْ وَجْهِ وَجْهَةِ الْفَسَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্যের পরিমাণ তরবারির রৌপ্যের সমান নাকি কমবেশি তা চুক্তিকারীদ্বয়ের জানা না থাকে, তাহলে তো বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কথা। কেননা, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক (الْأَصْلُ) হচ্ছে জায়েজ হওয়া। আর হারাম হয় 'রিবা' সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পক্ষে অতিরিক্ত আছে বলে জানা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম সাব্যস্ত হবে না; বরং জায়েজ হিসেবে থাকবে।

উত্তরের সারকথা হলো, না জানার সূরতে মোট তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে- ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির রৌপ্যের চেয়ে বেশি হওয়া, তার চেয়ে কম হওয়া ও উভয়টি সমান হওয়া। এ তিনটির মধ্যে একটি সূরতে অর্থাৎ বেশি হওয়ার সূরতে বিক্রয় জায়েজ আর দুটি সূরতে তথা কম ও সমান হওয়ার সূরতে বিক্রয় নাজায়েজ। সুতরাং তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে একটি হচ্ছে জায়েজ হওয়ার সূরত আর দুটিই হচ্ছে নাজায়েজ হওয়ার সূরত। অতএব, জায়েজ হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে নাজায়েজ হওয়ার সম্ভাবনার দিক বেশি হওয়ার কারণে নাজায়েজ হওয়ার দিকটি অগ্রাধিকার পাবে। কাজেই বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) যে অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন, এভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে যদি শুধু 'রিবা' হওয়ার সন্দেহ বা সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলেই বিক্রয় হারাম হয়। সুতরাং না জানার সূরতে যেহেতু 'রিবা' হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেহেতু বিক্রয় হারাম হয়ে যাবে।

তাছাড়া মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যে দুটি কারণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এর প্রতিটি হচ্ছে বিক্রয় হারাম হওয়ার 'কারণ' (عِلَّةٌ)। আর যা বিনিময়ের জন্য 'কারণ' (عِلَّةٌ) হয় তা অগ্রাধিকার দেওয়ার ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে না। অবশ্য শামসুল আয়িম্মা আল কারদারী এ প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়; বরং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উক্ত দুটি সম্ভাবনার যে কোনো একটি থাকলেই যখন বিক্রয় হারাম হতো তখন দুটি বিদ্যমান থাকায় তো অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে বিক্রয় হারাম হবে।

অর্থঃ কেউ যদি একটি রৌপ্যের পাত্র স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা নির্ধারিত মূল্যের আংশিক নগদ পরিশোধ করে, আর অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হয়ে যায় তাহলে বিধান হলো, যতটুকু অংশ নগদ পরিশোধ করেছে পাত্রের ততটুকু অংশের বিক্রয় জায়গা ও কার্যকর হবে, আর অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর পাত্রটি উভয়ের মাঝে শরিকানা হিসেবে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রেতা পাত্রটি একশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল, অতঃপর ক্রেতা কেবল পঞ্চাশ দিরহাম নগদ পরিশোধ করার পর তারা পৃথক হয়ে গেল তাহলে পঞ্চাশ দিরহাম যেহেতু মোট মূল্যের অর্ধেক সেহেতু পাত্রটির অর্ধেকের বিক্রয় সহীহ হবে, আর অবশিষ্ট অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। ফলে ক্রেতা পাত্রটির অর্ধেকের মালিক হবে, আর বিক্রেতা অর্ধেকের মালিক থাকবে।

قَوْلُهُ لَئِنْ صَرَّ كُذِّفَ نَصَحَ فِيمَا وَجَدَ الْخ. মাসআলাটির দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি হচ্ছে 'বায় সরফ'। আর 'বায় সরফ' সম্পাদিত হওয়ার পর তা সহীহ হিসেবে বহাল থাকার জন্য শর্ত হলো, চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্বা বা হস্তগত করা। কাজেই যে অংশের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সে অংশের ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিক্রয় সহীহ থাকবে আর যে অংশের মূল্য পরিশোধ করা হয়নি সে অংশের বিক্রয় শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْفَسَادُ طَارٌ : এখান থেকে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, যখন পাত্রটি কিছু অংশের মূল্য নগদ হস্তান্তর না করার কারণে সে অংশের বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেছে তখন তো একই চুক্তি হওয়ার কারণে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি পাত্রের অপর অংশেও বিস্তৃতি লাভ করার কথা এবং সম্পূর্ণ পাত্রের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কথা।

জবাবের সারকথা এই যে, ফাসিদ দু'ধরনের হয়ে থাকে—

১. فَسَادٌ فِي الْأَصْلِ 'চুক্তির মূলের মাঝে ফাসিদ হওয়া।'

ফাসিদ হওয়ার কারণটি যদি চুক্তির সূচনাতেই বিদ্যমান হয়, তাহলে সেটি হচ্ছে প্রথম প্রকার ফাসিদ অর্থাৎ فَسَادٌ فِي الْأَصْلِ

[ফাসাদ ফিল আসল] আর যদি প্রথম চুক্তিটি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর ফাসিদ হওয়ার কারণ যুক্ত হয়, তাহলে সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার ফাসিদ অর্থাৎ فَسَادٌ طَار [ফাসাদে তরি]।

যদি প্রথম প্রকারের ফাসিদ হয় তাহলে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ বিক্রয় বস্তুতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং সম্পূর্ণ চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় প্রকারের ফাসিদ হলে অর্থাৎ চুক্তি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর যদি কোনো কারণ যুক্ত হওয়ার ফলে বিক্রয় ফাসিদ হয় তাহলে কেবল যে অংশ কারণটি যুক্ত হবে সে অংশের বিক্রয় ফাসিদ হয়। এ ক্ষেত্রে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি অন্য অংশে বিস্তৃতি লাভ করে না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু পাত্রটির বিক্রয় প্রথমে সহীহভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তীতে কিছু অংশের মূল্য নগদ হস্তগত না করার কারণে ফাসিদ হওয়ার কারণ যুক্ত হয়েছে, সেহেতু এটি দ্বিতীয় প্রকারের ফাসিদ (فَسَادٌ طَار)। কাজেই তা অপর অংশে বিস্তৃতি লাভ করবে না। সুতরাং যে অংশের মূল্য নগদ হস্তগত করা হয়েছে সে অংশের বিক্রয় সহীহ থাকবে।

উল্লেখ্য, এখানে কারো প্রশ্ন হতে পারে যে, আলোচ্য সূরতে তো তাহলে চুক্তিটির মাঝে বিভক্তি (تَفْرِيقُ الصَّفَفَةِ) করা হচ্ছে। অর্থাৎ ক্রয়কৃত বস্তুর অর্ধেকের বিক্রয় কার্যকর হচ্ছে আর অর্ধেকের বিক্রয় কার্যকর হচ্ছে না। আর এরূপ বিভক্তির ক্ষেত্রে তো ক্রেতার নেওয়া বা না নেওয়ার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হয় অথচ আলোচ্য সূরতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কারোই ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করা হয়নি। এর উত্তর হলো, ফাসিদ হওয়ার কারণটি চুক্তিকারীদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে। কেননা, তাদের পরস্পরে হস্তান্তর না করার কারণে ফাসিদ হয়েছে। সুতরাং তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, কারো নিজের কার্যের ফলে চুক্তির মাঝে বিভক্তি হলে তার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَجَبَ بَعْضُ الْإِنَاءِ فَالْمُتَبَرِّئُ بِالْخِبَارِ الْخ : উল্লিখিত পাত্র বিক্রয়ের মাসআলাটির সূরত যদি এরূপ হয় যে, ক্রেতা পাত্রটি ক্রয় করার পর দেখা গেল বিক্রেতা সম্পূর্ণ অংশের মালিক ছিল না; বরং পাত্রটির কিছু অংশের মালিক অন্য এক ব্যক্তি, তাহলে বিধান হলো, ক্রেতা এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার পাবে, সে চাইলে বিক্রেতা যে অংশের মালিক ছিল সে অংশের মূল্যের বিনিময়ে শুধু সে অংশের মালিকানা লাভ করবে। আর তা না চাইলে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করে পাত্রটি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিবে। [অর্থাৎ পূর্বের সূরত এবং এ সূরতের মাঝে বিধানগত এ পার্থক্য হলো যে, পূর্বের সূরতে পাত্রের কিছু অংশের বিক্রয় সহীহ হয়েছে কিন্তু ক্রেতা কোনো ইচ্ছাধিকার (خِبَارٌ) লাভ করেনি, আর এ সূরতেও কিছু অংশের বিক্রয় সহীহ হয়েছে কিন্তু ক্রেতা ইচ্ছাধিকার লাভ করেছে।] এর কারণ হলো, এ সূরতে যখন তৃতীয় ব্যক্তির কিছু অংশের মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তখন পাত্রটি তৃতীয় ব্যক্তির মাঝে এবং ক্রেতার মাঝে শরিকানা হয়ে যাচ্ছে। আর একীভূত বস্তুর মাঝে শরিকানা সাব্যস্ত হওয়া বস্তুর ক্রেতা বলে গণ্য হয়। কাজেই ক্রেতা এ ক্ষেত্রে পাত্রটি ক্রয় করার পর তাতে ক্রেতা পেয়েছে এবং এ ক্রেতা তার কোনো কাজের দরুন সংঘটিত হয়নি। সুতরাং সে তা خِبَارٌ ক্রেতার কারণে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে পূর্বের সূরতে যদিও পাত্রটির মাঝে শরিকানা সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু তা হয়েছে ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষ থেকে অর্থাৎ মূল্য নগদ হস্তান্তর না করার কারণে। সুতরাং তাদের কেউই ইচ্ছাধিকার পাবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ قِطْعَةً تَنْزَرُ : মাসআলা হলো, কেউ যদি রৌপ্যের টুকরা বিক্রয় করে, অতঃপর দেখা যায় যে বিক্রেতা সম্পূর্ণ টুকরাটির মালিক ছিল না; বরং অপর কোনো ব্যক্তি উক্ত টুকরাটির কিছু অংশের মালিক, তাহলে বিধান হলো বিক্রেতা যতটুকুর মালিক ছিল ক্রেতা কেবল ততটুকুর মূল্য পরিশোধ করে তা নিয়ে নিবে, আর বাকিটুকু যার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তাকে দিয়ে দিবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার পাবে না।

قَوْلُهُ لَا يَلَا يَبْرُهُ الْكَيْفِيَّةُ : এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার না পাওয়ার কারণ হলো, রৌপ্যের টুকরা কেটে ভাগ করে নিলে তাতে কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রে শরিকানা সাব্যস্ত হওয়ায় ক্রেতা হিসেবে গণ্য করা হবে না। সুতরাং ক্রেতার ফেরত দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَ دِينَارًا يَدْرِهِمْ وَ دِينَارَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ ، وَجُعِلَ كُلُّ جَنْسٍ مِنْهُمَا خِلَافٍ ، وَقَالَ زُفَرٌ (رح) وَالشَّافِعِيُّ (رح) : لَا يَجُوزُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا بَاعَ كُرَّ شَعِيرٍ وَكُرَّ حَنْطَةٍ يَكُرِّي حَنْطَةً وَكُرِّي شَعِيرٍ لَهَا أَنْ فِي الصَّرْفِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ تَغْيِيرٌ تَصَرُّفِهِ ، لِأَنَّهُ قَابِلُ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ ، وَمِنْ قَضِيَّتِهِ الْإِنْقِسَامُ عَلَى الشُّيُوعِ لَا عَلَى التَّغْيِينِ ، وَالتَّغْيِيرُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَضَحُّيْعُ التَّصَرُّفِ ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى قُلُوبًا بِعِشْرَةٍ وَثَوْبًا بِعِشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُمَا مُرَابِحَةً لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَمَكَّنَ صَرَفُ الرِّبْحِ إِلَى الثَّوْبِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি দুটি দিরহাম ও একটি দিনার বিক্রয় করে একটি দিরহাম ও দুটি দিনারের বিনিময়ে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ঐ দুটি শ্রেণীর প্রতিটি তার বিপরীত শ্রেণীর বিনিময়ে ধরা হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.) বলেন, বিক্রয় জায়েজ হবে না। একই মতপার্থক্য হবে যদি কেউ এক 'কুর' যব এবং এক 'কুর' গম বিক্রয় করে দুই 'কুর' গম এবং দুই 'কুর' যবের বিনিময়ে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, প্রতিটিকে তার বিপরীত শ্রেণীর বিনিময়ে সাব্যস্ত করার অর্থ হচ্ছে চুক্তিকারীর প্রয়োগকে পরিবর্তন করা। কেননা, চুক্তিকারী সম্পূর্ণ মূল্যবস্তুকে সম্পূর্ণ ক্রয়কৃত বস্তুর বিনিময়ে সাব্যস্ত করেছে। আর তার এই সাব্যস্তকরণের দাবি হচ্ছে মূল্যবস্তু ক্রয়কৃত বস্তুর উপর সর্বব্যাপীরাপে বস্তুিত হবে; নির্দিষ্টরূপে নয়। আর চুক্তিকারীর প্রয়োগের মাঝে পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়, যদিও তাতে চুক্তি উদ্ধার করার ফায়দা অর্জিত হয়। যেমন- কেউ যদি একটি 'বাল' দশ দিরহামে এবং একটি কাপড় দশ দিরহামে ক্রয় করে, অতঃপর সে উভয়টিকে একই বিক্রয়চুক্তিতে 'মুরাবাহাহ' [ক্রয়মূল্যের উপর নির্দিষ্ট লাভের শর্তে বিক্রয়]-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয় না, যদিও এ ক্ষেত্রে মুনাফাকে কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত [করে বিক্রয়কে বৈধ সাব্যস্ত] করা সম্ভব ছিল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَ دِينَارًا الخ : অর্থঃ কেউ যদি দুটি দিরহাম ও একটি দিনার বিক্রয় করে একটি দিরহাম ও দুটি দিনারের বিনিময়ে, তাহলে আমাদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের দুই দিরহামকে অপর পক্ষের দুই দিনারের বিনিময়ে ধরা হবে আর প্রথম পক্ষের এক দিনারকে অপর পক্ষের দুই দিরহামের বিনিময়ে ধরা হবে। কেননা, যদি এক পক্ষের দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের দিরহামই ধরা হয়, তাহলে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের বিক্রয়ে কমবেশি হওয়ার কারণে 'বির' (সুদ) সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রয় হারাম হবে। একপক্ষে দিনারের ক্ষেত্রেও কমবেশি হওয়ার কারণে বিক্রয় হারাম হবে। তাই চুক্তিকারীদের চুক্তি যথাসম্ভব সহীহ সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে দিরহামের বিনিময়ে দিনার আর দিনারের বিনিময়ে দিরহাম ধরা হবে। তাহলে 'বির' সাব্যস্ত হবে না। কেননা, রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا بَاعَ كُرَّ شَعِيرٍ : অনুব্রূপভাবে কেউ যদি এক 'কুর' যব ও এক 'কুর' গম বিক্রয় করে দুই 'কুর' যব ও দুই 'কুর' গমের বিনিময়ে, তাহলে আমাদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রেও পূর্বের মতো বিক্রয়কে সহীহ

সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রথম পক্ষের যবকে অপর পক্ষের গমের বিনিময়ে ধরা হবে, আর প্রথম পক্ষের গমকে অপর পক্ষের যবের বিনিময়ে ধরা হবে। আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

মূল কথা হলো, যদি 'রিবা'-এর দ্রব্যাদির মধ্য থেকে একাধিক শ্রেণীর দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা হয় আর সুরত এমন হয় উভয় দিকের একই শ্রেণীর দ্রব্য একটির বিনিময়ে অপরটি ধরা হলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মতে এক পক্ষের এক শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য ধরা হবে, যাতে চুক্তিটি সহীহ সাব্যস্ত হতে পারে। আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এরূপ ধরা হবে না; বরং চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنْ يَبَى الصَّرْفَ إِلَى غَلَابِ النِّجَسِ: ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, যদি উক্ত সুরতগুলোতে এক শ্রেণীর দ্রব্য অপর শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে ধরা হয়, তাহলে চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তিটি যেভাবে সম্পাদন করেছে তার মাঝে পরিবর্তন এসে যায়। আর চুক্তি সহীহ সাব্যস্ত করার জন্যও চুক্তিকারীদের কৃত চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাব্যস্ত করা জায়েজ নয়। পরিবর্তন আসে এভাবে যে, চুক্তিকারীদ্বয় এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে। কেননা, দিরহাম ও দিনারের মাসআলায় প্রথম পক্ষ তার দুই দিরহাম ও এক দিনার এ মোট তিনটি বিক্রয় করেছে অপর পক্ষের দুই দিনার ও এক দিরহামের বিনিময়ে। আর এর দাবি হচ্ছে, বিনিময় ও বটন সাব্যস্ত হবে অনির্দিষ্টভাবে বিবৃতির ভিত্তিতে (عَلَى الشُّبْهِ)। অর্থাৎ প্রথম পক্ষের প্রদত্ত দুই দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের দিরহাম বা দিনারের কোনো অংশ নির্দিষ্ট হবে না; বরং সম্পূর্ণ দিরহাম ও দিনারের মাঝে তার অনির্দিষ্টভাবে অংশ সাব্যস্ত হবে। এরূপভাবে প্রথম পক্ষের দিনারের বিপরীতেও অপর পক্ষের দিরহাম ও দিনার উভয়টির মাঝেই অনির্দিষ্টভাবে অংশ সাব্যস্ত হবে।

সম্পূর্ণ দ্রব্যকে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে বিবৃতির ভিত্তিতে বিনিময় সাব্যস্ত হয় তার দলিল হচ্ছে, কেউ যদি একটি গোলাম ও একটি দাসী ক্রয় করে একটি কাপড় ও একটি ঘোড়ার বিনিময়ে, অতঃপর দেখা গেল ক্রয়কৃত গোলামটির মালিক প্রকৃতপক্ষে অন্য এক ব্যক্তি, তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর এ অধিকার মূল্য হিসেবে তার দেওয়া কাপড় ও ঘোড়া উভয়টির মাঝে সাব্যস্ত হবে। যদি বিবৃতির ভিত্তিতে (عَلَى الشُّبْهِ) বিনিময় সাব্যস্ত না হতো, তাহলে ক্রেতা উভয়টির মাঝে ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করত না। সুতরাং বুঝা গেল যে, সম্পূর্ণ দ্রব্যকে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবৃতির ভিত্তিতে বিনিময় সাব্যস্ত হয়। অতএব, আমাদের আলোচ্য সুরতে চুক্তিকারীদ্বয় যেহেতু তাদের এক পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যকে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে সাব্যস্ত করে ক্রয়-বিক্রয় করেছে সেহেতু দিরহামকে দিনারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট করা হলে তারা যেভাবে চুক্তি সম্পাদন করেছে তার মাঝে পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে। আর চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ নয়। এমনকি পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি চুক্তিটি সহীহ করা সম্ভব হয় তবুও তা জায়েজ নয়।

নিম্নে ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে 'চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তির মাঝে যে তা সহীহ করার জন্যও পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ নয়' তার প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে—

كَانَ إِذَا اشْتَرَى قَلْبًا بِعَنْكَرِ الْخ: এ ইবারতের মাধ্যমে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত কয়েকটি উদাহরণের প্রথম উদাহরণটি উপস্থাপন করা হচ্ছে— প্রথম উদাহরণ হলো, কেউ যদি দশ দিরহাম সমপরিমাণ ওজনের একটি রূপার বালা দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং একটি কাপড় দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে অতঃপর উভয়টিকে একত্রে লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় (بَيْعَ الْمَرَاغَةِ) করে অর্থাৎ এভাবে বিক্রয় করে যে, আমি যে মূল্যে এ দুটি ক্রয় করেছি তার চেয়ে পাঁচ দিরহাম লাভের ভিত্তিতে আমি তোমার নিকট উভয়টি বিক্রয় করলাম, তাহলে সকলের একমতভাবে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কারণ হলো, বালাটির ওজন হচ্ছে দশ দিরহাম এবং ক্রয়মূল্যও দশ দিরহাম এখন এটাকে যদি লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় তাহলে মূল্য হবে দশ দিরহামের চেয়ে বেশি ফল 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা, বালাটিও রৌপ্যের এবং প্রদত্ত মূল্য দিরহামও হচ্ছে রৌপ্যের, কাজেই কমবেশি করে বিক্রয় করায় 'রিবা' হওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। অথচ যদি চুক্তির মাঝে পরিবর্তন করা জায়েজ হতো তাহলে এ ক্ষেত্রে লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বালাটিকে লাভমুক্ত ধরা যেত, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যেত। অথচ কারো মতেই এভাবে পরিবর্তন করে বিক্রয়কে জায়েজ করা হয়নি। সুতরাং বুঝা গেল চুক্তি সহীহ করার উদ্দেশ্যেও চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তিতে পরিবর্তন সাধন করা যাবে না।

وَكَذَٰلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ عَبْدًا بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ مِنَ الْبَائِعِ مَعَ عَبْدٍ آخَرَ بِأَلْفٍ وَخَمْسٍ مِائَةٍ لَا يَجُوزُ فِي الْمُشْتَرَىٰ بِأَلْفٍ، وَإِنْ أَمَكَنَ تَصَحُّبَهُ بِصَرْفِ أَلْفٍ إِلَيْهِ، وَكَذَٰلِكَ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدٍ غَيْرِهِ وَقَالَ: يَغْتُكَ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَمَكَنَ تَصَحُّبَهُ بِصَرْفِهِ إِلَىٰ عَبْدِهِ، وَكَذَٰلِكَ إِذَا بَاعَ ذِرْهَمًا وَثَوْبًا بِذِرْهَمٍ وَثَوْبٍ وَافْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الذِّرْهَمَيْنِ، وَلَا يُصْرَفُ الذِّرْهَمُ إِلَى الثَّوْبِ لِمَا ذَكَّرْنَا۔

অনুবাদ : একরূপভাবে কেউ যদি এক হাজার দিরহামে একটি দাস ক্রয় করে অতঃপর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই আরেকটি দাসের সাথে মিলিয়ে উভয়কে বিক্রেতার নিকটই পুনরায় দেড় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তাহলে এক হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয়কৃত দাসের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিটি নাজায়েজ হয়। যদিও উক্ত দাসের সাথে এক হাজার দিরহাম সম্পৃক্ত করে চুক্তিটি বৈধ সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিল, একরূপভাবে যদি নিজের গোলাম এবং অন্যের গোলাম একত্রিত করে এভাবে বিক্রয় করে যে, আমি তোমার নিকট এ দুটি গোলামের একটি বিক্রয় করলাম তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয় না; যদিও এ ক্ষেত্রে তার বক্তব্য নিজের গোলামের দিকে সম্পৃক্ত করে চুক্তিটি বৈধ সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিল। তদ্রূপ যদি কেউ একটি দিরহাম এবং একটি কাপড় বিক্রয় করে এক দিরহাম এবং একটি কাপড়ের বিনিময়ে অতঃপর হস্তগত করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তাহলে দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যায়; দিরহামটি [মূল্য হিসেবে] কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না। এসব ক্ষেত্রে কারণ তা-ই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ : দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, কেউ যদি একটি গোলাম এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে অতঃপর বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই গোলামটির সাথে আরেকটি গোলাম একত্র করে বিক্রেতার কাছেই দেড় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে এক হাজার দিরহামে ক্রয়কৃত গোলামটির ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কারণ হলো, দুটি গোলামের মূল্য যখন দেড় হাজার দিরহাম সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন একটির মূল্য পড়েছে সাড়ে সাত শত দিরহাম। আর 'বিক্রয় অধ্যায়'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো বস্তু ক্রয় করার পর বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই বিক্রেতার নিকট পুনরায় তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। আর আলোচ্য সূরতে তাই করা হয়েছে। অথচ এ সূরতেও যদি দেড় হাজার দিরহাম থেকে এক হাজার দিরহাম প্রথম গোলামটির বিনিময়ে ধরা হয় আর পাঁচ শত দিরহাম অপর গোলামটির বিনিময়ে ধরা হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু জায়েজ না হওয়ার কারণ এটাই যে, তাতে চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তিতে পরিবর্তন সাধন করা হয়। কেননা, তারা উভয় গোলামের বিনিময়ে দেড় হাজার দিরহাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই একটি গোলামের জন্য মূল্যের কোনো অংশ নির্দিষ্ট করা হলে তাতে পরিবর্তন করা হবে।

خ : قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدٍ غَيْرِهِ الخ : তৃতীয় উদাহরণ হলো, কেউ যদি নিজের মালিকানাধীন একটি গোলাম ও অন্য এক ব্যক্তির গোলাম একত্র করে কারো নিকট এভাবে বিক্রয় করে যে, আমি তোমার নিকট এ দুটি গোলামের একটি বিক্রয় করলাম, তাহলে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। কারণ, সে এমন জিনিস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা তার মালিকানাধীন নয়। অথচ এ ক্ষেত্রেও যদি চুক্তিতে পরিবর্তন করা জায়েজ হতো, তাহলে বিক্রয়ের বিষয়টি তার মালিকানাধীন গোলামটির সাথে সম্পৃক্ত করে বিক্রয়কে সহীহ সাব্যস্ত করা যেত। সুতরাং বুঝা গেল চুক্তি সহীহ করার উদ্দেশ্যেও চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ নয়।

خ : قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا بَاعَ دَرَهْمًا وَثَوْبًا بِدَرَهْمٍ وَثَوْبٍ الخ : চতুর্থ উদাহরণ হলো, কেউ যদি একটি দিরহাম ও একটি কাপড় বিক্রয় করে অপর পক্ষের একটি দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে অতঃপর তারা উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বেই পরস্পরে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে উভয় পক্ষের দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ হলো, উভয় পক্ষের দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয়টি হচ্ছে ‘বায় সরফ’। আর ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা শর্ত। অথচ এ ক্ষেত্রেও যদি চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে তাদের চুক্তি সম্পাদন করেছে তাতে পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ হতো, তাহলে প্রত্যেক পক্ষের দিরহামকে অপর পক্ষের কাপড়ের বিনিময়ে সাব্যস্ত করে দিরহামের ক্ষেত্রেও বিক্রয়কে সহীহ রাখা যেত। কেননা, তাহলে বিক্রয়টি ‘বায় সরফ’ হতো না, কাজেই নগদ হস্তগত না করার কারণে বিক্রয় ফাসিদ হতো না।

خ : قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا الخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য হলো, উপরিউক্ত চারটি মাসআলায় সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় নাজায়েজ। আর এ নাজায়েজ হওয়ার কারণ তো এটাই যে, চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে তাদের চুক্তি সম্পাদন করেছে তাতে পরিবর্তন আনা জায়েজ নয়। অন্যথা প্রতিটি মাসআলায়ই পরিবর্তন এনে জায়েজ সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিল। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, চুক্তি সহীহ করার জন্য হলেও চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তিতে পরিবর্তন আনা যাবে না।

وَلَنَا أَنَّ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَحْتَمِلُ مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ كَمَا فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ  
بِالْجِنْسِ، وَإِنَّهُ طَرِيقٌ مُتَعَيَّنٌ لِيَتَصَحَّحَ فَتَحْمَلَ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِيَتَصَرَّفَ، وَفِيهِ  
تَغْيِيرٌ وَصْفٌ لَا أَصْلَ، لِأَنَّهُ يَبْقَى مَوْجِبُهُ الْأَصْلِيُّ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّ  
بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذَا بَاعَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ  
بَنَصْرٍ إِلَى نَصِيبِهِ تَصْحِيحًا لِيَتَصَرَّفَ -

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, নিঃশর্তরূপে বিপরীতে সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে এককের বিপরীতে একক সাব্যস্ত  
হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন- সমশ্রেণীর বস্তুর বিপরীতে সমশ্রেণীর বস্তু সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে [এরূপই হয়ে  
থাকে]। আর আলোচ্য চুক্তিকে বৈধতা দানের জন্য 'এককের বিপরীতে একক সাব্যস্ত করা' হচ্ছে একমাত্র পন্থা।  
কাজেই চুক্তিকারীর চুক্তিকে বৈধ করার জন্য তার 'নিঃশর্ত সাব্যস্তকরণকে' এককের বিপরীতে একক সাব্যস্ত করার  
উপরই প্রয়োগ করা হবে। আর এতে চুক্তিকে কেবল গুণগত দিক থেকে পরিবর্তন করা হচ্ছে; চুক্তির সত্তাগত  
পরিবর্তন করা হচ্ছে না। কেননা, চুক্তির বিধানগত মূল দাবি বহাল থাকছে। আর তা হচ্ছে, সম্মুখের বিনিময়ে সম্মুখের  
মাঝে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। আর এটা ঐ মাসআলার মতো হলো যে, কেউ তার মাঝে এবং অন্যের মাঝে  
শরিকানা গোলামকে বিক্রয় করল, তাহলে চুক্তিটির বৈধতার স্বার্থে বিক্রয় তার অংশের সাথেই সম্পর্কিত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَحْتَمِلُ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করছেন। আমাদের  
দলিল হলো, আমাদের আলোচ্য মাসআলায় চুক্তিকারীদ্বয় তাদের এক পক্ষের দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের দ্রব্য সাব্যস্ত  
করেছে নিঃশর্ত (مطلق) ভাবে। অর্থাৎ তারা এটা স্পষ্ট করেনি যে, এ ক্ষেত্রে—

১. এক পক্ষের সম্পূর্ণ দিরহাম ও দিনার অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দিরহাম ও দিনারের বিনিময়ে (পূর্বে উল্লিখিত বিবৃতির ভিত্তিতে);
২. নাকি প্রথম পক্ষের দিরহাম অপর পক্ষের দিরহামের বিনিময়ে আর প্রথম পক্ষের দিনার অপর পক্ষের দিনারের বিনিময়ে;
৩. নাকি প্রথম পক্ষের দিরহাম হচ্ছে অপর পক্ষের দিনারের বিনিময়ে, আর প্রথম পক্ষের দিনার হচ্ছে অপর পক্ষের দিরহামের  
বিনিময়ে।

চুক্তিকারীদ্বয় কেবল বিনিময় সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু এ তিনটি সম্ভাবনার কোনোটি তারা নির্দিষ্ট করেনি। কাজেই তিনটির যে  
কোনোটি উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে আলোচ্য মাসআলায় যদি প্রথম পক্ষ বিক্রয়ের সময় এ তিনটির  
কোনো একটি তার উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ উল্লেখ করে, তাহলে তা সঠিক 'য়ে। যেমন— সে যদি বলে যে, আমি এ দুই  
দিরহাম ও এক দিনার তোমার নিকট এক দিরহাম ও দুই দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম এভাবে যে, দিরহাম দুটি হলো  
তোমার দিনারটির বিনিময়ে আর আমার দিনারটি হলো তোমার দিরহাম দুটির বিনিময়ে, তাহলে বিক্রয় [সকলের মতে] জায়েজ  
হয়; এ ক্ষেত্রে তার প্রথম কথা যদি পরবর্তী ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে তার পরবর্তী ব্যাখ্যা কার্যকর  
গণ্য হতো না। সুতরাং বুঝা গেল আমাদের আলোচ্য মাসআলায় উল্লিখিত তিনটি সুরতের যে কোনোটি উদ্দেশ্য হওয়ার  
সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত তিনটি সুরতের প্রথমটি হলো، الْكُلُّ بِالْكُلِّ আর দ্বিতীয়টি হলো، الْفَرْدُ بِالْفَرْدِ



مُقَابَلَةً أَلْفَرْدٍ بِالْفَرْدِ مِنْ غَيْرِ جَنْبِهِ ॥ এর মধ্যে প্রথম দুটির কোনোটি তাদের উদ্দেশ্য ধরা হলে বিক্রয় নাজায়েজ হয় আর শেষেরটি ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয়। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য তৃতীয়টি তাদের উদ্দেশ্য বলে ধরা হবে।

উল্লেখ্য, উপরের বর্ণনা অনুসারে চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে চুক্তি সম্পাদন করেছে তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয়নি; বরং তারা যেভাবে চুক্তি করেছে তাতে তাদের উদ্দেশ্য হিসেবে যে কয়টি সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল তন্মধ্যে যেটিতে বিক্রয় জায়েজ হয় সেটি ধরা হয়েছে। কেননা, চুক্তি জায়েজ হোক এটাই চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই কোনো পরিবর্তন সাব্যস্ত করা হয়নি। এ কারণে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) পরে যে বলেছেন وَفِيهِ تَغْيِيرٌ وَصِفَةٌ "এতে কেবল চুক্তিকারীদ্বয়ের কৃত চুক্তির গুণগত পরিবর্তন করা হয়েছে" একথাটি বলার প্রয়োজন ছিল না।

তবে মুসান্নিফ (র.) হয়তো এ পরিবর্তনের কথা মেনে নিয়ে জবাব দিয়েছেন এজন্য যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের আলোচ্য সূরতে চুক্তিকারীদ্বয় উক্ত তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটি (مُقَابَلَةً أَلْفَرْدٍ بِالْفَرْدِ عَلَى الشُّبْنِ) নির্দিষ্ট করেছে। তাই তৃতীয়টি (مُقَابَلَةً أَلْفَرْدٍ بِالْفَرْدِ مِنْ غَيْرِ جَنْبِهِ) উদ্দেশ্য হিসেবে ধরায় গুণগত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

عَنْهُ تَغْيِيرٌ وَصِفَةٌ لَا أَصْلَهُ، لِأَنَّ الْخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, তাঁরা যে বলেছেন, আলোচ্য মাসআলায় এক পক্ষের দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের দিনার সাব্যস্ত করা হলে চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে চুক্তি করেছে তার মাঝে পরিবর্তন এসে যায়, আর তা জায়েজ নয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, এখানে পরিবর্তন আসে কেবল চুক্তিটির গুণগত বৈশিষ্ট্যের মাঝে: মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন আসে না। আর মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন করা জায়েজ নয়, কিন্তু তার গুণগত বৈশিষ্ট্য (وَصِفَةٌ)-এর মাঝে পরিবর্তন করা জায়েজ। গুণগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন তো হচ্ছে এভাবে যে, চুক্তিকারীদ্বয় বাহ্যিকভাবে যে এক পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্য সাব্যস্ত করেছিল সেখানে আমরা এক পক্ষের নির্দিষ্ট একটি অপর পক্ষের নির্দিষ্ট একটির বিনিময়ে [তথা দিরহামের বিনিময়ে দিনার] সাব্যস্ত করেছি। আর মূল চুক্তিতে পরিবর্তন আসিনি তার কারণ হচ্ছে, চুক্তিকারীদ্বয়ের এভাবে চুক্তি করার ফলাফল হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের নিজের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, আর তা আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহালই রয়েছে। কাজেই তাদের চুক্তির মূলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) চুক্তিতে পরিবর্তন করা জায়েজ না হওয়ার পক্ষে যে নজিরগুলো উল্লেখ করেছেন তার কোনোটি এমন নয় যে, তাতে চুক্তির গুণগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ করা যেত কিন্তু তা সত্ত্বেও বিক্রয় জায়েজ নয়। [এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা একটু পরে আলোচনা করা হবে।]

سُوتَرَاং أَمَّا أَدَرِ الْمَاسْأَلَاٹِ أَمْ مَازَ أَلَاٹِ الْمَازَ أَلَاٹِ : সুতরাং আমাদের মাসআলাটি এ মাসআলাটির মতোই হলো যে, দু-বাজার মাঝে একটি শরিকি মালিকানাধীন গোলাম রয়েছে অতঃপর তাদের একজন গোলামটির অর্ধেক বিক্রয় করে দিল [কিন্তু সে তার অর্ধেক বিক্রয় করেছে তা উল্লেখ করেনি] তাহলে সকলের মতে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রোতা কোন অর্ধেক তা অনির্দিষ্ট রেখেছে। কাজেই তার নিজের অর্ধেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আবার অপর জনের অর্ধেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অপর জনের অর্ধেক ধরা হলে বিক্রয় নাজায়েজ হয়, আর তার অর্ধেক ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয়। তাই বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য তার অর্ধেক উদ্দেশ্য হওয়ায় নির্দিষ্ট করা হবে। এ ক্ষেত্রে চুক্তিকারী কৃত চুক্তি অনুযায়ী তার চুক্তির মাঝে গুণগত পরিবর্তন এনে চুক্তিকে জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও গুণগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এনে বিক্রয়কে জায়েজ সাব্যস্ত করা হবে।

يَخْلَافُ مَا عُدَّ مِنَ الْمَسَائِلِ، أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُرَابَحَةِ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ تَوَلِيَّةً فِي الْقَلْبِ  
بِصَرْفِ الرِّبْحِ كُلِّهِ إِلَى الثَّرَوِ، وَالطَّرِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ، لِأَنَّهُ  
يُمْكِنُ صَرْفُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَلْفِ إِلَى الْمُسْتَرْتَى، وَفِي الثَّالِثَةِ أَضِيفَ الْبَيْعُ إِلَى  
الْمُنْكَرِ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْبَيْعِ، وَالْمُعَيَّنُ ضَدُّهُ، وَفِي الْأَخِيرَةِ انْعَقَدَ الْعَقْدُ  
صَحِيحًا، وَالْفَسَادُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، وَكَلَامُنَا فِي الْإِنْتِدَاءِ -

অনুবাদ : পক্ষান্তরে হিমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে। যে সকল মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বিষয়টি ভিন্ন- 'মুরাবাহাহ'-এর মাসআলাটির ক্ষেত্রে কারণ হলো, সম্পূর্ণ মুনাফাকে কাপড়ের সাথে সম্পর্কিত করা হলে 'বাল্লা'-এর ক্ষেত্রে চুক্তি 'তাওলিয়া-চুক্তি'-তে [অর্থাৎ ক্রয়মূল্যের শর্তে বিক্রয়চুক্তিতে] পরিণত হয়ে যাবে [ফলে চুক্তির সন্তাপ্ত পরিবর্তন হবে]। আর দ্বিতীয় মাসআলায় বৈধতার জন্য [উল্লিখিত] পন্থাটি [একমাত্র পন্থা হিসেবে] নির্ধারিত নয়। কেননা, [বৈধতার জন্য] এক হাজার দিরহামের অতিরিক্ত ও ক্রয়কৃত গোলামটির সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব। [কেননা, এক হাজারের কম হলে নাজায়েজ হবে, আর এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি হলে জায়েজ হবে। কাজেই বৈধতার পন্থা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে চুক্তি ফাসদ হবে।] আর তৃতীয় মাসআলায় অনির্দিষ্ট গোলামের সাথে বিক্রয় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর অনির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের পাত্র হতে পারে না। আর নির্দিষ্ট হলে অনির্দিষ্টের বিপরীত। [সুতরাং অনির্দিষ্ট বস্তু বলে নির্দিষ্ট বস্তু উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়।] আর শেষ মাসআলায় চুক্তিটি বিশুদ্ধরূপে সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে [হস্তগত না করে পৃথক হওয়ার কারণে] চুক্তিটি বহাল থাকার ক্ষেত্রে ফাসাদ [অবৈধতা] সৃষ্টি হয়েছে। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে প্রারম্ভিক শুদ্ধতা সম্পর্কে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَخْلَافُ مَا عُدَّ مِنَ الْمَسَائِلِ، أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُرَابَحَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত নজিরগুলোর জবাব দিচ্ছেন। প্রথম নজির তথা মুরাবাহাহ সম্পর্কিত মাসআলার জবাব হলো, উক্ত মাসআলায় যদি বিক্রয় জায়েজ করার জন্য লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে মূল চুক্তির মাঝেই পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। আর চুক্তিকারীদ্বয় সম্পাদিত মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন এনে বিক্রয় সহীহ করা জায়েজ নয়। মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাধিত এভাবে যে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় রৌপ্যের বালা ও কাপড় উভয়টির ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে 'মুরাবাহাহ' বা ক্রয়মূল্যের উপর লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় করেছে। কাজেই যদি লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে বালার বিক্রয় হবে ক্রয়মূল্যের সমান মূল্যে। আর ক্রয়মূল্যের সমান মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয় করাকে বলা হয় 'বায় তাওলিয়া'। আর 'মুরাবাহাহ' ও 'তাওলিয়া' হচ্ছে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চুক্তি। সুতরাং লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের দিকে ফিরানো হলে রৌপ্যের বালার ক্ষেত্রে চুক্তি 'মুরাবাহাহ' থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'তাওলিয়া' হয়ে যাবে। আর তা হবে চুক্তিকারীদ্বয়ের কৃত চুক্তির মূলগত পরিবর্তন। কাজেই তা জায়েজ হবে না। অতএব, এ নজিরটি আমাদের দলিলের বিপক্ষে দাঁড় করানো যাবে না। কেননা, আমাদের দাবি ছিল চুক্তির মূলগত কোনো পরিবর্তন না এনে যদি কেবল তার গুণগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ করা সম্ভব হয়, তাহলে তা করতে হবে।

قَوْلُهُ وَالطَّرِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ الخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত দ্বিতীয় নজির তথা গোলাম ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তা বিক্রয় করার কাছে পুনরায় বিক্রয় করা সম্পর্কিত মাসআলাটির জবাব হলো, উক্ত সূরতে আপনাদের বক্তব্য অনুসারে ক্রয়কৃত গোলামটির মূল্য এক হাজার ধরা হলে আর তার

সাথে যুক্ত অপর গোলামটির মূল্য পাঁচ শত ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও চুক্তিকারীদের কৃত চুক্তিতে পরিবর্তন আসার কারণে এভাবে ধরা জায়েজ হয়নি। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, এ সুরতে পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ না করার কারণ হচ্ছে ভিন্ন। তা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে বিক্রয়কে জায়েজ করার জন্য পছন্দ নির্দিষ্ট একটির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সম্ভাব্য একাধিক পছন্দ বিদ্যমান। আর একাধিক পছন্দ বিদ্যমান থাকার কারণে যেহেতু তন্মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার ভিত্তি নেই, সেহেতু কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। জায়েজ করার জন্য একাধিক পছন্দ বিনিয়োগ এভাবে যে, গোলামটির ক্রয়মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। আর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে বিক্রেতার নিকট তা এক হাজার দিরহামের চেয়ে কম মূল্যে পুনরায় বিক্রয় করা নাজায়েজ। কিন্তু এক হাজার বা তার চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ। সুতরাং যখন ক্রেতা উক্ত গোলামটির সাথে আরেকটি গোলাম যুক্ত করে দেড় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে, তখন বিক্রয় জায়েজ করার জন্য ক্রয়কৃত গোলামটির মূল্য এক হাজার দিরহাম ধরলে আর অপর গোলামটির মূল্য পাঁচ শত দিরহাম ধরলে বিক্রয় জায়েজ হবে। আবার ক্রয়কৃত গোলামটির মূল্য এক হাজারের চেয়ে বেশি ধরে অপর গোলামটির মূল্য পাঁচ শত দিরহামের চেয়ে কম ধরলেও বিক্রয় জায়েজ হবে। আর এ এক হাজারের বেশি ধরার ক্ষেত্রে এক দিরহাম বেশিও হতে পারে আবার দুই দিরহাম হতে পারে এভাবে চারশত নিরানব্বই পর্যন্ত হতে পারে। চুক্তিকারীদ্বয় যখন এতগুলো সম্ভাব্য জায়েজ সুরতের মধ্য হতে কোনোটি নির্দিষ্ট করেনি, তখন আমরা কোনো একটিকে নির্দিষ্ট কীভাবে করব? সুতরাং কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো ভিত্তি না থাকার কারণে কোনোটিকে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না। সারকথা এই যে, এ সুরতে জায়েজ সাব্যস্ত করার সম্ভাব্য সুরত অনেকগুলো হতে পারে। তন্মধ্যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তি ছাড়া একটিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, আর তা জায়েজ নয়। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে আমাদের দিরহাম দিনার সম্পর্কিত মূল আলোচ্য মাসআলায় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য পছন্দ কেবল একটাই বিদ্যমান। তা হলো, এক পক্ষের এক শ্রেণীর দ্রব্যকে অপর পক্ষের অন্য শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে সাব্যস্ত করা। কাজেই তা নির্দিষ্ট করা হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তি ছাড়া একটিকে অগ্রাধিকার দিতে হচ্ছে না। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِي الثَّالِيَةِ أَضْيَفَ الْبَيْعِ إِلَى التَّنْكِرِ الْخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত তৃতীয় নজির তথা নিজের গোলামকে অপরের গোলামের সাথে মিলিয়ে বিক্রয় করা সম্পর্কিত মাসআলার জবাব হলো, উক্ত মাসআলায় যখন বিক্রেতা বলেছে যে, আমি এ দুটি গোলামের মধ্য হতে একটি গোলাম তোমার কাছে বিক্রয় করলাম, তখন বিক্রয়-বস্ত্ত (مَبْعُوعٌ) 'মাজহুল' বা অনির্দিষ্ট বস্ত্ত হয়ে গেছে। আর 'মাজহুল' বা অনির্দিষ্ট বস্ত্ত বিক্রয়েদ্রব্য (مَبْعُوعٌ) হতে পারে না। কাজেই বিক্রয় নাজায়েজ হয়েছে। আর আপনাদের বক্তব্য অনুসারে তার নিজের গোলামটি নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কেননা, নির্দিষ্ট বস্ত্ত হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্ত্তের বিপরীত। আর কোনো কিছু উল্লেখ করে তার বিপরীত কিছু উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব হয় না (الْكُنْ لَا يَنْتَازِلُ جُذُؤُ). কাজেই 'দুটির একটি বিক্রয় করলাম' বলে 'আমার গোলামটি বিক্রয় করলাম' উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া সম্ভব হবে না। অতএব, এ সুরতে চুক্তির কোনো গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা বিদ্যমান নেই।

উল্লেখ্য, এ জবাবটি আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) নিতান্ত দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَفِي الْآخِرَةِ انْتَفَدَ الْعَقْدُ صَحِيحًا الْخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত চতুর্থ উদাহরণ তথা একটি দিরহাম ও একটি কাপড় অপর পক্ষের একটি দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার মাসআলাটির জবাব হলো, এ মাসআলাটিতে প্রথমে বিক্রয় সহীহ হয়েছে; কিন্তু চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে চুক্তিটি পরে বাতিল হয়ে গেছে। এ মাসআলাটিকে আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলায় আমাদের বিপক্ষে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা সঠিক হয়নি। কেননা, আমাদের আলোচনা হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে চুক্তি করেছে শুরুতেই সেভাবে চুক্তি যদি জায়েজ না হয়, তাহলে তার গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে তা জায়েজ সাব্যস্ত করার বিষয়ে। আর আপনাদের পেশকৃত উক্ত নজিরে প্রথমে তো বিক্রয় জায়েজ হয়ে সম্পাদিত হয়েছে, কাজেই তা আর পরিবর্তন করে জায়েজ সাব্যস্ত করার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং একে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা সঠিক হয়নি।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ ذِرْهَمًا بِعَشْرَةِ ذَرَاهِمَ وَ دِينَارٍ جَارَ النَّبَيْعِ ، وَكَيُونُ الْعَشْرَةُ بِمِثْلِهَا وَالدِّينَارُ بِدَرْهِمٍ ، لِأَنَّ شَرْطَ النَّبَيْعِ فِي الدَّرَاهِمِ التَّمَاثُلُ عَلَى مَا رَوَيْنَا ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ ذَلِكَ ، فَبَقِيَ الدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ وَهُمَا جِنْسَانِ ، وَلَا يَغْتَحَرُّ التَّسَاوِي فِيهِمَا وَلَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً وَفِضَّةً أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَأَحَدُهُمَا أَقْلٌ وَمَعَ أَقْلِهِمَا شَيْءٌ آخَرُ يَبْلُغُ قِيَمَتَهُ بَاقِي الْفِضَّةِ جَارَ النَّبَيْعِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَمَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيَمَةٌ كَالْتَرَابِ لَا يَجُوزُ النَّبَيْعُ لِتَحَقُّقِ الرِّبَا ، إِذَا الزِّيَادَةُ لَا يُقَابِلُهَا عَوَضٌ فَيَكُونُ رِبَاً .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি এগারোটি দিরহাম বিক্রয় করে দশটি দিরহাম ও একটি দিনারের বিনিময়ে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে দশ দিরহাম দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং দিনারটি এক দিরহামের বিনিময়ে ধরা হবে। কেননা, আমাদের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে দিরহাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [জায়েজ হওয়ার] শর্ত হলো উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। সুতরাং বাহ্যত এটাই সাব্যস্ত হবে যে, সে বিক্রয়ে সমতারই ইচ্ছা করেছে। কাজেই দিনারের বিনিময়ে এক দিরহাম অবশিষ্ট রইল। দিরহাম ও দিনার দু শ্রেণীর বস্তু। আর দু শ্রেণীর বস্তুর ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা বিবেচ্য নয়। যদি চুক্তিকারীদ্বয় রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, আর এক পক্ষে তা কম হয় এবং কম পরিমাণের সাথে অন্য কোনো দ্রব্য থাকে যার মূল্য অপর পক্ষের অবশিষ্ট রৌপ্যের মূল্যের সমান হবে, তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি কোনো প্রকার মাকরুহ না হয়েই জায়েজ হবে। আর যদি অন্য দ্রব্যটির মূল্য অপর পক্ষের অবশিষ্ট রৌপ্যের মূল্যের সমান না হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি মাকরুহ হয়ে জায়েজ হবে। আর যদি ঐ দ্রব্যটি মূল্যহীন হয়, যেমন- মাটি, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কারণ, 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা, [এক পক্ষের রৌপ্যের] বেশি পরিমাণটুকুর বিনিময়ে কিছুই থাকছে না, কাজেই তা 'রিবা' [সুদ] হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْخ : قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ ذِرْهَمًا بِعَشْرَةِ ذَرَاهِمَ وَ دِينَارٍ جَارَ النَّبَيْعِ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ যদি এগারোটি দিরহাম বিক্রয় করে দশ দিরহাম ও এক দিনারের বিনিময়ে তাহলে জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের এগারো দিরহামের মধ্য হতে দশ দিরহাম অপর পক্ষের দশ দিরহামের বিনিময়ে ধরা হবে, যাতে সমান সমান হয়ে যায়। আর প্রথম পক্ষের অবশিষ্ট এক দিরহামকে অপর পক্ষের এক দিনারের বিনিময়ে ধরা হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ شَرْطَ النَّبَيْعِ فِي الدَّرَاهِمِ التَّمَاثُلُ عَلَى مَا رَوَيْنَا : বিক্রয় জায়েজ হওয়ার দলিল হলো, দিরহাম হচ্ছে রৌপ্যের তৈরি। আর রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীস الْخ -এর

ভিত্তিতে শর্ত হলো, উভয় পক্ষে সমান সমান হওয়া। আর চুক্তিকারীদ্বয়ের যেহেতু উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে তাদের বিক্রয় সহীহ হোক, সেহেতু যেভাবে ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয় সেভাবে ধর্তব্য হবে। কাজেই দ্বিতীয় পক্ষের দশ দিরহামের বিনিময়ে প্রথম পক্ষের এগারো দিরহামের মধ্য হতে দশ দিরহাম ধরা হবে, তাহলে উভয় পক্ষের রৌপ্যের পরিমাণ সমান সমান হয়ে যাবে। অতঃপর অবশিষ্ট থাকল প্রথম পক্ষের এক দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের এক দিনার। আর এ ক্ষেত্রে তো সমান সমান কিংবা কমবেশি করে উভয় প্রকারেই বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, উভয়টির শ্রেণী ভিন্ন, আর উভয় দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে সমান সমান করে বিক্রয় করা শর্ত নয়। এর দলিলও 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَبَاعَا نِصَّةً بِنِصَّةٍ أَوْ ذَكَاً بِذَكَبِ الْخ: মাসআলা হলো, কেউ যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করে কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, আর এক পক্ষের দ্রব্য অপর পক্ষের দ্রব্যের চেয়ে ওজনের দিক থেকে কম হয় এবং যে পক্ষে কম রয়েছে তার সাথে অন্য কোনো বস্তু রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ এক পক্ষে রয়েছে দশ দিরহাম ও অন্য একটি বস্তু, আর অপর পক্ষে রয়েছে পনের দিরহাম, তাহলে বিধান হলো, দশ দিরহামের সাথে যে বস্তুটি রয়েছে তার মূল্য যদি অপর পক্ষের অতিরিক্ত পাঁচ দিরহামের সমান হয়, তাহলে বিক্রয় মাকরুহ হওয়া ছাড়াই জায়েজ হবে। আর যদি বস্তুটির মূল্য পাঁচ দিরহাম না হয়, তাহলে বিক্রয় বিধানগতভাবে জায়েজ হবে কিন্তু মাকরুহ (তাহরীমী) হবে। আর যদি বস্তুটি একেবারে মূল্যহীন হয় যেমন- মাটির একটি টুকরা, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

যদি বস্তুটির মূল্য পাঁচ দিরহাম হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের দশ দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের পনের দিরহাম থেকে দশ দিরহাম ধরা হবে। আর প্রথম পক্ষের অন্য বস্তুটির বিনিময়ে অপর পক্ষের অবশিষ্ট পাঁচ দিরহাম ধরা হবে, কাজেই 'রিবা' সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

আর বস্তুটির মূল্য পাঁচ দিরহাম না হলে বিক্রয় মাকরুহ (তাহরীমী) হওয়ার কারণ হলো, এভাবে বিক্রয় করা হচ্ছে 'রিবা' [সুদ]-কে হালাল করার কৌশল বা 'হিলা'। কেননা, কেউ যদি উদাহরণস্বরূপ একশত দিনারের বিনিময়ে পঞ্চাশ দিনার বিক্রয় করতে চায়, তাহলে তা 'রিবা' হওয়ার কারণে হারাম হবে। তাই সে বিক্রয়কে জায়েজ করার কৌশল হিসেবে পঞ্চাশ দিনারের সাথে দুই কেজি ধান যুক্ত করে বিক্রয় করবে। সুতরাং হারাম 'রিবা'-কে হালাল করার কৌশল হওয়ার কারণে এটি মাকরুহ তাহরীমী হবে। এজন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-؟ قَوْلُهُ فَيَنْفَرُ "আপনি এরূপ বিক্রয়কে কিরূপ মনে করেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন- وَمِنْ الْجَبَلِ "পাহাড়সম অন্যায মনে করি।"

আর যদি বস্তুটি একেবারেই মূল্যহীন হয় তাহলে বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, মূল্যহীন বস্তু বিনিময়দ্রব্য হিসেবে গণ্য হয় না। কাজেই তা থাকা ও না থাকা সমান কথা। সুতরাং এক পক্ষে দশ দিরহাম হলো আর অপর পক্ষে পনের দিরহাম। ফলে অপর পক্ষের পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে প্রথম পক্ষে কোনো বিনিময়ে না থাকার কারণে তা 'রিবা' [সুদ] হবে এবং বিক্রয় হারাম হবে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মাসআলায় যে বলা হয়েছে, 'যে পক্ষের কম দিরহাম রয়েছে সে পক্ষের অন্য বস্তুটির মূল্য অপর পক্ষের অতিরিক্ত দিরহামের সমান হলে বিক্রয় মাকরুহ হওয়া ছাড়াই জায়েজ হবে', এ ক্ষেত্রে যদি বস্তুটির মূল্য সমান না হয়ে এতটুক কম হয় যা সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়কালে মানুষ ঠকতে পারে তাহলে তাও সমান বলেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি এত কম হয় যে, মানুষ বিক্রয়কালে ঠকলে এতটা ঠকে না তাহলে তা সমান হিসেবে গণ্য হবে না এবং বিক্রয় মাকরুহ হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ মাসআলার দাবি অনুসারে পূর্বে বর্ণিত দুই দিরহাম ও এক দিনার অপর পক্ষের দুই দিনার ও এক দিরহাম বিক্রয়ের মাসআলায়ও বিক্রয় মাকরুহ হবে। [ফাতহুল কাদীর]

وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخِرِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَشْرَةُ دِينَارًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَ دَفَعَ الدِّينَارَ وَتَقَاصًا الْعَشْرَةَ بِالْعَشْرَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا بَاعَ بِعَشْرَةِ مُطْلَقَةٍ، وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ يَجِبُ بِهَذَا الْعَقْدِ ثَمَنٌ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِينُهُ بِالْقَبْضِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالَّذِينَ لَيْسَ بِهِذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يَبْقَى الْمَقَاصَةُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ، فَإِذَا تَقَاصًا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ فَسَخَ الْأَوَّلُ وَالْإِضَافَةُ إِلَى الدِّينِ، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ يَكُونُ اسْتِبْدَالًا بِبَدَلِ الصَّرَفِ.

**অনুবাদ :** যদি কারো আরেক ব্যক্তির নিকট দশ দিরহাম পাওনা থাকে, অতঃপর যার নিকট দশ দিরহাম পাওনা সে যদি পাওনাদারের নিকট একটি দিনার বিক্রয় করে দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং দিনারটি পাওনাদারের নিকট হস্তান্তর করে আর [উভয়ে নিজ নিজ] দশ দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নেয়, তাহলে [ইসতিহাসনের ভিত্তিতে] তা জায়েজ হবে। মাসআলাটিতে [“দশ দিরহামের বিনিময়ে” কথাটির দ্বারা] উদ্দেশ্য হলো, যদি অনির্দিষ্ট দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে [তাহলে উক্ত বিধান হবে]। জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, এ বিক্রয়চুক্তির কারণে ক্রেতার উপর মূল্য [অনির্দিষ্ট দশ দিরহাম] এভাবে ওয়াজিব হয়েছে যে, তা [পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে] হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য, যার কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর ঋণের দশ দিরহাম একরূপ নয়। কাজেই সমশ্রেণীতা না থাকার কারণে কেবল বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কাটাকাটি সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং যখন তারা উভয়ে কাটাকাটি করেছে তখন এটি [শুদ্ধতার দাবিরূপে] প্রথম চুক্তিকে রহিত করে চুক্তিকে নতুন করে ঋণের দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করে নিবে। কেননা, যদি একরূপ ধরা না হয়, তাহলে ‘সরফ’ চুক্তিতে বিনিময়দ্রব্যকে [হস্তগত করার পূর্বে অন্য বস্তু দ্বারা] পরিবর্তন করা সাব্যস্ত হয়ে যাবে [যা জায়েজ নয়]।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخِرِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ الخ: মাসআলা হলো, কোনো [ঋণদাতা] ব্যক্তির যদি অপর এক [ঋণগ্রহীতা] ব্যক্তির নিকট দশ দিরহাম পাওনা থাকে অতঃপর ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকট একটি দিনার দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে এবং দিনারটি হস্তান্তর করে দেয়, [ফলে ঋণগ্রহীতারও ঋণদাতার নিকট দশ দিরহাম পাওনা হলো আর ঋণদাতারও পূর্বের ঋণের দশ দিরহাম পাওনা হলো] অতঃপর ত.রা. প্রত্যেকে অপরের নিকট প্রাপ্য দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে মাসআলাটির দুটি সুরত হতে পারে। প্রথম সুরত হলো, ঋণগ্রহীতার এক দিনার বিক্রয় করার সময়ই তারা উল্লেখ করে নিল যে, এ দিনারটি তার কাছে পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে। আর দ্বিতীয় সুরত হলো, বিক্রয়ের সময় কেবল ‘দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম’ এভাবে [অনির্দিষ্ট দশ দিরহাম] উল্লেখ করেছে, তারপর তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে ঋণের পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারের মূল্যের দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নিল।

প্রথম সূরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে আমাদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং কাটাকাটিও সহীহ হবে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও ইমাম যুফার (র.)-এর মতের অনুরূপ।

উল্লেখ্য, কিভাবে শুধু দ্বিতীয় সূরত তথা মতবিরোধপূর্ণ সূরতটি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম সূরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, ঋণগ্রহীতার দিনারটি দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় হচ্ছে 'বায় সরফ'। আর 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা শর্ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদিও বাহ্যিকভাবে শুধু এক পক্ষের দ্রব্য তথা দিনারটি মজলিসে হস্তগত করা হয়েছে আর অপর পক্ষের দশ দিরহাম মজলিসে হস্তগত করা হয়নি; কিন্তু বিধানগতভাবে অপর পক্ষের দশ দিরহামও হস্তগত করা হয়ে গেছে। এর কারণ হলো, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে প্রথমত যে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা এজন্য শর্ত যে, কোনো পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা না হলে এটি **بَيْعُ الْكَالِي** 'বাইন' অর্থাৎ 'দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যা নবী করীম **ﷺ** নিষেধ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় পক্ষের দ্রব্যও এজন্য নগদ হস্তগত করা শর্ত যাতে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হয়ে না যায়। কেননা, যদি এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা হয় আর অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা না হয় তাহলে উভয় দিকে সমতা রক্ষা হয় না, ফলে 'রিবা' (সুদ) সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আলাচ্য মাসআলায় যখন এক পক্ষের দ্রব্য তথা দিনারটি নগদ হস্তগত করা হয়েছে তখন "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়"-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা হয়েছে। আর অপর পক্ষের দ্রব্য তথা দশ দিরহাম যেহেতু তার পূর্ব থেকেই হস্তগত করা রয়েছে, কাজেই চুক্তিকালে উভয় দ্রব্যই হস্তগত করা হয়ে গেছে। সুতরাং উভয় দিকে সমতা সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হওয়া থেকেও রক্ষা হয়েছে। কাজেই সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে।

দ্বিতীয় সূরত যা কিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তথা "বিক্রয়ের সময় কেবল 'দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম' এভাবে [অনির্দিষ্ট দশ দিরহাম] উল্লেখ করেছে তারপর তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে ঋণের পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারের মূল্যের দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নিল" এ সূরতে ইমাম যুফার (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর কিয়াসের দাবিও হচ্ছে তাই। এটা কিয়াসের দাবি হচ্ছে এভাবে যে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় প্রথমে অনির্দিষ্ট [মুতলাক] দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। তারপর তারা উক্ত দশ দিরহামের পরিবর্তে ঋণের পাওনা দশ দিরহাম কাটাকাটি করেছে। ফলে 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে তারা এক পক্ষের দ্রব্য [দশ দিরহাম] হস্তগত করার পূর্বে তা অন্য দ্রব্য [তথা ঋণের দশ দিরহাম] দ্বারা পরিবর্তন করেছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কোনো দ্রব্য গ্রহণ করা জায়েজ নয়। কাজেই কিয়াসের দাবি অনুসারে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কিন্তু আমাদের মতে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে। এটি হচ্ছে 'ইসতিহসান' (اِسْتِحْسَانٌ)-এর দাবি অনুসারে।

**قَوْلُهُ وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ يَجِبُ بِهَذَا الْعَقْدِ الْخ** 'ইসতিহসান'-এর দাবি অনুসারে জায়েজ হচ্ছে এভাবে যে, আলাচ্য মাসআলায় ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকট দিনারটি বিক্রয় করেছে তখন দিনারটির মূল্য [দশ দিরহাম] হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব হয়েছে। কেননা, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। অপরদিকে ঋণগ্রহীতার নিকট পাওনা দশ দিরহাম হচ্ছে 'দাইন' [ঋণ] তা হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। সুতরাং দিনারের মূল্যের দশ দিরহাম হচ্ছে এক ধরনের, আর পাওনা দশ দিরহাম হচ্ছে আরেক ধরনের। কাজেই উভয় দশ দিরহামের ধরন (جِنْسٌ) ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে কাটাকাটি সহীহ না হওয়ার কথা। কিন্তু চুক্তিকারীদ্বয় যখন চুক্তির পর উভয়ে সম্মতিক্রমে কাটাকাটি করতে চাচ্ছে তখন তা [যথাসম্ভব] সহীহ করা আবশ্যিক। অতএব, তাদের এ কাটাকাটি সহীহ করার জন্য এ কথা বলতে হবে যে, তাদের কাটাকাটি দুটি বিষয়কে পরোক্ষভাবে (مُسْتَنْ) শামিল করে নিয়েছে।

একটি হচ্ছে, পূর্বের অনির্দিষ্ট দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটির বিক্রয়কে রহিতকরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চুক্তিটি নতুনভাবে ঋণের পাওনা দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্তকরণ। অর্থাৎ তারা যেন এ কথায় সন্মত হলো যে, আমরা পূর্বের চুক্তিটি বাতিল করে দিয়ে তোমার নিকট আমার পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি বিক্রয় করলাম। কেননা, এভাবে যদি পূর্বের চুক্তিটি রহিত করে দিনারটির বিনিময়কে পাওনা দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করা না হয়; বরং দিনারটির মূল্যের অনির্দিষ্ট (مُطْلَقًا) দশ দিরহামের বিনিময়ে পাওনা দশ দিরহাম দিয়েছে বলে ধরা হয় তাহলে 'বায় সরফ'-এর মাঝে এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা জায়েজ নয়। কাজেই তাদের কাটাকাটি সহীহ করার জন্য উক্ত দুটি বিষয় [অনিবার্য কারণে] পরোক্ষভাবে রয়েছে বলে ধরা হবে। সুতরাং যখন পূর্বের চুক্তি রহিত করে নতুনভাবে পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি বিক্রয় করেছে বলে ধরা হলো, তখন বিক্রয় ও কাটাকাটি জায়েজ হয়ে যাবে, যেভাবে প্রথম সূরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিলটি উপরে যেভাবে বর্ণনা করা হলো এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আত্মামা ইবনে হমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে উভয়ের কাটাকাটির কারণে প্রথম চুক্তিটি রহিত করে পুনরায় নতুনভাবে পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় ধরে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আমাদের দলিলটি হলো একরূপ যে, যখন চুক্তিকারীদ্বয় অনির্দিষ্ট (مُطْلَقًا) দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি ক্রয়-বিক্রয় করেছে তখন উক্ত দশ দিরহাম হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে আবশ্যিক। অতঃপর তারা যখন কাটাকাটি করেছে তখন তার অর্থ হচ্ছে যে, দিনারের মূল্যের দশ দিরহামকে পাওনা দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর পাওনা দশ দিরহাম তো ঋণগ্রহীতা [দিনার বিক্রেতা] পূর্বেই হস্তগত করেছে। কাজেই তা হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শুধু পার্থক্য এতটুকুই হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে হস্তগত করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে আগে আর তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে পরে। কিন্তু এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট করা যাতে সমতা সাব্যস্ত হয়, আর তা অর্জিত হয়ে গেছে।



وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الدِّينِ بَقَعَ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ، وَالْفَسْحُ قَدْ  
 بَثْنَتْ بِطَرِيقِ الْإِقْتِصَاءِ، كَمَا إِذَا تَبَايَعَا بِأَلْفٍ ثُمَّ بِأَلْفٍ وَخَمْسٍ مِائَةٍ وَزُقُرُ (رح)  
 يُخَالِفُنَا فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالْإِقْتِصَاءِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الدِّينُ سَائِقًا، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدٍ  
 فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، لِيَتَضَمَّنِ انْفِسَاخَ الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةَ إِلَى دَيْنٍ قَائِمٍ وَقَدْ  
 تَحَوَّلَ الْعَقْدُ، فَكَفَى ذَلِكَ لِلْجَوَازِ قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ ذَرَاهِمٍ صَحِيحٍ وَذَرَاهِمِينَ  
 غَلَّتَيْنِ بِذَرَاهِمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَذَرَاهِمٍ غَلَّتِي، وَالْغَلَّةُ مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَيَأْخُذُهُ  
 التُّجَّارُ، وَوَجْهُهُ تَحَقُّقُ الْمَسَاوَةِ فِي الْوِزْنِ، وَمَا عُرِفَ مِنْ سُقُوطِ اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ -

অনুবাদ : পক্ষান্তরে [প্রথম চুক্তিকে রহিত করে] চুক্তিকে ঋণের দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করলে কেবল চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেই কাটাকাটি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। আর চুক্তি রহিতকরণ কখনো অনিবার্যতার দাবিতেও [আপনা-আপনি] সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন- দু-জনে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করল, তারপর তারা চুক্তি পুনরায় পনের শত দিরহামের বিনিময়ে সম্পাদন করল। ইমাম যুফার (র.) এ ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতবিরোধ পোষণ করেন। কেননা, তিনি অনিবার্যতার দাবিতে [আপনা-আপনি] চুক্তি রহিতকরণ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না। উপরিউক্ত বিধান হলো যদি ঋণের পাওনা বিক্রয়চুক্তির পূর্বের হয়ে থাকে। আর যদি ঋণের পাওনা চুক্তির পরের হয়ে থাকে, তাহলেও দুটি বর্ণনার বিসৃদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে অনুরূপ বিধানই হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রেও [কাটাকাটির মাধ্যমে] চুক্তি পরিবর্তনকালে প্রথম চুক্তি রহিত হয়ে ঋণের দিরহামের সাথে চুক্তি সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি [অনিবার্যতার দাবির কারণে] অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর জায়েজ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। ইমাম কুদরী (র.) বলেন, দুটি সহীহ দিরহাম ও একটি গল্লাহ দিরহামের বিনিময়ে একটি সহীহ দিরহাম ও দুটি গল্লাহ দিরহাম বিক্রয় করা জায়েজ। গল্লাহ দিরহাম (غُلَّة) হলো যা 'বাইতুল মাল' ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু ব্যবসায়ীগণ গ্রহণ করে। মাসআলটিতে বৈধতার কারণ হলো, ওজনের ক্ষেত্রে সমতা বিদ্যমান হওয়া, আর উৎকৃষ্টতার বিষয় ধর্তব্য না হওয়ার যা [রিবার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে] পরিজ্ঞাত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الدِّينِ بَقَعَ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বে বলা হয়েছে যে, দিনারটির মূল্যের দশ দিরহাম এবং পাওনা দশ দিরহাম এই উভয়টির ধরন ভিন্ন হওয়ার কারণে কাটাকাটি করার সম্ভব নয়। তাহলে পরে আবার প্রথম চুক্তি রহিত ধরে কাটাকাটি কীভাবে সহীহ হলো? উত্তরের সারকথা হলো, আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম চুক্তি রহিত ধরার পর আর কাটাকাটি ধরা হয়নি; বরং এরূপ ধরা হয়েছে যে, প্রথম চুক্তি রহিত করে তারা ঋণের পাওনা দশ দিরহামকেই মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। ফলে স্বয়ং দ্বিতীয় চুক্তিই পাওনা দশ দিরহামকে ঋণগ্রহীতা [দিনার বিক্রোতা]-কে কেটে দিয়েছে। উল্লেখ্য, عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ বলে মুসান্নিফ (র.) দু লাইন পরের তাঁর বক্তব্য ذَلِكَ تَحْوِيلُ الْعَقْدِ فَكَفَى ذَلِكَ دَيْنٍ قَائِمٍ إِلَى الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةَ إِلَى دَيْنٍ قَائِمٍ وَقَدْ تَحَوَّلَ الْعَقْدُ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আরেকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

الْحَقُّ وَالنَّصَحُ قَدْ يَنْتَبِطُ بِطَرِيقِ الْإِفْتِصَاءِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন : প্রশ্নটি হলো, যদি আপনারদের বর্ণনা অনুসারে কাটাকাটির কারণে প্রথম চুক্তিকে তারা রহিত বা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ধরা হয়, তাহলে তো কাটাকাটির সময় দিনারের মালিক তথা ঋণগ্রহীতা দিনারটি ফেরত গ্রহণ করে পুনরায় হস্তান্তর করা আবশ্যক হওয়ার কথা। কেননা, কোনো বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তার বিধান হচ্ছে ক্রেতা তার মূল্য ফেরত নিবে এবং বিক্রেতা তার বিক্রীত-দ্রব্য ফেরত গ্রহণ করবে। অথচ আলোচ্য মাসআলায় তো দিনারের মালিককে দিনারটি ফেরত নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে যে তারা প্রথম চুক্তিকে রহিত বা প্রত্যাহার করেছে বলে ধরা হয়েছে তা তারা স্পষ্টরূপে প্রত্যাহার করেনি; বরং অনিবার্য কারণে (بَطَرِيقِ الْإِفْتِصَاءِ) ধরে নেওয়া হয়েছে। আর অনিবার্য কারণে (بَطَرِيقِ الْإِفْتِصَاءِ) যা ধরে নেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে ঐ বিধান প্রযোজ্য হয় না, যা স্পষ্টভাবে সম্পাদন করলে প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রথম চুক্তি প্রত্যাহার করেছে বলে ধরা হলেও দিনারের মালিকের উপর দিনারটি ফেরত গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি একটি দ্রব্য এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে প্রথমে বিক্রয় করে এবং দ্রব্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে, তারপর আবার ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে চুক্তি পনের শত দিরহামের বিনিময়ে করার ব্যাপারে সম্মত হয় তাহলে এটাই ধর্তব্য হয় যে, তারা প্রথম চুক্তি প্রত্যাহার করে পুনরায় পনের শত দিরহামের বিনিময়ে দ্রব্যটি বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। এ ক্ষেত্রেও যেহেতু তারা স্পষ্টভাবে প্রথম চুক্তি রহিত বা প্রত্যাহার করেনি; বরং পরের চুক্তি সহীহ করার জন্য অনিবার্য কারণে প্রথম চুক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে ধরা হয়েছে, সেহেতু বিক্রেতাকে দ্রব্যটি ফেরত গ্রহণ করে পুনরায় হস্তান্তর করার আবশ্যকতা নেই। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও দিনারের মালিকের জন্য দিনারটি ফেরত নিয়ে পুনরায় হস্তান্তর করা আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ وَ زُرُّ (رَحَا) يَخَالِفُنَا فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِإِفْتِصَاءِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) আমাদের সাথে মতবিরোধ করেন। তাঁর মতে কাটাকাটির মাধ্যমে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধের কারণ হলো, তিনি (رَحَا) অর্থাৎ অনিবার্য কারণে পরোক্ষভাবে কোনো চুক্তি কিংবা চুক্তি রহিত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়াকে মানেন না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় তাঁর মতে কাটাকাটির কারণে পরোক্ষভাবে প্রথম চুক্তি রহিত বা প্রত্যাহার করা হয়নি। অতএব, চুক্তিকারীদ্বয়ের কাটাকাটি সঠিক হবে না। [বিস্তারিত দলিল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।]

قَوْلُهُ وَ هَذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ سَائِقًا، فَإِنْ كَانَ لَاحِقًا الْحَقُّ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে মতবিরোধসহ বিধান বর্ণনা করা হলো তা ছিল 'যদি দিনার বিক্রয়কারীর নিকট দিনার ক্রয়কারীর পূর্ব থেকে দশ দিরহাম পাওনা থাকে' এরূপ সূরতে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, প্রথমে দিনার ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছে তারপর বিক্রেতার নিকট ক্রেতার নতুন করে পাওনা হয়েছে, অতঃপর সেই পাওনা দিরহামের বিনিময়ে দিনারের মূল্য কাটাকাটি করে নিল। যেমন- এক ব্যক্তি একটি দিনার অপর ব্যক্তির নিকট দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল এবং দিনারটি হস্তান্তর করে দিল কিন্তু ক্রেতা দশ দিরহাম হস্তান্তর করেনি। অতঃপর মজলিসে থাকাবস্থায়ই ক্রেতা একটি কাপড় বিক্রেতার নিকট দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল। এখন দিনারের মালিকের ক্রেতার নিকট দশ দিরহাম পাওনা হয়েছে আবার ক্রেতার দিনারটির মালিকের নিকট দশ দিরহাম পাওনা হয়েছে। অতঃপর উভয়ে তাদের পাশাপাশি দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নিল। এরূপ সূরত হলে বিধান কি হবে? সে ক্ষেত্রে আমাদের মায়হাবে দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে এ ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে এবং কাটাকাটি সহীহ হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে ফকহী আবু সুলায়মান (র.)-এর রেওয়ায়েত এবং ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদরী (র.) এটিই গ্রহণ করেছেন। মুসান্নিফ (র.)-এর মতে এটিই হচ্ছে বিতর্কিতম রেওয়ায়েত। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে কাটাকাটি সহীহ হবে না, কাজেই এমতাবস্থায় পরস্পরে পৃথক হয়ে গেলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে ফকহী আবু হাফস (র.)-এর রেওয়ায়েত। ইমাম শামসুল আযিমাহ ও কাহী খান (র.) এ রেওয়ায়েতই গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, মূলত কিয়াস অনুযায়ী পূর্বের সূরতেও জায়েজ না হওয়ার কথা ছিল। জায়েজ করা হয়েছে কিয়াসের বিপরীতে হয়রত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের কারণে। আর হাদীসটি কেবল ঐ সূরতের ক্ষেত্রেই বর্ণিত হয়েছে, যখন পাওনা পূর্বের হবে আর কাটাকাটি সংশ্লিষ্ট চুক্তি পরে হবে। কাজেই কিয়াসের বিপরীত হওয়ার কারণে জায়েজ হওয়ার বিধান কেবল এ সূরতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي كُنْتُ إِذَا بَنَيْتُ إِلَى مَكَّةَ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخَذْتُ مَكَانَهَا دَنَانِيرَ أَوْ قَالَ بِالنَّعْكَسِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا انْتَفَقَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا عَمَلٌ.

“হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ‘বাকী’ নামক স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত দিরহামের বিনিময়ে উট ভাড়া দেই, অতঃপর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে দিনার গ্রহণ করি অথবা তিনি এর বিপরীত বলেছেন [অর্থাৎ দিনারের বিনিময়ে ভাড়া দেই অতঃপর উক্ত দিনারের বিনিময়ে দিরহাম গ্রহণ করি]। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি তোমরা এভাবে পৃথক হও যে, তোমাদের [চুক্তি সম্পাদন ও দিরহামের পরিবর্তে দিনার গ্রহণের] মাঝে কোনো কাজের দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি।” এ হাদীসে ভাড়া উট গ্রহণকারীর নিকট প্রথমে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর দিরহাম পাওনা হয়েছে। অতঃপর উট গ্রহণকারী তাঁর নিকট দিনার বিক্রয় করেছে এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) তা হস্তগত করেছেন আর দিনারের মূল্য তাঁর পাওনা দিরহামের বিনিময়ে কাটাকাটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীসে কেবল প্রথমে পাওনা ঋণের বিনিময়ে পরে কাটাকাটি করার বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, তা এ সূরতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

قَوْلُهُ لَيُتَصَدَّقُ أَنْفَسَ الْأَوَّلِ وَالْإِسَافَةِ إِلَى ذَيْنِ كَائِمِ الْخ: মুসান্নিফ (র.)-এর মতে প্রথম রেওয়ায়েত তথা জায়েজ হওয়ার রেওয়ায়েতটি অধিক বিতৃষ্ণ হওয়ার কারণ হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাটাকাটি সহীহ করার জন্য এ কথাই ধরে নিতে হবে যে, তারা কাটাকাটির সময় পূর্বের চুক্তি রহিত করেছে এবং নতুনভাবে ঋণের দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। সুতরাং আলোচ্য সূরতে যদিও প্রথমে দিনারটি বিক্রয়চুক্তির সময় দিনারটি ক্রয়কারীর কোনো পাওনা ছিল না, কিন্তু যখন তারা কাটাকাটি করেছে তখন তো কাপড়টির মূল্য হিসেবে দিনার ক্রেতার দশ দিরহাম পাওনা রয়েছে দিনার বিক্রোতার নিকট। আর “কাটাকাটি” যখন নতুন চুক্তি ধরা হলো তখন এটাই হলো যে চুক্তিকালে দিনার ক্রেতার যে পাওনা ছিল সেই পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি ক্রয় করা হলো। সুতরাং এ সূরতটিও পূর্বের সূরতের ন্যায়ই হলো। সারকথা হচ্ছে কাটাকাটির পূর্বে ক্রেতার ঋণ সাব্যস্ত হলেই যথেষ্ট হবে, প্রথম বিক্রয়চুক্তির পূর্বে ঋণ থাকা আবশ্যিক নয়। কেননা, কাটাকাটি হচ্ছে পুনরায় চুক্তির ন্যায়। কাজেই সেই সময়টি ধর্তব্য হবে।

উল্লেখ্য, এ সূরতেও আল্লামা ইবনে হুমাম (র.)-এর বর্ণিত দলিল অনুসারে কাটাকাটিকে নতুন চুক্তি ধরে নেওয়ার কোনো আশঙ্ক্যতা নেই; বরং এ ক্ষেত্রেও জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, পরস্পরে নগদ হস্তগত করা শর্ত হওয়ার যা উদ্দেশ্য তা ঋণের বিনিময়ে কাটাকাটির দ্বারা অর্জিত হয়। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয় পক্ষে সমতা রক্ষা করা। আর আলোচ্য সূরতে তা অর্জিত হয়েছে। কারণ, কোনো পক্ষের দ্রব্যই মজলিসের পরে বাকি থাকেনি।

قَوْلُهُ وَبِجُزْءٍ بَعْدَ دَرْهَمٍ صَحِيحُ الْخ: [সহীহ দিরহাম] বলা হয় এমন দিরহামকে যা সম্পূর্ণটি একটি টুকরো। আর دَرْهَمٌ غُلَّةٌ [গল্লাহ দিরহাম] বলা হয় এমন দিরহামকে যা একাধিক টুকরোয় বিভক্ত। বর্তমানে আমাদের দেশের এক টাকার কয়েন এবং খুচরা পয়সার এক টাকার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। খুচরা পয়সার এক টাকা যেমন দুটি আধলি [৫০ পয়সা] কিংবা চারটি সিকি [২৫ পয়সা] মিলে এক টাকা হয়, কিন্তু তা এক টাকা হলেও কয়েক টুকরায় বিভক্ত। আর এক টাকার কয়েন হলে টাকাটি সম্পূর্ণ একটি টুকরা হয়। কাজেই এক টাকার কয়েন হচ্ছে পূর্বকার সহীহ দিরহামের পর্যায়ে, আর খুচরা পয়সার এক টাকা হচ্ছে পূর্বকার ‘গল্লাহ দিরহাম’-এর পর্যায়ে। তবে সহীহ দিরহাম ও ‘গল্লাহ দিরহাম’ ওজনের ক্ষেত্রে সমান সমান হতো। ‘গল্লাহ দিরহাম’ একাধিক টুকরায় বিভক্ত হওয়ার কারণে সেকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা ‘বাইতুল মাল’ তা গ্রহণ করত না, তবে ব্যরসায়ীরা তা গ্রহণ করত। আর সহীহ দিরহাম উভয়েই গ্রহণ করত।

মাসআলা হলো, কেউ যদি দুটি দিরহাম ও একটি ‘গল্লাহ দিরহাম’-এর বিনিময়ে একটি সহীহ দিরহাম ও দুটি ‘গল্লাহ দিরহাম’ বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই তিন দিরহাম করে রয়েছে এবং ওজনের দিক থেকে উভয় পক্ষের দ্রব্যই সমান। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘বায় সরফ’-এর ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ওজনের দিক থেকে উভয় পক্ষের দ্রব্য সমান সমান হওয়া। আর গণগত দিক থেকে তারতম্য থাকলে তা ধর্তব্য হয় না। কাজেই ‘বায় সরফ’-এর শর্ত মোতাবেক হওয়ার কারণে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِضَّةٌ، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبُ فَهِيَ ذَهَبٌ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يَحْتَسِرُ فِي الْجِيَادِ حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُ الْخَالِصَةِ بِهَا وَلَا يَبْعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إِلَّا مُتَسَاوِيًا فِي الْوِزْنِ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْإِسْتِقْرَاضُ بِهَا إِلَّا وَزْنًا، لِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غَشٍّ عَادَةً، لِأَنَّهَا لَا تَنْطِيعُ إِلَّا مَعَ الْغَشِّ، وَقَدْ يَكُونُ الْغَشُّ خَلْقِيًّا كَمَا فِي الرَّدِيِّ مِنْهُ، فَيَلْحَقُ الْقَلِيلُ بِالرَّذَاءِ، وَالْجَيِّدُ وَالرَّدِيُّ سَوَاءٌ۔

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, দিরহামের মধ্যে যদি রৌপ্যের অংশ প্রধান হয় তাহলে তা [সম্পূর্ণ] রৌপ্য বলেই বিবেচিত হবে। আর দীনারের মধ্যে যদি স্বর্ণের অংশ বেশি হয় তাহলে তা [সম্পূর্ণ] স্বর্ণ বলেই বিবেচিত হবে। আর উভয়টিতে তখন কমবেশি করা হারাম হওয়ার বিষয়টি ঠিক সেরূপই বিবেচিত হবে যে রূপ উৎকৃষ্ট দিরহাম-দীনারের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরূপ মুদ্রার বিনিময়ে খাঁটি মুদ্রা কিংবা এরূপ মুদ্রার একটির বিনিময়ে অন্যটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওজনের দিক থেকে সমতা ব্যতীত বিক্রয় জায়েজ হবে না। তদ্রূপ এরূপ খাদযুক্ত মুদ্রা ওজনের ভিত্তিতে না হলে কর্ত্ত গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা, [স্বর্ণ ও রৌপ্য] মুদ্রা সাধারণত সামান্য খাদ থেকে মুক্ত হয় না। কারণ, খাদ ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্য জমাট বাঁধে না। আর কখনো সৃষ্টিগতভাবেই খাদ থাকে। যেমন- নিম্নমানের স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে। অতএব, অল্প খাদকে স্বর্ণ-রৌপ্য নিম্নমানের হওয়া বলে গণ্য করা হবে। আর উৎকৃষ্ট স্বর্ণ-রৌপ্য ও নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য সমান বলে গণ্য হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ : মাসআলা হলো, যদি দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা]-এর মাঝে খাদ হিসেবে অন্য ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করা থাকে তাহলে যদি রূপার পরিমাণ বেশি হয় আর খাদের পরিমাণ কম হয় তাহলে দিরহামটি বিধানগত দিক থেকে রূপা হিসেবেই গণ্য হবে। কাজেই এরূপ দিরহামের বিনিময়ে যদি খাঁটি রূপা ক্রয় করে কিংবা এরূপ খাদযুক্ত দিরহামের বিনিময়ে অন্য একটি খাদযুক্ত দিরহাম ক্রয় করে, তাহলে সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যিক হবে। এরূপভাবে দিনার [স্বর্ণমুদ্রা]-এর ক্ষেত্রে যদি স্বর্ণের পরিমাণ বেশি থাকে আর খাদের পরিমাণ কম থাকে, তাহলে উক্ত দিনারটি বিধানগত দিক থেকে স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হবে। কাজেই তা দ্বারা যদি খাঁটি স্বর্ণ ক্রয় করা হয় কিংবা অন্য একটি খাদযুক্ত দিনার ক্রয় করা হয় তাহলে উভয় পক্ষ স্বর্ণ হওয়ার কারণে উভয় দিকের দ্রব্য ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যিক হবে।

আর এরূপ খাদযুক্ত দিরহাম কিংবা দিনার কর্ত্ত দিলে তা ওজনের ভিত্তিতে দেওয়া আবশ্যিক হবে; সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে তা কর্ত্ত দেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই তা ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনার যেহেতু বিধানগত দিক থেকে রৌপ্য ও স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হবে সেহেতু তা ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যিক হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غَشٍّ : খাদের পরিমাণ কম হলে দিরহামকে রৌপ্য হিসেবে গণ্য করা এবং দিনারকে স্বর্ণ হিসেবে গণ্য করার দলিল হলো, মুদ্রা তথা দিরহাম ও দিনার সাধারণত খাদ ছাড়া হয় না। কেননা, খাঁটি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের সাথে খাদ মিশ্রিত না করলে তা মজবুত হয় না, ফলে তা দ্বারা মুদ্রা তৈরি করা সম্ভব হয় না। আবার কখনও কখনও প্রাকৃতিকভাবেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে খাদ যুক্ত থাকে। যেমন নিম্নমানের স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের সাথে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু খাদ মিশ্রিত থাকে। আর হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নমানের স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং উৎকৃষ্ট মানের স্বর্ণ ও রৌপ্য বিধানগত দিক থেকে সমান বলে গণ্য হয়। কাজেই অল্প খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনার নিম্নমানের রৌপ্য ও স্বর্ণের পর্যায়ে বলে গণ্য হবে। অতএব, তা খাঁটি স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে।

وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغَشُّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَابِيرِ إِعْمَارًا لِلْغَالِبِ  
فَإِنْ اشْتَرَى بِهَا فَضَّةً خَالِصَةً فَهُوَ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي حِلْيَةِ السَّنَفِ.

অনুবাদ : আর যদি দিরহাম দিনারের মাঝে 'খাদ'-এর পরিমাণ প্রধান হয় তাহলে তার বিধান স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিধানের ন্যায় হবে না। কেননা, প্রধান অংশের দিক বিবেচ্য হয়। সুতরাং যদি একরূপ দিরহামের বিনিময়ে খাঁটি রূপা ক্রয় করে তাহলে তার বিধান ঐ সকল সুরতের অনুরূপ হবে যা আমরা রৌপ্যখচিত তরবারির ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغَشُّ : যদি দিরহাম বা দিনারের মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি হয় আর রৌপ্য বা স্বর্ণের পরিমাণ কম হয় তাহলে তা বিধানগত দিক থেকে দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা] বা দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] বলে গণ্য হবে না; বরং তা রৌপ্য বা স্বর্ণ সংযুক্ত সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে খাদের পরিমাণ বেশি, আর যার পরিমাণ বেশি হয় তা ধর্তব্য হয়। কাজেই তা সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে, মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে না।

অতএব, যদি কেউ একরূপ খাদযুক্ত দিরহামের বিনিময়ে খাঁটি রৌপ্য ক্রয় করে কিংবা একরূপ খাদযুক্ত দিনারের বিনিময়ে খাঁটি স্বর্ণ ক্রয় করে, তাহলে তার বিধানের ক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত রৌপ্য সংযুক্ত তরবারি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে কয়টি সুরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে কয়টি সুরত প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ দিরহামের ক্ষেত্রে মাসআলাটি হবে একরূপ যে, যদি অপর পক্ষের খাঁটি রৌপ্যের পরিমাণ খাদযুক্ত দিরহামের মাঝে যে পরিমাণ রৌপ্য বিদ্যমান আছে তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে বেশিটুকু দিরহামের মধ্যে যে খাদ রয়েছে তার বিনিময়ে ধরা হবে।

আর যদি অপর পক্ষে খাঁটি রৌপ্যের পরিমাণ খাদযুক্ত দিরহামের মাঝে যে পরিমাণ রৌপ্য বিদ্যমান আছে তার সমান হয় কিংবা কম হয় অথবা কম না বেশি তা জানা না থাকে, তাহলে দিরহামের রৌপ্যের অংশে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। আর খাদের অংশ যদি রৌপ্যের অংশ থেকে কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়া পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে খাদের অংশের বিক্রয় বহাল থাকবে। অন্যথায় খাদের অংশের বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে। এর বিস্তারিত কারণ পূর্বে রৌপ্য সংযুক্ত তরবারি বিক্রয়ের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এখানে মুসান্নিফ (র.) খাদযুক্ত দিরহাম দিনারের ক্ষেত্রে কেবল দুটি সুরতের বিধান উল্লেখ করেছেন—

১. খাদের পরিমাণ কম হলে তার বিধান।
২. খাদের পরিমাণ বেশি হলে তার বিধান। কিন্তু খাদের পরিমাণ রৌপ্য বা স্বর্ণের সমান হলে তার বিধান কি হবে? তা উল্লেখ করেননি। এর বিধান হলো, এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণটি রৌপ্য বা স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হবে। অর্থাৎ খাদের তুলনায় রৌপ্য বা স্বর্ণের পরিমাণ বেশি হলে যেরূপ তা রৌপ্য ও স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হয় তদ্রূপ সমান সমান হলেও রৌপ্য ও স্বর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। — [ফতোয়ায়ে শামী খও-৭, পৃ. ৫৩৪]

فَيَنْ يَبْعَتُ بِحِنْشِهَا مُتَفَاضِلًا جَارَ صَرَفًا لِلْجَنِّسِ إِلَى خِلَافِ الْجَنِّسِ مَعِي فِي حُكْمِ  
شَبَابَيْنِ فِضَّةً وَصَفْرٍ، وَلَكِنَّهُ صَرَفٌ حَتَّى يُشْتَرَطَ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لَوْ كُنُوهُ  
الْفِضَّةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَإِذَا شُرِطَ الْقَبْضُ فِي الْفِضَّةِ يُشْتَرَطُ فِي الصُّفْرِ، لِأَنَّهُ  
لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ إِلَّا بِضَرِّ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَمَشَاهِجًا (رحا) لَمْ يُفْتَوْا بِجَوَازِ  
ذَلِكَ فِي الْعَدَالِيِّ وَالْغَطَارِقَةِ، لِأَنَّهَا أَعَزُّ الْإِمْوَالِ فِي دِيَارِنَا فَلَوْ أُبْيَحَ التَّفَاضُلُ فِيهِ  
بِنَفْتَحُ بَابِ الرِّوَا .

অনুবাদ : সুতরাং যদি এরূপ খাদ-প্রধান দিরহাম সমশ্রেণীর দিরহামের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করে, তাহলে  
জায়েজ হবে : [এ বৈধতা হচ্ছে] খাদ ও রৌপ্যের প্রত্যেকটি অপর শ্রেণীর বিপরীতে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। সুতরাং  
দিরহামগুলো দুটি জিনিস তথা রৌপ্য ও পিতলের হুকুমভুক্ত হবে। তবে উভয় দিকে রৌপ্য থাকার কারণে চুক্তিটি  
'ব'য়' সরফ' হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যিক হবে। আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে  
যখন হস্তগত করা আবশ্যিক হলো, তখন পিতলের ক্ষেত্রেও হস্তগত করা আবশ্যিক হবে। কেননা, ক্ষতি ছাড়া  
পিতলকে রৌপ্য থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, তবে আমাদের মাশায়েখগণ [ফকীহগণ]  
আদালী ও গাতরেফী দিরহামের ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন না। কেননা, এ  
দুটি হচ্ছে আমাদের দেশের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। কাজেই যদি এ ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিনিময় বৈধ করা হয়, তাহলে  
'রিব' [সুদ] -এর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَنْ يَبْعَتُ بِحِنْشِهَا مُتَفَاضِلًا جَارَ الخ : মাসআলা হলো, যে সকল দিরহামের মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি তা যদি  
অনুরূপ অধিক খাদযুক্ত দিরহামের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। অর্থাৎ উভয় পক্ষে সমান  
সমান হওয়া আবশ্যিক হবে না। দিনারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান হবে। এ ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ  
হলো, যেহেতু খাদ বেশি হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ দিরহাম রৌপ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে না, সেহেতু উভয় পক্ষেই দুটি করে দ্রব্য  
সাব্যস্ত হচ্ছে—

১. রৌপ্য,

২. খাদ তথা পিতল [বা অন্য কোনো ধাতব পদার্থ]।

সুতরাং যদি প্রথম পক্ষের রৌপ্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের পিতল এবং প্রথম পক্ষের পিতলের বিনিময়ে অপর পক্ষের রৌপ্য  
ধরা হয় তাহলে উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হওয়ার কারণে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হয়; অতএব, বিক্রয় যথাসম্ভব  
জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য তা-ই ধরা হবে। উল্লেখ্য, এ মাসআলার অনুরূপ মাসআলা হিদায়া গ্রন্থের ৯২ নং পৃষ্ঠার ওরুতে  
মতবিরোধ ও দলিলসহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَلِكُنْهُ صَرْفٌ حَتَّى يَنْتَرِطَ النَّفْسُ الْح : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য সূরতে যদি এক পক্ষের রৌপ্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের পিতল ধরা হয় তাহলে চুক্তিটি 'বায় সরফ' হবে না। কেননা, 'বায় সরফ' হয় যদি উভয় পক্ষের দ্রব্য স্বর্ণ বা রৌপ্য হয়। সুতরাং যদি 'বায় সরফ' না হয়, তাহলে উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে তথা উভয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যিক হবে না। অথচ আলোচ্য সূরতে বিধান হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যিক।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি 'বায় সরফ'-ই হবে। এর কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে যে এক পক্ষের রৌপ্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের খাদ তথা পিতল ধরা হয়েছে তা ছিল চুক্তিটি জায়েজ করার জন্য অনিবার্য কারণে। আর প্রয়োজনের তাগিদে অনিবার্য কারণে যা ধরা হয় তা কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রটিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার প্রভাব অন্য ক্ষেত্রে পড়ে না। কাজেই 'বায় সরফ' না হওয়ার বিষয়টি কেবল কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রেই ধর্তব্য হবে। আর নগদ হস্তগত করা আবশ্যিক হওয়ার ক্ষেত্রে এটি 'বায় সরফ' হিসেবেই বহাল থাকবে। কেননা, উভয় দিকে প্রকৃতপক্ষে রৌপ্য রয়েছে। আর উভয় দিকে রৌপ্য থাকার কারণে যখন উভয়ের রৌপ্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যিক হয়েছে তখন অবশিষ্ট খাদ তথা পিতলের ক্ষেত্রেও নগদ হস্তগত করা আবশ্যিক হবে। কেননা, ক্ষতি সাধন ব্যতীত খাদ রৌপ্য থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। সুতরাং উভয় অংশই নগদ হস্তগত করা শর্ত হবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَمَشَانِخُنَا (رح) الْح : মুসান্নিফ (র.) বলেন, দিরহাম বা দিনারের ক্ষেত্রে খাদের পরিমাণ বেশি হলে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। কিন্তু আমাদের 'মা ওরাউন নাহর' তথা বুখারা ও সমকন্দ-এর মাশায়েখগণ 'আদালী' ও 'গাতারিফ' মুদার ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন না। অথচ এ দুটি মুদার মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি, তাই উপরে বর্ণিত মাসআলা অনুসারে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার কথা। এ দুটি মুদার ক্ষেত্রে তাদের কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া না দেওয়ার কারণ হলো, এ দুটি মুদার ক্ষেত্রে যদি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ ফতোয়া প্রদান করা হয় তাহলে জনগণ এ জনপ্রিয় মুদার ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করতে করতে ক্রমান্বয়ে খাঁটি দিরহাম ও দিনারের ক্ষেত্রেও কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করা আরম্ভ করে দিবে। ফলে তারা 'রিবা' তথা সুদী লেনদেনের মাঝে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাই 'রিবা' বা সুদের পথ যাতে উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য ফকীহগণ উক্ত দুটি ক্ষেত্রে কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন না।

জ্ঞাতব্য : عَدَائِي 'আদালী' হচ্ছে তৎকালীন এক বাদশার নাম। তার নামানুসারে এক প্রকার অধিক খাদযুক্ত দিরহামকে 'আদালী' বলা হতো। আর غَطَارِفَةُ الْكَنْدِي -এর নামানুসারে নামকরণকৃত এক প্রকার দিরহাম। এ দিরহামেও খাদের পরিমাণ বেশি থাকত। غَطْرِيفُ بْنُ عَطَاءٍ ছিলেন বাদশাহ হারুনুর রশীদ-এর শাসনামলে খুরাসানের গভর্নর। তবে কারো কারো মতে তিনি বাদশাহ হারুনুর রশীদের মামা ছিলেন।

ثُمَّ إِنْ كَانَتْ تُرَوِّجُ بِالْوِزْنِ فَالْتَّبَاعُ وَالْإِسْتِقْرَاضُ فِيهِمَا بِالْوِزْنِ، وَإِنْ كَانَتْ تُرَوِّجُ  
بِالْعَدِّ فِالْعَدِّ، وَإِنْ كَانَتْ تُرَوِّجُ بِهِمَا فِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْمَعْتَبَرَ هُوَ الْمَعْدَادُ  
فِيهِمَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَصٌّ، ثُمَّ هِيَ مَا دَامَتْ تُرَوِّجُ تَكُونُ أَثْمَانًا لَا تَتَغَيَّرُ  
بِالْتَّغْيِيرِ، وَإِذَا كَانَتْ لَا تُرَوِّجُ فَهِيَ سِلْعَةٌ تَتَغَيَّرُ بِالْتَّغْيِيرِ، وَإِذَا كَانَتْ يَتَقَبَّلُهَا  
الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَهِيَ كَالزُّنُونِ، لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا بَلْ بِجِنْسِهَا زُنُونًا،  
إِنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ بِحَالِهَا لِتَحَقُّقِ الرِّضَاءِ مِنْهُ، وَبِجِنْسِهَا مِنَ الْجِبَادِ، إِنْ كَانَ  
لَا يَعْلَمُ لِعَدَمِ الرِّضَاءِ مِنْهُ -

অনুবাদ : আর খাদ-প্রধান দিরহাম দিনার যদি ওজন হিসেবে প্রচলিত হয় তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় ও কর্জ গ্রহণ ওজনের ভিত্তিতে করতে হবে। আর যদি গণনার ভিত্তিতে প্রচলন হয়ে থাকে তাহলে গণনার ভিত্তিতেই করতে হবে। আর যদি ওজন এবং গণনা উভয়ের ভিত্তিতে প্রচলন হয়ে থাকে তাহলে উভয়ের যে কোনোটির ভিত্তিতেই তা করতে পারবে। কেননা, খাদ-প্রধান দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রে যেহেতু 'নস' [শরিয়তের স্পষ্ট বাণী] নেই সেহেতু এ দুটির ক্ষেত্রে প্রচলনই বিবেচ্য হবে। আর যে পর্যন্ত তা [মুদ্রা হিসেবে] প্রচলিত থাকবে সে পর্যন্ত তা 'মূলদ্রব্য' বলে গণ্য হবে, নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে না। আর যখন তা [মুদ্রা হিসেবে] প্রচলিত না থাকবে তখন তা পণ্যদ্রব্য বলে গণ্য হবে, নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে। আর যদি এমন হয় যে, কেউ কেউ তা [মুদ্রা হিসেবে] গ্রহণ করে আর কেউ কেউ গ্রহণ করে না তাহলে তা ক্রটিযুক্ত মুদ্রার ন্যায় হবে। তখন চুক্তির সম্পর্ক নির্দিষ্ট মুদ্রার সাথে হবে না; বরং বিক্রোতা যদি উক্ত মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে ঐ শ্রেণীর ক্রটিযুক্ত [অনির্দিষ্ট] মুদ্রার সাথে চুক্তি সম্পর্কিত হবে। কেননা, তার পক্ষ থেকে সম্মতি বিদ্যমান আছে। আর যদি বিক্রোতা উক্ত মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে অবগত না থাকে, তাহলে ঐ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট [অনির্দিষ্ট] মুদ্রার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হবে। কেননা, [ক্রটিযুক্ত মুদ্রা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে] তার পক্ষ থেকে সম্মতি বিদ্যমান নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ تُرَوِّجُ بِالْوِزْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনারের আলোচনা করা হয়েছে [অর্থাৎ যে সকল দিরহাম বা দিনারে খাদের পরিমাণ বেশি থাকে] সেগুলো যদি জনসমাজে ওজনের ভিত্তিতে লেনদেনের প্রচলন হয়ে থাকে তাহলে তার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা তা কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করতে হলে ওজনের ভিত্তিতেই করতে হবে। গণনার ভিত্তিতে তার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় বা তা কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করা জায়েজ হবে না। আর যদি জনসমাজে এগুলোর লেনদেন গণনার ভিত্তিতে প্রচলিত হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা কর্জ হিসেবে তা আদান-প্রদান গণনার ভিত্তিতেই করতে হবে; ওজনের ভিত্তিতে করা জায়েজ হবে না। আর জনসমাজে যদি এগুলোর লেনদেন ওজনের ভিত্তিতে এবং গণনার ভিত্তিতে উভয় পদ্ধতিতেই প্রচলন থেকে থাকে তাহলে উভয় পদ্ধতিতে [অর্থাৎ গণনার ভিত্তিতে এবং ওজনের



ভিত্তিতে। এগুলোর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করতে পারবে। সারকথা, যে পদ্ধতিতে প্রচলন হবে সে পদ্ধতিতেই তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ও কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করতে হবে।

এর কারণ হচ্ছে—কোনো দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত হবে নাকি গণনা-নির্ভর হবে সে সম্পর্কে যদি শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো 'নস' (নির্দেশ-বাণী) না থাকে তাহলে তা জনসমাজের প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হবে। সুতরাং অধিক খাদযুক্ত দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রে যেহেতু শরিয়তের কোনো 'নস' (নির্দেশ-বাণী) নেই, সেহেতু জন-প্রচলনের উপরই তা নির্ভরশীল হবে।

مُسَانِيفُ (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনার যতক্ষণ পর্যন্ত জনসমাজে সচল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিধানগতভাবে মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে। আর মুদ্রা যেহেতু নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয় না, সেহেতু এ ক্ষেত্রে উক্ত মুদ্রাও নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা অনির্দিষ্ট হিসেবেই গণ্য হবে। ফলে কেউ যদি এরূপ মুদ্রা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করে আর ক্রয়কালে মুদ্রাগুলো নির্দিষ্ট করে বলে যে, এ দশটি মুদ্রা দ্বারা আমি ক্রয় করলাম, তাহলে তার উপর উক্ত নির্দিষ্ট মুদ্রা হস্তান্তর করা আবশ্যিক হবে না; বরং এরূপ যে কোনো দশটি মুদ্রা সে হস্তান্তর করতে পারবে। কেননা, তা নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। আর মুদ্রাগুলো হস্তান্তর করার পূর্বে তা যদি হালকা হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হবে না। কেননা, বিক্রয়চুক্তিতে যদি হস্তান্তর করার পূর্বে মূল্য হিসেবে নির্ধারিত মুদ্রা হালকা হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হয় না।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ لَا تَرَوُّجُ فَهِيَ سِلْعَةُ الْخ: আর যদি উক্ত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনার জনসমাজে অচল হয়ে যায় তাহলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা সাধারণ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আর সাধারণ পণ্য-দ্রব্য যেহেতু নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয় সেহেতু উক্ত দিরহাম-দিনারও নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এরূপ অবস্থায় উক্ত দিরহাম বা দিনার যদি কেউ বিক্রয় করে আর তা হস্তান্তর করার পূর্বেই হালকা হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তা মুদ্রাদ্রব্য হিসেবে গণ্য না হওয়ায় বিক্রয়দ্রব্য (مَبِيع) হিসেবে গণ্য হবে। আর হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রয়দ্রব্য হালকা হয়ে গেলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এ বিধান হবে কেবল ঐ সূরতে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিষয়টি জানে যে, উক্ত দিরহামগুলো অচল এবং তাদের প্রত্যেকে এটাও জানে যে, অপর পক্ষও অচল হওয়ার বিষয়টি জানে। পক্ষান্তরে যদি অচল হওয়ার বিষয়টি তাদের কারো জানা না থাকে কিংবা তাদের একজনের জানা না থাকে অথবা প্রত্যেকেই জানে কিন্তু এক পক্ষের জানা থাকার কথা অপর পক্ষের জানা না থাকে, তাহলে এ তিন সূরতে নির্ধারিত অচল দিরহামের সাথে চুক্তিটি সংশ্লিষ্ট হবে না। বরং সমপরিমাণ সচল দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। আর তা হস্তান্তরের পূর্বে হালকা হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ يَتَقَبَّلُهَا النَّعْصُ دُونَ النَّعْصِ الْخ: আর যদি উক্ত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনারের অবস্থা এমন হয় যে, তা জনসমাজের কেউ কেউ মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে আর কেউ কেউ গ্রহণ করে না। অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ অচলও নয় আবার সম্পূর্ণ সচলও নয়। তাহলে বিধান হলো, উক্ত দিরহাম বা দিনার ক্রটিপূর্ণ দিরহাম বা দিনার হিসেবে গণ্য হবে। এ সূরতে যদি তা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করে তাহলে যদি বিক্রেতার উক্ত মুদ্রাগুলো যে কেউ কেউ গ্রহণ করে না তা জানা থাকে তাহলে বিক্রেতা সমপরিমাণ ক্রটিপূর্ণ মুদ্রা (زُرُوف) পাবে। কেননা, সে জেনেওনে ক্রটিপূর্ণ মুদ্রাগুলো গ্রহণে সম্মত হয়েছে। আর যদি বিক্রেতার তা জানা থাকে তাহলে মুসানিফ (র.) বলেন যে, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা সমপরিমাণ ভাল মুদ্রা পাবে। কেননা, ক্রটিপূর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিক্রেতার সম্মতি পাওয়া যায়নি। কিন্তু আল্লামা ইবনে হমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, বিক্রেতার না জানা থাকলে বিধান হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের অঞ্চলে যে মুদ্রার প্রচলন সবচেয়ে বেশি বিক্রেতা তা পাবে। আর যদি এমন হয় যে, সবক'টি মুদ্রার প্রচলন সমান তাহলে দেখতে হবে সবগুলো মুদ্রার মান সমান কিনা? যদি মান সমান হয় তাহলে যে কোনো একটি দিলেই জায়েজ হবে। আর যদি মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং মুসানিফ (র.)-এর বর্ণনায় কিছুটা ক্রটি রয়েছে। [ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-পৃ. ১৪৫]

وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً فَكَسَدَتْ وَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رحا) عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحا) : قِيمَتُهَا آخِرُ مَا تَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا، لِهَمَّا أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ صَحَّ إِلَّا أَنَّهُ تَعَدَّرَ التَّسْلِيمُ بِالْكَسَادِ، وَلَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى بِالرُّطْبِ فَانْقَطَعَ، وَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ وَجَبَتِ الْقِيَمَةُ لِكِنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحا) وَقَتَ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحا) يَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ، لِأَنَّهُ أَوَّانُ الْإِنْتِقَالِ إِلَى الْقِيَمَةِ، وَلَا يَبْنَى حَنِيفَةُ (رحا) أَنَّ الثَّمَنَ يَهْلِكُ بِالْكَسَادِ، لِأَنَّ الثَّمَنِيَّةَ بِالْإِضْطِلَاجِ، وَمَا بَقِيَ فَيَبْقَى بَيْعًا بِلَا ثَمَنِ فَيَبْطُلُ، وَإِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ يَجِبُ رَدُّ الْمَبِيعِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَقِيَمَتِهِ إِنْ كَانَ هَالِكًا، كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ -

**অনুবাদ :** যদি খাদপ্রধান দিরহাম দ্বারা কোনো পণ্য ক্রয় করে, অতঃপর তা অচল হয়ে যায় এবং জনসমাজ এগুলোর মাধ্যমে লেনদেন পরিত্যাগ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, বিক্রয়ের দিন দিরহামগুলোর যা বাজারমূল্য ছিল ক্রেতাকে তাই পরিশোধ করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জনসমাজ ঐরূপ দিরহামের মাধ্যমে সর্বশেষ যেদিন লেনদেন করেছে সেদিনের বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তিটি বিতর্করূপে সম্পাদিত হয়েছে, তবে মুদ্রাগুলো অচল হয়ে পড়ায় মূল্য পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর [এরূপ] অসম্ভব হয়ে পড়া চুক্তি বিনষ্ট হওয়াকে অনিবার্য করে না। যেমন- কেউ যদি তাজা খেজুরের বিনিময়ে কোনো বস্তু ক্রয় করে অতঃপর তাজা খেজুর বাজার থেকে উঠে যায় [তাহলে চুক্তি বাতিল হয় না]। সুতরাং যখন চুক্তি বহাল রইল তখন সেগুলোর বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয়ের সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, বিক্রয়ের কারণেই তার উপর মূল্য পরিশোধের দায় সাব্যস্ত হয়েছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাজার থেকে তা উঠে যাওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, এ সময়েই দিরহামগুলোর পরিবর্তে তার মূল্য পরিশোধের দায় তার উপর আবর্তিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অচল হওয়ার কারণে 'মূল্য' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা, উক্ত দিরহামগুলো মুদ্রা হয়েছিল জন-প্রচলনের কারণে, আর [আলোচ্য সুরতে] এখন সেই প্রচলন বহাল নেই। সুতরাং এখন চুক্তিটি বহাল থাকলে তা থাকবে মূল্য ছাড়া বিক্রয়চুক্তি। কাজেই তা বাতিল হবে। আর যখন চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেল তখন যদি বিক্রীত-বস্তুটি ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে তাহলে ক্রেতার উপর তা ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হবে। আর যদি তা বিলুপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। যেমন [বিধান] ফাসেদ বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا سَلَمَةَ الْخ: মাসআলা হলো, যে সকল দিরহাম বা দিনারের মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি তা দ্বারা যদি কেউ কোনো দ্রব্য ক্রয় করে অতঃপর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তা জনসমাজে অচল হয়ে যায় [অর্থাৎ ক্রয় করার সময় উক্ত দিরাহম বা দিনার সচল ছিল কিন্তু ক্রয় করার পর ক্রেতা নগদ মূল্য পরিশোধ করেনি। অতঃপর পরিশোধ করার পূর্বেই তা অচল হয়ে গেছে, এখন কেউ তা মুদ্রা রূপে গ্রহণ করে না।] তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান কি হবে তা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি ক্রেতা দ্রব্যটি হস্তগত না করে থাকে তাহলে তাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। আর যদি ক্রেতা দ্রব্যটি হস্তগত করে থাকে তাহলে যদি দ্রব্যটি তখনও তার কাছে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবে। আর যদি তা ধ্বংস হয়ে থাকে বা খরচ করে থাকে তাহলে দ্রব্যটি যদি সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য (ذُرَاتُ الْأَسْئَالِ) যেমন- ধান, গম ইত্যাদি হয়ে থাকে, তাহলে অনুরূপ দ্রব্য বিক্রেতাকে দিয়ে দিবে। আর যদি দ্রব্যটি সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য (ذُرَاتُ الْأَسْئَالِ) না হয় তাহলে তার বাজারদর হিসেবে মূল্য পরিশোধ করে দিবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে না; বরং ক্রেতা অচল হয়ে যাওয়া দিরহাম বা দিনারগুলো সচল থাকা অবস্থায় যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করবে। তবে কোন দিনের দর অনুযায়ী সেগুলোর মূল্য ধর্তব্য তা নিয়ে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যেদিন বিক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেদিন উক্ত দিরহাম বা দিনারের যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বশেষ যেদিন উক্ত দিরহাম বা দিনারের প্রচলন ছিল সেদিনের যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় আমাদের মায়হাবে আমাদের ইমামগণের মধ্য হতে কার মতের উপর ফতোয়া হবে, সে ব্যাপারে ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে দুই ধরনের অভিমত উল্লেখ রয়েছে। 'যখীরা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া (وَعَلَيْهِ الْقَوْلُ)। আর মুহীত, তাতিয়াহ, আল-হাকায়িক ও আল-বাহরুর রায়িক-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া। [ফতোয়ায়ে শামী খণ্ড-৭, পৃ. ৫৩৬।]

قَوْلُهُ لَهَا أَنَّ الْمَعْدُ ذُصِّحَ الْخ: আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে বিক্রয়চুক্তি বাতিল না হয়ে উক্ত অচল হয়ে যাওয়া দিরহাম বা দিনারের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে তার দলিল হলো, বিক্রয়কালে সকলের ঐকমত্যে চুক্তিটি সঠিক হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে মূল্য হিসেবে নির্ধারিত দিরহাম বা দিনারগুলো অচল হয়ে যাওয়ার কারণে নির্ধারিত মূল্য হস্তান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর বিক্রয়চুক্তি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর যদি কোনো কারণে নির্ধারিত মূল্য হস্তান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয় না। এর উদাহরণ হচ্ছে, কেউ যদি তাজা খেজুরের বিনিময়ে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা উক্ত তাজা খেজুর হস্তান্তর করার পূর্বেই তাজা খেজুর দুষ্টাপ্য হয়ে পড়ে [অর্থাৎ এমন হয় যে, জনসমাজে তাজা খেজুর পাওয়া যাচ্ছে না] ফলে মূল্য হিসেবে নির্ধারিত খেজুর হস্তান্তর করা ক্রেতার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে সকলের ঐকমত্যে চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং মূল্য হিসেবে নির্ধারিত তাজা খেজুরের বাজারদর হিসেবে যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করবে, কিংবা বিক্রেতা পরবর্তী বছর বাজারে খেজুর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সুতরাং আলোচ্য সূরতেও নির্ধারিত মূল্য হস্তান্তর করা অসম্ভব হওয়ার কারণে চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং উক্ত দিরহাম বা দিনারের যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যেদিন চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল সেদিনের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো ক্রেতার জিম্মায় সাব্যস্ত হয়েছে বিক্রয়চুক্তির কারণে। কাজেই চুক্তি সম্পাদনের দিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে। যেমন- কেউ যদি কারো কোনো বস্তু আত্মসাৎ [গনব] করে, অতঃপর আত্মসাৎকৃত বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যেদিন সে বস্তুটি আত্মসাৎ করেছিল সেদিনের দর অনুযায়ী আত্মসাৎকারীর উপর বস্তুটির মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

কেননা, আত্মাসাতের কারণেই তার উপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়েছে, তাই আত্মাসাতের দিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো সর্বশেষ যেদিন সচল ছিল সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, সেদিনই ক্রেতার উপর উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলোর পরিবর্তে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়েছে। কেননা, মূলত তার উপর উক্ত দিরহাম বা দিনার পরিশোধ করা ওয়াজিব ছিল, অতঃপর তা অচল হয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোর পরিবর্তে তার মূল্য ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং অচল হয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বে সেগুলোর যা বাজারমূল্য ছিল তাই পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ حَبِيفَةً (رحا) : إِمَامُ أَبُو هَانِيْفَا (ر.)-এর দলিল হলো, উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো মুদ্রারূপে সাব্যস্ত হয়েছিল জনপ্রচলনের কারণে; খাটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় সৃষ্টিগতভাবে এগুলো মুদ্রা ছিল না। সুতরাং যখন মুদ্রারূপে এগুলোর প্রচলন জনসমাজ থেকে উঠে গেছে তখন উক্ত মুদ্রাগুলো সামগ্রিকভাবে হালাক হয়ে গেছে ধরা হবে। ফলে এরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, এক পক্ষে বিক্রয়দ্রব্য আছে, কিন্তু অপর পক্ষে মূলদ্রব্য নেই। সুতরাং তা আর বিক্রয়চুক্তি হিসেবে বহাল থাকতে পারে না। কেননা, বিক্রয়চুক্তির জন্য এক পক্ষে বিক্রয়দ্রব্য আর অপর পক্ষে মূলদ্রব্য থাকা আবশ্যিক। অতএব, চুক্তি বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, এখানে কারো প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রচলন উঠে যাওয়ার কারণে উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো মুদ্রা হিসেবে গণ্য না হলে তো বিক্রয় বাতিল হওয়ার কথা নয়। কেননা, দিরহাম বা দিনারগুলোর মুদ্রা হওয়া বাতিল হলেও সাধারণ দ্রব্য হিসেবে তো তা বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই উভয় পক্ষে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে চুক্তিটি بَيْعُ الْمَقَابَضَةِ বা উভয় পক্ষে বিক্রয়দ্রব্যের চুক্তি রূপে বহাল থাকার কথা।

এর উত্তর হলো, এভাবে উভয় পক্ষে বিক্রয়দ্রব্য হিসেবে চুক্তিটি বহাল রাখাও সম্ভব নয়। কেননা, আলোচ্য মাসআলায় দিরহাম বা দিনারগুলো ক্রেতার জিম্মায় ওয়াজিব হয়েছিল অনির্দিষ্টভাবে [কারণ, মুদ্রা নির্দিষ্ট হয় না]। আর অনির্দিষ্ট বস্তু 'বায় সলম' বাতীত অন্য কোনো ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রয়দ্রব্য হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া জায়েজ নয়। কাজেই উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলোকে বিক্রয়দ্রব্য সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে যখন বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে তখন বিধান হলো, যদি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে বস্তুটি হস্তগত করে থাকে তাহলে সে বস্তুটি বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর ক্রেতার হাতে যদি তা ধ্বংস হয়ে থাকে কিংবা সে তা বরক করে থাকে তাহলে বস্তুটি যদি এমন দ্রব্য হয় যার অনুরূপ বস্তু [তারতম্য ছাড়া] পাওয়া যায় ذَاتُ الْمَنْفَعَةِ যেমন- ধান, গম, ডিম ইত্যাদি তাহলে তদ্রূপ বস্তু ফিরিয়ে দিবে। আর যদি এমন দ্রব্য হয় যার তারতম্যবিহীন অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায় না ذَوَاتُ الْغَيْرِ যেমন- গরু, বকরি ইত্যাদি তাহলে তার মূল্য ফিরিয়ে দিবে। অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হলে যেক্ষেপ বিধান হয়, এ ক্ষেত্রেও সেরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

জ্ঞাতব্য : কোনো মুদ্রা অচল হয়েছে বলে কখন সাব্যস্ত হবে এ ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যদি [একটি দেশের] সকল অঞ্চলে মুদ্রাটির প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তা অচল হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যে অঞ্চলে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যদি সেই অঞ্চলে মুদ্রাটির প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তা চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে অচল হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। সকল অঞ্চলে তার প্রচলন বন্ধ হওয়া আবশ্যিক নয়।

قَالَ : وَجَوَزُ الْبَيْعِ بِالْفُلُوسِ ، لِأَنَّهُ مَالٌ مَعْلُومٌ ، فَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً جَاءَ الْبَيْعُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ ، لِأَنَّهَا أَتَمَّانٌ بِالْإِضْطِلَاحِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجْزِ الْبَيْعُ بِهَا ، حَتَّى يُعَيِّنَهَا لِأَنَّهَا سَلْعٌ فَلَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ধাতব-পয়সার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কেননা, ধাতব-পয়সা হচ্ছে একটি পরিজ্ঞাত মাল। আর ধাতব-পয়সা যদি প্রচলিত থাকে তাহলে সুনির্দিষ্ট না করেও তার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, প্রচলনের কারণে তা মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। আর যদি তা অচল হয়ে যায় তাহলে তা সুনির্দিষ্ট করা ব্যতীত তার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, তা এখন পণ্যবস্তু, কাজেই তা সুনির্দিষ্ট করা অপরিহার্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الحِشْرُ শব্দটি فُلُوس-এর বহুবচন। فُلُوس বলা হয় এমন মুদ্রাকে যা স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু দ্বারা তৈরি। জনসমাজে তা মুদ্রারূপে প্রচলিত হয়েছে। আমরা এখানে এর অর্থ ‘ধাতব মুদ্রা’ করেছি।

মাসআলা : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত ‘ধাতবমুদ্রা’ দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, ‘ধাতবমুদ্রা’ শরিয়তসম্মত ‘মাল’-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তা বর্ণনা দ্বারা কিংবা উপস্থিত দেখিয়ে তার পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি নির্ধারণ করা সম্ভব। আর শরিয়তসম্মত মালের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ, যদি তার পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি নির্ধারণ করা হয়।

তবে মাসআলা হলো, ক্রয়কালে যদি উক্ত ‘ধাতবমুদ্রা’ প্রচলিত থাকে তাহলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক হবে না। [অর্থাৎ মুদ্রাগুলো উপস্থিত করে দেখিয়ে এভাবে বলতে হবে না যে, আমি এ দশটি মুদ্রা দ্বারা তোমার দ্রব্যটি ক্রয় করলাম; বরং এভাবে বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি অমুক প্রকারের দশটি ‘ধাতবমুদ্রা’-এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম।] কেননা, যদিও এগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় সৃষ্টিগতভাবে মুদ্রাদ্রব্য নয়, কিন্তু প্রচলনের কারণে এগুলো মুদ্রা হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর মুদ্রার বিধান হলো তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক নয়; বরং নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। এ কারণেই কেউ যদি দশটি মুদ্রা দেখিয়ে বলে যে আমি এ দশটি মুদ্রার বিনিময়ে তোমার দ্রব্যটি ক্রয় করলাম তবুও তার উপর ঐ দশটি মুদ্রা দেওয়া অপরিহার্য নয়; বরং যে কোনো দশটি মুদ্রা দিলেই যথেষ্ট হবে।

আর ক্রয়কালে যদি উক্ত ‘ধাতবমুদ্রা’ অচল হয়ে থাকে এবং তার প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য আবশ্যিক হলো, তা নির্দিষ্ট করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সে এভাবে বলবে যে, আমি আমার হাতের এ দশটি ‘ধাতবমুদ্রা’-এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যে কোনো দশটি মুদ্রা দিতে পারবে না; বরং যে দশটি দেওয়ার কথা বলেছে, তাই হস্তান্তর করতে হবে। এর কারণ হলো, অচল হয়ে যাওয়ার কারণে উক্ত মুদ্রাগুলো এখন আর মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা সাধারণ পণ্য-দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ পণ্য-দ্রব্য হলে তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক। কাজেই উক্ত ‘ধাতবমুদ্রা’ নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক হবে।

وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ الشَّافِقَةَ ثُمَّ كَسَدَتْ بَطَلَ الْبَيْعِ عِنْدَ ابْنِ حَنِفَةَ (رح) خَلَامًا لَهَا  
وَهُوَ نَظِيرُ الْإِخْتِلَافِ الَّذِي بَيْنَاهُ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً فَكَسَدَتْ عِنْدَ ابْنِ  
حَنِفَةَ (رح) يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا، لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَمُوجِبَةٌ رَدِّ الْعَيْنِ مَعْنًى، وَالشَّمْنِيَّةُ  
فَضْلٌ فِيهِ، إِذَا الْقَرْضُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ قِيَمَتُهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ وَضَعُ  
الشَّمْنِيَّةِ تَعَذَّرَ رَدُّهَا كَمَا قَبِضَ، فَيَجِبُ رَدُّ قِيَمَتِهَا كَمَا إِذَا اسْتَقْرَضَ مِثْلِيًّا  
فَانْقَطَعَ لَكِنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) يَوْمَ الْقَبْضِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يَوْمَ الْكَسَادِ  
عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ، وَأَصْلُ الْإِخْتِلَافِ فِيمَنْ غَضَبَ مِثْلِيًّا فَانْقَطَعَ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ  
(رح) أَنْظِرْ لِلْجَانِبَيْنِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَيْسَرُ.

অনুবাদ : যদি প্রচলিত ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে অতঃপর [মূল্য পরিশোধের পূর্বেই] তা অচল হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর এ ক্ষেত্রে তাদের মতবিরোধ আমাদের পূর্ববর্ণিত মতবিরোধের অনুরূপ। যদি কেউ প্রচলিত পয়সা কর্ত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর তা অচল হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে কর্ত্ত্বগ্রহীতার উপর অনুরূপ পয়সা পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। কেননা, “কর্ত্ত্ব” হচ্ছে إِعَارَةٌ বা ধার গ্রহণ, আর এর দাবি হচ্ছে গুণগত দিক থেকে অভিন্ন জিনিস ফেরত দেওয়া। আর মূল্যগুণ হলো তাতে বিদ্যমান একটি অতিরিক্ত বিষয়। কেননা, কর্ত্ত্ব মূল্যদ্রব্যের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কর্ত্ত্বগ্রহীতার উপর উক্ত পয়সার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। কেননা, যখন তার মূল্যগুণ বাতিল হয়ে গেছে তখন যে অবস্থায় তা গ্রহণ করেছিল সে অবস্থায় তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই তার মূল্য ফেরত দেওয়া অপরিহার্য হবে। যেমন- যদি সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু কর্ত্ত্ব গ্রহণ করে, অতঃপর তা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে কর্ত্ত্বরূপে হস্তগত করার দিনের মূল্য [ধর্তব্য হবে] আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অচল হওয়ার দিনের মূল্য [ধর্তব্য হবে], যার বিবরণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মূল মতবিরোধ হলো ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে কোনো সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু আত্মসাৎ করল, অতঃপর তা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি উভয় পক্ষের জন্য অধিক হিতকর। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর সহজ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ الشَّافِقَةَ: মাসআলা হলো, কেউ যদি প্রচলিত ‘ধাতবমুদ্রা’-এর বিনিময়ে কোনো বস্তু বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা উক্ত মুদ্রা পরিশোধ করার আগেই তা যদি অচল হয়ে যায় [অর্থাৎ তার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়] তাহলে এর বিধান কী হবে সে ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয়মুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হবে না। ক্রেতা উক্ত

‘ধাতবমুদ্রা’-এর যা মূল্য ছিল তা প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমে পরিশোধ করবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উক্ত ‘ধাতবমুদ্রা’-এর মূল্য ধরা হবে যেদিন বিক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেদিনের বাজারদর হিসেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ‘ধাতবমুদ্রা’-এর মূল্য ধরা হবে সর্বশেষ যেদিন তা প্রচলিত ছিল সেদিনের বাজারদর হিসেবে। উল্লেখ্য, এ মাসআলার অনুরূপ মাসআলা মতবিরোধ এবং প্রত্যেক ইমামের দলিলসহ পূর্বের পৃষ্ঠায় [তথা হিনায়া গ্রন্থের ৯৩ নং পৃষ্ঠার শেষাংশে] বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমায (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য মাসআলায় মুসান্নিফ (র.) যেভাবে আমাদের ইমামগণের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম কুদুরী (র.) ঠিক এভাবেই বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ‘আসল’ তথা মাবসুত, শরহুত তাহাবী ও আল-আসরার গ্রন্থসমূহে আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমাদের তিন ইমামের কারো দ্বিমতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেবল ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনার অচল হয়ে যাওয়ার মাসআলায় আমাদের তিন ইমামের মাঝে মতবিরোধের দাবি অনুসারে আলোচ্য মাসআলায় মতবিরোধ থাকারই কথা। কেননা, অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনার অচল হয়ে যাওয়া এবং ‘ধাতবমুদ্রা’ অচল হয়ে যাওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই উভয় ক্ষেত্রে একই রকম মতবিরোধ হওয়ার কথা।]

قَوْلُهُ وَكَوْا اسْتَفْرَضَ نُلُوسًا الْخ: মাসআলা হলো, কেউ যদি কারো নিকট হতে প্রচলিত ‘ধাতবমুদ্রা’ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর পরিশোধ করার পূর্বেই তা অচল হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ঋণগ্রহীতা উক্ত অচল হয়ে যাওয়া ‘ধাতবমুদ্রা’-এর দ্বারা তাই ঋণ পরিশোধ করবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত অচল হয়ে যাওয়া ‘ধাতবমুদ্রা’ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে না; বরং উক্ত ‘ধাতবমুদ্রা’-এর যা মূল্য ছিল তা রৌপ্যমুদ্রা কিংবা স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে পরিশোধ করবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উক্ত ‘ধাতবমুদ্রা’-এর মূল্য ধরা হবে যেদিন ঋণ গ্রহণ করেছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার মূল্য ধরা হবে সর্বশেষ যেদিন উক্ত ‘ধাতবমুদ্রা’ প্রচলিত ছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া [ফতোয়ায়ে শামী, খণ্ড-৭, পৃ. ৫৩৮।] আলোচ্য মাসআলায় মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইনের দলিল পরে বর্ণনা করেছেন। আর দলিল বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.)-এর রীতি হলো, যার মতটি তাঁর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য তাঁর দলিলটি পরে বর্ণনা করা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর নিকট সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَمَوْجِبَةٌ رَدِّ الْعَيْنِ مَعْنَى: ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ঋণ [কর্জ] ‘আরিয়াত’ বা ধারগ্রহণ হিসেবে গণ্য হয়। উল্লেখ্য, ঋণ বা কর্জ হচ্ছে কোনো বস্তু নিয়ে তা খরচ করে পরে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু মালিককে ফেরত দেওয়া আর ‘আরিয়াত’ বা ধার হচ্ছে কোনো বস্তু নিয়ে তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করে পরে মূল বস্তুটি মালিককে ফেরত দেওয়া। কিন্তু ঋণ বা কর্জকে ‘আরিয়াত’ হিসেবে ধরা হয়, তার কারণ হলো যদিও কর্জের ক্ষেত্রে মূল বস্তুটির পরিবর্তে তার সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরূপ ধরে নেওয়া আবশ্যক হয় যে কর্জগ্রহীতা মূল বস্তুটি ফিরিয়ে দিয়েছে। কেননা, যদি ধরা হয় যে কর্জগ্রহীতা মূল বস্তুর বিনিময়ে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু দিয়েছে তাহলে শ্রেণী ও পরিমাণ মাধ্যম (جِنْسٌ مَعَ الْقَدْرِ) এক হওয়ার কারণে নগদ আদান-প্রদান গুয়াজিব হয়, নতুবা ‘রিবা’ [সুদ]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাই অনিবার্য কারণে কর্জের ক্ষেত্রে এটাই ধরতে হয় যে, কর্জগ্রহীতা যেন মূল বস্তুটি ফেরত দিয়েছে। সুতরাং তা ‘আরিয়াত’ বা ধার হিসেবে গণ্য হয়।

সারবথা কর্জ (ঋণ)-কে ‘আরিয়াত’ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর আরিয়াতের দাবি হচ্ছে গ্রহীতা মূল বস্তুটি ফেরত দিবে। কিন্তু কর্জের ক্ষেত্রে যেহেতু মূল বস্তুটি খরচ করেই উপকার গ্রহণ করা হয় সেহেতু প্রকৃতপক্ষে মূল বস্তুটি ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। আর বাহ্যত মূল বস্তু ফেরত দেওয়া অসম্ভব হলে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তুর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মূল বস্তু পরিশোধ করা যায় [কিন্তু মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে তা হয় না]। সুতরাং সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু পরিশোধের মাধ্যমেই উক্ত কর্জ আদায় করতে হবে।

قَوْلُهُ وَاللَّيْلَةُ فَضْلٌ فِيهِ الْخ : এখান থেকে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য সুরতে যেহেতু উক্ত মুদ্রা অচল হয়েছে সেহেতু তদ্রূপ অচল মুদ্রা পরিশোধের মাধ্যমে কীভাবে পরোক্ষভাবে মূল বস্তু ফেরত দেওয়া হয়। কেননা, যখন গ্রহীতা তা গ্রহণ করেছিল তখন তো মুদ্রাগুলো ছিল সচল, আর যখন সে পরিশোধ করছে তখন তা অচল হয়ে গেছে। কাজেই মানের দিক থেকে তা তো সমান হচ্ছে না।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। কেননা, ঋণ বা কর্জের ক্ষেত্রে মুদ্রা হওয়া কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়। এ কারণেই উক্ত মুদ্রা অচল হয়ে যাওয়ার পর তা ঋণ হিসেবে আদান-প্রদান করা জায়েজ। কাজেই মুদ্রা হওয়া যখন ঋণ বা কর্জের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় নয় তাই তা এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ وَعِنْدَكُمْ بِجِبِّ قِسْمِهَا لِأَنَّهُ لَنَا بَطْلُ الْخ : ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যখন উক্ত 'ধাতব মুদ্রা' অচল হয়ে গেছে তখন তার মুদ্রা হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি বিনষ্ট হয়েছে। কাজেই কর্জগ্রহীতা যেদ্রুপ গ্রহণ করেছিল সেদ্রুপ ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। আর মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি যদিও কর্জের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়, কিন্তু কর্জ গ্রহণকালে তা বিদ্যমান থাকলে পরিশোধের সময় তা বিবেচনার বাইরে নয়। কারণ, ঋণ বা কর্জের ক্ষেত্রে বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি ধর্তব্য হয়ে থাকে। সুতরাং উক্ত মুদ্রার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে কেউ যদি সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু, যেমন- ধান, গম ইত্যাদি কর্জ হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর তা পরিশোধ করার পূর্বেই তা বাজারে দুষ্পাণ্য হয়ে যায়, তাহলে কর্জগ্রহীতার উপর উক্ত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে কর্জ গ্রহণের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বশেষ প্রচলনের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য, এ মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয়ের দলিল পূর্বের পৃষ্ঠায় [হিদায়ার ৯৩ নং পৃষ্ঠায়] বর্ণন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَصْلُ الْإِخْلَافِ يَمْنَنُ غَضَبٌ مِثْلُ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে এ ক্ষেত্রে যে মতবিরোধটির কথা উল্লেখ করা হলো, এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তাঁদের উভয়ের মাঝে মূল মতবিরোধটি হচ্ছে 'গসব' [আত্মসাৎ] সংক্রান্ত মাসআলায়। অর্থাৎ কেউ যদি কারো কোনো বস্তু 'গসব' [আত্মসাৎ] করে, আর বস্তুটি এমন হয় যার সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু পাওয়া যায় [যেমন- ধান, গম ইত্যাদি] অতঃপর গসবকারী সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু পরিশোধ করার পূর্বেই যদি উক্ত বস্তু বাজারে দুষ্পাণ্য হয়ে যায় তাহলে উভয়ের মতে গসবকারী উক্ত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মূল্য ধরা হবে যেদিন 'গসব' করেছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বশেষ যেদিন বাজারে বস্তুটি বিদ্যমান ছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে।

قَوْلُهُ وَقَوْلُ مُعَمِّدٍ أَنْظِرْ لِنَجَائِبِ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি কর্জদাতা ও কর্জগ্রহীতা উভয়ের লাভ ক্ষতির প্রতি তুলানামূলক ভারসাম্য রক্ষাকারী। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী উক্ত মুদ্রাগুলোর মূল্য নির্ণয় করা অধিক সহজতর। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি গ্রহণ করা হলে কর্জগ্রহীতা ও কর্জদাতা এদের উভয়ের হককে প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয়। কেননা, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত গ্রহণ করা হলে কর্জদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, তাঁর মতানুসারে কর্জগ্রহীতা অচল মুদ্রা পরিশোধ করবে, ফলে কর্জদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত গ্রহণ করা হলে কর্জগ্রহীতা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, তাঁর মতানুসারে কর্জ গ্রহণ কালের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর মুদ্রাদ্রব্য সাধারণত অচল হওয়ার পূর্বে ক্রমাগত তার মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। কাজেই কর্জ দেওয়ার সময় যে মূল্য ছিল তার চেয়ে অচল হওয়ার পূর্বে কম মূল্য ছিল। অতএব, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমতটিতে কর্জদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমতটিতে কর্জদাতা কেবল লাভবান হয়। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটিতে উভয়ের লাভ-লোকসানের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা হয়।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী অচল মুদ্রাগুলোর মূল্য নির্ণয় করা সহজ হয়, তার কারণ হলো, যেদিন কর্জ গ্রহণ করা হয়েছে সেদিনটি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট এবং উভয়ের জানা। কাজেই সেদিনের মূল্য কত ছিল তা নির্ণয় করতে কোনো সমস্যা দেখা দিবে না। পক্ষান্তরে সর্বশেষ কোন দিন মুদ্রাগুলো সচল ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে জনগণের বক্তব্যের মাঝে বিরোধ দেখা দিতে পারে। ফলে : বর্তমানে প্রচলনের দিনের মূল্য নির্ধারণ করা জটিল হয়ে যাবে।



قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا يَنْصِفُ دِرْهَمَ فُلُوسٍ جَارَ وَعَلَيْهِ مَا يَبَاعُ يَنْصِفُ دِرْهَمَ مِنَ الْفُلُوسِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ يَدَانِيقُ فُلُوسٍ أَوْ يَقِيرَاطُ فُلُوسٍ جَارَ، وَقَالَ زُفَرٌ (رح) لَا يَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِالْفُلُوسِ، وَإِنَّهَا تُقَدَّرُ بِالْعَدْوِ لَا بِالدَّانِيقِ وَيَنْصِفُ الدِّرْهَمَ فَلَا يَدَّ مِنْ بَيَانِ عَدْوِهَا، وَنَحْنُ نَقُولُ : مَا يَبَاعُ بِالدَّانِيقِ وَيَنْصِفُ الدِّرْهَمَ مِنَ الْفُلُوسِ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ، وَالْكَلَامُ فِيهِ، فَأَعْنَى عَنِ بَيَانِ الْعَدْوِ، وَلَوْ قَالَ يَدِرْهَمَ فُلُوسٍ أَوْ يَدِرْهَمَيْنِ فُلُوسٍ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) لِأَنَّ مَا يَبَاعُ بِالدِّرْهَمِ مِنَ الْفُلُوسِ مَعْلُومٌ، وَهُوَ الْمُرَادُ، لَا وَزَنُ الدِّرْهَمِ مِنَ الْفُلُوسِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالدِّرْهَمِ، وَيَجُوزُ فِيمَا دُونَ الدِّرْهَمِ، لِأَنَّ فِي الْعَادَةِ الْمُبَايَعَةَ بِالْفُلُوسِ فِيمَا دُونَ الدِّرْهَمِ، فَصَارَ مَعْلُومًا بِحُكْمِ الْعَادَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالُوا : وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَصَحُّ لَأَسِيْمًا فِي دِيَارِنَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি অর্ধ-দিরহাম পয়সার বিনিময়ে কোনো বস্তু ক্রয় করে তাহলে তা জায়েজ হবে। তাকে অর্ধ-দিরহামের বিনিময়ে যা পয়সা বিক্রয় করা হয় তা দিতে হবে। এরূপভাবে যদি সে বলে 'এক দানেক পয়সার বিনিময়ে' কিংবা 'এক কিরাত পয়সার বিনিময়ে' তাহলেও জায়েজ হবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সকল সূরতে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, সে ক্রয় করেছে পয়সার বিনিময়ে। আর পয়সার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সংখ্যার মাধ্যমে; দানেক এবং অর্ধ-দিরহামের মাধ্যমে নয়। সুতরাং তার সংখ্যা উল্লেখ করাই অপরিহার্য। আমাদের বক্তব্য হলো, দানেক ও অর্ধ-দিরহামের বিনিময়ে যা পয়সা বিক্রয় করা হয় তা মানুষের [সাধারণভাবে] জানা। আর আমাদের আলোচনাও হচ্ছে সে ক্ষেত্রেই। কাজেই সংখ্যা বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আর যদি বলে 'এক দিরহাম পয়সার বিনিময়ে' কিংবা 'দুই দিরহাম পয়সার বিনিময়ে' তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে একই বিধান হবে। কেননা, দিরহামের বিনিময়ে যতটুকু পয়সা বিক্রয় করা হয় তা [জনসাধারণের] জানা। আর ক্রেতার উদ্দেশ্যও তাই; দিরহামের সমপরিমাণ ওজনের পয়সা তার উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত আছে যে, এক দিরহাম পরিমাণের ক্ষেত্রে জায়েজ হবে না, কিন্তু এক দিরহাম পরিমাণের কম হলে জায়েজ হবে। কেননা, দিরহামের কম পরিমাণের ক্ষেত্রেই পয়সার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে। সুতরাং প্রচলনের কারণে তা পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে এক দিরহাম [বা ততোধিক] পরিমাণ এরূপ পরিজ্ঞাত নয়। ফকীহগণ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমতটিই অধিকতর বিতৃষ্ণ, বিশেষত আমাদের [মা-আরাউন-নহর] অঞ্চলে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

هَلَا رَؤُوسَ يُمُودَا, আর رَؤُوسَ হলো খাতব যুদ্রা। دَارِئُ [এক দানেক] হচ্ছে একটি রৌপ্যমুদ্রার এক-ষষ্ঠমাংশ [ছয় ভাগের ১ ভাগ]। আর نِصْرَاط [এক কীরাত] হচ্ছে এক দানেকের অর্ধেক তথা এক দিরহামের বারো ভাগের এক ভাগ। উল্লেখ্য, দিরহাম, দানেক ও কীরাত এ তিনটি শব্দ রৌপ্যমুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; 'খাতবযুদ্রা'—এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না।

وَمِنْ أَشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি কোনো দ্রব্য ক্রয়কালে এভাবে বলে যে, আমি তোমার দ্রব্যটি 'অর্ধ দিরহাম খাতবযুদ্রা'—এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম তাহলে আমাদের তিন ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)—এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ক্রেতার উপর অর্ধ দিরহাম রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ 'খাতবযুদ্রা' বিক্রয় করা হয় সে পরিমাণ 'খাতবযুদ্রা' পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। একপভাবে যদি ক্রেতা বলে আমি 'এক দানেক খাতবযুদ্রা'—এর বিনিময়ে তোমার দ্রব্যটি ক্রয় করলাম কিংবা 'এক কীরাত খাতবযুদ্রা'—এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম তাহলেও আমাদের তিন ইমামের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ক্রেতার উপর প্রথম সূরতে এক দানেক রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ 'খাতবযুদ্রা' বিক্রয় করা হয়, তা পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে, আর দ্বিতীয় সূরতে এক কীরাত রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ 'খাতবযুদ্রা' বিক্রয় করা হয় তা পরিশোধ করা আবশ্যিক হবে। আর ইমাম যুফার (র.)—এর মতে উল্লিখিত তিনটি সূরতের কোনোটিতে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ لَأَنَّهُ أَشْتَرَى بِالْعُلُوسِ, وَإِنَّا تَعَدُّ بِأَعْدَا الخ : ইমাম যুফার (র.)—এর দলিল হলো, উক্ত সূরতগুলোতে ক্রেতা 'খাতবযুদ্রা'—এর বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয় করেছে। আর 'খাতবযুদ্রা' হচ্ছে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য, অর্থাৎ তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সংখ্যা উল্লেখ করে [যেমন—পাঁচটি খাতবযুদ্রা]। আর উক্ত সূরতগুলো ক্রেতা পরিমাণ হিসেবে যে এক দিরহাম, এক দানেক ও এক কীরাতের কথা উল্লেখ করেছে এর সবক'টিই হচ্ছে ওজনের পরিমাপ। কাজেই ক্রেতা 'খাতবযুদ্রা'—এর সংখ্যা উল্লেখ করেনি। ফলে মূল্যের পরিমাণ অজ্ঞাত (مَجْهُول) রয়ে গেছে। সুতরাং মূল্যের পরিমাণ অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

ইমাম যুফার (র.)—এর পক্ষে আরেকটি দলিল হলো, উক্ত সূরতগুলোতে প্রথমত বিক্রয় সম্পাদিত হয়েছে দিরহাম, দানেক কিংবা কীরাতের বিনিময়ে। আর এর সবক'টিই হচ্ছে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাপ। অতঃপর ক্রেতা তার বিনিময়ে 'খাতবযুদ্রা' দেওয়ার শর্ত করেছে। ফলে একটি চুক্তির মাঝে আরেকটি চুক্তির সংযুক্তি صَنْفَةٌ بَيْنَ صَنْفَتَيْنِ হয়েছে। আর শরিয়তে তা জায়েজ নয়। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ হবে না। এ দলিলটি আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন।—[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَتَعَدُّ نَقْرًا : আমাদের দলিল হলো, অর্ধ দিরহাম বা এক দানেক কিংবা এক কীরাতের বিনিময়ে কী পরিমাণ 'খাতবযুদ্রা' বিক্রয় করা হয় তা সকলের জানা বিষয়। কেননা, বিক্রয় জায়েজ হওয়ার বিধানটি ঐ সূরতের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যখন জনগণের জানা থাকে যে, অর্ধ দিরহাম কিংবা এক দানেকের বিনিময়ে কী পরিমাণ 'খাতবযুদ্রা' বিক্রয় করা হয়। সুতরাং ক্রেতা যখন বলেছে "অর্ধ দিরহাম খাতবযুদ্রার বিনিময়ে" কিংবা 'এক দানেক খাতবযুদ্রার বিনিময়ে' ক্রয় করলাম" তখন তার এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে কিংবা এক দানেক রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ খাতবযুদ্রা বিক্রয় করা হয় তা দ্বারা ক্রয় করলাম। কাজেই এ ক্ষেত্রে মূল্যের পরিমাণ অজ্ঞাত রইল না; বরং তা চুক্তিকারীদের নিকট সুনির্ধারিত রয়ে গেছে। অতএব, ইমাম যুফার (র.)—এর বক্তব্য অনুসারে 'মূল্য অজ্ঞাত রয়েছে' এ কথাটি সঠিক নয়। একপভাবে তাঁর পক্ষ থেকে যে বলা হয়েছে 'এ ক্ষেত্রে একটি চুক্তির মাঝে আরেকটি চুক্তির সংযুক্তি صَنْفَةٌ بَيْنَ صَنْفَتَيْنِ হয়েছে' এটিও যথার্থ হয়নি। কেননা, আমাদের বক্তব্য অনুসারে ক্রেতা প্রাথমিকভাবেই খাতবযুদ্রার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করেছে, কাজেই তা পরিবর্তন করার শর্ত যুক্ত করা হয়নি।

خ: مُسَانِيف (র.) বলেন, পূর্বে যে তিনটি সুরতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এ তিনটি সুরতেই মূল্যের পরিমাণ ছিল এক দিরহামের চেয়ে কম। কিন্তু উপরিউক্ত মাসআলায় যদি মূল্য এক দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি হয়। যেমন- ক্রেতা যদি বলে যে, 'এক দিরহাম ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলাম' কিংবা 'দুই দিরহাম ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলাম' তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হচ্ছে পূর্বের দলিলের মতোই। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক দিরহাম কিংবা দুই দিরহামের বিনিময়ে যে পরিমাণ ধাতবমুদ্রা বিক্রয় করা হয় সে পরিমাণ ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। আর এক দিরহাম কিংবা দুই দিরহামের বিনিময়ে কী পরিমাণ ধাতবমুদ্রা বিক্রয় করা হয় তা জনগণের জানা বিষয়: কাজেই মূল্য সুনির্ধারিত হয়ে গেছে, অতএব বিক্রয় জায়েজ হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, জনসমাজে ধাতবমুদ্রার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে কেবল এক দিরহামের কম পরিমাণের ক্ষেত্রে। এক দিরহাম বা এক দিরহামের বেশি ক্ষেত্রে এর প্রচলন নেই। কাজেই এক দিরহামের কমের ক্ষেত্রে বিক্রয় হলে প্রচলনের কারণে বুঝা যাবে যে উল্লিখিত পরিমাণ বলে ক্রেতার উদ্দেশ্য সমপরিমাণ ধাতবমুদ্রা। কিন্তু এক দিরহাম বা তার বেশির ক্ষেত্রে যেহেতু প্রচলন নেই, সেহেতু তা বুঝা যাবে না। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে না।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এখানে যে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এক দিরহামের বেশির ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এটি তাঁর থেকে বর্ণিত 'জাহির রেওয়ায়েত' (طَاهِرُ الرَّوَّانِي) -এর পরিপন্থী। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর লিখিত 'মাবসূত' গ্রন্থে তাঁর এ মতবিরোধের কথার উল্লেখ নেই।

خ: مُسَانِيف (র.) বলেন, ফকীহগণের অভিমতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা, জায়েজ হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে ক্রেতার উল্লেখকৃত পরিমাণের বিনিময়ে কী পরিমাণ ধাতবমুদ্রা বিক্রয় করা হয় তা জানা থাকা। কাজেই এ ক্ষেত্রে এক দিরহামের কম হওয়া কিংবা বেশি হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিশেষভাবে আমাদের 'মাওরাউন নাহর' তথা বুখারা ও সমরকান্দ অঞ্চলে জায়েজ হওয়ার বিধানটিই অধিক সঠিক। কেননা, এ অঞ্চলে জনগণের মাঝে দিরহামের বিনিময়ে ধাতবমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করার প্রচলন রয়েছে। কাজেই অধিক দিরহাম পরিমাণ উল্লেখ করলেও তার বিনিময়ে কি পরিমাণ ধাতবমুদ্রা হবে তা সকলের জানা থাকে। কাজেই নাজাজেজ হওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।

قَالَ : وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفًا دِرْهَمًا وَقَالَ أَعْطَيْتَنِي بِنِصْفِهِمْ فَلَوْسًا وَبِنِصْفِهِمْ نِصْفًا إِلَّا حَبَّةَ جَزَارٍ الْبَيْعُ فِي الْفُلُوسِ، وَبَطَلَ فِيمَا بَقِيَ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ بَيْعَ نِصْفِ دِرْهَمٍ بِالْفُلُوسِ جَائِزٌ، وَبَيْعُ النِّصْفِ بِنِصْفٍ إِلَّا حَبَّةً رِبَاً فَلَا يَجُوزُ، وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) بَطَلَ فِي الْكُلِّ، لِأَنَّ الصَّفَقَةَ مُتَّحِدَةً، وَالْفَسَادُ قَوِيٌّ فَيَشْتَعِلُ، وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ، وَلَوْ كَرَّرَ لَفَطَ الْإِعْطَاءِ كَانَ جَوَابُهُ كَجَوَابِهِمَا هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُمَا بَيْنَانٍ، وَلَوْ قَالَ : أَعْطَيْتَنِي نِصْفَ دِرْهَمٍ فَلَوْسًا وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةً جَزَارٍ، لِأَنَّهُ قَابِلُ الدِّرْهَمِ بِمَا يَبَاعُ مِنَ الْفُلُوسِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ إِلَّا حَبَّةً، فَيَكُونُ نِصْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا حَبَّةً بِمِثْلِهِ، وَمَا وَرَأَاهُ بِإِزَاءِ الْفُلُوسِ . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কেউ যদি মুদ্রা-ব্যবসায়ীকে একটি দিরহাম দিয়ে বলে, তুমি এর অর্ধেকের বিনিময়ে আমাকে পয়সা দাও. আর বাকি অর্ধেকের বিনিময়ে এক রত্তি কম অর্ধ-দিরহাম [ওজনের ছোট দিরহাম] দাও, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে। পয়সার অংশে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে এবং অবশিষ্ট অংশে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, পয়সার বিনিময়ে অর্ধ-দিরহাম বিক্রয় করা জায়েজ। আর এক রত্তি কম অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে অর্ধ-দিরহাম বিক্রয় করা 'রিবা' [সুদ]-এর অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তা নাজায়েজ। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত্যের দাবি অনুসারে সম্পূর্ণ অংশেই বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, চুক্তিটি [উভয় অংশে] অভিন্ন এবং ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালী। কাজেই তা সম্পূর্ণ অংশে বিস্তার লাভ করবে। [ফাসিদ বিক্রয় পরিচ্ছেদে] এ মাসআলার উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি 'দাও' শব্দটি উভয় অংশে পুনরাবৃত্তি করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সিদ্ধান্ত সাহেবাইন (র.)-এর সিদ্ধান্তের মতোই হবে। এটাই বিশুদ্ধতম বর্ণনা। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় অংশের ক্ষেত্রে দুটি বিক্রয়চুক্তি। আর যদি বলে আমাকে অর্ধ দিরহাম পয়সা এবং এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম দাও, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, ক্রেতা দিরহামটির বিপরীতে অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য পয়সা এবং এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম [ক্রেতা প্রদত্ত দিরহামটি থেকে] সমপরিমাণের বিনিময়ে হবে আর অবশিষ্ট অংশ পয়সার বিনিময়ে হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুখতাসারুল কুদুরীর অধিকাংশ অনুলিপিতে কেবল দ্বিতীয় মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفًا دِرْهَمًا : এখান থেকে পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত মুসান্নিফ (র.) মোট তিনটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন-

প্রথম মাসআলা হলো : কেউ যদি মুদ্রা-বিক্রেতাকে একটি দিরহাম দিয়ে বলে যে, তুমি এ দিরহামটির অর্ধেকের বিনিময়ে আমাকে ধাতবমুদ্রা আর অবশিষ্ট অর্ধেকের বিনিময়ে এমন একটি ক্ষুদ্র দিরহাম দাও যার ওজন হবে অর্ধ দিরহামের চেয়ে এক 'হাব্বা' পরিমাণ কম, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম অর্ধেকের বিনিময়ে যে ধাতবমুদ্রা ক্রয় করতে চেয়েছে তার বিক্রয় সহীহ হবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেকের বিনিময়ে যে ক্ষুদ্র দিরহাম চেয়েছে এ অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হবে। প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, দিরহাম আর ধাতবমুদ্রা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য, কাজেই তাতে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিক্রয় যে কোনোভাবে হলেই জায়েজ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে হচ্ছে দিরহাম, যা রৌপ্যের তৈরি। সুতরাং একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়ার কারণে সমান সমান হওয়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু ক্রেতা অর্ধেক দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের অর্ধ দিরহামের চেয়ে এক 'হাব্বা' কম চেয়েছে। কাজেই 'রিবা' [সুদ] হওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ ও বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى نَيْسَابِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (ر.) : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলার বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত কি তা স্পষ্টভাবে তাঁর থেকে বর্ণিত নেই। কিন্তু অন্য মাসআলায় তিনি যে অভিমত পোষণ করেছেন সে অভিমত অনুসারে তাঁর মতে আলোচ্য মাসআলায় দিরহামটির উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রেই বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর মত অনুযায়ী উভয় অর্ধেকে বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, এখানে ক্রেতা উভয় অর্ধেকের বিনিময়ে যা ক্রয় করেছে তা সে একই চুক্তির অধীনে ক্রয় করেছে। কাজেই এখানে চুক্তি একটি। আর যে কারণে দ্বিতীয় অর্ধেকের মাঝে বিক্রয় বাতিল হয়েছে যে কারণটি শক্তিশালী কারণ, তা হলো 'রিবা' [সুদ] হওয়া। এটি শক্তিশালী কারণ এজন্য যে, এ কারণে সকলের মতে বিক্রয় বাতিল হয়। সুতরাং বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ যখন শক্তিশালী তখন চুক্তিটি একই হওয়ার ফলে তা উভয় অর্ধেকের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করবে। কাজেই উভয় অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলার উদাহরণ বা তদ্রূপ মাসআলা সাহেবাইন ও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাঝে উক্ত মতবিরোধসহ পূর্বে 'ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ের শেষের দিকে ৪৬ নং পৃষ্ঠায় দলিলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَرَّرَ لَنُظَّ الْأَعْطَاءِ الْخ : এখান থেকে দ্বিতীয় মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, ক্রেতা মুদ্রা-বিক্রেতাকে একটি দিরহাম দিয়ে এভাবে বলল যে, اَعْطِنِي بِنِصْفِهِ فُلُوسًا "আমাকে এ দিরহামের অর্ধেকের বিনিময়ে ধাতব-মুদ্রা দাও আর অর্ধেকের বিনিময়ে এমন একটি ক্ষুদ্র দিরহাম দাও যার ওজন অর্ধেক দিরহামের চেয়ে এক 'হাব্বা' কম।" অর্থাৎ এ সূরতে ক্রেতা 'দাও' কথাটি উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি করেছে। আর প্রথম মাসআলায় ক্রেতা উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে 'দাও' কথাটি একবারই বলেছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ সূরতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও কেবল দ্বিতীয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হবে। আর প্রথম অর্ধেক অর্থাৎ যে অর্ধেকের বিনিময়ে ধাতব-মুদ্রা ক্রয় করেছে সে অর্ধেকের ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে। এ সূরতে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ নেই।

এ সূরতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু ক্রেতা উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে 'দাও' কথাটি উল্লেখ করেছে সেহেতু এখানে উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে দুটি বিক্রয়চুক্তি হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণটি প্রথম অর্ধেকের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করবে না। কেননা, উভয় চুক্তি পৃথক বলে গণ্য হবে।

عَلَيْهِمَا الْيَمَانُ الْخ : قَوْلُهُ هُوَ الصَّيْحُ لِأَنَّهَا يَمَانُ الْخ (মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা বর্ণনা করেছি যে, 'এ সুরতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় জায়েজ হবে' এ বর্ণনাটিই সঠিক। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি দুটি সাব্যস্ত হচ্ছে। কাজেই একটি বাতিল হওয়ার কারণে অপরটি বাতিল হবে না। যদিও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, এ সুরতেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রেই বিক্রয় বাতিল হবে। কিন্তু তা সঠিক নয়।

عَلَيْهِمَا الْيَمَانُ الْخ : قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ : أَعَطَيْنِي يَصِفُ دَرَمٍ ثَلَاثُ الْخ : এখান থেকে তৃতীয় মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় মাসআলাটি হলো, কেউ মুদ্রা-বিক্রেতাকে একটি দিরহাম দিয়ে এভাবে বলল যে, أَعَطَيْنِي يَصِفُ دَرَمٍ ثَلَاثُ الْخ 'তুমি আমাকে অর্ধেক দিরহাম পরিমাণ ধাতবমুদ্রা এবং অর্ধ দিরহামের চেয়ে এক 'হাক্বা' কম পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা দাও।' অর্থাৎ এ সুরতে ক্রেতা তার দেওয়া দিরহামটিকে অর্ধেক করে ভাগ করেনি; বরং সম্পূর্ণ দিরহামটির বিনিময়ে বিক্রেতার নিকট হতে উক্ত ধাতবমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা চেয়েছে। এ সুরতে [আমাদের তিন ইমামের ঐকমত্যে] সম্পূর্ণ চুক্তিটি জায়েজ হবে। কেননা, ক্রেতা সম্পূর্ণ দিরহামটির বিনিময়ে বিক্রেতার নিকট হতে দুটি বস্তু চেয়েছে; আধা দিরহামে যা ধাতবমুদ্রা বিক্রয় হয় তা এবং একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা যার ওজন আধা দিরহামের চেয়ে এক হাক্বা কম। সুতরাং ক্রেতা যখন তার দেওয়া দিরহামকে অর্ধেক হিসেবে ভাগ করেনি তখন বিক্রয়কে জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য এরূপ ধরা হবে যে, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যে ক্ষুদ্র দিরহামটি দিয়েছে তার বিনিময়ে সমপরিমাণ ওজন ক্রেতার দেওয়া দিরহামটি থেকে ধরা হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে রৌপ্য হওয়ার কারণে সমান সমান অপরিহার্য। অতঃপর ক্রেতার দেওয়া দিরহামটি থেকে যা অবশিষ্ট থাকে তা বিক্রেতার দেওয়া ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে ধরা হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে এক দিকে ধাতবমুদ্রা আর অপর দিকে রৌপ্যমুদ্রা হওয়ার কারণে কমবেশি হওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। কাজেই যথাসম্ভব বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য এভাবে ধরা হবে। উল্লেখ্য, পূর্বের দুই মাসআলায় এভাবে ধরা সম্ভব নয়। কেননা, উক্ত দুই সুরতে ক্রেতা নিজেই তার দিরহামকে অর্ধেক অর্ধেক করে বিনিময় হিসেবে উল্লেখ করেছে। সুতরাং তার বিপরীত ধরা সম্ভব নয়।

عَلَيْهِمَا الْيَمَانُ الْخ : قَوْلُهُ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'মুখতাসারুল কুদুরী' গ্রন্থের অধিকাংশ অনুলিপিতে [নুসখায়] কেবল দ্বিতীয় মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়েছে [প্রথম মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়নি]। উল্লেখ্য, এখানে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলাটি বলে সর্বশেষ মাসআলাকে [আমরা যেটিকে তৃতীয় মাসআলা হিসেবে উল্লেখ করেছি সেটিকে] বর্ণিয়েছেন। আর প্রথম মাসআলার দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, আমাদের উল্লিখিত প্রথম মাসআলা।

উল্লেখ্য, 'মুখতাসারুল কুদুরী' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, অধিকাংশ অনুলিপিতে যে প্রথম মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়নি তা অনুলিপিকারদের পক্ষ থেকে ভুলবশত বাদ পড়েছে।